বঙ্গশ্রী

মাসিক পত্রিকা

CUL-H04249-16-P030240

অষ্টাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৫৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

(16)

756·3
·002/3

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

সম্পাদক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

P30240

বিষয় ও লেখক-সূচী

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
অভিনয়ের মিলন প্রসঙ্গ—একটি প্রশ্ন	শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত	২৬৮
অমৃতলালের প্রহসন	শ্রীকালিদাস রায়	২১৭
অসুখ হয় কেন ?	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
আঁদ্রে জিদ (সচিত্র)	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৬
আসামের নারী শিল্প	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসাগর	৫৫০
ঋগ্বেদে ও এড্ডায় সৃষ্টির কথা	শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী	১৯১
ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্ব-প্রগতি	আজ্‌হার উদ্দীন খান	১৭৩, ২২৬, ৩৩১
কন্যাকুমারী (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ	৪৩০
কপালকুণ্ডলা ও চৈত্রে কাঁথিতে বঙ্কিম মেলা (সচিত্র)	—	৩৪৭
কাব্যে চিত্তরঞ্জন	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৭
কি শিখিলাম (সচিত্র)	শ্রীহরিহর শেঠ	৪৪৫
কান্ত কবি রজনীকান্ত	শ্রীকালিদাস রায়	৫২৯
গুপ্তিপাড়া (সচিত্র)	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	১৬১
গ্রীক-দর্শন	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৭৯, ১১৫, ২৫৪
শ্রীশ্রীভগোবিন্দ	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮৩
শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৫৭০
তিব্বতের রাজধানী লাসা (সচিত্র)	শ্রীদীপঙ্কর	
'নবজাতকের কবি' রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	
নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	
নিরুক্ত	ডাঃ শ্রীঅমরেশ্বর ঠ	
নীলের গান ও পূর্ব্ববঙ্গ	শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব	
'পথের পাঁচালী'র দুর্গা	শ্রীনমিতা গুহ	
পিঠে পুলি (উদ্ধৃতি)	৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধ	
ভারতীয় জাহাজ শিল্প	শ্রীহিমাংশু রায়	
মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগু	
মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে পাক-ভারত বাণিজ্য	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যা	
বঙ্কিমচন্দ্রের 'লরেন্স ফষ্টর' চরিত্র কাল্পনিক নয়—বাস্তব	—	
বঙ্গবীর শ্যামাকান্ত	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগু	
বাংলা নাট্যমঞ্চের দুঃখের পাঁচালী	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্	
বার্ণার্ড শ' ও বিরস নাটক (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্র	
বিনোদিনী দাসী (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ	
বৈদ্যনাথে সাতদিন	শ্রীসুধীরকুমার	
শ' এর তিনটি নাটক	অধ্যাপিকা হিমা	

বিষয়	লেখক	
ও আধুনিক বিজ্ঞান	শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন	১৭৯
ম (সচিত্র)	—	১৮৩
	বেলা দে	৭৭
	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯৭
ও মানবের সনাতন প্রশ্ন	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬২
ী আচার্য্য ...নাথ বসু (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২০
মাজ	শান্তি রায়	২৩৯
অভিসম্পাত	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৭
...স্তর রাষ্ট্রসংস্থা	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
...প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'		৪৯৯

উপন্যাস

রণজিৎকুমার সেন — ৪৩, ১৪৫, ২৩১, ৩৩৫, ৪৩৫, ৫১৯

কামনীড় (কার্ল গিয়েলারুপ)— অনুবাদ—শুদ্ধোধন সেন — ৮৩, ১৭১, ৩৭২

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী — ৬৯, ১৪৮, ২৫৬, ৩১৬, ৪৬২, ৫৪৭

শ্রীচুনিলাল মুখোপাধ্যায় — ৪৩৬, ৫৭১

গল্প

বিষয়	লেখক	
	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১০৪
	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২৯৮
দু'টো	রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	১৬৫
ঐ—ঐ—ঐ	ভূপেন্দ্রনাথ দাস	২৬৩
চণ্ডুলা তালাও	শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১২৭
চিঠি	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী	৪৬৮
চিঠি	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫১৩
জাতীয় সম্পদ	আশা দেবী	৩০২
জোঁক	সুরুচি সেনগুপ্তা	২২২
দুর্গতির একদিন	শ্রীরমাপতি দাস	৩৮২
নূতন দিন	শক্তিপদ রাজগুরু	৪৭৫
পরিচয়	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	৫৬৩
পথের সন্ধান	শ্রীউষা বিশ্বাস	৪১১
পূর্বজন্মের ইতিবৃত্ত	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৩১
প্রতিধ্বনি	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫৫৫
ভাগ্যচক্র মুন্সী প্রেমচন্দ	অনুবাদ—পারুল ঘোষ	১৯৫
বহুরূপী	শ্রীমতী টুনু ঘোষাল	২৪৮
শৃঙ্খল-মুক্তি	শঙ্কর বসু	৯
সাধুর কবলে	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী	৭৪
সাহিত্যিক	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩৯৭
স্বর্ণ-দিগন্ত	সুভাষ সমাজদার	৩২৭

কবিতা

বিষয়	লেখক	
অমলাভিসার	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪২০
অস্বীকার	কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত	৩৫৫
আমি তার ধরি হাত	শ্রীলক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস	৪৫৩
ঋক্-প্রার্থনা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৫৩৪
গান	শ্রীমতী শান্তা ঘোষ	৫৪৬
চিরন্তনী	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	২৭৩
চিহ্ন	শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য	৪৪৪
জাগো স্বপ্নাত্মা	বটকৃষ্ণ দে	৩৪৪
ঝড় এলো	শ্রীঅসীমকুমার সোম	৫১৫
টুকরো কথার মালা	সুনীল কুমার গুপ্ত	১৪৪
তোমায় আমি ডাক দিয়েছি	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২২৫

বিষয়	লেখক	
দিব্য আঁখির রশ্মিকুসুম	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৬৬
নিরীক্ষা	শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৫৩৪
পরিত্যক্ত	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	২৫৫
প্রতিধ্বনি	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৩৮৭
প্রদীপ	শ্রীমমতা ঘোষ	৪২০
প্রশ্নবান	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	২৪৭
ফাঁকি	জ্যোতির্ম্ময় ভড়	১৫৪
কাঞ্চনায়ন	অরুণ চৌধুরী	৩৫৫
ভাড়াটে ভাঁড়	মণি দাশগুপ্ত	১৭০
যৌবনের সেনা	শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী	৪১০

পুস্তক ও আলোচনা ৮৬, ১৮৪, ৩৭৬, ৪৭২

বিষয়	লেখক
বন্দনা	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যা:
বাণী-কীর্ত্তন	হরিপদ দত্ত
বাজু বলম্বিত বেলা	
বিষণ্ণ বন্ধুর	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বিস্ময়ণ	সুনীলকুমার নন্দী
বেলাভূমি	আব্দুর রশীদ খান
ব্যবধান	সন্তোষকুমার অধিকারী
মিলনের শেষ—মিলনে	মন্মথনাথ কাব্যভারতী
সূর্য্য-স্বপ্ন	শ্রীসুধীর গুপ্ত
হে ভারত	শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

সম্পাদকীয় ৮৭, ১৮৫, ২৭৭, ৩৭৭, ৪

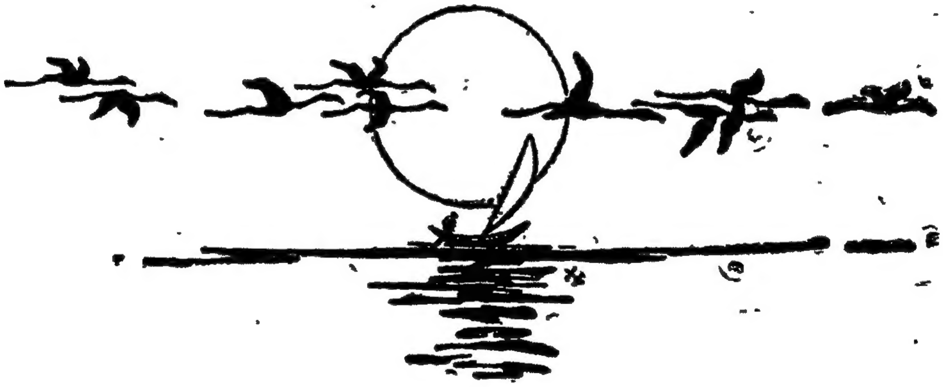

াবির্ভাব
আগষ্ট, ১৮৭২

শ্রীঅরবিন্দ

তিরোভাব
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

শ বর্ষ　　পৌষ—১৩৫৭　　২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রসংস্থা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

…ত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান শাসনের অবসানে সুসভ্য …তির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের শাসন রীতি- …শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রভাবে … আমরা অখণ্ড ভারতে অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত …খণ্ড স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার সুমোহন আশা …ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। তাহারই সূচনা …শ,—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির …। স্বাধীনতা যজ্ঞের এই বাস্তব অনুষ্ঠানের মূলে একজন মহামতি ইংরাজ মিঃ এলান ও হিউম এবং …ঐ অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে পৌরোহিত্য …ছিলেন, একজন মনীষী বাঙ্গালী ব্যবহারাজীবী মিঃ … সি, ব্যানার্জ্জী। ইংরাজ উচ্চশিক্ষা বিস্তার …আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আত্ম-শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভেদনীতি প্রচলিত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভেদে ইন্ধন যোগাইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে প্রবর্দ্ধিত করিয়া চির-বিচ্ছেদের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। ফলে, পরাধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে অখণ্ড ও অখণ্ডনীয় ভারতবর্ষকে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান, এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অখণ্ড ও অখণ্ডনীয় হইলেও, রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ চিরদিনই বহুধা বিভক্ত। যুগে যুগে বহু শক্তিমান পুরুষ বহুধা-বিভক্ত

ভারতবর্ষের খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া সম্রাস্ত সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় সকল ও বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে পাঠান সাম্রাজ্য, পাঠান সাম্রাজ্য হইতে মোগল সাম্রাজ্য, এবং মোগল সাম্রাজ্য হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্য,—উত্তরোত্তর-উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং বৃটিশ শাসনে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল কখনও কাহারও করতলগত হয় নাই। রামরাজ্যেও তাহা ঘটে নাই; কুরু-রাজ্যেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং বিধাতার তাহা অভিপ্রেত নহে, বুঝিতে হইবে। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও রাষ্ট্রতন্ত্র হিসাবে ভারতে তিনটি বিভাগ ছিল, এখনও আছে। প্রথম বৃটিশ অধিকার; দ্বিতীয় দেশীয় স্বাধীন, করদ এবং মিত্র রাজ্য এবং তৃতীয় বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন ভূভাগ। বেলুচিস্তান ও ব্রহ্মদেশ লইয়া ভারতবর্ষের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮,০০,০০০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে বৃটিশ শাসিত অংশের আয়তন ছিল প্রায় ১০,৯৩,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ সমগ্র ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশ প্রায় সমস্তই ছিল ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজগণের শাসনাধীন এবং ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় শত। ভারতবর্ষের স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা যেমন এখন, তেমনি তখনও ছিল মাত্র দুইটি—নেপাল ও ভুটান বা ভোটরাজ্য। নেপালের আয়তন ৫৬,০০০ বর্গ মাইল এবং ভুটানের ১০,০০০ বর্গ মাইল। এতদ্ব্যতীত পর্ত্তুগীজ ও ফরাসী এই দুইটি বিদেশীয় জাতির রাজত্ব আছে। গোয়া, দমন ও দিউ—এই তিনটি প্রদেশ লইয়া পর্ত্তুগীজ ভারতের আয়তন ছিল ২,৩৬০ বর্গ মাইল এবং বাঙ্গালার চন্দননগর এবং দক্ষিণ উপকূলস্থ পণ্ডীচেরী, মাহী, কারিকল ও ইয়ানন সম্বলিত ফরাসী ভারতের আয়তন ছিল ২৮০ বর্গ মাইল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সম্প্রতি চন্দননগরের অধিবাসিদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছানুযায়ী ফরাসী চন্দননগরকে পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে বৈদেশিক রাজত্বের অস্তিত্ব

যে কেবল অসমীচীন, তাহা নহে; ভবিষ্যৎ
পক্ষেও হানিকর। এই হেতু, ফরাসী অধিকৃ
স্থান এবং পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থানত্রয়কে ভা
অঙ্গীভূত করিবার নিমিত্ত ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ
সহিত ভারত সরকারের আলাপ-আলোচনা চ
উভয়েই এখন স্বায়ত্ত শাসনের নামে স্বাধিকার
চেষ্টিত। স্বাধীনতা অর্জ্জনের নিমিত্ত
ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়া
পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান. এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে
করদ ও মিত্র দেশীয় রাজ্য ছিল। সুতরাং
মাত্র দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা নহে।
ভারতবর্ষে চারিটি বিভাগ ঘটিয়াছিল।
হিন্দুস্থান, বৈদেশিক রাজ্য এবং দেশীয় স্বাধীন,
মিত্র রাজ্য। বৃটিশ শাসনে এই দেশীয় রাজ
ভারতবাসীর একতা ও স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতি
বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি।
নৃপতিগণ ছিলেন বৃটিশ শাসকদের হস্তে ক্রী
রাজ্য শাসন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদে
ছিল না। প্রতি রাজ্যে বৃটিশ প্রতিনিধি
যথার্থ শাসক। তাঁহার তর্জ্জনী হেলনে দেশীয়
বর্গকে শাসনের নামে স্বৈরাচার প্রতিপাল
হইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বণিক
বণিকের তুলাদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সাহ
মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করে,
সকল রাজন্যবর্গের পূর্ব্বপুরুষেরা—যিনি যে
সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, বৃটিশের অধিকা
করিতে তিনি সেইরূপ পরিমাণে সুযোগ-সুবি
সম্পদ সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই রা
পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-পরিপুষ্ট বিবাদ-বিস
ও তীব্র রাখিবার নিমিত্ত বিভেদমূলক অ
উপাধি এবং তোপধ্বনির বিনিময়ে ইংরাজ
সহিত বিভিন্ন সর্ত্তে বিভিন্ন প্রকারের সন্ধিপত্র
করে। ফলে, রাজমণ্ডল বৃটিশ ভারতের অধিবা
সহায়তা ও সহানুভূতি এবং স্ব স্ব রাজ্যান্তর্গত প্র
আন্তরিক অনুরক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি জা

ছধারী বায়সের পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বৃন্দের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থ সমৃদ্ধির প্রতি বিন্দু না রাখিয়া তাহারা তাহাদের প্রকৃত পরিচালক জ্যবাদী শাসক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত বৃটিশের এই কূট ভেদনীতি যেমন একই ক্তবর্গকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল, তেমনি বিভিন্ন জনমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্ম ও স্বার্থমূলক প্রভেদ সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করিয়া একতার বিরোধী ও বিভেদের অত্যুর্ব্বর ভূমি প্রস্তুত করিয়া- ন্দু-মুসলমানের বিরোধের ইহাই মূল তত্ত্ব। ী ভারতভূমির স্থায়, মহাচীনও অন্তর্যুদ্ধের হু বর্ষ বিধ্বস্ত হইতেছে এবং এখনও তাহার ঘটে নাই। এশিয়া ও আফ্রিকা এই উভয় শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত সুসভ্য কূটনীতিজ্ঞ াতির রাজনৈতিক শতরঞ্জ ক্রীড়ার চির রঙ্গ কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে, পের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির র্ত্তন ঘটে এবং সিংহলে, ভারতে ও বর্ম্মায় প্রতিষ্ঠা হেতু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধপূর্ব্ব ভারসাম্য বিপর্য্যস্ত হইয়া তাহার রাষ্ট্রতান্ত্রিক ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে, যুক্তরাজ্য ও রকেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন দিকস্থ সমস্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ ইয়াছে।

গা লাভের পূর্ব্বে পরাধীন ভারতের রক্ষণা- য়িত্ব ছিল শাসক জাতির। শাসক জাতি পরাক্রমশালী, সুতরাং আত্মস্বার্থরক্ষার ই আত্মস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে শাসিত একতার বিরোধী বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়গত সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া তাহাদিগকে পরস্পর চ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং পরাধীন াজী ও পর্ত্তুগীজ অধিকার এবং বহু ক্ষুদ্র স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল—বৃটিশের ও অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার যন্ত্র ও উপায় ন্তু স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকদিগের অতিকষ্টে অর্জ্জিত স্বাধীনতা সংরক্ষণই মুখ্য ব্রত। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত, শ্রেণীগত, ধর্ম্মগত, শিল্পগত, সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত প্রভেদ-পার্থক্য বিস্মৃত করিয়া একাভিসন্ধী হওয়াই মুখ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধির ফলে অখণ্ড ও অখণ্ডনীয় ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। অখণ্ড হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত অটুট ঐক্য-বুদ্ধির ফলে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। তাহার কুফল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে উদ্বাস্তু করিয়াছে। সেখানে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী সলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের অবকাশ এবং অভিপ্রায় অতি কম। কিন্তু হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম, ভাষা, শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত প্রভেদ-পার্থক্য ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু খণ্ড রাজ্যের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সংঘর্ষে বহু অনর্থ সংঘটনের প্রচুর অবকাশ বিদ্যমান। এই হেতু, স্বাধীনতা অর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রের মন্ত্রিমণ্ডলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু, মুসলমান, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলিকে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যথাসম্ভব বৃহদায়তন যুক্তরাজ্যে পরিণত করিয়া বৃটিশ শাসনকালীন প্রদেশগুলির সহিত সর্ব্ববিষয়ে তুল্য অধিকার সম্পন্ন করিয়া আত্মশাসনশীল বিভিন্ন উপরাষ্ট্রগুলিকে নব ভারতের ঐক্যবদ্ধ সার্ব্বভৌমিক সাধারণতন্ত্রী-কেন্দ্রী সংগঠনের অন্তর্ভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার অর্পিত হইয়াছিল এমন একজন বিচক্ষণ দেশনেতার প্রতি—যিনি বয়সে, সামর্থ্যে, শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় একমাত্র দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি—যাঁহার কথায় ও কার্য্যে ছিল ধৈর্য্য ও বীর্য্য, শাসনে ও সংস্কারে ছিল অটুট দৃঢ়তা এবং অসামান্য অধ্যবসায়, স্পষ্ট ভাষণে ছিল অকুণ্ঠ সত্যবাদিতা এবং যুক্তিতর্কে ঐন্দ্রজালিক শক্তি। তাঁহার সদুপদেশ এবং যুক্তিবাদে প্রত্যয়ান্বিত হইয়া দেশীয় রাজ্যের অধিপতিগণ প্রত্যেক অঞ্চলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একীভূত করিয়া বৃটিশ শাসনাধীন প্রদেশগুলির ন্যায় আয়তনবিশিষ্ট উপরাষ্ট্রে পরিণত করিয়া সার্ব্বভৌম স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শাসন ও সংরক্ষণের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছেন। ইহাতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক

ভারতের ধনবল, জনবল ও রাষ্ট্রশক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিদিগের ন্যায় গণ-তান্ত্রিক শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র ভারত-রাষ্ট্র একায়ত্ত কেন্দ্রীভূত শাসন-সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-সমর্থ রাষ্ট্রতন্ত্রের সৃষ্টি ও পুষ্টি হেতু ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্বাধীন, মিত্র ও করদ নৃপতিগণ সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রচুর পরিমাণে স্ব স্ব ক্ষমতা ও মর্য্যাদা স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ মনে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যুক্তভারত অর্থাৎ ভারত-বর্ষ উপ-মহাদেশে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ ছিল:—(১) বৃটিশ ভারত, (২) দেশীয় রাজ্য, (৩) বিদেশী অধিকার। বৃটিশ ভারতে এগারটি গবর্ণর অর্থাৎ সহকারী লাট-শাসন-কর্ত্তা-শাসিত প্রদেশ এবং পাঁচটি চিফ কমিশনার অর্থাৎ উপ-শাসন কর্ত্তা পরিচালিত উপ প্রদেশ ছিল। প্রদেশগুলি ছিল:—(১) বাঙ্গালা (রাজধানী কলিকাতা); (২) মান্দ্রাজ (রাজধানী—মাদ্রাস); (৩) বোম্বাই (রাজধানী বোম্বাই) (৪) যুক্তপ্রদেশ (রাজধানী—প্রথমে এলাহাবাদ, পরে লক্ষ্ণৌ); (৫) পাঞ্জাব (রাজধানী—লাহোর); (৬) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (রাজধানী—নাগপুর); (৭) বিহার (রাজধানী পাটনা); (৮) উড়িষ্যা (রাজধানী—কটক); (৯) আসাম (রাজধানী—শিলং); (১০) সিন্ধু—(রাজধানী—করাচী); এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (রাজধানী—পেশোয়ার)। উপ-প্রদেশগুলি ছিল এইরূপ:—(১) বেলুচিস্থান (রাজধানী—কোয়েটা); (২) কুর্গ (রাজধানী কুর্গ), (৩) আজমীর মারওয়ার (রাজধানী—আজমীর); (৪) দিল্লী (রাজধানী—দিল্লী) এবং (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (রাজধানী—রসদ্বীপ)।

দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল—৫৬২। অয়র্ল্যাণ্ডের তিনগুণ পরিমিত সুবিস্তৃত হায়দরাবাদের ন্যায় বৃহৎ রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র কয়েক বর্গ মাইল পরিমিত ক্ষুদ্র রাজ্যে ইহাদের পরিসমাপ্তি। সুবৃহৎ রাজ্য ছিল তিনটি। দক্ষিণে ৮২,৬৯৮ বর্গ মাইল পরিমিত হায়দরা-বাদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল ভুবনবিখ্যাত ই
এলোরার গুহাগুলি, গোলকুণ্ডার দুর্গ এবং
বাদসাহ আওরাংজেবের সমাধি। উত্তরে ৮৫,৮
মাইল পরিমিত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং ৭৩,
মাইল পরিমিত কালাত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রা
মাত্র সাতাশ জন মনুষ্য এবং বাৎসরিক আশী টা
সম্পন্ন বিলবাড়ী রাজ্য। মোটামুটি রাজ্যগুলি
ভাবে বিভক্ত করা যায়: (১) কাশ্মীরের সহিত
রাজ্যগুলি; (২) হায়দরাবাদ এবং মুসলীম
(৩) মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলি; (৪) শিখ রাজ্যগুলি; (
এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থিত রাজ্যগুলি; এবং (৬)
করদ রাজ্যগুলি।

৫৬২টি রাজ্যের নাম উল্লেখ করিবার প্র
তবে আর একটু বিশদ করিয়া আমরা কয়েক
গুচ্ছের নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করিব। উত্তরে
সিকিম, আসামে মণিপুর, বেলুচিস্থানে কালাত
রাজ্য গুচ্ছ—ইহাতে বরোদা প্রভৃতি ১২টি
ভারতের ভূপাল গুচ্ছ—ইহাতে ভূপাল প্রভৃতি
মধ্য ভারতের বুন্দেলখন্দ গুচ্ছ—ইহাতে অজয়
১১টি রাজ্য; মধ্যভারতে ইন্দোর ও রেওয়
বৃহৎ রাজ্য লইয়া একটি গুচ্ছ; মধ্য ভারতে
তৃতীয় মালাবার গুচ্ছ—ইহাতে ৮টি রাজ্য;
তিনটি গুচ্ছ—বাঙ্গালার ৩টি রাজ্য, ছত্রিশগড়ে
উড়িষ্যার অন্তর্গত সোনপুর, গোয়ালিয়র, ব
রামপুর লইয়া একটি গুচ্ছ; দাক্ষিণাত্যে
প্রভৃতি ৫টি রাজ্য লইয়া একটি গুচ্ছ; মান্দ্রাজে
পদুকোট্টাই এবং ত্রিবাঙ্কুর একটি গুচ্ছ। পাঞ
যালপুর প্রভৃতি ১২টি রাজ্য লইয়া একটি
পুতানায় বিকানীর ও শিরোহী; পশ্চিম ভার
প্রভৃতি ১৭টি রাজ্য; পাঞ্জাব পার্ব্বত্য প্রদেশে
পুতানায় জয়পুর গুচ্ছে ৫টি এবং পূর্ব্ব
ভরতপুর প্রভৃতি ৬টি; পশ্চিম রাজপুতা
প্রভৃতি ৪টি; মারবার এবং দক্ষিণ রাজপুতা
প্রভৃতি ৪টি; উত্তর পশ্চিম সীমান্তে চিত্রল
মহীশূর, হায়দরাবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মী

। এই সকল ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ রাজ্যগুলির আমলে বিষম পার্থক্য ছিল—অধিপতিদিগের সম্মানসূচক তোপধ্বনির সংখ্যা লইয়া। ৫৬২টি মধ্যে ১৪৯টির এইরূপ অধিকার ছিল। সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ৯টি তোপধ্বনি অধিপতিদিগের মান র পরিমাপ নির্দেশ করিত। কাশ্মীর, বরোদা, র, হায়দরাবাদ এবং মহীশূর ২১টি তোপের ছিলেন। এই ৫৬২টি রাজ্যের অধিপতিদিগের ১২জন স্বকীয় অধিকারে রাজন্য পরিষদের ber of Princes) সভ্য ছিলেন, এবং ১০৮টি প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ছিল। বাকী তালুকদার জায়গীরদার—তাহাদের সে অধিকার

। শাসনের অবসানে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট দ্বিধাবিভক্ত ভারতে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের শে ও রাজ্যগুলি বিভক্ত হইয়াছিল তাহাদের ও নৈকট্য অনুযায়ী। স্বাধীনতা অর্জনের মহৎ ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে র্য্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে, বাঙ্গলা ও ও দ্বিধাবিভক্ত করিতে হইয়াছিল, কারণ এই তভাগ্য প্রদেশে হিন্দু ও শিখ অধিবাসীর তুলনায় নের সংখ্যা ছিল অধিক। পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের অধিবাসিদিগের চরম দুর্ভাগ্য বশতঃ পাঞ্জাব লার বিভাগে একজন ইংরাজ মধ্যস্থের কূট-সালিসী র ফলে পরস্পরের স্বার্থের এরূপ বিষম সংঘর্ষ হয় যে, নির্মম ভ্রাতৃদ্রোহে এবং নৃশংস ভ্রাতৃহত্যায় র পুণ্য ভূমি দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করে। পঞ্চ- রক্তপাতের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গলায়ও সংক্রামিত হয়। এবং পশ্চিম পঞ্জাবের সহিত বেলুচিস্থান, উত্তর সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু পাকিস্থানের অঙ্গীভূত বং পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ব পঞ্জাব অন্যান্য প্রদেশ- সহিত বৃহত্তর ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মী শোষণপ্রিয় শাসক সৃষ্ট ও পুষ্ট হিন্দু মুসলমান র একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান যে উভয়ের মধ্যে ভারত- র এইরূপ বিভাগ, তাহা পাঞ্জাবের সর্বভারতীয় মনস্বী নেতা স্বনামধন্য লালা লাজপত রায় বহুবর্ষ পূর্ব্বে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পরে সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ যখন আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিল. তখন দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বৃটিশ সম্রাটের সার্ব্বভৌম আধিপত্য ছিল। এই আধিপত্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন কাল হইতে প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এবং পরে বৃটিশ রাজতন্ত্রের শীর্ষস্থিত নৃপতির সহিত যে সকল সন্ধি-সর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ফলে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনতন্ত্র সেই আধিপত্য তৎসৃষ্ট দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রের নিকট হস্তান্তরিত না করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে দুইটি রাষ্ট্রের যে কোনটির আনুগত্য স্বীকার করিতে অনুরোধ জানাইয়া উভয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির সূত্ররূপে একটি অতি কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই বিষবৃক্ষের পরিণতি আজ কাশ্মীর-বিরোধে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র এই ক্ষেত্রে যদি কূটিলতা পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে অন্যান্য ক্ষমতার সহিত এই সার্ব্বভৌম আধিপত্য আইনানুযায়ী যুক্তিসিদ্ধ ভাবে উত্তরাধিকারীদ্বয়ের অধিকার অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দিতেন তাহা হইলে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে এবটা বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত না।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ সন ১৩৫৪ সালের ৩০শে আশ্বিন, স্বাধীনতার দিবসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থান হইতে সদ্য-বিচ্ছিন্ন হিন্দুস্থানে পাঁচ শত দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদিগের স্বৈরশাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই অখণ্ড রাজ্যগুলি ছিল বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বাধীনতা লাভের মাত্র দেড় বৎসর পরে এই রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ় অধ্যবসায়শীল সহিষ্ণু ও সংযত প্রচেষ্টার ফলে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সপ্তদশে। দেশীয় রাজ্যরূপে চিনিতে পারিলেও যথাসম্ভব ঐকান্তিক সংযোগ সংগঠনের পশ্চাতে স্বাধীন ভারতের

অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ইহাদের প্রভেদ পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। যুগযুগান্তরের সুদীর্ঘ পরাধীনতা-বিমুক্ত ভারতের সমলব্ধ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বহুধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যগুলিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভারতের গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনশীল উপরাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া বৃহত্তর ভারতের সমগ্র সংগঠনের অঙ্গীভূত করণই ছিল তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। স্বরাষ্ট্র-সচিব প্রচুর বিচক্ষণতা এবং প্রশংসনীয় দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত এই সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই অতি প্রয়োজনীয় এবং অতীব সমীচীন প্রচেষ্টার পশ্চাতে বিন্দুমাত্র ভাবপ্রবণ আগ্রহাতিশয্য কিংবা রাজ্য বিস্তার লিপ্সা কিংবা শক্তিমদমত্ত রাজনৈতিক আকিঞ্চন প্রচ্ছন্ন ছিল না। পরন্তু ভৌগোলিক পরিস্থিতি সংরক্ষণ প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রভৃতি কয়েকটি অতীব গুরুতর কারণে স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র ভারতের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশ ও রাজ্যগুলিকে একটি যথার্থ অটুট একত্রীভূত সংগঠনে পরিণত করাই ছিল অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই সঙ্কল্পের প্রথম অনুষ্ঠান হইয়াছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে সার্ব্বভৌমিক হিন্দুস্থানের নব রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আনয়ন। পাকিস্থানের জন্মের পশ্চাতে হিন্দুস্থানের অনুকরণে রাজস্থান, শিখস্থান, পাঠানস্থান প্রভৃতি বহুস্থানের প্রতিষ্ঠা কল্পনা বহু উর্ব্বর মস্তিষ্ককে এরূপ আলোড়িত করিতেছিল যে, কোন কোন "হিতৈষী" মহলে এরূপ আপাতরম্য একটি অহেতুক দুশ্চিন্তা জন্মিয়াছিল যে, দেশবিভাগের এবং দেশীয় রাজগুলির বিচ্ছেদের ফলে অচিরে ভারতে রাষ্ট্রবিপর্য্যয় ঘটিবে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের আশঙ্কা এখনও অমূলক রহিয়াছে। ভবিষ্যতেও অমূলক থাকিবে।

নব-সংগঠিত ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সংরক্ষণ হেতু কেন্দ্রীয় ভারত সরকার সর্ব্বাগ্রে যাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে ভারত রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে, তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই দেশীয় রাজ্যগুলির স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুগত্য স্বীকৃতি নব ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তৎকালীন বিষম প্রতিকূ স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহার গুরুত্ব ও গৌরব সুধী মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া আয়তনে পরিণত করা হয়, এবং নব-সংগঠিত ব রতন রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তি দেশীয় রাজ্যগুলির কতকগুলিকে নিকটবর্ত্তী প্রদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যথা বরোদা ও কোলাপুর (বে ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা) এবং কুচবিহার (বাঙ্গলা) গুলিকে কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ব্বর্ত্তী করা হয়; ত্রিপুরা এবং কতকগুলিকে একত্রিত করিয়া করা হয়। এই প্রক্রিয়া সর্ব্বপ্রথমে ১৯৪৮ সাে জানুয়ারী তারিখে উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড় রাজ্য লইয়া আরম্ভ হয়, এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা তারিখে কুচবিহার রাজ্যকে পশ্চিম বঙ্গের করিয়া সমাপ্ত হয়। কয়েকটি পার্ব্বত্য রাজ্যের সম্মিলনে সংগঠিত হিমাচল প্রদেশকে সর্ব্বাগ্রে খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে সরাসরি কেন্দ্রীয় স শাসনাধীনে আনা হয় এবং সর্ব্বশেষে ১৯৫০ জানুয়ারী মাসে বিন্ধ্য প্রদেশকে এইরূপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের স সম্মিলনে সংগঠিত এই রাষ্ট্রকে প্রথমে একটি সম্মিলনে পরিণত করা হয়, কিন্তু শাসন-বিশৃঙ্খলা এবং ইহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুন্নতির কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য হইয়া সরাসরি ইহার শা লইতে হয়। ২১৭টি কাথিয়াবাড় খণ্ড রাজ্য এবং শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া সংগঠিত হইয়াছি সায়ত্তশাসনশীল সম্মিলিত রাষ্ট্র সংস্থা—সৌরাষ্ট্র, খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। এই পর্য্যায়ের সংযো শেষ পরিণতি ঘটিয়াছিল ভারতের দক্ষিণ প্রা দুইটি রাজ্যের সংযোগ-সম্মিলনে যুক্ত ত্রিবাঙ্কুর ও উপরাষ্ট্রে। এইরূপে স্বল্প সামর্থ্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যং আয়তনে সম্ভ্রান্ত এবং অর্থসামর্থ্যে সম্পন্ন রাষ্ট্রের করণের ফলে ৬,৯২৫ মিলিয়ন (৬৯২ কোটি) অ

সম্পন্ন ৬৩,৭০৪ বর্গ মাইল ব্যাপী ২১৬টি রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে ৩৪'৭ (৩৪ কোটি) অধিবাসী-সমন্বিত ২১৫,৪৫৯ বর্গমাইল ব্যাপী ২৭৫টি রাজ্য স্বায়ত্বশাসনশীল যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার সংযোগ-সম্মিলন দ্বারা একত্রীকরণের ফলে ৭০,৭৮৩ (৭০৭৮ কোটি) অধিবাসী সমন্বিত ৩৯৭,৮৯৩ বর্গ মাইল ব্যাপী ৫৫২ সংখ্যক দেশীয় রাজ্য শক্তি-সামর্থ্যে সমধিক দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়ার বহির্ভূত ছিল মাত্র তিনটি সুবৃহৎ রাজ্য—হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং জম্মু ও কাশ্মীর। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের বিশেষ বিধানের অন্তর্গত; কিন্তু হায়দরাবাদ ও মহীশূর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সমতুল্য; এবং ভূতপূর্ব বৃটিশ শাসিত প্রদেশ হইতে কোন অংশে বিভিন্ন নহে। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত খাসিয়া পর্ব্বত, নিকটবর্ত্তী উপজাতীয় অঞ্চলের সহিত আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটি স্বয়ং শাসিত জেলায় পরিণত হইয়াছে। অনুন্নত অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য সুযোগ সুবিধাও এই জেলা পাইবে।

স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র ভারতের সীমান্তর্গত সমস্ত স্বতন্ত্র এবং সংযুক্ত উপরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের নববিধান সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। হায়দরাবাদের রাজপ্রমুখ নিজাম বাহাদুর এই মর্ম্মে স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, যথাসময়ে হায়দরাবাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র-প্রণয়নকারী-পরিষদ (Constituent Assembly) তথাকার আভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং সার্ব্বভৌম কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত তাহার সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিবে। জম্মু ও কাশ্মীরের স্বীকৃতিতে ঐ রাষ্ট্রের নিমিত্ত আইন-প্রণয়নে, কেন্দ্রীয় মহাসভার অধিকার কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। জুনাগড় মানবাদার, মংরোল, বান্টয়া, বারিয়াবাদ এবং সরদারগড় প্রভৃতি রাজ্যের শাসনভার তত্রত্য জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের প্রকাশ্য সভায় গৃহীত প্রস্তাব এবং অধিবাসিবর্গের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি অনুযায়ী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সৌরাষ্ট্র শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান-সম্পত্তি এবং বংশানুক্রমিক প্রাপ্য ভাতা নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইবেন। প্রত্যেক রাজ্যের সৈন্য এবং অর্থসামর্থ্য কেন্দ্রীয় শাসন ও শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলির সংযোগ সম্মিলন এবং কেন্দ্রীয় সার্ব্বভৌম শাসনতন্ত্রের সহিত তাহাদের ঐক্যকরণের দশ বৎসরের মধ্যে নবসংগঠিত উপরাষ্ট্রগুলিতে এই গুরু পরিবর্ত্তনের ফলে যাহাতে কোন প্রকার আর্থিক অথবা অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় না ঘটে তাহার সম্যক ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে যথাসম্ভব ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত সমপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রসংস্থাকে যে অটুট ঐক্যবন্ধনে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা যে কেবল স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষেমঙ্কর, তাহা নহে; কূটচক্রীর লীলাভূমি খণ্ড-খণ্ড ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষেও পরম কল্যাণজনক। এই সংস্কার স্বৈর শাসনের নির্ম্মম কবল হইতে তত্রত্য প্রজাবর্গকে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্ব্বে যে রাষ্ট্র-নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষতঃ শুল্কসংক্রান্ত বিদ্বেষ-বিভেদ ছিল, তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। সমগ্র রাষ্ট্রের সহিত আইনের সমতার সহিত, শুল্ক নির্দ্ধারণ ও প্রবর্ত্তনের সমতা রক্ষিত হইবে। কেন্দ্রীয় শুল্ক ও কর প্রভৃতির নিরূপণহেতু ও নীতি এবং বন্টন ও ওয়াশীল-প্রথায় সর্ব্বত্র সমতা রক্ষিত হইবে। আভ্যন্তরীণ শুল্কের বিলোপ হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের সৌকর্য্য ঘটিবে। ট্যাক্স্ এড়াইবার ফন্দী-ফিকির দমিত হইবে। প্রায় প্রতিরাজ্যকে পূর্ব্বে যে সকল অনাবশ্যক গোমস্তাখানা এবং বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান পোষণ করিতে হইত, তাহার সংখ্যা ছিল যেমন বহু, ব্যয়ও ছিল তেমনি প্রচুর। এইরূপ অপচয় ও অপব্যয় বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে। ফলে, জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধা এবং সর্ব্ববিধ সামাজিক কল্যাণবৃদ্ধির নিমিত্ত এখন সম্ভবমত অর্থ-সামর্থ্য নিয়োজন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা, আচার ও বিচার, কৃষি ও শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে

দ্রুত উন্নতি ঘটিবে এবং জনসাধারণের কল্যাণ ও জাতীয় অর্থনীতির উৎকর্ষ ঘটিবে। ফলতঃ নবরাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত বিশিষ্ট অধিকার মানের এবং জায়গিরী প্রথার বিলোপ সাধন ঘটিবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধনে নিবদ্ধ এবং অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত সমপর্য্যায়ে সমুন্নত করিয়া সমগ্র স্বাধীন দেশের অটুট ঐক্যসাধন বিরাট কীর্ত্তি নহে, বিপুল সাধনা। সিদ্ধি এখনও সুদূরপরাহত। নব জাগ্রত এশিয়ার মধ্যমণি ভারতবর্ষ। স্বাধীন ভারতের তরুণ তপন যখন মধ্যগগনে উদগ্র হইয়া তীক্ষ্ণ তেজে এবং তীব্র বীর্য্যে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রদীপ্ত প্রভায় প্রভাবান্বিত হইবে, তখনই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। লুপ্ত গৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব, সুপ্রাচীন আর্য্য ভারতের লুপ্ত বীর্য্য, সুপ্তিমগ্ন হিন্দুজাতি যখন শৌর্য্যে-বীর্য্যে হিন্দুস্থানের পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ করিবে, সাধনায় তখনই সিদ্ধি লাভ ঘটিবে।

পিঠে-পুলি

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

পুলি পিঠে—কিবা মিঠে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে খাই, আর বাঙ্গালার গুণ গাই। হায়রে আজ যাহারা "মদন ছাবার" মোহে মসগুল্, তারা যদি এই পৌষের মিঠে-মধুর রৌদ্রে পিঠ দিয়া নলেন গুড়ের পায়েসে ডুবাইয়া পুলি-সরু-চাকলি-পিঠে খাইত, তবে আর ঐ নিরাস্ত ছিবড়ের মত জিনিসগুলা গিলিত না। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিত বাঙ্গালীর প্রাণে কত রস—সে রসের কি মাধুর্য্য। ফিরিঙ্গীর ঐ মদনছাবা রোষ্ট রুটি যেমন শুক্‌নো পোড়া, ফিরিঙ্গীর প্রাণটাও তেমনি কাট্‌খোট্টা; যারা ঐ ফিরিঙ্গীর রাঁধা খাদ্যগুলা খাইয়াছে, তাহাদের জাতিপাত ত হইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কোমল মধুর প্রাণখানিও হারাইয়াছে।

আর দেখিয়া যাও, যারা পৌষ-পার্ব্বণে পুলিপিঠে খায়, পিতৃ-পিতামহের ধারা বজায় রাখে, তাদের কিবা আনন্দ, কিবা উৎসব; বাংলার এই দুর্দ্দিনেও তাদের ঘরে সুখের জোয়ার বহিয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণের দিন প্রাতে পিসিমা বলিতেন, দেখিয়া আয়—"পাঁদাড়ে শেয়াল ফুলিতেছে।" এমন মিঠে বাঙ্গালীর এই পুলি পিঠে যে, বনের পশুও ইহার লোভে পুলক-স্পর্শে ফুলিয়া ওঠে। কে তোরা ছাড়িলি রে হতভাগ্য, এমন সুধা-স্বাদু ঘরের জিনিষ। ছাড়িয়াছিস্ বলিয়াই তোদের এমন দুর্গতি।

অদ্বৈতানন্দ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে এই পিঠে-পুলির রসে মজিলাম। কাজ নাই আমার ভূমানন্দ—অদ্বৈত অনুভূতির নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমি জন্ম-জন্মান্তর বাঙ্গালার শ্যাম-অঙ্কে জন্মাইব, ঐ পিঠেপুলিরই অনুপম অনুরাগে। এ আমার মোহ নহে, বুড়া বয়সের লোভও নহে, আজ অদ্বৈততত্ত্বকে ভাল করিয়া অনুভব করিলাম, উহা ত নাস্তিত্ব নহে—উহা যে অস্তিত্বের অমৃতে অমৃতায়মান—'রসো বৈ সঃ'—যাহা আছে সবই সেই রসমহিমায় মহিম-মধুর। তাই আরণ্যক ঋষির সত্যদৃষ্টি—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। আমি আজ অনুভব করিয়াছি—আমার বাংলার সবই ভূমার মহিমায় মহিমান্বিত। তাই আমি আজ আমার পিসিমার হাতে গড়া পুলি-পিঠের স্বাদ লইতে লইতে সেই অদ্বৈত রসাস্বাদন করিয়েছি। বিশ্বাস হয় না? ভালবাসিও, আমার—তোমারও বঙ্গভূমিকে!—তবে পুলি-পিঠের স্বাদে ভূমানন্দই অনুভূত হইবে।

আজ পিঠে-পার্ব্বণ—কাল উত্তরায়ণ। এইটুকু বুঝা চাই। আজ আমরা ভোগের প্রমোদে মাতিয়া উঠি, কাল অম্লানবদনে সত্যব্রত পালন করিয়া বীর-শয্যা গ্রহণ করি। আমরা কাঙ্গালও নই—ভোগীও নই। আজ আমাদের উৎসব—কাল আমাদের বিসর্জ্জন। এস, আজ পেট পুরিয়া পুলি-পিঠে খাই—বুঝিয়া লই অন্তরের নিগূঢ় অনুভূতি দিয়া মাতৃস্নেহ, খুড়ি, জ্যেঠি, পিসি, মাসীর উদ্বেলিত মমতা। কাল ব্রত উদ্‌যাপন করিব—দেশের জন্য আমার সমাজ-সভ্যতা স্বজাতির জন্য—শরশয্যা বরণ করিব, আত্ম-বিসর্জ্জন করিব। পৌষ-পার্ব্বণের পর উত্তরায়ণে নির্দ্দেশ করিতেছে—ভোগের পর—ত্যাগ,—পিঠে খাইতে খাইতে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। *

---

* "সন্ধ্যা হইতে উদ্ধৃত।"

শৃঙ্খল-মুক্তি

শঙ্কর বসু

ভোরের আকাশ। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ রিক্তা বধূর মতো ম্লান গৌরবে দিগন্তের আঙিনায় বিদায়ের নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় ম্রিয়মানা। তার দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ আলো যেন আকাশ ছাড়িয়ে মাটীর পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

হিজলী জেলখানা। খড়গপুর ষ্টেশন হতে অল্প কিছুটা দূরে একটু উঁচু টিলার উপরে। ওর এক পাশ দিয়ে পুরী যাবার রেল পথটা এঁকেবেঁকে গা ঘেঁসে চলে গেছে। দক্ষিণে লাল কাঁকড় মেশানো চওড়া রাজপথ। এই পথেই নাকি একদিন কপালকুণ্ডলার হাত ধরে নবকুমার সপ্তগ্রাম গিয়েছিল। কতো যুগ যুগান্তের কতো অসংখ্য নরনারীর পদচিহ্ন বুকে করে সে-পথ আজও তেমনি পড়ে আছে। পথের উত্তর দিকের শাল বনটা কেটে পরিষ্কার করে স্বদেশী কয়েদীদের জন্য এই জেলখানাটা তৈরী হয়েছে। জেলের বাইরে কোন প্রাচীর নেই—চারদিকে শুধু তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। পূবদিকে ঠিক জেলখানার পাশাপাশি একটা মস্ত বড়ো দালান। বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের ওখানে রাখা হয়েছে। অনেক দিন আগে একসময় সমগ্র মেদিনীপুর জেলাটাকে দু'ভাগে ভাগ করে এখানে এই হিজলীর মাঠে তার একটির সদর হেড-কোয়ার্টার করার মতলব ছিলো এবং ডেটিন্যুদের ঐ দালানটিই ছিলো সেই প্রস্তাবিত জেলার দেওয়ানী আদালত বাড়ী।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত মাঠ। মাঝে মাঝে এক আধটা শালগাছ—যেন অতীতের এক একটা সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তারকাঁটা ঘেরা জেলখানাটার পূব-পশ্চিমে আড়াআড়ি ভাবে বেশ চওড়া একটা রাস্তা। ওর এক প্রান্তে কয়েদীদের পাকশালা। অপর প্রান্তে—একেবারে পূব দিকে স্নানের জায়গা এবং পায়খানা। ঠিক মাঝামাঝি রাস্তাটার দু'পাশে সাড়ি সাড়ি লম্বা টীনের ঘরে কয়েদীদের থাকার ব্যবস্থা। ঘরগুলো প্রচুর আলো বাতাসে ভরা। ওতে শুয়ে আকাশের তারা গোণা যায়। জোছনা রাতে কারো মনে কাব্য-রসের সঞ্চার হলে বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। আর একটু বৃষ্টি-বাদলা হলে তো কথাই নেই—যে যার মতো বিছানা বগলে করে শেয়ালদা ষ্টেশনের যাত্রীর মতো ঘরের মাঝখানে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এক একখানা ঘরে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ জন করে কয়েদী থাকার ব্যবস্থা। অবশ্য এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা মতো যে প্রত্যেক ঘরে থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। কোন ঘরে হয়ত কিছু বেশী আবার কোন ঘরে হয়ত কিছু কম। প্রত্যেক ঘরের দরজা একটা, কিন্তু ওতে রীতিমতো তালাচাবির বন্দোবস্ত আছে, তবে ঘর থেকে পালাতে হলে এই সুরক্ষিত দরজা ছাড়া যে যাবার উপায় নেই, তা নয়। কিন্তু সবাই সত্যাগ্রহী বন্দী কি না, তাই যা ভরসা। কারণ এরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছে বলেই স্বেচ্ছায় কারা-ত্যাগের কোনো অভিসন্ধি ওদের নেই। এ কথা সরকার বাহাদুর জানে বলেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ভাঙ্গা ঘরের জীর্ণ দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে কোন মতে আইন বাঁচিয়ে রেখেছে।

এমনি একখানা ঘরে অন্যান্য কয়েদীদের সাথে বিমানও ঘুমিয়ে আছে। বেশ একটু শীতের আমেজ মেশানো ভোরের বাতাস। কয়েদীরা যে যার কালো কম্বলগুলো গভীর প্রেমে গায়ে জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে—দৈনন্দিন জীবনের কোন কর্ম্ম-ব্যস্ততা নেই—কোন উদ্বেগ নেই, ব্যর্থতার কোন গ্লানি নেই।

বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা খোলা জানালাগুলো গলিয়ে চাঁদের টুকরো টুকরো আলো সারা ঘরময় আলো-ছায়ার আলপনা দিয়ে তুলেছে। ওরই এক টুকরো আলোর ছোঁয়া লেগে বিমানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গায়ের কম্বলখানা একবার টেনে ভাল করে জড়িয়ে বিমান একবার বাইরে জোছনা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে

কি যেন ভাবতে লাগলো। দিনের কর্ম্মহীন ব্যস্ততার মধ্যে যে কথা কখনও কোন সময় ভাববার অবকাশ হয় না, ভোরের এই নিস্তব্ধতার শান্ত শীতল স্পর্শে ওর অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলো যেন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মনের দুয়ারে এসে ভীড় জমিয়েছে।

অতিশৈশবে পিতৃহীন বিমান। সংসারে তার বিধবা মা ও ছোট বোন লীলা ছাড়া আপন বল্‌তে আর কেউ ছিল না। বিধবা মায়ের স্নেহ ও দুঃখের অশ্রু-ধোয়া কত আশা—কতো স্বপ্ন দিয়ে যে বিমানের শৈশবের দিনগুলি পার হয়েছে, বিমান হয়ত তার হিসেব রাখে না। কিন্তু বিমান শুধু জানে যে, ওকে মানুষ হতে হবে, মায়ের দুঃখ ঘোচাতে হবে; ছোট বোন লীলাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য। বিমান যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এলো, মা ওকে কোলে করে আদরে স্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কেমন পরীক্ষা দিলে বাবা!'

বিমান হেসে জবাব দিলো—'তোমার ছেলে কি খারাপ পরীক্ষা দিতে পারে মা!'

কিন্তু যেদিন সত্য সত্যই বিমানের পরীক্ষার ভাল পাশের খবর এলো, একমাত্র পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য সেদিন পর্য্যন্তও তিনি অপেক্ষা করতে পারেন নি। মাতৃহারা বিমানের চোখের জলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। জীবনের যতো আশা—যতো কল্পনা সবই যেন ওই অন্ধকারের পথে হারিয়ে গেল। ছোট বোন লীলার হাত ধরে বিমান চলে এলো সহরে পিতৃবন্ধু নরেন বাবুর আশ্রয়ে। এখানে এসে লীলা পেল মাধবীকে—মাধবী পেলো বিমানকে। মাধবী নরেন বাবুর মেয়ে, লীলার চেয়ে দু'বছরের বড়ো। তা ছাড়া নরেন বাবুর স্ত্রী সারদাসুন্দরীর মধ্যে বিমান ও লীলা যেন ওদের হারানো মাকে খুঁজে পেলো।

কিন্তু ভগবান যার আশ্রয় ভেঙ্গে দিয়েছে, মানুষের তাকে অস্বীকার করতে যাওয়ার মতো এতোবড় বিড়ম্বনা আর কিছু নেই।

বিমানের কানে এলো—ঢং-ঢং-ঢং, জেলের সদর দরজায় ঘণ্টা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘুমন্ত পুরীটা যেন কোন এক যাদুকরের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে কোলাহলমুখর হয়ে উঠলো। জনকয়েক সিপাহীসান্ত্রী সঙ্গে নিয়ে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ঘরে ঘরে তালা খুলে মামুলী গুনতি মিলিয়ে দেখলেন যে, ভাঙ্গা ঘরের দরজা খুলে কেউ পালিয়েছে কিনা। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ঘর খোল হয়ে গেল—আবার সদর দরজায় ঘণ্টা হলো—ঢং-ঢং-ঢং: অর্থাৎ ঠিক আছে।

কিন্তু সব ঠিক থাকলেও তখন পর্য্যন্ত ঘরের বার হবার নিয়ম নেই। প্রাতকৃত্যাদি সমাপনের তাগিদের তারতম্য অনুযায়ী বন্দীরা যে যার ঘরের দরজায় উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার ঘণ্টা হলো—ঢং-ঢং-ঢং। আর প্রকৃতির আহ্বানে অপেক্ষমান বন্দী-জনতা ছুট দিয়েছে—যেন রেসের ঘোড়দৌড়, কে কার আগে যেতে পারে তার-ই প্রতিযোগিতা। কারণ জেলখানার এই অন্তঃপুরের গোপন আসরে আসন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু তা-ও প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসাবে অগ্রিম রিজার্ভ করে রাখার উপায় নেই, অগ্রাধিকার বলে যে প্রথম দখল নিতে পারে। অনেক সময় বে-সামাল যাত্রীরা প্রয়োজনের তারতম্য অনুযায়ী পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি অথবা দরজা ধরে টানাটানি সুরু করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। এমন কি সময় সময় হয়ত বা কায়িক শক্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সেটা আক্রোশে নয়, আপোষে। কখনও কখনও এমনও অবস্থা হয়ে পড়ে যে, যিনি স্থান দখল করে বসেছেন, তার ভাণ্ডে জল নেই, আর যিনি দখল পাননি, তিনি জলের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ফলে আধাআধি বখরায় একটা আপোষ নিষ্পত্তি করতে হয়।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্রাতকৃত্যাদি শেষ হতেই পাকশালায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। বন্দীরা আবার দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে—মাঝখানের চওড়া রাস্তায়। সকলের হাতেই একটি করে এলুমিনিয়মের বাটী ও এক খানা থালা। ওদের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন কোসনের

মধ্যে সর্ব্বসাকুল্যে এই সম্বল। জল খাওয়া, স্নান করা, প্রয়োজন হলে গান বাজনার তাল দেওয়া এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সর্ব্ব কাজেই ঐ থালা বাটী ছাড়া আর কিছু নেই। কাজেই অতি পাকা গিন্নিপণায় ওগুলোকে মেজে ঘসে সাফ সাফাই রাখার চেষ্টা-যত্নের ত্রুটী নেই।

প্রায় পোয়া মাইল খানেক দূরে পাকশালা এবং খাবার ঘর। বন্দীরা চলেছে সাড়ি সাড়ি। কোন ভাবনা নেই—চিন্তা নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, যেন নিরাসক্ত আনন্দের টুকরোগুলো রাস্তা গড়িয়ে চলেছে। ওদের হাতের থালা বাটী আর পায়ের শিকলবেড়ী জলতরঙ্গের শব্দ-ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠেছে।

সকলেরই পায়ে অবশ্য শিকলবেড়ী নেই। বিশেষ বিশেষ বন্দীর বিশেষ অলঙ্কার। এ অলঙ্কার পরার সৌভাগ্যের দুর্ভোগ সকলের কপালে জোটে না। তবে যাদের হয়, কয়েদী জীবনে তারা বনেদীঘর এবং কৌলিন্যের মর্য্যাদা পায়।

অবশ্য প্রথম থেকে এ প্রথাটা এখানে প্রচলিত ছিলো না। বিমান ও বিশু, ওরা দুজন যে-দিন মাদারীপুর থেকে এখানে চালান হয়ে এলো, জেলের নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরদিন ওদের দুজনকেই জেলের বড় কর্ত্তা—অর্থাৎ কমাণ্ডান্ট-এর নিকট হাজির করা হলো। কমাণ্ডান্ট সাহেব জাতিতে ইংরেজ এবং তাঁর একমাত্র গুণাগুণ—তিনি কোথাকার এক যুদ্ধে তাঁর একখানি হাত হারিয়েছিলেন। সাহেব লোক,—একে হাতকাটা, তার উপর ইংরেজ, রাজত্বটাকে যারা পয়মাল করতে চায়, সেই সব বদমাইশ কয়েদীদের তিনি অধিকর্ত্তা। কাজেই তাঁর মেজাজটাও বেশ একটু কড়া রকমের। বিমান ও বিশুকে ওঁর কাছে হাজির করতেই সাহেব রূঢ় অভদ্র ভাষায় একটা গালাগাল দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'সালাম করো, সালাম করো।'

যারা গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করতে চায় সেই গভর্ণমেন্টেরই একজন চাকরের এই ঔদ্ধত্যে বিমানের পিত্তি জ্বলে ওঠে এবং সাহেবের মুখের কথা শেষ না হতেই বিমান জবাব দেয়—'সালাম? কভি নেহা।'

সিপাহী ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে ওদের ধরে জোর করে সালাম করার কায়দায় হাত দুটী মুচড়ে কপালে ঠেকিয়ে দেয়।

ওরা মনে মনে হয়ত ভাবলো—তবু যা-হোক আপদ চুকে গেল। কিন্তু সাহেবের হুকুম হলো—'শালা লোগ বহুত বদমাইশ আছে। উস্‌কো ডাণ্ডাবেরী লাগাও।' সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু'জনকে কামারশালায় নিয়ে ডাণ্ডাবেরী পরিয়ে দেওয়া হলো। দু'পায়ে দুটো লোহার বেরী; এবং বেরী থেকে কোমর পর্য্যন্ত লম্বা দুটো লোহার ডাণ্ডা, ওজন কমপক্ষে দু'সের। লোহার ঘষা লেগে পা কেটে বড় রক্ত বের হয়—তাই পায়ে বাঁধবার জন্য দু'টুকরো করে কম্বলের পটিও সেই সঙ্গে দিয়ে দিলো।

দু'জন যখন এই নূতন আভরণে সেজে গুজে অন্দর মহলে এলো, জেলের দু'হাজার বন্দীর মধ্যে ওরা যেন তখন অলিম্পিক বিজয়ী বীর।

এরপর থেকে আর যারা-ই অন্য জেল থেকে এখানে চালান হয়ে এলো, সকলের ভাগ্যেই এই গৌরবের বিজয়-তিলক। এ তিলক পরার দুঃখও আছে আনন্দও আছে। তবে আনন্দটা ওদের নিজস্ব—স্বতঃস্ফূর্ত্ত। আর দুঃখটা পুরোপুরি ওদের নয়। দুঃখের অনুভূতিটা ওদের, কিন্তু তার অভিব্যক্তি অন্যের। ওদের চোখে মুখে ভাবে ভাষায় কোথাও তার প্রকাশ নেই। ওরা চলে ফেরে মনের আনন্দে। গান গায়—"এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল…।"

সাতটার মধ্যেই বন্দীদের প্রাতঃকালীন জলযোগ পর্ব্ব শেষ হয়ে যায়। ঘাসের বীজ মেশানো দেড় ছটাক খুদের সাথে ডালের ছিটে ও হলুদের রং দিয়ে এক অপরূপ ও অভিনব খাদ্যবস্তু এই প্রাতর্ভোজনের উপকরণ। জেলের চলতি ভাষায় ওকে বলে "লাপসী"—বন্দীরা কেউ কেউ আদর করে ওর নামকরণ করেছে "লাপসী বেগম"।

লাপসী খাওয়া শেষ হতেই বন্দীরা ঘরে ফিরে এলো। সব ঘরে ঘরে আবার তালা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে, পথে, আনাচে-কানাচে পাহাড়াওয়ালা সিপাহীর সতর্ক খবরদারী আর ভেতরে বন্দীদের নিশ্চিন্ত অবসরে চিত্ত-বিনোদনের বিচিত্র অনুষ্ঠান।

ঘরে ঘরে কোথাও হয় ত বা শয়ন-বিলাসীর দল কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রাহীন চোখে ঘুমের কসরৎ করে চলেছে। ক্রীড়ামোদিগণ মাটি দিয়ে তৈরী করা দাবা পাশার ছক গুটি নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। একটু বৃয়স্ক অথবা আদি ও অকৃত্রিম খাদি-অনুরক্তেরা নিঃশব্দে তকলী কেটে চলেছে-এবং সশব্দে প্রাথমিকদের "পহলী কেতাব" পাঠ শেখাচ্ছে। মার্কসবাদী বিপ্লবী তরুণদল বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দ্বন্দ্বমূলক অধ্যায়ের বাস্তব মহড়া দিচ্ছে। ছোট ছেলেরা বড়দের কাছে রাজনৈতিক হাতেখড়ি দিচ্ছে। বড়রা ছোটদের নিয়ে পাঠশালা খুলে বসেছে। কোথাও হয়ত বা অপর কেউ কেউ-জেলের "খাটুনী" নিয়ম মাফিক নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে দড়ি পাকাবার চেষ্টা করছে। যাদের একটু আধটু ধূমপানের বদ নেশা আছে, তারা ঘরের এক কোণে বসে পথ থেকে কুড়িয়ে শালপাতা এবং পাহাড়াওয়ালা সিপাহীর কাছ থেকে খৈনী-তামাক-পাতা দিয়ে রীতিমত একটা বিড়ির কারখানা খুলে দিয়েছে।

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের এই কোলাহল ও ভীড়ের মধ্যে বিমান তার নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে একখানি নভেল পড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ধ্যান-নিমিলিত দৃষ্টি তার বই-এর পাতা ছাড়িয়ে জেলের বন্ধন ডিঙ্গিয়ে দূরে—বহু দূরে, মাঠ, ঘাট, সহর, গ্রাম পার হয়ে ফরিদপুরের কুমার নদীর তীরে ছোট্ট একটা গ্রাম গোবিন্দপুরের পথে পথে কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়।

বাবাকে তার মনে নেই, কিন্তু মায়ের অভাবের দুঃখটাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার সব কাজ—সব চিন্তা, জীবনের সমস্ত পাতায় পাতায় যে তার দুঃখিনী মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সারদা-সুন্দরীর স্নেহে ও যত্নে তার দাহ কমে গিয়েছে, কিন্তু দাগ মুছে যায়নি।

ছোট বোন লীলা ওর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, কিন্তু তবুও মায়ের স্নেহের সবটুকুতে যেন বিমানেরই ছিলো নিঃশেষ অধিকার। সেজন্য লীলার অভিমানের অন্ত ছিল না, অথচ দাদাকে ছাড়া তার একটা মুহূর্তও চলতো না। দাদাকে নিয়েই তার যতো আড়াআড়ি ভাগাভাগি, আবার দাদাই তার খেলার সাথী। কতোদিন কতো দুপুরে, সন্ধ্যায় ঠাকুরদের পড়ো-বাড়ীতে বাঁশ বনের পেছনে বসে কাঁচা আম মাখা, কুলমাখা আচার খাইয়েছে। কোনদিন আবার মায়ের রান্নাঘর থেকে চাল ডাল চুরি করে কুমার নদীর পারে শেওড়া গাছটার তলায় বসে চড়ুইভাতি করেছে। মায়ের কাছে ধরা পড়ে বিমান ছুটে পালিয়েছে, কিন্তু বেচারী লীলা কতো বকুনি খেয়েছে, কতো মার খেয়েছে, তবুও মুখ ফুটে দাদার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও কোনদিন করেনি। বরং মা চলে গেলেই চোখের জল মুছে হাসতে হাসতে এসে ডেকেছে—'দাদা, দাদা, আয় না। মা চলে গেছে। চল না দাদা দত্তবাড়ীর বাগান থেকে ক'টা পেয়ারা নিয়ে আসি।'

সেই পুরণো দিনের এমনি কতো পুরণো কথাই আজ বিমানের মনের তলা থেকে ওপরে উঠে আসে। সব কথা মনে পড়ে না, কিন্তু যেটুকু মনে পড়ে, মনের আঙিনার বাইরে আজ যে তার কোনও অস্তিত্ব নেই—কোন দাম নেই, এ কথা ভাবতেও বিমানের কষ্ট হয়।

গত মাসে মাধবীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছে—লিখেছে, লীলা অসুস্থ। কিন্তু তারপর থেকে আর কোন খোঁজ খবর নেই। আর থাকলেও সে খোঁজ-খবর পাবারও তো কোন উপায় নেই। কারণ জেলের নিয়ম অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা মাসে একখানার বেশী চিঠি পাবে না বা লিখতেও পারবে না। এক মাসের ভেতরে একখানার বেশী চিঠি এলেও সেগুলি জেল-গেটেই জমা হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক মাস অন্তে একখানা করে দেওয়া হবে—তা সে যতো জরুরী চিঠিই হোক না। বিমানের একমাস শেষ হয়ে গেছে, হয় ত আজকাল দু' একদিনের মধ্যেই চিঠি পাবে, কিন্তু তবুও ওর মনটা ভয়ানক খারাপ লাগছে। ওর কেবলি মনে হয়—যদি লীলার অসুখ বেশী হয়ে থাকে, যদি লীলা মরে যেয়ে থাকে—না, বিমান আর কিছু ভাবতে পারে না। ওর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে—বুকের ভেতর যেন একটা মোচড় খেয়ে ওঠে। কিন্তু—

আবার ভাবে—আমি বাইরে থেকেই বা কী করতে পারতেম। সেখানে তো নূতন-মা রয়েছে, মাধবী রয়েছে।

মাধবীর জন্ত ওর খুব দুঃখ হয়। ওর নিজের মনের কাছে সে-দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই। মাধবী তো আজ ওরই একান্ত আপনার জন হতে পারতো, কিন্তু বিমান নিজেই যে ওকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তবুও মাধবী একেবারে পর হয়ে যায়নি। একটা বছর যেতে না যেতেই সিঁথির সিন্দুর মুছে মাধবী আবার ফিরে এসেছে। মাধবী ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু বিমান আর ওকে ফিরে পায়নি। মাধবী এখন লীলার সহচরী—ওর কেউ নয়।

দূরে জেল গেটে দশটার ঘণ্টা হতেই সকাল বেলার অনুষ্ঠানের যবনিকা পড়ে গেল। ছোটো বড়ো সকলের ভেতর তাড়াহুড়া লেগে গেল স্নানের জন্ত। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী—ওদের অনাবশ্যক কাপড়-চোপড়ের আড়ম্বর নেই। সর্ব্বসমেত দু'খানা গামছা, দুটো হাফ প্যাণ্ট, দুটো কোর্ত্তা। সপ্তাহ অন্তে সাজিমাটীর জল দিয়ে ওগুলোকে ধোপদুরস্ত রাখতে হয়, কারো তেল মাথার বিলাসিতা নেই। কারণ রান্নাবান্না সর্ব্বসাকুল্যে ওদের প্রতি ১৬ জনে ৫ ছটাক তেল বরাদ্দ। তবুও তেলে-জলে বাঙ্গালীর ছেলে—তাই গায়ে মাথায় একটু তেল না মেখে কেউ পারে না। বিশেষ করে শীতের দিনে। কাজেই যে-করেই হোক ওর কেউ কেউ একটু আধটু তেল জোগাড় করে প্রয়োজনীয় পাত্রাভাবে ওষুধের ভাঙ্গা কাচের শিশি অথবা জলখাবারের এল্যুমিনিয়মের বাটীতে করেই লুকিয়ে রাখে এবং সকলের অজ্ঞাতে গায়ে মাথায় একটু আধটু মেখে নেবার চেষ্টা করে।

বিশুর একটা ভাঙ্গা বোতলে এমনি করে বেশ কিছুটা তেল জমে উঠেছে। কী করে জমলো কেউ জানে না। তবে বন্ধুবান্ধবেরা বলে যে, ওদের বাড়তি কম্বল অথবা কোর্ত্তা গামছা বদলী দিয়ে বিশু 'বাণিজ্য' করেছে। কিন্তু নিজে অবশ্য এ কথা স্বীকার করে না। ও বলে যে, রান্না ঘরের "মেট" অর্থাৎ সর্দ্দার কয়েদীটির সাথে ওর বেশ ভাব হয়েছে, এবং সে-ই ওকে মাঝে মাঝে তেলটুকু, পেয়াজটা লঙ্কাটা দিয়ে খাতির করে।

বিশু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের গায়ে মাথায় একটু তেল মেখে তেলো হাতখানা দিয়ে পায়ের লোহার "ডাণ্ডাবেরী"টা ঘষছিলো। রাখাল কোত্থেকে এসে একেবারে বিশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাতের বোতলটা নিয়ে রীতিমতো টানাটানি সুরু করে দিয়েছে। ওদের চেঁচামেচিতে বিনোদ দৌড়ে এসে ওদের মাঝখানে পড়ে বলে—'এ হতেই পারে না বিশু, এটা একেবারে তোমার বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি। এই শীতের দিনে আমরা কেউ গায়ে মাথায় মাখবার একটু তেল পাবো না, আর তুমি বসে বসে তোমার ডাণ্ডাবেরীতে তেল ঘষবে—এতটা সহ্য করা যায় না। আমরা সমানাধিকারে বিশ্বাসী, কাজেই সকলকে দিয়ে থুয়ে যদি বাড়তি থাকে, তবেই তোমার ডাণ্ডাবেরীতে ঘষতে দেওয়া হবে।'—ইতিমধ্যে আরো অনেকে এসে জুটেছে, মহিম, দুলাল, দেবনাথ। সকলেই বিশুর বিপক্ষে। রাখাল ভাঙ্গা বোতলটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিয়েছে। রাখালও ছাড়বে না, বিশুও তার অতিকষ্টে জমানো তেল কিছুতেই ওদের দেবে না। দু' দলের ভেতর একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। বোতলের ভাঙ্গা কাঁচ লেগে রাখালের হাত কেটে রক্ত পড়ছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। রবীন পেছন থেকে এসে বিশুকে জাপটে ধরেছে, বিশুও বেগতিক বুঝে ওর হাত কামড়ে দিয়েছে।

বিপিন ওদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। তাই বলে যোগ দেয় নি—তবে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, কিন্তু রক্তারক্তি দেখে তাড়াতাড়ি এসে ওদের মাঝখানে পড়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—'এই হতভাগারা, দোহাই তোদের মার্কস ভগবানের। তোরা এখন থাম তো একটু। দেশের জন্ত জীবন দিতে এসে তোরা কি এখন এক কৌটা তেলের জন্ত খুনোখুনী করবি না'কি? যা—ভাগ, সর।'

ঢং—ঢং—ঢং। খাওয়ার ঘরে ঘণ্টা পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বুর্জ্জোয়া প্রোলেটেরিয়েটের লড়াই থেমে গেল। তাড়াহুড়া করে স্নান সেড়ে আবার সব দল বেঁধে খাওয়ার ঘরের দিকে ছুটলো। ওদের পায়ের শিকল আর হাতের থালাবাটীগুলো ঝনঝনিয়ে উঠলো, যেন কোন চেঙ্গিস অথবা তৈমুর চলেছে লুটের মহলে।

অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের খাদ্যখানায় এমন কোন লোভনীয় বস্তুর ব্যবস্থা নেই যাতে ওদের এতটা উল্লাস হতে পারে। কিন্তু ওদের অভিযোগটা বস্তুর আকর্ষণে নয়—ভাবের উন্মাদনায়; খাওয়াটা ওদের কাছে গৌণ ব্যাপার—না খেলে নয়, তাই। পেটের ক্ষুধার আগুনকে ভাত ডাল তরকারীতে চাপা দেওয়া ছাড়া ওতে না আছে কোন স্বাদ, না আছে কোন গন্ধ—না আছে রূপ। কাঁকড় মেশানো ভাত ডাল ও একটা তরকারী। তরকারীকে তরকারী না বলে ব্রহ্মাণ্ড বললেই বোধ হয় ভাল। কারণ ওতে না থাকে এমন বস্তু নেই। প্রতি একদিন অন্তর প্রত্যেককে আধ ছটাক মাংস বা মাছ দেওয়ার নিয়ম আছে। তবে সেটা ধুমায়মান বহ্নিমানের মতো অনুমানে বুঝে নিতে হয়, চেহারা বা স্বাদে বোঝার উপায় নেই—ওটা কি বস্তু।

এই খাওয়া নিয়ে প্রতিদিনই জেল-কর্তৃপক্ষের সাথে কয়েদীদের একটা না একটা গণ্ডগোল লেগেই থাকে। হরেন সেদিন খেতে বসে চেঁচিয়ে উঠলো—'শালা জেলের চোর, চোর, একটা হারামী চোর। মাংসের ভেতর কাঠের কুচি মিশিয়েছে। এ ব্যাটাদের সাথে আর পারা যায় না।'

মহিম খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'আরে জানিস না বুঝি, জেল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কুকুরের লেজ। যতক্ষণ টেনে ধরে রাখো বেশ সিধে থাকবে—ছেড়ে দিয়েছো কি অমনি বাঁকা হয়ে বসে আছে।'

মহিমের কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। হরেনের কথায় কেউ কেউ থালা থেকে মাংসগুলো মাটীতে ফেলে দিলো। জ্যোতিষ কিন্তু নির্ব্বিকার পরমহংসের মতো যা পেয়েছে খেয়েই চলেছে। রাখাল ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে—'এই রাক্ষস, কেবল যে খেয়েই চলেছিস। কী খাচ্ছিস্ তা হুঁস আছে।' জ্যোতিষ কিন্তু কোন বাক্যব্যয় করে সময়ের অপচয় না করে শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করে, জবাব দেয়, 'পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী! জেল খাটতে এসেছো—অতো হিসেবের দরকার কী হে বাপু! তেল, নুন দিয়ে সেদ্ধ করে যা দিয়েছে খাও—যতক্ষণ পেটে থাকবে ততক্ষণই লাভ।'

জ্যোতিষের কথা শেষ না হতেই প্রাণতোষ বেশ গম্ভীর হয়ে বলে—'আরে বাবা, পেটে থাকলে তো কথাই ছিলো না। কিন্তু এগুলো যে কায়েম হয়ে থাকার বস্তু নয়। বরং ওর থাকায় অন্দর মহলের পুরানো সঞ্চয়টুকু সমেত বাজে খরচ হবার ভয় রয়েছে।'

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। সবাই আবার যে-যার ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ঘরে তালা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ হয়তবা কম্বলের সুকোমল শয্যা বিছিয়ে টানটান হয়ে পড়ে গেল—কেউবা পদ্মাসনে শিরদাঁড়া খাড়া করে খাঁটি ভারতীয় কায়দায় হজমশক্তি বাড়াবার যোগ সাধনায় লেগে গিয়েছে, কেউ খেলা-ধূলা, কেউ পড়াশুনা, কেউ গল্পগুজব—ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেল ৩টায় আবার ঘর থেকে বের হলো।

বিস্তীর্ণ এলাকা। ফাঁকে ফাঁকে বন্দীদের থাকার ঘর; ছোটোখাটো খেলার মাঠ এবং সাধারণ কয়েদীদের দ্বারা আবাদ করা বিরাট সব্জী ক্ষেত। এখানে সেখানে দল বেঁধে বেঁধে অথবা বেদলে, একাকী অথবা বন্ধুর সাথে প্রায় সকলেই সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়ে পড়েছে। ফাঁকা যায়গাটুকুর মধ্যে কেউ কেউ আবার হা-ডু-ডু, কাপাটী খেলা সুরু করে দিয়েছে। অনিল আর বসন্ত ওরা দু'জন ওদের ঘরের পূবদিকে একটু নিরিবিলি যায়গায় বসে পুটুর পুটুর করে চলেছে। রোজ বিকেলবেলায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ওই একটা যায়গায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা কাটিয়ে দেয়। দু'জনে কী যে এতো কথা বলে কেউ জানে না, তাই অনুকূল ঠাট্টা করে বলে—'ওরা দু'জনে যেন স্বামী-স্ত্রী, ওদের কথা আর ফুরোয় না।'

উত্তরদিকে সব্জী বাগানের একপাশে খোলা নির্জ্জন যায়গাটীতে বিমান একাকী বসে আছে। সামনে তার-কাঁটার বেড়ার ওপারে মস্ত বড়ো খোলা সবুজ মাঠ। মাঠের উত্তর পূবদিক দিয়ে "বনরাজিনীলা" খড়্গপুর সহর। শ্যামল বনানীর ফাঁকে ফাঁকে সহরের রং বেরংয়ের পাকা বাড়ীগুলো অস্তগামী রোদের আলোতে মুখ বাড়িয়ে যেন আপন কৃত্রিম রূপসজ্জা-বিলাসের ঠমক দেখিয়ে অন্ধকারে অভিসারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের এপার দিয়ে প্রায় জেলখানাটার পাশ দিয়ে খড়্গপুর

থেকে পুরীগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। উৎসুক যাত্রীরা মুখ বাড়িয়ে বন্দীশিবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দূর থেকে দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না।

বিমান গাড়ীর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে। ওর মনটা খুব খারাপ লাগছে। আজই বিকেলে বাড়ীর চিঠি পেয়েছে—লীলা নেই—সত্য সত্যই নেই। আর কোনদিনই বিমান লীলাকে দেখতে পাবে না। ওর বড়ো আদরের—বড়ো স্নেহের লীলা আজ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওকে আর দাদা বলে কোন দিন ডাকবে না। একথা বিমান কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা শূন্য উদাস দৃষ্টিতে বিমান বসে আছে। বসে বসে কত কী ভাবছে। চলন্ত গাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে ওর কেবলই মনে হয় যেন রঙীন শাড়ী পড়া লীলার মতো একটী মেয়ে বেণী দুলিয়ে খোলা জানালার ধারে বসে আছে। বিমানের ইচ্ছে হয় গলা ছেড়ে ওকে ডাকে—'লীলা—লীলা, কোথায় যাস? এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে। ফিরে আয়—ফিরে আয় লীলা।'

কিন্তু ওর অন্তরের এই আর্তনাদ কেউ শোনে না—কেউ ফিরে তাকায় না। গাড়ী চলে যায়, দূরে শাল-বনের ওপার থেকে তার শব্দ কানে ভেসে আসে। বিমানের মনে হয়, বুঝিবা কোন অভিমানিনী বালিকা বনান্তরাল থেকে কান্নার আবেগে ফুঁপিয়ে উঠছে। বিমানের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে। দু'হাতে চোখ মুছে সে উঠে পড়ে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। পশ্চিম আকাশের ফাঁকা জায়গাটা জুড়ে একটা রক্তিম আভা—গাছ পালা শুদ্ধ রাঙিয়ে তুলেছে। বিচ্ছিন্ন মেঘের প্রান্তে প্রান্তে সোনালী রোদের ক্ষীণ রেখাগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাটের লোকজন বাড়ী ফিরে চলেছে। ওদের কেনা বেচার সওদা নিয়ে গরু মহিষের গাড়ী গুলো ক্যাঁকড় ক্যাঁকড় শব্দে সন্ধ্যার অন্ধকারের বুকে দাগ কেটে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর বন্দীরা দলবেঁধে কলরব করে খেতে চলেছে।

এ বেলার খাওয়ার ভেতর বিশেষত্ব কিছু নেই—কোন পরিবর্তনও নেই। সেই ভাত ডাল তরকারী এবং একদিন অন্তর একদিন আধ ছটাক মাংস বা মাছ। তবে কেউ কেউ ভাতের পরিবর্তে রুটী খায়।

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ওদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল। ফেরার পথে থালা বাটী ও শিকলবেড়ীর ঐক্যতানে মনে হয় যেন বিজয়ী সৈন্যদল যুদ্ধ জয়ের পর ঘরে ফিরে চলেছে। আনন্দের আতিশয্যে কেউ হয়ত গান ধরে দিয়েছে—'ফিরে চলো, ফিরে চলো আপন ঘরে।'

ঘরে ফিরে এসেছে সবাই। কিন্তু তবুও জেলের নিয়ম—একবার গুনতি দিয়ে দেখতে হবে সবাই ঠিক ঠিক ঘরে আছে কিনা। জেল-সিপাহী তাদের জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হেঁটে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে ঘরে ঘরে তালা বন্ধ করে চলে গেল।

প্রত্যেক ঘরে একটী বা দু'টি করে লণ্ঠন আছে। কিন্তু সেটা নীচে রাখার নিয়ম নেই। কারণ লণ্ঠনের আগুনে যদি কেউ পুড়ে মরে! তাই সরকারী হুকুমে বাতিঘরের লোক এসে বাতিগুলো নিরাপদ স্থানে টাঙিয়ে দিয়ে যায়। অবশ্য ওরা টাঙিয়ে দিয়ে গেলেও বাতিগুলো যে সারা রাত্রি ওখানেই টাঙানো থাকবে, এমন কথা বলা যায় না।

কারণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন মতো ওটা ওঠানামা করে।

সন্ধ্যার পর গল্পের আসর, কোথাওবা গানের বৈঠক জমে উঠেছে। তবে গানের বৈঠকটাকে মাঝে মাঝে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ছাড়া বৈঠক না বলে আখড়া বললেই বোধ হয় ভাল হয়। কারণ গান যা হয়, তাতে তালমানের চেয়ে শারীরিক ডনকুস্তিই বেশী হয়। ওদের সুরের মূর্চ্ছনায় হয়ত বা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর দেবী পথে-ঘাটে হাত পা ভেঙ্গে পড়ে যায়।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। এতক্ষণ গানের মল্লযুদ্ধ ক'রে রণক্লান্ত সৈনিকরা সব ঘুমে অচেতন। সমস্ত জেল-খানাটা যেন একটা নিঝুম স্বপ্নপুরীর মতো অন্ধকার আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আছে—শব্দ নেই—কোলাহল

নেই। যেন কোন বিরহিণী প্রিয়া দূর প্রবাসের প্রিয় বিরহে ধ্যানমগ্ন, স্তব্ধ মৌনতায় শূন্য প্রেক্ষণে তাকিয়ে আছে। শুধু জেগে আছে গোটা কয়েক প্রহরী। তারা মাঝে মাঝে থেকে থেকে হাঁকডাক দিচ্ছে—'এই ত্রিশ নম্বর কত রে?'

প্রত্যেক ঘরে ঘরে জন কয়েক করে সাধারণ কয়েদী থাকে। তারা এই সব সিপাহীবাবুর প্রশ্নের জবাব দেয়—'এক দুই তিন চার···পঁচিশ···ঠিক আছে ৩০ নং।' অর্থাৎ কোন্ নম্বর ঘরে কতোজন স্বদেশী বাবু আছে ওরা গুণতি করে সেটাই জানিয়ে দেয়। দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পর পর সিপাহী বদল হলেই এমনি হাঁকডাকে মোট কয়েদীসংখ্যার একটা গুনতি হয়।

সবাই ঘুমিয়েছে, কিন্তু বিমানের চোখে তন্দ্রা থেকেও আজ আর ঘুম নেই। লীলার মৃত্যুসংবাদ একটা ঝড়ের মতো ওর মন মেজাজ দুটোকেই ভেঙে চুরে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। ঘুমে চোখ ভেঙে আসে, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। সুপ্তিমগ্ন রাত্রির নির্জ্জনতায় বিমান তাই তার মনের এই ভাঙ্গাচুরা টুকরোগুলিকে জোড়াতালি লাগিয়ে চলেছে।

মাধবীর চিঠিখানা তখনও তার হাতের মুঠোতেই রয়েছে, কিন্তু মন ওর গোবিন্দপুরের আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথে হেঁটে চলেছে। কুমার নদীর পারে বৈচী বনের আড়াল থেকে লীলা ওকে একবার উঁকি মেরে দেখা দিয়ে দৌড়ে চলে যায়, বিমান গলা ছেড়ে ডাকে—'লীলা, লীলা, শোন, শোন লীলা।'

কিন্তু লীলা আজ আর কিছুতেই ওর কথা শোনে না। মাথার চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে লীলা হাসতে হাসতে দৌড়ে চলেছে—একেবারে কুমার নদীর পার ঘেঁষে। ভয়ে বিমানের বুকটা দুর-দুর করে ওঠে। আবার ডাকে—'এই পাজি মেয়ে, নদীর অতো পার ঘেঁষে চলেছিস্! পড়ে যাবি—পড়ে যাবি, ফিরে আয়, ফিরে আয় বলছি।'

কিন্তু লীলা কিছুতেই ফেরে না। বিমান যতো তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে যায়, লীলা ততোই যেন দূরে সড়ে যায়। বিমান প্রাণপণ ছুটে চলে ওকে ধরতে, কিন্তু ওকে ধরতে পারে না। বিমানের গলা শুকিয়ে আসে—আর ডাকতে পারে না। হাত পাগুলো যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। তবুও বিমান ক্লান্ত হয় না, প্রাণপণে আবার ডাকে—'লীলা, লীলা, থাম লীলা। আর যাসনে—পড়ে যাবি, শোন, শোন লীলা।'

ঝুপ করে একটা শব্দ হলো, আর সত্যসত্যই কুমারের পার ভেঙে পড়ে লীলা কোথায় হারিয়ে গেল। বিমান খোঁজ পায় না—। আবেগ ও উত্তেজনায় বিমানও নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবে, কিন্তু পেছন থেকে মাধবী ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে—'ছি, বিমান দা, কোথায় চলেছ তুমি? লীলা আর নেই।'

বিমান পেছন ফিরে একবার মাধবীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে। তারপর মাধবীর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'কে? মাধবী? তুমি! লীলা কোথায়?'

মাধবী কথা বলে না, শুধু ওপর দিকে হাত দেখিয়ে জানায়—'লীলা চলে গেছে।'

বিমান আবার জিজ্ঞেস করে—'কিন্তু তুমি! এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

মাধবী একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে—'আমি? আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য। লীলা নেই—মা নেই—আমার যে আর কেউ নেই বিমান দা। আমার বড্ডো ভয় করে যে। তুমি—তোমাকে ছেড়ে আমি একা থাকতে পারবো না।'

বলতে বলতে মাধবী ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে আবার বলে—'চলো, বিমান দা, আমরা এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। নূতন করে ঘর বাঁধি।'

বিমান আস্তে আস্তে মাধবীর মাথায় আদরে স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভিজে গলায় বলে—'তা আর হয় না মাধবী। ভাঙনের তীরে দাঁড়িয়ে প্রেমের বাসর সাজানো যায় না।'

হঠাৎ বিমানের তন্দ্রা ভেঙে যায়। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে ভোরের আকাশের এক ফালি চাঁদের আলো ওর গায়ে মাথায়—সাড়া ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দূরে—অন্য কোন ঘরে কে যেন তখন গেয়ে চলেছে—

আজি রক্ত নিশি ভোরে
একি শুনি—ওরে,
মুক্তি কোলাহল বাজে বন্দী-শৃঙ্খলে।···

'পথের পাঁচালী'র দুর্গা

শ্রীনমিতা গুহ

'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশু চরিত্রগুলি এত সুন্দরভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক অপু ও অপুর বোন দুর্গা বিভূতি বাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অপুর মত কৌতূহলী, বুদ্ধিমান, শান্ত, পড়াশুনায় আগ্রহশীল; সরল ছেলের সংখ্যা আমাদের দেশে কম, কিন্তু দুর্গার মত অসংখ্য মেয়ে ঘরে ঘরে দেখা যায়। গ্রাম্য মেয়ের একটী নিখুঁত ছবি বিভূতি বাবু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দুর্গার চরিত্র দোষে গুণে অতুলনীয় হইয়াছে। মানুষ দেবতা নয়, তাহাই আমরা দুর্গা চরিত্রে দেখিতে পাই। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথকে ঠিক ধরাধামের মানুষ বলিয়া মনে হয় ন, ইন্দ্রনাথের উদারতা, সাহসিকতা সমস্তই যেন সুদূরলোকের মনে হয়, কিন্তু দুর্গা এই ধরার মেয়ে। দুর্গা চুরি করিয়া এটা ওটা আনিয়া মাকে দেয়, ইন্দ্রনাথের মত সে পরের জন্ত চুরি করে না। দুর্গা লোভী কিন্তু এই দুর্গাই আবার একটী নির্য্যাতিতা বধূর দুঃখে দুঃখিতা, স্নেহের ভাইটীকে ভালমন্দ খাওয়াইতে পারে না বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িতা। দুর্গার স্বভাবে যে দোষক্রটী দেখা যায়, তাহার জন্ত দায়ী তাহাদের সংসারের অভাব অনটন। দরিদ্রের সংসারে দুর্গা যখন কোন খাত দ্রব্য কাহারও বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তখন তাহার মাতা সর্ব্বজয়ারও মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সময় সময় প্রতিবেশিনীদের নালিশের জ্বালায় দুর্গাকে মার-ধোর করিয়াছেন, কিন্তু এটা হইয়াছে মাসীর কান কাটার গল্পটীর মত। একবার প্রশ্রয় দিয়া পরে শাসন করিলে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

আমরা দুর্গার প্রথম দেখা পাই তাহার দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দির ঠাকুরুণের সঙ্গে। দুর্গার দরদী মনটী আমাদের মুগ্ধ করে। ইন্দির ঠাকুরুণকে তাহার মা বাবা কেউ ভালবাসে না। কিন্তু দুর্গার ছোট্ট হৃদয়টী দুঃখিনী পিসির জন্ম মমতায় ভরপূর। ইন্দির ঠাকুরুণের জীবিত-কাল পর্য্যন্ত দুর্গার যে চরিত্র আমরা দেখি তাহা অতি সুন্দর···একটুখানি দোষের ছিটে ফোঁটা দেখি—সে লোভী। নিঃসঙ্গ পিসিমার জন্ত দুর্গার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। মা ইন্দির ঠাকুরুণকে তাড়াইয়া দিয়াছে, দুর্গা গিয়া হাত ধরিয়া সেই বুড়ী পিসিমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। দাসী ঠাকুরুণের নিকট হইতে নোনা খাইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বজয়া ইন্দির ঠাকুরুণকে যা'তা বলিয়া গালাগাল দিয়াছিলেন, কিন্তু পিসিমার জন্ত দুর্গার ছোট্ট হৃদয়খানি কাঁদিয়া উঠিল, দাসী ঠাকুরুণের কাছে গিয়া বলিল—"পিসিমা বুড়ো মানুষ একটা নোনা কিনে এনেচে, তা বুঝি বকে?" মায়ের উপর তার এই অনুযোগ অপূর্ব্ব। আরও সুন্দর··· দুর্গা বলিল, "আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে···মাকে বলো না যেন পিসি।" মায়ের নিষ্ঠুরতা তাহাকে বেদনা দিয়াছে। দুর্গাকে সর্ব্বজয়ার সংসারে অনেকটা আগাছার মত মনে হয়, মা বাবা দুই-জনের স্নেহই মেয়েটীকে কোনসময় ভালবাসিয়া কাছে টানিয়া লয় নাই, একমাত্র ইন্দির ঠাকুরুণ দুর্গার মধ্যে নিজের মৃত মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর সমস্ত মমতাটুকু ঢালিয়া দিয়াছিল; তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারিত না।' স্নেহের কাঙ্গাল দুর্গাও তাহার প্রতিদান দিয়াছিল চড়কের মেলার পর চুপি চুপি দুঃখিনী পিসিমাকে দেখিতে গিয়াছিল, শুধু তাই নয়, নিজে খেলনা না কিনিয়া পিসির জন্ত আনিয়াছিল মুড়কি ও বদমা। দুর্গা মাকে লুকাইয়া ইন্দির ঠাকুরুণকে বাড়ী লইয়া যাই-বার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছে। ছেলে মানুষ হইলেও দুর্গা বুঝিয়াছে তাহাদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার পর পিসির দুঃখে ও অনাহারে দিন কাটিতেছে। কিন্তু সর্ব্বজয়া যখন আশ্রয় দিল না তখন ইন্দির ঠাকুরুণ দুর্গার প্রত্যাশায়

এদিক ওদিক চাহিল। দুর্গা বাড়ী থাকিলে কিছুতেই দুঃখিনী পিসিকে খাইতে দিত না। সর্ব্বজয়ার নির্দয়তা আমাদের আঘাত করে, অপরদিকে তাহারই মেয়ে দুর্গার সমবেদনাশীল মনটী আমাদের মুগ্ধ করে। দুর্গার স্মরণ-শক্তিও কম ছিল না, ইন্দির ঠাকরুণ দুর্গাকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করিত ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দিত, যাহা হয়তো দশ পনেরোদিন বলা হয় নাই, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি ঠিক মনে রাখিত তাহাকে ঠকানো কঠিন।

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর চার-পাঁচ বৎসর পর আমরা আবার দুর্গার দেখা পাই। দুর্গার চেহারা সুন্দর হইয়াছে, লেখক বর্ণনা দিয়াছেন—"গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো এতটা ফরশা নয়, একটু চাপা।...মুখের গড়ন মন্দ নয়...চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।" কিন্তু হায়, সুন্দরী মেয়েটীর পরনে ময়লা কাপড়, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথার চুল রুক্ষ। নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে। মাকে ফাঁকি দিয়া মায়ের নিষিদ্ধ কাজ করিতে নিজে তো ওস্তাদই ছিল, তাহার উপর সরল ভাইটিকেও সাকরেদ করিয়া লইয়াছিল। দুর্গা কি ভাবে দিন কাটায় তাহার সুন্দর ছবি বিভূতিবাবু দিয়াছেন—সর্ব্বজয়া বলিতেছেন, "সে (দুর্গা) সেই খেয়ে বেড়িয়েছে—সে বাড়ী থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক। আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে। কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরচে। অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে না কানে নেয়?" দুরন্ত ছেলে এমন গ্রামে অনেক দেখা যায়, যারা পাঠশালা পলাইয়া লোকের বাগানের গাছের ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দুর্গা একা, বড়জোর মাঝে মাঝে ভাইটিকে সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে দুর্গার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, বনে বনে থাকিতেই সে ভালবাসিত। বাড়ীতে তাহার মন টিকিত না, কোথায় কার বাগানে, কোন জঙ্গলে আম জাম নোনাফল আছে তাহা তাহার নখদর্পনে। অন্য মেয়েদের মত গৃহ-কোণে বসিয়া গৃহকাজ কি শিব পূজায় তাহার মন ছিল না। কিন্তু এই বন্যপ্রকৃতির দুর্গাও বিবাহের স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

চুরি করা তাহার একটা স্বভাব ছিল। "টুনুর পুতুলের বাক্স হইতে পুঁতির মালা চুরি করিয়াছিল। সে জন্য তাহার মা তাহাকে বেদম প্রহার করিয়াছিল, কিন্তু একটা কথা আছে না—"স্বভাব যায় না মলে" দুর্গার চরিত্রে এই প্রবাদ বাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হইয়াছিল। যেদিন মার নিকট হইতে ভীষণ প্রহার লাভ করিয়াছিল, সেই দিনই আবার সে পালিতদের বাগান হইতে কামরাঙা চুরি করিবার মতলব করিয়াছে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে সেজ ঠাকরুণ যে অত লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতেন, তবুও সে পুনঃ পুনঃ তাহাদের বাড়ী হইতে এটা ওটা চুরি করিয়া আনিত, এমন কি ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়াও সে সোনার সিঁদুরের কৌঠা পর্য্যন্ত চুরি করিয়া বাড়ীতে লুকাইয়াছিল। অপু ও দুর্গা দুইজনেই অতিকষ্টে মায়ের দেওয়া সামান্য খাদ্য খায় এবং অপু দুর্গা হইতে বয়সে ছোট কিন্তু তবুও খাবারের প্রতি হ্যাংলাপনা নাই, কিন্তু দুর্গা ফিরিওয়ালা চিনিবাসের খাবারের সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে লাগিল। সেজ বৌর উক্তি আমরা সমর্থন করি। "এতবড় মেয়ের এই হ্যাংলাপনা আমাদের বিসদৃশ লাগে।

দুর্গার চড়ুইভাতির উৎসব আমাদের মুগ্ধ করে... কিন্তু সেখানেও সে অপুকেই সঙ্গী করিয়াছিল, অন্য কোন সমবয়সী মেয়েকে ডাকে নাই। কিন্তু বিনি যখন প্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছে। যাত্রা দলের ছেলে অজয়কে আপন ভাইয়ের মত দেখিয়াছে। কিন্তু গায়ে পড়া ভাবে সে কাহারও ভালবাসা যাজ্ঞা করে নাই। এর পরই দুষ্টু মেয়েটীর দুষ্টামির পর্ব্ব সাঙ্গ হইল, আরম্ভ হইল অতি করুণ অধ্যায়।

দুর্গা অসুখে ভোগে, লোভী মেয়েটী খাবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু সর্ব্বজয়ার মেয়েটী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখিতে পাই না। মা বাবা দুইজনেই ছেলেটীর জন্য ব্যস্ত। তাহাকে ভাল খাইতে দিতে পারেন না বলিয়া ব্যথিত। দুর্গা বেচারীর অসুখে ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। দুর্গা আবদার

করে,—"এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নিমকি নোনতা মুখে বেশ লাগে।" সাবু তাই মোটে জোটে না, তার বিস্কুট। ফুটাঘরে রুগ্না অসুস্থা মেয়েটি জলে ভিজিয়া স্যাঁতা হইয়া যায়। তার বাবারও কোন খোঁজ খবর নাই। বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে দুর্গা ক্রমশঃ মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। রুগ্না মেয়েটির বহুদিনের সাধ আজ বিদায়ক্ষণে মনে জাগে, ছোট ভাইটির কাছে আবদার করে,—"আমায় একদিন রেল-গাড়ী দেখাবি।" হায়! দরিদ্র ঘরের মেয়েটির কি সামান্যই সখ। কিন্তু তাহাও পুরিল না, অকালে মুকুল ঝরিয়া পড়িল। এমনি করিয়া কত ফুল না ফুটিয়া অযত্নে অবহেলায় ঝরিয়া পড়ে, কেবা তাহার খোঁজ রাখে। দুর্গার উঁচু নজর ছিল না, সামান্য জিনিষ পাইলেই সে সুখী হইত। শিশু চরিত্র গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অভি-ভাবকদের উপর।

দুর্গার চরিত্র সমালোচনা করিলে মনে হয়, দুর্গা যদি মা বাবা, পাড়া প্রতিবেশিনীদের নিকট হইতে ভালবাসা লাভ করিত তাহা হইলেই একটি ভাল মেয়ে হইতে পারিত। ভালবাসার অভাবেই তাহার জীবন মরুময় হইয়াছিল। সংসারে তাহাকে দুজনে ভালবাসিয়া ছিল, একজন হইতেছে তাহার পিসি ইন্দির ঠাকরুণ, আর এক-জন তাহার ছোট ভাই অপু। ইন্দির ঠাকরুণকে সে যথেষ্ট ভাল বাসিয়াছে এবং তাহারই চেষ্টায় ইন্দির ঠাকরুণ সর্ব্বজয়া কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াও তাহাদের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের পয়সা হইতে পিসিকে কয়া, মুড়কি কিনিয়া দিয়াছে। মাকে লুকাইয়া পিসিকে দেখিতে গিয়াছে। তাহার স্নেহপ্রবণ মনটি আমাদের মুগ্ধ করে। অপুকে সুখী করিবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, বাবার কাছ হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া ভাইকে দিয়াছে। ভাইয়ের মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে। দিদির উপর অপুরও অপরিসীম মায়া ছিল। সমস্ত বইটাতে অপুর মতই আমাদের মনে হয় দুর্গার যেন কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে, উহার সাথী এখানে কেহ নাই। অপুকে যেমন সকলে ভালবাসিয়া কাছে টানিয়া লইয়াছে, সঙ্গী সাথীরা তাহার সঙ্গে খেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু দুর্গা বেচারীর কেহ ছিল না। সেজন্য মনে হয় অভিমানে দুর্গা অতি অকালেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

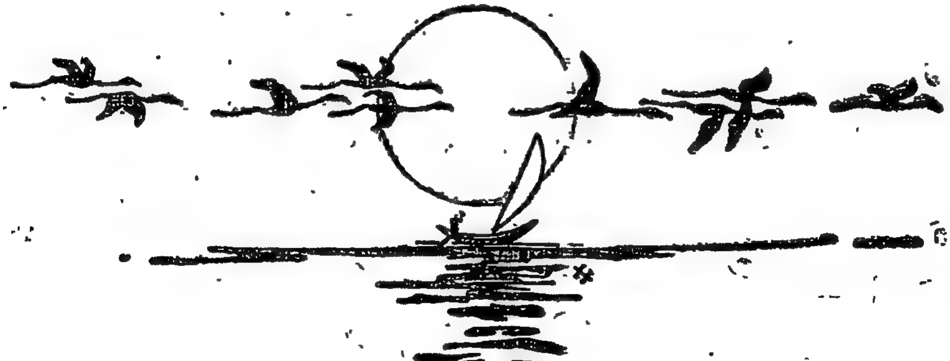

সাহিত্যরথী আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেবেন্দ্রনাথের সহিত আমার পরিচয় হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। ইনি তখন শ্যামবাজার ৭নং চৌধুরী লেনে বাস করিতেন। ইঁহার পরে তাঁহার অন্তিম দিন পর্য্যন্ত আমি বরাবর তাঁহার কাছে যাইতাম। পঁচিশ বৎসরের দীর্ঘ পরিচয়ে এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে তিনি আমাকে খুব আত্মীয় জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। সেরূপ স্নেহ সাধারণতঃ লোকে জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকটই পাইয়া থাকে। সাহিত্যিক হিসাবেও এমন নীরব সাধক কদাচ দৃষ্ট হয়, এখনতো হয়ই না, তখনও হইত কিনা শুনি নাই। তিনি অনেক রচনাই রাখিয়া গিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত বিনা আপত্তিতে হৃষ্টচিত্তে সকলকে সহায়তা করিতেন—লিখিয়া দিতেন। কত যে তাহা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার গদ্যরচনার প্রশংসা করিয়া স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয় প্রায়ই বলিতেন :

"দাদা আমি যে সব সাহিত্যিকদের প্রশংসা করি, বিশেষ বিশেষ গুণের জন্ত, কিন্তু আপনাকে করি আপনার অপূর্ব্ব রচনার জন্ত। এমন গদ্য রচনা এখন কাহারও কলমে বড আসে না।" যাহার যেরূপ অধিকার, তিনি সেই হিসাবে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বলি সাহিত্যিক অপেক্ষাও মানুষটি ছিলেন আরও চমৎকার, এমন অমায়িক, উদার, ধর্ম্মপ্রাণ, পরোপকারী সাচ্চা লোক আমি ক্বচিৎ দেখিয়াছি। কখনও একটা অসত্য কথা ভুলেও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না, ক্ষুদ্রতা তাঁহার মধ্যে কখনও দেখি নাই, অহঙ্কার বা দম্ভ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রকে ক্ষণিকের তরেও মলিন করে নাই। অথচ তিনি ছিলেন কলিকাতার এক অভিজাত বংশের সন্তান।

দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকমাসের মধ্যে টাউনহলে যখন বিরাট সভা হয়, তখন প্রথমে দেবেন্দ্র বাবুর নাম শুনিতে পাই। সভায় গিরিশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী' নাটক মিনার্ভায় শীঘ্রই অভিনীত হইবে, সাহিত্যরথী সুরেশ সমাজপতি মহাশয় ঘোষণা করেন। পরিচয় দিয়া সমাজপতি মহাশয় বলেন—

"নাটকখানির চারি অঙ্ক পর্য্যন্তই গিরিশচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চম অঙ্কে শেষ করিতে পারেন নাই, পরে তাঁহার পিতৃস্বসাপুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু শেষ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু গিরিশচন্দ্রের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাই সমাপ্তিও খুব উত্তম হইয়াছে।"

প্রথম দেবেন্দ্র বাবুর নাম শোনা মাত্রই শ্রদ্ধা জন্মিল, কিন্তু লোকটিকে সভায় লক্ষ্য করি নাই।

দশ-পোনের দিন পরেই মিনার্ভায় "গৃহলক্ষ্মী" দেখিতে উদ্বোধন রাত্রিতেই উপস্থিত হইলাম। সেদিন গিরিশচন্দ্রের প্রতিকৃতির সম্মুখে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই উপস্থিত হইয়া "বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপিয়র" গাহিয়াছিলেন। পরে অভিনয় আরম্ভ হইল,—এত ভাল লাগিল যে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পঞ্চম অঙ্কের প্রতি দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু দেখিলাম কোথাও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই, মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যাবলী ঠিক তালে তাল রাখিয়া নাটকীয় ঘটনার অবসান করিয়াছে। নাট্যকার হিসাবেও দেবেন্দ্র বাবুর উপর শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

পরে জানিয়াছিলাম, তিনি নাটক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রও 'ব্যাপসা কি ত্যাপসা' প্রভৃতি নাটকে তাঁহার সহায়তা লইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। তবে সে রাত্রিতে গৃহলক্ষ্মীর অভিনব দেখিয়া মনে হইল না যে পঞ্চম অঙ্ক গিরিশচন্দ্রের রচনা নয়; ভিন্ন লোকের লেখনী-সমুদ্ভূত বলিয়া মোটেই মনে হইল না,—এতই সামঞ্জস্য ছিল পূর্ব্ব কয়টি অঙ্কের সঙ্গে।

P30240

দেবেন্দ্রনাথের উপরে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

ইহার পাঁচ বৎসর পরের কথা। ইতিপূর্ব্বে আমি কচিৎ বাঙ্গলা লিখিতাম। যাহা লিখিতাম সুধী সমাজে বাহির করা যাইত না। কিন্তু কেন যে গিরিশচন্দ্রের জীবনী লিখিব—এরূপ দুঃসাহস আমার জন্মিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ তখন আমার পক্ষে এতবড় বিরাট পুরুষ, পরম ভক্তবীর, মহানাট্যকার গিরিশচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনার প্রচেষ্টা বামনের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহার কাজ তিনি করান। মানুষতো নিমিত্ত মাত্র! তবে কাজ হইয়া গেলেই অহঙ্কার আসে, তাঁহার কৃপার কথা ভুলিয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ বসু

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি, সময়টা আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, ১৩২৪। এই সময় আমার এক বন্ধুর সহিত কুড়ি বৎসর পরে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। তাহার নাম শোকহরণ দাশগুপ্ত (মজুমদার), পাটনায় একসঙ্গে পড়িতাম ও একসঙ্গে বেড়াইতাম। এরূপ উদার ও ধর্ম্মপ্রাণ লোককে বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের কথা—আমার সে সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি আমার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। সেদিনই আমাকে গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ দানিববাবুর কাছে গিরিশবাবুর বাড়ীতে (১৩ নম্বর বোস পাড়া লেনে) নিয়া যান। দানিবাবু ও অবিনাশবাবু গিরিশবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

পরদিন শোকহরণবাবু আমাকে বাগবাজারে 'উদ্বোধন' আফিসে লইয়া গেলেন। সেখানে স্বামী সারদানন্দকে (শরৎ মহারাজকে) প্রণাম করি। মহারাজ আমাকে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" লইয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তাহাতে গিরিশ বাবুর অনেক কথা আছে—বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার বকলমা প্রদান সম্বন্ধে। মহারাজ এই প্রসঙ্গে উদ্বোধনে যে 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' বাহির হইয়াছিল, তাহাও লইতে বলেন। উদ্বোধনে চারিটি প্রবন্ধ বাহির হয় শ্রীশচন্দ্র মতিলাল নামে, কিন্তু এইগুলি এমন ভাবে স্বামী সারদানন্দ 'পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন' করিয়া দেন যে, খোল ও নলচে সম্পূর্ণই বদ্‌লাইয়া যায়।

অতঃপরে স্বামী সারদানন্দ আমাকে বলেন, "গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একমাত্র 'অথরিটি' ব্যাঙ বাবু। তিনি আপনাকে সাহায্য করিবেন, আমি তাঁহার কাছে আপনাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" ব্যাঙ বাবু দেবেন্দ্রনাথের ডাক্ নাম।

এই বলিয়া উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একটী ভদ্রলোককে দিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। উপেনবাবু বোধ হয় উদ্বোধনের সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। দত্ত মহাশয়কে বলিয়া দিলেন, "উপেন, ব্যাঙ বাবুর কাছে এঁকে নিয়ে গিয়ে আমার কথা ব'লবে।"

প্রায় চারটার সময় আমরা দেবেন্দ্র বাবুর কাছে উপস্থিত হইলাম। তিনি দোতলায় থাকিতেন, একতলায় বসিতেন তাঁহার একমাত্র পুত্র পার্ব্বতীনাথ বসু। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তিনি তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। চেহারা গৌরবর্ণ, ঈষৎ স্থূলকায়, শ্বেত শ্মশ্রু শোভিত, মুখ চোখের দৃষ্টি স্থির, সে দৃষ্টিতে বিষাদ ও ভক্তির ভাব উভয়ই প্রতিভাত ছিল। বয়স সবে ৫৭ বৎসর মাত্র, কিন্তু দেহ, কেশ, শ্মশ্রু বার্দ্ধক্যের পরিচয় করাইয়া দিল।

পরিচয় হইতেই তিনি বলিলেন, "গিরিশ বাবুর জীবন

চরিত! স্বামী সারদানন্দ পাঠিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই সাধ্যানুসারে চেষ্টা ক'রব"—

আমি বলিলাম—আমিতো কিছুই জানি না, তবু দুঃসাহস হইয়াছে।

তিনি—আপনি পূর্ব্বে কিছু লিখেছেন?

আমি—লিখেছি কিছু, তবে আজ হ'তেই আবার নূতন ক'রে আরম্ভ ক'রব।

তিনি হাসিলেন।

বলিলাম—আমি নূতন লোক—

তিনি—তাতে কিছু হয় না, তবে অনুরাগ থাকা চাই।

এই 'অনুরাগ' কথাটি গিরিশচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিতে আমি কখনও বিস্মৃত হই নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি গিরিশবাবুকে কখনও দেখেছেন?"

আমি বলিলাম, "না"।

কথায় কথায় তিনি বলেন—"গিরিশচন্দ্রকে আপনি পাবেন তাঁর রচনার ভেতরেই। দুই একটা গল্প দিলেই তো এসব মহাপুরুষদের জীবন চরিত হয় না। এঁদের রচনা খুব ভাল ক'রে পড়্‌তে ও বুঝতে হয়।"

এই বলিয়া তিনি এমার্সনের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলেন:

"Great geniuses have the shortest biographies, their Cousins can tell you nothing about them. They live in their writings."

এইরূপ অনেক আলোচনা হইল। দেবেন্দ্র বাবুর তখন যে চেহারা দেখিয়াছিলাম, ইঁহার ফটো ইতিপূর্ব্বে একখানি বহিতে চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাতে নামের পাশে ছিল দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। আমার বিস্ময়ের কথা আমি জানাইলে তিনি বলেন, "সে ছবি আমিও দেখেছি, ওটা ছাপাখানার ভুলে হয়েছিল। দেবেন্দ্র মজুমদার মহাশয় গিরিশবাবুর গুরুভাই—ভিন্ন ব্যক্তি"।

কথায় কথায় আমি বলিলাম—"গৃহলক্ষ্মীর পঞ্চম অঙ্ক আপনিই রচনা করেছেন.?"

"হাঁ, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?"

—আমি আমার কথা বলিলাম। দুই একমাস পূর্ব্বেই "ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের" প্রথম নিবেদন গৃহলক্ষ্মীতে আমি উপেন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করি, সে কথাও প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল। সেদিন সেখানে গিরিশচন্দ্রের অন্যতম ভক্ত ও সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের অভিনয় আদ্যোপান্ত দেখিয়াছিলেন, রিহার্সেলের সময়ও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার কাছে অভিনয়ের যথাযথ বিবরণ আগ্রহের সহিত শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবু খুসীই হইলেন। 'গৃহলক্ষ্মী' সম্বন্ধে তাঁহার এই আগ্রহ স্বাভাবিক। পরে শুনিয়াছি মিনার্ভায় গৃহলক্ষ্মী রিহার্সেলের সময় অভিনেতা অভিনেত্রীদিগকে তিনি নিজে যথাযথ নির্দ্দেশ দিতেন। দানিবাবু, তারাসুন্দরী, অপরেশবাবু, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি একথা অনেক বার স্বীকার করিয়াছেন।

সেদিন কথায় কথায় তাঁহার রচিত 'বাসিফুলের' প্রসঙ্গই হয়। উহা কয়েকটি মনোরম গল্পের একখানি পুষ্প-মালঞ্চ। পরলোকগত পুত্র ও কন্যার নামে 'বাসিফুল' উৎসর্গীকৃত। বহিখানি উলটাইয়া প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত উৎসর্গ পত্রখানি পাঠান্তে মনটা যেন বিষাদে ভরিয়া গেল। লেখাগুলি এখনও মনে আছে—

> "নশ্বর দেহে এ অভাগার গেহে যখন তোমরা অতিথি ছিলে, তোমাদের স্নেহসংস্পর্শে কাঁটাবনে ফুল ফুটিয়াছিল। যে ফুল একদিন বাগ্‌দেবীর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম, আজ তাহা বাসি,—যে হৃদয় একদিন তোমাদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলাম, আজ তাহাও বাসি। মানব জীবনে যাহা কিছু উপাদেয়, উপভোগ্য, আমার সে সকলই তোমরা লইয়া গিয়াছ, কেবল রাখিয়া গিয়াছ তোমাদের মধুমাখা স্মৃতি-বিষ। সেই স্মৃতির উদ্দেশে "বাসিফুল" উৎসর্গ করিলাম"।

ঘণ্টা দুই আড়াইর আলাপে শ্রদ্ধা লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তিনি বলিয়া দিলেন, "কিছু লেখা নিয়ে আসবেন।"

ইহার পর নূতন করিয়া লেখা শুরু হইল। হৃদয়ে সাহসও খুব হইল যে একজন খাঁটি পথপ্রদর্শক পাইয়াছি।

এইবার যাতায়াত সুরু হইল। আমি লিখিয়া তাঁহার কাছে পড়িতাম। তিনি হয় অনুমোদন করিতেন, নয়তো ফিরিয়া ভাল করিয়া লিখিতে বলিতেন।

কিছুদিন যাতায়াতের পরে তিনি আমাকে একটী দুরূহ কাজ করিতে আদেশ করেন। ইহা প্রথমে একেবারেই অসাধ্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদে পরে তাহা যথাসম্ভব সাফল্যে পরিণত হয়। কেবল তাহাই নয়,—অনুসন্ধিৎসু লেখক বলিয়া আমার যাহা কিছু সুনাম, তাহা এই নির্দ্দেশের ফলেই হইয়াছিল। তিনি আমার অপেক্ষা প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসরের বড়, কিন্তু তবু আমাকে 'হেমেন্দ্রবাবু' ছাড়া কখনও ডাকিতেন না। একদিন বলিলেন—

"হেমেন্দ্রবাবু, আপনাকে একটী কঠিন কাজে হাত দিতে হবে। পুরাতন কাগজ খুঁজে কোন্ নাটকের কোন্ তারিখে প্রথম অভিনয় তা বের করতে হবে।"

আমি ভীতিকণ্ঠে বলিলাম—"অবিনাশ বাবুর বহিতে এরূপ একটী তালিকাতো আছে।"

দেবেন্দ্রবাবু—কেবল গিরিশ বাবুর নাটকেই সম্পূর্ণ হবে না। প্রথমাবধি সব নাট্যকারের নাটকেরও অভিনয় তারিখ খুঁজে বের করতে হবে। এতে তুলনামূলক সমালোচনার সুবিধা হবে, আর আপনার বই হবে সবচেয়ে প্রামাণিক।

অসাধ্য সাধন! দেড়শত বৎসরের কাগজের সন্ধান! কি করিব আদেশ মাথায় পাতিয়া নিলাম। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক হইতেই Imperial Library (বর্ত্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী) হইতে পুরাতন কাগজ খুঁজিয়া রত্ন উদ্ধার করিতে সুরু করিলাম। রত্নই বলিতেছি, কারণ এই অনুসন্ধানের ফলেই আমার ৪ খণ্ড ইংরাজীতে "ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ" ও বাঙ্গলাতে ২ খণ্ড রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস তৈরী হইয়াছে। আরও এই জাতীয় কত বহি লিখিত হইয়াছে। মদ্রচিত 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকের শেষ অধ্যায়টিও ইহার ফলেই খুব তথ্যবহুল হইয়াছে। অতঃপরে রঙ্গমঞ্চ এবং গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার আয়াস দেখিয়াই বোধহয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক পদে বরণ করেন। এই সবই হইয়াছে দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে।

আর একদিনও একটী বৃহৎ কাজের ভার দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন। তাহাতেও অনেক বিষয়ে খাটিবার কথা আছে। গিরিশবাবুর পিতা, সহোদরগণ, প্রথমা স্ত্রী, দ্বিতীয়া স্ত্রী, দ্বিতীয় পুত্র ও কন্যার মৃত্যুর তারিখ, বয়স প্রভৃতি মিউনিসিপ্যাল রেজিষ্টার হইতে সব বাহির করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তিনি জানান যে, ইহাতে খরচ হইবে বটে, কিন্তু তাহা বৃথা যাইবে না। পত্রখানি এখনও আমার কাছে আছে, বাহুল্যবশতঃ এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

ক্রমে গ্রন্থখানি অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগবাজার রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবুই আমাকে আগ্রহ করিয়া সেখানে লইয়া গেলেন। তিনি কচিৎ বাটির বাহিরে যাইতেন, এই প্রথমে বাহিরে যাইতেছেন, খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, দেখিলাম আমার উৎসাহ হইতেও তাঁহার উৎসাহ বরং বেশী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাখাল মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র। এ সময়ে তিনি বেলুড় মঠ ও বিবেকানন্দ মিশনের সর্ব্বাধিনায়ক। যেরূপ জ্ঞানী তেমনি ভক্ত। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—

"খুব চেনা মুখ, পূর্ব্বে যেন কোথায় আপনাকে দেখেছি!"

এই বলিয়া কি ভাবিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করেন?"

আমি—ওকালতি করি।

তাঁহার পরিচিত উকীলদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। আসিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু বলেন—

"মহারাজ, ইনি গিরিশবাবুর জীবনচরিত লিখ্ছেন, আপনি এঁকে একটু আশীর্ব্বাদ করে দেন।"

মহারাজ তৎক্ষণাৎ আমাকে খুব উৎসাহিত করিয়া বলেন—

"আপনি লেগে যান, ঠাকুরের কৃপায় আপনার খুব হবে।

এই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া মনে যে কিরূপ আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইল তাহা সহজে অনুমেয়।

ইহার দুই-এক বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে বেলুড়মঠে গিরিশবাবুর নামে একটী অতিথিশালা (Guest-House) তৈয়ার হইয়াছে। এপর্য্যন্ত গিরিশবাবুর জন্মতিথি দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হইত। তিনি ও কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন। এবার (১৯২১) বেলুরমঠে হইবে স্থির হইল। তিনি আমাকে পত্রে লিখিলেন—

"গিরিশবাবুর গার্হস্থ্য জীবনখানি পাঠ করেন, ইহা মঠাধ্যক্ষগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা।" ইতিপূর্ব্বে এই অধ্যায়টি শেষ হইয়াছে। পত্রখানি নিম্নে প্রদান করিলাম।

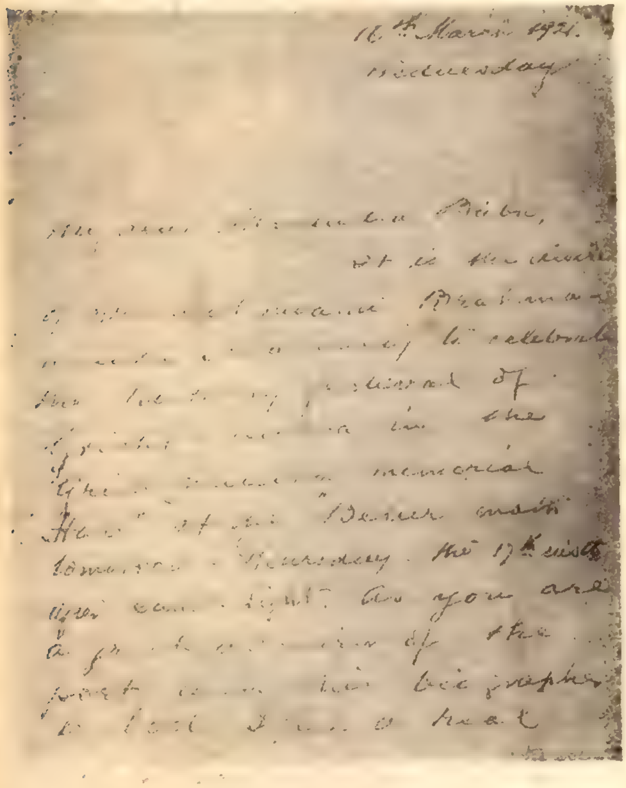

দেবেন্দ্রবাবুর ইংরাজী হস্তাক্ষর

16th March, 1921.
Wednesday.

My dear Hemendra Babu,

It is the desire of Swami Brahmananda Maharaj to celebrate the Birth-day festival of Girish Chandra in the "Girish Chandra Memorial Hall" at the "Belurmath" to-morrow Thursday, the 17th instant after candle light. As you are a great admirer of the poet and his biographer to boot, I feel a real pleasure in inviting you to join us at the 'Math' to-morrow. I have proposed that you will in the holy place give readings from your manuscripts of his "গার্হস্থ্য জীবন"।

I have been with the help of friends keeping the birth-day of the poet in my own house in our own humble way. This year it is the desire to celebrate it in the Math as there are insurmountable difficulties in my place this year and expect that in future it will be made public festival. Of course it will be semi public this year and it is desired that the expenses will be borne by subscription amongst friends. I give you this hint. You may choose to take it or not. But take it or not, I earnestly hope that you will join us.

There will be one difficulty in your way as to conveyance. Please bear this fact in your mind and try to make some sort of arrangement. We shall be able to come back to Calcutta by 1 o'clock in the night and I fear that if you go you will have to pass the night in Calcutta.

Trusting you are well,
Yours affectionately,
Sd/. Debendranath Bose.

এই চিঠি পাইয়া দেবেন্দ্রবাবুর আদেশ-ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার কালীঘাটের বাসা হইতে আহিরীটোলার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন পরলোকগত ললিত মোহন সেন। ইনি আমার সঙ্গে অভিনয় করিতেন, গৃহলক্ষ্মীতে তরঙ্গিনী খুব ভাল করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে খুব ভাল জানিতেন।

যাতায়াতের জন্য নৌকা ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বেলুর মঠের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি তখন

ভাগীরথী তীরে চেয়ারে বসিয়া বায়ু সেবন ও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছিলেন। তিনি ভারী খুসী হইয়া দেশের তদানীন্তন অবস্থা এবং আদালতের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি স্বামী শিবানন্দকে বলেন—

"তারকদা, তুমি আজ সভাপতি হবে। ব্যাঙবাবু এসেছেন, গিরিশবাবুর কথা হেমবাবু পড়বেন।"

দেবেন্দ্রবাবুর সাক্ষাতে মঠের সন্ন্যাসীগণের সম্মুখে সমগ্র গার্হস্থ্য জীবনটি পাঠ করিলাম। সে দিন আমার পক্ষে কি গৌরবের দিন! সন্ন্যাসীদের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছায় বুক ভরিয়া গেল। আহারান্তে রাত্রি দুইটা তিনটার সময় কালীঘাটের বাসায় পৌছিলাম। সন্ন্যাসিগণ সহ সব একসঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছিলাম।

এই সময়ে 'অসহযোগের' যুগ পড়িয়াছে। দেশবন্ধু ও অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী আইন ব্যবসা ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। আমিও ছাড়িব ছাড়িব করিতেছিলাম। বেলুড় মঠের সভার এক মাসের মধ্যে ক্রমে ছাড়িয়া দিলাম। দেড়বৎসর দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখা হইল না। উপদেশচ্ছলে তিনি আমাকে অসহযোগে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি সে নিষেধ পালন করিতে পারি নাই। নিষেধ করেন এই জন্য যে পরিবারের প্রতিপালনের ভার একমাত্র আমার উপর। ছাড়িয়া দিলে পরিবারের কষ্ট হইবে। এই সময় মধ্যে ইতিপূর্ব্বে তিনি দুই একবার আমার বাসা-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর রন্ধন-পটুতার প্রশংসা করিতেন, আমার মাকেও খুব শ্রদ্ধা করিতেন। আমার পরিবারের সমস্ত ব্যাপারই তিনি জানিতেন। তাই পরামর্শ যাহা দিবেন, হিতৈষী আত্মীয় হিসাবে তাঁহার দিক হইতে ঠিকই দিয়াছিলেন। ইহার পরে অনেক দিন আর দেখা হয় নাই। তবে জেলে যাওয়ার পরে আবার তাঁহাকে খুব স্মরণ হইল। সেইখান হইতে দুই একখানি পত্রও লিখিলাম, কিন্তু 'গিরিশচন্দ্র' বাহির হইবে এরূপ ভরসা তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল। তিনি যে পত্র খানি লেখেন ইহাতেই তাহা বুঝা যাইবে। পত্রখানি আমি জেলখানায় পাই। সমগ্র পত্রখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

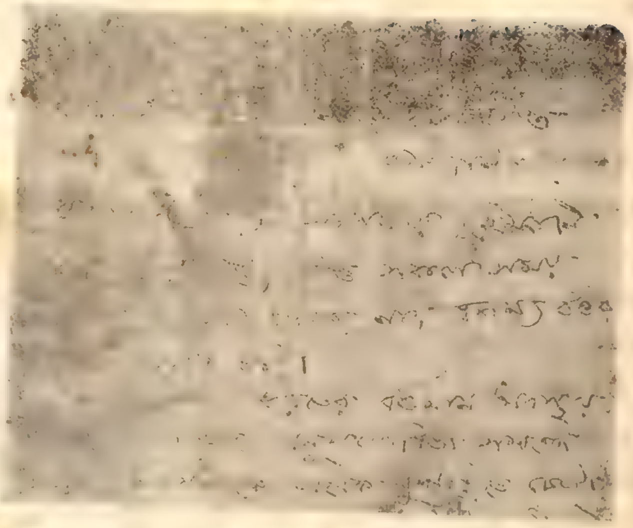

... ...

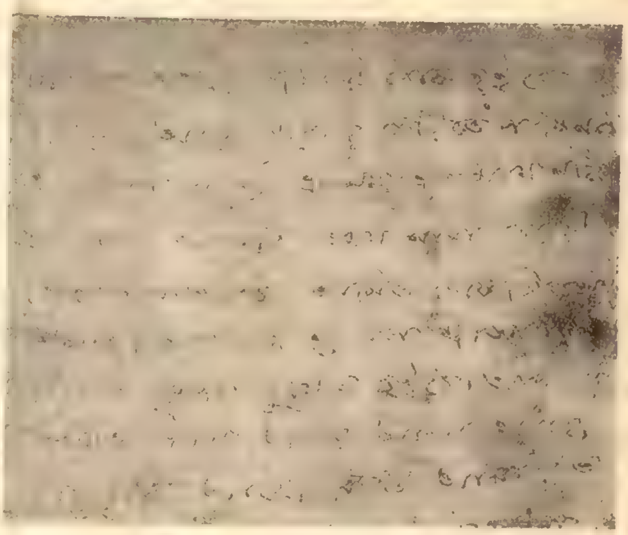

দেবেন্দ্র বাবুর বাংলা হস্তাক্ষর

২০।২।২২

শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কল্যাণবরেষু—

স্নেহাস্পদেষু,

আপনার দুইখানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সকল সময় শরীর ভাল থাকেনা, এজন্য উত্তর দিতে পারি নাই।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অসহযোগিতার অনুপযোগিতা আমি আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আপনাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না···

মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসুন···

গিরিশচন্দ্রের জীবনী শেষ হইবে বলিয়া আর ভরসা করিতে পারিনা। এসকল কার্য্যে একমন একধ্যান না হইলে হয় না। আপনি এখন নানা কারণে ভিন্ন ভাবাক্রান্ত। আমিও শেষ চিন্তায় নিমগ্ন। আর যদি হয় সে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা বুঝিতে হইবে। আপনার এখনও বয়স আছে, আশা আছে, অনুরাগ আছে, কিন্তু আমারতো সকলই ফুরাইয়াছে—

··· ··· ···

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

আমাকে যে তিনি কত স্নেহ করিতেন, এই চিঠিখানি হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। জেলখানায় 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তক খানিই কেবল লিখিতাম। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেও বাহির হয় নাই। বাহির হইবে এরূপ আশার সঞ্চারও তাঁহার হৃদয়ে করিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে বন্ধুবর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের একখানি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রবাবুর শরণাপন্ন হয়েন। তিনি অকাতরে তাঁহাকেও সহায়তা করিতে লাগিলেন। এবং অবিনাশবাবুর গিরিশচন্দ্রই আমার গ্রন্থের পূর্ব্বে বাহির হইল। অবিনাশবাবু 'গিরিশচন্দ্রের' একনিষ্ঠ ভক্ত, গিরিশচন্দ্রের রচনাগুলি তিনিই সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের খুঁটিনাটি সবই জানিতেন। তাহার বহিও খুবই ভাল হইল।

ইতিমধ্যে দেশবন্ধু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার আকস্মিক তিরোভাবের ৬ মাস মধ্যেই আমি আবার ওকালতি ব্যবসায়ে ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু তথাপি "গিরিশ প্রতিভা" বাহির হইল না। ১৯২৬এ 'দেশবন্ধু স্মৃতি' বাহির হইল। দেবেন্দ্রবাবুর কথায় এবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে "গিরিশ প্রতিভা" সত্যই বাহির হইল। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরের সাধনা অবশেষে ফলবতী হইল। "গিরিশ-প্রতিভা" নামটিও তাঁহারই প্রদত্ত।

"গিরিশপ্রতিভা" দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। পরিচালকের আশীর্ব্বাদে অখ্যাত লেখকের হাতে বিরাট গ্রন্থ বাহির হইল। সকলেই শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং গিরিশবাবুর জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে পুস্তকখানির সর্ব্বত্র আদর হইতে লাগিল। দানিবাবুও চারিদিকে যশোগান করিতে লাগিলেন এবং কুমুদবাবু, ডাঃ কান্তিলাল প্রমুখ গিরিশ ভক্তগণ সকলেই খুসী হইলেন। ভূমিকাও দেবেন্দ্রবাবুই লিখিয়াছেন। সমালোচনার কোন কোন স্থানে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাধা দেন নাই। আর পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সংগ্রহে আমার পরিশ্রম ও কষ্টকে তিনি 'অমানুষী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কুমুদবাবুকে তিনি বলেন—

"দেখুন, আমরা গিরিশদাদার সংস্পর্শে এসেছি, আমাদের শ্রদ্ধা থাকাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু হেমেন্দ্র তার সঙ্গ না পেয়েও একান্ত ভক্তি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই কাজটি সাধন করেছে, সেজন্য সে আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা অতুলনীয়।"

গ্রন্থখানি আমার মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত। তিনিই বলিয়া দেন কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া 'জননী চরণে'—কথাটি মাত্র লিপিবদ্ধ করিতে। পুস্তকখানি বাহির হওয়ায় যেন আমাপেক্ষা তাঁহারই বেশী আনন্দ হইল। তিনি একখানি মরক্কো লেদারে বাঁধাই বহি চাহিলেন। অনতিবিলম্বে তদ্রূপ ব্যবস্থা হইল। কুমুদ

বাবুকেও আমি বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ঐ ভাবেই বহি দিয়াছিলাম।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, আমার ব্যক্তিগত কথা বলিয়া পাঠকের নিকট বোধ হইতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর মহানুভবতা, উদারতা এবং গিরিশবাবুর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় দেবার জন্যই ইহার আবশ্যক হইয়াছিল। এবার তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা প্রয়োজন বোধে নিবেদন করিব।

দেবেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে দেখা হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই বিপত্নীক হন। অনেকগুলি পুত্রকন্যাও হারাইয়াছিল, কিন্তু আমি মাত্র একজনকেই অবশিষ্ট দেখিতে পাই। ইনি পুত্র পার্ব্বতীনাথ, গ্রাজুয়েট এবং বিশেষ শিক্ষিত ও সদালাপী ছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন বেঙ্গলী পত্রের পরিচালক হন, পার্ব্বতীবাবুই উঁহার সহকারী অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন, কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর পরে ইনিও ভ্রাতা-ভগ্নীদের অনুসরণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। দেবেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে আমাকে মাঝে মাঝে বলিতেন—

"আপনারা কাছে থাকায় বেশ ভাল থাকি, নতুবা গৃহ আমার শ্মশান, শমনের পুনঃ পুনঃ অভিসারে গৃহের প্রতি কক্ষ স্মৃতির সমাধি মন্দির।"

এবার পুত্রটিও গেল—একমাত্র পুত্র, যোগ্য, সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল। কিন্তু ৬২ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া বৃদ্ধের যে অমানুষিক ধৈর্য্য দেখিয়াছি, তাহা শুনিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। চোখে এককোঁটা জল নাই। হৃদয়ের কোন উচ্ছ্বাস নাই। দাহকারিগণ শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি পরিধান করিবেন, কোন স্থানে অগ্নি স্পর্শ করিবেন, কি মুখে দিবেন—সব ব্যবস্থা নিজে করিতেছেন। বন্ধুরা প্রবোধ দিবেন কি, তিনিই মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন। এরূপ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির কথা মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের "ভক্তি-যোগে" পাঠ করিয়াছি, চোখে দেখি নাই।

জলধর বাবু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যখন প্রাতে আসিয়া সেই প্রসঙ্গ উঠাইলেন, তিনি উত্তর করেন, "দাদা, অন্য প্রসঙ্গ তুলুন, প্রবোধবাক্য নিজেই আমি অনেক লিখেছি!"

একদিন বলেন, "হেমবাবু, ছেলে মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় জীবনে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করিনি, কলকে ঝাঁকিয়ে পাকালে সু—তার হয় না।"

দেবেন্দ্রবাবু রামকৃষ্ণ দেবের পরমভক্ত ছিলেন। বোধ হয় গিরিশবাবুর প্রেরণায়ই পরে তিনি সেখানে যাইতেন। একদিন শুনিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"হ্যাঁ গা, বুড়ি ছোঁওয়া থাকলে কি কেউ আর চোর হয় গা?"

ইহাই তিনি মন্ত্রের ন্যায় মনে করেন, তাঁহার অন্তর বলিতে থাকে—

"সোণার ঠাকুর সর্ব্ব ঘটে
খোঁজ তোর অন্তরে"

পুত্রশোকের কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে এই সিদ্ধমন্ত্রই গুরুমুখী করিয়া লইয়া সাধন করেন।

ঠাকুরের জীবন চরিত তিনি শ্রীশ মতিলালকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের জীবন চরিতও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশ ব্রহ্মচারী রচিত গ্রন্থটিকে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন এবং অপূর্ব্ব রচনাকৌশলকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুরুর প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তির প্রেরণায় সব গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন।

দেবেন্দ্রবাবুর দূর সম্পর্কীয় এক ভাগিনেয় সেখানে থাকিতেন। সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার তাহার উপরই ন্যস্ত ছিল, তাহার নাম ছিল অতুলকুমার ঘোষ। ইনি অকৃতদার, কিন্তু অত্যন্ত সুপণ্ডিত, নিঃস্বার্থ উদার-হৃদয় ছিলেন। জষ্টিস শরৎ ঘোষ ইহার খুড়তুতো কি জ্যাটতুতো ভাই! বেশ সদ্ভাবও ছিল।

দেবেন্দ্রবাবুর সত্তর বৎসর বয়সে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই সুখে দুঃখে নিত্যসঙ্গী অনাত্মীয় হইয়াও পরমাত্মীয় জীবনের অবলম্বন, দুর্দ্দিন সুদিনে একান্ত নির্ভর সহচর অতুলকুমার হৃদরোগে ভুগিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইনি আমার প্রতি বিশেষ সহৃদয়তা দেখাইতেন। আজ এই উপলক্ষে সেই সুহৃদবরের নামও স্মৃতিপথে আসিল।

এই বৎসরেই আর একজন পরমাত্মীয় তিনি হারান। তাঁহার শৈশব-বান্ধব, বল বুদ্ধি আশা ভরসা মহারাজা

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এই আবাল্য মহোপকারী বন্ধু মহারাজ এবং সোদরাধিক বান্ধব হারাইয়া তিনি গভীর শোকে নিমগ্ন হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ অপার ভক্তি এবং বিশ্বাসের বলেই এই নিদারুণ শোকগুলিও হাসিমুখে সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেবেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদরের একটি পৌত্র শিশুকাল হইতে তাঁহার সঙ্গে থাকিত। উহার ডাকনাম গোপাল, আসল নাম হীরেন্দ্রনাথ বসু। বৃদ্ধের সমস্ত স্নেহ যেন এই নাতিটির উপরে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটা আশ্রয় লাভ করিল।

গোপালের ছেলে বয়স হইতে পড়াশুনা শিক্ষা-দীক্ষার ভার 'দাদুর' হাতেই ছিল। গোপাল শিল্পী এবং দাদুর জীবদ্দশায়ই এম, এ পাশ করিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর পিতা গোপীনাথ ছিলেন সবজজ।

এবার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সম্বন্ধে নিবেদন করা আবশ্যক মনে করি। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াই তিনি বাল্যবন্ধু দেবেন্দ্রনাথকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া তাঁহার সহকারী কর্ম্মসচিবের পদে নিযুক্ত করেন।

৮।৯ বৎসর কাজ করিবার পরে ষ্টেটের মঙ্গলের জন্য দেবেন্দ্রবাবু মহারাজাকে উপদেশ দেন, "আমাদের চারিজনকে না রাখিয়া বাহির হইতে চারিজনের বেতন দিয়া একজন বিচক্ষণ ম্যানেজার নিযুক্ত কর।" কিন্তু মহারাজ সে উপদেশ গ্রহণ না করায় দেবেন্দ্রনাথ নিজেই পুত্র কন্যাদের অসুস্থতার অজুহাতে ছাড়িয়া কলিকাতা আসেন। এখানেও মহারাজা তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তিনশত মুদ্রা মাসিক পেনসন দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। পূজার সময় দিতেন দ্বিগুণ। নিরহঙ্কার মহাপ্রাণ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা আসিলেই বাল্যবন্ধুর গৃহে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

এই পেনসনে দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চ্চা চলিত অবাধে।

দেবেন্দ্রবাবু যখন কাশিমবাজারে ছিলেন, অনুমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ-বাড়ীতে কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে গিরিশবাবুর মিনার্ভা দলকে ডাকেন। সঙ্গে যান অর্দ্ধেন্দুবাবু, চুনীবাবু—প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্রের যোগেশের ভূমিকা দেখিয়া মহারাজা ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ অজস্র প্রশংসা করেন। যাহাহউক, দেবেন্দ্রবাবুর মত শিক্ষিত ব্যক্তি আমি খুব কম দেখিয়াছি। কি অপূর্ব্ব প্রতিভার তিনি 'ওথেলো' নাটকখানি বাঙলায় অনুবাদ করিয়া ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করান,তাহাতে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। অনুবাদের সময় অনেকদিন উপস্থিত থাকিতাম। অতঃপরে এণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রাও অনুবাদ করেন। সেক্‌সপিয়রের কোন নাটকই দেবেন্দ্রবাবুর বাদ ছিল না। সমালোচক Gervinius Hazlitt, Donald প্রভৃতিও সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে জলধরবাবু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেককে দেখিয়াছি। জলধরবাবু প্রায়ই আসিয়া ৩।৪ ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। সমাজপতি মহাশয় নানা আলোচনার মধ্যে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে খুব তাগাদা দিতেন আর শরৎবাবুও আসিয়া রসাল আলাপ করিয়া যাইতেন। যমুনা সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পালও আসিতেন।

ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় অপরেশবাবু খুব ঘন ঘন আসিতেন। অনেক নাটক দেখাইয়া নিতেন, 'রামায়ণ' গ্রন্থে কয়েকটি গানও দেবেন্দ্রবাবু রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয়ও আসিতেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'সীতা' খুলিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী মহাশয় শ্রীহেমেন্দ্র রায় সহ আসিয়াছিলেন। সেদিন দেবেন্দ্রবাবু আমাকে Great National Theatre-এর ফটো (১৮৭৭ খৃঃ অঃ) দিয়াছিলেন। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরাও তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে এবং কোন কোন গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সব সাহিত্যিকগণ তাহাদের গ্রন্থের মধ্যে বা পরবর্ত্তী রচনাকালে সে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথও এজন্য ভ্রুক্ষেপও করিতেন না।

গ্রেট ন্যাশ্‌নাল থিয়েটার (১৮৭৩ খৃঃ)

১৯২৫।২৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত প্রবর অশোক শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। 'শকুন্তলার নাট্যকলা' গ্রন্থ যে দেবেন্দ্রবাবু লেখেন, ইহা একখানি অতি মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থ রচনায় মালমশলা দিয়া কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রবাবুও তাহা ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু একদিকে মুক্ত হস্তে তাহার সাহিত্যসম্পদ অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করিতেন, অপরদিকে কাহারও বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইলে সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল, স্বর্গীয় পূর্ণ ঘোষ, রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঘাবাবু), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায়ই আসিতেন। বাঘাবাবু দেবেন্দ্রবাবুকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই জন্যই আমাকেও খুব স্নেহ করিয়া থাকেন। সূর্য্যবাবু এবং অন্যান্য সাহিত্যিকেরা সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলোচনা করিতেন এবং পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিলে সেখানেই উঠিতেন।

মঠের অনেক সন্ন্যাসীকে তাঁহার ওখানে দেখিয়াছি। মহারাজ অসিতানন্দ খুব শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের সহিত তিনি নানাবিষয়ে আলোচনা করিতেন ও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল গিরিশচন্দ্রের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইনি প্রতিদিন আসিতেন। দেবেন্দ্রবাবু তাহাকে "শ্রীরামকৃষ্ণচরিত" লিখিয়া দেন।

তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিব। একবার দেবেন্দ্রবাবুর কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়—তাঁহার একজন নিত্যসহচর হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ লয়েন। যথাসময়ে টাকা দিতে কষ্ট হয়, কিন্তু পীড়াপিড়ি করিলে দেবেন্দ্রবাবু কিছু সম্পত্তি বিক্রী করিয়াই টাকা পরিশোধ করেন। ইহার পরে তাঁহাকে আর সেই বাড়ীতে দেখি নাই। তবে দেবেন্দ্রবাবু নিঃশব্দেই টাকাটা পরিশোধ করেন। এবং প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে উক্ত ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রদর্শন করেন নাই।

শেষ বয়সে তিনি পৈত্রিক ভিটার কতকটা অংশ ছাড়াইয়া একখানি বাড়ী করিয়া যান। আজ তাহাতেই সসহোদর গোপাল প্রভৃতি বাস করিতেছে। জায়গা ছিল উভয় ভ্রাতার—দেবেন্দ্রবাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোপালের পিতামহের। শেষ বয়সেই পৈত্রিক ভিটায় (২৬, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট) থাকিতে পারিলেন, ইহাই কতকটা সান্ত্বনার বিষয়। আজ গোপাল ছাড়া দেবেন্দ্রবাবুর আর কেহ নাই। সব গিয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সহোদর আপনার বলিতে কেহই রহিল না।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গিরিশবাবুকে খুব ভক্তি করিতেন। তিনি মনে করিতেন তাহার যাহা কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে সব গিরিশ বাবুর কৃপায়। বেলুড়মঠে গিরিশ স্মৃতিস্তম্ভের সাহায্যকল্পে ইনি "গোপালের মা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া

দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে দেন। তিনি আমূল পরিবর্ত্তনে নূতন করিয়াই উপন্যাসখানি লিখিয়া দেন, কিন্তু প্রকাশিত পুস্তকে দেবেন্দ্র বাবুর নাম থাকে সম্পাদক হিসাবে। সে সময় দাদা জলধর সেন মহাশয় প্রতিদিন আসিতেন। তিনি 'গোপালের মা'র ভূমিকায় নিম্নলিখিত কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করেন—

"গোপালের মা," পুস্তকের মুদ্রণকার্য্যে আমি সহযোগী। ইহার লেখক আমার ছোট ভাই আর সম্পাদক আমার দাদা। তবে এ-কথা ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারি যে, আমার এই ছোট ভাই একদিন দাদার আসনে উপবিষ্ট হইবেন এবং দাদা তখন গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, সেই পরিচয় এ গ্রন্থে আমার ন্যায় সাধন ভজনহীন মূঢ়ও পাইয়াছে। এই উপন্যাসের আখ্যান ভাগ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য অতি উচ্চ, অতি মহান, অতি পবিত্র, তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দ।"

এরূপ আনন্দ ভাব তাঁহার মধ্যে আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শেষকালে প্রায়ই অম্লপিত্ত অসুখে ভুগিতেন। যে দিন অসুখ হইত, দুই তিনদিন অজ্ঞানের মত পড়িয়া থাকিতেন, জ্ঞান থাকিত না। উপর্য্যুপরি অসুখে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

ইদানীং আর্থিক অসচ্ছলতাও অভিভূত করিল। আমি দুর্ভাগা, আমার সাধ্য ছিল না এত বড় হিতৈষী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তির অভাব দূরীভূত করি। শেষ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গিরিশ লেকচারার নিযুক্ত করেন।

প্রথম গিরিশ অধ্যাপকের আসন তাহার হইলেই মানানসই হইত, কিন্তু পাইলেন চারিজনের পরে। রুগ্ন-দেহে নিজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন অশোক শাস্ত্রী মহাশয়। জীবন-সন্ধ্যার অন্ধকারে রচিত হইলেও ইহা একখানি অমূল্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

এইরূপে ১৯৩৮-এর নভেম্বর মাসে (২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫ সাল) ক্রমাগত ভুগিতে ভুগিতে নিজ জন্মভূমিতেই ৭৯ বৎসর বয়সে ঠাকুরের নাম জপ করিতে করিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার শেষ রচনার গানটিই তাহার প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দিয়াছে—

"চাইনে মা তোর হীরে জহর, কাঁধে দে মা কাঁথার ঝুলি,
আমি আঁখি ভ'রে দেখি তোরে খুলে দে মা
চোখের ঠুলি।"

কয়দিন দেখা হয় নাই, মনটা বড় উচাটন ছিল। আফিসে বসিয়া আছি, হঠাৎ ফোন আসিল—"এইমাত্র দেবেন্দ্রবাবুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, শীঘ্র আসুন।"

তৎক্ষণাৎ পথ ধরিলাম। গিয়া দেখিলাম—রোগে, শোকে, বিচ্ছেদে অশেষ দুঃখ পাইয়া আজ যেন নিদ্রা সুখ ভোগ করিতেছেন, দেখিলাম পরম ভাগবত প্রশান্ত বদন মহাপুরুষ এখন চিরশান্তিতে মহানিদ্রাব্রত। তাঁহার শব কাশী মিত্রের ঘাটে নীত হইল, গোপাল মুখার্জ্জি করেন। আমি একজন পরম বান্ধব হারাইলাম।

জীবনে অনেক হিতৈষী ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আজ শেষ আপন জন চলিয়া গেলেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ তৃতীয় খণ্ড গিরিশ শত বার্ষিকী সংখ্যারূপে বাহির হয়। একটী সামান্য কথায় উহা দেবেন্দ্রবাবুর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু উহা বাহ্যিক স্মৃতি মাত্র। আজ এই শ্রদ্ধা নিবেদনটুকু হৃদয়ের অর্ঘ্যস্বরূপ দিতে সমর্থ হইলাম, ইহাই শান্তি। এই দীন অর্ঘ্য তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই পৌছিবে, এই বিশ্বাস আমার আছে, কারণ শ্রদ্ধা অনেক উচ্চস্থানেও যায়।

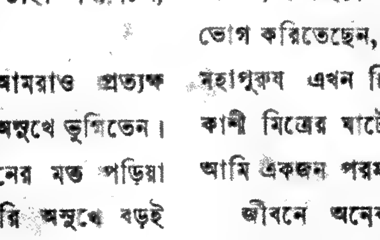

পূর্ব্বজন্মের ইতিবৃত্ত

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

কথাটা উঠেছিল হরিচরণবাবুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশাকে কেন্দ্র ক'রে। হরিচরণবাবুর বাড়িতে একসঙ্গে পুত্র এবং পুত্রের জননীর জ্বর হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া তাঁর সংসারেও আর কেউ নেই—একটি ঠিকে ঝি আবুর মা সেও বিনা নোটিশে মেয়ের বাড়ি চলে গিয়ে বসে আছে। এই সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থায় হরিচরণবাবু বিষম বেকায়দায় হিম-সিম খাচ্ছেন। স্ত্রী এবং পুত্রের বার্লি, ছানার জল থেকে শুরু ক'রে ডাক্তার বাড়ি হাঁটাহাঁটি করা সব কিছুই তাঁকে একলা করতে হচ্ছে। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যতঃ খুব সপ্রতিভ ভাব বজায় রেখেই চালাচ্ছিলেন। এমন সময় নিবারণ দত্ত মশাই কুশল জিজ্ঞাসা করতে এলেন—পাড়াতে যদিও অনেক ঘর বাসিন্দা, তবুও হরিচরণের সঙ্গে আর সকলের তেমন মাখামাখি নেই, এদিক দিয়ে এ পাড়ার অসামাজিকতা খাস মধ্য কলকাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। কেবলমাত্র নিবারণ বাবুই ব্যতিক্রম। তিনি হুঁকো হাতে, খড়ম পায়ে হন্‌হন্‌ ক'রে আসেন, আবার একসময়ে উঠে পড়েন হঠাৎ। আজও তেমনি ভাবেই এসেছেন। হরিচরণ নিজের কাজ করছেন, মাঝে মাঝে দু'চারটে কথা জুগিয়ে যাচ্ছেন। পাশের ঘরে মনোরমা বিছানার উপর বসে বসেই স্বামীকে এটা-ওটা দেখিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন—কারণ হরিচরণ নিজের মতামতকেই বেশী শ্রদ্ধা করে।

একসময়ে নিবারণ বল্‌লেন—"এ সবই মশাই দেনা শোধ করা, বুঝলেন—"

হরিচরণ একটু থমকে হাতের কাজ বন্ধ রেখে প্রশ্ন করলেন—"দেনা কিসের মশাই? কারও ধার ক'রে কি খেয়েছি—না, খাই?"

—"ওই ত, আপনারা আবার জন্মান্তরের কথাটা মনে ঠাঁই দেন না! আমি বল্‌ছি যে, এই যে আপনাকে হাঁড়ি-ঠ্যালা থেকে বাসনমাজা পর্য্যন্ত করতে হচ্ছে—এ আপনার কর্ম্মের ক্ষয় হচ্ছে, মানে গত জন্মের দেনা শোধ করছেন, এই খোকার দেনা, বৌমার দেনা—"

পাশের ঘর থেকে মনোরমার সলজ্জ কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"আপনি ওসব ব'লে আর পাপের ভাগী করবেন না!"

—"না, না বৌমা, এতে পাপ-পুণ্যের কিছু নেই ত! হরিবাবু নিশ্চয় গত জন্মে এমন কিছু করেছিলেন যার জন্যে মানে—এই যে আপনি ওর এই জন্মের স্ত্রী হয়ে ওর সংসার সাম্‌লাচ্ছেন—এও তো সেই প্রাক্‌জন্মের ফল বৌমা—!"

হরিচরণ মুগের ডালে হিং ফোড়ন দিয়েছে—তার সৌরভে একতলার ঘরখানা ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল। মনোরমা অস্ফুটস্বরে বলে উঠ্‌ল—"উঃ কী উৎকট রান্না রে বাবা, মুগের ডালে হিং! হাজার বারণ করলেও শুনবে না!"

নিবারণ দত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লেন—"বাঃ, ভোফা খোশ্‌বাই! হাজার হ'লেও জাত বামুন ত! আপনি মশাই সাতটা রাঁধুনীর নাক-কান কাটতে পারেন। আমার অমলার বিয়েতে কিন্তু মশলার মাপজোক আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে চাটুয্যে মশাই!"

মনোরমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসি সাম্‌লাবার চেষ্টা করতে করতে উঠে এল—"তা হ'লেই হয়েছে দত্ত মশাই! একদিক দিয়ে ভালো হবে অবিশ্যি—আপনার খরচ বাঁচ্‌বে!"

নিবারণ একবার মনোরমাকে ভালো ক'রে দেখে নিল। প্রৌঢ় হরিচরণের এদিক দিয়ে স্ত্রীভাগ্য খুবই ভালো বল্‌তে হবে—সাত দিনের জ্বরেও মনোরমার চেহারা এতটুকুও রুগ্ন দেখাচ্ছে না, বরং যেন বয়সটা আরও কাঁচা দেখাচ্ছে। নিবারণ হুঁকায় মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল—"আজকাল যা বাজার পড়েছে বৌমা, তাতে বেশি

খরচের সাধ্য কোথায় বলো! তাছাড়া এত ত আন্দোলন হ'ল,কুলি মজুরের মাইনে বাড়ল. জিনিসপত্রের দাম বাড়ল, রেলের ভাড়া বাড়ল, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেদের কোনোদিকে কিছু সুরাহা হ'ল না।"

মনোরমা যে কারণে উঠে এসেছিল, সেই কথাটা বলাই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য—ও বললে —"না, না, আমি বলছি উনি পরামর্শ দেবেন যা, সেটা আগে শুনুন—উনি বলবেন সের দুই হিং কিনতে আর পাঁচসের তেঁতুল কিম্বা পাঁচশ লেবু আনতে। সবতাতেই ওঁর ওই এক মশলা—"

রান্নার খুপড়ি থেকে হরিচরণ হাঁক দিল—"এই ছাখো পতি নিন্দের পাপ পরজন্মের জন্য তোলা থাকচে। দত্ত মশাই আবার এইজন্যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পৃথিবীর পাঁকে টেনে আনবেন—তখন আবার—"

হরিচরণের কথা শেষ করতে দিলেন না নিবারণ দত্ত —তিনি উত্তেজিত ভাবে ভাঙা গলায় বললেন—"অত ঠাট্টা করবার কিছু নেই মশাই। বামুন হয়ে আপনি এত নাস্তিক কি ক'রে হ'লেন বলুন ত? আর এইসব অনাচারের জন্যেই ত পৃথিবীর এত দুর্ভোগ। নইলে কি ভূমিকম্প, জল প্লাবন, তুফান—এসব অমনি হয়?"

—"অমনি হবে কেন? এসবের বৈজ্ঞানিক কারণ আছে।"

—"ছাই, বিজ্ঞান—আপনারা খুব বড় বড় বাৎচিৎ করেন। বলতে পারেন মনের কথা বিজ্ঞান দেখতে পায়? আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কর্ম্মফলে আপনার আস্থা না থাকতে পারে—তাতে কিছু এসে যায় না, যা সত্যি, তা ত আপনার একটা বিশ্বাস অবিশ্বাসে বসে থাকে না! আমার নিজের স্বচক্ষে দেখা—যাকে মুখ চেয়ে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বুঝলে বৌমা!" নিবারণ এবারে মনোরমাকে সম্বোধন করলেন।

মনোরমা নিজের কথা শেষ ক'রে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। দত্তর কথার জবাবে সে বললে—"আঃ ছেলেটা বড্ড জ্বালাতন করছে। অসুখ হয়ে যেন আরও পেয়ে বসেছে,—ছাড় না, দত্ত মশাই-এর কথাটা শুনতে দে—।"

—"আহা, ওকে কেন মিছে বকছ! আমি এই জন্মান্তরের কথা বলছিলাম—বুঝলে, তা নিজের চোখকে ত মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দিতে পারব না। আমি তখন চেঁয়া গজনীপুরে থাকি। কোম্পানীর কাজে যেতে হয়েছিল। সেই অজ জায়গায় এক কাণ্ড—হঠাৎ একদিন এই বেলা তখন ন'টা দশটা হবে। হাটের কাছে একটা জায়গায় বেশ ঘনমাথা—প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝিবা রেশমী চুড়ি কিম্বা কাঁঠালের নীলেম হচ্ছে। ওসব জায়গায় এইসব ব্যাপারে ভিড় জমে খুব। আমার ত ওসবে কিছু কাজ নেই। তা পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে কান্নার শব্দ কানে আসতেই মনটা কেমন হ'ল—বলি একবার দেখেই যাইনা বিষয়টা কি! তারপর ভিড় আর ঠেলতে হ'ল না, আমার পাটভাঙা জামা কাপড় দেখে সবাই পথ ক'রে সরে দাঁড়াল। দেখলাম কি জান বৌমা! —শুনছেন ও মশাই হরিবাবু—কথাটা হয়ত ভালো লাগবে না, গাঁজাখুরী বলে উড়িয়েই দেবেন হয়ত, তবু শুনুন।"

হরিচরণের ডাল রান্না হয়ে গেছে, তিনি উনুনে জল চড়িয়ে দিয়ে এঘরে এলেন। বললেন—"রাগ করছেন কেন দত্ত মশাই। বলুন, বলুন—"

নিবারণের হুঁকার দিকে তাকিয়ে বললেন হরিচরণ—"এঃ, এ যে একেবারে তুব হয়ে গ্যালো দাদা! যাক গে, একটা খাকী সিগারেটই খাওয়া যাক। রান্নার আর সব ভালো, কেবল ওই উনুনের চোখ রাঙানীকেই ভয় লাগে—বড্ড তাত!"

নিবারণ গল্পের আমেজ নষ্ট হতে দিলেন না—"হাঁ যে কথা বলছিলাম। ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখলাম, একটি বছর বাইশ চব্বিশ কি বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছোকরা হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে। তার কোমরে একটা হাত, কোমরটা কেমন যেন যন্ত্রণায় থেকে থেকে কুঁজো হয়ে পড়ছে। আমাকে দেখে সে যেন আরও ডুকরে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম—'কী হয়েছে হে, অমন মেয়েদের মত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছ কেন?' পুরুষ মানুষকে কাঁদতে দেখলে আমার ভয়ানক বিশ্রী লাগে।"

"তা সে ত চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে—আপনি কেবলরাম তর্করত্নকে চেনেন ?"

"আমি তখনও ওর ওপর চটেই আছি—বলি—'তা দিয়ে তোমার কী কাজ !' সে বেচারা আবার কাঁদতে লাগল, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যা বল্লে, তাতে আমার মনটা একটু নরম হ'ল, ও বললে কি জানো বৌমা !"

"ও বললে—'আমার সংসারে সব থেকেও নেই। বাবা মা, দাদা-ভাই সবাই আমাকে আমার রোগের জন্যে অবহেলা করে। তাদের দোষ দিই না, আমি যদি সারাটা জীবন এইভাবে রোগ ভোগ করি, তারাই বা সে জন্যে সব সময় কষ্ট সহ্য করবে কেন ? জানেন, আমার এই অম্লশূলের বেদনা এক-এক সময় এমন সাংঘাতিক হয় যে আমার চীৎকারে বাড়ীর লোক রাত্রে ঘুমোতে পারে না, দিনে তাদের মুখে ভাত রোচে না'।"

হরিচরণ বাধা দিয়ে বললেন—"দাঁড়ান মশাই, চালটা ছেড়ে দিয়ে আসি—তারপর শুনব !"

নিবারণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—"দেখলে বৌমা ! হাজার হলেও খাঁটি সত্য কি না !"

মিনিট তিনেক পরে হরিচরণ গামছায় হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন—"হাঁ তারপর—সেই ছোক্‌রা কি আপনার সঙ্গ নিল ?"

নিবারণ বললেন—"না, আমার সঙ্গ নেওয়া ত তার উদ্দেশ্য নয়। সে গিয়েছে সেখানে কেবলরাম তর্করত্নের খোঁজে। ওই রকম সাংঘাতিক শূল বেদনা নিয়ে বদ্যিনাথধাম থেকে সে রওনা হয়েছে—খোঁজ ক'রে ক'রে, খোঁজ ক'রে ক'রে টেঁয়া গজনীপুরে যাওয়া ত চাট্টিখানি কথা নয় !

—"তার মতলবটা কি ?" হরিচরণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

—"তোমার মত সবাই ত আর মতলববাজ নয়। শোনই না দত্ত মশাই-এর কথাটা—তা নয় আগেই মতলব দেখবার জন্যে আঁকুপাঁকু করা চাই।" মনোরমা বেশ বক্রভাবেই কথাগুলো বল্লে।

নিবারণ বললেন—"মোট কথা, ছেলেটি একাদিক্রমে সাড়ে পাঁচ বছর শূল বেদনায় ভুগে ভুগে যখন মরীয়া হয়ে গেল, মা-বাপ, ভাই-বোন সকলেই যখন ওকে অগ্রাহ্য করে—তখন ওর মনে খুব দুঃখ হল। একদিন ঠিক করলে যে, এমন জীবন না রাখাই মঙ্গল। ঠিক সেই সময়ে কে যেন ভগবানের দৈববাণীর মত ওর কানে পরামর্শ দিল—যখন মরতেই সাধ হয়েছে, তখন একবার বাবা বদ্যিনাথের চরণ দর্শন ক'রেই মরা ভালো। কথায় বলে—বোদে পাথর, জগা কাঠ, পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট, আর যত সব ভুটভাট্‌ !"

মনোরমা গায়ে আঁচল টেনে সংযত হয়ে উঠে এলো—"তার মানে কি হ'ল দত্ত মশাই !"

নিবারণ দত্ত সহাস্য বদনে বললেন—"কী গো বামুন মশাই, বলুন দেখি—এর মানেটা কী !"

—"হ্যাঁ তা হলেই হয়েছে—ওঁকে বলুন, এখুনি দুধ বার্লিতে হিং সম্বরা দিয়ে রান্না করতে—" ব'লে মনোরমা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাল। কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মনে হ'ল, হয়ত হরিচরণ এতে ব্যথিত হ'য়েছে, তাই আবার বললে—"ওঁর এসব দিকে মনই নেই। নিজের লেখাপড়া নিয়েই দিন কাটে।"

নিবারণ বল্লেন—"অবিশ্যি এগুলোও লেখাপড়ার মধ্যেই পড়ে। যাক্‌, মানেটা শুনে নাও—বোদে পাথর মানে বৈদ্যনাথ ধামের শিবলিঙ্গ—পাথরের তৈরী, তিনি জাগ্রত—আর জাগ্রত হচ্ছেন জগা কাঠ মানে পুরীধামের জগন্নাথ দেব, তিনি ত কাঠের তৈরী ! পাগ্‌লার চৌদ্দ মানে হচ্ছে শিবচতুর্দ্দশী—পাগ্‌লীর আট হচ্ছে দুর্গাষ্টমী। এগুলো হচ্ছে খাঁটি উপোস—আর সবই ভুটভাট মানে বাজে।"

হরিচরণ হাস্‌লেন—"দত্তমশাই, শকরী ফর্‌ফরায়তে ! প্রথায় এ্যাঙ্গো মেলালেন ত ! যাগ্‌গে গল্পটা বলুন।"

নিবারণ দত্তর গলায় জোর আছে, তিনি বল্লেন—"তবুও গল্প বল্‌ছেন আপনি এটাকে ?"

—"আচ্ছা সত্যিটাই শুনি—আমার আবার সব কিছুই গল্প মনে হয় কি না—কথকতা করার এই দোষ !"

নিবারণ বল্লেন—"আপনার যদি নরকে স্থান হয় তাহলেও বুঝবেন এই সতীর পুণ্যবলে হবে। ভগবানের পরিহাস জগন্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ! ..যাক্‌, অবান্তর বাদ

দিয়ে বলি, বৌমা বেশ মন দিয়ে শোনো। তা সেই বছরে ছেলেটির আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক শিবচতুর্দ্দশীর মেলাতে বদ্যিনাথ যাচ্ছিল—অনেক হাতে পায়ে ধ'রে ও তাদের সঙ্গ নিল। পথে সঙ্গীদের ত নাকালের একশেষ—ওর চীৎকার আর ছটফটানীর হিড়িকে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল। তবু কেউ বিশেষ নারাজ হল না, কি জানি বাবা বৈদ্যনাথ যদি অপরাধ নেন। তবে মনে মনে সবাই বললে, একবার ওকে মন্দিরে জমা দিতে পারলে আর ওর দায় কেউ নেবে না—তখন ত ও বাবার দায়িত্বে পড়ল কি না।...যা হোক করে বৈদ্যনাথ দর্শন হ'ল। ছেলেটি ধর্ণা দিল। তিন দিন তিন রাত্রি সেই একভাবে পড়ে থাকবার পর স্বপ্ন পেল, তুই ঘোর পাপী। তোর রোগ ভোগের লয় হবে কি করে? তুই যে গত জন্মে তোর জন্মদাতা জনক পিতাকে পদাঘাত করেছিলি। বুড়ো বাপকে একটা ছোট্ট অপরাধে পদাঘাত করেছিলি—তাই আজ তোর এই শাস্তি। মনে পড়ে? বৃদ্ধ তখন খেতে বসেছিল—আর।...বুঝলেন মশাই, এই পর্য্যন্ত বলেই ছোক্‌রা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল। আমি ত মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। হাটের মধ্যখানে সে এক পেল্লায় ভিড়—সবাই বলে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে।' এদিকে মুখে মুখে খবরটা ত তর্করত্ন মশাই-এর কানে উঠ্‌লো। তিনিও হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হয়েছেন তৎক্ষণে। বল্‌ব কি চাটুয্যে মশাই—যেই না তর্করত্ন এসে পৌঁছেছেন, অম্‌নি ছোক্‌রা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে লুটোপুটি।—আর কান্না, 'বাবা, আমায় মাপ করো বাবা, তুমি আমাকে চরণে আশ্রয় দাও—নইলে—।' আমি ত অবাক, সে কক্ষণো এর আগে তর্করত্নকে চোখেই ভাখেনি। তা ছাড়া আমরা ত জানি তর্করত্নের কোনো সন্তান নেই—অবাক কাণ্ড।"

মনোরমা আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বললে—"ও চিন্‌তে পেরেছে বুঝি—উনিই ওর পূর্ব্বজন্মের পিতা।"

—"এ্যাই—এতক্ষণে তুমি ঠিক ধরেছ বৌমা। ছেলেটি বল্‌লে—'আমি আজ চৌদ্দ দিনের পথ আসছি খোঁজ ক'রে ক'রে, স্বপ্নে পেয়েছি শুধু...টেঁয়া গঙ্গনীপুর—কেবলরাম তর্করত্ন! তুই যা তাঁর সেবা কর, তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন।' আমি জান কবুল করেছি, আমার সঙ্গীরা ত ফেলে পালিয়েছে পথে। আমার ত প্রাণের মায়া নেই, মরেছি না মরতে আছি। এ জন্মের শেষটুকু দেখতে চাই। তা বাবা, তোমাকে যখন দেখেই চিনেছি, তখন ভগবান আমায় রক্ষা করবেনই।"

—"তারপর কী হ'ল?"

—"তারপর কেবলরাম তর্করত্ন মশাই তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালেন। অবাক ভাখো কাণ্ডখানা—ছেলেটি একেবারে তালগাছের মত সোজা দাঁড়িয়ে পরল—যেন মন্ত্রের বলে ওর রোগ আদ্ধেক কমে গিয়েছে। ও বল্‌লে, 'আঃ কতদিন এমন সোজা হয়ে দাঁড়াইনি যে!' কথাটা শুনে কেবলরামের চোখে জল এল।"

মনোরমা গাঢ় স্বরে বল্‌লে—"তা ত আসবেই—আহা বাপের প্রাণ ত।"

নিবারণ দিগ্বিজয়ীর দৃষ্টিতে একবার হরিচরণের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করলেন।

হরিচরণ প্রশ্ন করলেন—"তারপর কী হল?"

—"তারপর সেই ছেলে তর্করত্নের সংসারে প্রায় মাসাবধিকাল রইল। তর্করত্নের অভাবের সংসার, তিনি কোনো রকমে পণ্ডিতী ক'রে স্কুলে পনেরোটি টাকা বেতন পান—তবু কী আর করেন, খুব কষ্ট করেই তাকে রেখেছিলেন। তাঁর গৃহিণীর দাপটেই শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি টিকতে পারল না, গৃহিণী তারও পূর্ব্ব জন্মের সৎ-মা। ছেলেটি তাই বলত। যাই হোক, সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল—একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। তার যেন কোনো রোগই কোনো দিন ছিল না এমন তাজা হয়ে উঠল সাত দিনের মধ্যে। সে-মানুষই নয় সে। বিদায় নেবার সময় সে খুব কেঁদেছিল।"

হরিচরণ বল্‌লেন—"অতএব অত্র ইহাই উপপাদ্য—মানে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এখন এক কাপ চা খাবেন দত্ত মশাই?"

দত্ত মশাই মহাউৎসাহে বল্‌লেন—"বিলক্ষণ! চা খাবো না—সে কী হয়!"

চায়ের পর্ব্ব চুকলে পরে নিবারণ দত্ত উঠবার জন্ত ভূমিকা করলেন—"বেলা কত হ'ল? দশ হবে?"

হরিচরণ বল্লেন—"মশাই, দশটা কেন এগারোটা বাজলেই বা কী! আপনি ত বাড়া ভাতে হাত দেবেন। আমি কি আপনাকে অম্নিই চা খাইয়েছি নাকি?"

একটু অপ্রতিভ ভাবে নিবারণ দত্ত বল্লেন—"তবে?"

—"এখন গ্যাঁট হয়ে বসুন। অনেক কথা—"

নিবারণ দত্ত তর্কের জন্ত প্রস্তুত হ'তে লাগ্লেন মনে মনে। মুখে শুধু বল্লেন—"ও—এখনও বুঝি বিশ্বাস হয়নি!"

হরিচরণ হেসে জবাব দিলেন—"আরে মশাই, বিশ্বাস না করে উপায় আছে? এযে একেবারে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! সেই জন্তেই ত বল্‌ছি—আপনি আমার কয়েকটি কথার জবাব দিন!"

—"বলুন, যদি পারি ত নিশ্চয় উত্তর দেবো।"

—"আচ্ছা, কেবলরাম তর্করত্নের রং খুব ফর্সা নয় কী? মাথায় টাক আছে?"

নিবারণ দত্ত লাফিয়ে উঠলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ফর্সা মশাই, আর টাক ছাড়া মাথাই নেই তাঁর। সবটাই ত টাক!"

—"আচ্ছা, সে সময়ে তাঁর বেতন আপনি যা বল্লেন ঠিক তাই ছিল? না, কিছু বেশি?"

—"বেশিও হতে পারে—আমার ঠিক জানা নেই। এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন ত!"

—"বল্‌ছি, সব বল্‌ছি। আপনার এটা বানানো গল্প নয় তা বেশ বুঝতে পারছি কিনা।"

—"নিশ্চয় নয়। তা হলে এখন বলুন পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করেন।"

—"থামুন মশাই, আমি আরও বলে যাই—আচ্ছা সেই ছেলেটির নাম রামস্বরূপ চাটুয্যে না?"

—"আশ্চর্য্য আপনি দেখছি সবই জানেন। নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না—বল্লুব .ক, ছেলেটিকে আমার ভারী ভালো লেগেছিল—আর ওখানে ত কাজের চাপ ছিল না তেমন, তাই তর্করত্ন মশাই-এর বাড়িতে খুব দাবা খেল্‌তে যেতাম।"

হরিচরণ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন—"ছেলেটির কাছে আপনি হরদম 'হেরে' যেতেন না?" সাধারণতঃ হরিচরণ খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তাঁকে এমন দিল-খোলা হাসি হাসতে দেখে মনোরমা একটু বেশী অবাক হয়ে গেল।

নিবারণ দত্ত বিস্ময়ের আতিশয্যে হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

হরিচরণ বললেন—"না, না, বার বার চাল ফেরৎ হয় না দত্ত কাকা! এ বারেও আপনি হারলেন!"

নিবারণ দত্ত এবারে হরিচরণের হাত চেপে ধরলেন—"আর বলতে হবে না—এবারে বুঝেছি। আশ্চর্য্য মানুষ ত—এতদিন এখানে আছো পাশাপাশি, অথচ ধরা দাও নি ত' বাবা। তুমিই তা হলে।"

মনোরমা দিশাহারার মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে।

—"শুনুন মশাই, আমার নাম রামস্বরূপ নয় কোনো দিনই!"

—"তবে ওটা সেই পূর্ব্বজন্মের নাম! স্বপ্নে জানা গিয়েছিল?"

—"আপনাদের যেমন কাণ্ড! আমার যে তখন ও-ই পেশা।"

—"কি পেশা?"

—"দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল—কিন্তু পকেট সব সময় ফক্কা হয়েই থাকত! তা ওই এক এক জায়গায় এক একটা ভাওতা দিয়ে চালিয়ে দিতাম। সে বলতে গেলে আমার এই জীবনে অমন গোটা তিরিশেক জন্ম পালটেছে। কথায় কথায় নামধাম সব বদলাতে পারতাম, ছেলে বেলা থেকে বহুরূপীর কাজেই হ'ত পাকিয়েছি কি না!"

—"কি রকম?"

—"অত শোনবার সময় একদিনে হবে না। সে এক-মহাভারতের ব্যাপার—তার চেয়ে আপনি যে

জন্মের চেহারা দেখেছেন তার খবরটা ভালো ক'রে শুনে নিন—চশমার কাজ করবে তাতে।"

—"তা হলে আপনার ওটা সর্ব্বৈব বুজরুকী নাকি! স্বপ্নাদেশ—দৈববাণী—সব বানানো?"

—"দুনিয়াতে ত সবই বুজরুকী। বাঃ, আপনি এবারে যেন বুঝতে পারবেন বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার! আরে মশাই যাচ্ছিলাম মুর্শিদাবাদ—পুরনো শহরের চেহারা দেখবার খুব শখ। তা পর পর কয়েকদিন হেঁটে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ইচ্ছে হ'ল কয়েকটা দিন বিশ্রাম ক'রে যাই। গজনীপুরের মাইল তিনেক দূরের শড়ক দিয়ে চলেছি—গুটি কয়েক ছেলের সঙ্গ পেলাম। তারা ইস্কুলে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যেই গল্প করছিল, 'কেবল পণ্ডিতের' কথা—তাঁর মত মানুষ নাকি দু'টি হয় না। কোন একটি ছেলে মহা অপরাধ করেছিল, হেড্ মাষ্টার তাকে সাস্‌পেণ্ড করবেন সব ঠিকঠাক। এমন সময়ে কেবলরাম বাধা দিয়ে সব ওলটপালট করে দিয়েছেন। ছেলেরা বলাবলি করছিল—'এর জন্ত হেড মাষ্টার মশাই-এর কাছে তর্করত্ন পণ্ডিতেরও বাক্যগালা পোয়াতে হয়েছিল, তিনি বলে দিয়েছেন—নিজের ছেলে নেই বলে পরের ছেলেদের এমন অন্ধস্নেহ দিয়ে সর্ব্বনাশ করা কি ঠিক! ছিঃ, ওরা যে বিগড়ে যাবে। ব্যস, আমার মাথায় তখন চার্চ্চিলের চেয়েও কড়া পাঁচ ঘুর-পাক খায়। বুঝলেন মশাই—কেবলরাম পণ্ডিত পরের ছেলেকে স্নেহ করে! আর যায় কোথায়? অমনি ঠিক হয়ে গেল—গাঁয়ের কাছাকাছি এসেই সেজে গেলাম অম্লশূলেররোগী—কেবরবি বর। তারপর ত সবই জানেন; বুঝলেন ত মশাই, জন্মান্তর কত সস্তার মামলা। ওটা হচ্ছে আমার উনত্রিংশৎ জন্ম।"

নিবারণ দত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"আপনি ত মশাই সাংঘাতিক লোক।"

"আমাকে কি আর এমন সাংঘাতিক দেখছেন—তার চেয়েও সাংঘাতিক মানুষ নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়। তা, কেবল পণ্ডিত সত্যিই আমাকে স্নেহ করতেন। বলব কি মশাই, তার সেই জাঁহাবাজ গিন্নীর কি বাক্যবাণ ভদ্রলোক মুখ বুজে সইতেন আর হাসতেন। গিন্নী ত বলতেন, ভীমরতি হল ত এই বয়েসে, বুড়ো হলে যে আর খুঁজেই পাবো না। বলি কোথা থেকে একটা জোচ্চোরকে ডেকে এনে পুষছো। কোন দিন যে সব চক্ষুদান করবে ওই হতভাগা।' তার জবাবে কেবল কি কি বলতেন জানেন—'আহা একটু আস্তে বলো, বেচারী শুনলে বড় আঘাত পাবে। আর সত্যিই ও তেমন ছেলে নয়; আমরা ছেলে চরিয়ে খাই বুঝলে না—এক আঁচড়ে মানুষ চিনি।'—গিন্নীর বুদ্ধির কিন্তু খুব ধার—সে বেটি কথায় কথায় বলত—'আহা পুষ্যিপুত্তুর! আমার মুণ্ডু—পুষ্যিপুত্তুর হ'লেও বা ছিল, এ আবার গত জন্মের সম্বন্ধ টানে! কি জানি কোন্ দিন গত জন্মের ইস্তিরী এসে হিস্‌সা খারিজ ক'রে বসে! উঃ, কী কাণ্ড! অম্বলের ব্যামো না ছাই—ফুর-ফুরে চেহারা কেমন বাবুটি সেজে ঘুরে বেড়াতে পারে—দু'বেলা চার থালা ভাত হজম করে, ওর নাকি সাত বছরের রোগ!"

মনোরমা হেসে ফেলল—"উঃ কী সাংঘাতিক কথা! তুমি সব সহ্য করতে?"

—"আর কি করব? তাতেও কিছু হ'ত না—কি জানি কেমন ক'রে পণ্ডিত বুঝতে পেরে গেল। একদিন আমাকে ডেকে বললে—'ভাখো বাবাজী! এখন বলতে নেই ঈশ্বর ইচ্ছায় তুমি রোগমুক্ত হয়েছ। তোমার শরীর বেশ কর্ম্মঠ হয়েছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আজকাল আমি ভালোই আছি বাবা।' তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—'আমি তোমার পিতা না হই পিতৃতুল্য বটে—তা একটা কথা বলব মনে করছি—' আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—'বলুন! আদেশ করুন।' তিনি বললেন—'ভাখো বাবাজী, আমরা গরীব গৃহস্থ মানুষ! তুমি এখানে থেকে আমাদের বড়ই আনন্দ দিয়েছ। তা ভাখো বাবাজী, গঙ্গা পার হয়ে সাড়ে এগারো ক্রোশ উত্তর উজনীপুর গ্রাম আছে—সে বড় সুন্দর জায়গা। সেখানে দ্বিজনাথ সমাদ্দার আছেন—তিনি খুব সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করবেন। পারছেন না কেবলমাত্র শিষ্য-সেবকদের জন্ত। সেই গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ হচ্ছেন

দ্বিজপদ—জমিজমারও অভাব নেই। ঠাকুর-সেবার নিত্য ব্যবস্থা—সবই ভালো। এখন তিনি আমাকে ধরেছেন যাবার জন্য। তা বাবাজী, আমার এই ইস্কুলের চাঁদের হাট ছেড়ে যাওয়া ত সম্ভব নয়—সেই জন্য মনস্থ করেছি তোমাকেই সেখানে পাঠাবো। বিবেচনা করে ছাখো, একটা অমন দেবসেবার সুযোগ—আর বলব কি গ্রামের মানুষগুলির কি সরল বিশ্বাস। তোমার জীবনে জীবিকার চিন্তা থাকবে না—সবই তাঁর কৃপা, তিনিই মিলিয়ে দিয়েছেন ত।'

মনোরমা এবারে সকলরবে বলে উঠল—"ও মা গো, তোমার পেটে পেটে এত ছিল। তবে যে তুমি আমার বাবাকে বলেছিলে উজনীপুরের পঞ্চানন্দ ঠাকুর তোমাকে স্বপ্নাদেশ করেছেন। তা এ ছ্যাচড়াপনা করবার দরকার কি ছিল?"

হরিচরণ রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন—"ছ্যাচড়ামী আর করতে পারলাম কই। গজনীপুরের পরই ত তোমার বাবা দ্বিজপদ সমাদ্দার মশাই-এর কাছে গেলাম স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে।"

—"তা আবার মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিল—এমনিতেই ত বাবা লোক খুঁজছিলেন। তার ওপর ওই যে তর্করত্ন মশাই—ওঁকে ত বাবা শ্রদ্ধা করতেন।"

—"তোমার কেবলরামকে মনে পড়ে?"

—"না, তা অবিশ্যি মনে পড়ে না, অনেক পণ্ডিত ত আসতেন বাবার কাছে। আর আমার তখন বয়েসই বা কত? বাবা যখন তীর্থে গেলেন তখন আমি বছর আটেকের হবো।"

"আরে সেইখানেই ত বুড়ো আমায় মেরে দিয়ে গেল। বুড়ো বললে, 'বাবা পঞ্চানন্দের নামে তোমার হাতে সব তুলে দিয়ে গেলাম বাবা; মনুটাকে একটু দেখো। বয়স হ'লে ওকে পাত্রস্থ ক'র। তুমিই বা কে আমিই বা কে—তিনিই ওর ব্যবস্থা করবেন, যাঁর ওপর জগৎসংসারের ভার, তিনি ওর কথাও শুনতে পারেন।' উঃ কী সাংঘাতিক শোনাই শুনেছিলেন। আমার ইচ্ছে ছিল, এই ছ'চার মাস গুছিয়ে নিয়ে তারপর ওই পঞ্চানন্দের ওপর মনুর ভারটা দিয়ে নিশ্চিন্দি হবো। তা বুঝলেন দত্ত মশাই—এমন তোখোর মেয়ে, ও আমার পুজোর ভুল ধরবে আমার রান্নার খুঁত ধরবে। এক এক সময় আয়সা জালাতন করত, ইচ্ছে হ'ত ঠাস ক'রে গালে চড়িয়ে দিই।"

মনোরমা কৃত্রিম কোপে কণ্ঠস্বর বিকৃত ক'রে বললে, —"আহা বড্ডই খাতির করতেন উনি। মনে নেই, একদিন সেই বস্তার মধ্যে ক'রে চালান ক'রে দেবে বলে মস্ত বড় একটা ধানের বস্তা এনে হাজির ক'রে ছিলে—উঃ সেদিন কী ভয়ই পেয়েছিলাম।"

নিবারণ দত্ত প্রশ্ন করলেন—"তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নি? —হ্যাঁ, তিনিই ত মাথা হয়ে আমাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। আমি আর গোপন করতে পারিনি—ওঁকে আদ্যন্ত সব বলেছিলাম। সব শুনে উনি হেসেছিলেন—ও'র সেই স্বভাবসিদ্ধ নির্মল হাসি দিয়ে যেন আমার মনের সব মালিন্য ঘুচিয়ে দিয়ে বলে ছিলেন —'ছাখো বাবাজী,আমাকে তুমি না বললেই বিস্মিত হ'তাম। কারণ আমার মন বলেছিল, এ ছেলে কখনও অন্যায় পথে থাকতে পারে না। তুমি যে অভিনয় করছ তা আমি প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর বুঝে ছিলাম যে, তোমার মা বাবা সংসারে থাকলে সত্যিই অমন স্নেহের কাঙাল হয়ে ফিরতে পারতে না—একটা অভিমানের জ্বালা তোমাকে সব সময় অশান্ত ক'রে রাখত। তা ত নয়, তোমার মনে আসলে স্নেহের পিপাসা ছিল প্রবল, সেই জন্যই অতগভীর তোমার অভিনয়-পটুত্ব—তুমি সেই হাটের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের নাম ক'রেছিলে ছ'চার বার, কিন্তু গজনীপুরে থাকাকালীন ত ভুলেও মা-বাবার নাম করো নি। যাকগে, আমি যে বুঝিনি তা নয়—তবে তোমার স্বভাবে একটা মায়া কেড়ে নেবার শক্তি আছে—তা আমার গৃহিণীও স্বীকার করেছিলেন। এ ভালোই হ'ল, ছল ক'রে যে দেবতার দোহাই দিয়েছ তিনি সত্যিই তোমার ওপর সুপ্রসন্ন। সে সব কথা আমি কাউকে বলিনি—কি হবে ব'লে? আশীর্বাদ করি সুখে দেবসেবা করো।' এর পর তিনি সোনাযোড়া শাঁখা মনোরমার হাতে পরিয়ে দিয়ে গেলেন। আহা আজও আমার কেবলরামের

কথা মনে হয়—সত্যি যদি তিনি আমার পিতা হ'তেন।" ব'লে হরিচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন।

নিবারণ দত্ত বল্লেন—"এ যে রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার মশাই।"

—"আর বলবেন না মশাই। ওই উজনীপুর গ্রাম একেবারে দৈত্যপুরীর মত হয়ে উঠেছিল। আমি যদি বলি একটু বেড়াতে যাই—অমনি মনু নাচতে লাগল, 'আমি যাবো।' শিষ্যদের দু চার জন ছেলেছোকরা প্রায় সব সময় আশপাশে আগলেই আছে। পালাই এমন পথ পাই না।"

এখন ত ওসব কথা বলা সোজা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা যে রোজগার হ'ত ওই দৈত্য পুরীতে তা বলো। আজও সেই টাকার দৌলতেই বসে বসে খাচ্ছ, তা কি ভাবো একবার।

—"সে টাকা কার? দস্তুর মত ব্যবসায় করেছি গোটা যুদ্ধটা—ধান চাল, মিলিটারী মহলে তরকারী চালান দিয়েছি, তবে না—পারত তোমার পঞ্চানন্দ ঠাকুর অত টাকা দিতে?"

"—খুব যে, বলি ব্যবসার মূলধনটা পেলে কোথায় শুনি। কে দিয়েছিল?"

—"ওটা সম্পূর্ণ নিজস্ব। বিয়েতে যৌতুক পেলে কি সেটা আর কারও সম্পত্তি থাকে?"

"—বলি সে ত আমারই দৌলতে। আর আমি—!"

—থাকগে ও নিয়ে ঝগড়া ক'রে কি লাভ চাটুয্যে মশাই—এখন উঠি, অনেক বেলা হ'ল।"

"—আচ্ছা, অনেক বাজে বকলাম। এখন সে সব দিনের কথা মনে পড়লে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মনে হয় সেইসব দিনগুলো ত আর ফিরবে না, আহা বেশ ছিলাম। সত্যি, যুক্তিতর্ক বাদ দিলেও আমার কী মনে হয় জানেন দত্ত ম'শাই—মানুষের একটা জীবনেই বার বার জন্মান্তর ঘটে।"

মনোরমা ঝাঁঝালো স্বুরে বলে উঠল—"বলি ওই সবই হবে, এতটুকু বালি ক'রে রেখে, তাও মন লাগে না। উঃ মা গো!"

নিবারণ দত্ত উঠে চলে গেলেন। তিনি হঠাৎ কেমন মৌন হয়ে পড়েছেন যেন, বিদায় সম্ভাষণও করতে ভুলে গেলেন—অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছেন তিনি।

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে রান্নার খুপ্‌ড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। মনোরমার আত্মাভিমান আহত হয়েছে তা ওর কথা থেকেই বুঝতে পারা গেল—"বলি, দিন-দিন কি হচ্ছো শুনি,—"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল হরিচরণ। তার মন সেই আঠারো উনিশ বছর আগেকার শান্ত নিবিড় গ্রামের মধুর পরিবেশের এক ঝলক সৌরভের আভাষ যেন আবিষ্কার করেছে। সে তাতেই বিভোর।

মনোরমার কণ্ঠ কেমন বে-সুরো শোনায়—"পাড়ার লোক ডেকে নিজের ঘরের কেচ্ছা না গাইলে কি ভাত হজম হচ্ছিল না? বুড়ো বয়েসে এইসব কেলেঙ্কারী রটলে মুখ খুব উজ্জ্বল হবে?"

হরিচরণের মনে হয় মনোরমা হয়ত লঘু তিরস্কার করছে—এটা গ্রাহ্য করতে নেই। জীবনে যে কিছুই গ্রাহ্য করে নি, সে এত অল্প কথায় বিচলিত হয় না। তাই ও কথার পরেও হরিচরণ বললেন—"চল্ না মনি একবার উজ্‌নীপুর যাই—খোকাকে নিয়ে। বেশ মজা হবে। ওখানকার কত কথাই আজ মনে পড়ছে—সেই যে, আমি বলেছিলাম, তোর জন্যে পাত্তর দেখ্‌তে যাবো—তা তুই কি বলেছিলি মনে পড়ে?"

—"না, পড়ে না, যাও—বুড়ো বয়েসে ঢঙ!"

—"ওই, দত্ত ম'শাই ঠিকই বলেছেন—জন্মান্তরবাদ! আমার কিন্তু মনে আছে স্পষ্ট। তুই বলেছিলি, যাও না, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। লোকে বলবে তুমি আমায় খুন করেছ! বেশ হবে, তোমার হাতে দড়ি পড়বে।"

মনোরমা দুম্-দুম্ শব্দ ক'রে ধরণীতল বিকম্পিত ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়ল গিয়ে। শঙ্কিত কণ্ঠে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করলেন কাছে এসে—"কী গো আবার জ্বর আসছে না কি? দেখি!"

মনোরমা কোনো জবাব দিল না—হরিচরণ গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলেন—"কই না ত—গা দেখছি পাথর! কী হ'য়েছে, অমন ক'রে এসে শুয়ে রইলে যে,

একটু গা-হাত-পা মুছে নাও—বালি হ'তে আর কতক্ষণ লাগবে। বেলা হয়ে গেছে অনেক।”

“তোমাকে বারণ ক'রে দিয়েছি না—তুমি উজনীপুরের নাম মুখে আনবে না। সেখানকার ঠাকুরদেবতা জমি-জেরাত সব ভাসিয়ে দিয়ে এলে—পই-পই ক'রে ব'লেছিলাম, ওগো এমন ক'রে শেকড় কেটে দিয়ো না, পরে পস্তাতে হবে।...এখন কেমন লাগছে। কোন মুখে সেখানে যাবে শুনি।”

“বেশ তাই হবে, এখন ওঠো। উজনীপুর না-হয় নাই গেলে। এখন এ-সময়ে শুয়ে থেকো না।”

“বেশ করব, থাকব—তুমি কেন ওই লোকটাকে তোমার এইসব কথা বলতে গেলে—ছি-ছি, কী বলবে বলো তো। ও এখন এইসব রটিয়ে বেড়াবে তা জানো।”

হরিচরণ হেসে উঠলেন আপন মনে—“জানো মনু—ও লোকটিকে আমার না ব'লে উপায় ছিল না। ওকে যে আমি চিনি সেটাই জানিয়ে দিলাম। ও টের পেয়ে গিয়েছে, আর এ-মুখো ছুঁচ বেচতে আসবে না। উঃ, কী মারাত্মক হ'তে পারে একটা মানুষ।—”

“কেন, কেন?”

“সব কথাই কি মুখে মুখে হয়—তুমি কি কোনোদিন মুখ ফুটে ব'লেছিলে যে আমাকে মানে আমার মত বুড়োকে ভালো বাসবে? তবু ত—।”

—“যাও তোমার সব তাতেই ওই এক কথা। হ্যাঁ গো, বলো না দত্ত মশায়ের কথাটা।”

—“আমার অমন স্বভাব নয়, ঘরের কথা পরকে বলি বলেই পরের কথাটা ঘুরে রটিয়ে দেবো, তেমন মেয়েলি স্বভাব আমার নয়।”

—“রাখো তোমার ঢঙ—বলো।”

—“শুনবেই নেহাৎ। দেখো, কাল যেন এই গল্প আবার অন্যের মুখ থেকে শুনতে না হয়।”

—“আচ্ছা হয়েছে, আমি বুঝি পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়াই, যে, কথা হজম হবে না। বলো, উঃ—”

—“ওই যে বললাম, দত্তকাকা আবার চাল ফেরৎ নিলেন, তা হবে না।—আসলে ওঁর সঙ্গে তর্করত্ন গিন্নীর আসনাই ছিল—আমি থাকাতে সে সব বড্ড অসুবিধে হ'ত। তর্করত্ন মশাই দেবতুল্য মানুষ ত, উনি ও সব বুঝতেন না। আমি কিন্তু পর পর কয়েকবার দত্ত মশাইকে বাড়ির বাগানে অসময়ে যাতায়াত করতে দেখেছি—সাবধান করেও ছিলাম। সেই রাগেই ত গিন্নী আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। যাক, সেসব আমি আসবার সময় তর্করত্নকে জানিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তিনি স্নেহান্ধ, গৃহিণীকেও খুবই ভালোবাসতেন। কাজেই জানিয়ে ফলের মধ্যে হ'ল এই যে, দত্তর সঙ্গে তর্করত্ন গৃহিণী উধাও হলেন। তর্করত্ন একলা পড়ে গেলেন। বিয়ের সময় আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, আসুন, আমার কাছে এসে থাকুন—তা হেসে বলেছিলেন, কে কার বোঝা বইবে বাবা। এ আমার পাওনা ছিল। তুমি বলেছ এই আমার সান্ত্বনা।”

—“ও মা কী সর্ব্বনাশ! ওই হতভাগা দত্তর পেটে পেটে এত। এদিকে ত মুখে খুব ইহলোক পরলোক—ছি-ছি-ছি! তারপর? খুব কেলেঙ্কারী হল ত।”

—“তার পরের কথা কি করে বলি। শুনি ত এখানে এসে যে, ইনি দত্তর দ্বিতীয়পক্ষ। যাক গে, পরের কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই। ও সব ভুলে যাও—”

—“হ্যাঃ, ভুলে যাবে, এবারে ওই হতভাগা এমুখো হলে হয়—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। তাই বলি, কথায় কথায় বৌমা-বৌমা করে কেন গলে যান। এখনও রস আছে বুড়োর। দাঁড়াও না, ওর ঋণশোধ বাকী আছে—মুড়ো ঝ্যাঁটা দিয়ে শোধ করব। মানুষের বাইরে দেখলে চেনবার উপায় নেই, কেমন ভিজে বেড়ালটি।”

হরিচরণ মনোরমাকে শান্ত করবার জন্ত সাদরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—“কী কাজ পরের কথায়—ভুলে যাও মনু।”

—“না, না, এই করে ওরা আস্পর্দ্ধা পায় তা জানো? ইস্ একটু যদি কথাটা আগে বলতে—তা হলে বুড়োর সাত জন্মের চক্কর ঘুরিয়ে ছাড়তাম। তুমি বড্ড ইয়ে—”

হরিচরণ বললেন—এবারে বালি আনি, তুমি ওঠো।”

নিরুক্ত

ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তত্র চতুষ্ট্বং নোপপদ্যতে ॥ ১ ॥

অযুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানামিতরেতরোপদেশঃ ॥ ২ ॥

শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ ॥ ৩ ॥

তত্র (তাহা হইলে অর্থাৎ বচন ইন্দ্রিয় নিত্য হইলে) চতুষ্ট্বং (নাম আখ্যাত উপসর্গ ও নিপাত—শব্দের এই চারিপ্রকার বিভাগ) ন উপপদ্যতে (সঙ্গত হয় না) ১। বা (আর) অযুগপৎ (ভিন্ন ভিন্ন কালে) উৎপন্নানাং শব্দানাং (উৎপন্ন শব্দের মধ্যে) ইতরেতরোপদেশঃ (পরস্পর গুণপ্রধান ভাবে নির্দ্দেশ) [ন উপপদ্যতে] (সঙ্গত হয় না) ২। চ (এবং) শাস্ত্রকৃতঃ (শাস্ত্রবিহিত) যোগঃ (শব্দের পরস্পর সংযোগ) [ন উপপদ্যতে] (সঙ্গত হয় না) ৩।

আচার্য্য উদুম্বরায়ণের মতে বচন (বাক্য পদ বা বর্ণ) ইন্দ্রিয় নিত্য অর্থাৎ অনিত্য, ইহা বলা হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তিনটী দোষের আশঙ্কা সমুপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, নাম আখ্যাত উপসর্গ ও নিপাত ভেদে শব্দের চারিপ্রকার বিভাগ উৎপন্ন হয় না। তাহার কারণ, সমকালে অবস্থিত পরস্পরাপেক্ষ অনেক বস্তু সম্বন্ধেই দ্বিত্বাদি সংখ্যার প্রবৃত্তি হইতে পারে। শব্দ বা পদ এক একটি উচ্চারিত হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় দুইটী শব্দ বা পদ একই সময়ে অবস্থান করে না, কাজেই পরস্পর অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব তাহাদের সম্বন্ধে দ্বিত্বাদি সংখ্যার অর্থাৎ শব্দ বা পদ দুইপ্রকার তিনপ্রকার বা চারিপ্রকার এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বচন শব্দের 'বাক্য' অর্থ গ্রহণ করিলেও এই অনুপপত্তি দুষ্পরিহার হয়। কারণ, বাক্য বাগিন্দ্রিয় হইতে প্রচ্যুত হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়; বাক্যের অবয়বভূত যে পদ তাহা যে বিনাশশীল (উৎপত্তির পরক্ষণেই) তৎসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ২ যে পদটী এখনই উচ্চারিত হইল সেই পদটীকে অবিনষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইলেও যে পদটী পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়াছে তাহাকে বিনষ্ট বলিয়া ধরিতেই হইবে। বিনষ্ট এবং অবিনষ্টের সহপরিসংখ্যান বা একত্র গণনা অযৌক্তিক।৩

বচন শব্দের 'বর্ণ' অর্থ গ্রহণ করিলেও অনুপপত্তির সমাধান হয় না। বর্ণ সমূহের সমবায়ে পদ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিচার করিতে গেলে বর্ণসমূহের সমবায় বা একত্র সংঘটন সম্ভব নহে। কারণ, একটী বর্ণ যেই উচ্চারণ করিলাম তাহা নষ্ট হইয়া গেল, দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে প্রথম উচ্চারিত বর্ণের অবস্থিতি নাই। কাজেই দুইটী বর্ণেরও সমকালে অবস্থিতি না থাকায় পদভাবই সিদ্ধ হয় না; অসিদ্ধ বস্তুর বিভাগ কল্পনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ১ দ্বিতীয়তঃ, বচনের ইন্দ্রিয়

১। কৃতকত্বোচ্চারিত প্রধ্বংসিতাৎ ন কালান্তরমবতিষ্ঠতে। অতঃ শব্দানাং নাস্তি যৌগপদ্যম্। যুগপদবস্থিতাদেকার্থবিবয়া চতুষ্ট্ব সংখ্যা পরস্পরাপেক্ষে নৈকস্মিন্ বস্তুনি (অনেকেষু বস্তুষু) দ্বিত্বাদি সংখ্যানাং সর্ব্বাসাং প্রবৃত্তেঃ। অতঃ চত্বারি পদজাতানি ইতি বহুক্তং পদচতুষ্ট্বং তন্নোপপদ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বাক্যং সমস্তমুক্তুতং তদিন্দ্রিয়েনাবতিষ্ঠতে, যদবয়বভূতানি পদান্যবস্থিতানি পরিসংখ্যাতুম্ (দুঃ)।

৩। ন চ বিনষ্টাবিনষ্টপদয়োঃ সহপরিসংখ্যানমস্তি (দুঃ)।

১। মহাভাষ্যে ও দেখিতে পাই—'নহি বর্ণানাং পৌর্ব্বাপর্যমস্তি। কিংকারণম্? একবর্ণবৃত্তিত্বাদ্ বাচঃ, উচ্চারিত প্রধ্বংসিতত্বাচ্চ বর্ণানাম্। একৈকবর্ণবর্ত্তিনী বাগ্, ন দ্বৌ যুগপদুচ্চারয়তি। গৌরিতি গকারে যাবদ্ বাগ্ বর্ত্ততে নৌকারে ন বিসর্জ্জনীয়ে। যাবদৌকারে ন গকারে ন বিসর্জ্জনীয়ে। যাবদ্ বিসর্জ্জনীয়ে ন গৌকারে নৌকারে। উচ্চারিত প্রধ্বংসিতত্বাৎ। উচ্চরিত প্রধ্বংসিতাঃ খল্বপি বর্ণাঃ। উচ্চরিতঃ প্রধ্বস্তঃ, অথাপরঃ প্রযুজ্যতে। ন বর্ণো বর্ণস্য সহায়ঃ।

নিত্যতা নিবন্ধন পদ সমূহ অযুগপৎ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন-কালে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর প্রধান অপ্রধান ভাবে যে নির্দ্দেশ তাহাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। নাম সাধন, আখ্যাত সাধ্য, সাধ্য সাধনের মধ্যে সাধ্যেরই প্রাধান্য ইহা বলা হইয়াছে ১।১১। বাক্যের অবয়বভূত পদ সমূহ এককালে উৎপন্ন হয় না, পূর্ব্বে যে পদটী উচ্চারিত হইয়াছে, তৎপরে উচ্চারিত পদের অপেক্ষায় তাহা বিনষ্ট। যদি নাম পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং আখ্যাত পরে উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পরস্পরের তুলনায় নাম বিনষ্ট আখ্যাত অবিনষ্ট; এইরূপে, যদি আখ্যাত পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং নাম পরে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরস্পরের তুলনায় আখ্যাত বিনষ্ট, নাম অবিনষ্ট। কাজেই নামের অপেক্ষায় আখ্যাতের প্রাধান্য এবং আখ্যাতের অপেক্ষায় নামের অপ্রাধান্য এইরূপে উক্তি সঙ্গত হয় না—বিনষ্ট ও অবিনষ্টের মধ্যে প্রধান অপ্রধান ভাবের কল্পনা যুক্তি বিরুদ্ধ।১ তৃতীয়তঃ, বচন ইন্দ্রিয়নিত্য হইলে ব্যাকরণ-শাস্ত্র বিহিত সংযোগ (যেমন, ধাতুর সহিত উপসর্গের, প্রত্যয়ের সহিত ধাতুর) সিদ্ধ হয় না। কারণ, সংযোগ হইতে হইলে দুইটী বস্তু থাকা চাই—ব্যাকরণে উপসর্গ ও ধাতু, ধাতু ও প্রত্যয়, নাম ও প্রত্যয় পরস্পর সংযুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে অযুগপৎ উচ্চারিত ইহাদের মধ্যে একটী বিনষ্ট এবং অন্যটী অপেক্ষাকৃত অবিনষ্ট; বিনষ্ট ও অবিনষ্টের সংযোগ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?২

অনুবাদ—তাহা হইলে শব্দের চতুষ্টয়ত্ব সঙ্গত হয় না (১)। আর অযুগপদুৎপন্ন শব্দ সমূহের প্রধান অপ্রধান ভাব [সঙ্গত হয় না] (২) এবং শাস্ত্র বিহিত সংযোগ [সঙ্গত হয় না] (৩)।

১। ন হি বিনষ্টং নাম গুণভাবমিয়াদ্যাখ্যাতে, নাপি নষ্টমাখ্যাতং প্রধানভাবমিয়ান্নাম্নি। নহি বিনষ্টাবিনষ্টয়োরিতরেতর গুণপ্রধানভাবোঽস্তি (দুঃ)।

২। অযুগপদুৎপন্নো হি সত্যাং ধাতুরুচ্চারিতো বিনষ্টঃ, স কথমুপসর্গেণ যোক্ষ্যতে প্রত্যয়েন বা। নহি বিনষ্টাবিনষ্টয়োর্যোগো ঽস্তি (দুঃ)

পূর্ব্বোক্ত তিনটী সূত্রই পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করে বলিতেছেন—

ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য ॥ ৪ ॥

তু (কিন্তু) শব্দস্য (শব্দের) ব্যাপ্তিমত্ত্বাৎ (ব্যাপ্তি-বিশিষ্টতা নিবন্ধন) [এতৎ সর্ব্বম্ উপপদ্যতে] (এই সমস্তই উপপন্ন হয়)।

সূত্রে 'তু' শব্দটী পূর্ব্বপক্ষনিরাস সূচনা করিতেছে। এই সূত্রটীর তাৎপর্য এই যে—শব্দ ব্যাপ্তিমান্, শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্বই ১—৩ সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে তাহার নিরাস বা খণ্ডন করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে 'শব্দ ব্যাপ্তিমান্' ইহার অর্থ কি এবং শব্দ ব্যাপ্তিমান্ হইলে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হয় কিরূপে? একটু অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হইবে যে 'ইহা শব্দ' 'এই শব্দের এই অর্থ'—ইহা মানুষের বুদ্ধিস্থ। মানুষ যখন কোন ও একটী শব্দ উচ্চারণ করে তখন তাহার বুদ্ধিতে থাকে 'আমি এই শব্দের দ্বারা এই অর্থের প্রতীতি করাইতে চাই'। শ্রোতার ও বুদ্ধিতে থাকে 'ইহা শব্দ' এবং 'এই শব্দের এই অর্থ'। অন্য কথায় বলিতে গেলে শব্দ বক্তা ও শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং তন্নিবন্ধনই শ্রোতার বুদ্ধিগম্য হয় যে বক্তা যাহা উচ্চারণ করিয়াছে তাহা একটী অর্থবোধক শব্দ এবং তাহার এই অর্থ। বক্তারও শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে বলিয়াই শব্দ ব্যাপ্তিমান্। ঈদৃশ ব্যাপ্তিমত্তার অভাবে শব্দের উচ্চারণ ও অর্থবোধ সম্ভবপর হইত না। যাহা অনবস্থিত বা অস্থায়ী তাহা ব্যাপ্ত করিতে শ্রোতার বুদ্ধিস্থ নাম আখ্যাত প্রভৃতি পারে না। ফল কথা এই যে শব্দ উচ্চারণের পরক্ষণেই শব্দের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া বিনষ্ট হইলেও সংস্কার রূপে বুদ্ধিতে বর্ত্তমানে থাকে এবং তাহার স্মৃতি সম্ভব হয় এবং এই স্মৃতিপূর্ব্বকই পরিসংখ্যান বা শব্দের চারি প্রকার বিভাগ গণনা হইয়া থাকে। বিনষ্টা-বিনষ্টের সহপরিসংখ্যান বা একত্র গণনা সঙ্গত নহে এই আপত্তি ও বিচারসহ নহে। কারণ, যাহা বলা হইয়াছে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, মূর্ত্তিমান্ বা স্থূল শব্দ যাহার অভিব্যক্তি হয় তাহাই নষ্ট হইয়া থাকে শব্দের আকৃতি

অর্থাৎ যন্নিবন্ধন শব্দের শব্দত্ব ১ তাহা নষ্ট হয় না, বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকে। মুখ্যতঃ সহপরিসংখ্যান হয় এই বুদ্ধ্যবস্থ শব্দের এবং তাহা আরোপিত হয় স্থুল বা অভিব্যক্ত (উচ্চারিত) শব্দে।

শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্ব রূপ হেতুদ্বারাই আখ্যাত ও নামের মধ্যে পরস্পর প্রধান অপ্রধান ভাবের উক্তি এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র বিহিত সংযোগসিদ্ধি যে অযৌক্তিক তাহার (তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রোক্ত আপত্তিদ্বয়ের) খণ্ডন হইতেছে। শব্দ মানুষের বুদ্ধিব্যাপ্ত অর্থাৎ বুদ্ধি শব্দের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। প্রধান অপ্রধান ভাব মুখ্যতঃ স্থুল বা অভিব্যক্ত আখ্যাত রূপ শব্দ ও নাম রূপ শব্দের মধ্যে থাকে না, থাকে আখ্যাত রূপ বুদ্ধি ও নাম রূপ বুদ্ধির মধ্যে, কিন্তু তাহা আরোপিত হয় স্থুল বা অভিব্যক্ত (উচ্চারিত) আখ্যাতরূপ ও নামরূপ শব্দের মধ্যে। এইরূপ, ব্যাকরণ শাস্ত্র বিহিত সংযোগ ও মুখ্যতঃ হয় বুদ্ধিব্যাপ্ত বা বুদ্ধিরূপে আকারিত উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে, বুদ্ধিব্যাপ্ত বা বুদ্ধি রূপে আকারিত ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে কিন্তু তাহা আরোপিত হয় স্থুল বা অভিব্যক্ত (উচ্চারিত) উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে এবং স্থুল বা অভিব্যক্ত (উচ্চারিত) ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে। [ক্রমশঃ

১। আকৃতি র্জাতিলিঙ্গাখ্যা (ন্যাঃ দঃ ২।২।৬৮।

পৌষ-পার্ব্বণ

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহাসুখভোগ॥

... ...

মেয়েদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি বাঁধে॥

কত থাকে তার কাঁচা কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার॥

বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্র কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

শীতে সরু খালের মতো স্তিমিত হ'য়ে আসে নবগঙ্গা, বর্ষায় আবার ক্ষেপে ওঠে প্রচণ্ড বেগে, কুলপ্লাবি স্রোতের শব্দ জাগে তখন কলকলনাদে।

কামার, কুমোর, চাষি-মজুর, মধ্যবিত্ত আর মাঝিমাল্লার বর্দ্ধিষ্ণু মহকুমা। বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে তার নবগঙ্গা। গঙ্গার নব সংস্করণ নয়, নামের মধ্যে তবু একটা স্বাজাত্য আছে। বঙ্গ-বিভাগে আজ এখানে এসেছে ইস্‌লামী জোয়ার, অবিভক্ত বঙ্গে একদিন পাশাপাশি জাগ্‌তো এখানে শঙ্খ ঘণ্টা আর আজানের ধ্বনি। ত্রিশ বছর আগে আর পরে: ইতিহাসের কি নির্ম্মম হাসিই না চোখে ভাসে! সেদিন মুসলমান চাষি আর 'কেরায়া'র মাঝির সাথে মধ্যবিত্ত হিন্দুর আত্মীয়তা ছিল অন্তরের, সামাজিক সম্বন্ধে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছিল বিরাট একটা যৌথ-পরিবারের মতই পরস্পর ঘনিষ্ঠ। সকালের রোদ বিকেলে যেতো, এ-বাড়ীর মানুষ যেয়ে আসর জমাতো ও-বাড়ীতে। প্রীতি ছিল, সৌহার্দ্দ্য ছিল, ছিল তেম্‌নি কাঙালপনাও। স্কুল-আদালতে মহকুমা হ'লেও চক্ মিলানো গ্রামের মতই তখন মাগুরা। ওপারের মানুষ এসে সওদা ক'রে নেয় এপার থেকে, এপারের মানুষ গিয়ে বীজ বুনে আসে ওপারের চষা ক্ষেতে। তার মধ্যেই সুখ-দুঃখ, তার মধ্যেই আশা-আনন্দ, তার মধ্যেই রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তেম্‌নি অন্তরের তিক্ততা আর বৈলক্ষণ্য।

তার মধ্যেই সঞ্চারিত হ'লো একদিন তিনটি পরিবারের ত্রয়ী সাধনার ক্ষেত্র। কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে, রসিকলাল আর মিঃ মল্লিক।

কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে আজ বেঁচে নেই, বারো বছরের একমাত্র ছেলে বিজনকে নিয়ে সংসারে আজ বেঁচে আছেন তাঁর বিধবা স্ত্রী নির্ম্মলা। রসিকলাল মাগুরা-কোর্টেই ওকালতি করেন। মেয়ে সবিতা, বাচ্চা দু'টি ছেলে মিণ্টু আর জিতু, দূর সম্পর্কের মৃত ভাই অমিয় মাধবের কন্যা ছন্দা আর অতিরিক্ত রকমের মুখরা স্ত্রী অঞ্জনা: রসিকলালের সংসার ব'ল্‌তে এই ক'টি প্রাণী। স্ত্রী অতিরিক্ত রকমের মুখরা হ'লেও বিশেষ শান্ত প্রকৃতির মানুষ রসিকলাল। অন্দরের আবহাওয়ায় বিষিয়ে উঠে সম্প্রতি এসে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি বাইরের ঘরে। দিনের বৃহত্তর অংশটা কেটে যায় আইনের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে, বাকী সময়টুকু কাটে নিজেকে নিয়ে মজা নদীর মতো। ততক্ষণে সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে চীৎকার ক'রে আকাশ মাথায় ক'রে নেন অঞ্জনা। মিণ্টু ভূমিষ্ঠ হবার পর নাকি কি একটা বড় অসুখে তাঁকে শয্যাশায়ী থাক্‌তে হয়েছিল কিছুকাল, মেজাজটা বিগ্‌ড়ে গেছে সেই থেকেই। নইলে রসিকলাল নিজেও জানেন—মিণ্টু পেটে আস্‌বার আগে পর্য্যন্ত সুরটা এমন উদারা থেকে তারায় ওঠেনি অঞ্জনার। স্ত্রীর স্বভাবকে আজ অদৃষ্টের বিবর্ত্তনের সঙ্গেই বাধ্য হ'য়ে স্বীকার ক'রে নিতে হ'য়েছে রসিকলালকে। মাঝে মাঝে এক একবার নিজেকে তুলনা ক'রতে যান তিনি মিঃ মল্লিকের সাথে, কিন্তু তুলনায় প্রতিযোগিতায় অবধারিত রূপেই হার স্বীকার ক'রে নিতে হয় তাঁকে। ব'নেদী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গতি-সম্পন্ন মানুষ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ মল্লিক নামেই এখানে তিনি সমধিক খ্যাত।

মহকুমার এই পরিবেশে খানিকটা খাপছাড়া জীবন। কী একটা সূত্রে একদিন আসেন তিনি এ অঞ্চলে, সেই থেকে বছর কয়েক ধ'রে আছেন। স্ত্রী আর বছর ন'দশ বয়সের মেয়ে রেবাকে নিয়ে বাংলোর মতো বেঁধে আছেন তিনি সংসারটি। নাগরিক সভ্যতার আলোয় মার্জ্জিত চেহারা; শিক্ষিত রুচি আর শালীনতা বোধের ঐতিহ্য লক্ষ্যে পড়ে আচারে, কথায় আর চোখের দৃষ্টিতে। একেশ্বরবাদী শান্তিপ্রিয় জীবন। গোড়া হিন্দু-শাস্ত্রের পুতুল পূজোর আসারতা নিয়ে ইতিমধ্যে একদিন তিনি বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিলেন রসিকলালের আইনের যুক্তিকে। তাই ব'লে অন্তরের সম্প্রীতিটা আইনের খাতা ঘেঁষে চলেনি। মাঝে মাঝে সান্ধ্যবৈঠকে সেটুকু বরং ঘনিষ্ঠ হ'য়েই ওঠে।

অধস্তন পুরুষে নেমে এসে দেখা যায়—ছন্দার বয়সের সঙ্গে রেবার বয়সের মিলটা দূরের নয়, বরং এ ওর ঠিক উল্টো পিঠ। তাদের খেলাঘরের জীবনে মাঝে মাঝে এসে অতিরিক্ত রকমের অভিভাবকত্ব প্রকাশ ক'রে বসে বিজন। জ্যামিতিক ত্রিভুজের মতো কণ্ঠ-সংলগ্ন তারা পরস্পর। খেলাঘরের তিনটি নির্ম্মল শুচিশুদ্ধ জীবন। দিন ক্রমে এগিয়ে চলে, খেলাঘরের রূপও তেম্‌নি একটু একটু ক'রে পাল্টাতে থাকে তাদের। মাঝে মাঝে একাকিত্বের মুহূর্তগুলো অন্ধকার রাত্রির মতো কালো হ'য়ে আসে ছন্দার কাছে। ভাবতে বসে তখন সে নিজেকে নিয়ে, ভাবতে বসে বিজন আর রেবার দিকে লক্ষ্য ক'রেই। জীবনে তাদের ব্যথা লুকোবার যায়গা আছে, স্নেহ কেড়ে নেবার মানুষ আছে, কিন্তু ছন্দার? দূর সম্পর্কের মুখরা কাকিমার সংসারে মানুষ হ'য়ে আপনার ব'লতে সে কাউকে পায়নি। যেখানে স্নেহ কুড়োবার যায়গা, ফাঁক থেকে গেছে সেইখানেই। কাকা রসিকলাল ইচ্ছে থাক্‌লেও কাছে ডেকে নেবার ভরসা পান না বড় একটা। ভয় আছে কাকিমাকে, চোখে পড়লেই চেঁচিয়ে উঠবেন তিনি: 'ছেন্না দেখ, নিজের ছেলেমেয়েগুলো সেই কখন্ থেকে ক্ষিদেয় গলা কাটাচ্ছে, এদিকে ভাই-ঝিকে নিয়ে ব'সেছেন তিনি আদিখ্যেতা দেখাতে। তবু তো এমন কিছু আপ্‌না' ভাইয়ের সম্পর্ক নয়, তেমন হ'লে না জানি তবে কি হ'তো!' এমন কথা শুধু একদিন কেন, ব'লে ব'সে কতদিনই তো গলা ফাটিয়েছেন অঞ্জনা। কাকিমার সেই রুদ্র ভয়াল মূর্ত্তি কিশোর-মনে গাঁথা র'য়ে গেছে ছন্দার। কাকা রসিকলাল সেই থেকে যথাসম্ভব ঔদাসীন্য রক্ষা ক'রেই বাইরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।—এসব কথা মনে হ'লে অশ্রু রোধ ক'রতে পারে না ছন্দা। বিজনের জীবনে এ দুঃখের ইতিহাস নেই, এমন ক'রে আড়ালে ব'সে অশ্রু মুছে নিতে হয় না রেবাকে। স্নেহাঞ্চলে সুখের নীড় রচনা ক'রে আছে তারা। তাদের অদৃষ্টকে কল্পনা ক'রে হিংসা হয় না, মনে হয়—শান্তির কি সুন্দর উদাহরণ!

খেলাঘরের দিনগুলো এমনি ক'রেই সুখের বসন্তে দুঃখের ঝটিকা হ'য়ে উড়ে যায়। নিজের দিকে লক্ষ্য ক'রে এক একবার সেদিকে দৃষ্টি তুলে ধরে ছন্দা।

দুই

সেদিন কি একটা উপলক্ষে যেন দুপুরেই ছুটি হ'য়ে গেল বিজনদের প্রাইমারী স্কুল। বই খাতা নিয়ে ঘরে ফিরলো বিজন। ততক্ষণে নিজের শয্যায় শুয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠলেন নির্ম্মলা। বল্‌লেন, 'এরই মধ্যে বুঝি ছুটি হ'য়ে গেল আজ! রান্নাঘরে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে দেয়ে এসে অঙ্ক বই আর খাতা নিয়ে ব'স্।'

কথা শুনে মনে মনে কিছুটা দ'মে গেল বিজন। আজ বিকেলে তাদের হকি-টুর্ণামেন্ট। অথচ তার নিজের হকি নেই। এটা কম দুঃখের কথা নয় তার পক্ষে। ছন্দাদের পেয়ারা গাছের ডাল থেকে বাঁকা দেখে একটা ডাল কেটে নিয়ে আসতে পারলেই তা দিয়ে আপাতত একটা হকি ব'নিয়ে নিতে পারবে সে: উদ্দেশ্যটা হ'চ্ছে এই। অথচ মা'র আদেশ কঠিন খড়্গের মতো অকস্মাৎ উদ্যত হ'য়ে উঠেছে। কথামতো অঙ্ক বই আর খাতা নিয়ে এসে না ব'সলে মার খাওয়াটা অবধারিত। রান্নাঘর থেকে খাবার খেয়ে এসে একান্ত সুবোধ বালকের মতই তা'ই খুলে ব'সলো সে অঙ্ক বই আর খাতা। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে আঁকিবুঁকি করলো খাতায়, কিন্তু মন বসতে চাইল না কিছুতেই। সারা ব্রহ্মতালুতে খুরপাক

খাচ্ছে তার হকি-টুর্ণামেন্ট। নিজের হকি নেই—এ দুঃখ সে কাকে বোঝাবে?

পার্শ্বপরিবর্ত্তন করলেন একবার নির্ম্মলা। ঘুমের ঘোর তখনও ভালো ক'রে কাটেনি। গাঢ় নিদ্রায় আবার দু' চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলো। ঘুমিয়ে পড়লেন নির্ম্মলা।

তাঁর নাসিকা গর্জ্জনের আভাষ পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার স্থির হ'য়ে বস্‌লো বিজন। খুসিতে খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠলো এবারে সে। বিজন জানে—মা'র যেমন আজগুবি ঘুম, তেম্‌নি একবার ঘুমোলে সহজে সে-ঘুম ভাঙবার নয়। খোলা প'ড়ে রইল অঙ্ক বই আর খাতা, এক্ সময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর পা টিপে টিপে ধারালো হাত দা'খানি হাতে নিয়ে সোজা সে বেরিয়ে পড়লো রসিকলালের বাড়ীর দিকে।

রসিকলাল তখন কোর্টে। অঞ্জনা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরের মেঝেয় পাটি বিছিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমন্তপুরীর একমাত্র প্রহরী ছন্দা। একা একা ভালো লাগছিল না ঘরের মধ্যে বসে থাক্‌তে। বাইরের দাওয়ায় ব'সে তাই অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিল ছন্দা। বিজনকে আসতে দেখে এবারে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা গেল তার মধ্যে। কিছুটা সাম্‌নে এগিয়ে এসে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'দা নিয়ে কোথায় যাচ্ছো বিজুদা?'

ভারিক্কি কণ্ঠে বিজন বল্‌লো, 'যাচ্ছিনে কোথাও, স্কুলের মাঠে আমাদের আজ হকি-ম্যাচ্ আছে, তোদের পেয়ারা গাছ থেকে একটা বাঁকা ডাল কেটে নেবো, তাই এসেছি।'

স্বাভাবিক কৌতুহল নিয়েই ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হকি খেল্‌বে, তা ডাল দিয়ে কি ক'রবে?'

—'মেয়ে মানুষের অত দিয়ে দরকার কি, ও তুই বুঝবি নে।' থেমে বিজন বল্‌লো, 'কি ক'রবো, তা পরেই দেখতে পাবি; আয়, নিচে দাঁড়াবি তুই।'

বুকখানি সহসা একবার আতঙ্কে দুর্-দুর্ ক'রে উঠ্‌লো ছন্দার। ব'ল্‌লো, 'শব্দ শুনে কাকিমা যদি হঠাৎ জেগে ওঠেন, তবে যে আর রক্ষা থাক্‌বে না বিজুদা!'

'নে, জ্যাঠামি রাখ্, রক্ষা থাক্‌বে না আর কিছু!' স্পষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের সুর মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো বিজনের কণ্ঠে: 'ভারী তো কাকীমা, তার আবার ভয়! আয়, নীচে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিবি তুই, আমি নির্ব্বিবাদে কাজ হাঁসিল ক'রে চ'লে যাবো।'

ভয়ে কাঁপ্‌ছে বুকখানি দুর্-দুর্ ক'রে, তবু কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই নীরবে অনুসরণ ক'রলো ছন্দা বিজনকে।

নির্ব্বিবাদে খুসী মত ডাল কেটে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এলো বিজন। বাসায় ফির্‌বার পথে ছন্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে ব'লে এলো সে: 'খবরদার, ঘুনাক্ষরেও যেন তোর কাকীমার কানে না ওঠে ব্যাপারটা, তবে মেরে কিন্তু একেবারে হাড় গুড়িয়ে দেবো।'

ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে শুধু চেয়ে রইল ছন্দা বিজনের মুখের দিকে. উত্তরে একটি কথাও ব'ল্‌তে পারলো না।

বাসায় এসে সেই বাঁকা ডাল দিয়ে মনের মতো ক'রে হকি বানিয়ে আবার কিছুক্ষণের জন্য এসে বই-খাতা নিয়ে ব'স্‌লো বিজন। কিন্তু আঁক কষা আর হ'লো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলার নিদ্রা ভেঙে গেল, জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'ক'টা অঙ্ক কষ্‌লি বিজু?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে এবারে বাধ্য হ'য়েই কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'লো বিজনকে, ব'ল্‌লো, 'ক'টা আবার ক'ষ্‌বো, একটা নিয়েই যে এতক্ষণ কাট্‌লো। কিছুতেই এসে যোগফলে মিল্‌ছে না!'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বেশ তো, ওটা না হয় পরে মাষ্টার ম'শাইর কাছ থেকেই বুঝে নিবি; ততক্ষণে আর পাঁচটা ক'ষ্।'

বাইরে বেলা ক্রমে প'ড়ে আস্‌ছিল। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধ'রছিল না বিজনের। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় আব্দারের সুর তুলে ব'রলো সে মা'র কাছে, 'এবারে কিন্তু আমি খেল্‌তে যাবো মা, আমাদের আজ একটা ভীষণ ম্যাচ খেলা আছে। দেরী ক'রে গেলে ওদিকে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

আপত্তি ক'রলেন না নির্ম্মলা। কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে সংসার থেকে চ'লে যাবার পর হ'তে বিজনের সকল আব্দার নির্ব্বিবাদে মেনে এসেছেন তিনি। বিজন ছাড়া সংসারে 'আসক্তি বল্‌তে আজ আর তাঁর কি আছে?

ছেলেকে তাই শাসন করেন তিনি যতটুকু, স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখেন তার অধিক। এ স্নেহের কাছে কোনো যুক্তি নেই, কোনো বিচার নেই।

বই-খাতা বুজিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিল বিজন। পায়ে সাদা কিড্‌স্‌, হাঁটু থেকে কোমর অবধি খাঁকি পেন্টুলান, গায়ে হাতাকাটা জামা : পাকা খেলোয়ারের পোষাক। সন্ত তৈরী করা নতুন হকিখানি হাতে দোলাতে দোলাতে খেলার মাঠের দিকে বেরিয়ে প'ড়লো বিজন।

সুরু হ'লো খেলা। হঠাৎ বিপক্ষ দলের কার হাতের একখানি হকি এসে সজোরে আঘাত ক'রলো বিজনের ডান পায়ের হাঁটুতে। যন্ত্রণা চেপে রাখ্‌তে না পেরে সহসা ব'সে প'ড়ে কাত্‌রাতে সুরু ক'রলো সে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্ত নয়। এ ভাবে ব'সে থাকা ভীরুতার লক্ষণ। তেমন ভীরুতা প্রকাশ ক'রতে রাজি নয় বিজন। সাম্‌নেই বল পেয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে আবার সে সুরু ক'রলো হকির কৌশল দেখিয়ে যথানিয়মে দৌড়োতে। ব্যথায় টন্ টন্ ক'রছে হাঁটুটা, মনে হ'চ্চে—পা থেকে আল্‌গা হ'য়ে খ'সে প'ড়েছে হাঁটুর বাটিটা। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। বল নিয়ে অনবরত আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হ'য়ে উঠেছে সে বিপক্ষ দলের গোল-পোষ্টের দিকে।

শেষ পর্য্যন্ত একটা আশ্চর্য্য রকমের স্কোর। দু'মিনিট মাত্র বাকী রেফারীর ঘড়িতে। একটু বাদেই বাজবে খেলা-সমাপ্তির হুইসিল। দর্শকদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ফেটে পড়ছে মাঠের মধ্যে। এমনি সময়ে হঠাৎ গোলটা হয়ে গেল। এ্যাঙ্গল্‌-সট্ গোল, স্কোরটা করলো বিজনই। হাঁটুর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে পারলো সে এতক্ষণে।

হিপ্‌-হিপ্‌-হুর্‌রা ধ্বনিতে সহসা আকাশ বিদীর্ণ হয়ে উঠলো। রূপোর মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরলো বিজনদের দল। পাশ থেকে কে একজন সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলো, 'চোট্‌টা খুব বেশী লাগেনি তো তোর পায়ে?'

—'ওটুকু চোটে কি হয়, দিলাম তো শেষ পর্য্যন্ত স্কোরটা ক'রে!'—উত্তর দিতে গিয়ে আত্ম-কৃতিত্বের গর্ব্বটুকু চেপে যেতে পারলো না বিজন।

কিন্তু যত তাচ্ছিল্য ক'রেই আঘাতের মাত্রাটাকে লঘু ক'রে দিতে চেষ্টা করুক্ না সে সহপাঠিদের কাছে, রাত্রে কিন্তু ততোধিক গুরুতর যন্ত্রনায় অস্থির হ'য়ে প'ড়লো বিজন। হাঁটুটা দেখতে দেখতে অনেকখানি ফুলে উঠেছে। ব'সে ব'সে গরম জলের সেক দিয়ে দিলেন নির্ম্মলা। বল্‌লেন, 'দস্যি ছেলে, খেল্‌তে গিয়ে যে হাঁটু ফুইয়ে এলি, এরপর স্কুলে যাবি কি ক'রে?'

যন্ত্রণার মধ্যেও কেমন যেন খানিকটা খুসীর আভাষ খেলে গেল এবারে বিজনের কণ্ঠে। বল্‌লো, 'তা ঠিক যেতে পারবো, দেখে নিও তুমি। স্কোর ক'রেছি, স্কুলে কে কি বলে, শুনবো না মা?'

—'এই আনন্দেই থাকো, হতচ্ছাড়া কোথাকার।' ব'লে কিছুটা স্নেহের তিরস্কার ক'রলেন নির্ম্মলা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যথাটা আর বড় বেশী বোধ হ'লো না পায়ে। এপাশে ওপাশে নানা দিকে পাখানিকে ঘুরিয়ে দেখলো বিজন, নাঃ, মা'র স্নেহের হাতের গুণই আলাদা।

ইতিমধ্যে ওপাশের বাখাড়ীর বেড়া ডিঙিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো রেবা আর ছন্দা। কাল রাত্রেই তারা বিজনদের মেডেল জেতার খবর পেয়েছিল। সেই থেকে ঔৎসুক্যে ভ'রে আছে সারা মন। বাখাড়ীর বেড়া ডিঙিয়ে আস্‌তে গিয়ে বিজনের পদচালনার ব্যাপারটা তাদের চোখে পড়েছিল। বল্‌লো, 'ও কি বিজুদা, ডন-কুস্তি করছো নাকি?'

মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ ক'রেই এবারে স্থির হ'য়ে বস্‌লো বিজন। অপ্রস্তুত হ'তে সে রাজি নয় কোনো ক্রমেই। বল্‌লো, 'মেয়েমানুষের বুদ্ধি, এভাবে কেউ বুঝি ডন-কুস্তি করে? যা জানিস্‌নে, তা নিয়ে এমন ক'রে কথা বল্‌তে আসিস্ কেন?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'তা না হয় না-ই জান্‌লাম, কিন্তু কি খাওয়াচ্ছো বলো?'

—'মানে?'

—'বাঃ রে, মানে আবার কি, মেডেল জিত্‌লে, খাওয়াবে না?'

—'আচ্ছা তো বোকা দেখছি।' চোখ-মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে বিজন বললো, 'মেডেল কি আমি একা জিতেছি যে খাওয়াবো।'

জেরা ক'রলো এবারে রেবা : 'একাই জেতো আর দোকলাই জেতো, জিতেছ তো! আগে খাওয়া চাই, তারপর অন্য কথা।'

—'বাঃ রে, বেশ মানুষ তো!'

দু'পা সামনে এসে দাঁড়ালো এবারে ছন্দা, বললো, 'বেশ মানুষ ছাড়া কি, মনে আছে কালকের কথা বিজুদা? না খাওয়ালে কালকের কথা কিন্তু একেবারে ফাঁস ক'রে দেবো।'

মৃদু হাসির সঙ্গে কৃত্রিম ক্রোধ মিশিয়ে এবারে খানিকটা তেড়ে উঠ্‌লো বিজন ছন্দার উপর : 'তবে আর একগাছাও চুল থাকবে না তোর মাথায়, জানিস তো?'

ঈষৎ ঠোঁট উল্টিয়ে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'ঈষ, ধ'রেই দেখ না, মজা দেখিয়ে দেবো।'

ইতিমধ্যে নির্ম্মলা এসে সামনে দাঁড়ালেন।

বিজনের যত ক্রোধ এবারে বাঁকা চোখের চাপা হাসির মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

নির্ম্মলাই উপযাচক হয়ে এবারে সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনজনকে কাছে বসিয়ে বাটিতে বাটিতে ক'রে সাজিয়ে দিলেন তিনি টাট্‌কা মুড়ি আর পাটালী।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'লো বিজনের, একদৌড়ে গিয়ে সামনের ঘোষেদের দোকান থেকে ছোট একভাঁড় দই এনে ঢেলে দিল সে ছন্দা আর রেবার বাটিতে। তাই নিয়েই একটা মহোচ্ছবের হুলুস্থুল।

—'নে, আশ্ মিট্‌লো তো এখন।'

রেবা কিম্বা ছন্দার মুখে কিন্তু এবারে একটি কথাও প্রকাশ পেলো না।

মনে মনে নির্ম্মলা বুঝলেন, এ উপলক্ষ্যে অন্ততঃ ছেলের পায়ের ব্যথাটা ক'মেছে, নইলে এত সহজে দৌড়ে গিয়ে ঘোষেদের দোকান থেকে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ছুটে এসে এমন হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলা বিজুর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। ব'ল্‌লেন, 'নাও, এবারে ঘরে গিয়ে ব'সে তোমরা গল্প করো, আমি ততক্ষণে যায়গাটা পরিষ্কার ক'রে নিই।'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'আমরা থাক্‌তে আপনি কেন পরিষ্কার ক'রতে ব'সবেন মাসীমা।' নির্ম্মলাকে একরকম জোর ক'রেই সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতেই ছন্দা নিকো-বার কাজে লেগে গেল যায়গাটা।

এসব কাজে রেবা অভ্যস্ত নয়। অনভিজ্ঞতার চোখ নিয়েই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য ক'রতে লাগলো সে ছন্দার কাজটাকে। পরে এসে বল্‌লো, 'এতও পারিস তুই বাপ্।'

চঞ্চল চোখ দু'টোকে একবার তির্য্যকভাবে নিবদ্ধ ক'রলো ছন্দা রেবার মুখের দিকে, ভাবলো—জবাব দেবে না, কিন্তু না দিয়েও পারলো না, 'বল্‌লো, 'জীবনে তোর মতো আদর পেয়ে তো মানুষ হইনি, সংসারের কাজ-গুলো নিজের হাতে ক'রতে হয়; এটুকু তাই কিছু নয়।'

এবারে বাধ্য হ'য়েই থেমে যেতে হ'লো রেবাকে।

এর ঠিক দু'দিন বাদেই বিজন আর ছন্দার নিমন্ত্রণ হ'লো রেবাদের ঘরে। উপলক্ষ—তার পুতুলের বিয়ে। চিনেমাটির পুতুল নয়, সেলুলয়েডের বড় জল্-পুতুল। এই উপলক্ষে সামান্ত অঙ্কের বেশ কিছু খরচ হ'য়ে গেল মিসেস্ মল্লিকের। জোর ক'রে ঠেসে ঠেসে খাওয়ালো রেবা বিজন আর ছন্দাকে।

না পেরে শেষ পর্য্যন্ত হাত গুটিয়ে ব'স্‌লো ছন্দা। বিজন ব'ল্‌লো, 'আমাকে তোর জব্দ ক'রবার ইচ্ছে ছিল, তাই না রেবা?'

মুখ টিপে হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'কিছু একটা বেশী খেলেই বুঝি জব্দ হয় মানুষ! আমার এত ঘটা ক'রে পুতুল বিয়ের খাওয়া, নিজের হাতে সব ক'রে-কম্মে দিয়েছেন না, জব্দই যদি বলো, খেয়ে না হয় জব্দ একটু হ'লেই।'

কাছেই ব'সে ছিলেন মিসেস্ মল্লিক। তাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রেই আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না বিজন। কিন্তু মনে মনে খাবারের তারতম্যটা বড় বেশী বিঁধতে লাগ্‌লো তাকে। তার ঘরে মুড়ি, পাটালী আর দইয়ের অধিক

কিছু জোটাতে পারেনি সে, কিন্তু রেবার পুতুল বিয়েতে দইটা আনুসঙ্গিক মাত্র, তাকে আবৃত ক'রে আছে ক্ষিরপুলি, ছানাবড়া আর কাঁচা সন্দেশ। সংসারে অবস্থার তারতম্যটা হয়তো এম্‌নি ক'রেই ফুটে ওঠে চোখের উপর।

নবগঙ্গার পাড়ে গিয়ে নিজেকে নিয়ে যে কতক্ষণ ব'সে ব'সে কাটালো সে, ঠিক ব'ল্‌তে পারিনা। তারপর ঘরে এসে একসময় নীরবে শুয়ে প'ড়লো সে নিজের বিছানায়।

তিন

অবকাশ মতো মিসেস্ মল্লিক এসে ব'স্‌লেন সেদিন নির্ম্মলার সাম্‌নে। গল্পে গল্পে কাট্‌লো কিছুক্ষণ আনন্দে। বিজনের সাড়া না পেয়ে এক সময় মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বিজুকে যে দেখ্‌ছি না, খেল্‌তে বেরিয়েছে বুঝি?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ও কি ঘরে থাক্‌বার ছেলে, আছেই তো দিনরাত খেলা নিয়ে। সেদিন পা ফুলিয়ে এসে শুয়ে প'ড়লো, ভাব্‌লাম—তবু দু'দিন ঘরে থাক্‌বে। ও মা, ঘরে থাক্‌বে কি, রাত কাবার হ'তেই আবার তর্‌পানি শুরু হ'লো। এমন দস্যি ছেলেকে নিয়ে আর পারি না দিদি। বড় হ'য়ে যে ও কি ক'রবে, তাই ভাব্‌চি।'

মৃদু হেসে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বড়র কথা বড় হ'য়ে। এখনই সে ভাবনা কেন? ওদের ঐ দস্যিপনাটুকু আছে ব'লেই তো মেতে আছি ওদের সঙ্গে, নইলে সময়-টুকুও বুঝি আর কাট্‌তো না।'

উত্তর ক'রলেন না নির্ম্মলা।

থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বিজুর শুধু দস্যিপনাটাই দেখ্‌লেন, ওর লেখাপড়ার দিকটাও তো দেখ্‌বেন। প্রত্যেকবার ফার্ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌চে, সোনার টুক্‌রো ছেলে, এমন ছেলে ক'জনের হয় দিদি, ব'ল্‌তে পারেন?'

এবারও কিছু একটা উত্তর ক'রলেন না নির্ম্মলা। ছেলের প্রশংসায় মাতৃগর্ব্বে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ, তারপর মৃত স্বামীর উদ্দেশে মনে মনে একবার ব'ল্‌লেন, 'স্বর্গ থেকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো তোমার বিজুকে, ও যেন সত্যিই বড হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মুখ উজ্জ্বল ক'রতে পারে যেন দেশের।'

ইতিমধ্যে পিছনের খিড়কি দুয়োর দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো বিজন।

কৃত্রিম রাগত-কণ্ঠে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'দিনরাত বাইরে বাইরে কেবল টো টো ক'রে বেড়াবি, ওদিকে যে পরীক্ষার আর বাকী নেই দু'দিনও। শেষ পর্য্যন্ত কি ফেল করাটাই ইচ্ছে?'

কিছুক্ষণ শান্ত হ'য়ে দাঁড়ালো বিজন, ব'ল্‌লো, 'ফেল বুঝি কোনোদিন ক'রেছি, সব সময় তুমি শুধু পরীক্ষের খোঁটা দাও। দেখো—এবারও পাশ ক'রবো।'

এবারে আপ্‌নি থেকেই সুর নরম হ'য়ে এলো নির্ম্মলার, জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বলি, কোথা থেকে কাটিয়ে এলি এতক্ষণ, বল্‌ তো?'

'কোথায় আবার কাটাতে যাবো!' বিজন ব'ল্‌লো, 'খেলে ফির্‌ছিলাম ছন্দাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে, ডেকে ছন্দা ব'ল্‌লে—ডোমখুর আর বেতফল খাবে বিজুদা? আমিই বা ছাড়ি কেন, খেলাম, পকেটে পুরেও নিয়ে এলাম। এই ছাখো—'

পকেট থেকে এক মুঠো ডোমখুর আর বেতফল তুলে মা'র চোখের সামনে মেলে ধ'রলো বিজন, তারপর মিসেস্ মল্লিককে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌লো, 'খাবেন মাসীমা, খুব মিষ্টি।'

'না বাবা, মাত্র তো ঐ ক'টা অবশিষ্ট, ও তুমিই খাও।' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'রেবার আবার এসব দিকে একেবারেই ঝোঁক নেই, তার সব চাইতে প্রিয় খাদ্য পাকা খেঁজুর। কর্ত্তা তাই মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন বাজার থেকে।'

শুনে জিভে হয়ত একবার জল এলো বিজনের। ব'ল্‌লো, 'পাকা খেজুর তো, ও আমিও ভালোবাসি মাসী-মা। এবারে রেবাকে ব'লে দেবো, হাতে এলেই আমি যাতে দু'টো পাই।'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'লোভ বেড়ে যাচ্ছে বড্ড দিন দিন, তাই না? যাও, এবারে হাত-পা ধুয়ে প'ড়তে বসো গে, যাও।'

তিল মাত্র আর সেখানে না দাঁড়িয়ে এবারে সোজা এসে বিজন নিজের পড়ার জায়গায় ব'সে প'ড়লো ; ব'সে প'ড়লো বই নিয়ে নয়, অবশিষ্ট ভোমখুর আর বেতফল-গুলো নিয়ে। বেশ লাগছে একটা একটা ক'রে রসিয়ে রসিয়ে চিবোতে। টক আর মিষ্টিতে মিলে বেশ একটা অপূর্ব্ব রসাস্বাদন।...

কথাপ্রসঙ্গে একসময় খানিকটা দুঃখের ছায়া নেমে এলো ছন্দাকে নিয়ে। রেবা আর বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক সময়ই এ প্রসঙ্গ এসে পড়ে, আজও এলো।—ছন্দার উপর অঞ্জনার অহেতুক অত্যাচার দিনে দিনে ক্রমেই ভারী হ'য়ে উঠচে। অঞ্জনার নিজের মেয়ে সবিতাও ছন্দার বয়সী, পাটরাণীর মতো সেও এটা ওটা নিয়ে ফাই-ফরমাস করে ছন্দাকে, মাঝে মাঝেই মিথ্যে লাগিয়ে মার খাওয়ায় তাকে মায়ের হাতে। নিজের মেয়ে আর দূর সম্পর্কিত দেবরের মেয়ের মধ্যে পার্থক্য টেনে নিজের মধ্যে অনবরত জ্ব'লে ওঠেন অঞ্জনা। অনেক সময়েই রসিকলালের কান পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় না। অঞ্জনা জানেন—স্বামীর কাছে নিজের মেয়ের চাইতে ছন্দার আদরটা অনেকখানিই বেশী। এখানে আরও বেশী বিক্ষোভ অঞ্জনার। এই নিয়ে কথা শোনাতেও ছাড়েন না তিনি রসিকলালকে। অথচ রসিকলাল কিন্তু তাঁর বহির্ব্বাটিতে একেবারেই নীরব, নির্ব্বিকার। এসব কথা জানাজানি হ'য়ে গেছে বৈকি মিসেস মল্লিক আর নির্ম্মলার মধ্যে।

নির্ম্মলা বল্‌লেন, 'মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না, দুঃখে বুক ফেটে যায়। এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের কত সাধ-আহ্লাদ থাকে, সেদিক থেকে মেয়েটার যে কতবড় দুঃখের জীবন, তা ভাবতে পারি না দিদি।'

মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'মেয়ে মানুষও তেমনি বটে ওর কাকিমা। বলি, তুমিও তো ক'ছেলে-মেয়ের মা, মায়ের প্রাণে কি এতটুকুও বাজে না?'

—'তবে আর দুঃখ ছিল কি!' নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'অঞ্জনা কি মানুষ, পাথর—পাথর—একেবারেই পাথর, দিদি।'

যখন এ বাড়ীতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল অঞ্জনার, আনুপাতিক বয়সের হিসেবে সেই থেকে তাঁকে নাম ধ'রেই ডেকে এসেছেন নির্ম্মলা ; আজ যাতায়াতের পালা আপ্‌নি থেকেই একরকম শেষ হ'য়ে এসেছে। রুচিতে মেলে না ব'লে নির্ম্মলাও বড় একটা গা মাখান নি, মনের সঙ্গে মিশ খায়না ব'লে অঞ্জনাও ধীরে ধীরে আসা কমিয়ে দিয়েছেন। তাতে অঞ্জনা বেঁচেছেন কিনা বলা শক্ত, তবে মনে মনে নির্ম্মলা বর্ত্তে গেছেন অনেকখানি।

স্বল্পকাল থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সেদিন শুনলাম, সারাদিন খেতে দেয়নি ছন্দাকে। বিকেলে রেবার সঙ্গে এসেছিল খেলতে, কচি মুখখানি শুকিয়ে চুপ্‌সে গেছে। জিজ্ঞেস্ ক'রলাম—কি হ'য়েছে রে ছন্দা? ব'ললে—কাকিমা মেরেছে। পরে রেবার মুখ থেকে সব শুনতে পেলাম। একবাটি দুধ এনে মুখের সামনে তুলে ধ'রে ব'ল্‌লাম, এটুকু খেয়ে নে তো মা। লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা। ভাবি কি দিদি জানেন, অমন হাকসাঁইটে কাকিমার সংসারে এমন লজ্জা নিয়ে ক'দিন বাঁচবে মেয়েটা!'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'যে ক'দিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন সংসারে।'

ততক্ষণে বিজন বাংলা পাঠ্য খুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়তে সুরু ক'রে দিয়েছে। অভিনয়ের মতো একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠচে তার অপটু কণ্ঠের মধ্যে :

> 'ভগবানের অমোঘ নিয়মে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। তিনি সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, সংহার করিতেছেন। তিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। জীব-জগতের তিনিই জীবন দিয়াছেন, আবার ধ্বংস করিতেছেন। আপন লীলায় লীলাময় তিনি ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান।...'

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে চারদিক আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছিল। তার মাঝে নির্ম্মলা আর মিসেস্ মল্লিকের বেশ লাগছিল বিজনের পাঠ্য বিষয়ের সমুচ্চ উচ্চারণ। ভগবানের প্রতি অচল বিশ্বাসে দু'জনেরই হৃদয় পূর্ণ।

সন্ধ্যার এই স্তিমিত আভায় বিজনের উদাত্ত এই ঈশ্বর-উচ্চারণ তাই কেমন যেন খানিকটা মুগ্ধ আবেশে আবিষ্ট ক'রে তুল্‌ছিল তাঁদের। কথা রেখে অনেকক্ষণ ব'সে তাই দু'জনে নীরবে শুন্‌লেন, পরে একসময় বিদায় নিয়ে উঠে যেতে যেতে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'একটু আগে না ব'কছিলেন বিজুকে, কেমন সময়নিষ্ঠ দেখুন তো, তেম্‌নি কি চমৎকার উচ্চারণ-ভঙ্গী। দেখ্‌বেন—বিজু আপনার কত বড় হয় জীবনে।'

নির্মলা কিছু একটাও আর উত্তর ক'রলেন না, মনে মনে শুধু আর-একবার ব'ললেন, 'একথা যেন সত্য হয় ভগবান।' তারপর উঠে তুলসীমঞ্চ থেকে ঘুরে এসে সন্ধ্যা-আহ্নিকের যোগাড়ে ব'স্‌লেন।

এম্‌নি ক'রেই সময়ের কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছিল, নিঃশেষ হ'য়ে আস্‌ছিল দেয়ালপঞ্জীর দিনগুলো একটি একটি ক'রে।...

তখন বিজনদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হ'চ্ছে।

বিকেলের দিকে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে বুড়িগঙ্গা না কি একটা খেল্‌ছিল ছন্দা আর রেবা।

একসময় বিজন এসে ব'ল্‌লো, 'কাল খুব ভোরে ভোরে উঠে আমাকে দু'জনে তোরা দু'ছড়া মালা গেঁথে দিবি, মাষ্টারমশাইকে দেবো। ক্লাসের সবাই মালা নিয়ে আস্‌বে, আমি নিয়ে যেতে না পারলে কি মান থাক্‌বে!'

দু'হাত কোমরে রেখে গ্রীবা বেঁকিয়ে রেবা ব'ল্‌লো, 'ই-স্‌, কতবড় মানী ব্যক্তিটি, দেখি!'

বিজন দৃঢ়নেত্রে একবার তার মুখের দিকে তাকালো মাত্র, জবাব দিল না।

নীরবে ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানালো ছন্দা।

তারপর আবার সুরু হ'লো তাদের খেলা।

কিন্তু পরদিন সকালে উঠে রেবার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বিজন দেখ্‌লো—গাছের নীচে থেকে প্রচুর ফুল কুড়িয়ে ইতিমধ্যেই ছোট বড় চার পাঁচ ছড়া মালা গেঁথে ফেলেছে ছন্দা। একদিকে খুসীতে বুকখানি যেমন ভ'রে উঠছিল তার, অন্যদিকে মনের কোথায় যেন খানিকটা ব্যথাও অনুভব ক'রতে লাগলো সে। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'রেবা আসে নি বুঝি?'

—'এলে তো দেখ্‌তেই পেতে।' ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিল ছন্দা।

—'তা—তুই যে বড় এলি?'

—'এমন আসি তো রোজই।' ছন্দা ব'ল্‌লো, 'রোজ এম্‌নি সময়ে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে লক্ষীর আসন সাজাতে হয়।'

—'মালা তো আর গাঁথতে হয় না!'

—'সেটুকু না হয় আজ নতুন হ'লো, কিন্তু না গাঁথ্‌লেই ভালো ছিল, তাই না?'

খানিকটা বোকার মতো দৃষ্টিতে তাকালো এবারে বিজন: 'এ-কথা কেন ব'ল্‌লি ছন্দা?'

—'তুমি যে জিজ্ঞেস্‌ ক'রলে, এলাম কেন?'

—'অম্‌নি রাগ হ'লো বুঝি?' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তোরা মালা গেঁথে না দিলে কোথায় পাবো, বল্‌ তো? রেবাটার এমন বড়মানুষি গর্ব্ব কোথায় থাকে, দেখ্‌বো। ফুল কুড়িয়ে একটা মালা গেঁথে দিলে যেন ওর জাত যেতো, পাজিটা।' পরোক্ষে রেবার উপর খানিকটা তিরস্কার বর্ষণ ক'রে নিল বিজন।

ছন্দা এ-কথায় কিছু একটা প্রতিবাদও ক'রলো না, জবাবও দিল না। শুধু দু'পা কাছে এগিয়ে এসে সব চাইতে বড় মালা-ছড়াটি নিজের হাতে রেখে বাকী সব-গুলো বিজনের হাতে তুলে দিল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ওটা যে বড় দিলি নে?'

—'ই-স্‌, আহ্লাদ আর ধরে না, সবটাই দেখ্‌চি পাবার ইচ্ছে!' থেমে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'ভেবেছ, এটা বুঝি তোমার বুড়ো মাষ্টারের গলায় দেবার জন্যেই গেঁথেছি, আহা আবার সাধ যে!'

—'তা নয় না গেঁথেছিস্‌, কিন্তু কাকে ওটা দিবি, বল্‌তো?'—বিজনের কণ্ঠে এখানে খানিকটা অনুনয়ের সুর ভেসে উঠ্‌লো।

পাঁপড়ির মতো পাত্‌লা ঠোঁটের মধ্যে উদ্গত একটা হাসি গোপন ক'রে নিল ছন্দা: 'সবটাই এত জানবার ইচ্ছে কেন? যা পেয়েছ, তাই নিয়েই যাও না, ঝুলোও গে তোমার মাষ্টারের গলায়।'

ক্রমশঃই কৌতুহলে সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌চে বিজনের। ছন্দার একখানি হাত আলগোছে নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে তেম্‌নি অনুনয়ের কণ্ঠে আবার সে একই প্রশ্ন তুলে ধ'রলো, 'বল্‌ না লক্ষ্মীটি, কাকে দিবি ওটা ?'

আধো আধো মিষ্টি স্বরে ছন্দা বল'লো, 'কেন ব'লবো, তুমি আমাকে বলো সব কথা ?'

—'কেন, কি লুকিয়েছি বল্‌ ?

—'জানি না, যাও।'

—'বাঃ রে মজা, তবু দিলি নে তো মালাটা।' থেমে আবার প্রশ্ন ক'রলো বিজন, 'বল্‌ না লক্ষ্মীটি, কাকে দিবি ?'

—'কি ছিনেজোঁক রে বাবা। ছন্দা ব'ল্‌লো, 'আগে চক্ষু বোজো, তবে ব'ল্‌বো।'

চোখ বুজে মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো বিজন, ব'ল্‌লো, 'বল্‌ এবারে।'

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিজের হাতের মালাটি এবারে বিজনের গলায় পরিয়ে দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো ছন্দা: 'বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে বিজুদা।'

চোখ খুলে বিজন তাকালো একবার নিজের বুকে দোলানো মালাটার দিকে, বললো, 'ও—এই তবে তোর ইচ্ছে ছিল ?'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে জিভ কেটে শুধু একবার ভেঙ্‌চালো ছন্দা।

থেমে বিজন ব'ললো, 'কিন্তু তোর গলাটা যে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রে, আয়, তোকেও একটা পরিয়ে দি। এতগুলো মাষ্টারকে না দিলেও চ'লবে।'

—'ই-স্‌, নিজের হাতের গাঁথা মালা আমি পরি না।' ব'লে সহসা খানিকটা দূরে গিয়ে স'রে দাঁড়ালো ছন্দা।

হাত বাড়িয়ে ধ'রতে গেল তাকে বিজন, কিন্তু পারলো না, ততক্ষণে তার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছন্দা।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল বিজন।

এবারে এক দৌড়ে সোজা গিয়ে উঠ্‌লো ছন্দা নিজেদের ঘরের দাওয়ায়।

পাশে তখন নবগঙ্গার বর্ষাতি বুকে জলকণাগুলি নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ ধরে যে ছন্দার গমন-পথের দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। পরে একসময় সোজা সে স্কুলের পথে পা বাড়ালো।...

এম্‌নি করেই সময়ের চঞ্চল পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লো দিনগুলো। আবর্ত্তিত বর্ষ-চক্রে উড়ে চল্‌লো ঋতুলক্ষ্মীর বস্ত্রাঞ্চল। নবগঙ্গায় জোয়ারের পর ভাটা এলো, আবার জোয়ার। সময় কোথাও স্থির নয়, স্থির নয় তেম্‌নি জীবনের গতি। জীবন প্রধাবিত, বিস্তারিত, বিশ্লিষ্ট, বিরামবিহীন তার অগ্রগতি। সেই আগামী মুহূর্ত্তের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লো সরল সুন্দর তিনটি হাসিভরা জীবন: রেবা, বিজন, আর ছন্দা।

[ক্রমশঃ

বার্ণার্ড শ' ও বিরস নাটক

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে বার্ণার্ড শ' এক অপূর্ব্ব বিস্ময়। আজ পর্য্যন্ত যে কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষী স্বকীয় মননশীলতা ও মৌলিক সৃজনী শক্তির জন্যে বিশ্বের সুধী-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, বার্ণার্ড শ' তাঁহাদের অন্যতম। সেক্সপীয়র, গ্যেটে, ভল্‌টেয়ার, টলষ্টয়, হুগো প্রমুখ চিন্তানায়কগণ আধুনিক সমাজে জীবনবেদের এক একজন উদ্গাতারূপে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। আজকের দিনে তাঁদের সেই অত্যুচ্চ আসনে ঠিক তাঁদেরই পাশে সসম্মানে স্থান পাবার যোগ্য ব্যক্তি কেউ যদি থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি বার্ণার্ড শ'। শ' শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি ও সমাজের এক নব পুরুষসূক্তের স্রষ্টা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় একাধারে উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীত সমালোচনা প্রভৃতির স্ফুরণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর শক্তিশালী লেখনী নিঃসৃত সৃষ্টি-কর্ম্মের মধ্যে নাটকই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ প্রবন্ধকার ঔপন্যাসিক ও সমালোচক-শ' অপেক্ষা নাট্য-কার শ'য়েরই কৃতত্ব অধিক। দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দ কালেরও অধিক নিরলস ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তিনি এমন একটি স্থানে উপনীত হয়েছেন যা তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের কাছে দুরধিগম্যই নয়, কল্পনাতীতও বটে। তাঁর অনন্যতা ও অনুপম শক্তির গুণে আধুনিক যুগে সাহিত্য হিসেবে নাটকের একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান স্থিরীকৃত হয়েছে।

সেক্সপীয়ারের পরবর্ত্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে ভিক্টোরিয় যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে বহু নাটকের বিকাশ দেখা গেলেও সে দেশের সুধী সমাজে তা বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তৎকালীন খ্যাতনামা ও প্রতিভাবান কবিগণ যথা—শেলী, কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, বাইরণ ইত্যাদি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেও এবং রঙ্গালয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করলেও নাট্যকার হিসেবে কৃতকার্য্য হতে পারেননি। অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করলে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কারণ—রোমান্টিক কবিগণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং সমাজ থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন; দ্বিতীয় কারণ—তখনকার দিনে শ্রোতাদের রুচিবোধ এই সব কবিদের উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তুপূর্ণ নাটক অপেক্ষা একঘেয়ে বীরত্ব কাহিনী, প্রহসন, অদ্ভুত নাট্যই (Extravaganza) বেশী পছন্দ করত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নরওয়ের ইব্‌সেনের নাট্য-প্রতিভার ঢেউ এসে ইংলণ্ডের উপকূলে লাগল—যার ফলে সেখানে একটা রেনেসাঁ বা নবযুগের সূচনা দেখা গেল এবং একদল নাট্যকার রঙ্গালয়ের শ্রোতাদের রুচিবোধ উন্নততর করতে সচেষ্ট হলেন। এ বিষয়ে অগ্রণী হিসেবে যাঁদের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন রবার্টসন (T. W. Robertson), জোন্স (Henry Arthur Jones), পিনেরো (Sir Arthur Wing Pinero), গিল্‌বার্ট (William Schwenk Gilbert) ইত্যাদি। এঁরা বিভিন্ন দিক থেকে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলি উপলব্ধি

করে নাটকের ভেতর দিয়ে সেগুলি প্রতিফলিত করলেন। আবার এই ক'জনের মধ্যে গিল্‌বার্ট বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনায় (Satiric Comedy) সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। নাট্যকার জীবনের প্রারম্ভে শ' গিলবার্টের এই জাতীয় নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই শতাব্দীর শেষ পাদে আর একজন শক্তিশালী নাট্যকার আবির্ভূত হন। তাঁর নাম অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde)। ওয়াইল্ডের মৌলিক সংলাপ রচনাগুণ বার্ণার্ড শ'কে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে এবং তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ নিয়ে এই সংলাপরীতিকে অনুধাবন করেন। তা ছাড়া বিয়োগান্ত নাটক অপেক্ষা মিলনান্ত নাটকের প্রতি শ'র যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তারও মূলে আছে ওয়াইল্ডের কমেডি রচনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং অকুণ্ঠ সমাদর।

লণ্ডনের নাট্যজগতে বার্ণার্ড শ'র আবির্ভাবের ইতিহাস আকস্মিক হলেও অভাবনীয় নয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে সাংসারিক দুরবস্থার চাপে পিষ্ট হয়ে শ' তাঁর স্বদেশভূমি ডাবলিন ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে লণ্ডনে আসেন। কোন রকমে জীবন ধারণের মত একটি কেরাণীর চাকুরী সংগ্রহ করে তিনি তাঁর বহু ইপ্সিত সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হলেন। পাঁচ বৎসর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অবসরহীন প্রয়াসে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করলেন। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণের ভাবালুতাশূন্য ও গতানুগতিক প্রেম-কল্পনাহীন কাহিনীর কেউ সমাদর করল না। নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম শ' তখন সাময়িক ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি বন্ধ রেখে গিয়ে পড়লেন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে। সিডনী ওয়েব, গ্রাহামওয়ালেসের সংস্পর্শে এসে প্রতিষ্ঠিত করলেন ফেবিয়ান-সোসাইটি। তারপর পার্কে পার্কে চলল তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির অন্তর্নিহিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ম্মম অভিযান। ১৮৮৯ সালে লণ্ডনের 'নিউ থিয়েটারে' ইব্‌সেনের 'ডল্‌স হাউস' অভিনীত হবার অব্যবহিত পরেই গ্রেইনের প্রযোজনায় 'ইণ্ডি-পেণ্ডেণ্ট থিয়েটারে (Independent Theatre) ইবসেনের 'গোষ্টস্' (Ghosts) মঞ্চস্থ হল। সমাজতন্ত্রবাদের ধ্বজাবাহী ও গোঁড়া সমর্থক শ' এই অভিনয় দেখে ইবসেন প্রচারিত আদর্শ ও মতবাদের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাবান হলেন না, পরন্তু 'ইবসেন আদর্শের সার' (The Quintessance of Ibsenism) নাম দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ লিখে ইংলণ্ডের সুধীসমাজে তাঁর সুনাম বর্দ্ধিত করলেন। কেননা শ' ইবসেনের সেই সতর্ক বাণীকে—'Beware of the rules of thumb. Examine them in relation to the particular circumstances and reject them if the circumstances seem to you to demand it."—তাঁর নিজেরও অন্তরের বাণী করে নিয়েছিলেন। তারপর ১৮৯২ সালে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী কোন ইংরেজ লেখকের নতুন নাটক

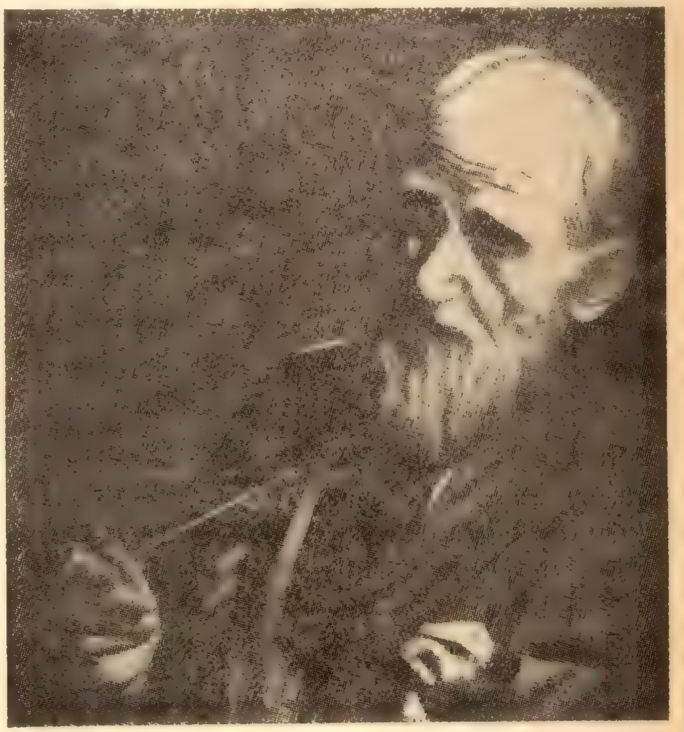

চিন্তাবিষ্ট জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

পাওয়া গেল না। সেই সময় অর্থাৎ ইংলণ্ডের নাট্য-শালার দুর্দ্দিনে এবং সেই জাতীয় অবনতির সন্ধিক্ষণে (humiliating national emergency) বার্ণার্ড শ' সাহসে ভর করে গ্রেইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। শ' এই নাটকটি ১৮৮৫ সালে রচনা আরম্ভ ক'রে দুই অঙ্কের পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গ্রেইন তাঁর অনুরোধ রাখতে রাজী হলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রথম নাটক 'উইডোয়ার্স হাউসেস্' (Widowers' Houses) অভিনীত হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের নাট্য সমালোচক মহলে ও শ্রোতাদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। এটা আসলে নাটক না সমাজতন্ত্রের নীরস বিতর্ক, তা কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারল না। ফলে শ'র ভাগ্যে সুনাম অপেক্ষা দুর্নামই পাওনা হল। এ সম্বন্ধে পরে শ' বলেছেন—"It made a sensation out of all proportion to its merits or even its demerits; and I at once became infamous as a playwright......I, being at that time in some practice as what is impolitely called a mob orator, made a speech before the curtain."

কিন্তু অসমসাহসিক শ' প্রতিকূল সমালোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন না। তিনি আরও অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে দ্বিতীয় নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৯৩ সালে 'দি ফিলাণ্ডারার' (The Philanderer) রচিত হল, কিন্তু চরিত্রোপযোগী অভিনেতার অভাবে তা মঞ্চস্থ হল না। তবুও শ' না দ'মে গিয়ে তৃতীয় নাটক আরম্ভ করলেন এবং ১৮৯৪ সালে 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন' রচিত হওয়ার পর লণ্ডনের সেন্সর বোর্ড (Lord Chamberlain's Examiner of plays) এটিকে অশ্লীল ঘোষণা করে সাধারণ রঙ্গালয়ে এর অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলেন। ফলে তিনি রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর পূর্ব্বসূরী হেনরী ফিল্ডিংয়ের মত নিজের নাটকের অভিনয়ের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করলেন বলা বাহুল্য, এই সময়ের কয়েক বছর পরেই ১৯০২ ও ১৯০৭ সালে যথাক্রমে তাঁর দুইটি নাটক 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেসন,' ও 'দি ফিলাণ্ডারার' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু এসব কথা বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, 'উইডোয়ার্স হাউসেস' অভিনয়ের পর শ' নাট্যকার হিসাবে সুনাম লাভ করলেও ইংলণ্ডের শ্রোতা ও পাঠক মহলে এমন একটা সাড়া জাগালেন যা তাঁর পরবর্ত্তী নাটক দুটি রচনায় সহায়তা করল। এই তিনটি নাটকই একত্রিত হয়ে 'বিরস নাটক' (Plays Unpleasant) নামে পরিচিত।

বার্ণার্ড শ'র 'বিরস নাটক' আলোচনাকালে একথা মনে করলে অসঙ্গত হবে যে এই নাটকগুলিতে তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্র-নাথের 'বনফুল, ভগ্নহৃদয় ও কবিকাহিনী' এইরূপ তিনটি খণ্ড কাব্য অথবা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'কড়ি ও কোমল' এইরূপ তিনটি কাব্যের (অংশ বিশেষের নয়) বিস্তৃত আলোচনা করতে বসে কেউ যদি এমন যুক্তির অবতারণা করেন যে এইগুলি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, তাহলে তিনি যেমন ভুল করবেন, তেমনি বার্ণার্ড শ'র 'বিরস নাটক' থেকে তাঁর অনুপম প্রতিভার নিদর্শন অনুসন্ধান করলে একই রকম ভুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকগুলিতে তাঁর অপরিণত বয়সের স্বল্প অভিজ্ঞতা এবং যৌবনসুলভ উদ্দামতার এমন একটা ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে আছে, যেটাকে সত্যিকার সাহিত্যিক বিচারের মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায় না। তবুও এগুলিকে একেবারে মূল্যহীন বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ প্রত্যেক বড় প্রতিভার আবির্ভাব ঠিক রাত্রির অন্ধকার নাশী সূর্য্যোদয়ের মত। প্রত্যহ প্রভাতেই পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়-কালে তার মধ্যাহ্নদীপ্তি আমরা দেখতে পাই না সত্যি, কিন্তু তার নয়নাভিরাম অরুণরাগে আমাদের প্রাণে যে নবজীবনের অমৃতস্পর্শ লাভ করি, এ কথা কে অস্বীকার করবে? তাই শ'র 'বিরস নাটকে' আমরা বিরাট প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও তাতে প্রথম আলোকের আভাষ পেয়েছি—যে আলোকের চমকে আমাদের মোহনিদ্রা ভেঙেছে এবং আমরা বহুযুগের

জীর্ণতা জড়তা ত্যাগ করে পৃথিবীর বাস্তবরূপকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি।

বার্নার্ড শ' সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবী সমালোচক। তাই তাঁর নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-সমালোচনা ও সমাজ সংস্কার। আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্যের ফলে মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার যে সকল সমস্যা হিমালয় প্রমাণ বাধার ন্যায় উত্তুঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে এবং যার সুসমাধানের জন্যে ইতিপূর্ব্বে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি, শ' তাঁর সংস্কার-মুক্ত উদার মতাবলম্বী মন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে সেই সমস্যার সার্থক সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। একদা মানুষ আপনার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজন সাধনের জন্য যে নিয়মপ্রপঞ্চকে সার্থক বলে মনে করেছিল এবং বহু শতাব্দী পরে যার ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আজ সেই জীর্ণ সংস্কারের ভার বোঝা,সেই অপ্রয়োজনের অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার মূঢ়তাকে বার্নার্ড শ' কোন দিনই বরদাস্ত করেন নি। তাই বর্ত্তমান সমাজ সংস্থিতির প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি চালিয়েছেন আপোষহীন সংগ্রাম। তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে ব্যক্তির প্রয়োজনের অধিক অগ্রসর হয়, সেখানে সেই সঞ্চয়কে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। আর এই বঞ্চনাকে সমর্থন করার জন্যেই বহুবিধ ধর্ম্ম, নীতি এবং আইন-কানুনের ধুম্রজাল রচনা করে মানুষকে ফাঁকি দেবার অহরহ চেষ্টা চলেছে। শ' তাঁর নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যে তাঁর চরিত্রে, প্রত্যেক কার্য্যে ও কথোপকথনে এই ফাঁকিকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শন করতে তিনি তাঁর নাটকে পূর্ব্বগামীদের রীতি ও পদ্ধতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পদক্ষেপ করেছেন। বস্তুত সেক্সপীয়রের পরে পাশ্চাত্যের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে শ' নতুন এক পথের পথিকৃৎ। তাঁহার নাটকের বাহন সুউচ্চ কবিকল্পনা, সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি ও মন্থর ঘটনা বিন্যাস সংযোগে চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ নয়, তাঁর নাটকের বাহন তাঁর নিজস্ব মতবাদ, নিজস্ব আঙ্গিক এবং নিজস্ব ভাষারীতি ও প্রকাশ ভঙ্গী। আমরা সাধারণত যে সকল অনুভূতিকে মূল্যবান মনে করে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকি বা পরমার্থিক সত্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, বার্নার্ড শ'র কাছে সেই সব অনুভূতির আদৌ মূল্য নেই। তাই তিনি আমাদের এই আচরণে কেবল ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। কেন না তাঁর জীবনদর্শনে আতিশয্য বা রোমান্সের কোন স্থান নেই। তিনি রোমান্স বিরোধী।

এই রোমান্স বিরোধীতার জন্যেই তাঁর দৃষ্টি এত স্বচ্ছ, অভ্রান্ত ও অন্তরভেদী, যার কাছে আমাদের বিবাহ প্রথা, পরশ্রমলব্ধ বা অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধনভোগের যৌক্তিকতা, চিকিৎসা ব্যবসা, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রভৃতি সব কিছুর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে যায়। শ' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মতবাদের মাধ্যমে, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার শ্লেষ উক্তিতে, মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গের নির্ম্মম আঘাতে মানুষের সজ্ঞান বা অজ্ঞান সঙ্কীর্ণতা, ভণ্ডামী, এবং কপটতাকে নগ্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত ক'রেছেন। বস্তুতঃ তাঁর মতবাদ যেমন অভিনব, তাঁর শ্লেষপূর্ণ যুক্তিতর্কও তেমনি অনন্য সদৃশ। তাঁর নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ, উক্তি প্রত্যুক্তির দীপ্ত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁর সরস বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং নাটকীয় গতির ক্ষিপ্রতা আমাদের শুধু আকৃষ্টই করে না, আমাদের মননক্রিয়ার শ্লথগতি তার সঙ্গে সমান তাল রাখতে না পেরে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। শ'র যে কোনও নাটক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অধিক আর কিছু না ব'লে এখন তাঁর নাটকের আলোচনায় আসা যাক। প্রথমে তাঁর বিরস নাটকত্রয়ীর প্রথম নাটক অর্থাৎ 'উইডোয়ার্স হাউসেস'-এর কথা ধরা যাক।

এখানে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, শ'র যে কোনও নাটক আলোচনাকালে তাঁর মতবাদ ও রোমান্স বিবর্জ্জিতার কথা ভুললে চলবে না। 'উইডোয়ার্স হাউসেস'-এর মতবাদ সম্বন্ধে শ' তাঁর প্রস্তাবনার এক জায়গায় বলেছেন: 'In Widower's Houses I have shewn middle class respectability and younger

son gentility faltering on the poverty of the slum as flies fatten on filth'। আমরা অনেক সময়েই ভাবি যে, ইচ্ছা করলেই বুঝি আমরা পাপের পঙ্কিলতাকে দূর করতে বা তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারি। কিন্তু শ' দেখিয়েছেন যে সমস্ত সমাজদেহ যেখানে পাপের বিষ-ক্রিয়ায় জর্জ্জরিত, সেখানে ব্যক্তিনীতি বা ধর্মনিষ্ঠার কোন মূল্য নেই—সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত নীতিবোধ মাছির মত ধনতন্ত্রের আবর্জ্জনা থেকে প্রাণধারণের সামগ্রী আহরণ করে। কিন্তু এ কথা হ'ল 'উইডোয়ার্স হাউসেস' নাটকের শেষ কথা। তাই এ-সব বলার আগে গোড়ার কথায় আসা যাক।

'উইডোয়ার্স হাউসেস' নাটকের সূচনায় দেখা যায় যে, ধনী সার্টোরিয়াস তার একমাত্র সুন্দরী কন্যা ব্ল্যাঞ্চের সঙ্গে জার্ম্মাণীর একটি শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থল পরিদর্শনের পূর্ব্বে যুবক হ্যারি ট্রেঞ্চ ও তার প্রৌঢ় বন্ধু উইলিয়াম কোকেন নামে দুই স্বদেশীয় পরিব্রাজকের সঙ্গে একই হোটেলে অবস্থান করছে। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রপথে দুই দলের সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং বিদেশে স্বজাতির প্রতি আকর্ষণ না থাকা সভ্য মানুষের রীতিবিরোধী বলে তাদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'তে দেরী হ'ল না। হ্যারির বন্ধু কোকেন বিশেষ ভাবে সকলকে মনে করিয়ে দিল—We rarely feel the charm of our own tongue until it reaches our ears under a foreign sky'। সার্টোরিয়াস কোকেনের কাছে জান্‌তে পেরেছে যে হ্যারি লেডী রক্সডেল নামে এক অভিজাত ধনী মহিলার নিকট-আত্মীয় এবং তিনি হ্যারির বিবাহান্তে তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দেবেন। ফলে হ্যারির প্রতি তার কৌতূহল বাড়ল এবং নিজের কন্যাকে আহ্বান ক'রে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সে তাদের মিলনের সুখস্বপ্ন দেখতে থাকল। এ-দিকে হ্যারি ব্ল্যাঞ্চের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সরাসরি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে বসল। ভাবের আবেগে গদ্গদ ব্ল্যাঞ্চ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কবে আমাদের বিয়ে হবে?' তখন ট্রেঞ্চ ভক্তোধিক ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বলল—"At the first Church we meet; the Apollinaris Church, if you like!" তাদের এই প্রস্তাব সার্টোরিয়াসের কাণে উঠলে সে লেডী রক্সডেলের সমর্থন না পাওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া মুলতুবী রাখল। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে, ট্রেঞ্চ যখন তার বন্ধু কোকেনকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে লেডী রক্সডেলকে তার নামে পত্র দেবার ভার অর্পণ করল, তখন এই সার্টোরিয়াসই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই চিঠির খসড়া রচনার কাজে সহায়তা করতে লেগে পড়ল। এখানেই নাট্যকার শ'র কৃতিত্ব এবং এখানেই তিনি তাঁর তীর্য্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাকবিবাহরীতি সম্বন্ধে তাদের ভাবালুতা ও রোমান্টিসিজমের কুয়াশা অপসারিত করেছেন।

এরপর দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র অন্ত-দিকে মোড় ঘুরেছে। মাত্র এক পাউণ্ড চার শিলিং খরচ করার অভিযোগে সার্টোরিয়াস তার ভাড়া আদায়কারী কর্ম্মচারী লিকচীস্‌কে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। কেন-না সে মনিবের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই একজন ভাড়াটিয়ার চারতালার ভাঙা সিঁড়িটা মেরামত করিয়ে দিয়েছে। মনিবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে ট্রেঞ্চ ও তার বন্ধু কোকেনকে আস্‌তে দেখে থামল এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার আনন্দ-লগ্নে তার হারানো চাকরিটা ফিরে পাওয়ার জন্যে সার্টোরিয়াসকে বল্‌তে অনুরোধ করল। সে সগর্ব্বে জানাল যে তার মত সুযোগ্য ভাড়া আদায়কারী সার্টোরিয়াস হাজার চেষ্টা করলেও আর একজনকেও খুঁজে পাবে না। কেননা ভাড়াটিয়াদের ওপর যতদূর সম্ভব চাপ দিয়ে সে এই কাজ করে থাকে। এ বিষয়ে তার এই উক্তি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়—Why, see here, gentlemen! Look at that bag of money on the table. Hardly a penny of that but there was a hungry child crying for the bread it would have bought. But I got it from him—screwed and worried and bullied it out of them. I—look here, gentlemen; I am pretty seasoned to work; but there, money there that I could not have taken if it had not been for the thought of my

o · ı ı ıdren depending on me for giving him satisfaci n !' একেই বার্ণার্ড শ' ব'লেছেন আবর্জ্জনার ওপর নি শীল মাছির জীবন।

লিং ।সের এই কথায় স্তম্ভিত ট্রেঞ্চ তাকে তার নির্মমতার জন্তে অভিসম্পাত দিয়ে সার্টোরিয়াসের কাজের যাথার্থ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলে সে বলল—'Do you suppose he sacked me because' I was too hard? Not a bit of it; it was because I was not hard enough. I never heard him say he was satisfied yet; no, nor he would not, not if I skinned our alive. I don't say h's the worst landlord in London, he could not be worse than some; but he is no better than the worst I ever had to do with. এই প্রসঙ্গে সে জানাল যে সার্টোরিয়াস প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের দরুণ যা ভাড়া আদায় করে তার তুলনায় পার্ক লেনের একটা অট্টালিকার ভাড়াও অত বেশী হয় না। সে এ কথাও বলল যে, 'Every few hundred pounds he could scrape together he bought old houses with; houses that you would not hardly look at without holding your nose...Just look how he lives himself, and you will see the good of it to him. He likes a low death rate and a gravel soil for himself, he does!"

এইসব কথা শোনার পর ট্রেঞ্চের মন সার্টোরিয়াসের প্রতি বিরক্ত হ'ল এবং বিয়ের পর তাকেও এই পাপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করতে হবে এই কথা ভেবে তার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হ'ল। তারপর ব্ল্যাঞ্চের সঙ্গে আলাপকালে সে নিজের অর্থের অপ্রতুলতার ওজর দেখিয়ে ব্ল্যাঞ্চেকে বলল যে বিয়ের পর শ্বশুরের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করা তার আত্মমর্য্যাদাবিরোধী। ফলে তাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তারপর ট্রেঞ্চ সার্টোরিয়াসের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তার অন্যায় ও অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থের কথা উল্লেখ ক'রে লিকচীসের উক্তিকে প্রতিধ্বনিত ক'রে বলল—'Your fortune has been made out of a parcel of unfortunate creatures that have hardly enough to keep body and soul together—made by screwing and bullying and threatening,' and all sorts of pettifogging tyranny!' সার্টোরিয়াস অবিচলিত ভাবে এই অভিযোগ শুনল। তারপর শান্ত-ভাবে জবাব দিল—'As to my business it is simply to provide homes suited to the small means of very poor people, who require roofs to shelter them just like other people'. ট্রেঞ্চ প্রত্যুত্তরে বলল—Advantage is taken of that to make them pay for houses that are not fit for dogs. Why don't you built proper dwellings and give fair value for the money you like? তখন সার্টোরিয়াস ট্রেঞ্চের সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল: 'My young friend: these poor people do not know how to live in proper dwellings: they would wreck them in a week. You doubt me; try it for yourself. You are welcome to replace all the missing banisters, handraits, cistern lids and dust hole tops at your own expense, and you will find them missing again in less than three days; burnt, Sir, every stick of them."

...When people are very poor, you can not help them no matter how much you may sympathise with them.

তারপর ট্রেঞ্চকে উল্টো চাপ দিতে এবং তার বন্ধকী ব্যবসার আয় যে সমানভাবেই অসাধুতাপূর্ণ এবং নীতি-বিরোধী এই পাল্টা অভিযোগ আরোপ করতে সার্টোরিয়াস বলল—'What Lickcheese did for me, I do for you. He and I are alike intermediaries: you are the principal. It is because of the risks I run through the poverty of my tenants that you exact interest from me at the monstrous and exorbitant rate of seven percent forcing me to exact the uttermost farthing in my turn from the tenants'। সে একথাও বুঝিয়ে দিল-If when you say you are just as bad as I am, you mean that you are just as powerless to alter the state of society, then you are unfortunately quite right'. ট্রেঞ্চ তখন নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং এই বলে ক্ষমা-প্রার্থনা করল—'People who live in glass houses have no right to throw stones. But, on my honour, I never knew that my house was a glass one until you pointed it out...we are all in the same swim, it appears. I hope you will excuse my making such a fus'

তৃতীয় অঙ্কে কাহিনী ও চরিত্র নাটকীয় সংঘাতে এবং ঘটনা সমাবেশের জটিলতায় যেমন অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি সংলাপও নাট্যকারের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিনতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই অঙ্কে সবার আগেই লিক্‌চীস দর্শক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে লিকচীস দ্বিতীয় অঙ্কের দারিদ্র্য পীড়িত সামান্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী নয়। এখানে সে একজন রীতিমত ধনী ব্যবসায়ী এবং গণ্যমান্ত ব্যক্তি। কাটকাবাজীর দাক্ষিণ্যে এবং নিজের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যবসায়ী বুদ্ধির বলে সে হয়েছে প্রভূত অর্থের অধিকারী। কিন্তু ধনী হয়েও সে তার পুরান মনিবের কথা ভুলে যায় নি। কাটকাবাজীর ফলে মানুষ কত তাড়াতাড়ি আর্থিক উন্নতি করতে পারে সেই কথা বুঝিয়ে তাকে নিজের দলে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে সে সার্টোরিয়াসের কাছে এসেছে। তার এই স্বার্থ সিদ্ধির পথে প্রধান সহায়—শ্রমিকদের বাসভবনের উন্নতিকামী রয়েল কমিশনের রিপোর্ট যাতে সার্টোরিয়াসের বিরুদ্ধে তারই ভাড়াটিয়ার জবানবন্দীর কথা লেখা হয়েছে এবং তাকে লণ্ডনের নিকৃষ্টতম বস্তীর জমিদার (The worst slumlandlord in London) এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। লিকচীস এসে সার্টোরিয়াসকে এই বইটি দেখালে প্রথমে সে আদৌ গ্রাহ্য করলনা বটে, কিন্তু পরে তার সম্পত্তির কিছু অংশ উন্নতি বিধান করার একটা প্রস্তাব পেশ করে যখন অপর পক্ষকে (ট্রেঞ্চকে) ডেকে আনতে সে (লিকচীস) বেরিয়ে গেল, সেই অবসরে সার্টোরিয়াস তার কন্তার রাগ প্রশমিত করতে, (কেননা সে তার বাবার আগেই বইটা দেখে ফেলেছে) এবং তার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে এই কথা বলেছে: It's a curious thing, Blanche, that the parliamentary gentlemen who write such books as these should be so ignorant of practical bussiness. One would suppose, to read this, that we are the most grasping grining, heartless paid in the world, you and I.

আবার ব্ল্যাঞ্চ যখন তার বাবাকে প্রশ্ন করছে—এ কথা কি সত্য নয়? বাড়ীর দুরবস্থার জন্ত আমরা দায়ী নই? তখন সার্টোরিয়াস তার জমিদারী গাম্ভীর্য্য নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বোঝাচ্ছে—"If we made the houses any better the rents would have to be raised so much that the poor people would be unable to pay, and would be thrown homeless on the streets." আসলে এই হল সমাজতন্ত্রী শ'র বিত্তশালীদের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত। কারণ সার্টোরিয়াসের তার এই যুক্তিই সকল জমিদারের নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলার একমাত্র অবলম্বন। তাই যখনই দেখা যায় যে জমিদার স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে ভাড়াটিয়ার বাসভবনের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়েছে তখনই বুঝে নিতে হবে যে তার এই কর্ম্মের অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বা বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপার লুকিয়ে আছে। এবং সে স্বার্থ আর কিছু নয় আরও অধিক ভাড়া আদায় করবার মতলব। অর্থাৎ সামান্ত সুবিধা ও আরামের বিনিময়ে অতিরিক্ত হারে ভাড়া দাবী করবার চতুর কৌশল প্রয়োগ করা।

এই কথাটিই শ' তাঁর নাটকের নায়িকার জবানীতে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন:

"Well, it appears that the dirter a place is the more rent you get; and the decenter it is, the more compensation you get. So we're to give up dirt and go in for decency."

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সার্টোরিয়াস ট্রেঞ্চের এই অভ্রান্ত যুক্তিকে পূর্ণ সমর্থন না করে স্বার্থ বাগাড়ম্বর দেখিয়ে বলছে—

"I take the wider view of a public man. We live in a progressive age; and humanitarian ideas are advancing and must be taken into account......I should hardly feel justified in making a large claim for compensation under existing circumstances', সেই সার্টোরিয়াসই আবার কিছুক্ষণ পরে তাদের যৌন প্রস্তাবে ট্রেঞ্চের সম্মতি না পাওয়ায় এবং একক নিয়োগ (Individual Investment) ভবিষ্যতে সমূহ অর্থনাশের কারণ হতে পারে এই আশঙ্কায় দুশ্চিন্তামগ্ন হয়ে সে বলছে—

There is a risk in this compensation, Dr. Trench. The country council may alter the

live of the new street. If that happens, the money spent in improving the houses will be thrown away : simply thrown away. Worse than thrown away in fact ; for the new buildings may stand unlet or half let for years.

এই নাটকে যে-চরিত্র সর্ব্বাগ্রে পাঠক এবং দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে সে ডাঃ হ্যারী ট্রেঞ্চ। তার সকল উক্তির পেছনে একটা যৌবন সুলভ ঔদার্য্যের সঙ্গে আছে সুস্পষ্ট মর্য্যাদাবোধ। যদিও বন্ধকী সম্পত্তির সুদের আয়ে তার জীবনযাত্রা নির্ভরশীল, তবু সার্টোরিয়াসের মত সে অর্থগৃধ্নু নয়। পরিমিত এবং স্বল্প অর্থেই সে সন্তুষ্ট। তাই সার্টোরিয়াসের প্রস্তাবে সে সম্মত না হলে পর যখন সে অন্যের কাছে ঋণ নিয়ে ট্রেঞ্চের টাকা পরিশোধ করে দেবার ভয় দেখাল, তখনও সে নিজের আয়ের পথ বন্ধ হবার কথা ভেবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না বরং দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রশ্ন করল—

That's all very fine ; but I don't understand it. If you can do this to me, why didn't you do it long ago ?

আবার নাটকের শেষাংশে হ্যারীর চরিত্রের উদার সুন্দর রূপটি সকল পাঠকেরই মন হরণ করে যখন ব্ল্যাঞ্চের সঙ্গে তার পুনর্মিলনের সন্ধিক্ষণে আত্মহারা অবস্থায় সার্টোরিয়াসকে তার প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হতে দেখে সে বলে ওঠে—"I'll stand in, compensation or no compensation."

এবার শ'-এর 'বিরস নাটক'-এরই দ্বিতীয় নাটক বা 'The Philanderer'-এর আলোচনা করা যাক। এর বিষয়বস্তু প্রথম নাটক থেকে বিভিন্ন। এখানে বার্ণার্ড শ' শুধু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে নয়—সমাজের নরনারীর সম্পর্ক, বিশেষত তাদের যৌন সম্বন্ধ, বৈবাহিক অনুষ্ঠানের প্রচলিত নীতিবোধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট আচার নিষ্ঠার ব্যবহারিক আড়ম্বরের প্রতি তীব্র কশাঘাত করেছেন। তাঁর মতে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান-সভ্যতার নবলব্ধ আলোকে নরনারীর বহুকালগত বিবাহ নামক চুক্তি যা এ পর্য্যন্ত সকলের কাছেই নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতার সন্ধান পাচ্ছিল—আজ তা মেকী বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। সম্ভবত এই চুক্তির মূলে দুই পক্ষের এমন কোনও অকপট অনুমোদন এবং অত্যাজ্য বন্ধন নেই যা একে স্থায়িত্বের মর্য্যাদা দান করতে পারে। নরনারীর ক্ষণিকের ভাল লাগা থেকেই এর উৎপত্তি এবং এই ক্ষণিকের ভাল লাগা থেকেই যুগে যুগে মোহান্ধ মানুষ বিবাহ সম্বন্ধ বা পরিণয় বন্ধন নাম দিয়ে পারস্পরিক আকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তাই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই এই মোহের অবসান হলে তার বুঝতে বিলম্ব হয় না যে আসলে এটা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই কারণে আজ সকল দেশের সকল সমাজের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ই যারা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করে, তারা এই দায় থেকে অব্যাহতি পাবার পথের অনুসন্ধান করছে। অর্থাৎ বিবাহের সামাজিক প্রয়োজন এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান বাহুল্যকে বাদ দিয়ে এবং তার ছলনাভরা ফাঁদে পা না বাড়িয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যাতে জীবন যাপন করা যায় আজকের নরনারী উচ্চকণ্ঠে তারই দাবী পেশ করছে।

এই কথাই শ' তাঁর 'ফিলাণ্ডারার' নাটকের প্রস্তাবনায় বুঝিয়ে বলেছেন—

In the Philanderer I have shewn the grotesque sexual compacts made between men & women under marriage laws which represent to some of us a political necessity (especially for the other people) to some a divine ordinances, to some a romantic ideal, to some a domestic profession of women and to some that worst of blundering abominations, an institution which society has outgrown but not modified and which advanced individuals are therefore forced to evade.

শ' জীববিজ্ঞানী। অর্থাৎ মানব জীবনকে বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর অন্ধ প্রবৃত্তি ও জৈব প্রেরণার অন্তর্নিহিত রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করাই তাঁর নাটক সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। শত সহস্র বৎসরের সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে শিক্ষা ও ভদ্রবেশী আচরণের পশ্চাতে যে মানুষ তার পাশবিক প্রবৃত্তি ও কামনার আদিম ক্ষুধা নিয়ে আজও নখদন্ত বিকাশ করে আছে, বার্ণার্ড শ' তার শ্লেষ ও ব্যঙ্গের শাণিত

তরবারির আঘাতে সেই আবরণ ছিন্ন ভিন্ন আর মুখোস উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন—'ফিলাণ্ডারার' নাটকে।

অতঃপর নাটকের বিষয়বস্তু এবং প্রতিপাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার আগে যে পটভূমিকায় শ' তাঁর এই সৃষ্টিবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই দিকে নজর দিতে হবে। নতুবা নাটকের উদ্দেশ্য যেমন সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না, তেমনি তার রসরূপের সার্থকতা সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ জাগবে। আগে বলা হয়েছে যে ১৮৮৯-৯৩ সালের ইবসেনের 'ডলস্ হাউস', 'গোষ্টস' এবং অন্যান্য নাটক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিনীত হবার পর সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল যার ফলে একদল লোক কেবল নাটকের ঘটনাসংস্থিতির বাহ্যিক আকর্ষণের এবং নাটকীয় কাহিনীর আপাতদৃষ্টি বিন্যাস ও চরিত্রের ভাবপ্রবণতাপূর্ণ সংলাপে মুগ্ধ হয়ে ভক্তির আতিশয্যে গদগদ হয়ে ইবসেন অনুগামী রসিকশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করতে থাকল। এমন কি এরা রাতারাতি নিজেদের জাতির সাধনা ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিমত্তা এবং আচার ব্যবহার প্রদর্শন করার আগ্রহে এত বেশী উৎসাহিত হল যে প্রায় সকলেই নিজেদের ইবসেনের নাটকের চরিত্ররূপে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল। এদের অবস্থাটা হয়েছিল অনেকটা আজকের দিনের আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মত—রাশিয়ার কথায় যাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত উৎফুল্ল হয় এবং মার্ক্সীয় দর্শনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় উচ্চ ঘোষণায় এবং সোভিয়েট সাহিত্যিকদের ভাবকল্পনাহীন প্রচারের ঢক্কা নিনাদে যারা অন্তরের সশব্দ সগর্ব উল্লাস হয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু এ কথা যাক।

ইবসেনের নাটকীয় চরিত্রের বাহ্যিক রূপসজ্জার মোহে এবং তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপের আপাত সত্যযুক্তিতে অভিভূত হয়ে তার কৃত্রিমতার অনুকরণে পুরুষরা যেমন নিজেদের 'advanced' বা অগ্রগামী বলে ঘোষণা করল তেমনি স্ত্রীলোকেরা সকলেই 'নোরার' আদর্শে আপনাদের নারীত্বকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করল। ফলে সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির মধ্যে যে ভাবের বন্যা তার জীবনধারাকে প্লাবিত করে দিল তাকে এক কথায় বলা যায় ইবসেনীয় ভাব বা Ibsenism। এই যে সার্বত্রিক মূঢ়তা বা প্রগতির নামে সুনিশ্চিত জাতীয় অধোগতি, বার্ণার্ড শ'কে তা গভীরভাবে ব্যথিত করল এবং তিনি তখন এই ইবসেনীয় ভাবের যে বিকার তাকেই তাঁর নাটকের অঙ্গীভূত করার জন্য সচেষ্ট হলেন—এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে 'দি ফিলাণ্ডারার' রচিত হল।

এখন এই নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনায় আসা যাক। এইখানে স্মরণ রাখতে হবে যে আধুনিক জগতের আলোকপ্রাপ্ত নরনারীর বিবাহনীতি বিরোধী যৌনজীবন ব্যাখ্যা এই নাটকের প্রধান উপজীব্য এবং এই নীতি তথাকথিত ইবসেনীয় ভাবলব্ধ শিক্ষা দীক্ষারই সুনিশ্চিত পরিণতি। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের গ্রেস ট্রানফিল্ডের সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন লিওনার্ড চার্টারিসের কথাবার্ত্তায় এই উক্তির সত্যতা সর্ব্বাগ্রেই প্রমাণিত হয়। বিধবা ট্রানফিল্ডের বিবাহের মূলে স্বামীর প্রতি তার যে অনুরাগ বা প্রেমের কোন অস্তিত্বই ছিল না সেই কথাই উল্লেখ করে চার্টারিস বলছে—

When one's young, one marries out of mere curiosity, just to see what it's like.

পক্ষান্তরে বিবাহিতা নারীও যে পুরুষের অধীনস্থ নয়, গ্রেস সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাই চার্টারিসকে সে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না যে—

No woman is the property of a man. A woman belongs to herself and to nobody else.

গ্রেস, চার্টারিস, জুলিয়া এই তিনটি চরিত্র এই নাটকে নাট্যকারের সকল উদ্দেশ্যের বাহন হয়েছে। গ্রেস ও জুলিয়া উভয়েই চার্টারিসের প্রতি প্রেমাসক্ত। কিন্তু চার্টারিস তাদের কাহাকেও ধরা দিতে রাজী নয়। গ্রেসের প্রতি ঈর্ষ্যাবশত জুলিয়ার অনুরাগ চার্টারিসের ওপর অধিক এবং যখনই সে তাকে একান্ত করে পাবার আশায় বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে তখনই চার্টারিসের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই তুলে সেই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে এবং তাদের সম্পর্ক যে নিছক সখ্যতার সম্পর্ক, তাই উল্লেখ করে বলে—

Advanced people form charming friendship: conventional people marry. Marriage suits a good many people……Friendship suits some people……you chose friendship instead of marriage.

জুলিয়াকে সে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে সে কখনো তাকে একা দেখে মুগ্ধ হয়, তখন তাকে প্রগতিশীলা নারী বলেই মনে করেছিল। সেই জন্য তার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে জুলিয়া নিশ্চয়ই বিবাহকে 'degrading bargain' মনে করে এবং তার মতে এটা যে এমন এক জিনিষ যার দ্বারা—'a woman sells herself to a man for his social status of a wife and the right to be supported and pensioned in old age out of his income—সে বিষয়ে চার্টারিসের সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বস্তুতঃ তার এমন একটা বিশ্বাস ছিল বলেই উভয়ের মধ্যে একটা অবাধ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই জুলিয়া যখন বুঝল যে, তার ও চার্টারিসের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গভোগের মাঝখানে প্রেমের আগমন হয়েছে এবং চার্টারিস তার প্রতিও সমান অনুরাগ প্রদর্শন করছে তখন সে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে এক সময় বলে ফেলল—"you made me pay dearly for every moment of happiness. You never go yourself on me for the humiliation of being the slave of your passion for me. I was never sure of you for a moment……I was your plaything, not your companion."

জুলিয়ার এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ চার্টারিস যা বললো তা এই নাটকের মূল কথা এবং সেই কারণে এই উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উক্তিটি এই— Did I not findout, before our friendship was a fortnight old, that all your advanced views hardly a fashion picked up and followed like any other fashion without understanding on meanieg a word of them ?

এখানে বার্ণার্ড শ' সেই যুগের তথাকথিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ ইবসেনের সংস্কারমূলক আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি না করে তাকে একটা ফ্যাসনের মত কেবল অনুকরণ করে যে বুদ্ধিজীবি সমাজ আপনাদের অগ্রগামীতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করে, শ' এখানে তাদের আতিশয্য ও আত্মম্ভরিতাকে তীক্ষ্ণ শ্লেষের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। [আগামী বারে সমাপ্য

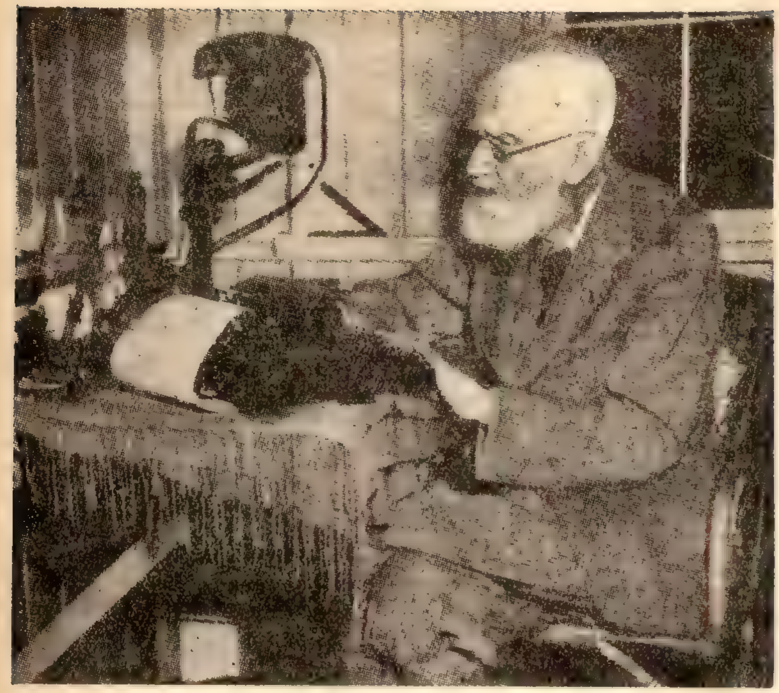

শ'এর তিনটি নাটক

অধ্যাপিকা হিমা চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে। তাঁদের যে কোনও রচনার মধ্যেই তাঁদের জীবন দর্শনের ছায়া পড়া এত স্বাভাবিক যে লেখকের মতবাদ অথবা জীবনদর্শন সম্পর্কে অন্ততঃ একটা স্থূলধারনাও তাঁদের রচনার সংস্পর্শে এসে পাওয়া সম্ভব। শ' এর নাটক পড়বার সময়ে প্রত্যেক পাঠকই প্রায় এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ভুল করে এসেছেন। আমরা শ'এর যে কোনও একটি নাটক, ধরুন Man and Superman পড়লাম, শ'এর জীবন-দর্শনের অনেকখানিই মনে হ'ল যেন আমরা জানতে পেরে গেলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় নাটকে মনোনিবেশ করলাম, অকস্মাৎ নূতনতর আঘাতে আমাদের পূর্ব্বের ধারণা ভেঙ্গে পড়ল। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে নূতনতর বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে, সে বিস্ময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন নূতন আঘাতের রূপ নিয়ে আসে।

তবে কি শ'এর কোনও জীবনদর্শন নেই? একটি নাটকের মূল দর্শনের সঙ্গে অপর একটি নাটকের মূল দর্শনের এতখানি আত্মবিরোধ যে দুইটি নাটকের একই লেখকের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর কিন্তু দুষ্কর হলেও যে তা' সম্ভব নয়—সেই কথাটিই জানতে পারবো শ'এর তিনটি নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে।

আমার বর্ত্তমান আলোচ্য নাটক তিনটি এই—"Man and Superman", "Saint Joan" এবং "Mrs. Warren's Profession" এই তিনটি নাটক মনোনীত করবার কারণ এই যে, এই তিনটির মধ্যে শ'এর মতবাদের বিশিষ্ট তিনটি দিক দেখতে পেয়েছি। প্রথমতঃ "Man and Superman"এর কথাই ধরা যাক্। বার্ণার্ড শ'এর Creative Evolution-এর নাট্যরূপ দেবার জন্যই তিনি এই নাটকটি রচনা করতে সুরু করেন—কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় "Creative Evolution"-এর Elan Vitalকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে তাঁর Life force. "Man and Superman"-এর নায়ক Tanner, নায়িকা Ann। বিপ্লববাদী Tanner প্রচলিত সমস্ত hypocricyর বিরুদ্ধেই শুধু জেহাদ ঘোষণা করেনি, তাঁর সংগ্রাম জৈবপ্রকৃতির সঙ্গেও। Ann এই জৈব-প্রকৃতির দূতী এমন এক নারী যার আকর্ষনী সত্তাকে কোনও পুরুষই অস্বীকার করতে পারে না। বার্ণার্ড শ'এর ভাষায় "Ann is one of those vital geniuses," বিশ্ব-

ব্যাপী যে সৃষ্টিলীলা চলেছে, নারী সেই সৃজনী শক্তি, পুরুষ নারীর সৃষ্টিকার্য্যের যন্ত্র মাত্র। নারী নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুরুষের উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা পোষণ করে না বরং সে উদ্দেশ্যকে ধূলির মধ্যে লুটিয়ে দিয়ে নিজের রূপ, সৌন্দর্য্য, কলা কৌশল ও প্রেমের ছলনায় বন্দী করে রাখে একেবারে নিজস্ব আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু Tanner চায় পৌরুষ—যে পৌরুষ জৈবশক্তিকে পরাভূত করে মননশক্তির প্রতিষ্ঠা করবে। নিরন্তর সংগ্রামের পর আত্মরক্ষার জন্যই Tanner Ann-এর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়, কিন্তু Life force নিজেই পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবন করে—কারণ নারী কর্ত্তা, পুরুষ কর্ম্ম মাত্র; Tanner Octavius (Annএর admirer)কে বুঝিয়ে দেয়, "You think that you are Ann's suitor; that you are the pursuer and she the pursued; that it is your part to woo, pursuade, to prevail, to overcome; Fool! is is you who are the pursued, the marked down quarry, the destined prey." Ann পশ্চাদ্ধাবন করে Tanner-এর, এবং পরিশেষে পুরুষের মননশক্তি অর্থাৎ জৈবশক্তি ছাড়িয়ে জীবোত্তর মনুষ্যত্বে (supermanএ) পৌঁছাবার প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়। Tanner আত্মসমর্পন করে Annএর কাছে এবং মজার কথা এই যে, এই আত্মসমর্পণের মধ্যে দুঃখের গ্লানি থাকে না কোথাও—যে কথা Tanner পূর্ব্ব হতেই জানতো—"That's the devilish side of a woman's fascination, she makes your will, your own destruction."

নাটক হিসাবে Man and Superman প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হয় এবং 'Man and Superman'এর theory of life force এবং theory of superman সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিচিত্রতর অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত বর্জ্জন করে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, বার্ণার্ড শ' নারী ও পুরুষের পৃথক উদ্দেশ্য দেখাতে গিয়ে যদিও নারীকে অধিকতর শক্তিময়ী করে চিত্রিত করেছেন তথাপি নারীকে পুরুষের কাছে হীনতর উদ্দেশ্যবাহীরূপে সৃষ্ট করেছেন। মননশক্তির অধিকারে বঞ্চিতা নারী কেবল জৈবশক্তির দূতী সে, মহত্তর সাধনার প্রতিবন্ধক, মুক্তির বিরোধী। কিন্তু সত্যই কি তাই? নারীর মন কি পুরুষের মনের সহগামী নয়?

এই বিরাট প্রশ্নের অকস্মাৎ উত্তর এসেছে Saint Joan-এর মধ্যে। Saint Joan বার্ণার্ড শ'এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এ পর্য্যন্ত শ' এর লেখার মধ্যে আমরা একটি বিশেষ technique দেখে এসেছি। Shawএর নাটকের চরিত্রগুলি যথার্থ মনুষ্য-চরিত্র নয়, অর্থাৎ যে মানুষ সুখে দুঃখে, আচারে আচরণে, কর্ম্মে ও চিন্তায়, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সামঞ্জস্য করে এসেছে। তাঁর চরিত্রগুলি রূপ দেবার পূর্ব্বে অনেকখানি প্রস্তুতি আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি নাটক রচনার পূর্ব্বে তাঁর বক্তব্য ও মতামতগুলি যে ভাবে যুক্তি-তর্ক ও প্রস্তাবনা-বিরোধিতার মধ্যে তিনি প্রকাশ করতে চান, সেই অনুযায়ী তাঁর বিভিন্ন মতামতের মুখপাত্রস্বরূপ। বিচিত্র নরনারীর সৃষ্টি হয়ে এক একটি বিশেষ মানুষই—এক একটি বিশেষ টাইপও সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে বুদ্ধির শানিত দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকটি নাটকই আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু কোনও বিশেষ চরিত্রেই আমরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি সমতুল হৃদয়বৃত্তির সন্ধান পাই না। শ'এর নাটকের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির কোনও কারবারই নেই কোনো চরিত্রে। কিন্তু চরিত্রকে ছাড়িয়ে যেখানে সমগ্র নাটকটিকে বিচার করা যায়, সেখানে আমরা ঠিক এই জিনিসটি দেখতে পাই না—সে কথা পরে। এখন Saint Joanএর সঙ্গে অন্য নাটকগুলির যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে, সেইটিই দেখবো। শ'-এর প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই দেখেছি নিজস্ব সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতিই একটি বিশেষ কারুণ্য মিশ্রিত ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছে লেখকের লেখনীর মধ্যে এবং সেই ব্যঙ্গের কবল হতে নায়ক নায়িকারও নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু Saint Joanএর মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছি। ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, ধর্ম্মযাজকগণের দম্ভ ও বাহ্যাড়ম্বর এবং ধর্ম্মকে রাজনীতির ক্রিড়নক ও উদ্দেশ্য সাধকরূপে নিয়োজন করার মধ্যে যে হাস্যকর পরিস্থিতির দৃশ্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা শ'এর লেখনী চরিত্রের স্বাভাবিকতারই স্ফুরণ। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানেই যেখানে দেখি Joan চরিত্র অঙ্কন

করতে গিয়ে মুখর লেখনী অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ক্ষুরধার লেখনী মানুষের intellectuality এবং reason-এর দিকই এতদিন জেনে এসেছে, সেই লেখনী শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ল একটী গ্রাম্য বালিকার বিশ্বাসের সারল্যের কাছে—"It is God's business we are here to do, not our own···the voices come first; and I find the reason after···" বার্ণার্ড শ'এর রচনার মধ্যে এই প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি পরাজয় স্বীকার করেছে হৃদয়বৃত্তির কাছে। নারী শুধু জৈব প্রকৃতির দূতীই নয়, মহত্তর সাধনার অধিকার আছে তার, মহত্তর জীবনের স্বপ্নকে সেও প্রতিষ্ঠা করতে পারে প্রকৃতির দেওয়া এই জীবনের মধ্যেই। Man and Superman-এর বিবাক্ত সম্মোহনের পর চেতনা জেগে যেমন বলতে ইচ্ছা করে—"ধিক্ রমণীরে শতবারে ধিক্—হত লাজ বিধি তোমারে ধিক্", আবার Saint Joan-এর পরিচয় পেয়ে তেমনই আসে বহু প্রতীক্ষিত আশ্বাস, "ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা, সৃজেছ আমারে রমণী করি।"

Ann-এর মধ্যে নারী চরিত্রের একদিক দেখে আমরা শিহরিত হয়েছি—Ann মিথ্যাবাদী, Ann coquet, Ann ঈর্ষ্যাপরায়ণা। তবুও সে যে Perfect Woman, এইটুকু বোঝার জন্য Bernerd Shaw কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি রাখেন নি। আবার দেখি Joan—সেও নারী—কিন্তু কৈ এ নারী তো জৈব প্রকৃতির দূতী নয়, মানুষের মহত্তর সাধনার তপোভঙ্গ করতেও সে চায় না—বরং তার নারীত্ব এই তপস্যাতেই নিয়োজিত—"I am a soldier! I do not want to be thought of as a woman. I will not dress as a woman. I do not care for the things women care for. They dream of lovers, and of money. I dream of leading a charge and of placing the big runs...I am not a dare devil, I am a servant of God". এ নারীত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

তবে কি সবটুকুই শ'এর Intellectual Jugglery? না—প্রথম কথা, বার্ণার্ড শ' ভালবাসেন তাঁর স্বজাতি মানুষকে। তিনি বিচারকও নন, সংস্কারকও নন, তিনি দ্রষ্টা। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁর লেখনীতে সহানুভূতি নেই—কিন্তু বিচারকের নিরপেক্ষ কাঠিন্যও নেই—বিভিন্ন মানুষের ত্রুটী-বিচ্যুতি দুর্ব্বলতাকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে এসেছেন এবং বারবার এই কথাই প্রমাণ ক'রেছেন যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিচারেরও পরিবর্ত্তন হবেই। মানুষকে বোঝা বা দেখা সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি বা একপক্ষীয় যুক্তির দ্বারা সম্ভবপর নয়। লজিকশাস্ত্রে মানুষের সংজ্ঞা যদিও Man is a rational animal, কিন্তু মানবিক শাস্ত্রে তা নয়। Reason-এর উপরে যা আছে তা' হৃদয়। মানুষকে বুঝতে, জানতে হবে হৃদয় দিয়ে। এই হৃদয়ের মধ্য দিয়েই দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিতকে। মানুষের চরিত্র—তার স্খলন, পতন, ত্রুটীর প্রায় সবটুকুই নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকের উপর—সেইটুকুই বার্ণার্ড শ' দেখিয়েছেন—Mrs. Warren's Profession-এ। Mrs. Warren সহরে কোন্ এক রহস্যপূর্ণ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করেন—তাঁর মেয়ে Vivie তাঁর থেকে বহু দূরে সেই অর্থে শিক্ষা ও সম্মানে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন ক'রেছে। এই অবস্থায় মাতা-কন্যার মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। জননীর আচার-ব্যবহারে সন্দিগ্ধা হয়ে ওঠে Vivie—কোথা হ'তে কোন্ পথে তাদের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার সঙ্গতি আসছে? সন্দেহ দৃঢ় হবার 'পর Mrs. Warren-কে challenge ক'রে Vivie—অস্বীকার করে তাঁর মাতৃত্ব; জানায় তার নিজের শিক্ষা, সম্মান এবং সমাজ তাকে জীবনের যে পথ দেখিয়েছে সেই পথের সঙ্গে তার জননীর কোন সংস্রব নেই। অপমানিতা Mrs. Warren আক্রমণের প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে প্রতিবাদ—করেন—কেন Vivie তার way of life সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে? "Oh, I won't bear it; I won't put up with the injustice of it. You boast of what you are to me—to me who gave you the chance of being what you are. What chance had I"...

Vivie: "Don't think for a moment I set myself above you in any way. I shall always respect your right to your own opinion and your own way of life."

এইখানে Mrs. Warren ব্যঙ্গমিশ্রিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মতামত? অধিকার? My own opinions and my own way of life! Do you think I was brought up like you? Able to pick and choose my own way of life? Do you think what I did because I liked it, or

thought it right, or would not rather have gone to College and been a Lady if I'd had the chance ?...

Mrs. Warren তাঁর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেন। কোন পথ বাছাই করবার উপায় ছিল তাঁর ? এক বোন তাঁর সীসার কারখানায় কাজ করতে করতে মারা গিয়েছে বিষাক্ত আবহাওয়ায়। আর একজন দুঃসহ দারিদ্র্যের সংসারে মাতাল স্বামীর হাতে স্বাস্থ্য ও যৌবনকে লাঞ্ছিত ক'রে এসেছে—সৎপথে থাকার পুরস্কার এই। তৃতীয়তঃ, কেন তথাকথিত অসৎপথে স্বচ্ছল সম্মানের জীবনযাপন করছে। শেষোক্ত পথই Mrs. Warren বেছে নিয়েছেন—আজ যদি তিনি অপর দুই বোনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতেন তবে বর্ত্তমানের সুখ, সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য, Vivie-র শিক্ষা, Tripos, way of life কোথায় থাকতো ? "Why should not I have done it ? Would you have had the stay in them and become a worn out old drudge before I was forty ?"

Mrs. Warren-এর যুক্তির বিরুদ্ধে Vivie আর কিছু বলবার খুঁজে পায় না। শুধু বলে, Mrs. Warren-এর যখন সুদক্ষ পরিচালনার ক্ষমতা আছে, তখন কেন তিনি অন্য ব্যবসায়ের পথ ধরেন নি ? এর উত্তরে Mrs. Warren জানান— "All we had was our appearance and our turn for pleasing men. What is any respectable Girl brought up to do but to catch some rich man's fancy and get the benefit of his money by marrying him ? As if a marriage ceremony could make any difference in the right or wrong of the thing".

তথাকথিত নীতির দিক দিয়ে Mrs. Warren-এর চরিত্র হয়তো দোষনীয়, কিন্তু শক্তি ও দৃঢ়তায় সে চরিত্রের তুলনা নেই। সবল যুক্তির আঘাতে প্রতিপক্ষকেই শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। নিজের সম্পর্কে লজ্জিতা হবার কোনই কারণ খুঁজে পান না তিনি—"I never was a bit ashamed really. I consider I had a right to be proud I always knew how to respect myself and control myself. I despise such people (who think their luck will last for ever); They have no character, and if there's a thing I hate in a woman, it's want of character."

এইবার সমালোচনার প্রথম দিকে ফিরে যাওয়া যাক্। আলোচিত তিনটি নাটকের মধ্যে লেখকের তিনটি বিশিষ্ট রূপ দেখতে পাচ্ছি। একটিতে নারী জৈব প্রকৃতির দূতী, আর একটিতে নারীত্ব মহত্ত্বর সাধনায় নিয়োজিত—আর একটিতে নারী প্রমাণ করছে—চরিত্রের দৃঢ়তা ও শক্তিই বিচার্য্য, তথাকথিত নীতি বা দুর্নীতি নয়। কোনটি বার্ণার্ড শ'-এর নিজস্ব দর্শন বা জীবন সম্বন্ধে অভিমত ? এখানে এইটুকুই আমরা বলতে পারি যে, বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে মূলগত ঐক্যটী ধরা প'ড়েছে তা' লেখকের স্বকীয় রূপ—তিনি সংস্কারকও নন—থিয়োরিষ্ট—একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল নাট্যকার। সমাজের বিভিন্ন নরনারীর বিচিত্র রূপ তিনি দেখে এসেছেন এবং সে দেখার মধ্যে কোনও দৃঢ়মূল সংস্কারও নেই এবং পূর্ব্বারক্ত ধারনা নেই। স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে বিভিন্ন সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—কিন্তু সমাধানের চেষ্টা না করেই সেই ভুলের মাঝেই পড়ছে যবনিকা। যুক্তিবাদীর কষাঘাতে আদ্যোপান্ত যে নাটক প্রত্যেকটি নরনারীর নগ্নরূপ তুলে ধরেছে, হৃদয়বৃত্তির সহজ প্রাবল্যে নাট্যকার মানুষের ভুলকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাকে অসমাপ্ত রেখে ভুলের মধ্যেই সে নাটকের যবনিকা টেনে এনেছেন।

দিব্য আঁখির রশ্মিকুসুম

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

যাক্ এ রজনী
যাক্ সে এখনি
আঁচলে বাঁধিয়া অগণিত মণি—
মণ্ডিত-মালা চলে যাক্
(দূর) গগনের পারে উড়ে যাক্
নিঃস্ব মনের দুঃস্বপনের
রহস্যজাল পুড়ে যাক্,
ঊর্ণনাভির জীর্ণ তন্তু
ছিঁড়ে যাক্ ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্,
(শুধু) তমসার পারে
কিনারে কিনারে
রশ্মিকুসুম থরে থরে থরে
সুপ্ত নয়ন প্রফুল্ল করে
ফুটে থাক্।

ঝরায়ে অঝোর আলোর ঝরণা
আয়লো উর্বসী আগুন বরণা
বেঁধে নিয়ে তোর রশ্মি বীণার
স্বর্ণ তন্ত্রী গুটি সাত
(সেই) সপ্ত-তন্ত্রী করি ঝঙ্কার
অতি উদাত্ত তুলি ওঙ্কার
সত্যেরে, চিরসুন্দরে—
শিব শঙ্করে করি প্রণিপাত।
ঝিল্ মিল্ করে সোণালি আলোক
মিতালির মোহে মিলিয়াছে লোক
ফাল্গুনী মোহে
নরনারী দোঁহে
গাঁথিয়া পরেছে মালতী,
রাঙা হয়ে উঠে পলাশের ফুল
ফুটিয়া উঠেছে রসাল মুকুল
মাধবী কুঞ্জে গুঞ্জনে ভৃঙ্গে
দোঁহারে যুবক যুবতী।

দিগ-বিদিকের শুধু এক দিক
আঁখিতে আঁখিতে চায় অনিমিখ
মনে পড়ে পরে
ভরা অন্তরে
ছল করে ঘরে ফিরিবার
সাথে লয়ে শুধু স্মরণ-সুরভি
সপ্ত পর্ণ বীথিকার।

আঁখি ছল ছল্
হৃদয় উতল
দখিনা পবন ঢালে পরিমল,
এক পা বাড়াতে পিছু ফিরে চায়-দুটী পা—
বকুলের মত ঝরে বুঝি পড়ে
আকুল-হৃদয় দুটী বা!

(ছিল) আলোকের মণি
যে পরশ-মণি
প্রত্যুষ হ'তে প্রদোষে,
(এই) মেঘ ছায়া ঘন ঝঞ্ঝাপবনে
কোথায় লুকালো বলো সে,
চুম্বিয়া যার কিরণ কণিকা
নদীজলে ঢেউ ছলকে,
মরণের বীণে জীবনের গান
গুঞ্জরি উঠে পুলকে,

প্রলয়ে সৃজনে সে ইন্দ্রজাল
সুরু কাল হ'তে চলে সারাকাল
কুঁড়ি হতে ফুল
ফুটিলে দোদুল
কত বুলবুল গায় গান,
কত না ভৃঙ্গ কত প্রজাপতি
তবু তার নাহি যায় মান—
সেই মানিনীর এত অভিমান!

তাই ঝরে পড়া তার লিপি বিধাতার
ঝরে পড়া তার পরিণাম
না না, ঝরে পড়ে তো না
মাটির উপরে
লুটাইয়া করে পরণাম।
(তাই) যত পড়ে ঝ'রে
করুণায় ভ'রে
তত অভিরাম হয় সে,
সে যে অকূলের কোলে
কূল হারা ফুল
আপনারে ভুলি রয় সে।
(হয়) ধূসরিত ধূলিময় সে,
(তবু) ধূলায় পড়েও পাণ্ডুরা হাসি
বিদায় বারতা কয় সে।
ফাগুন ভুবনে লাগে কম্পন
ক্রন্দসী বুঝি করে ক্রন্দন
অবনীর নব অবগুণ্ঠন
মহাকাল খুলে দেয় তার,
রাঙানো রঙন অশোক পলাশে
মন খুলে বলে নিজ অভিলাষে
চকিত নয়নে চায় চারি পাশে
প্রাণ চায় যারে তারে চায়।
(তারি) অন্তঃপুরে আসে বসন্ত
অন্তর-মধু-পিয়াসী,
পারায়ে মৌন মহাপারাবার—
বাচিয়া পরিতে সে ফাঁসি।
রবি-রশ্মির রমণীয় রূপ
হর্ষে শিহরে প্রতি রোমকূপ
তৃণে ও পর্ণে
বিনায় বর্ণে
অবর্ণনীয় মালা,
(তারি) পর্ব্বে পর্ব্বে বন্দনা বাণী
জপে বিরহিণী বালা।
(সেই) অনুরাগে রাঙা বৈরাগিনীর
অক্ষমালিকা গলে—
(তারি) ধুকধুকি খানি মধ্য মণির
ঝিকি ঝিকি যেন জ্বলে।

আলোকে পুলকে বন্দনায়
চেতনা সিন্ধু ছন্দ পায়—
কম্পিত মীর মূর্চ্ছনায়
বেজে ওঠে কার বাঁশী—
(যার) সুরে সাড়া দিয়ে বলে এই প্রাণ
এই আসি এই আসি—
আমি ইহারেই ভালোবাসি।
আসুক সে আলো—
কালো চলে যাক্
পারায়ে তেপান্তরী,
কালভৈরব নিয়ে চলে যাক
জলদ কাদম্বরী—
(তার) ডম্বরু ডম্বরী।
এই আলোকের অ-বাক যে বাণী
দেয় সে ইসারা দেয় হাতছানি
সে রাগিণী রাগে
ফাগুয়ার ফাগে
রাঙায় রঙ্গভূমি—
নব দূর্ব্বার ভাজিম বিছায়ে
তোমার চরণ চুমি।
অবারিত আলো উজল নবীন
আরো বেশী ভালোবাসি প্রতিদিন
নির্জ্জনে বসি রজনী-বিহীন
চাহি না রাতের কালো;
মত্ত করি পান
আপূর্য্যমান
আরো চাই তত আলো,
আরো আলো, ওগো, আরো আলো দাও
আলোরেই বাসি ভালো।
ছি ছি ছি! মাগো মা! কালো মিশ্ মিশ্,
কালিয় সাপের কালকূট বিষ
কালো দেখিলেই করে বিষপিষ
অন্তর বিষে বিষায়ে—
(ওগো) আলো দাও মোরে
বুক ভরে ভরে—
আলো দাও মোরে
ত্রিনয়ন ভরে
বর্ণমালার সাতনরী হার
কণ্ঠে সে লব মিশায়ে,

আলোরেই ভালো বাসি চিরকাল
                বাসিয়া মেটে না তৃষা এ।
রূপকথা পুরে সে মায়ার পুরী
ইরাণ-তুরাণ আরবের হুরী
অপাঙ্গে-হানি নয়নের ছুরি
                ধৈর্য্য করিল চুর,
আরো আলো দাও আরও দাও সুর
হৃদয়ে বাণীর বন্যা মধুর
মন্দাকিনীর আনন্দ নীর
                নূপুরে ছন্দ পুর
                তবু—অন্তর সুবিধুর।
আকাশে-নীলিম আলোর বন্যা
                শ্যামল সোহাগে ঢালা,
ধরণী ধন্যা স্রোতস্বিনীর
                বাণীর বন্যা আলা—
আলোর রাগিণী আলোকের সুর
নারিকেল তালে বাজায় নূপুর
করে করতাল হিন্তাল পাল
                বাজায় সে ধ্বনি,
কাহারে কাকুতি কাহারে মিনতি
                করে মান ভঞ্জনি।
লোভন নয়নে শোভন কাজল
তার আঁখিজল করে ঢল ঢল
সরসীর পরে প্রভাত কমল
                সর্ব্বাভরণ হীন—
অন্তর মাঝে ঝঙ্কারি বাজে
                বাণীর স্বর্ণ বীণ
                বেজে ওঠে রিণিরিণ।
উলসিয়া উঠে মুগ্ধালস-হিয়া
                গাহিয়া বাণীর জয়—
রূপ লাবণ্য প্লাবন ধন্য
                মৌন মাধুরী ময়।
বাক্ চলে বাক রাতি
প্রেতাধ্যুষিত রাতি—
ভয় সঙ্কুল মত্ত বিপুল
                দৈত্যের মত রাতি—
অগণিত ফণী ডাকিনী যোগিনী
                প্রেতিনীবৃন্দ সাথী—
ঐরাবতের মত অতিকায় গম্ভীর বেদী হাতী।
বিভীষিকা শিখা
        বিদ্যুৎলিখা
                আগ্নেয় গিরি বুক—
উল্কা আলেয়া খদ্যোৎ মালা
                খেলিবার কন্দুক,

(করি) বেদনার ছল
        বাষ্প বিহ্বল
        আঁখি ছল ছল
        গলিত কাজল
                কালকূট পয়োমুখ।
আঁধারের ধারা ঝরে অবিরল
নিবিড় নিকষ কালো কুন্তল
                অন্ধ বধির রাতি,
ক্ষণিক আলোকে ঘনীভূত হয়
                তামসী নেশায় মাতি,
দেখিনা শুনিনা অনুমান করি
                চক্ষু শ্রবণ পাতি।
থাক দিনমনি
মহা মহীয়ান
তমসার পারে চির অম্লান,
ওঠে না নাবে না
নেবে না ডোবে না
                দীপ্ত অনির্ব্বাণ।
অমৃতোৎ সার
রশ্মি তাহার
                শাশ্বত ভাস্বান,—
                এক সে বিবস্বান।
উদয় নাই
অস্ত নাই
অবগুণ্ঠন কুণ্ঠা নাই,
ছায়া যবনিকা
        মায়া বরণিকা
                জালা বর্ণিকা
                পুড়িয়া ছাই।
শুধু আলো, শুধু অরুণ আলোক
নাই শোক মোহ নাই নির্মোক
শুধু আলো আর শুধু আনন্দ
শুভ্র স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ,
শুধু প্রেম
শুধু নিকষিত হেম
চক্ষে হেরিয়া—বক্ষে পেলেম
যুগ যুগান্তে
                জীব জীবান্তে
                লিখিনু পান্থ সে ইতিহাস,
শুধু আলো আর শুধু ভালোবাসা
                শুধু আনন্দ অমৃত স্নান—
পূর্ণ ধন্য মৌন মগ্ন
                মগ্ন তবু নিমজ্জমান।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

আমার কৈশোরের সঙ্গিনী সাবিত্রী ছিল গরীবের ঘরের রূপসী মেয়ে। গরীবের ঘরে মেয়ে জন্মালে মা বাপের হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে না; তার বিয়ের ভাবনা ভেবেই তাঁদের মনের সবটুকু সুখ নিঃশেষ হয়। তার উপর মেয়ে যদি কুরূপা হয় তবে ত কথাই নেই—দুর্ভাবনা চরমে পৌছয়।

সুখের বিষয় সাবিত্রীর মা-বাপের মনে মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা আত্ম-প্রকাশের অবকাশ পায়নি। মেয়ের অতুলনীয় রূপই তার অমূল্য যৌতুক হবে আশা করে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাৎসল্যের বাহুল্যেই হো'ক বা মেয়ের রূপশ্রীর মোহেই হো'ক তাঁরা জেগে স্বপ্ন দেখতেন—রূপ-কথার রাজপুত্রের মত কত ধনীর দুলাল এসে দুয়ারে ধন্না দেবে সাবিত্রীর জন্যে। এই মোহের জড়িমাই ভাবাবিষ্ট করে রেখেছিল তাদের অন্তর যে পর্য্যন্ত না সাবিত্রী যৌবনে পা দিয়েছিল।

নিঃস্ব ভবতারণের ভাঙা ঘরে সাবিত্রী ছিল অনেকটা শারদ-পূর্ণিমার এক ঝলক ঝলমল আলো। তার রূপের জ্যোৎস্নার মাধুরিতে পিতা ভবতারণের তুচ্ছ ঘরখানি সত্যই সে সুন্দর ও মধুর করে তুলেছিল। তাই সংসার-সাগরে সাবিত্রীর রূপের নোঙর ফেলে উদাসীন ছিলেন তাঁরা। রূপে যদি সে বিকোয় ত বিকোবে, নইলে তাঁরা নিতান্তই নাচার।

ভবতারণ ছিলেন একজন হোমিও ডাক্তার। নবদ্বীপে তমালতলা লেনে একটি জীর্ণ বাড়ীতে বাস করতেন। ডিস্‌পেন্সারী বল্‌তে তেমন কিছু ছিল না তাঁর; থাকার মধ্যে ছিল একটি ওষুধের বাক্স আর খান কয়েক বই। যে ঘরে সাবিত্রী এবং তার দাদা নির্ম্মলেন্দু পড়াশোনা করত ভবতারণও সেই ঘরেই রুগীদের দেখতেন। এতে ছেলে মেয়েদের পড়ার যে বিঘ্ন হত না। ভবতারণের পূজা-আহ্নিক শেষ করে উঠতে বেলা ন'টা বেজে যেত; আর ততক্ষণে ছেলে মেয়েও নেয়ে-খেয়ে ইস্কুলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ত।

ঘরে আসবাব পত্র তেমন কিছু ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল জীর্ণ সতরঞ্চি-পাতা একখানা তক্তাপোষ আর একখানা কাঠের বেঞ্চী যার একটা পায়ের অভাব দূর করেছিল খান কয়েক সাজ'নো ইট। ঘরের দু'দিকে দু'টি কুলুঙ্গীর একটিতে থাক্‌ত ওষুধের বাক্স আর বই কয়খানি, অপরটিতে থাকত হারিকেন। আঁধার রাতে রুগী দেখবার ডাক আসলে এই হারিকেনটিই তাকে অসময়ের বন্ধুর মত হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিত।

ভবতারণ কোন দিনই ডাক্তার বলে নিজের পরিচয় দিতেন না। রুগীরা 'ডাক্তার বাবু' বলেই ডাকত আর তা থেকেই তাঁর ডাক্তার খেতাব কায়েম হয়েছিল। ভবতারণ কোন দিন কোন ডাক্তারী ইস্কুলে-কলেজে পড়েননি; হাই ইস্কুলে পড়া সাধারণ বিদ্যা আর স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে পেশাদারী বিদ্যায় অসাধারণ অভিজ্ঞ করে তুলল।

অপূর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে রুগীর ধাতুগত, দৈহিক ও মানসিক রোগ-লক্ষণের সঙ্গে ওষুধের লক্ষণ মিলিয়ে এমন নির্ভুল ভাবে ওষুধের ক্রম, মাত্রা ও পরিমাণ স্থির করতেন যাতে অধিকাংশ রুগীই আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ে সেরে উঠত। শুধু ওষুধের ব্যবস্থা করেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন না; প্রাণের দরদ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর হাত-যশ আর রুগীর জন্য দরদের কথা ফুলের গন্ধের মতই বিনা বিজ্ঞাপনে ছড়িয়ে পড়ল। ভবতারণের সুনামের প্রসার দেখে স্থানীয় ডাক্তার কবরেজ তাঁকে 'হাতুড়ে' ও 'গো-বদ্যি' বলে শ্লেষ করত আর তাতে তাদের আনন্দও হত প্রচুর।

রুগীর সংখ্যা ও হাত-যশ বৃদ্ধি পেলেও ভাগ্যলক্ষ্মী ভবতারণের প্রতি প্রসন্না হলেন না। রুই-কাৎলা

জাতীয় রুগীর চিকিৎসা-সৌভাগ্য জীবনে কোন দিনই হয়নি তাঁর। দীন-দরিদ্র চুনোপুঁঠি রুগীই ছিল তাঁর সংসার প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল। এদের মধ্যে দশ আনাকেই তিনি বিনা 'ভিজিটে' দেখতেন এবং ওষুধও দিতেন বিনা মূল্যেই। সময় সময় অবস্থা বিশেষে পথ্যাদিও তিনিই যোগাতেন।

বাকী ছ' আনা রুগীর নিকট হতে প্রতিমাত্রা ওষুধের জন্ত এক আনা মূল্য, আর ন'-মাসে ছ'-মাসে দূরের রুগী দেখতে গিয়ে 'দর্শনী' বলে সামান্ত যা কিছু পেতেন তাতেই তাঁর ছোট সংসারটি চালিয়ে নিতেন কায়ক্লেশে। ঘরে নাম-মাত্র একটি লক্ষীর কৌটা থাকলেও কোন দিনই এক সঙ্গে পাঁচটি টাকাও সঞ্চয় হয়নি তাতে।

এই দরিদ্র পরিবারকে কেন্দ্র করে খেয়ালি অদৃষ্টদেবতা আমার প্রথম জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিলেন তারই কথা আজ বলছি।

দুই

আগুনের একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ কী না অনর্থ ঘটাতে পারে। তেমনি তুচ্ছ একটি-দুটি সাংসারিক ব্যাপারও অনেক সময়ই লোকের জীবনে প্রলয় ডেকে আনে। আমার জীবনেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল মার দেহান্তের পর।

জন্মাবধিই আমি ছিলাম ঠাকুমার আদুরে গোপাল। তেরো বছরের সময় মা যখন একদিন পূজার ফুলটিরই মত পরমপিতার চরণতলে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লেন সেই থেকে আরো বেশী আঁচল-ধরা হয়ে পড়লাম ঠাকুমার। অচিরেই নতুন মা পেলাম; কিন্তু তাঁর নিকট মায়ের স্নেহ পেয়েছিলাম বহুদিন পরে।

মা ছ'মাসের ওপর জ্বরে ভুগছিলেন। চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা, পথ্যাদির কোন কসুর হচ্ছিল না। সহরের সেরা ডাক্তার দেখতেন, ঠাকুমা, বেহারী মামা, আর অনেক কালের ঝি শিবুর-মা প্রাণ দিয়ে সেবা যত্ন করত। এ-সবই ভস্মে ঘি ঢালারই মত বৃথা হল। অবস্থা দিন-দিনই মন্দের দিকে যেতে লাগল। মা'র অমন সোনার মত রং ফিকে হল, চোখের কোলে কালি পড়ল, শরীর এত দুর্বল হল যে অন্তের সাহায্য ছাড়া পাশ ফেরবারও শক্তি রইল না। প্রায়ই চোখ বুজে পড়ে থাকতেন; কচিৎ কখন বসে-যাওয়া চোখ দুটি আধো মেলে আমার পানে চাইতেন। তাঁর চাউনিতে আগেকার দীপ্তি বা সজীবতা ছিল না। কোথা থেকে রাজ্যের ঘুম এসে যেন তাঁর চোখের পাতায় ভর করেছিল। সেই কঙ্কাল-সার দেহের প্রাণটুকু যেন কণ্ঠায় এসে ধুক্ ধুক্ করছিল। ডাক্তার—কবিরাজ তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন; আর বাড়ীর লোকও কখন কি হয় ভেবে দিন কাটাচ্ছিল।

এমন একটি উদ্বেগপূর্ণ দুর্দিনের আসন্ন অপরাহ্নে ক্ষেমী পিসির আগমনে বাড়ীর থমথমে ভাবটা কিছু দূর হলেও—নিস্তব্ধ বাড়ীটা মুখর হয়ে উঠল।

কি জানি কেন ক্ষেমী পিসিকে দেখলেই আমার মনের মধ্যে একটা বিরক্তি দৈত্য দানবের মত মাথা নাড়া দিয়ে উঠত। সে দেখতে বদখৎ ছিল তা না, ঝগড়াটেও ছিল না; হাসি-হাসি মুখে সকলের সঙ্গেই সে মিষ্টি কথা কইত। তবে কেন তাকে দেখলেই আমার মন অমন বিষিয়ে উঠত? শুধু কি আমি? আমার মাও তাকে দেখলে বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। তাঁর মুখের হাসি নিমিষেই মিলিয়ে যেত। সৌজন্যে সুমার্জ্জিতা, স্বভাবে সুশীলা ছিলেন বলে কোন দিনই তাকে জানতে দেননি কী বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ছিল তার ওপর। তখন কারণ জানতাম না বলে মনে আমার বিস্ময় জাগত, অমন দেবীর মত মা আমার, তিনি কেন অত বিরাগ পোষণ করতেন ক্ষেমী পিসির উপর। পরে যখন ক্ষেমী পিসির জীবনের খাঁটি ইতিহাস জানলাম, তখন এই বিস্ময়ের সমাধান হয়ে গেল—মার মহত্ত্বে, দেবীত্বে হৃদয় আমার ভক্তি-শ্রদ্ধায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

ক্ষেমী পিসি যে শুধু আমাদের বাড়ীই আসা-যাওয়া করত তা নয়। সে ছিল ডাকসাইটে পাড়া-বেড়াণী। খাওয়া হলেই বেরিয়ে পড়ত, সহর আর সহরতলীর নানা পরিচিত বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা জমাত। বছরের একটি দিনও কামাই ছিল না তার। পরিচিত মহলে সে ছিল কুৎসাকাহিনীর একটি ছোটখাটো গেজেট।

সে পঞ্চমুখী হয়ে দেশশুদ্ধ লোকের কুৎসা গেয়ে তার ভক্ত গুষ্টির মনস্তুষ্টি করত। শুধু কি তাই? সে বুড়ীদের পাকা চুল বেছে দিত, বৌ-দির চুল আঁচড়ে তাদের পছন্দ মত খোপা বেঁধে দিত আর কচি-কাচাদের মন ভোলাতে দেশ-বিদেশের রূপকথার পসরা সাজিয়ে বসত। এক কথায় সে ছিল লোকের মন চুরি করবার সোনার সিঁধ কাটি।

আমাদের বাড়ীতে ক্ষেমী পিসির ঘন-ঘন আসা-যাওয়া ঠাকুমা তেমন পছন্দ করতেন না। নিজে সেকেলে ধরনের ছিলেন বলে পাড়ার মধ্যেও কোন বাড়ী যেতে হলে একা একা যেতেন না; আমাকে, বেহারী মামাকে, না হয় শিবুর মাকে সঙ্গে নিতেন। মা বড় কোথাও যেতেন না। ন'মাসে ছ'মাসে কারুর বাড়ী যেতে হলে আমাদের মধ্যে যাকে হোক সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাই মাও ক্ষেমী পিসির একা একা টংটং করে যেখানে-সেখানে ছুটাছুটি সুনজরে দেখতেন না। ঠাকুমা ত একদিন একটু কড়া করেই বললেন—হ্যাঁরে ক্ষেমী, তোকে কি ভুলেও একদিন ঘরে থাকতে নেই? এই কাট-ফাটা রোদে তেতে-পুড়ে নিত্যি পাড়ায় পাড়ায় পাহারাওলার মত টহল দিতে অরুচি হয় না?

কথাটা ক্ষেমঙ্করীর আঁতে ঘা দিল কিনা জানবার উপায় ছিল না। সে ছিল যাকে বলে গভীর জলের মাছ; কারুর কাছেই মনের আসল রূপটা সহজে ধরা দিত না। একগাল হেসে সে জবাব দিল—না জ্যেঠাইমা, অরুচি হয় না। খেয়ে-দেয়ে একটু না বেরুলে পেটের ভাত হজম হয় না—মন নেতিয়ে পড়ে।

ঠাকুমা বিরক্তির হাসি হেসে বললেন—মন ত নেতিয়ে পড়ে, কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে ঘরে একা ফেলে যে সারাদিন বাইরে ঘুরিস, ভয়-ডর করে না?

ক্ষেমী পিসি একথার কোন জবাব দেয় না—পাশ কাটিয়ে মা'র ঘরে যায়, নয় ত আবান্তর কথার চাপা দেয়।

মার খুব ভাল খাবার তৈরী করবার সখ ছিল। স্বভাবতই শরীরটা কাহিল ছিল বলে রোজ করা সম্ভব হত না; শুধু রবিবারে করতেন। ঠাকুমা বাজারের নোস্তা-খাবার খেতেন না বলে মা মিষ্টি ও নোস্তা দু'রকম খাবারই তৈরী করতেন।

চন্দ্র-সূর্য্যের মত ক্ষেমী পিসিরও পাড়ায়-পাড়ায় উদয় অস্তের একটা ধরাবাঁধা সময় ছিল। তার নিয়মিত ভ্রমণ-চক্রের মধ্যে যে সব বাড়ী পড়ত তার প্রত্যেকটিতেই পদার্পণের সুপরিকল্পিত দিন-ক্ষণ ছিল। আমাদের বাড়ীতে তার শুভাগমন হত কি রবিবার বিকেল তিনটায়—মা যখন খাবার তৈরী করবার জন্তে হেসেলে ঢুকতেন।

যেখানে স্বার্থের লেশটুকুও থাকত সেখানেই ক্ষেমী পিসি নিজেকে সময় ও অবস্থার উপযোগী করে নিতে পারত। সে জানত আমাদের বাড়ীর কেউ তাকে দেখতে পারে না; তবু সে প্রতি রবিবারই আসত। কেন? মায়ের কাছে খাবার তৈরী শিখতে। তার সময় ছিল, বুদ্ধি ছিল, মেহনৎ করবার শক্তি ছিল; আর ছিল যা-কিছু নতুন সে-সব শিখবার অফুরন্ত উৎসাহ। সে জানত অল্প-ভাষিণী মা আমার পরের কথায় থাকতেন না, পরের কুৎসায় কান দিতেন না। এ-সব জানত বলেই ক্ষেমী পিসি মার কাছে মাছের মতই মুখটি বুজে থাকত—স্বার্থেও বটে, শ্রদ্ধায়ও বটে।

ক্ষেমী পিসির আমাদের বাড়ী আসার উদ্দেশ্যই মা'র অলক্ষ্যে হাতে-কলমে খাবার তৈরী করা শিখে নেওয়া। সে জন্তই মা চান আর নাই চান, সে পায়ে-পড়া হয়েই ময়দা ঠেসে, পেঁয়াজ কেটে, ছানা বেটে, চিনির রস জ্বাল দিয়ে তাঁকে একটু আসান দিত। মা কিন্তু সব বুঝতে পারতেন।

এমনি ক'রেই বাড়ী-বাড়ী ঘুরে ঘুরে নিজের যত্ন-চেষ্টায় ক্ষেমী পিসি কাজ চালানো-গোছ কাট-ছাট, সেলাই, উলের কাজ, ক্রুশের (Crochet) বন্ধনীর কাজ কিছু কিছু শিখে ফেলেছিল। তবে মজা হচ্ছে এই, যে বাড়ীতে খাবার শিখেছে সে বাড়ীতে গল্প জুড়ে দিত শেমিজ-কামিজ সেলাইয়ের, আর যে বাড়ীতে সেলাই শিখেছে সেখানে বিদ্যা জাহির করত পাকা ময়রাণীর। সর্ব্বত্রই সে গর্ব্ব ক'রে বলত—সবাই পয়সা দিয়ে লোক রেখে শিখে, সে কিন্তু শিখেছে শুধু নিজেরই চেষ্টায়।

সংসারে ভাল-মন্দ সব লোকেরই ভাবকও যেমন আছে, তেমনি নিন্দুকও আছে। ক্ষেমী পিসিরও ছিল।

যে ক্ষেমী পিসি কি রবিবারই আমাদের বাড়ী এসে খাবার খেয়ে যেত, নিয়ে যেত, তৈরী করা শিখে যেত, মা'র অসুখের সময় সে একেবারে বে-মালুম গা-ঢাকা দিল। হঠাৎ একদিন তাকে আসতে দেখে একটু বেশী রকমই চমক লাগল আমার। ভাবলাম হয়ত মা'কে দেখতেই এসেছে; কিন্তু তা নয়। সে মা'র ঘরে ঢুকল না; শুধু একটি বারের জন্যে উঁকি মেরে আমার জিজ্ঞেস্ করলে—হ্যাঁরে বিমল, তোর ঠাকুমা কোথায় রে?

—কি জানি কোথায়?—ব'লেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সে আর একতিলও দাঁড়াল না, মা'র ঘরেও গেল না; দুম্-দাম্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আপদ দূর হ'ল ভেবে আমিও হাঁপ ছেড়ে মা'র ঘরের দুয়ারটিতে একখানা বই হাতে ক'রে ব'সে পড়লাম। কান পেতে রাখলাম মা যদি কোন কিছুর জন্ত ডাকেন। ক্ষেমী পিসি নীচে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বকতে-বকতে শিবুর মা উপরে আসল।

ছিঃ! ছিঃ! কি ঘেন্না! হ'ত আমাদের ছোট লোকের ঘর, বিদায় করত মুড়ো ঝ্যাটা মেরে।

আমি সভয়ে জিগ্‌গেস করলাম কি হয়েছে শিবুর মা? কাকে ঝ্যাটা মেরে বিদায় করত?

শিবুর মা বিরক্তির সঙ্গে মুখটা বাঁকিয়ে বললে—কি আবার হবে দাদামনি। যাও, জল খাওগে তুমি। গিন্নী-মা খাবার আগলিয়ে বসে আছেন। যাও তুমি; মা'র কাছে আমি বসছি।

নীচে যেতে-যেতে ঠাকুমার গলার আওয়াজ পেলাম। একটু রাগের সঙ্গেই বল্‌ছিলেন—ক্ষেমা দে ক্ষেমী, ক্ষেমা দে, ও-কথা কি মুখে আন্‌তে আছে!

ক্ষেমী পিসিও খেদের সঙ্গেই বললে—কি আর এমন মন্দ কথাটা বললাম, জ্যেঠী? কবে থেকেই ত তোমরা খরচ লিখে রেখেচো বউকে। আজ হোক, কাল হোক, মধুদার বিয়ে ত দেবেই তোমরা। দিব্বি ডাগর মেয়ে, দেখতেও খুব সোন্দর, আর ঘর-গেরস্থালির কাজেও বেশ গুছানো। পাকা দেখাটা যদি দেখে রাখতে তা হ'লে এমন খাসা মেয়ে হাত-ছাড়া হয় না। আমি তোমাদের ভালর জন্তেই বলছি জ্যেঠী।

ঢের ভাল করেছিস; আর ভাল করতে হবে না তোকে। এখন বাড়ী যা, আমার ঢের কাজ পড়ে আছে।

এই ক'টি কথা ব'লেই আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঠাকুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক্ষেমী পিসি হাত-মুখ নেড়ে বল্‌লে—ও মা, এ আবার কেমন ধারা মানুষ! ভাল কথা বল্‌লাম, কোথায় শুনবে, না উল্‌টে দশকথা শুনিয়ে দিল। আমিও ব'লে রাখলাম বাপু, আমাদের লতিকাই মধুদার কপালে নাচ্‌ছে। দু' দিন বাদে এই ক্ষেমীরই পায়ে ধর্‌তে হবে এ মেয়ের জন্তে। অমন ঘাটের মরা নাকি বেঁচে ওঠে?

আমি চোখ পাকিয়ে কট্‌মট্ ক'রে চাইতেই সে গট গট ক'রে এক ঝাপ্‌টা পাগলা হাওয়ার মত বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। আমি ত রাগে গর গর। যেখানকার খাবার সেখানেই প'ড়ে রইল। ছুটে গিয়ে মা'র বুকে মুখ গুঁজে গুমরাতে লাগলাম। মা তাঁর শীর্ণ ডান হাত-খানি কষ্টে টেনে এনে আমার মাথায় রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লেন—শিবুর মা'র মুখে সব শুনেছি, দুঃখ করিসনে খোকন, ঠাকুমা রইলেন, তোর ভাবনা কি?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললম—ও কেন অমন কথা বললে? ওকে আর ঢুকতে দোব না বাড়ীতে। যাবার সময় ঠাকুমাকে শাসিয়ে গেল; বল্‌লে—তাদের লতিকা না কে তার জন্তে নাকি ওরই পায় ধরতে হবে। কেন মা; তা' হবে কেন? কে মা এ লতিকা?

মা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। মুখ তুলে দেখি ঠাকুমা মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। তার বুকের ভিতর থেকে কান্না যেন ঠেলে বেরুচ্ছিল। তিনি ধরা গলায় বল্‌লেন—ছিঃ বিমল, মাকে কি কাঁদাতে আছে!

মা'র মুখপানে চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু-ধারা ঝ'রে প'ড়ছে। ঠাকুমা নিজের আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মা'র মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে বল্‌লেন—কেঁদো না বউ মা, কেঁদো না। ক্ষেমীর কথার কি কোন মানে আছে, না তার কথা কানেই তোলে মানুষে!

অতি দুর্ব্বল কণ্ঠে একটু একটু থেমে থেমে মা বললেন—আমি ত মা চললাম, ওর আবার বিয়ে দেবেন। তবে ক্ষেমী যে মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে তার সঙ্গে নয়। জানেন ত মা ওদের ঘর? আর খোকনকে আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম। আপনিই ওকে দেখবেন, মানুষ করবেন। আর আমার শ্রাদ্ধে কোন ঘটা না ক'রে সে টাকাটা রেখে দেবেন বেহারীর ভাত-কাপড়ের জন্যে।

এই কথা ক'টি বলেই মা হাঁপিয়ে উঠলেন। আবার ফোঁটা ফোঁটা জল জেগে উঠল চোখের কোণে। মৃত্যু-পথ-যাত্রী মায়ের হৃদয় নিঙড়ানো ছাড়া-ছাড়া কথাগুলি শুনে ঠাকুমার চোখ দু'টিও করুণায় সজল হয়ে উঠল। তিনি হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে মা'র চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—ষাট, ষাট, ও কথা কি বলতে আছে বউ মা। তোমার চাইতেও কত কঠিন কঠিন রুগী সেরে উঠছে, তুমিও উঠবে। তোমার ঘর-সংসার তুমিই করবে মা। বিমলের জন্যে, বেহারীর জন্যে ভাবনা কি তোমার?

মা কিছুক্ষণের চেষ্টায় থেমে থেমে বল্লেন—এ বাড়ীতে বড়ই সুখে ছিলাম মা; মরতে আমার ইচ্ছে যাচ্ছে না। যদি সেরে উঠি ভালই; কিন্তু আমার মন বলছে সেরে উঠব না। আমি মরে গেলে দেখে শুনে একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে যেন ওঁর বিয়ে দেন মা।

ঠাকুমা মমতা-মাখানো স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্লেন—ছিঃ মা, ও কথা কি ভাবতে আছে না বলতে আছে! তোমার মত লক্ষ্মী-পিরতিমেকে যদি হারাই, আমি প্রাণধরে আবার বধূর বিয়ে দিতে পারব না।

মা যেন কি বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। শীর্ণ সাদাটে ঠোঁট দু'খানি একটু কেঁপে উঠেই অসাড় হয়ে পড়ল। চোখ দু'টিও যেন ঘুমের ঘোরে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল।

ঠাকুমা ভয় পেয়ে বাবাকে ডেকে আনিতে বল্লেন।

বাবা সবেমাত্র কোর্ট থেকে ফিরছেন। জামা কাপড়ও ছাড়েননি। আমি ছুটে গিয়ে ওঁকে ডেকে আনলাম। বাবাকে দেখেই ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—বধূ, বউমা যেন কেমন করছে। শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক।

মুহূর্ত্তের জন্য একটিবার মা'র মুখপানে তাকিয়েই বাবা ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুমা, শিবুর মা, বেহারী মামা, আমি মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডাক্তারের জন্য লোক পাঠিয়ে বাবাও এসে মা'র পাশে দাঁড়ালেন। আমাদের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে মাকে আমরা বেঁধে রাখতে পারলাম না। ডাক্তার আসবার আগেই মা'র শেষ নিশ্বাসটি মহাকাশে মিলিয়ে গেল। মা যখন আমাদের মন ও গৃহ অন্ধকার করে পরপারের পথে পা বাড়ালেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে থম্ থম্ করছে তখন বাইরের প্রকৃতি।

[ক্রমশঃ

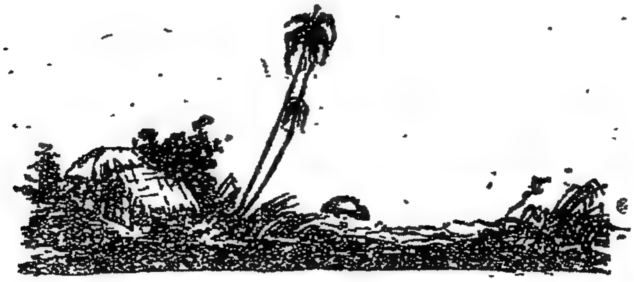

সাধুর কবলে

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী

শহরের উপকণ্ঠে ভোগানন্দ স্বামীর আশ্রম। আশ্রম প্রাঙ্গণ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দে সর্ব্বদা ভরপুর। স্বামিজী বললে আপনারা মনে করবেন তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ বা সন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিক বসনধারী অথবা রক্তবস্ত্র পরিহিত তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ন্যায়—সে অনুমান হবে সম্পূর্ণ ভুল। আমার বন্ধু রমেশ বাবু সাধু সন্দর্শন করতে গিয়েছিলেন সেই আশ্রমে লোকের অর্থাৎ সাধুর ভক্তবৃন্দের ভীড় ঠেলে, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বললেন, তিনি পাপী তাই তার বরাতে সাধু দর্শন হল না। আমি আশ্চর্য্য কণ্ঠে বললাম, "সে কি?"—ঠাকুর সে সর্ব্বক্ষণ বসে থাকেন এই সময়ে। তার কথা শুনে বুঝলাম তিনি গেরুয়াধারী কাউকে না দেখে ঠিক করেছেন সাধু বাবা আশ্রমে অনুপস্থিত। মুখচোরা ভালমানুষ লোক কাউকে জিজ্ঞেস করেননি ভোগানন্দ স্বামীর পরিচয়। আমি যখন বললাম স্বামীজি গৈরিকধারী নন—ধুতি জামা পরেন, আমার বন্ধুবর বিস্ফারিত নয়নে বললেন, তবে কি ঐ ফিনফিনে জড়ির পাড় ধুতি পরিহিত, সিল্কের গেঞ্জী গায়ে—পায়ে পামসু ভদ্রলোকটি, যার দু' দিকে কেহ গাড়ু গামছা, কেহ পিকদানী হাতে দণ্ডায়মান—তিনিই কি?—আমি বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নেড়ে বললাম—হ্যাঁ—তিনিই তিনি! বন্ধুবর এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন—এ কি রকম সাধু?—তিনি প্রস্রাব করতে গেলেন মেয়েরা গাড়ু গামছা নিয়ে ছুটল তাঁর পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পরে বললেন: এ কি রকম সাধু—ঠিক যেন বাবুটি—জমিদার বাবু বসে আছেন। আর সে না হয় এক রকম হলো, কিন্তু সাধুকে ঘিরে আছে সর্ব্বক্ষণ নারী রক্ষীদল, এটা বড়ই বিসদৃশ, সমর বাবু?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম: ভগবান কখন কিরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন তা মহাজনেরাই বলতে পারেন, না—আপনি আমি তো কোন্ ছার। রমেশ আশ্চর্য্য কণ্ঠে বললেন: এই বাবুটিকে কি আপনারা অবতার ঠাওরেছেন? আমি বিজ্ঞের সুরে বললাম: আমি হয় ত বলি না, কিন্তু এঁর গোঁড়া ভক্তবৃন্দ—সেই মুহূর্ত্তে দ্বারদেশে বামাচরণ বাবু এসে উপস্থিত হওয়ায় আমি প্রসঙ্গ ধামা চাপা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বসালাম। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা কে কি অশোভনীয় কথা বলে ফেলেন তাঁর উপস্থিতিতে, তাই অবিলম্বে পরিচয় দিলাম বামাচরণ বাবুর—জানালাম ইনি ভোগানন্দ স্বামীর প্রিয়ভক্ত—একজন আশ্রম-কর্ম্মী। আমি বামাচরণ বাবুকে বিনীত কণ্ঠে বললাম, আমার বন্ধু রমেশ বাবু তাদের ঠাকুর ও আশ্রম সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে উদগ্রীব—অনুগ্রহপূর্ব্বক তার প্রশ্নের উত্তর দিতে। বামাচরণ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মাথায় হাত ঠেকিয়ে চেয়ারে বেশ আঁটশাঁট হয়ে বসলেন। পরে রমেশকে উদ্দেশ করে বললেন: দেখুন, একদিন আমিও এমনিভাবে ঠাকুরের ভক্তকে অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করেছিলাম—এই সাদাসিদে অমায়িক ব্যক্তিকে চিনতে না পেরে। যা'ক সে কথা—আচ্ছা, রমেশ বাবু এবারে আপনি প্রশ্ন করুন?

রমেশ স্মিতমুখে বললেন: আপনার ঠাকুর ধুতিজামা পরিহিত কেন?

বামাচরণ চক্ষু মুদ্রিত করলেন ক্ষণকাল, পরে গদগদ কণ্ঠে বললেন: ঠাকুর আমার অবতার—যেমনি রাম জন্মেছিলেন দশরথের গৃহে—রাজপুত্রের বেশে, গৃহীরূপে বিরাজিত হয়ে দেখালেন রাম-অবতার। স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়ে হলেন রাজা দ্বারকায়—করলেন সর্ব্বজাতি সমন্বয়—বাদ গেল না পশুরাজ জাম্ববান—বিবাহ করলেন জাম্ববতীকে, আরও কত বিবাহ করলেন, কাহাকেও তিনি বিফল মনোরথ করেননি। নারী প্রেম বাঞ্ছা করলে—তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেননি। আমার ঠাকুর যে সেই রাম—কৃষ্ণের অংশ। তিনি কেন ভেক নেবেন সামান্য সন্ন্যাসীর?

বামাচরণ রমেশের সঙ্গে আলাপ করে যখন জানলেন রমেশ একজন ধনী ব্যবসায়ী, তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন : রমেশ বাবু চলুন আপনি একটিবার ঠাকুর দর্শনে—তার শ্রীঅঙ্গে মাথা রেখে শ্রীমুখের বাণী শুনলে ধন্য হবেন। আপনি বললেন ভুগছেন 'ব্লাডপ্রেসারে'—ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আপনি রোগমুক্ত হবেন। আমরা অসুখ হ'লে ডাক্তার ডাকি না—অষুধ খাই না—ঠাকুরের চরণামৃত খেয়ে রোগমুক্ত হই। পাশে বসেছিলেন রতনবাবু, তিনি অধৈর্য্য কণ্ঠে বললেন : ডক্টর হিল দাইসেল্ফ্! আচ্ছা মশাই, আপনার ঠাকুর তবে 'ব্লাডপ্রেসারে' ভুগছেন কেন ?

বামাচরণ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন : দেখুন ঠাকুর রামকৃষ্ণও 'ক্যান্সার' রোগে মারা গেলেন—তিনি অনায়াসে রোগমুক্ত হতে পারতেন।

রতন সহাস্যে বললেন : ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও আপনার ঠাকুর সমান পর্য্যায়ে বলতে চান ?

বামাচরণ মাথা নেড়ে বললেন : নিশ্চয়ই—আমার ঠাকুর আরো উর্দ্ধে জনসেবা ও জাতীয় গঠনমূলক কার্য্যে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধর্ম্মরক্ষার জন্য ও অধর্ম্ম বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন এই বিশ্বে।

আমাদের মুখে বিদ্রূপের হাসি লক্ষ্য করে বামাচরণ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন : আপনারা হাসছেন—আমি পদার্থ বিদ্যায় এম-এ পাশ ক'রে কলেজে প্রফেসর ছিলাম। আমরা 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' কিছু না দেখে কোন জিনিষ বা লোকচরিত্র বিশ্বাস করি না। ঠাকুরের বিভূতি দেখে আমি সবকিছু ত্যাগ ক'রে হয়েছি ঠাকুরের সেবক। আমার ন্যায় ঠাকুরের আছে সহস্র সহস্র সেবক—ভক্ত—উপাসক।

রতন বিদ্রূপ কণ্ঠে বললেন : আপনার মতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোন কার্য্য করেন নি আর তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশের উন্নতিমূলক কোন কাজ করেন নি—আর আপনার ঠাকুর সেইসব কাজ করছেন ? আর আপনার ঠাকুর তাঁদের চেয়েও ত্যাগী ও সাধক-শ্রেষ্ঠ ?

বামাচরণ আমতা আমতা ভাবে বললেন : আমি ঠিক সেরূপ ভাবে বিচার করি নি—আমার ঠাকুরের আশ্রমের উদ্দেশ্য ও তাঁর বাণী বিভিন্নমুখী—সময়োপযোগী—বাধা দিয়ে আমি নিম্নকণ্ঠে বললাম : আপনার ঠাকুরের বহু বিবাহের প্রচলন সময়োপযোগী ও প্রগতিমূলক সভ্য সংস্কার কি ? বামাচরণ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন : ঠাকুর বলেন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির পুনরুদ্ধারের জন্য বহু বিবাহ—সবর্ণে বা অসবর্ণে বিশেষ প্রয়োজন।

রমেশ প্রচ্ছন্ন হাসি হেসে বললেন : আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ত হ'লে আবার আদিম যুগের দিকে পশ্চাৎমুখী হবে দেখছি! আপনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে 'পলিগেমী' সমর্থন করেন ? বামাচরণ বিমর্ষ হাসি হেসে বললেন : আমাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই—ঠাকুরের বাণী আমাদের বেদবাক্য।

বামাচরণ বাবুর ভৃত্য এসে জানাল তাঁর কন্যা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন—বামাচরণ ত্রস্তে বাড়ী গেলেন। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

পরদিন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে বন্ধুবর রমেশ চন্দ্রের অনুরোধে যেতে হ'ল ভোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে। সেখানে গিয়ে দেখা হ'ল বামাচরণের সঙ্গে। তিনি সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন রমেশকে। আশ্রমের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবার পর তিনি আমাদের দূর হ'তে দেখালেন ঠাকুরের 'স্নানযাত্রা'। আমরা দেখলাম ঠাকুর ব'সে আছেন একটি চৌবাচ্চার মাঝখানে আর একটি মহিলা অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে সচন্দন জল ঢালছেন ঠাকুরের মস্তকে। কয়েকটি মহিলা সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন, গামছা, তোয়ালে, কাপড়, গেঞ্জি ও চন্দনের বাটী হস্তে। স্নানান্তে তা'রা ঠাকুরের সর্বাঙ্গ দিল পুঁছে, কপোলে পরাল চন্দন, দেহে দিল আচ্ছাদন। তারপর গমনোন্মুখ স্বামিজীর পাদমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল বামাচরণ। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমাদের উভয়কে। আমার প্রতি উদাস ভাব দেখিয়ে রমেশের প্রতি সদয় ভাব দেখিয়ে ঠাকুর অনুরোধ জানাল রমেশকে বৈকাল বেলা দেখা করতে। একটি ছোটোখাটো মেয়ে-বাহিনী সহ ঠাকুর প্রস্থান করলেন। বামাচরণ পকেট থেকে একটি শিশি বের ক'রে ঠাকুরের স্নানের চৌবাচ্চা হ'তে জল নিল—এক গণ্ডুষ ভক্তিভরে মুখগহ্বরে

ফেলল। দেখতে দেখতে অসংখ্য ভক্ত এসে ভীড় করল সেই চৌবাচ্চার চারদিকে—সবাই সেই জল মাথায় ঠেকিয়ে খেতে সুরু করল। মুহূর্ত্তে চৌবাচ্চা হ'ল জলশূন্য।

রমেশের প্রশ্নে বামাচরণ জানাল—এই জল হ'ল ঠাকুরের চরণামৃত—ইহা প্রত্যহ খেলে মানুষ হয় সর্ব্বরোগমুক্ত, পায় শান্তি—ভগবৎকৃপা। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে একবিন্দু পড়লে তাঁকে এই মর জগতে আর ফিরে আসতে হবে না—একদম বৈকুণ্ঠ লাভ। তার জন্তেই এই চরণামৃতের জন্ম এত কাড়াকাড়ি—ভীড়। আমি গম্ভীরভাবে রমেশকে বললাম: আপনার আছে বিরাট ঔষধের কারবার। এই বামাচরণ বাবুর 'থ'-তে এই চরণামৃত নিয়ে যান কয়েক বোতল—হোমিওপ্যাথি শিশিতে এক ড্রাম ক'রে চালিয়ে দিন "সর্ব্বৌষধি" লেবেলে। শুনেছি কলকাতার কোন বিখ্যাত "কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্" নাকি বিন্ধ্যাচলের "কালীকুয়া" ও ভুবনেশ্বরের কুণ্ডের জল বিক্রী ক'রে বড়লোক হয়েছিলেন। "ইউ রমেশবাবু, ট্রাই ইউর লাক্ হিয়ার।" পশ্চাৎ থেকে রতনবাবু সাগ্রহে ব'লে উঠলেন: উনি না নিলে আমি নিশ্চয়ই কয়েক কলসী চরণামৃত নিতে রাজী আছি—আমার কবরেজখান আছে, সেখানে চালু করা সহজসাধ্য হবে—রমেশবাবুর বিলাতী ঔষধের সঙ্গে খাপ খাবে না। বামাচরণবাবু, আপনাকে 'হেল্প' করতে হবে আমাকে এই কারবারে—অবশ্যি আপনাকে মুনাফার 'শেয়ার' দেব। আমি রতনের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললাম: আপনি আবার কখন এলেন? তিনি প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন: আমি এসেছি এই 'যাষ্ট্ ইন্ টাইম।' রমেশ মৃদু হেসে বললেন: আচ্ছা, আমরা তিনজনে 'পার্টনারসীপে' চালাব এই কারবার রতনবাবুর "অমৃত আয়ুর্ব্বেদ আগারে।" আমি উষ্মার ভান করে বললাম: আপনারা ত দেখছি ভয়ানক স্বার্থপর! "যার জন্তে রামের মা তাকে তুমি চেন না?" আমি জিনিবটি আবিষ্কার করলাম, আমাকে একদম ফাঁকি?

রতন গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললেন: সত্যি, এটা আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা চারজনেই সমান অংশীদার। একটা "প্রাইভেট্ লিমিটেড্" কোম্পানী 'ফ্লোট' করা হোক।

বৈকাল বেলা দেখা হবে বলে বিদায় নিল বামাচরণ।

বিকাল বেলা। বামাচরণের সংগে রমেশ গেলেন আশ্রমে। ঠাকুর সপারিষদ রমেশের আগমন প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। রমেশকে সাদরে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন। ঠাকুর তাকে তাঁর কাছে বসালেন—পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর কর্ম্মসচিব, ঋত্বিক সচিব, প্রচার সচিব প্রভৃতির সংগে। কর্ম্মসচিব নরম সুরে বললেন: এই আশ্রম গড়ে উঠেছে সাধু জনসাধারণের অর্থে ও সদিচ্ছায়—এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রমেশ বাবুর ন্যায় দানশীল ব্যক্তির অকাতর অর্থের উপর। তিনি খাতা খুলে দেখালেন ভারতের বিখ্যাত মনীষিগণের স্বেচ্ছাদত্ত প্রশংসালিপি—দানবীর গণের চাঁদার তালিকা—কয়েকটি মহিলার ভূসম্পত্তি দানের দলিলপত্রাদি। কর্ম্মসচিব প্রশংসমান দৃষ্টিতে রমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন: বলুন রমেশ বাবু, আপনার নামে কত টাকা লিখব এই আশ্রম-খাতায়?—আজ থেকে আপনি আমাদের গুরু-ভাই।

রমেশকে ঠাকুর আকর্ষণ করছিলেন তার হাঁটুতে শোয়াতে—রমেশ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে মুক্ত করতে ঠাকুরের কবল থেকে। তিনি শুনেছেন সাধু জানেন সম্মোহন বিদ্যা—যে ব্যক্তিকে তিনি শায়িত করবেন তাঁর হাঁটুতে, মন্ত্রবলে সে হবে তাঁর ক্রীতদাস। প্রচার সচিব বললেন: আপনার দানের কাহিনী ছাপা হবে দেশী বিলাতী কাগজে—ঐ দেখছেন না 'ষ্টেনো' লিখছে সব বিবৃতি। সেই সঙ্গে ছাপব ঠাকুরের বাণী। জানেন তো "প্রোপাগাণ্ডা" হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মাস্ত্র যাকে বলে "এটম বোম" সর্ব্বকার্য্যে। আপনি হবেন 'বিসিনেস্ ম্যাগনেট্' আমাদের প্রচারের চোটে; ফেঁপে উঠবে আপনার ব্যবসা দশগুণ—তার সঙ্গে পাবেন ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ। জানেন তো লাভের অংশ থেকে সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে ঠাকুরকে। ঋত্বিক সচিব সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে প্রচার সচিবের বাণীর প্রতিধ্বনি করলেন হাসিমুখে। কর্ম্ম সচিব সহাস্তে কলম গুঁজে দিলেন রমেশের হাতে—খাতাখানি এগিয়ে ধরলেন সামনে। সুধীর নিরুপায় হয়ে—এঁদের হাত থেকে অবিলম্বে মুক্তি পাবার ফিকিরে লিখলেন ১০০৲ টাকা বাৎসরিক। সচিবদের পীড়নে 'বছর' কেটে লিখলেন 'মাসিক'। সচিবের দল উল্লাস প্রকাশ করলেন—ঠাকুরের মুখে হাসি ফুটল। ঠাকুরের সেবিকার দল জোরে হাওয়া করতে লাগলেন। রমেশ সন্দেহ দোলায় দোল খেতে লাগলেন আচ্ছন্ন ভাবে।

শ্রীঅরবিন্দ

বেলা দে

শ্রীঅরবিন্দের জীবন এত বেশী কর্ম্মবহুল ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল যে অল্প কথায় ও অল্প সময়ে তা বলা কঠিন। তবুও মহামানবের জীবনী আলোচনায় আছে এক বিরাট আনন্দ। ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুলের ছাত্র অরবিন্দ, মুক্তি সংগ্রামের হোতা অরবিন্দ ঘোষ আর পণ্ডিচেরীর আশ্রমে যোগমগ্ন শ্রীঅরবিন্দ—এই তিনের মধ্যে পর পর যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় পরিবর্ত্তন আমরা দেখতে পাই, তা একমাত্র অতিমানবেই সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৮৭২ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অরবিন্দের পিতার নাম স্বর্গীয় ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী তাঁর মাতার নাম। অরবিন্দ তাঁর বাল্যশিক্ষা তাঁর পিতার ইচ্ছানুযায়ী ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারে আরম্ভ করেন। পরে লণ্ডনের সেণ্টপল বিদ্যালয় থেকে অরবিন্দ বৃত্তিসহকারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে সসম্মানে 'ট্রাইপোজ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯০ সালে অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তখন নিয়ম ছিল প্রত্যেক উত্তীর্ণ ছাত্রকে কিছুকাল শিক্ষানবীশ থাকতে হবে—অরবিন্দ স্বেচ্ছায় অন্তরের আহ্বানে এই শিক্ষানবীশকালে অনুপস্থিত রইলেন। অরবিন্দ আই. সি, এস হলেন না, ভারতের পক্ষে এ এক শুভ ঘটনা। অরবিন্দ দেশে ফিরে এলেন, দেশে এসে তিনি বরোদারাজ্যের কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অরবিন্দ আদর্শ অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বিশালতায় ছাত্রগণ মুগ্ধ হয়ে থাকতো। বরোদায় অবস্থানকালে অরবিন্দের বিবাহ হয়—তাঁর পত্নীর নাম সাধ্বী মৃণালিনী দেবী। মৃণালিনী আজ আর ইহজগতে নেই। এই বরোদাতেই মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। উভয়েই প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। অরবিন্দের যোগসাধনার সূত্রপাতও এই বরোদায়। দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে থাকলেও অরবিন্দ মনে মনে ভারতীয়ই ছিলেন। পাশ্চাত্য জগত তাঁকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করতে পারে নি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য সাধক প্রবর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে যেদিন তিনি পরিচিত হলেন সেদিন থেকে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনা ও ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। এই তাঁর বিখ্যাত যোগ সাধনার প্রথম দীক্ষা—তার পর এলো ১৯০৫ সাল। বাংলার আকাশ বাতাস তখন বঙ্গভঙ্গের বেদনায় বিক্ষুব্ধ চঞ্চল। অরবিন্দ তখন বরোদায় বসে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করবার সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। অরবিন্দ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে বাংলায় ফিরে এলেন। তখন বাংলা দেশে তদানীন্তন কালের অন্যতম নেতা বাগ্মী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মাত্র ৫০০৲ শত টাকা সম্বল করে 'বন্দেমাতরম' নামে এক সংবাদপত্র পরিচালনা করছিলেন, অরবিন্দ কলকাতায় এসে বিপিনচন্দ্রের সহিত যোগদান করলেন। অরবিন্দ সমস্ত জাতীয়তাবাদীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে তুলতে লাগলেন।

অরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে ভারতে এক জাতীয় দল গড়ে উঠলো। জাতীয়দল ক্রমেই সমগ্র ভারতে এরূপ প্রভাবশীল হয়ে উঠলো যে, তদানীন্তন সরকার তাদের কার্য্যকলাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। এই দলকে বিনষ্ট করবার জন্য সরকার জাতীয়দলের বহু নেতাকে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ডিত করলেন। ১৯০৭ খৃঃ ২৭শে জুন অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের

অভিযোগে ধৃত হন। অরবিন্দ অভিযুক্ত হওয়ার সংবাদে দেশময় একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন আবেগ উচ্ছ্বাসে অরবিন্দের উদ্দেশ্যে গেয়েছিলেন—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোন ক্ষুদ্রদান,
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।
'তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর। তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ—আলোক যাহার
জলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মত? জয় তব জয়।"

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে দেশবাসী সেদিন অরবিন্দের জয়ধ্বনি করলো। তদানীন্তন সরকার অরবিন্দকে শাস্তি দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু অরবিন্দ বিচারে নির্দ্দোষ বলে মুক্তিলাভ করে আবার দেশের স্বরাজ সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। এই সময় একদল তরুণ স্থির করলেন যে তাঁরা বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে ভারত থেকে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদল হিংসানীতি অবলম্বন করে দেশময় এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করলেন। এই নিয়ে কলকাতার পুলিশ মহলে ভীষণ কর্ম্মতৎপরতা পড়ে যায় এবং তার ফলে মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারীপুকুর বাগানে একটা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয় ও অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ধৃত হন। পুলিশ অরবিন্দকে এই দলের গুপ্তনেতা সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। চতুর্দ্দিকে মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অরবিন্দের বিচার হয়। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করলেন। বিচারে অরবিন্দ দীর্ঘ এক বছর কারাবাসের পর ১৯০৯ সালে ৫ই মে পুনরায় নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তিলাভ করেন। কবির বাণী সার্থক হলো—

'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে বলো কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

কারাগারের বাইরে এসে অরবিন্দ পুনরায় দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি জেলে যে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন, যে ঐশীবাণী উপলব্ধি করেছিলেন, দেশকে সেই জ্ঞানের সন্ধান দিতে, সেই বাণী শোনাতে বাঙলা দেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি দেশকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে—স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু অরবিন্দ দেশময় ভ্রমণ করে বুঝতে পারলেন, দেশে অবসাদের যুগ এসেছে, তাঁর নতুন বাণী গ্রহণ করবার মত শক্তি দেশের নেই। তাই তখন তিনি পূর্ণ যোগমার্গ অবলম্বন করে সাধনার দ্বারা ভারতের শক্তি উন্মেষের জন্য শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে রাজনীতি ক্ষেত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করলেন। ১৯১০ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল অরবিন্দ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পণ্ডিচেরিতে পদার্পণ করেন। বহু বাধা, বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে নির্জ্জন সমুদ্রতীরে অরবিন্দের যোগজীবন আরম্ভ হলো। ধীরে ধীরে একজন, দু'জন করে তাঁর শিষ্য ভক্ত তাঁর পাশে সমবেত হতে লাগল। আজ অরবিন্দের আশ্রম—ঋষি অরবিন্দের যোগস্থান ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত। আশ্রমের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্রব নেই। আশ্রমে সকল ধর্ম্মের লোকই যোগদান করতে পারে। যোগসাধনায় গভীর ভাবে নিমগ্ন হবার পর থেকে বহির্জ্জগতের সঙ্গে অরবিন্দের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বছরে তিনদিন মাত্র তিনি সকলকে দর্শন দেন। ভারতের প্রাচীন যুগের যে সব সত্যদর্শী তপোনিরত যোগীঋষির পরিচয় আমরা পেয়েছি, শ্রীঅরবিন্দও বর্ত্তমান ভারতের সেরূপ একজন সাধন-

গ্রীক্-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়—

আরিষ্টটলের দর্শন

চরিত্রনীতি : আরিষ্টটলের চরিত্রনীতি সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে দুইখানি তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। Nicomachean Ethics তাঁহার নিজের লিখিত।

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত মুখ্যতঃ তৎকালীন শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই মত। তাহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। প্লেটোর Republic গ্রন্থে সম্পত্তি ও পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে সকল বৈপ্লবিক মত বিবৃত হইয়াছে, সেরকম কোনও মতও নাই।

মানুষে প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি লক্ষিত হইলেও, মানুষ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তাহার বুদ্ধি তাহাকে প্রকৃতির কার্য্য-কারণ—শৃঙ্খলের বহির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়াছে। স্ব-সংবেদনের অধিকারী মানুষ আপনার বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? তাহার শ্রেয়ঃ কি? আরিষ্টটল বলেন, সুখই উদ্দেশ্য, সুখই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সুখ কি? আরিষ্টটল বলেন, "অনুকূল অবস্থায়, ধর্ম্মানুগত ও সচেতন কার্য্যে রত প্রজ্ঞাবান্ জীবনই সুখ।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে (১) সুখ দৈহিক পদার্থ নয়, মানসিক; (২) ধর্ম্মের (virtue) সাধনা ভিন্ন সুখ অনধিগম্য, (৩) ইহা কেবল শক্যতা (potentiality) নহে; ইহা শক্তি অথবা ক্রিয়া (৪) সুখের জন্য অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন।

সুখের এই সংজ্ঞা হইতে তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। (১) সুখের জন্য বাহ্যিক কোন্ কোন্ অবস্থা আবশ্যক? (২) সুখের জন্য কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন? (৩) যে শক্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তাহা কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল বাহ্যিক অবস্থার উপর সুখের নির্ভরশীলতার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, পর্য্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান, উচ্চ বংশে জন্ম, এবং বন্ধু ও শারীরিক সুবিধা সুখের সম্পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল মানুষের প্রধান সম্পদ বুদ্ধি ও ধর্ম্মের (virtue) আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধির স্বকরণীয় কার্য্য ব্যতীত, ইহা দ্বারা বলবান প্রবৃত্তি সকল দমিত হয়। ইহা হইতে ধর্ম্ম দ্বিবিধ প্রমাণিত হয়। বুদ্ধি-সম্বন্ধী ধর্ম্ম একই; কিন্তু প্রবৃত্তিসম্বন্ধী ধর্ম্ম (চরিত্রনৈতিক) বহুবিধ। প্রবৃত্তি শাসিত ও সৎপথে চালিত হইতে হইতে, ধর্ম্ম অভ্যাসে পরিণত হয়। এই জন্য আরিষ্টটল ধর্ম্মকে "মধ্যপথ" বলিয়াছেন, এবং "প্রজ্ঞা কর্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম্মে মধ্যপথ অবলম্বনের অভ্যাসকে" ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির জন্য যে ক্রিয়াপরতার প্রয়োজন, তাহার আলোচনা আছে। ধর্ম্ম প্রকৃতির দানও

[৭৮ পৃষ্ঠার পর]

নিরত ত্যাগী নিস্পৃহ যোগী ঋষি ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যোগমগ্ন অরবিন্দকে দর্শন করে বলেছিলেন—'অরবিন্দকে তার যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলাম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'; আজ আবার তাঁকে দেখলাম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার॥'

বিগত ৫ই ডিসেম্বর এই সাধননিরত মহাযোগির মহাজীবনের উপর অকস্মাৎ যবনিকা টেনে দিল। মহাকাল ভারতের বুক থেকে ছিনিয়ে নিল মহাতপস্বী শ্রীঅরবিন্দকে। আত্মার বাণী দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীকে উদ্বুদ্ধ ক'রতে। তাঁর 'লাইফ ডিভাইন' চির অমরতা নিয়ে বেঁচে রইল পৃথিবীর বুকে। অমৃতের শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীঅরবিন্দ, তিনি অমর। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম।

নয়, অথবা যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহার জ্ঞানও নয়। ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক নয়, প্রত্যেকের অবস্থা ও অন্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ দ্বারা তাহার ধর্ম্মের নির্ণয় হয়। জীবনের প্রত্যেক সম্বন্ধের-সহিত তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। প্রধান প্রধান ধর্ম্মের একটা তালিকা আরিষ্টটল দিয়াছেন। মিতাচার, সাহস, উদারতা; মহাপ্রাণতা তাহার মধ্যে আছে। এই সকল ধর্ম্মের প্রত্যেকটাই তাহার ঐকান্তিক অভাব ও অন্তিম আতিশয্য, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কাপুরুষতা ও হঠকারিতার মধ্যবর্ত্তী সাহস। অতিরিক্ত লালসা ও নির্লিপ্ততার মধ্যবর্ত্তী মিতাচার। দানশীলতা অমিতব্যয়িতা ও অর্থগৃধ্নুতার মধ্যবর্ত্তী। ঔদ্ধত্য ও লাজুকতার মধ্যবর্ত্তী বিনয়, দাম্ভিকতা ও আপনার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনের মধ্যবর্ত্তী অকপটতা; চাটুকারিতা ও রোষপ্রবণতার মধ্যবর্ত্তী "ভাল মেজাজ"। ন্যায়ানুগত বোধ অনুভূতিহীনতা ও অসূয়াপরতার মধ্যবর্ত্তী; মহাপ্রাণতা নীচতা ও আড়ম্বরিতার মধ্যবর্ত্তী।

বুদ্ধি-সম্বন্ধী ধর্ম্ম লাভ হয় শিক্ষা হইতে। নৈতিক ধর্ম্মের অভ্যাস করিতে হয়। ব্যবস্থাপকগণের কর্ত্তব্য এমন ব্যবস্থার প্রণয়ন করা, যাহা দ্বারা অভ্যাস অর্জ্জন করা সহজ হয়। ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিতে করিতে আমরা ন্যায়বান হই। সৎ অভ্যাস অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া আমরা সৎ কার্য্যেই আনন্দ লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত উল্লেখযোগ্য।

"মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্ম্মেই (virtue) মহান। পার্শ্বে বাহু দুলাইতে দুলাইতে বিপদ হইতে পলায়ন করা অথবা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা তাহার অনুপযুক্ত। কিছুই যিনি মহৎ বলিয়া গণ্য করেন না, কোন উদ্দেশ্যে তিনি হীন কাজ করিবেন? অন্যান্য ধর্ম্মের সহযোগে ভিন্ন মহাপ্রাণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মহাপ্রাণতার সহযোগে অন্যান্য ধর্ম্ম মহত্তর হয়। এই জন্য মহাপ্রাণতা সমস্ত ধর্ম্মের মুকুট বলিয়া প্রতীত হয়। মহাপ্রাণ হওয়া দুরূহ ব্যাপার, কেননা চরিত্রের উৎকর্ষ ও মহত্ব ব্যতীত মহাপ্রাণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। সৎ-লোক-প্রদত্ত উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইলে তিনি অনধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি মনে করেন তাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাই, অথবা তাহা অপেক্ষা কমই, তিনি পাইতেছেন, কেননা পরিপূর্ণ ধর্ম্মের উপযুক্ত কোনও সম্মানই নাই। তথাপি উচ্চতর কোনও সম্মান তাহাকে দিবার নাই বলিয়া, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু সামান্য কারণে যে কোনও-লোক-প্রদত্ত সম্মান তিনি তুচ্ছ মনে করেন, কেননা এই রকম সম্মান অথবা অপমান তাহার প্রাপ্য নহে; কেননা তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ক্ষমতা ও সম্পদ সম্মানের জন্যে প্রার্থনীয়; যাহার কাছে সম্মানও তুচ্ছ, তাহার কাছে অন্যান্য সবই তুচ্ছ। সেইজন্য মহাপ্রাণ লোকদিগকে লোকে অবজ্ঞাকারী বলিয়া মনে করে। ছোট ছোট বিপদ মহাপ্রাণ লোক ইচ্ছা পূর্ব্বক বরণ করেন না, কিন্তু তিনি বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করেন না, এবং বিপদে তিনি জীবনের ভয় করেন না। তিনি জানেন এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন জীবন-ত্যাগই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে তিনি উদ্যত, কিন্তু গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করেন। কেননা পরের উপকার করা উৎকর্ষের লক্ষণ, গ্রহণ করা নিকর্ষের লক্ষণ। প্রাপ্ত উপকার অপেক্ষা অধিকতর উপকার করাই তাঁহার স্বভাব, কেননা তাহা দ্বারাই উপকারীর ঋণ-পরিশোধ করিয়া তাহাকে ঋণে আবদ্ধ করা হয়। নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা না করা, কিন্তু অবিলম্বে অন্যকে সাহায্য করা মহাপ্রাণতার লক্ষণ। উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে আত্মসম্মানপূর্ণ ব্যবহার, ও মধ্য শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অনহঙ্কৃত ব্যবহারও মহাপ্রাণ লোকের লক্ষণ। উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ছোট না হইয়া বড় হওয়া কঠিন, কিন্তু মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে সহজ। সাধারণ লোকের মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া খ্যাত করা অশিষ্ট, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব্যবহারে নয়। ঘৃণা ও ভালবাসা তিনি গোপন করেন না, কেননা ভাবগোপন করার অর্থ সত্য অপেক্ষা লোকের মতকে অধিক মর্য্যাদা দেওয়া; তাহা কাপুরুষের কাজ। তিনি মুক্তবাক, কেননা তিনি সকলই অবজ্ঞা করেন, এবং সঙ্গে নীচলোকের রসিকতা করিবার সময় ভিন্ন সর্ব্বদাই সত্য বলেন। তিনি প্রশংসা করিতে অভ্যস্ত নহেন, কেননা কিছুই তাহার নিকট মহৎ নহে। তিনি খোষগল্প করেন না; তিনি নিজেও প্রশংসা ইচ্ছা করেন না, অন্যের নিন্দাও ভালবাসেন না। লাভজনক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপেক্ষা সুন্দর ও নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যই তিনি পছন্দ করেন। ধীর পদক্ষেপ, গম্ভীর স্বর এবং স্পষ্ট উচ্চারণ মহাপ্রাণ লোকের উপযুক্ত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয় কোনও সমাজেই মহাপ্রাণ লোকের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না। সামাজিক উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী না হইলে কাহারও পক্ষে মহাপ্রাণ হওয়া সম্ভবপর নহে।

আরিষ্টটলের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্ঞান; এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান—যাহা মানব-জীবনের অন্তিম লক্ষ্য, তাহা—দর্শন, অর্থাৎ জ্ঞান-তৃষ্ণা। প্রত্যেক লোক তাহার অভ্যাসানুরূপ কার্য্য বাছিয়া লয়। ধর্ম্মে অভ্যস্ত বলিয়া ভাল লোকে সেই জন্য ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম বাছিয়া লয়। সুখের অর্থ আমোদ-প্রমোদ নহে। ধর্ম্মানুগত জীবনই সুখের

জীবন। কিন্তু কোন্ ধর্ম? ইহার উত্তর-মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের ধর্ম। বুদ্ধিই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম হইতেছে চিন্তার জীবন, ধ্যানের জীবন। ইহাই মহত্তম, স্থায়িতম, অতিতম সুখকর ও স্বয়ংপূর্ণ জীবন। কিন্তু এই পূর্ণসুখ অনুকূল অবস্থা সাপেক্ষ। চিন্তাশীল লোকের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবশ্যক আছে। কিন্তু অসৎ লোকের অপেক্ষা তাহার নাই। নির্জ্জনে, শান্তিতে ধ্যান করিতে হয়; কোনও ফলের অপেক্ষা না করিয়া শুধু ধ্যানের জন্যই ধ্যান ভালবাসা যায়; রাজনৈতিক ও সৈনিকদিগের কারবার লোকের সঙ্গে, কিন্তু ধ্যান-প্রিয় ব্যক্তির লোকের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি-গ্রাহ্য সুখের জীবন ভাগবৎ জীবনের সদৃশ। এসুখ মানুষের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত, তাহা হইলেও মানুষের মধ্যে একটা ঐশ্য অংশ আছে, তাহার বৃদ্ধির জন্য তাহার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ মরণ-ধর্ম্মী বলিয়া কেবল পার্থিব ব্যাপারে মগ্ন থাকা তাহার উচিত নহে। যতটা তাহার সাধ্য, আপনাকে অমর করিবার জন্যে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার মনে রাখা উচিত যে এই ঐশ্য অংশই প্রত্যেক মানুষের "স্ব", এবং যদিও দেহের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র, ইহার মূল্য অত্যধিক। ধ্যানের সুখই দেবতারা ভোগ করেন। চরিত্রনৈতিক ধর্ম মানবীয় ধর্ম, কিন্তু ধ্যানরূপ ধর্ম স্বর্গীয়। মনুষ্যের কার্য্যের সদৃশ কার্য্যে দেবতারা ব্যাপৃত আছেন, ইহা মনে করাও হাস্যকর। যিনি দেবতাদের সাযুজ্য ও তাহাদের সুখের মত সুখ কামনা করেন, তাহার কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের জীবনে প্রবেশ লাভের জন্য চেষ্টা করা।

আরিষ্টটল ধর্ম্মের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নয়; তাহাতে কোনও শৃঙ্খলাও নাই। বিনয়, মৃদুতা প্রভৃতির উল্লেখ তাহাতে নাই। আভিজাত্যলক্ষনাক্রান্ত সে তালিকা। অভিজাত-দিগের ধর্ম্মের উল্লেখই তাহাতে আছে—সাধারণ মানুষের ধর্ম্মের উল্লেখ নাই। দাসদিগকে তিনি ধর্ম অথবা সুখের উপযুক্ত মনে করিতেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহার "মধ্য পথ" মত দ্বারা তিনি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় পার্থক্য বিদূরিত করিয়াছেন। আরিষ্টটলের চরিত্রনীতিতে কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু আছে যে, তাহা বলা যায় না। চরিত্র নৈতিক ইচ্ছার (moral will) আলোচনাও যৎসামান্য মাত্র আছে। তিনি সৎকার্য্যের সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

আরিষ্টটলের মতে মানব-মনের প্রবৃত্তি-সমূহ সম্পূর্ণ রূপে প্রজ্ঞা-রহিত (irrational) এবং চরিত্রনৈতিক-দোষ-দুষ্ট। এই অর্থে প্রবৃত্তিদিগের সত্য কোনও মধ্য-পথ (mean) থাকা সম্ভবপর নহে। কেবল অভ্যাস কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে পারে না। অভ্যাস অনেক সময় উন্নত জীবনের পরিপন্থী হইয়াও দাঁড়ায়। "অভ্যাস উত্তম প্রভু বটে, কিন্তু অধম ভৃত্য।" চরিত্রনীতিকে ধরা বাঁধা নিয়মে পরিণত করা যায় না। অভ্যাসের নিগড় ভঙ্গ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপরই আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে।

আরিষ্টটল বুদ্ধি-সম্বন্ধী ধর্ম ও চরিত্রনৈতিক ধর্ম সকলের স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ। আমাদের যাবতীয় সহজাত সংস্কার—তৃষ্ণা—ও প্রবৃত্তি-সমন্বিত-নৈতিক প্রকৃতি—চরিত্রনৈতিক ধর্ম সকল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং প্রজ্ঞার শাসনাধীনে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়াই এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। আবার আমাদের নৈতিক প্রকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত না হইলেও, প্রজ্ঞা তাহার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। মানব-প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতি-ক্রিয়া আছে। আত্মসংযমের প্রধান কার্য্য এবং প্রত্যেক সৎ সংকল্পের পরে কার্য্যে পরিণতি দ্বারা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার শাক্তি-বর্দ্ধিত হয়। এবং প্রজ্ঞা তাহার কার্য্য-সম্পাদন দ্বারা অধিকতর সামর্থ্য লাভ করে। আবার প্রজ্ঞা যতই শক্তিশালী হয়, ততই আমাদের প্রকৃতির নিম্নাংশের বাধা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং নৈতিক জীবন প্রজ্ঞা দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়। এবং আমাদের সৎ কাজ করিবার অভ্যাস বলবত্তর হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বলিয়াই তাহার আচরণ ভাল কি মন্দ এই প্রশ্ন উঠে। যদি একাকী থাকিত, অন্য কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ তাহার না থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র-নীতির কোনও প্রশ্নই উঠিত না। অন্যকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়, অবিচার; ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের গঠন যদি এ-রকম হয় যে তাহার উৎকৃষ্টতর ভোগের দ্রব্য রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করিতে থাকে, রাষ্ট্রের অবশিষ্ট অধিকাংশের নিকট সে সমস্ত দ্রব্য অপ্রাপ্য থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থা চরিত্র-নীতির দিক হইতে ভাল কি মন্দ, এই প্রশ্নের মীমাংসা বর্ত্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্লেটো ও আরিষ্টটল এই ব্যবস্থার কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। গণ-তান্ত্রিকেরা বলেন রাষ্ট্রনীতিতে ক্ষমতা ও সম্পত্তির কথাই

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকে তাহা ভোগ করিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগের খৃষ্টানগণও এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হইতেছে ধর্ম্ম; ক্ষমতা ও সম্পত্তির অভাবে মানুষের ধর্ম্মসাধনার কোনও ব্যাঘাত হয় না; সুতরাং রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বিভাগের কোনও প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তীকালে Stoic গণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মের ধারণা আরিষ্টটলের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। দাস তাহার প্রভুর মতই ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সক্ষম, ইহা তাঁহাদের মত। গর্ব্বকে আরিষ্টটল ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টান মতে তাহা বর্জ্জনীয়। বিনয় খৃষ্টান মতে ধর্ম্ম, আরিষ্টটলের মতে অধর্ম্ম। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক ও দরিদ্র লোকদিগকে যদি অন্যের মত ধার্ম্মিক হইবার সুবিধা দিতে হয়, তাহা হইলে আরিষ্টটলের বুদ্ধির ধর্ম্ম-সমূহকে ধর্ম্মের তালিকা হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা Bertrand Russel-এর মত।

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রচলিত মত হইতে ভিন্ন। সকল মানুষের অধিকার সমান, এবং ন্যায় বিচারের অর্থ সাম্য—ইহাই আধুনিক মত। ইহা আরিষ্টটলের মত নহে। তাঁহার মতে সাম্য নয়, ন্যায়সঙ্গত অনুপাতই সুবিচার। পিতা অথবা প্রভুর সুবিচার এবং সাধারণ সুবিচার এক নহে। পুত্র পিতার এবং দাস প্রভুর সম্পত্তি। স্বকীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে অবিচারের কথা উঠিতে পারে না। পুত্র যদি দুর্ব্বৃত্ত হয়, পিতা তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু পুত্র পিতাকে বর্জ্জন করিতে পারে না। কেননা পিতার ঋণ পরিশোধ করা পুত্রের পক্ষে অসাধ্য। যাহার মূল্য যেরূপ, সেই অনুপাতে সে ভালবাসা পাইবার অধিকারী। যেখানে পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে সাম্য নাই, সেখানে যিনি গুরু তিনি লঘুকে যে পরিমাণে ভাল বাসিবেন, লঘুর কর্ত্তব্য তাহা হইতে অধিক পরিমাণে গুরুকে ভালবাসা। স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও প্রজাগণ সেইজন্য স্বামী, পিতা-মাতা ও রাজা তাহাদিগকে যে পরিমাণে ভালবাসেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে। স্ত্রীর যাহা কার্য্য, তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ উচিত নয়; স্বামীর কার্য্যেও স্ত্রীর হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য।

আরিষ্টটলের সময়ে চরিত্রনৈতিক গুণ ও অন্যবিধ গুণের মধ্যে যে ভেদ ছিল, খৃষ্টীয় মতের প্রভাবে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কবিত্ব একটি বড় গুণ; চিত্রাঙ্কণপটুতাও বড় গুণ, কিন্তু তাহারা নৈতিক গুণ নহে। কবি ও চিত্রকরকে আমরা কবিত্ব ও চিত্রাঙ্কণ পটুতার জন্য অধিকতর ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করি না। মানুষের "ইচ্ছার" সহিতই চরিত্রনীতির ভাল মন্দের সম্বন্ধ, বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বাছিয়া লওয়াই নৈতিক ধর্ম্ম। যখন আমি দুইটি পথের যে কোনওটি অবলম্বন করিতে পারি, তখন আমার ধর্ম্মবিবেক (conscience) উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তাহা আমাকে বলিয়া দেয়; তখন ভালটি অবলম্বন করা ধর্ম্ম, মন্দটি গ্রহণ করা পাপ। ইহাই খৃষ্টীয় মত। কিন্তু আধুনিক অনেক দার্শনিক এ মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রথমে শ্রেয়ঃ কি, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া যে কার্য্যে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই মতের সঙ্গে আরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্য আছে।

ধর্ম্ম নিজেই উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, এ বিষয়ের মতভেদ আছে। আরিষ্টটল মুখ্যতঃ ধর্ম্মকে সুখরূপ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় বলিয়াই গণ্য করেন। কিন্তু এক স্থলে তিনি ধর্ম্মকেই উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মনে হয়। "পরিপূর্ণ জীবনে আত্মার ধর্ম্মানুগত কার্য্যই মানবের শ্রেয়ঃ।" Bertrand Russel বলেন, বুদ্ধির ধর্ম্ম সকল উদ্দেশ্য, আর কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম উপায়, ইহাই বোধ হয় আরিষ্টটলের মত। খৃষ্টীয় মতে ধর্ম্মের নিজের জন্যই ধর্ম্ম পালনীয়, ধর্ম্মের ফলের জন্য নয়। যাহারা সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাহারা ধর্ম্মকে সুখ লাভের উপায় বলিয়া গণ্য করেন।

কিন্তু কাহার শ্রেয়ঃ নৈতিক কর্ম্মের লক্ষ্য? ব্যক্তির না সমাজের? সামাজিক মঙ্গল (social good) কি সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলের সমষ্টি, অথবা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমাজের মঙ্গল? জার্ম্মান দার্শনিকদিগের অনেকে শেষোক্ত মতাবলম্বী। কিন্তু আরিষ্টটলের মত তাহা ছিল না।

[ক্রমশঃ

পরিব্রাজক কাম'নীত

কার্ল গিয়েলারুফ অনুবাদঃ শুভ্রোধন্দু সেন

স্বর্গ-পুষ্প শুকায়

"হ্যাঁ, বন্ধু" বশিট্‌ঠী বলেন, "প্রভুর নিজ মুখ হ'তে এ শ্লোক আমি শুনেছি, তোমার কাছে আশাধ্বংসি ব'লে বোধ হ'লেও, সেদিন শোনবার সময় আমি যেমন নিরাশ হই নি, আজও আমি তেমনি সে বাণীকে সত্যে পরিণত হ'তে দেখে দুঃখ পাচ্ছি না বরং আনন্দ বোধ করছি।"

বশিট্‌ঠীর পূর্ব্ব-জীবন বর্ণনা কালে পশ্চিম স্বর্গের ধ্বংস ধীরে অবিরামগতিতে চলছিল। এই পুণ্যাত্মারা এবং এই সুখলোক যে শীঘ্রই পতিত হবে, বিলীন হ'য়ে যাবে, সে সম্বন্ধে আর কার-ও সন্দেহ ছিল না।

পদ্মগুলির অর্দ্ধেক পাঁপড়ি ইতিমধ্যে ঝরে গেছে; স্বল্পবর্ণের ছোট ছোট নৌকাগুলির ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জল তখনও দেখা যাচ্ছে; এক এক-মুহূর্ত্ত পরে পরে এক-একটা পাঁপড়ি ঝরছে, আর জলটা কেঁপে উঠছে। পশ্চিম স্বর্গের অধিবাসীদের পদ্মাসনে উপবেশনের ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় চরম পতন আসন্ন। কারও মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, কারও মাথা কাঁধের ওপর; তটস্থিত উদ্যানের পুষ্প-পত্র ঝরিয়ে এক-একবার এক-একটা হিম প্রবাহ ব'য়ে যায়, আর পুণ্যাত্মারা জ্বরগ্রস্তের মত কেঁপে ওঠেন। পাখীদের সুর-সঙ্গীতে অসামঞ্জস্যই এখন প্রধান সুর হ'য়ে উঠেছে, সব সময় আর শোনাও যাচ্ছে না। যা-ও বা শোনা যাচ্ছে তার অনেকখানি আর্ত্তধ্বনি ও দীর্ঘশ্বাস। পুণ্যাত্মাদের অবয়বে পুষ্পে-পত্রে প্রস্তরে এমন কি মেঘখণ্ডগুলির এতদিনকার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে, চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ঘন নীল-আলোকের একটা যবনিকা। সুগন্ধময় সতেজ জীবনপ্রদ বায়ুও আর নাই, তার স্থানে এখন বইছে নিদ্রাকর একটা গন্ধ—শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, শ্বাস নিলে ইন্দ্রিয়গুলি ঝিমিয়ে আসে।

ক্লান্ত হস্ত উত্তোলন ক'রে কামনীত তাঁর পরিবেশ প্রদর্শন করেন।

"এ দৃশ্যের মধ্যে আনন্দবোধ করা কেমন ক'রে সম্ভব বশিট্‌ঠী!"

"এইজন্য সম্ভব, বন্ধু, যে এই স্বর্গ স্থায়ী হ'লে, অন্তহীন হ'লে, এর হ'তে উচ্চ আর কিছু থাকত না কিন্তু এর হ'তেও উচ্চতর কিছু আছে; সে উচ্চতরের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই অবস্থাকেই প্রভু 'বর্ত্তনশীলতার আনন্দ' ব'লে বর্ণনা ক'রেছিলেন; এইজন্যই তিনি ব'লেছিলেন, 'সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংস পরিজ্ঞাত হ'লে, অসৃষ্টকে জানা যায়।"

জলাভাবে মৃতপ্রায় পুষ্প বর্ষাধারায় যেমন পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে, বশিট্‌ঠীর কথা শুনে কামনীতও তেমনি সজীবতা বোধ করলেন।

"তোমার কল্যাণ হ'ক বশিট্‌ঠী; আমার মোক্ষ তোমারই দান। বুঝছি, এ সত্য। আমাদের ভুল হ'য়েছিল—এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা পর্য্যাপ্ত উচ্চাশা করিনি। আমরা নিজেদের জন্য কামনা ক'রেছিলাম এই পুষ্প স্বর্গ; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই পুষ্প শুষ্ক হবে। চিরস্থায়ী পুষ্প হচ্ছে নক্ষত্রগুলি; শাশ্বত বিধি অনুসারে তারা চিরকাল নিজ নিজ পথে চলেছে। চেয়ে দেখ বশিট্‌ঠী, পশ্চিম স্বর্গের সকল কিছুই যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, ম্লান হ'য়ে আসছে, তখনও আমাদের সর-সংযুক্ত আকাশগঙ্গার ক্ষুদ্র শাখাটুকু পূর্ব্বের মতই উজ্জ্বল, পূর্ব্বের মতই পূর্ণ আছে। এর কারণ, আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হ'য়ে আসছে অবিনশ্বর নক্ষত্রলোক হ'তে। নক্ষত্রলোকের দেবতাদের মধ্যে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে পারলে, অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

"তাতেই বা সফল হব না কেন?" বশিট্‌ঠী জিজ্ঞাসা করেন। "এমন সব সন্ন্যাসীর কথা শুনেছি যাঁরা নক্ষ-

ব্রহ্মের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য হৃদয়-মন নিবদ্ধ ক'রে-ছিলেন। ভগবদ্‌গীতার উক্তি সত্য হ'লে, এ কামনার জন্য আমাদের সময় এখনও চ'লে যায় নি। ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হ'য়েছে—

"মৃত্যুকালে কোন লোকপ্রাপ্তির জন্য হৃদয় মনের কামনা অপূর্ণ থাকে না, নবাগত জীবনে আকাঙ্ক্ষিত অস্তিত্ব লাভ করা যায়।"

"বশিট্‌ঠী? মানুষের সাহসের অতীত আশা যে তুমি আমায় দিচ্ছ! তবে আর বিলম্ব নয়, এস সমগ্র শক্তিতে লক্ষ ব্রহ্মলোকে পুনঃ প্রবেশের কামনা করি।"

এই সঙ্কল্পে তাঁরা উপস্থিত হ'য়েছেন মাত্র এমন সময় হ্রদ ও উদ্যান সমূহের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। রাশিকৃত পুষ্প ও পত্র ঝ'রে পড়ল; পুণ্যাত্মারা ঝড়ের বেগে নত হ'য়ে পড়লেন; তাঁদের বেশ তাঁদের কম্পমান দেহে সঙ্কুচিত হ'ল।

সুগন্ধ ভারাক্রান্ত বদ্ধ কক্ষে শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসতে আসতে সহসা মুক্ত গবাক্ষ পথে সতেজ লবণাক্ত বায়ুর শ্বাস পেলে মানুষ যেমন স্বস্তি বোধ করে, কামনীত ও বশিট্‌ঠীও সেইরূপ অনুভব করলেন। আকাশগঙ্গার তীরে তাঁরা পূর্ব্বে আর একবার এই বায়ুর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

"কিছু দেখতে পাচ্ছ?" বশিট্‌ঠী জিজ্ঞাসা করেন।

কামনীত বলেন, "গঙ্গার অভিনন্দন। শোন, তিনি ডাকছেন।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঋভুদের বিলাপধ্বনি মিলিয়ে গেল; গর্জ্জে উঠল তাঁদের পূর্ব্বশ্রুত গভীর দীর্ঘ-স্থায়ী গম্ভীর বজ্রনাদ।

"ভালই হ'য়েছে, এ পথ আগে হ'তেই আমাদের জানা আছে," বশিট্‌ঠী মন্তব্য করেন; বলেন, "এখনও কি তোমায় ভয় করছে, বন্ধু?"

"কেন আর ভয় করব? এস।"

বায়ুর গতির বিরুদ্ধে নীড়ত্যাগী পক্ষী যুগলের ন্যায় তীরবেগে তাঁরা ভেসে চললেন।

তাঁদের প্রতিবেশীরা বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, এমন সত্তাও আছেন যাঁদের এখন ওড়বার শক্তি ও সাহস আছে!

তাঁরা ঝঞ্ঝার গতিমুখে অগ্রসর হন আর তাঁদের পশ্চাতে একটা ঘূর্ণি উঠে ম্লানায়মান সুখবতীর পুষ্প-পত্র-প্রাণ ঝরিয়ে চলে যায়।

শীঘ্রই তারা তালীবনে পৌঁছলেন; তালীবনও অনতি-বিলম্বে পিছনে পড়ে রইল। সম্মুখে বিশ্বতটিনীর রজত জলরাশি দিকচক্রের নীল সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

জলরাশির ওপর দিয়ে তখন তাঁদের গতি চলছে। দৃশ্য জলস্রোতের ওপর অদৃশ্য কিন্তু সমপ্রবল একটা বায়ু-স্রোতও সেখানে চিরপ্রবহমান। তাঁরা এই স্রোতে ধরা পড়লেন। আর বায়ুর বিরুদ্ধে নয়, ঝড়ের গতিতে ঝড়ের সঙ্গে তাঁদের যেতে হ'ল।

প্রচণ্ড গতিতে এবং নীচে কত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে তার শব্দে, এঁদের চেতনা লুপ্ত হ'ল।

লক্ষ ব্রহ্মের রাজ্যে

এবার লক্ষ ব্রহ্মের রাজ্যে দুটী নক্ষত্রের দেবতারূপে কামনীত ও বশিট্‌ঠী অস্তিত্ব গ্রহণ করলেন।

একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র পদার্থে কামনীতর আত্মসত্তা সন্নিবেশিত হয়েছিল; জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁর শক্তিতে প্রাণবন্ত একটা নক্ষত্ররূপ ধারণ ক'রে তাঁর চিৎশক্তি বলে চালিত হ'তে লাগল। তাঁর চিৎশক্তি বলে নক্ষত্রটী স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তিত হ'তে লাগল; এই হ'ল তাঁর অহম।

আবার বশিট্‌ঠীর জ্যোতিতে কামনীত প্রতিফলিত হ'য়েছিলেন; বশিট্‌ঠীও কামনীতর জ্যোতিতে প্রতি-ফলিত হ'য়েছিলেন। এইরূপে রশ্মি-বিনিময় করে তাঁরা একটা সাধারণ বিন্দুর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হতে লাগলেন; এই বিন্দুতে সংহত জ্যোতিঃই তাঁদের পারস্পরিক প্রেম এবং বিন্দুকেন্দ্রিক আবর্ত্তন তাঁদের প্রেমজীবন। গতি-পথে পারস্পরিক জ্যোতিঃ প্রতিফলিত ও স্পর্শ করে তাঁরা প্রেমানন্দ লাভ করতে লাগলেন।

তাঁদের দৃষ্টিশক্তি এখন চতুর্দ্দিকে; ফলে একই কালে অসীম ব্যোমের সর্ব্বত্র তাঁরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সক্ষম। তাঁদের কাছেই আরও কয়েকটি নক্ষত্র; এই সকল নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁদের আলোক বিনিময় হয়; সমষ্টিগত-ভাবে তাঁরাও এই কয়টী নক্ষত্র দ্বারা একটা নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্ট হয়েছে; এইরূপ অগণিত পুঞ্জ নিয়ে একটা ব্রহ্মাণ্ড। আরও দূরে দৃষ্টি যায়। দেখা যায় অগণিত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড-পুঞ্জ হয়েছে। তারপর অবস্থান করছে ব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জমালা, আরও ব্রহ্মাণ্ড-পুঞ্জমালা; অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জমালার সমষ্টি নিয়ে হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জমালাবৃত্ত; বৃত্তের পর বৃত্ত এই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। কিন্তু বৃত্তগুলি শেষ নয়। এদের সমন্বয়ে এক একটা লোক সৃষ্ট হ'য়েছে। এইরূপ কত লোক নিয়ে লক্ষব্রহ্মের রাজ্য কে গণনা করবে?

এই বিপুল বিশ্বে তাঁরা যুগ্ম নক্ষত্র; একটা পুঞ্জের অংশ। পুঞ্জের গতি লক্ষ্য ক'রে তাঁরাও অন্যান্য নক্ষত্র ও যুগ্ম নক্ষত্রের সঙ্গে গতি গ্রহণ করলেন। কেউ কারও অতি নিকটে বা অতি-দূরে গমন করেন না; অথচ নির্ব্বাক সহানুভূতিতে তাঁরা অপরকে সঠিক গতিপথ ও গতিমান

জানিয়ে দেন। দুজনে লক্ষ্য করলেন, পুঞ্জটীর অন্যান্য পুঞ্জের সঙ্গে মিলিত একটা ইচ্ছা শক্তির উদ্ভব হ'য়েছে; সেই মিলিত ইচ্ছা শক্তির বলে তাঁদের ব্রহ্মাণ্ড আবর্ত্তিত হচ্ছে।...

বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের ছন্দোময় ঘর্ত্তনশীলতায় প্রদর্শিত এই সহানুভূতি, এই বিরাম বিহীন বিশ্বব্যাপ্ততা, এই বহু বিগুণিত গতি বিনিময়—এই হল তাঁদের বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁদের বহির্জীবন, তাঁদের সর্ব্বসত্তা-বিচ্ছুরিত দাক্ষিণ্য।

লক্ষব্রহ্মের রাজ্যের নিয়ে বায়ু দেবতাদের অবস্থান। লক্ষব্রহ্মের রাজ্যে পরিচালিত গতি সমন্বয়, বায়ু দেবতাদের কাছে সুরসমন্বয় ব'লে প্রতীয়মান হয়। এই সঙ্গীত-লহরীর ক্ষীণ তরঙ্গসমূহ পশ্চিমস্বর্গের আকাশে ভেসে আসত, তারই অনুকরণে ঋতুগণ স্বর্গবাসীদের সুখশ্রাব্য সঙ্গীত তরঙ্গ সৃষ্টি করতেন। মর্ত্তালোকে ও লক্ষব্রহ্ম-রাজ্যের অবিরাম উত্থিত সঙ্গীত লহরীর ক্ষীণতম আভাস ভেসে আসে—এত ক্ষীণ যে আত্মদর্শী মহর্ষিরাই মাত্র শুনতে পান, শুনতে পান পূর্ণজ্ঞানালোকদীপ্তগণ, তাই তাঁরা অজ্ঞাত লোকের সুর সামঞ্জস্যের কথা বললে সাধারণ লোকের কাছে রহস্যময় বার্ত্তা বলে মনে হয়। পরম পুলকাবেশে সঙ্গীতদের অন্তকর্ণে এই সুর তরঙ্গই ধ্বনিত হয়—তাঁরা তাই যন্ত্রে ও কণ্ঠে তোলেন এমন মোহময় সঙ্গীত যারা প্রতিধ্বনিত করেন নক্ষত্র দেবতাদের অস্তিত্বের আনন্দ। কারণ এই গতি ও ধ্বনিই তাঁদের জীবনানন্দ, অস্তিত্বের উল্লাস।

এই সকল গতির, এই সকল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জমালা-বৃত্তের কেন্দ্রস্বরূপ অবস্থান করেছেন স্বাসনসমাসীন লক্ষ-ব্রহ্ম; তাঁরই অপরিমেয় জ্যোতিঃ বিকীরণে নক্ষত্রসমূহ জ্যোতির্ময়; তাঁরই লক্ষ লক্ষ আদর্শিকার মত নক্ষত্র সমূহ তাঁর জ্যোতিঃ তাঁর দেহে প্রতিসরিত করছে; তাঁরই চির প্রবহমান উৎসসম অশেষ শক্তিবশে নক্ষত্র সমূহে গতি-সঞ্চার হ'চ্ছে; আবার সকল গতির কেন্দ্রে অবস্থান করছেন তিনিই—লক্ষব্রহ্ম।

এই হ'ল তাঁদের নবজন্ম—অস্তিত্ব—ব্রহ্মের পূর্ণতা-পূর্ণিত সত্তা—উচ্চতম দেবতার সাহচর্য্য—পুণ্যময়তা—পূজনীয়তা—পরম শান্তি।

লক্ষব্রহ্মের রাজ্যস্থিত নক্ষত্র সমূহের কেন্দ্র লক্ষ-ব্রহ্ম; তাঁরই সর্ব্বদিকে সর্ব্ববস্তু সমবেত; এই অকল্পনীয় মহাশক্তি-ধৃত ব্রহ্মলোক অনন্ত হ'লেও এক অর্থে সান্ত। প্রাচীন-কালের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যেমন চর্ম্ম চক্ষেই আকাশ মণ্ডলস্থ রাশিচক্র দর্শন করেছিলেন, লক্ষব্রহ্ম লোকের অধিবাসীরাও তেমনি তাঁদের উর্দ্ধে সংখ্যাতীত রাশিচক্র দেখতে পাচ্ছেন—সেগুলিও বিচ্ছিন্ন একক বা যূথবদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র; ব্রহ্মলোকবাসীর বহু উর্দ্ধে মহা ব্যোমব্যাপী বিক্ষিপ্ত রয়েছে রাশিচক্রান্তর্গত জ্যোতিঃ-কায়া। বর্ত্তনশীল জীবন-নদে অবিরত কত রূপ উদ্ভূত হ'য়ে অরূপে বিলীন হ'য়ে যায়, এরা অজ্ঞাত, অকল্পীয়; আবার জ্ঞাত, কল্পনীয় কত রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে এই নরলোকে এবং আরও কত জ্ঞাত অজ্ঞাত লোকে; ব্রহ্ম-লোকের উচ্চাকাশস্থ জ্যোতিঃপুঞ্জে তেমনি নক্ষত্র সমন্বয়ে, বিচ্ছিন্নতায়, সারিবদ্ধতায় কত সম্ভব অসম্ভব কল্পনীয় অকল্পনীয় রূপের সৃষ্টি করেছে মহাভৌতিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয়।

লক্ষব্রহ্ম লোকবাসীরা তাঁদের রাশিচক্রসমূহে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কত মৌলিক রূপ দর্শন ক'রে বিভিন্ন লোক ও জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

ব্রহ্মলোকবাসী সর্ব্বদর্শী ব'লে এই বস্তুটি দেখবার জন্য ঐ বস্তুটী হ'তে তাঁদের দৃষ্টি অপসারিত করবার প্রয়োজন হয় না। নেত্রপলক ব্যতিরেকেই একবালে বিশ্বের সর্ব্ব বস্তু তাঁদের দর্শনগম্য। এক পলকে তাঁরা স্রষ্টার সৃষ্টি সমন্বয় ও তৎসঙ্গে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দর্শন করেন; তাঁদের নিকট ভগবদ্‌জ্ঞান এবং বিশ্বজ্ঞান এক ও অখণ্ড হ'য়ে যায়। কোন মানুষ ঈশ্বরের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলে দেখত অহরহ পরিবর্ত্তনশীল রূপসমূহ তার চোখে লুপ্ত; আবার যে মানব সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্যই দেখতে পায়, ঈশ্বরের সমন্বয় তার দৃষ্টি-বহির্ভূত। কিন্তু ব্রহ্ম লোক-বাসীরা একই সঙ্গে বৃত্ত ও কেন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁদের জ্ঞান সমন্বয়সম্ভূত, অচঞ্চল, সংশয়াতীত।

সমগ্র ব্রহ্মলোকে সময় এখন নিঃশব্দে অনুভূত হ'য়ে প্রবাহিত। পরিচ্ছন্ন স্রোতস্বিনীর শান্ত মসৃণ স্রোতোধারায় বাধা বিঘ্নহীনতার জন্য যেমন উচ্চাবচতা থাকে না, তেমনি ব্রহ্মলোকের কালস্রোতে কোন চিন্তা বা অনুভূতির বাধা না থাকায় নিস্তরঙ্গ স্রোতে সময় প্রবাহিত হচ্ছিল।

এই অননুভূত কালস্রোতেই ছিল ব্রহ্মলোকবাসীদের অনন্তকাল। কিন্তু অন্তহীনতা তো মায়া মাত্র এবং শান্ত কালস্রোত হ'তে উদ্ভূত সর্ব্ব শক্তি বস্তু ও অনুভূতি—তাঁদের জ্ঞান, তাঁদের দেবত্ব, তাঁদের আনন্দ, তাঁদের অস্তিত্ব, ব্রহ্ম লোকবাস, তাঁদের প্রেম জীবন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন—সকল কিছুই মায়া গঠিত, মায়াসিক্ত, মায়াবৃত। [ক্রমশঃ

পুস্তক ও আলোচনা

ইঙ্গিত : উপন্যাস। সুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুর দান নিতান্ত সামান্য নয়। তাঁহার রাজধানী, পদ্মা প্রমত্তা নদী, পদধ্বনি, মানবের শত্রু নারী প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সঙ্গে বাঙালী পাঠকমাত্রেই পরিচিত। উহার অধিকাংশ কাহিনীই মানব-জীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব লইয়া রচিত, তাহাতে রাজনীতির ছায়াপাত ঘটে নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার ব্যতিক্রম। আগাগোড়া মনস্তত্ত্বধর্ম্মী লেখক হইয়াও সুবোধ বাবু যে কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ও রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন সম্পর্কে সচেতন, 'ইঙ্গিত'-এ তাহার প্রথম এবং সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতির যে খেলায় নেতায় নেতায় সঙ্ঘাত বাধে, অর্থনীতি ও সমাজনীতি শক্তিমানের ক্রীতদাসে পরিণত হয়, বহু প্রাণ পদদলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গে দোলে, 'ইঙ্গিত' সেই উন্মত্ত খেলার সহজবোধ্য কাহিনী। চরিত্র বিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা লক্ষ্যে পড়ে। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী, শ্রীমন্ত, বিভূতিবাবু, রাণী সুভদ্রা, জয়ন্তী প্রভৃতি বিভিন্নমুখী চরিত্রগুলি এক সঙ্গে জুটিয়া ইঙ্গিতকে গভীর ও সুদূর-প্রসারী করিয়া তুলিয়াছে।

তখন ও এখন : গল্প সঞ্চয়ন। শিশির সেন। আনন্দ পাবলিসার্স : ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

'বিংশ শতাব্দী'র লেখক শ্রীযুক্ত শিশির সেনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তখন ও এখন'। যথেষ্ট কম রচনা পরিবেশনের মধ্য দিয়া যাঁহারা সংযমশীল সার্থক রচনা দ্বারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, শিশির বাবু তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থে দশটি গল্প স্থান পাইয়াছে, প্রথম গল্প 'ঊনত্রিশে জুলাই' বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়, গল্পটি রাজনীতি মূলক। এতদ্ভিন্ন মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীকেও লেখক পাশা-পাশি স্থান দিয়াছেন। প্রায় প্রতিটি গল্পই আত্মবকিয়তায় উজ্জ্বল। শিশির বাবুর লেখনী জয়যুক্ত হউক।

প্রথমা : গল্পগ্রন্থ। বেলা দে। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

'প্রথমা' দ্বারা লেখিকা বাংলা সাহিত্যে প্রথম গ্রন্থয়িত্রী রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে মোট দশটি গল্প পরিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলি মোটা-মুটি চলনসই বলা চলে। চতুর্থ গল্প 'সব শেষ' দিয়া 'প্রথমা'র সমাপ্তি টানিলে গল্প সাজানো আরও রুচিপূর্ণ হইত বলিয়াই মনে হয়। লেখিকার প্রথম উদ্যম হিসাবে 'প্রথমা' সার্থক। গল্পগুলির বিষয়বস্তু যাহাই হউক, সমস্ত রচনার মধ্যে লেখিকার বিশেষ একটি মিষ্টি হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়—যাহা গল্পগুলিকে অনেকখানি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

করণিক : বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (অধুনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ) এম্প্লয়িজ এ্যাসোসিয়েসনের মুখপত্র। ৬৭এ, নেতাজী সুভাস রোড, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জনসাধারণে জ্ঞান বেশীদূর অগ্রসর নয়। সঞ্চয়কারিদের সঙ্গে ব্যাঙ্কেরসম্বন্ধ মাত্র চেকের মাধ্যমে, ইহার অধিক নয়। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রহিয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারী ভূমিকা স্বরূপ গোড়াতেই ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়া জনসাধারণকে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সহজভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে প্রশ্নটি তুলিয়াছেন, তাহা আজ ব্যাঙ্ক পরি-চালকদের পক্ষে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।—'এই নূতন পরিচালনা-নীতির মধ্যে উদার মহত্তম কর্ম্মপন্থা দেখা দেবে, না সে তার পুরোণো কর্ম্মপন্থাকেই অনুসরণ ক'রে চল্‌বে। ব্যাঙ্ক শুধু ঋণ দেওয়া ও নেওয়া প্রতিষ্ঠানরূপে চালু থাক্‌বে, না বৃহত্তর জগতের বিবর্ত্তনের মধ্যে নিজেকেও প্রগতিশীল ক'রে তোলার প্রয়াস পাবে, জনসাধারণের মর্ম্মদেশে প্রবেশ ক'রে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে দেবে?'

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় রচনায় সংখ্যাখানি বিশেষ সারগর্ভ হইয়াছে। সুচারু প্রচ্ছদপটে প্রথম দৃষ্টিতে 'করণিক'কে কাব্যসঞ্চয়ণ বলিয়া ভ্রম হয়। এমন সুন্দর গ্রন্থসজ্জা ও মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা সাময়িকপত্র জগতে খুব বেশী দৃষ্ট হয় না।

সম্পাদকীয়

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান

সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দ-তিরোধানের সংবাদ পৌঁছিবা মাত্রই কলিকাতার "মেট্রোপলিটান ক্লাবে"র প্রায় পাঁচশত সভ্য তাঁহার প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থে একটী শোকসভায় সম্মিলিত হয়। সভাচার্য্য মহাশয় স্বদেশ-সেবায় শ্রীঅরবিন্দের অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি বাণী আবৃত্তি করেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। যে সময়ে মাতৃভাষায় অনভ্যস্ত ইংরাজী-নবিস অরবিন্দ ঘোষ বরোদার গাইকোয়ারের সাতশত টাকার বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ৭০৲টাকা সম্বলে কলিকাতা আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন, বাঙ্গলার সে সময়ের অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তখন দেশে সু-পবন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে, ভারতে পূর্ব্বে যাহা হয় নাই—জাতীয়তা-বোধ প্রবলভাবে জাগিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে চিন্তাধারা জাগিয়াছিল, এবার বিংশ শতাব্দীতে তাহা কার্য্যধারায় প্রবাহিত হইল। প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহ সমগ্র দেশ প্লাবিত করিল। কিন্তু যেস্থানে সেই প্রবাহের উৎস, তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার মত বাঙ্গলায় তখন কেহ ছিলেন না। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু নব ভাবধারার প্রাণস্পর্শ তিনি করিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দই সেই ভাবধারার প্রতিভূ হইলেন। দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, কবি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি"।

প্রথমেই তিনি গ্রহণ করিলেন জাতীয় শিক্ষার ভার। তৎপরেই নিলেন সাংবাদিকতার কঠোর দায়িত্ব। সে আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, ইতিপূর্ব্বে যাহা কখনও হয় নাই। এ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের ধুয়া ছিল—আমরা সব উন্নতি করিব, কিন্তু ইংরাজের অধীনে, যেহেতু ইংরাজ-শাসন ভগবানের দান। কিন্তু অরবিন্দ বলিলেন, "ইংরাজ চাই না, আমাদের কাজ আমরাই করিব। আমাদের শাসন আমরাই চালাইব।" তাই কাগজের নাম হইল "বন্দেমাতরম্", আর উদ্দেশ্য হইল সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ—Absolute autonomy free from all British Control, দাবী স্বাধীনতা। কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"কোনো ক্ষুদ্র দান,
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। শুধু আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।

'বন্দেমাতরম্' নাম হইল কেন? কারণ তিনি মনে করিতেন, এই মন্ত্র ঋষি-প্রদত্ত; দেশের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মস্ফূর্ত্তির বিকাশ হয় ইহাতে। একথাও অরবিন্দ বলিয়াছেন—আজ দেশের লোক যেরূপ বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, এই মন্ত্রের মর্ম্ম এখন বুঝিবে না, হয়তো অনেক দিনই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু যখন বুঝিবে, তখন ঠিক দেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও ইহার সাধনা করিবে। এই পূর্ণ স্বরাজ লাভের আদর্শেই কাগজের নাম হয় "বন্দেমাতরম্"।

এই পরিপূর্ণতার জন্য সাধনার পথে দুইবার রাজনিগ্রহ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একবার 'বন্দেমাতরম্' মোকদ্দমায়, আরেকবার আলিপুর - বোমা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায়। কিন্তু দুইবারই তিনি দায়মুক্ত হইয়াছেন। ইংরাজ তাঁহাকে জালবদ্ধ করিতে পারে নাই। যখন ফিরিয়া আসিলেন (১৯০৯), তখন দেখিলেন—দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার চরম হইয়াছে। ভিক্ষানীতি প্রবল হইয়াছে, ভিক্ষালব্ধ মিণ্টোমর্লি সংস্কার কার্য্যে পরিণত

করিতে নেতৃবৃন্দ উৎসুক হইয়াছে। তিনি আবার সংবাদ-পত্রের সহায়তায় লেখনী ধারণ করেন—এবার 'কর্ম্ম-যোগীন' এবং 'ধর্ম্ম' কাগজের মাধ্যমে। সেই লেখনীর প্রভাব ইংরাজ সহ্য করিতে পারিল না, মডারেটরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগণ প্রমাদ গণিলেন। আবার ইংরাজ অস্ত্র হানিল—তাহাই ব্যর্থ করিবার জন্য অরবিন্দ দেশত্যাগ করিয়া পণ্ডিচারীতে গেলেন—যেমন পরবর্ত্তী কালে একদিন সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার সুস্বাদু ফল আনিবার জন্য সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। এই পরিপূর্ণতার কথাই রবীন্দ্রনাথ তাহার অমর কবিতায় লিখিয়াছেন—

"যার তরে নরদেব চিররাত্রিদিন তপোমগ্ন
যার তরে কবি বজ্ররবে গেয়েছেন
মহাগীত। মহাবীর সবে গিয়াছেন
সংকট যাত্রায়, যার কাছে আরাম
লজ্জিত শির নত করিয়াছে, মৃত্যু
ভুলিয়াছে ভয়, সেই বিধাতার শ্রেষ্ঠদান
আপনার পূর্ণ অধিকার চেয়েছ
দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়।"

অরবিন্দ পণ্ডিচারিতে যান ১৯১০ সালে। কথা হইতেছে, এই ৪০ বৎসরের সাধনায় তিনি কি পাইলেন এবং দেশবাসীকে কি দিয়া গেলেন। অনেকে বলেন, যাহারা সাধক তাহাদের সিদ্ধি লাভ হইলে তাহারা নীরবে উহা ভোগ করেন না, লক্ষ মুখে উহা বিতরণ করেন। বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে অমৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এখন সিদ্ধিলাভ পরিপূর্ণ ভাবে লাভ হইয়াছিল কিনা, সাধনার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে কিনা, সিদ্ধির কোন উচ্চ স্তরে উপস্থিত হইয়াছেন কিনা, এসব বিষয় আমাদের অনধিকার চর্চ্চা, মনে হয় ঐ সব বিচারের সময় এখনও হয় নাই। একমাত্র কাল তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। তবে একথা বলা যাইতে পারে, আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমাকালে সাধন-সময়ের কতকগুলি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। আর 'ব্রহ্মতেজের' কথা তাঁহার পূর্ব্ব-রচনায় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যাঁহাকে অরবিন্দ তাহার মোকদ্দমা সমর্থনকালে 'নারায়ণ' স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, যাঁহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হইয়াছে সেই দেশবন্ধুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলা যাইতে পারে:

"Aurabindo will be regarded as a poet of patriotism, prophet of nationalism and a lover of humanity and his voice will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands."

অরবিন্দের প্রথম পাঁচ-বৎসরের (১৯০৫-১৯১০) অবদানেই তিনি স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি, জাতীয়তার উদ্বোধক ও মানবপ্রেমিক। পরের চল্লিশ বৎসরের সাধনার কথা ছাড়িয়াই আজ আমরা স্বাধীনতার এই প্রথম জাতীয়তার পুরোহিত নিঃস্বার্থ ত্যাগব্রতী মহা-মানবের স্মৃতির প্রতি ভারতবাসীর পক্ষ হইতে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি। বন্দেমাতরম্।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে দেখিয়া আসিতেছি, আমাদের নেতৃবৃন্দ তাল ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা ভারতের চিরাচরিত ধর্ম্ম। যুদ্ধ সম্বন্ধেও ভারত যখন মহাত্মা গান্ধীর মহদাদর্শানুসারে জগতের শান্তি সংস্থাপনে ব্রতী, তখন কিছুতেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করিয়া পারেনা। এবং তাহাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থানুযায়ী একমাত্র রক্ষা কবচ। কোন পক্ষানুবর্ত্তী হইলেই ভারতের সাধনা জগৎকে কিছুতেই সে দিতে পারিবেনা। সুতরাং যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষতা-নীতি সকলেরই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই নীতিতে শান্তির বার্ত্তা সর্ব্বদা ঘোষণা করিলে এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া কোরিয়ার যুদ্ধে 'উনোকে' সমর্থন করায় এবং মেডিকেল ইউনিট দিয়া সহায়তা করায় এবং সৈন্য নাই বলিয়া পাঠানোর প্রশ্ন এড়াইবার উক্তিতে নিরপেক্ষতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান সৈন্যগণ যখন ৩৮ সমান্তরাল অক্ষরেখা পার হইয়া উত্তরে আরও অগ্রসর হইয়া গেল, তখন, ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগ আপত্তি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া উক্ত অক্ষসীমা পার হওয়ার ব্যাপারটায় কার্য্যতঃ প্রতিবাদ করে নাই। সুতরাং আমেরিকানদের যে কিছু কিছু বিপর্য্যয় হইতেছে, তাহাতে ভারতের প্রস্তাবগুলির প্রতি চীন-গণতন্ত্র-সরকার বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারিতেছে না। অবশ্য শ্রীযুক্ত বি এন রাও যুদ্ধ নিবারণ cease fire সম্বন্ধে যে সব চেষ্টা করিতেছেন, তাহা খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু চীন গণতন্ত্র সরকারের প্রতিনিধিকে উনোতে লওয়া হউক, এরূপ প্রস্তাব ভারত এখন আর উত্থাপিত করিতেছেনা। আমাদের মনে হয় গণতন্ত্রী চীনকে উনোতে না নিলে কোনরূপ গোলমাল মিটিবার সম্ভাবনা নাই। করমোজার কথা এখন নাও উঠিতে পারে। আমাদের মনে হয়, বরাবর নিরপেক্ষ থাকিয়া ভারত চীনের প্রধান উপদেষ্টার দাবী করিতে পারিত, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা (মত ও কার্য্যবিধি) রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় ভারতের মিটমাটের সাধু চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার মত কার্য্যকরী হইতেছে না। ভরসা করি, ভারত চীনকে উনোতে লওয়ার প্রস্তাব পুরোভাবে রাখিয়া বাকী কথা চালাইবে। আমাদের বিশ্বাস, তাহাতেই ভাল কাজ হইবে।

খাদ্যদর্শন ও মুন্সীবাদ

দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ উপযোগিতা এই যে, ইহা দ্বারা নিছক পার্থিব বিষয়াদির কোনোরূপ ফললাভ না হইলেও যেকোনো পার্থিব বিষয়েরই বস্তু-অতীত রহস্যগুলি লইয়া অনেক বাদানুবাদ করা চলে, সে বাদানুবাদের স্থলে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করা চলে। এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই বাদানুবাদের কোনো মীমাংসা না হইলেও চলে। ভারতবর্ষ দর্শনের দেশ, সব কিছুই দর্শনের মহিমায় উন্নীত করাই হইল এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব। হাট বাজারের মতন এমন যে একটা বড় ব্যাপার, ভারতের দর্শনপ্রাণতার প্রভাবে সেটিও কৃষ্ণদর্শনে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই দর্শন-প্রাণতার ঐতিহ্যে হালে আবার আমরা আরও একটি নূতন দর্শন লাভ করিয়াছি। এটি হইল ভারতের নবতম দর্শন। খাদ্যদর্শন বা মুন্সীবাদ—ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল মুন্সী এই নবতম দর্শনের প্রবর্ত্তক।

বছর খানেক আগেকারই কথা হইবে বোধ হয়, একদিন, মনে আছে ভারতের পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (বেআইনি কথা বলিতেছি না; একবছর আগে তখনও শ্রীযুক্ত নেহরু অ-পণ্ডিত হইবার বাসনা প্রকাশ করেন নাই) ঘোষণা করেন যে, ১৯৫১-র মধ্যেই ভারত খাদ্যোৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল হইবে। কথাটা শুনামাত্রই ভারতের সকল অদার্শনিকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহা জড় পার্থিব সত্যের কথা নহে, দর্শনেরই কথা। কারণ একেবারে জড় গাণিতিক হিসাব হইতেই কথাটা বহুদিন হইতে জানা আছে যে, ভারতের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ আর ভারতের সেই খাদ্য-খাদক লোকসংখ্যার পরিমাণ—এই দুই পরিমাণের মধ্যে প্রভেদটা দুস্তর। ভারতের সমস্ত কর্ষিত ভূমিতেও যদি বারমাস ধরিয়াই নিরুপদ্রবে খাদ্য উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলেও সেই খাদ্য দিয়া ভারতের সমস্ত মানুষের পেট ভরে না; এই জন্যই ভারতের একটা মোটা অংশের খোরাক জোগায় রেঙ্গুনের চাল। কিন্তু ভারতের খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারটাও আবার খামখেয়ালি প্রকৃতির জন্য কোনো বছরেই মোটেই নিরুপদ্রব অবস্থায় যায় না—প্রতি বছরই কোনো না কোনো স্থানের শস্য একটা না একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বরবাদ হইয়া যাইবেই। ফলে ভারতের খাদ্য-খোরাকে আরও খানিকটা ঘাটতি পড়ে। ইহার উপরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বরিশালের চাল ও পশ্চিম পাঞ্জাবের গম ইত্যাদি বেহাত হইয়া যাওয়ায় ভারতের এই ঘাটতি অধিকতর তীব্রতায় অধিকতর পাকা আসন লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহা জানা কথা যে, এইসব দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক না সরাইয়া ভারতকে শুধুমাত্র একবৎসরের মধ্যে স্বয়ম্ভর উৎপাদকে পরিণত করার কথাটা যুক্তির প্রতিপাদ্য নয়, উহা দার্শনিক তুরীয়তা।

কিন্তু শ্রীনেহেরু শুধুমাত্র আদর্শটুকুরই সন্ধান দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ভারতের স্বয়ম্ভর খাদ্য নীতিকে একটা পুরাপুরী দর্শনে পরিণত করিতে বাকি আর যা কিছু কৃতিত্ব, সে-সমস্তই ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল মুন্সীর। গত জুন মাসেই যখন ভারতের একাধিক স্থান হইতে একাধিক ভুখা-মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত মুন্সীই দার্শনিকের পরম নিস্পৃহতায় সেই সব সংবাদ নস্যাৎ করিয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ বৃক্ষরোপণে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর ভারতের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এদেশে ৩৯লক্ষ টনের মত খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন ছিল। উক্ত পূর্ব্ব বৎসরেই দক্ষিণ ভারত, বিহার প্রভৃতি স্থানে চাষ আবাদের যে রকম গতিক গিয়াছে, তাহাতে এ বৎসরে হয়তো পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে অধিক পরিমাণেই খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন ছিল। এটা অবশ্যই পার্থিব অর্থনীতির কথা। কিন্তু দার্শনিক মুন্সিজী সে প্রয়োজনকে প্রয়োজন বলিয়াই মনে করেন নাই। এমন কি ভারতের প্রধানতম খাদ্য ঘাটতি-পূরক ব্রহ্মদেশ যখন মুন্সিজীর হাবভাব দেখিয়া ঘাবড়িয়া গিয়া মুন্সিজীর কাছে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য এক আবেদন জানায় তখনও শ্রীমুন্সিজী নাকি নিতান্ত দার্শনিকের মতই ব্রহ্ম সরকারকে খুব ভাসা ভাসা এক জবাব দিয়া জানান যে, ভবিষ্যতে হয়তো ভারতের চালের প্রয়োজন হইতেও পারে। ফলে ব্রহ্ম সরকার গতিক সুবিধার নয় ভাবিয়া যে পরিমাণ চাল ভারতকে বরাবর দিত, সেই পরিমাণ তাহারা অন্য এক খরিদ্দার খুঁজিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এবং সব দিক দিয়া মুন্সিজীর দর্শন প্রচেষ্টাও ফলবতী হইয়াছে।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির কথা এখন ভাবিতে গেলে পেটের ভিতর হাত-পা সিধাইয়া যাওয়ার জোগাড় হয়। খাদ্যের পরিমাণে যা টান পড়িতেছে তাহা অবর্ণনীয়। দক্ষিণ ভারতে রীতিমত দুর্ভিক্ষ, বিহারেও তাই উত্তর প্রদেশেও তাই; পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা আধপেটা খাইলেও এখনও সেখানে ৯লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু কোথায় খাদ্য? মুমূর্ষু প্রাণীর মতো আবার পৃথিবীর চারিদিকে খাদ্য সংগ্রহের আবেদন গিয়াছে। সামান্য খাদ্য হয়তো মিলিবেও; কিন্তু সেটা দ্বিগুণ তিনগুণ দামে। এবং তা সত্বেও প্রয়োজনানুযায়ী প্রায় অর্দ্ধেক খাদ্যই আর্থিক বছরের শেষ ক'টি মাসের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে না। ব্যাপারটা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পার্লামেন্টের বশম্বদ সদস্যেরাও পর্য্যন্ত উদ্বেগে দার্শনিক কাণ্ডজ্ঞানটা বজায় রাখিতে সমর্থ হন নাই। ভারত পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশনে তাঁহারা মুন্সিবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীর মত যা তা সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। মুন্সিজী কিন্তু এই সব বিরুদ্ধ কথায় নামমাত্রও করেন নাই, উল্টাইয়া দার্শনিকের পরম নিশ্চিন্ততায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের যদি সহযোগিতা তিনি পান, তাহা হইলেও এখনও তিনি ভারতবর্ষকে খাদ্যের ব্যাপারে অনতিবিলম্বেই স্বয়ং-ভর করিয়া দিতে পারেন।

এই নবতম মুন্সিবাদের দার্শনিক অর্থ যে কি, তাহা অবশ্য বলা দুষ্কর, কিন্তু পার্থিব অর্থে ইহার অনুবাদ করিলে বোধ-হয় কথাটা এই রকমই দাঁড়ায় যে—পার্লামেন্টের বেকুব সদস্যরা অনেক কথা ফাঁস করিয়া দিল বলিয়াই না খাদ্য পরিস্থিতিতে আজ এত অভাব মনে হইতেছে। সদস্যরা কোনো কথা না বলিয়া যদি মুন্সিজীকে শুধু সায় দিয় চলিতেন, তাহা হইলে দেশের অর্দ্ধেক মরিয়া গেলেও কি তাহারা কখনও ঘুর্ণাক্ষরেও জানিতে পারিত যে তাহাদের ভাঁড়ার-ঘরের এই বাড়ন্ত অবস্থা!

তিক্ত চিনি

চিনির ব্যাপারেও নাকি শ্রীযুক্ত মুন্সির দপ্তরে প্রায় একই রকমের কেলেঙ্কারি।

চিনি পদার্থটিও আমাদের দেশে একটি সদা-ঘাটতির সরঞ্জাম। এ ঘাটতিও, অন্যান্য খাদ্য শস্যের মতই প্রাকৃতিক কারণপ্রসূত—যতখানি প্রয়োজন ততটা দেশে উৎপাদিত হয় না। হালে এ ঘাটতি আরও খানিকটা পাকা হইয়াছে, আমাদের রামভক্ত চিনি ব্যাপারীদের প্রসাদাৎ। বাজার দরকে একটা চড়া পর্দ্দায় বাধিয়া রাখার জন্য তাঁহারা মজুতমাল গোপন করিয়া বছর ভরই

একটা সর্ব্বকালীন ঘাটতি জিয়াইয়া রাখেন। ভারত সরকার এই বছরের গোড়ার দিকে এই ঘাটতির সমাপ্তি ঘটাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। এবং স্থির করিয়াছিলেন যে এবৎসরে তাহারা বাহির হইতে বেশ কিছু বেশী পরিমাণের চিনি আনাইয়া বাজারে ছাড়িয়া দিবেন।—এই ঘটনাটি হইল যখন জয়রাম দাস দৌলতরাম খাদ্য দপ্তরের কর্ণধার ছিলেন, তখনকার।

তারপর ইতিমধ্যে কর্ণধার পরিবর্ত্তিত হইয়া খাদ্যদপ্তরে আসিলেন মুন্সিজী।

মুন্সিজী আসিবার কিছু আগে হইতেই এক হংকং-এর চিনি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় খাদ্য দপ্তরের সহিত ৩০ হাজার টন চিনির বেচা কেনা নিয়া তদ্বির করিতেছিলেন, বেচা-কেনার সর্ত্ত ছিল যে হংকং-এর উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি টন প্রতি ৬৫২৲ টাকা মূল্যের বিনিময়ে ৩০ হাজার টন চিনি নিজেদের বহন-খরচায় ভারতের যে-কোনো বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু মুন্সিজী খাদ্যমন্ত্রী হইয়াই হংকং-প্রতিষ্ঠানের এই প্রস্তাব খারিজ করিয়া দেন। মাস কয়েক পরে আবার উক্ত প্রতিষ্ঠানই টন প্রতি ৬৫৫৲ টাকা দরে আরও ৫০ হাজার টন চিনি ভারতকে বিক্রয় করিবার অভিলাষ জানায়। মুন্সিজী নাকি এবারও এই প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দেন। শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে অবশ্য ৬০ হাজার টন চিনিই আমদানি করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ষাট হাজার টন চিনি ভারতবর্ষ কিউবা হইতে ক্রয় করিয়াছে-টন প্রতি ৮২৬৲ টাকা হইতে ৯০৮৲ টাকা দরে। অর্থাৎ পূর্ব্বতন হংকং প্রতিষ্ঠানের নিকট মালটা লইলে যে টাকা খরচ হইত, তার চেয়ে ১৩৩ লক্ষ মুদ্রা অধিক মূল্যে। বলা বাহুল্য এই বাড়তি টাকাটা ভারতীয় করদাতাদের পকেট হইতেই আদায় করা হইবে।

পার্লামেণ্টের সম্প্রতিকার এক অধিবেশনে উক্ত প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস-সদস্য শ্রীযুক্ত ত্যাগী এই কেলেঙ্কারির তথ্য বহুবিধ প্রমাণসহ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশ হইলে বোধহয় এমন একটা কেলেঙ্কারির জন্য সেখানকার মন্ত্রীসভা বারবার পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। কিন্তু রামরাজ্য ভারতের বেলায় এ সম্বন্ধে একটা তদন্ত হওয়াও সম্ভব হয় নাই। কয়েক জন সদস্যের তাড়নায় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য একবার তদন্তের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কথা বলিয়া তিনি এক প্রলয়ঙ্কর ফ্যাসাদে পড়িয়া গিয়াছিলেন। মুন্সিজী পদত্যাগের ভয় দেখান। কংগ্রেসী সদস্যরা এক ঘরোয়া অধিবেশনে শ্রীনেহরুর এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আর বাকি রাখেন নাই। সত্যই তো সামান্য এই একটা ব্যাপারের জন্য তদন্ত করিতে বসিলে আর শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কেমন করিয়া বজায় থাকে? কিন্তু বোধহয় তদন্ত করার শ্রীনেহরু কৃত প্রস্তাবটি গৃহীত হইলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্ত অটুট থাকিত। কারণ তদন্ত করার প্রস্তাব হইলেই যে তদন্ত করিতে হয়, বা হইলেও সে তদন্তের ফলে যে গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, এমন একটা অন্যায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী ব্যাপার কি আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সাড়ে তিন বৎসরে কোনদিনই ঘটিয়াছে? না তাহা ঘটিতে পারে?

নেপাল দেশটা কাদের?

রাজারও নয়, প্রজাদেরও নয়, মাত্র ৮০টি পরিবারের। নেপালের যত ভূমি তার শতকরা ৯০ ভাগের মালিক এই ৮০টি পরিবার। নেপালের যত প্রাকৃত সম্পদ, যত রাজকীয় পদ, যত ব্যবসায় সে সমস্তেই একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব শুধু এই আশীটি পরিবারের। নেপালের যে অট্টালিকা আর রাজপথগুলি সেই সবেতে এই ৮০টি পরিবারভুক্ত মানুষ ছাড়া আর কাহারও পা দেওয়ার অধিকার নাই। যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সে রাজ্যে সেখানে প্রবেশাধিকার প্রায় শুধু এই ৮০টি পরিবারের লোকজন। অথচ প্রজাদের কেহ যদি নিজেদের জন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িতে চায় সেই অপরাধের জন্য তার আজীবন কারাবাস হয়। এই ৮০টি পরিবারের বিরুদ্ধে কেহ যদি টু শব্দটি উচ্চারণ করে, তবে সেই হতভাগ্যের ফাঁসি হইতেও আটকায় না। এমনকি এইরূপ হঠকারিতা যদি সেখানে রাজাধিরাজও স্বয়ং করিয়া বসেন, তাহা হইলেও

সম্ভবত সেই বিষ্ণু অবতারেরও জীবন নিয়ে টানাটানি হইবার উপক্রম হইতে পারে।

এই নাকি নেপালের আভ্যন্তরীণ স্বরূপ। আধুনিক পৃথিবীতে এই রাষ্ট্রীয় স্বরূপকে নিঃসন্দেহেই অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ঘরের পাশে থাকিয়াও আমরা ভারতবাসীরা নেপাল রাজ্যের এই অসাধারণ সত্তার কথা কোন দিন জানিতে পারি নাই, জানিতে পারি নাই যে গত প্রায় কুড়ি বৎসর কাল হইতে নেপালী জনতার একটা অনুবেক্ষনীয় অংশ ভারতের কংগ্রেসেরই আদর্শে স্বদেশের এই অসাধারণ নারকীয়তা অপনীত করার জন্য শুধু সংগ্রাম করিয়াছে আর প্রাণ দিয়াছে। যে দিন জানিলাম, সেও একটা অসাধারণ ঘটনার সূত্রে। নেপালের অধিপতি স্বয়ং সেদিন এই ৮০টি পরিবারের নাগপাশ হইতে পলায়ন করিয়া আমাদের সরকারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে নেপাল-রাষ্ট্রের এই যে অনন্যসাধারণ বৈষম্য-স্বরূপ, এই স্বরূপ বুঝি শেষ পর্য্যন্ত অটুটই রহিয়া গেল। মাসখানেক আগে সীমাহীন অন্ধকার স্তূপের মধ্যে এক ফোঁটা আলোক-রশ্মির মতো একটা মহনীয় গণচেষ্টা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নেপালের এই অসাধারণ রাষ্ট্রীয় বৈষম্যকে দূর করিবার জন্য কিন্তু অগণ্য প্রতিকূলতার মধ্যে এই প্রচেষ্টা খুব সম্ভব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নেপালের রাণাচক্রকে ভূমিসাৎ করার জন্য আজও যাহারা সর্বস্ব বিপন্ন করিয়া নেপালের রাজকীয় বাহিনীর সহিত সংগ্রামপর, রাণা-চক্রের ক্ষমতার তুলনায় তাহাদের শক্তি অতিরিক্ত রকমে সামান্য। এই সামান্য শক্তিই হয়তো অসামান্য হইতে পারিত যদি ভারতের কাছে তাহারা মৌখিক সমবেদনার চেয়েও বস্তুগত কোনো সহায়তা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে জানি না, রাণাচক্র বিরোধী নেপালী জনসাধারণ কী সরকারী কী বে-সরকারী ভারতের কোনো মহল হইতেই এজাতীয় সহায়তা আজও একবিন্দু লাভ করে নাই। কোনোদিন যে পাইবে সে আশাও সম্ভবতঃ সুদূর পরাহত।

কংগ্রেস

নাসিক অধিবেশনের পর হইতেই যে কংগ্রেসের গঠন-সত্তা একটা প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি খাইয়াছে, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। বিভিন্ন জেলায় জেলায় খুদে নেতৃত্বের তো কথা নাই, প্রাদেশিক কমিটীগুলির হাজার দেড়েক সদস্য লইয়া একটা সামন্ত গোষ্ঠির মতো যে কংগ্রেসের মাঝারি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পর্য্যন্ত মানে মানে কংগ্রেস হইতে বিদায় লইয়া এক একটা করিয়া নূতন দল গঠনে উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। গণ-পরিষদের মত সর্বোচ্চ ক্ষেত্রেও এই বিচ্ছেদের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। এই সব আভ্যন্ত ঘটনার গতিকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ভারতে একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস এখন ভাঙনোন্মুখ।

ইতিপূর্ব্বে এই ধারণা অবশ্য আমাদের ছিল। কিন্তু বিষয়টাকে অন্য একদৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিতে গিয়া আমরা সেই ধারণাটাকে বদলাইয়া ফেলা দরকার মনে করিতেছি। এবং দেখিতেছি ভাঙনের চিহ্নমাত্রও কংগ্রেসের কোনো অংশে নাই। অবশ্য এই কংগ্রেস বলিতে আমরা প্রাক্-স্বাধীনতার যুগের কংগ্রেসকে বলিতেছি না। সে কংগ্রেসের অর্থ ছিল ভারতের সমগ্র জনতা। সে কংগ্রেসের মৃত্যু মহাত্মার সাথে সাথেই হইয়াছে। এখন কংগ্রেস বলিতে আমরা বুঝি—যে রাজ-নৈতিক দলটি দেশের সরকারি ভাগ্যের নিয়ন্তা, যে দলটির-মধ্যস্থতা ছাড়া কোনো পারমিটের আদান প্রদান আইনসিদ্ধ নয়, দেশের সমস্ত গরিষ্ঠ সংখ্যা প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি যে দলের অনুগামী এবং যে দল একটা ইলেকশন চালাইবার মত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই সব সর্ত্তের দিক হইতে রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের গা'টি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এমন সাধ্য কার?

জনগণের কংগ্রেস, জনগণের সান্নিধ্য হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া নিয়াছে। এইজন্যই ভারতীয় জনগণের হৃদয়-আসন হইতে কংগ্রেস আজ বিচ্যুত। শুধু এই তত্ত্বটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই দলত্যাগী কংগ্রেসীরা

আগামী ইলেক্‌সনে বাজিমাৎ করিবার আশায় সব কংগ্রেস বিরোধী দল গঠনে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই তাহারা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, যে ক্ষেত্র হইতে কংগ্রেস আজ বিচ্ছিন্ন, সেই জন হৃদয়ের সহিত কোন সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার মত ক্ষমতা এই দলত্যাগী কংগ্রেসীদের কাহারও নাই, সে বস্তু লাভ করিবার যোগ্য চৈতন্য-লাভে ইহারা পরাঙ্মুখ। কংগ্রেসকে ইহারা আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন সেইখানে যেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহা সব চেয়ে শক্তিশালী, অর্থাৎ সেই অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষেত্রে, সেই কাগজী জনপ্রিয়তায় আর সেই ইলেক্‌শনী স্বার্থ-দ্বন্দ্বে।

এই দিক দিয়া কংগ্রেসের গঠন-সত্তা কোনদিনই ভাঙিবার নয়ঃ সমগ্র জনগনের হৃদয় ক্ষেত্র হইতে একেবারে খসিয়া পড়িলেও না। কারণ আমাদের গঠণতন্ত্র যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের অনুযায়ী সেই গণতন্ত্রগণের বিরুদ্ধে একেবারে দেশশুদ্ধ চালিত হইলেও রীতিমত আইনের জোরেই অটুট থাকিতে পারে।

যুদ্ধ চাই না?

শেফিল্ড হইতে বিতাড়িত এবং ওয়ারস'-তে অনুষ্ঠিত যে শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল, সেখান হইতেও ঠিক এই রকমের একটা স্লোগান উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেই প্রসঙ্গের কোনো আলোচনা করিতেছি না। কাশ্মীর, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, এবং সমজাতীয় আরও কয়েকটি বৈষম্যমূলক আর্থিক বিষয় লইয়া, ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে চিঠি পত্রের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, আমাদের আপাততঃ বক্তব্য সেই পাক-ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে। কিছুদিন হইল আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু উক্ত আলোচনার চিঠি-পত্রাবলী সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম, প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের পারস্পরিক আলোচনার যে মূল প্রতিপাদ্যটি সেটিও মোটামুটি এই স্লোগানটিরই মতো; অর্থাৎ যে মতানৈক্য-দূষিত সমস্যা ক'টির জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ-গর্ভ বিরোধ ক্রমেই কশাইয়া উঠিতেছে—প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের উভয়েই সেই বিরোধের সমাধানে আন্তরিক ভাবেই যুদ্ধের প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিতে চান।

প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের উদ্দেশ্য যে অতি-মহৎ সে বিষয়ের উল্লেখটাই বোধ হয় বাহুল্য। কারণ স্বয়ং ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে যে, যদি কোনো একটা বিরোধ-পূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে প্রায় বিনা ব্যতিক্রমেই দেখা যায়—যে-কারণে যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সেই কারণটি কিন্তু মোটেই অপনীত হয় না—বরঞ্চ সেটি আরও জটিলই হইয়া ওঠে। শুধু একটিমাত্র উপায়ে যুদ্ধ দিয়া বিরোধের একটা সাময়িক মীমাংসা হইতে পারে—সেই উপায় হইল একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নেওয়া। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধের সমাধান যে বর্তমানের বিশ্ব-পরিস্থিতিতে সেই অদ্বিতীয় পরিণতির মধ্যেই ঘটিবে বা ঘটিতে পারে—একথা ভাবা বা কল্পনা করা বোধ হয় পাগলেরও দুঃসাধ্য।

কথাটা আরও একটু ঘটনাত্মক দৃষ্টি দিয়া বুঝিয়া নিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। জনগণের দিক হইতেই বিষয়টাকে যাচাই করি। পাকিস্তানের প্রতি আমাদের দেশের জনগণের বিরূপ-মানসের একমাত্র কারণ (পাক-ভারত বিরোধের আসল কারণ ইহাই) - পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুদের প্রতি পাকিস্তানীদের অতি-ইস্‌লামী মনোভাব। যাহারা একদিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সব চেয়ে নির্ভীক সৈন্যদের অন্যতম বলিয়া সমগ্র দেশের আদর্শস্থল ছিল, সেই এককোটি মানুষ,স্বাধীনতা পাওয়ার পরও স্বাধীনতার কোনো স্বাদ পাইবে না, পরন্তু ক্রীতদাসের চেয়েও জঘন্য জীবন যাপন করিবে, এবং তবুও তাহাদের প্রাণ নিরাপদ থাকিবে না, ধন নিরাপদ থাকিবে না, গৃহের আব্রুও, পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদা কলঙ্কিত হইবে—পূর্ব্ব-বঙ্গের এককোটি হিন্দুর জীবন সম্বন্ধে এই বাস্তব কথাটা ভাবিয়াই পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয় জনতা একটা যুযুৎসু মনোভাব পোষণ না করিয়া পারে না। ধরা যাক্‌ এই

শ্বাসরোধকর পরিস্থিতি হইতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের উদ্ধার করিবার সদভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এ যুদ্ধের সর্বশেষ পরিণতির কথাটা পরের প্রসঙ্গ, বলা যায় না—হয়ত এই সম্ভাবিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া আশঙ্কিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটাও বাধিয়া যাইতে পারে,—কিন্তু তার আগে যাঁহাদের বাঁচাইবার জন্য এই সম্ভাবিত যুদ্ধ, সেই এককোটি মানুষকে বাঁচানো যায় কি? না উল্টাইয়া সর্বনাশের তরঙ্গটাকেই তাহাদের উপরে বহাইয়া দেওয়া হয়? এই সমস্যাটির উত্তরে আমাদের ভারতের একটি উত্তর প্রায় সবসময়ই মুখাইয়া আছে দেখি, যে, পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের গায়ে হাত দিলে আমরা ভারতের মুসলমানদের আস্ত রাখিব না। কিন্তু তাহা হইলেও কি সেই হতভাগ্য এককোটি মানুষকে বাঁচানো গেল?

অথচ ক্রমাগত পাকিস্তানের ইসলামী মনোভাবের তোষণের মধ্যেও সত্যকার কোনো মীমাংসা নাই। অধিকন্তু উহাতে তুষ্টির দ্বারা দুর্জনকে অধিকতর শক্তিমান ও উদ্ধত করিয়া তোলাটাই সহজ। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইবে তাহা হইলে সমাধানটি হইবে কিসে? আমাদের মতে দুইটিমাত্র পথ খোলা আছে এই সমাধানের। নিপীড়িত নিঃসম্বল মানুষদের কোনো জাতি-ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্মই বলি আর জাতিই বলি, তাহাদের শুধু একটি মাত্র পরিচয় যে তারা নিঃসম্বল, অতি-সম্বল কতিপয়ের দ্বারা তারা পীড়িত। ভারত ও পাকিস্থানের এই জাতিধর্ম্মহীন নিঃসম্বলেরা যদি কোনোদিন নিজেদের চিনিয়া এক হইতে পারে, পাক-ভারত বিরোধের সর্ব্বসমস্যার সমাধান চরমভাবে হইতে পারে শুধু সেদিন। সমাধানের দুইটি খোলাপথের একটি হইল এই। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এ পথটি বিমূর্ত্ত অসম্ভবেরই মত রুদ্ধ। বাকি যে খোলা পথটি সমাধানের সেটি হইল যাদের দুর্দ্দশার জন্ত পাক-ভারতের বিরোধের সূচনা, তাদেরকে নিজের ঘরে ডকিয়া আনা। ইহা ছাড়া তৃতীয় পথ নাই।

পাক-ভারত প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের পত্রালাপের মধ্যে এই পথটির কিন্তু উল্লেখ মাত্রও দেখিলাম না। ইহার পরও যে ভারত ও পাকিস্তানের-বিরোধের মীমাংসা কোন পথে হইবে তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। হয়তো হইবেই না কোনো দিন। কারণ কৃত্রিম উপায়ে জাত এই উভয় শিশুরাষ্ট্রের সমস্ত বিরোধ চুকিয়া বুকিয়া গেলে হয়তো তার ফলে এই রাষ্ট্র দুটির বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতাদের নিরাপদ আসনের সামনে এমন কতকগুলি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে, যাহাদের সমাধান করিতে গেলে তাদের সেই অসম তক্তই বিপন্ন হইয়া উঠিবে।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে কোনো রাষ্ট্রেরই জনগণ কোনোদিন খুব বেশী লাভবান হয় না, লাভের মধ্যে তাদের কপালে জোটে অনায়াস-সিদ্ধ স্বর্গপ্রাপ্তির সুযোগ। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক লাভ ব্যতীত সত্যকার জয়লাভ যাদের হয়, তাদের খানিকটা পরিচয় আমরা পাইয়াছি সম্প্রতিকার কোরিয়া যুদ্ধের ঘটনা হইতে। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতেই প্রকাশ যে, কোরিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার ব্যবসা কারবারের অবস্থাটি হঠাৎ বড় চমৎকার ভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—সমরোপকরণ তৈয়ারী করার যে বিরাট বিরাট কারখানাগুলি বহুদিন অব্যবহারের ফলে মরিচা ধরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেগুলিতে এখন উদ্দাম কাজ—শেয়ার বাজারের সব রকম শেয়ারের প্রায় প্রতিটিই শতকরা ১৫ হইতে ৩৫ ভাগ উঠতি মূল্যের দিকে। আমেরিকার এই লাভভুক ভাগ্যবানদের কটাচর্ম্ম স্বজাতিদের সংখ্যা ভারত এবং পাকিস্তানেও খুব কম নয়। পাক-ভারত বিরোধটা মিটাইয়া ফেলিতে যে তাহাদের চেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিক সে পরিচয়ও আমরা পাট, তুলা ও কয়লার উভয় রাষ্ট্রীয় লেনদেনের মধ্যে পাইয়াছি। বলা যায় না, তাহাদের এই আন্তরিকতার প্রসাদে হয়তো বা পাক-ভারত বিরোধের মীমাংসার জন্ত শেষ পর্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা যুদ্ধও বাধিয়া যাইতে পারে। কিছুই কিছু বলা যায় না।

সমাধান

সম্প্রতি টালিগঞ্জের বাস্তুহারা কলোনীতে একদল জনতার উপর পুলিশ লাঠিচালনা করিয়া ২৬ জন

বাস্তহারাকে গ্রেপ্তার করে।' পুলিশের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, টালিগঞ্জে এক এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারী ছিল এবং কলোনীর বাস্তহারা ও বহিরাগত একদল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য, বেআইনী ভিড় ছত্রভঙ্গ করার জন্য, পুলিশকে লাঠিচালনা করিতে হয়। যে অঞ্চলে 'বিবেকানন্দ নগর'কলোনী অবস্থিত সেখানকার জমির মালিক ও উপনিবেশ গঠনকারী বাস্তহারাদের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ মন কষাকষি চলিতেছিল, এবং এই মন-কষাকষি স্বাভাবিক। ইহার ফলে পুলিশ এই অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করে। বাস্তহারাদের অভিযোগ এই যে, পুলিশ জমিদারের গুণ্ডাদের বাস্তহারাদের কুঁড়েঘর ভাঙিতে সাহায্য করে। গুণ্ডারা নাকি মেয়েদেরও অপমানিত করিয়াছিল। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদের সাধারণ সম্পাদকও অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ঘটনা এই নূতন নয় এবং ইতি-পূর্ব্বে এই ধরনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে পুলিশও ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছে এবং বাস্তহারারা আজ যে অভিযোগ করিয়াছে তখনও অনুরূপ অভিযোগই করিয়াছে।"

১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে প্রকাশিত একটি দৈনিক-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে খানিকটা অংশ হুবহু তুলিয়া দিলাম। বঙ্গশ্রীর পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখিবেন, এই মন্তব্যের মধ্যে বাস্তহারাদের সমর্থন এবং পুলিশ ও জমিদারদের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ উষ্মাপ্রচ্ছন্ন কটাক্ষ বড় বেশী রকমের সোচ্চার। সহযোগীর এই কুপিত দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনের যোগ্য নয়। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী হইলে সহযোগী আমাদের জাতীয় পুলিশ আর জাতীয় জমিদারদেরই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন। আমরা তো তাই করি। আর আমরা সমর্থন করি আমাদের এই জাতীয় পুলিশের প্রতিভূ জাতীয় সরকারকে। উদ্বাস্তরা আমাদের মতে এক-একটি মূর্ত্তিমান আপদ বিশেষ। এত দিনের যে সাধনার পর বুড়া বয়সে আসিয়া আমরা একটু স্বাধীনতা পাইয়াছি—গুছাইয়া বসিয়া মনের মত করিয়া শেষ বয়সে এই স্বাধীনতাটুকু একটুখানি ভোগ করিয়া নিব, এই আপদগুলির জালায় সেই সুযোগে' আমাদের আগুণ লাগিতে বসিয়াছে। এই হতচ্ছাড়াগুলাকে নদী-নালা ডিঙ্গাইয়া এদেশে আসিয়া পড়িয়া মরিতে কে বলিয়াছিল? আমাদের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করার জন্য যেকালে তাহারা পাকিস্তানই মানিয়া নিতে পারিল, তখন নীতিবোধ থাকিলে কি আর ভদ্রলোকের মত সেই পাকিস্তানে বসিয়া উহারা তুচ্ছ জীবনটুকুও দিতে পারিত না? স্বজাতিকে এমন করিয়া নাজেহাল করার আদর্শ তো আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে নাই। ইহা আমাদের মহান অহিংসার আদর্শেরও পরিপন্থী। আমাদের সুখকে উহারা হিংসা করে বলিয়াই না আমাদের নিত্যকার দুঃস্বপ্নের রূপ ধরিয়া আসিয়া উহাদের প্রাদুর্ভাব। আমাদের নিজরাষ্ট্রকে নির্বিঘ্ন করিতে হইলে এই দুঃস্বপ্ন হইতে আমাদের মুক্ত হইতে হইবেই।

কিন্তু গত ১৬ই অগ্রহায়ণের শনিবারে টালিগঞ্জে যে ব্যাপারটা হইয়া গেল, সেইরকম ব্যাপার ব্যতিরেকে এই দুঃস্বপ্ন দূর করিবার আর কোন্ সহজসাধ্য উপায় আছে শুনি। আর থাকিলেই বা কি? কতকগুলি বিদেশীর জন্য মিছামিছি কেন আমরা বাজে হাঙ্গামা বাড়াইতে যাইব?

আমাদের কথা নয়

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫২ সালে কলিকাতার লেক মেডিকাল কলেজ তুলিয়া দেওয়া হইবে; তবে হাসপাতাল থাকিতে পারে।...কলেজ আর চালানো সম্ভব হইবে না, কারণ কলেজের গৃহগুলি অস্থায়ী, উহার বাৎসরিক সংস্কার-ব্যয়ই তিন লক্ষ টাকা।' স্বাস্থ্য সচীবের এই উক্তিতে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবে। কলেজ বন্ধ হইলে লেক হাসপাতাল যে চলিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; কারণ হাসপাতাল ও কলেজ একই গৃহে, কলেজ বন্ধ হইলে গৃহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কমিবে না। (সত্যযুগ, ১০ই অগ্রহায়ণ)

হাসপাতালে আশ্রয় পাইবার সুযোগ সুবিধা কলিকাতাতে কোনোদিনই উহার অধিবাসীদের চাহিদা-

পরিমাণের তুলনায় অনুরূপ নয়—গত দশ বৎসরে এই বৈষম্য আবার অতি তীব্ররূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ যুদ্ধোত্তর কলিকাতায় অসাধারণ জনবৃদ্ধির তুলনায় হাসপাতালগুলির সংখ্যাল্পতার কথা চিন্তা করিলে আতঙ্ক জাগে। (ষ্টেটসম্যান, ১৩ই নভেম্বর)

* * *

মধ্যপ্রদেশ হইতে আগত জনৈক কংগ্রেসী পার্লামেণ্ট-সদস্য বহুদিন যাবৎ কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সমীপে অভিযোগ করিতেছিলেন যে, যতবার উক্ত সদস্য দিল্লী হইতে 'মণি অর্ডার' যোগে কাহারও কাছে কোনো টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, ততবারই সেই প্রেরিত টাকা উদ্দিষ্ট প্রাপকের কাছে না পৌঁছিয়া বারবার তাঁহারই কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বয়ং 'পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল' এই অভিযোগের তদন্ত করেন, এবং তদন্তের ফলে আবিষ্কার করেন যে গোড়াতেই গলদ। উক্ত পার্লামেণ্ট সদস্যটি কী ভাবে মণি-অর্ডার ফর্ম্ম লিখিতে হয়, তাহা জানেন না। কারণ যতবারই উনি 'মণি-অর্ডার' করিয়াছেন ততবারই উনি ফর্ম্মে প্রাপকের স্থানে লিখিয়াছেন নিজের নাম ঠিকানা, আর যাহার উদ্দেশ্যে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়াছেন মণিঅর্ডার ফর্ম্মে যে স্থানে প্রেরকের নাম লিখিবার নির্দ্দেশ, সেই জায়গায়। (ব্লিৎজ, ২৫শে নভেম্বর)।

* * *

ভারত পার্লামেণ্টের সদস্য অধ্যাপক কে, টি, শাহ সম্প্রতি বলিয়াছেন:—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিগুলি আমাকে খুব বেশী বিব্রত করিতে পারে না। একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে, জনৈক অধ্যাপকের নিকট আমি ব্রেজিলের রাজধানীর নাম কী জানিতে চাহিয়াছিলাম। যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সুরে তিনি আমাকে জানান ব্রেজিল-এর রাজধানীর নাম মেক্সিকো। কাছেই আরেকজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনি একজন সংবাদ-পত্র সম্পাদক। অধ্যাপকের উত্তর শুনিয়াই তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনি বোধ হয় ভুল করিতেছেন। মেক্সিকো ব্রেজিল-এর রাজধানী নয়, ব্রেজিলই হইল মেক্সিকোর রাজধানী।'

(যে কোনো সংবাদ-পত্র)

* * *

টিকেট সম্বলিত চিঠি ডাকবাক্সে ফেলার পর সকলেই এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হন যে, যথাসময়েই তাহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছিবে। কিন্তু না—ইদানীং অনেক সময়ই, এমন কি বেশীর ভাগ সময়ই তা' পৌঁছায় না। মধ্যপথেই অধিকাংশ চিঠির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের আমল হইতে এই বিপত্তির সূচনা—সম্প্রতি ইহা চরমে উঠিয়াছে। কি ভাবে এইসব চিঠি খোয়া যায়, তাহা লইয়া জনসাধারণের মনে দীর্ঘদিন হইতেই একটা প্রশ্ন উঁকি দিতেছিল। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, ডাকবাক্স হইতে চিঠি বাহির করিয়া তাহার টিকেটগুলি বেচিয়া দেওয়া একটা গোপন ব্যবসায় হিসাবে চলিতেছে এবং ডাক-কর্ম্মচারীরাই এই ব্যবসায় চালাইতেছে। আর তাহাদের কৃপাতেই অধিকাংশ চিঠির ডাক-পথে অপমৃত্যু ঘটিতেছে। গত শুক্রবার রাত্রে ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল গোয়েন্দা পুলিসের সহিত ছদ্মবেশে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক ডাক-কর্ম্মচারীর গৃহে হানা দিয়া পাঁচশত টিকেট সম্বলিত চিঠি উদ্ধার করিয়াছেন এবং ইহার ফলেই চিঠি খোয়া যাওয়ার মূল রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে যুগে টিন হইতে দুধ ও ফাইল হইতে ওষুধ বাহির করিয়া লইয়া বাজে জিনিষ দিয়া পয়সা উপার্জ্জন করা, শেয়ালকাটা বীজের রসকে তৈল এবং তেঁতুলের বীজের গুঁড়াকে আটা বলিয়া বিক্রয় করা সদাচাররূপে প্রচলিত, সে-যুগে ডাক-কর্ম্মচারীরা ডাকবাক্সে ফেলা চিঠি হইতে টিকেট উঠাইয়া বেচিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

(যুগান্তর, ২৫শে অগ্রহায়ণ)।

* * *

পাট-কেলেঙ্কারী সম্পর্কে কোন তদন্ত না বসুক, 'রাজধানীর চিঠি'র পাঠকেরা শুনিয়া খুসী হইবেন, তাহা লইয়া পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। পাটের কেলেঙ্কারীর ফলে ৩০ কোটি টাকা কাহার পকেটে গিয়াছে, জনৈক সদস্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বাণিজ্য-

সচিব জানান যে, টাকাটা যাহারা লেনদেন করিয়াছে তাহাদের পকেটেই গিয়াছে। (সত্যযুগ, ২২শে অগ্রহায়ণ)।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্মৃতি- বার্ষিকী

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা দেশবন্ধু গার্ল্‌স্ কলেজ ভবনে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কে, এন্, কাটজুর সভাপতিত্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযোগেশ চন্দ্র পালের কীর্ত্তন সঙ্গীত দ্বারা একটি ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত, শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী, ডাঃ সুশীলকুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের জীবন-আলেখ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। কলেজের সম্পাদক দেশব্রতী সাংবাদিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সুললিত হিন্দি ভাষায় ডাঃ কাটজুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া হিন্দিতেই মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অমর কীর্ত্তি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। অশ্বিনীকুমার সুদূর মফঃস্বলের লোক হইয়াও কিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম পুরোহিত হন, তৎসম্বন্ধে সভাপতি ডাঃ কাটজু মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। তিনি ডাঃ দাশগুপ্তের হিন্দিভাষণে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করেন এবং কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। অধ্যক্ষ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ কলেজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনা

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকগণ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ সম্প্রতি ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়কে তাঁহার ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

"ডাক্তার বসু কেবল একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাব্রতীই নহেন, তিনি একজন কর্ম্মবীর। তিনি পল্লী উন্নয়ন কল্পে ডাক্তার হইয়াও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য এবং সমাজ সেবায় বহু সাধনা করিয়াছেন। তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন এবং বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার অদম্য উৎসাহের ও কর্ম্মনিষ্ঠার বিরাম নাই। এইরূপ জনহিত-সাধনরত ব্যক্তিগণের দীর্ঘায়ু জাতি ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। আমরা তাঁহার শতাধিক বৎসর পরমায়ু এবং অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিয়া তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

লৌহেরও ক্ষয় আছে। ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে জড়দেহে কিছুই চিরন্তন স্থিতিশীল নয়। অবশেষে ভারতের লৌহ-মানব সর্দ্দারজীকেও নির্ম্মম মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হইয়া শুনিল— সর্দ্দারজী আর ইহ জগতে নাই। বিগত ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটের সময় বোম্বাই বিড়লা ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৭৫ বৎসর জীবনের গভীর সাধনা দ্বারা তিনি যে পরম সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারতের একজাতীয়তাসূত্রে কূটচক্রী বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য তিনি —আপন সাধনায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার লৌহসদৃশ মননশক্তির প্রভাবে দেশে এক নব চেতনার সূচনা হইয়াছিল; গান্ধীজী তাঁহাকে 'সর্দ্দার' আখ্যায় বিভূষিত করিলেন। গান্ধীবাদের অহিংস-আদর্শে নিজেকে সত্যাগ্রহীর মতো সমর্পণ করিয়াও অন্ধের মত শুধু নীতি গ্রহণ করিয়াই তিনি নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে অগ্রসর হন নাই, তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব ছিল হিমাচলের ন্যায়ই দৃঢ় ও উত্তুঙ্গ। পট্টভির ভাষায় Ballabhbhai possessed traits of character that were deceptive. His brevity was not courtness, nor was his silence sullenness...from the day that Vallabhbhai took to Gandhian cult, Gandhian ways of life and Gandhian ideals, he proved to be a devotee, who never questioned his decisions or doubted his advice. That did not mean that he did not have his judgment or view-point, nor did it

mean that he carried out Gandhiji's orders with a funerall face or a castoroil countenance.

কিন্তু এই লৌহসদৃশ কাঠিন্যের অন্তরালেও সুন্দর একটি কুসুমকোমল হৃদয় লুকাইয়া ছিল সর্দ্দারজীর। কখনও কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে অভিভূত হইতে দেখা যায় নাই। নির্ভীক সৈনিকের মতো নীরবে তিনি আজীবন আপন ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসে ও শাসন পরিচালনা বিভাগে পণ্ডিতজী হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও পণ্ডিতজীকে উর্দ্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া নিজে তিনি মহৎ সেবার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন; কর্ম্ম ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাঁহার জীবনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি। শিবাজী একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—'এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' শিবাজীর সেই স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিলেন সর্দ্দারজী। এ-দিক দিয়া তিনি ছিলেন শিবাজীর উত্তর-সাধক।

আজ ভারতের এই মহান নেতার আকস্মিক পরলোকগমনে সমগ্র দেশ বিষাদমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে পারে, এমন মানুষ আজ দুর্লভ। তাঁহার শক্তি, সাধনা ও ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরলোকগত পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করিয়া আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর হৃদয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

মা [শিল্পী—নিশানাথ মজুমদার

অষ্টাদশ বর্ষ — মাঘ—১৩৫৭ — ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলা সুকঠিন কার্য্য। তিনি ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন—আট বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করিয়া ১৪ বৎসর বিলাত বাসের পর ১৮৯৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ১৪, বৎসর কাল বিলাতে বাস করিলেও তিনি ফিরিয়া আসিয়াই বরোদা কলেজের পত্রিকায় 'ভারতীয় ভাবধারা' সম্বন্ধে ইংরাজি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহপাঠী কে, জি, দেশপাণ্ডে বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক ইংরাজি কাগজের সম্পাদক হন। শ্রীঅরবিন্দ 'ইন্দু প্রকাশে' 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'বন্দেমাতরম্‌' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন—

"যাহাই কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত বা রক্ষা হউক না কেন, বঙ্কিমের খ্যাতি কখনো বিনষ্ট হইতে পারে না। হে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণ, আপনাদের দৃষ্টি আজ শাসন-পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র আপনাদের নিকট একটি প্রকৃত দৃষ্টান্ত। বৃথা আত্ম-প্রশংসায় আমাদের স্ফীত হওয়া উচিত নহে। আদালতের উচ্চাসনে কিম্বা আইনজীবীর গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়া কেবলমাত্র আইনের জ্ঞানকেই সারবস্তু বলিয়া গণ্য করিলে চলিবে না। মহৎ চিন্তা, মহৎ কার্য্য ও অমর রচনা—ইহাই মনুষ্য জীবনের আদর্শ। বঙ্কিম মধুসূদন পৃথিবীকে এই তিনটি মহৎ জিনিষ দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষায় তাঁহারা ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা আজ মৃত হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে দিন বিচার করিবে, সে দিন তাঁহারা সংকীর্ণচেতা কোন সমাজ সংস্কারক কিম্বা

ভাগ্যান্বেষী কোন রাজনীতিককে ভারতের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিবে না—স্বীকার করিবে সেই মহান চেতা বাঙ্গালীকে—যিনি নিভৃতে নিঃশব্দে প্রকৃতির মত নিঃস্বার্থ হৃদয়ে পরম সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। যিনি একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতি গড়িয়া গিয়াছেন—সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে।"

সেই সময়ে 'ইন্দুপ্রকাশে' একটি রাজনীতিক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—

"যে দেশের শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সম্মতি লইয়া রচিত হয় নাই, সেই শাসনতন্ত্রের কাছে আবেদন প্রার্থনা অথবা নিয়মানুগ আন্দোলন নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।"

ইংরাজ সরকারের কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবার ভয়ে ঐ কাগজের কর্তৃপক্ষ শ্রীঅরবিন্দের রচনা প্রকাশ বন্ধ করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন ও বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করেন। দেবী ভবানীর স্তব ও পূজা পদ্ধতি সম্বলিত 'ভবানী মন্দির' নামক পুস্তকের মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনীতিক জীবনের কার্য্যপদ্ধতির প্রাথমিক আভাষ পাওয়া যায়।

১৯০২ সালে স্বর্গত ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৬ সালে মৃণালিনীকে লিখিত একখানি পত্রে শ্রীঅরবিন্দের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। আমি যদি নিজের জন্য, বিলাসের জন্য সব খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। এত দিন আমি পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। আর নয়, জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক, সে পথে যাইবার জন্য আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে। শারীরিক বল নয়, বন্দুক বা তরবারি লইয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে। ঐ ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। সমস্ত দেশ আজ আমার দ্বারে আশ্রিত। তোমার ভাল মানুষ স্বামী সেই লোককে আরও অনেককে সেই পথে প্রবেশ করাইয়াছিল। আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে বলিতেছি না, কিন্তু একদিন হইবে নিশ্চিতই।"

১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট 'বন্দেমাতরম' ইংরাজি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইল—অল্পদিন পরেই তাহা দৈনিকে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাহাতে লিখিলেন—

"প্রেম জীবন্ত হয়ে উঠে যখন, তখন ভাগবত মহিমা দেশরূপা মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা, নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা, আরাধনা এবং সেবার মধ্য দিয়েই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।"

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে সে সময়ে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন, আজও তাহা চিন্তার খোরাক জোগায়—তিনি লিখিলেন,—

"আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের দাবী এই যে, জাতি হিসাবে আমাদের ধ্বংস অবাস্তব, আমরা বেঁচে থাকবোই, কোন শক্তি আমাদের বাধা দিলে, তাকে ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রকৃতির নিয়ম আর ভাগবত নিয়ম অভিন্ন, এবং এইরূপে সেই শক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হবেই।"

১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হন ও বিচারে তাহার মুক্তির আদেশ হয়। ঐ সময়েই কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ১৭ই ভাদ্র ১৩১৪ সালে "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতাটি রচনা করেন।

বিপ্লববাদীদের সমর্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরমে লিখিয়াছিলেন—

শ্রীঅরবিন্দ

"রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের নীতিবোধই আমাদিগকে রাজনীতিক কার্য্যে পরিচালিত করিবে। ন্যায় ও বৈধতা রাজনীতিক ধর্ম্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ও বৈধতা। আক্রমণ অন্যায় হয় তখনই, যখন তাহার কোন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকে না। বল-প্রয়োগ অবৈধ হয় তখনই, যখন তাহা হয় স্বেচ্ছাচারী বা অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সে দার্শনিকতা বন্ধ্যা, যাহা সকল কর্ম্মকেই এক যন্ত্রবৎ নিয়মের অধীন করিতে চায় অথবা একটি বুলি অবলম্বন করিয়া সমগ্র মানব জীবনকে তাহার অনুগত করিতে চেষ্টা করে।"

১৯০৮ সালের ১লা মে হইতে ৪৭ জন ধৃত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের একজন। বিচারকালে শ্রীঅরবিন্দ জবানবন্দীতে বলিলেন—

"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—এ কথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহারই জন্য আমি জীবন ধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। ইহাই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তাহা হইলে আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে উপস্থিত এবং অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। পাশ্চাত্যের তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদের সহিত বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করিয়াছি। এই আদর্শই আমি আমার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমাদের কাজ হইতেছে, দেশবাসীকে বলা, তাহাদিগকে উপলব্ধি করানো যে, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের বৈশিষ্ট্য দান আছে, ভারতের একটি মিশন আছে, সমগ্র মানব জাতির জন্য তাহা করিতে হইবে। ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে তাহ আমাকে প্রদান করুন। আপনারা আমায় কারারুদ্ধ করিতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার অপরাধ কিছুতেই আমি অস্বীকার করিব না। আমি অকুণ্ঠভাবেই বলিতে চাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।"

১৯০৯ সালের ৬ই মে মামলার রায় প্রকাশিত হইল। বিচারক রায় দিলেন—

"অরবিন্দ ঘোষ, দেবব্রত বসু, দীনদয়াল বসু, নলিনী গুহ, শচীন সেন প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে অভিযুক্ত করিবার মত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও প্রমাণ না থাকায় উঁহাদের আমি বেকসুর খালাস দিলাম।"

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের আর একটা দিক ক্রমে জনগণের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কারামুক্তির পর উত্তরপাড়া ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন—

"দ্বাদশ মাস যে আমি জেলের মধ্যে ছিলাম, সেই সময় দিনের পর দিন শ্রীভগবান আমাকে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন, আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি, এখন সেই জ্ঞানই আমি আপনাদের নিকট প্রকাশ করবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। নির্জ্জন সেলের মধ্যে আমি দিবারাত্র অপেক্ষা করতে লাগলাম, আমার ভিতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্যে, তিনি আমাকে কি বলতে চান তা জানবার জন্যে, আমাকে কি করতে হবে, তা বোঝবার জন্যে। এই নির্জ্জন সেলেই এল আমার সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তিনি আমাকে বললেন যে, বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রেত ছিল না যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি, এবং তার জন্য তোমাকে

এখানে এনেছি। তুমি নিজে যা শিখতে পার নি, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্ত তৈরী করে তুলতে। তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয় নি, পরন্তু অনুভূতি, উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন—যাঁরা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্তে কর্ম্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্ব্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ নীচ, শত্রু মিত্র, জয় পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করলে চলবে না। আমি অনুভব করলাম, হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি? আমরা অনেক সময়েই হিন্দু ধর্ম্মের কথা, সনাতন ধর্ম্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে? অন্যান্ত ধর্ম্মের কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম হচ্ছে জীবন। এটি এমন জিনিষ, যা শুধু বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্ত এই ধর্ম্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত সে নিজের জন্ত উঠছে না, অথবা যখন সে শক্তিমান হবে, তখন দুর্ব্বলকে পদদলিত করবার জন্তও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকীরণ করবার জন্ত সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানব জাতির জন্ত জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্ত নয়। আর তাকে যে বড় হতে হবে, তাও তার নিজের জন্ত নয়, মানব জাতির জন্ত।"

সেদিন শ্রীঅরবিন্দ সর্ব্বশেষে যাহা বলেন, তাহা বিশ্বাসের বস্তুতর্কের জিনিষ নহে। তিনি বলিলেন—

"কেন আমাকে যে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ নই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়াতলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়; জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার বিছানা স্বরূপ যে একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল, তার উপরে শুয়ে উপলব্ধি করলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহুদ্বয় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন, সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।"

১৯০৯ সালের ২৬শে জুন 'কর্ম্মযোগিন' পত্র প্রকাশিত হইল—সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে কুরুক্ষেত্রের রথী ও সারথির চিত্র—তাহার নীচে গীতার সেই অমরবাণী উদ্ধৃত—তস্মাৎ যোগায় যুদ্ধ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ঐ সময়ে 'ধর্ম্ম' নামক একখানি বাংলা পত্রও তিনি প্রকাশ করিতেন। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী বন্ধু শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজি 'কর্ম্মযোগিন' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। সে সময়ে পুলিশের অত্যাচার ও কড়া নজর শ্রীঅরবিন্দকে বিব্রত করিতে লাগিল।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে চন্দননগর গমন করেন ও সেখানে ২ মাস থাকিয়া ৪ঠা এপ্রিল ছদ্মনাম ধারণ করিয়া পণ্ডিচেরীতে যাইয়া উপস্থিত হন। তাহার পর ৪ বৎসর কেহ তাঁহার কোন খবর জানিতেন না।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতার শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে 'আর্য্য' নামক একখানি ইংরাজি পাক্ষিক পত্রিকা আসিল—তাহার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ।

কর্ম্মযোগিনে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে গঠিত করিলে আমাদের সমাজের ভেদ দূর হইবে না। সমাজহিতৈষীদের এই অনুকরণস্পৃহা, যন্ত্রচালিতের ন্তায় এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা এবং দোষগুণ যাই থাকুক না কেন, এতে জাতির আত্মচেতনা মুক্তি পায় না, তার অধঃপতনও

রোধ করতে পারে না। এ হলো সেই আত্মিক শক্তি, কারণ এই শক্তি দ্বারাই আমরা অন্তরে মুক্ত উদার হয়ে রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব লাভ করতে পারি।"

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"রামায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে, কাব্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে ভারতকে আমরা পাই, ভারতের যে বিরাট আত্মিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই—তাহার রহস্য কি? জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়সী ভারত তার সমাজজীবনের যে অপূর্ব্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল, তার ভিত্তিই বা কি? ক্ষত্রিয়, শিখ এবং রাজপুতের অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারতের যে অপরাজেয় জীবনীশক্তি অভিব্যক্ত হয়েছিল, তার পিছনে কি ছিল? এই যে সর্ব্বাঙ্গীন নিখুঁত বিরাট সভ্যতা এর পিছনেই বা কি ছিল! এ সব কিছুই সম্ভব হত না, যদি না আত্মার ও মনের শিক্ষায় ভারত সম্পূর্ণতা লাভ ক'রে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পথে চলতো।"

১৯১৪ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ আর্য্য পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন— তন্মধ্যে "গীতার আলোচনা," "ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা" 'ঈশোপনিষদ', 'যুদ্ধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রভৃতির সহিত বহু লোক পরিচিত। ভারতের দর্শন আলোচনায় তিনি নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন—তাহার পথ অনুসরণ করিবার জন্য একদল চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

প্রায় ৪০ বৎসর কাল তিনি নিভৃতে যোগসাধনা করিয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বৎসরে ৩ দিন করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণকে সাক্ষাৎ দান করিতেন—যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। অথচ কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার সে রূপ ছিল না।

তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'সাবিত্রী' মহাকাব্য। তিনি আমাদের জন্য কি দিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে জড়বাদ জর্জ্জরিত ইহকাল সর্ব্বস্ব-জগতে তিনি অধ্যাত্মবাদ গ্রহণ করিয়া যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া একদিন পৃথিবী গ্রহণ করিবে—প্রত্যেক ভারতবাসী ইহাই বিশ্বাস করে।

★

দীর্ঘকাল সংগ্রামের ভিতর দিয়া কোনো জাতি বৈদেশিক শাসনমুক্ত হইলে পর বৈদেশিক শত্রুর হাতে তাহার স্বাধীনতা বিপন্ন হয় না, জাতির আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতাই তখন তাহার স্বাধীনতার শত্রু হয়। এই হেতু এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

—সর্দ্দার প্যাটেল

অপয়া

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তাহার গায়ের রং কিরূপ, মাথার কেশ ঘন কি পাতলা, মাথায় টাক আছে কিনা, হাত-পায়ের গড়ন কেমন, তিনি কৃশ কি স্থূল, এ সব বর্ণনার কোন আবশ্যক নাই। তবে—নাম তাঁহার শক্তিনাথ। কিন্তু সাংসারিক জীবনে শক্তিনাথ একেবারেই ছিল শক্তিহীন। একটি পয়সাও বাহির হইতে উপার্জ্জন করিবার যেমন তাঁহার শক্তি ছিল না, তেমনি নেশা, জুয়া খেলা ও বিলাসিতা তাঁহার ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু বিধাতা পুরুষ ঠিক হিসাব করিয়া তাঁহার পরমায়ু দিয়াছিলেন। বাপ-পিতামহের অর্জ্জিত এবং সঞ্চিত অর্থ-সম্পত্তি যখন শক্তিনাথ নিঃশেষে শেষ করিয়া দিলেন, তখনি একমাত্র শেষ সম্বল, জীর্ণ ভগ্ন গৃহ-প্রাঙ্গণের বায়ুর সহিত তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস মিশাইয়া দিয়া চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; রাখিয়া গেলেন পুত্র ভক্তিনাথকে পুত্র বধূ মায়াকে এবং ষোড়শী পৌত্রী—কমলাকে।

ভক্তিনাথ ছিল অসাধারণ সুপুরুষ। শক্তিনাথ অনেক খুঁজিয়া পুত্রের উপযুক্ত বধূই ঘরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু রূপে কমলা বাপ-মাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

শক্তিনাথের মৃত্যুর পর, সংসারে দারিদ্র্য বেশ ভাল করিয়াই দেখা দিল। অভাব-অনটনের ঘোর অন্ধকার নির্ম্মমভাবে সংসারটিকে ছাইয়া ফেলিল। পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির কোথাও একচুল শক্তিনাথ রাখিয়া যান নাই। শুধু বিঘা আট-দশ দেবোত্তর জমি—যাহা বিক্রয় করিবার অধিকার শক্তিনাথের ছিল না, তাহাই মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহাতে সংসার চলে না; কোন রকমে গৃহদেবতা 'শ্রীধরে'র সেবাটা চলে।

এ দিকে কমলা ষোল ছাড়াইয়া সতেরোতে পড়িল। তাহার বিবাহ দিতে হইবে। বাড়ী ঘরের অবস্থাও খারাপ। একখানা শয়ন ঘর মোটামুটি ভাবে মেরামত না করিলে, আসচে বর্ষায় জল পড়িবে। ভক্তিনাথ স্ত্রীকে কহিল—"এ রকম ভাবে শূন্য ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকলে কি কোরে চলবে? চল, কোলকাতায় চলে যাই; গিয়ে—যে-কোন-একটা কাজকর্ম্মে লেগে যাই।"

মায়া কহিল—"কমলার বিয়ে না দিয়ে আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। তুমি এর মধ্যে একদিন গোপালপুরে যাও। কই, তাঁরাও আর কোন খবর দিলে না। মেয়ে দেখে তাঁদের অত পছন্দ হোল, বলে গেলেন, দু'চার দিনের মধ্যেই পাকা দেখার দিন ঠিক কোরে খবর পাঠাব, কিন্তু একেবারেই যে চুপ চাপ। কিছু বুঝতে পারচি না।"

ভক্তিনাথ কোন কথা না বলিয়া ভাবিতে লাগিল এবং ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

পরের দিনই ভক্তিনাথ সকাল-সকাল স্নানাহার সারিয়া, একটু বিশ্রামান্তে গোপালপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ক্রোশ আড়াই-তিন পথ; মেঠো পথ। ভাদ্রের কড়া রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় ভক্তিনাথ গোপালপুর পৌঁছাইল।

বড় লোকের বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তা যদুনাথ বাবু তাঁহার নিয়মিত দৈনন্দিন দিবানিদ্রা হইতে সেইমাত্র উঠিয়াছেন; কিন্তু বিছানা হইতে উঠেন নাই। উন্মীলিত চোখে চিৎ হইয়া শুইয়া দুই-একটা হাই তুলিতেছিলেন। শম্ভু চাকর আসিয়া তাঁহাকে কহিল—"রূপগঞ্জের সেই বাবুটি এসেচেন।"

একটা অসভ্য মাছি তাঁহার ভুঁড়ির উপর ক্রমাগত বসিয়া বড়ই বিরক্ত করিতেছে, তাহাকে তাড়াইতে তাড়াইতে যদুবাবু কহিলেন—"বলগে যা; বাবুর শরীর খারাপ, পায়ে ব্যথা, চলতে-ফিরতে পারেন না।" তারপর নিজেনিজেই বলিতে লাগিলেন—"মেয়েটির রূপ আছে বটে, কিন্তু দরিদ্র ঘরের মেয়েকে কি কোরে আনি?"

শম্ভু চাকর চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ফিরাইয়া কহিলেন—"বলবি যে, বাবুর অসুখ সারলে পর তিনি চিঠি দেবেন,...বুঝলি?"

"আইজ্ঞে" বলিয়া, শশী পিছু ফিরিলে, বছবাবু কহিলেন—"দাঁড়া। ফ্যাসাদ একেবারে চুকিয়ে দেয়াই ভাল। বলগে যা; যে…যে…যে…থাক্, ঐ কথাই বলগে যা যে, বাবুর অসুখ সারলে তিনি চিঠি দেবেন। বলবি, এখন তিনি উঠে বসতে পারেন না, এই রকম অবস্থা… বুঝলি?"

"আইজ্ঞে…বুঝেছি" বলিয়া শশী চলিয়া গেল এবং নীচে আসিয়া ভক্তিনাথকে ঐরূপ সংবাদ দিল। ভক্তিনাথ বিবর্ণ চিত্তে উঠিয়া ধীরে ধীরে দেউড়ীর বাহিরে আসিল এবং কাছারী-ঘরের সুবৃহৎ থামের আড়ালে যে ছায়াটুকু পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া বসিল। কড়া রোদে এতটা পথ হাঁটার ফলে ভক্তিনাথ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা থামে হেলান দিয়া বসাতে মিনিট দশেক পরে তাহার তন্দ্রা আসিল। খানিক পরেই পিছনের কাছারী ঘরের মধ্যে খড়মের খট্ খট্ শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বছবাবুর কণ্ঠ তাহার কানে আসিল—"রূপগঞ্জের লোকটি চলে গেছে ত?"

কে একজন জবাব দিল—"তিনি অনেকক্ষণ চলে গেছেন।"

"বাঁচা গেল।" বলিয়া তিনি চাকরকে তামাক দিতে বলিলেন। কথাগুলি বাহিরে বসিয়া ভক্তিনাথ সবই শুনিতে পাইল এবং বাবুর অসুখের ব্যাপারটা এখন তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। এক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটার জন্ত সে যেন নিজেই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং বাবুর এই মিথ্যা কথার জন্ত সে নিজেকেই অপরাধী জানে, ত্বরিৎ এবং সতর্ক পদবিক্ষেপে বহির্বাটির চত্বর হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল।

ক্ষোভ, হতাশা এবং লজ্জার কাছে তাহার ক্লান্তি এবং পথশ্রান্তি যেন পথ হারাইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল। এলোমেলো খাপছাড়া ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সে রূপগঞ্জের মেঠোপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মায়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, উৎসুক প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হোল গা?"

"ওখানে হ'বার কোন আশা নেই"—বলিয়া ভক্তিনাথ শয়ন ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কমলা মোটা কাঁথা খানা গায়ে জড়াইয়া শুইয়া রহিয়াছে। মায়া কহিল, "তুমি বেরিয়ে যাবার পরই, ওর খুব তেড়ে জ্বর। এখন বোধ হয় জ্বরটা কমচে। অনবরত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বাছা আমার পাত্‌ হোয়ে গেল! ওর একটা-ব্যবস্থা কর, নইলে এই রকম ভুগে-ভুগে ও যে মরে যাবে!"

এ সমস্ত কথা ভক্তিনাথের কাছে নূতন নহে। এই সব কথা ও ব্যথার সহিত তাহার পরিচয় নিত্যক্ষণের এবং সর্বক্ষণের। সুতরাং কোন কথা না বলিয়া, সে মুখহাত ধুইবার জন্ত বাহিরে চলিয়া আসিল।

এ বছর কমলার সঙ্গে রূপগঞ্জের ম্যালেরিয়া যেন একটু ভালরূপ ভাব-ভালবাসা দেখাইতেছিল। ডাক্তার থেকে সুরু করিয়া পাড়ার সকলেই বলিতে লাগিল—"ওকে একটু ঠাঁই-নাড়া করা দরকার। এই সময়টাতে ওকে যেখানে হোক এক জায়গায় সরিয়ে রাখতে পারলেই ওর ম্যালেরিয়াটা সেরে যায়?" মায়া ও ভক্তি শেষ পর্য্যন্ত তাহাই স্থির করিল। কিন্তু কোথায় রাখা যায়? ভক্তিনাথ চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে কমলাও দিন-দিন রক্তহীন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে একদিন খুব আশা ও মনোযোগের সঙ্গে সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল।

ভক্তির এক বাল্যবন্ধু খুব উন্নতি করিয়াছে তিনি কলিকাতায় কোন সরকারী আফিসে বড় চাকুরী করিতেন। মোটা মাহিনা। শ্যামবাজারের ঐদিকে তাঁর বাসা। রূপগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রামে তাহার বাড়ী। বাল্যকালে একই স্কুলের একই শ্রেণীতে দুইজনে পড়িত এবং উভয়ের মধ্যে এত গাঢ় প্রণয় প্রীতি ছিল, যাহা সচারাচর দেখা যায় না। ভক্তিনাথ খুব ভাল করিয়া কমলার বিষয়ে তাহার এই অন্তরঙ্গ সুহৃদ তাপসকুমারকে জানাইল ও উত্তরের জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

দিন ছয়-সাত পরে তাপসের চিঠি আসিল। তাপস লিখিয়াছে—"কমলা আমার কন্তাতুল্য; ইচ্ছা করে তাকে এভাবে ম্যালেরিয়ায় ভোগা'য়ো না। যত শীঘ্র পার, তাকে আমার কাছে দিয়ে যাবে। ওর জন্ত

আমি খুব চিন্তিত থাকলাম। শুদ্ধ সুন্দর কমল—আমার কমলা মাকে ব্যাধি-কীট-দষ্ট করে এখন এরূপ ভাবে শুকিয়ে যাবার অবকাশ দিয়ো না। আমি ত এখনো মরি নি, বেঁচে আছি। তুমি পত্রপাঠ তাকে আমার কাছে রেখে যাবে।"

পাঁজিতে পরের সপ্তাহেই খুব ভাল দিন পাওয়া গেল। সেই দিনই ভক্তিনাথ কমলাকে শ্যামবাজারের তাপসের ওখানে রাখিয়া আসিল।

দুই

তাপসের স্ত্রী উষা, কমলাকে আগে কখনো দেখে নাই। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কমলার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তবু তাই দেখিয়া উষা চমকিত হইল। কমলাকে তাহাদের সংসারে আনিয়া রাখিবার ব্যাপারে, বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও, মনে-মনে তাহার অনিচ্ছা ও অসন্তোষ জমা হইয়াই ছিল, কিন্তু এখন তাহাকে দেখিয়া ও তাহার নম্র-মধুর স্বভাবের পরিচয় পাইয়া উষা মুগ্ধ হইয়া গেল। নিজ কন্যার মতই প্রীতি ও স্নেহের বেষ্টনে উষা তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল।

কমলা এ বাড়ীতে আসার পর তিন মাস গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম-প্রথম তাহার দুই একবার জ্বর হইয়াছিল, তারপর আর হয় নাই। তাহার চেহারা প্রায় আগেকার মতই সারিয়া উঠিতেছিল। পাড়ার ঝি-বউ গিন্নীরা সকলেই কমলাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কমলাকে বধূরূপে পাইবার জন্ত আগ্রহান্বিত। উষা সকলকে বলিত—"কোথায় কা'র হাঁড়ীতে ও চাল দিয়েছে, তা বিধাতা পুরুষই জানেন। কবে যে কার বিয়ের ফুল ফুটবে, কে জানে।"

মাঝে মাঝে রূপগঞ্জ থেকে কমলা বাপ-মায়ের চিঠি পায়; কমলা সে চিঠির জবাব দেয়। মায়ার কমলা-মুখী চঞ্চল বুকখানা সে চিঠি পাইয়া ও পাঠ করিয়া অনেকটা শান্ত হয়।

ক্রমে-ক্রমে কমলার সঙ্গে এ-বাড়ীর সম্বন্ধ এতই প্রীতিপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল যে, সাংসারিক সকল কাজেই কমলা না হইলে চলে না। তাপসের বই-খাতা আবশ্যক কাগজ-পত্র, তাহার আফিসের জামা-কাপড়, তাহার চা-জলখাবার, স্নানের তৈল-সাবান-তোয়ালে, আয়না-চিরুণী প্রভৃতি সবই কমলার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সংসারের খরচ-পত্রের হিসাব, দুধের ও ধোপার হিসাব—কমলাকেই রাখিতে হয়। উষার বাক্স ও দেরাজ প্রভৃতির চাবি, তাহাও কমলার হাতে। সে এ-বাড়ীতে আসার পর হইতে সংসারের সবদিকেই যেন একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কমলা সকলকেই ভালবাসে, সকলেই কমলাকে চায়।

কিছুদিন হইতে তাপস কমলাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করিবার জন্ত মনে মনে চিন্তা করিতেছিল। দুই একটি পাত্র এখানে-ওখানে দেখাও হইয়াছে, কিন্তু উষা-তাপসের পছন্দ হয় নাই। ভক্তিনাথকে তাপস এক পত্রে লিখিল, —"কমলাকে আর বেশী বড় করিয়া বিবাহ দিব না। পাত্রের সন্ধান করিতেছি। ভাল ঘর-বর না হইলে বিবাহ দিব না; এবং সে জন্ত যদি আমাকে দু'চার হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহাও করিব।"

সুতরাং একটি সুপাত্রের জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া খোঁজ করা হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেরই পছন্দ হয়, কিন্তু হা না—এ-পক্ষের। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া এইরূপ খোঁজা-খুঁজির পর, অবশেষে কমলার বিয়ের ফুল ফুটিয়া উঠিল। বরানগর চৌধুরীপাড়ার সুকুমার রায়ের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত কমলার বিবাহের পাকা-পাকি কথা স্থির হইয়া গেল। রায় মহাশয় ওখানকার একজন নাম-করা লোক। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা জমিদার। ছেলেটির স্কুল-কলেজের লেখাপড়া তেমন না হইলেও, জমিদারী কাজে নরেশচন্দ্র রীতিমত লায়েক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া, মাতৃ-ভক্ত বলিয়া পাড়ায় তাহার একটা নাম আছে।

ভাল দিন দেখাইয়া, উভয় পক্ষই সেই দিনে 'পাকা-দেখা' দেখিলেন। 'পাকা-দেখা' উপলক্ষ্যে, তাপস চিঠি লিখিয়া স-স্ত্রীক ভক্তিনাথকে তাহার বাড়ী আনাইয়া-ছিল। উভয় পক্ষের পরামর্শমত, পরের মাসের ১২ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইল।

ভক্তিনাথ ইতিমধ্যে একবার রূপগঞ্জে ঘুরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাপস তাহাদের ছাড়িল না; কহিল—"মধ্যে আর দিন-পনের-ষোল বাকী, এ ক'টা দিন আর গিয়ে কাজ নেই। কমলার বিয়েটা দিয়ে তারপর চলে যেয়ো।"

তাহাই হইল।

তিন

শুভদিনে শুভ লগ্নে কমলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কমলাকে বধূরূপে পাইয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী ও গৃহের অন্যান্য পরিজনবর্গ এমন কি দাস-দাসীর পর্য্যন্ত মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সকলেই তাহাকে এত বেশী আদর-যত্ন করিতে লাগিল যে, আজন্ম দারিদ্র্য-দুঃখ-পীড়িত কমলাকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইল। তবে, সে অস্থিরতার মধ্যে তৃপ্তি আছে, সে চঞ্চলতার ভিতর সুখের মধুময় উল্লাস আছে। বছর-দেড়েক আগে, সুকুমার বাবুর বড় ছেলেটি অকালে মারা যায়; সেই শোকাঘাতের ফলে রায় গৃহিণীর অন্তরের ক্ষতমুখ হইতে নিত্যই যে দুঃখের শোণিতস্রাব বহিতেছিল, কমলাকে লাভ করিয়া স্বর্ণ যেন তাহা হইতেও অনেকটা আরোগ্য লাভ করিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে, সুকুমার বাবুর হাত হইতে তাঁহার বীরভূমের জমিদারীর একটা বড় অংশ দৈববিপাকে হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এত বড় ক্ষতি, তাহার মনের উপর তীক্ষ্ণমুখ সূচের ন্যায় অহরহ বিদ্ধ করিতেছিল; কমলাকে ঘরে আনিয়া সুকুমার বাবু সেই ক্ষত ও ক্ষতির জ্বালা ভুলিতে লাগিলেন।

স্বর্ণ সকলের কাছেই বলিতে লাগিল—"কমলা আমার সাক্ষাৎ কমলা; আমার এই বাড়ী এবার বৈকুণ্ঠ হোয়ে যাবে।" বছর ১৫।১৬ আগে সুকুমার রাবু খুব সখ করিয়া একটি মূল্যবান হীরার আংটী কিনিয়াছিলেন। অনেকবার, টাকার খুব আবশ্যক ও অভাব ঘটিলেও, তিনি সেই আংটীটি বিক্রয় করেন নাই বা বন্ধক দেন নাই। এক্ষণে কমলার আঙুলে সেইটি পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "এতদিন পরে, এখন বুঝতে পারছি যে, সাত হাজার টাকা দিয়ে আংটীটা তোমার জন্যেই তখন কিনেছিলুম।"

এইভাবেই সুখে, আনন্দে ও উৎসাহে কমলার দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। মা-অম্বিকার আগমন—আভাসে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আশা-আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল; বাঙ্গলার শান্তদায়া আকাশে উল্লাসের রূপালী রং ফুটিয়া উঠিল, তাহার বাতাসে-বাতাসে আশা-উৎসাহের সঞ্জীবনী স্পর্শ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুকুমার বাবু কমলার জন্য এক ছড়া জড়োয়া নেকলেশের অর্ডার দিলেন। স্বর্ণ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি রকম শাড়ী চাই, বল বউমা?" কমলা কহিল, "শাড়ী ত অনেকই পেয়েছি মা, দেরাজে আর ধরে না। একখানা কম দামের সাধারণ শাড়ী কিনে দিলেই হবে।" স্বর্ণ মুখ-ভঙ্গীর এমন একটা ভাব দেখাইল, ভাষায় যাহার মানে হয়—'তাই তোমাকে দিচ্ছি আর কি!' কয়েকদিন পরে স্বর্ণ নিজে দোকানে গিয়া এবং পছন্দ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের এবং ডিজাইনের ছয়খানা দামী শাড়ী কমলার জন্য কিনিয়া আনিল।

পূজার দিন-পনের আগে সুকুমার বাবু রূপগঞ্জ হইতে চিঠি পাইলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ভক্তিনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছেন—"যদি বেয়ান ঠাকুরাণীর মত হয় এবং তাঁর কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে পূজার কয়টা দিন কমলাকে এখানে আনিয়া রাখি। আপনার বেয়ান কমলাকে দেখিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছেন।"

চিঠি পাইয়া সুকুমার বাবু স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করা যায় বল?"

স্বর্ণর মনের উপর একটা অসন্তোষের ছায়া আসিয়া পড়িল। সুকুমার বাবু কহিলেন—"প্রথমবারটা কি না! এবারে-না হয় দিন পাঁচ-সাতের জন্যে…কি বল?"

স্বর্ণর মনের ছায়াটা গাঢ়তর হইয়া উঠিল। সুকুমার বাবু কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি ইচ্ছে, মা? যাবে? না, এইখানেই পূজো দেখবে? কোলকাতার পূজো কখনো ত দেখনি; এখানে খুব ধুম-ধাম কোরে চারদিকে পূজো হয়। বল মা, এখানে থেকে তাই দেখবে, না—রূপগঞ্জে যাবে?"

কমলা কোন কথা না বলিয়া, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বল মা, তোমার মনের ইচ্ছেটা কি ?"

কমলা সেইরূপ মুখ নীচু করিয়াই কহিল—"আপনার আর মার যা ইচ্ছে, তাই হবে বাবা।"—কথার ভাব লক্ষ্য করিয়া মন বুঝিবার শক্তি যদি সুকুমার বাবুর থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, কমলার ঐ কয়টি মুখের কথার অন্তরালে কত বড় একটা আশা নিরাশার দোলা তাহার অন্তরকে দোলাইতেছিল, আর তাহার পিতামাতাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা কত প্রবল ভাবে তাহার মনের উপর চাপিয়া রহিয়াছে।

কমলার বিয়ের পর, তাপস মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বরানগরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইত। কমলাকে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী যাহাতে পূজার কয়টাদিন রূপগঞ্জে পাঠাইয়া দেন, সে জন্য ভক্তিনাথ তাহাকেও পত্র দিয়াছিল। পরদিন তাপস সন্ধ্যার পর বরানগরে আসিয়া সুকুমার বাবুর সহিত দেখা করিল। সুকুমার বাবু কহিলেন—"বউমাকে পাঠানো সম্বন্ধে আমাদের কোন অমতই নেই। বেয়াই মহাশয়কে আজ আমি চিঠি দিয়েছি, যেদিন তাঁর ইচ্ছা তিনি এসে বউমাকে নিয়ে যাবেন।"

ইহারই পাঁচ-সাতদিন পরে, একদিন ভক্তিনাথ এ বাড়ীতে আসিল ও পরদিন কমলাকে লইয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময়, কমলা যখন স্বর্ণকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল, তখন স্বর্ণ তাহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইতে খাইতে কহিল—"শীগ্‌গির এসো মা। বেশীদিন তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তা ছাড়া ম্যালেরিয়ার ভয়টাও আমার বড্ড করে।"

কমলা ছল ছল চোখে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চার

চিত্রকর যেমন আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করে, তেমনি এই বিশ্বরাজ্যের যিনি চিত্রকর, তিনি আলোছায়ার দ্বারাই আমাদের প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক সংসারের ছবি আঁকিয়া থাকেন। আমাদের সাংসারিক জীবন তাই কখনো সুখময়, আনন্দ-আলোকোদ্ভাসিত, মধুর সূর্য্যকরোজ্জ্বল, আবার কখনো বা শোক-দুঃখ পীড়িত, ঘন মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকারময়। সুতরাং সংসারে, সমাজে, জীবনে আলোরও যেমন আবশ্যক, অন্ধকারেরও তেমনি আবশ্যক। দুই-ই সত্যকার জিনিস। তাই, যাহাদের লইয়া এই কাহিনী, তাহাদের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া, সেই মহাচিত্রকর, তাঁহার পূর্ব্বকার তুলি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তুলি হাতে লইলেন। এতদিন যে ধারায় তাহাদের প্রত্যেকের জীবন চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে সে রংয়ের, সে ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিল।

কমলার বিবাহের পর একটি একটি করিয়া কিঞ্চিদধিক তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসর কাটিবার পর, বিগত দুই বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যতই অপ্রিয় এবং অবাঞ্ছিত হউক, জীবনের কাহিনী হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া যায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলির উল্লেখ করিতে হইবে।

বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এবং কোন মতে আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া, অবশেষে মায়া, সবার মায়া কাটাইয়া মহা আরোগ্যের পথে চলিয়া গিয়াছে। এযাবৎ ভক্তিনাথ দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাইলেও, সে ঠিক লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই ; কিন্তু মায়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার পর হইতেই সে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে। সে আর পাড়ায় কোন জায়গায় বাহির হয় না, কাহারো কাছে গিয়া বসে না, নিজের হাতে দুটি ডাল-ভাত রাঁধিয়া, তাই তিন বেলা ধরিয়া আহার করে। অধিকাংশ দিনই মুড়ী খাইয়া কাটাইয়া দেয় ; কোন কোন দিন একেবারে অনাহারেই কাটাইয়া দেয়। আগে কমলাকে, তাপসকে, সুকুমার বাবুকে প্রায়ই চিঠি লিখিত, এখন আর কাহাকেও চিঠি লেখে না। হয়ত, ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে তাহার মন পাষাণ হইয়া গিয়াছে ; কিংবা তাহার মনই হয় ত নাই ; হয় ত তাহার মনই সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন যেন তাহার দেহ আছে, সাড় নাই ; জীবন আছে, চেতনা নাই ; প্রাণ আছে, প্রাণের স্পন্দন নাই।

আজ দেড়বৎসর হইল তাপস কলিকাতা ছাড়া। গভর্ণমেণ্ট তাহাকে স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বদলী করিয়াছে। তাপস এখন সপরিবারে দিল্লীতে।

সুকুমার বাবুর সাংসারিক অবস্থা যদিও কমলার বিবাহের কয়েক বৎসর আগে হইতেই খারাপের দিকে যাইতেছিল, কিন্তু এই দুই বৎসরে তাঁহার সংসারে ক্রমাগত বিপদের পর বিপদ আসিয়া ভীষণভাবে ধাক্কা দিতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলার বিয়ের বছর দেড়েক আগেই মারা গিয়াছিল; সগু বিধবার কোলে তখন একটি বছরখানেকের খোকা। তাহাকেই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে কোনমতে তাহার অভিসপ্ত জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের নিষ্করুণ কষাঘাতে, কিছুদিন হইল খোকাটি তাহার কোল খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার অনেকখানি বুক জুড়িয়া সে ছিল, তাহাকে হারাইয়া সুকুমার বাবুর ও স্বর্ণের বুক একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। তাহার উপর, এই দুই বৎসরে, অর্থের দিক দিয়া, এ সংসারে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে, ইহার আগে কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। জমিদারীতে প্রজারা বিদ্রোহী, খাজানা আদায় হয় না; বৎসামান্ত যাহা হয় তাহা নায়েব-গোমস্তার চোরা-পেটেই চলিয়া যায়। এই সূত্রে মামলা-মোকর্দ্দমারও অন্ত নাই, তার জন্ত সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তবুও বড় মামলাটার এখনো নিষ্পত্তি হয় নাই, খোলা তলোয়ারের মত তাহা মাথার উপর ঝুলিতেছে। হাইকোর্টের এই আপীলের উপরই রায় পরিবারের সব-কিছু নির্ভর করিতেছে। এ পর্য্যন্ত নিম্ন আদালতে বরাবর ইহাদের জিত হইয়া আসিয়াছে। হাইকোর্টের এই শেষ বিচারে যদি জিত হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা—হার হইলে, ইহাদের পথের ভিখারী হইতে হইবে।

প্রতিবেশী মেয়ে-মহলে কানা-কানি হয়—"বউটার রূপ আছে, গুণও আছে, কিন্তু অপয়ার ধাড়ী! ও এসে অবধি ওদের সংসারটা ছারখার হয়ে গেল।"

ইহাদের মধ্যে একজন মাত্র এ কথায় সায় দেয় না, সে হইল সরকারদের সেজ গিন্নী। সেজো গিন্নী বলে —"ও এসে আছে বলেই, হয়ত ওদের দুঃখ বিপদের ভাঙা ছাদ এখনো সবটাই ভেঙে পড়ছে না। ওদের দুর্দ্দিন ত সুরু হোয়েছে ও আসবার অনেকদিন আগে থেকেই।"

স্বর্ণ অন্ত মেয়েদের কাছে যদিচ মুখে কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু কমলার বিরুদ্ধে তাহার মন সদাসর্ব্বদা বিষাক্ত হইয়াই আছে, এবং আর সকলের মত তাহার মনেও এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে কমলা অপয়া; এবং তার জন্তই তাহার সংসারের দিন দিন এইরূপ অবনতি ও দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। মোটের উপর, কমলার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও প্রীতির দুটি একেবারে উল্টাভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে। কমলা এখন তাঁহার চক্ষুঃশূল। স্বর্ণ তাহার সহিত বড়-একটা কথাই কহেনা; যাহা কহে, তাহা অতিমাত্রায় বাঁকা এবং বিষাক্ত। কমলা বুদ্ধিমতী। সকলের এই ভাবান্তর বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। সে নীরবে সকলের এই বিষ-ব্যবহার সহ্য করিয়া, বাংলাদেশের চির নির্য্যাতিত বধূদের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া, সে আর কি করিতে পারে? জীবনে তাহার একমাত্র আশা এবং বল—তাহার স্বামী। কিন্তু সেই স্বামী এতদূর মাতৃভক্ত যে, মায়ের কোনোরূপ অন্যায় অবিচারের সম্বন্ধে সে একেবারেই অন্ধ। নরেশচন্দ্রও তাহাকে অপয়া মনে করিয়া, তাহার সহিত কঠিন ও রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। কমলা ভাবে, সে চিরদুঃখিনী। তাহার একমাত্র স্নেহের আশ্রয় ছিল, তাহার দরিদ্র বাপ-মায়ের প্রীতির বেষ্টনী। আজ তাহার অতি-বড় এই দুর্দ্দিনে, তাহার সেই স্নেহময়ী জননী বড় অসময়ে তাহাকে চিরকালের জন্ত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বাপ—থাকিয়াও নাই। অপয়া কন্তা, তাহাদের ছাড়িয়া আসিবার পর হইতেই সংসারে তাহারা আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সুতরাং সে কাহাকে তাহার মনোবেদনা জানাইবে? জানাবার একজন ছিল বটে, কিন্তু সেই কমলাগত প্রাণ, উদার হৃদয় গৃহী-তাপস আজ তাহার নিকট হইতে বহুদূরে; দিল্লীতে। সুতরাং তাহার আর

কে আছে? শুধু মধ্যে মধ্যে তাহার অন্তরের মাঝে সে তাহার অন্তর্দেবতার সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁরই পদতলে সে মাথা লুটাইয়া প্রার্থনা জানায়—"ঠাকুর! তোমার পায়ে আমায় ঠাঁই দাও; আর যতদিন না আমার সে সৌভাগ্য হয়, ততদিন এই দুঃখ ভোগ করবার মত শক্তি আমাকে তুমি দিয়ো।" পরক্ষণেই সে একটি কচি শিশুকে তাহার বেদনা-কাতর ভাঙ্গা বুকে চাপিয়া ধরে। আজ কয় মাস হইল তাহার কোল আলো করিয়া একটি খোকা হইয়াছে।

একমাত্র এই সম্বলটুকু লইয়াই কমলা তাহার দুঃখের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল।

পাঁচ

কয়দিন হইল কমলার জ্বর হইয়াছে। অতিরিক্ত জল ঘাটিয়া এবং ঠাণ্ডা লাগিয়াই সম্ভবতঃ তাহার এই জ্বর। বিবাহের পর, স্বর্ণ যাহার পিছনে একজন ঝিকে পৃথকভাবে নিযুক্ত করিয়াছিল, আজ স্বর্ণ তাহাকে দিয়াই ঝিয়ের কাজ করাইতেছে। সুতরাং কমলার জন্ত স্বর্ণর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই; বরং তাহার এই অপয়া বৌটা এখন মরিয়া গেলেই সংসারের পক্ষে মঙ্গল। তাহার এবং সেই সূত্রে এ-বাড়ীর সবারই নিশ্চিত ধারণা যে কমলা এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেই, এ সংসারের যতকিছু দুর্দৈব সবই কাটিয়া যাইবে।

আজ সাত আটদিন ধরিয়া কমলা জ্বরে কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু তাহার জন্ত দু' কৌটা ওষুধের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। আর পথ্যের ব্যবস্থা অতি চমৎকার; সারাদিনে দুইখানা 'নেড়ো' বিস্কুট, আর পাতলা, চিনিশূন্য, জলের মত খানিকটা বার্লি—এই তাহার পথ্য। সে যে কেমন আছে, আছে কি মরিয়াছে, সে খোঁজ কেহই করে না। এই জ্বর অবস্থাতেও কমলাকে সংসারের দুই-একটা কাজ করিতে হয়। আজ সকালের দিকে, কমলার জ্বর ছিল না, কিন্তু রাত্রে খোকার জন্ত ভাল ঘুমাইতে না পারায়, তাহার চোখ দুটা ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল, অথচ মাথার যন্ত্রণায় ঘুমাইতেও পারিতেছিল না। এক ফালি ন্যাকড়ায় মাথাটা বাঁধিয়া, সে চুপ করিয়া মেজেয় পাতা একখানা মাদুরের উপর শুইয়াছিল; খোকাটি তাহার পাশে ঘুমাইতেছিল। স্বর্ণ এদিক দিয়া যাইতে যাইতে, একবার আড় চোখে দৃষ্টিপাত করিয়া গজ্ গজ্ করিয়া কহিল—"বাবা! লোকের অসুখও হয় বটে, কিন্তু এ রকম নবাবী অসুখ বাপের জন্মে কখনো কারো দেখিনি।"

"কোথাকার নবাবের অসুখ হোল, বড় গিন্নী?"

"এই আমাদের রাজনন্দিনী—মেজ বউমার, আবার কার!" বলিয়া স্বর্ণ দুম্ দুম্ করিয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"কেমন আছিস রে রাজ-নন্দিনী?" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগলেন।

ইনিই সরকারদের সেজগিন্নী। এই বিচারপরায়ণা, স্নেহময়ী নারীটিই কমলার একমাত্র হিতৈষিণী। এই বুদ্ধিমতী দরদী স্ত্রীলোকটি যা বলেন, তা স্পষ্টই বলেন; যা করেন, তা সোজাসুজিই করেন। একমাত্র এই সেজগিন্নীই প্রথম হইতে কমলার অন্তরের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কমলা একটি সুকোমল স্বর্গীয় পুষ্প। তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে, এই শুদ্ধ শুভ্র পবিত্র আত্মা, সর্ব্বগুণময়ী, পুণ্যবতী মেয়েটির জন্তই এ সংসার এখনো কোন-গতিকে টি কিয়া আছে। তাই সেদিন, এই সেজগিন্নীই পাড়ার অন্যান্ত মেয়েদের সাক্ষাতে বলিয়াছিল—"যেদিন কমলা ওদের সংসার ছেড়ে চলে যাবে, সেইদিনই ওদের মাথার উপর চরম দুর্দ্দশার অন্ধকার আকাশ খান্ খান্ হোয়ে ভেঙ্গে পড়বে।"

সেজগিন্নী কমলার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অনেক কথাই কহিল। বিধু ঝি আসিয়া এককাপ চা আর একখানা বিলী বিস্কুট কমলার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে সেজগিন্নীর দিকে বাঁকা চাহনিতে দৃষ্টি করায়, সেজগিন্নী তাহাকে কহিল—"কি লো বিধু! কট্-মট্ কোরে, মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলি বল্ ত? তা, তুই ঝি না হোয়ে যদি পুলিশের গোয়েন্দা হতিস্, তা হোলে মানাতো ভাল।" বিধু দাসীর সাধ্য কি যে একথার ঠিকমত জবাব দিতে পারে!

সুতরাং সে শুধু বোকার মত একটুখানি হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাতল-ভাঙ্গা 'কাপ' ও ফাটা ডিশটার দিকে দেখিতে দেখিতে সেজগিন্নী মৃদুকণ্ঠে কহিল—"তোর আদর দেখছি চরমে উঠেছে, মেজ বউ। বিয়ের পর এ বাড়ীতে যখন তুই প্রথম এলি, তখন তোকে রূপোর কাপ-ডিসে চা খেতে দেখেছিলুম।" কথা কয়টা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তারপরই পুনরায় কহিল, "তা, তুই বরাতটা করেছিলি ভাল। এমন ধারা ব্রেক্‌ফাষ্ট কোন্ বাড়ীর বউ পায় বল্ দেখি? মাটির খুরি নয়, গেলাস নয়, একেবারে চীনে-মাটির কাপ-ডিস্; তাতে আবার কালো চা! তাও আবার ঠাণ্ডা নয়, একেবারে গরম্ গরম্—ধোঁয়া উঠছে।......আমি ভেবেছিলুম—'ত্রিফলাদ্য পাঁচন'......; কোবরেজ্ মশাই বোধ হয় ব্যবস্থা কোরেছেন।...তা সুন্দর! চমৎকার! তবে, এর সঙ্গে একটা বিড়ি আর একটা দেশলাই যদি দিত, তা হোলে ত, তোর এই ঘরখানা, বাজারের সামনের ঐ 'মনোরঞ্জন টি সপ্' হোয়ে পড়তো। তাই ত ভাবি যে,........."

কিন্তু সেজগিন্নীর ভাবনা আর অগ্রসর হইতে পারিল না; নরেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং সেজগিন্নীর দিকে চাহিয়া কহিল—"কেমন আছেন কাকী মা?"

"ভাল আছি বাবা। তা হ্যাঁরে, বউটা এই রকম পোড়ে পোড়ে ভুগছে, একটু ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করছিস্ না তোরা?"

জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিতে রাখিতে নরেশ কহিল—"ওষুধ?...তা...হ্যাঁ...দিলেই ত হয়। তবে কি না, মা বলেছেন যে সাদা অন্ন, উপোস দিলেই সেরে যাবে; কতকগুলো ওষুধ খাওয়া ত ভাল নয়। সেই জন্যে......"

"সেই জন্যে, পোড়ে পোড়ে ও বেচারা ভুগতে থাকবে? বলি বাবা, তোরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে ওর ওপর! এই রকম বিনা ওষুধে......"

আর কোন কথা কেহ বলিতে পারিল না; খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়টাতে রূপগঞ্জে ভক্তিনাথ মাঠের পুকুরে স্নান করিতেছিল। ভুবন জেলের মা এক চুবড়ী শুশনি শাক তুলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; ঘাটে নামিয়া পা ধুইতে ধুইতে ভক্তিনাথের গামছাখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"দাদা ঠাকুর! গামছাখানাকে এইবার পেন্‌সিল্ (পেন্‌শান) দাও, ওতে আর কিছু পদাত্থ নেই।" ভক্তিনাথ কহিল—"হ্যাঁ, এতে আর চলে না, একখানা কিন্‌তে হবে। মেয়ের কাছে একবার যাবো, কিছু খরচ-পত্তর আছে ত! দু' পাঁচ টাকা যা হাতে আছে, তার থেকে আর খরচ করতে পারছি না।"

"কবে যাবেন গা, দাদাঠাকুর?"

"এই মাসের মধ্যেই একদিন যাব। শরীরটা মোটেই ভাল নেই, তাই..."

"বৌদি ঠাকরেণ মারা যাবার পর থেকে, সত্যিই তুমি দিন দিন যেন কেমন ধারা হোয়ে যাচ্ছ! শরীরে তোমার মোটেই অক্ত (রক্ত) নেই, একটু ওষুদ-পত্তর খাও বাবু! রবিনেশ (অবিনাশ) ডাক্তারকে একবার ভাল করে দেখিয়ে এসো গিয়ে।"—বলিতে বলিতে জেলে বুড়ী চলিয়া গেল।

ভক্তিনাথ সে-বেলা রান্না করে নাই। স্নানান্তে মুড়ির কলার খাইয়া শুইয়া পড়িল। শীতকালে খুব ঠাণ্ডার সময়, দুপুরের আহারের পর, লেপ মুড়ি দিয়া শুইলে যেমন রাজ্যের ঘুম আসিয়া সকলকে চাপিয়া ধরে, তেমনি আজ হাজার রকমের এলো-মেলো চিন্তা, একটার পর একটা আসিয়া ভক্তিনাথকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।—"সন্ধ্যের পর দুটি খিচুড়ী চাপিয়ে দোবো। গন্শার দোকানের মস্তর ডালটা লোহার কড়াই, কিছুতেই গলতে চায় না।...আচ্ছা ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় কি করে? ওঃ! চড়াই পাখীগুলোর কি ফুর্ত্তিই বেড়েচে; সারা দিনটা কি সাংঘাতিক কিচিরমিচিরই না লাগিয়েচে। দলে দলে একবার উড়ে বাইরে যাচ্ছে আবার আসচে! বেশ আছে ওরা!...লাউ গাছটার চারটে লাউ বেশ বড় হোয়ে উঠচে; ওর একটা নিয়ে যাব কমলার বাড়ী। কিন্তু যেতে গেলে, তিনটি টাকা গাড়ী ভাড়া, দুটাকার মিষ্টি, আর ওর জন্যে একখানা শাড়ী...না, তাতেও হবে না; ওকে দিলে ওর শাশুড়ীকে একখানা না দিলে ভাল

দেখায় না। দু'খানা শাড়ীই কিনতে হবে। পাঁচটা টাকা ত আছে, গাড়ী ভাড়া আর মিষ্টি ওতে হোয়ে যাবে'খন। শাড়ী এক জোড়া নারায়ণ পালের দোকান থেকে ধারে নিলেই হবে।···ওঃ ঘুঘু পাখীটা কোথায় বোসে ডাকচে! বাস্তবিক বড্ড করুণ ওদের ঐ ডাক! আচ্ছা চকাচকী বোলে যে পাখীর কথা সাবেক কালের গল্পে···।' ভাবিতে ভাবিতে ভক্তিনাথ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন উঠিল তখন অপরাহ্ণ। 'পাঁকাঠি জ্বালিয়া এক কাপ চা তৈয়ারী করিল। চা খাইয়া সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া সে হাটতলার দিকে চলিয়া গেল।

ঘন্টা দুই পরে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার এক হাতে একজোড়া দেশী তাঁতের শাড়ী, আর এক হাতে কাগজের ঠোঙায় মুগুরির ডাল।

ছয়

"কি ভাবচো বল ত?"

"ভাবচি যে, ও-মাসের চার তারিখে হাইকোর্টের মামলার রায় বেরোবে, মধ্যে আর ক'টাদিন বাকী। এই মামলার হার-জিতের উপরই আমাদের মরা-বাঁচা নির্ভর করচে।"

স্বর্ণ ও সুকুমার বাবুর মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। স্বর্ণ কহিল—"মামলায় আমাদের কি হবে বলে মনে হয়?"

"সকলেই ত বলচে যে, আমরাই জিতবো। আমারও খুব বিশ্বাস—তাই হবে। আমাদের ব্যারিষ্টার খুব জোর কোরেই বলচে যে জিত না হোয়ে যায় না। নীচের আদালতের সব কোর্টেই বরাবর আমরাই জিতে এসেচি; সুতরাং আমরা যে জিতবো, এ আশা আমার খুবই আছে।"

স্বর্ণ একটু ভাবিয়া কহিল—"আমার কিন্তু আশা হয় না। কেন না, যে 'অপয়া'টি এসে ঘাড়ে চেপে বসেচেন, তাতে আমি কিছুই আর ভরসা করতে পাচ্চি না।"

কিছুক্ষণ দুইজনেই কোন কথা কহিল না। মিনিট খানেক পরে স্বর্ণ কহিল—"তুমি এক কাজ কর। এই সময়টা ওর বাপের কাছে ওকে সরিয়ে দাও। ওর বাপকে চিঠি লেখ, ওকে এসে নিয়ে যাক।"

"চিঠি ত সেদিন দিলুম।"

"ফের ভাল কোরে দাও; রেজেষ্ট্রী কোরে দাও।"

"ভাল, কাল আবার তাই দোবো। আজ দুপুর বেলা হঠাৎ কি হোল?"

"হোল কি জানো, ওদিককার রান্নাঘরের দাওয়ায় ও আঁচল পেতে শুয়েছিল, আমি বল্লুম 'পথ ছেড়ে ঐ দিকে গিয়ে শোও।' ও বল্লে, 'আমার শীত করচে, রোদ ছেড়ে উঠতে পারচি না।' আমি বুঝলুম, ওটা ওর বদমায়েসী। আমার হাতে গঙ্গাজলের এক বালতি জল ছিল সবটা দিলুম ঢেলে ওর মাথায়। তখন সুড়্ সুড়্ কোরে বাছাধন ওর ঘরের দিকে চলে গেলেন। এমন একগুঁয়ে মেয়ে-ছেলে আমার বাপের জন্মে কখনো দেখিনি।"

"রাত্রে ওর একটু একটু জ্বর এখনো হচ্চে ত?"

"কে জানে, ওর কি হয় না হয়! আপদ ত মরেও না, তা হোলে ত আমরা নিষ্কৃতি পাই।"

সুকুমার বাবু আর কোন কথা না বলিয়া, কি ভাবিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কমলা খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখখানা অতিমাত্রায় বিমর্ষ। সামনের 'সোফা'খানায় নরেশ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু তাহার চোখ ও মন তাহাতে ছিল না। ঘরের বাতাসটা থমথমে; মনে হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইমাত্র কোনও অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে।

মিনিট দুই পরে, নরেশচন্দ্র একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল—"বাপ না নিতে আসে, তুমি নিজেই চলে যাও।"

"আমি ত যাব না বলচি না; আমাকে তোমরা কেউ দিয়ে এস। বিয়ের পর থেকে সকল কর্ত্তব্যই ত ক্কোরে আসচ, সুতরাং এ-টুকুও কর।"

"ঠিক ঠিক! তারপর?"

"তারপর আর কি; এ ত আর এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া নয়, যে—ইচ্ছে করলেই চলে যাব। আমি বৌ-

মানুষ, অক্ষম মেয়ে-ছেলে, একলা কি কোরে যাব ? তুমি ক্ষমতাশালী পুরুষ, তুমিই না-হয় দয়া কোরে দিয়ে এলে। তা'তে তোমার মানের কোন হানি হবে না।"

"খুব লেকচার ঝাড়চো যে দেখছি, জুতো মেরে মুখ ভেঙ্গে দোবো।"

"সে ক্ষমতা আর অভ্যেস তোমার খুবই আছে, তা জানি। প্রজাদের জুতো মেরে মেরে হাত ছুটো খুবই ত পাকিয়ে ফেলেছ।"

নরেশ রাগে ফুলিতে লাগিল। অগ্নি-গর্ভ জলন্ত তুবড়ীর মত সে গর্জ্জাইয়া উঠিল—"এ-বাড়ী থেকে তুমি দূর হোয়ে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, এই তোমার মারলুম জুতো। দূর হও—দূর হও—দূর হও—দূর হও—দূর হও।"—বলিয়া হাতের বাঁধানো বইখানা সজোরে কমলার মুখে ছুড়িয়া মারিল। বইয়ের ছুঁচালো কোনাটা কমলার চোখের কোণে লাগিয়া সেখানটা কাটিয়া গেল ও অল্প অল্প রক্ত ঝরিতে লাগিল। কমলা আর দ্বিতীয় কোন্ কথা না বলিয়া মেজের উপর ঘুমন্ত খোকার পাশে শুইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে এক সময়ে কমলা উঠিয়া মুক্ত জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, বহিঃপ্রকৃতি নিঃঝুম—নিস্তব্ধ। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল। ঘণ্টা খানেক পরে আবার উঠিল, আবার জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন পূর্বদিকের আকাশ-গায়ে অল্প-অল্প আলোর আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল। তখনো কাক-পক্ষী বাসা ছাড়ে নাই, কিংবা ডাকে নাই। সমস্ত পল্লী নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত। পথের উপর প্রথম পথিকের পদবিক্ষেপ তখনো পড়ে নাই। কমলা অতি সন্তর্পণে তাহার রাত্রি-বাস ছাড়িয়া একখানা মলিন শাড়ী পড়িল। তারপর ঘুমন্ত খোকাকে বুকে চাপিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। এ-বাড়ীর তখন সকলেই নিদ্রিত, কেহই উঠে নাই। কমলা খুব সতর্ক পদবিক্ষেপে বরাবর নীচে নামিয়া আসিল ও সদরের খিল খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। কয়েক পা আসিয়া, একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল; তাহার 'পর আবার অগ্রসর হইয়া সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাত

বেলা প্রায় নয়টা। কিছু আগে হাওড়া ষ্টেশানে একটা বর্দ্ধমান লোকাল আসিয়া লাগিয়াছিল। প্লাটফর্ম্মের বাইরে একস্থানে একজন রুগ্ন শুষ্ক-জীর্ণ লোককে ঘিরিয়া কয়েকজন ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লোকটির এক-হাতে কাগজে জড়ানো কাপড়, আর একহাতে একটা লাউ।

ভীড়ের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"ক' টাকা ছিল পকেটে ?"

"প্রায় চার টাকা।"

"সবই গেছে ?"

অপর একজন কহিল—"না; দয়া কোরে কিছু রেখে গেছে। আরে মশাই! পকেট-মার···সব নেবে-ন্য ত সন্দেশ খেতে কিছু রেখে যাবে ?"

"আপনি আসচেন কোথেকে; বাড়ী কোথায় ?"

"রূপগঞ্জ।"

"যাবেন কোথা ?"

"বরানগর, আমার মেয়ের বাড়ী।"

ভক্তিনাথ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। এক কাপ চা খাইবার তাহার পয়সা নাই। সবই পিক-পকেট হইয়া গিয়াছে। দুশ্চিন্তায়, দুর্ব্বলতায়, পথশ্রান্তিতে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল ও পুল পার হইয়া বড়বাজারের পথে আসিয়া পড়িল। ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিতেছিল, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া উঠিতেছিল।

বড়বাজারের একটা সঙ্কীর্ণ নোংরা গলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সে দেখিল একটা পুরাতন অন্ধকার বাড়ীর বারান্দায় একজন দরোয়ান গোছের হিন্দুস্থানী বসিয়া আছে। ভক্তিনাথ চা খাইবার জন্ত তাহার কাছে ছুইটা পয়সা ভিক্ষা চাহিল। লোকটা কহিল—"খাটমল্ ভিলাও, দোপয়সা কেঁও, দো রোপেয়া তোমারা মিল যায়ে গা।" কথাটা ভক্তিনাথ বুঝিতে পারিল না। তখন তাজা বাংলায় দারোয়ানজি যাহা বুঝাইয়া দিল, গোটা বাংলায় তাহার মানে দাঁড়ায় এইরূপ :—সামনের ঘরখানা

মাড়োয়ারীদের সম্পত্তি। ঘরখানার নাম—'খাট্‌মল'—অর্থাৎ ছারপোকার ঘর। ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা খাটিয়া পাতা আছে। খাটিয়াখানাতে লক্ষ লক্ষ ছারপোকাকে আশ্রয় দিয়া রাখা হইয়াছে। যে-কোন লোক ঘড়ি ধরিয়া আধ ঘণ্টাকাল ঐ খাটিয়াতে শুইয়া থাকিতে পারিবে, তাহাকে নগদ দুইটা টাকা দেওয়া হইবে।

ভক্তিনাথ কথাটা শুনিয়া খুবই আশান্বিত হইয়া পড়িল; দরোয়ানজীকে কহিল—"আমি শুইব।" তখন দরোয়ানজী তাহাকে সঙ্গে করিয়া 'খাট্‌মল-ঘরে' প্রবেশ করিল; ভক্তিনাথকে কহিল—"পিরাণ ছোড়কে শোনে হোগা।" গায়ের ছিন্ন মলিন জামাটা খুলিয়া ভক্তিনাথ খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। দেয়াল-গাত্রে একটা ক্লক-ঘড়ী ঝুল ও মাকড়সার জালে জড়িত হইয়া টিক্-টিক্ করিতেছিল।

তিরিশ সেকেণ্ড, এক মিনিট, দু' মিনিট। তাহার পরই ভক্তিনাথের সারা অঙ্গ জ্বালা করিতে সুরু করিল। মিনিট পাঁচের ভিতরেই লক্ষ লক্ষ উপবাসী ছারপোকা তাহার সর্ব্বাঙ্গে—এমন কি মাথার চুলের মধ্যেও ছাইয়া পড়িল ও তাহাদের সমবেত তীব্র দংশনের জ্বালায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু দুইটা টাকা। এক টাকার সন্দেশ, আর একটা টাকা তাহার ফিরিবার ট্রেণ ভাড়া—দুইটা টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু উঃ! আর যে পারা যায় না। ভীষণ কামড়। দেহের সর্ব্বাংশে ছুঁচ ফোটানোর তীব্র জ্বালা। অসহ। অসহ। উঃ। আর কতক্ষণ?......মোটে দশ মিনিট হোল। এখনও বিশ মিনিট বাকী? নাঃ—আর ত পারা যায় না! উঃ। গেলুম—গেলুম।......বাপ্।—ভক্তিনাথ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল।

খুবই আশ্চর্য্য হইয়া দরোয়ানজী কহিল—"পাঁচ মিনিটসে বাস্তি কোই নেই শোনে সক্‌তা হায়। তোমকো হাম তারিফ দেতা হায়।"—দরোয়ানজী জানে না যে, এই দুটো টাকা আজ তার কত দরকার। এর জন্মে সে তাই আজ তার বুকের রক্ত দিতেও কাতর নয়।

তখন দরোয়ানজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া সামনের বাড়ীর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছে গিয়া সব কথা বলাতে তিনি বলিলেন—"বারা মিনিট; আচ্ছা উন্‌কো একঠো রূপেয়া দে দেও।" ভক্তিনাথের সারা অঙ্গ তখনো ছারপোকার কামড়ে ভীষণভাবে জ্বালা করিতেছিল। সে টাকাটা লইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, টলিতে টলিতে, চিৎপুর রোড ধরিয়া বাগবাজারের পথে চলিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে, বরানগরে সরকারদের সেজগিন্নী সেজ কর্ত্তার কাছে আসিয়া কহিল—"রায়েদের মামলা হার হোয়ে গেল?"

সেজ কর্ত্তা কহিল—"তাই ত হোল, শুন্‌চি।"

"হার যে হবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। ওদের নির্য্যাতনে যেদিন লক্ষ্মী ওদের ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে চলে গেল, সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলুম যে, ওদেরও শীগ্‌গীর পথের ভিকিরী হোতে হবে! তার পুণ্যেই ওদের মাথার ওপরকার দুর্ভাগ্যের আকাশ এত-দিন ভেঙ্গে না পোড়ে কোনমতে আটকে ছিল।" কমলাকে মনে করিয়া একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল। কমলা আজ কোথায়? কে জানে, সে কোথায়! কিন্তু সে যেখানেই থাক, ভক্তিনাথ তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। বড় আশা লইয়াই যাইতেছে।

হাঁটিতে হাঁটিতে ভক্তিনাথ বাগবাজার আসিয়া পৌছিল এবং মদনমোহনতলার কাছে একস্থানে ভীড় দেখিয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল পথের উপরকার একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর মলিন-বস্ত্র পরিহিত একটি তরুণীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে আর একটি শিশু সেই মৃতার বক্ষোপরি উপুড় হইয়া শুইয়া তাহার দুগ্ধশূন্য স্তন মুখে দিয়া টানিতেছে। ভক্তিনাথের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে ধরিত্রীর আলো নিমেষে নিবিয়া গেল। তাহার দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অবশ দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কোনমতে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া ধপ্ করিয়া যেই রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল এবং শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া উন্মাদের মত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জনতার ভিতর হইতে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি একে চেনেন? ব্যাপার কি বলুন ত?"

এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যে দিবে, সে ত পাষাণ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্নের কথা কয়টি সকলের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া শূন্যে বৃথাই ঘুরিতে লাগিল।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মাইনর পরাক্ষা দিয়া যে বৎসর (১৮৯৩) ঢাকা আসি, সে আজ প্রায় সাতান্ন বৎসরের কথা, তখনই শুনিতে পাই হীরেন্দ্রনাথ ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারের সম্মান লাভ করিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহাও ক্রমে ক্রমে শুনিলাম। 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় তাঁহার "কালিদাস ও সেক্‌সপিয়র" প্রবন্ধ যে স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও দেখিয়াছিলাম। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা হীরেন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, তাহাও কবিবরের অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়। এই সবই অবগত হওয়া যায় লোকপরম্পরায় বা কাগজের মারফতে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় পাই ময়মনসিংহের সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীমান স্যার কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে। মহারাজা হীরেন বাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং উভয়ে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন। মহারাজা কুমুদচন্দ্র নিজেও খুব মার্জ্জিত-বুদ্ধি ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হীরেন বাবুর পাণ্ডিত্য, বিচার-শক্তি ও ধীরবুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে তাহাদের ক্লাশে প্রথম ছাত্র হইলেও হীরেন্দ্রনাথ বড় নিরহঙ্কার ছিলেন।*

এবার বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের কথা বলিতেছি। তখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। আমি সে সময়ে ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহ সেখানেও বেশ প্রবলবেগে চলিয়াছিল।

ক্রমে শুনিলাম কার্লাইল ও লায়ন সার্কুলারের জন্য নানাস্থানে ছাত্রগণ লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইতেছে। কলিকাতার নেতৃবৃন্দ কলিকাতার এবং মফঃসলের ছাত্র-বৃন্দের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

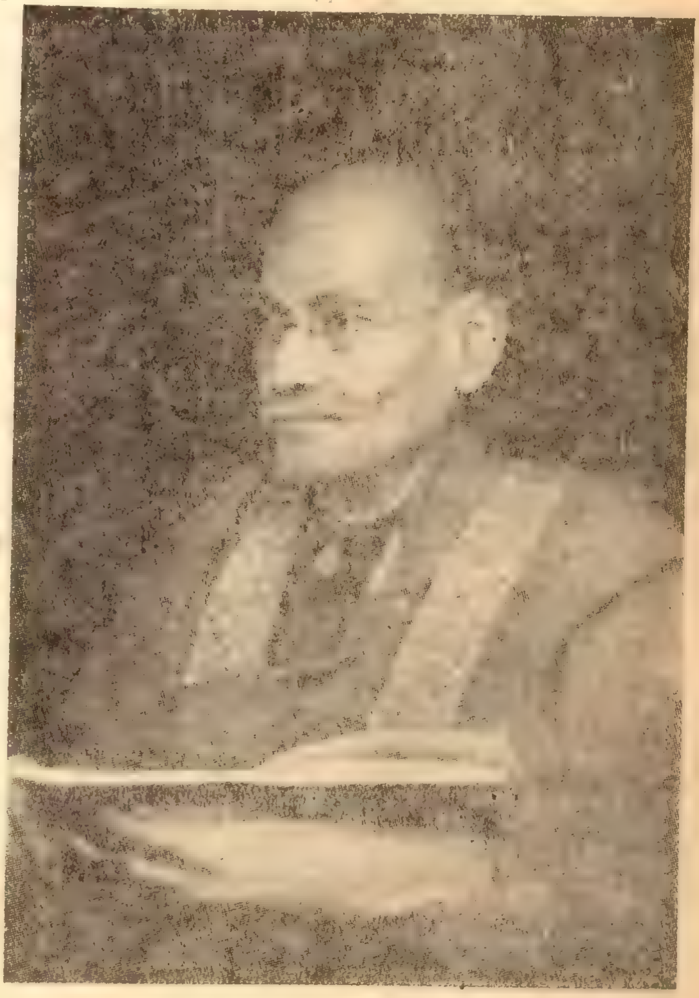

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* ১৮৮৮ খৃঃ হীরেন্দ্রনাথ বি,এ, পরীক্ষা দিয়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন তিন বিষয়েই প্রথম

১৯০৫-এর ৯ই নভেম্বর, ২৩শে কার্ত্তিক—কলিকাতা পান্থীর মাঠে এক বিরাট সভা হয়। ছাত্রেরা দলে দলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত—

"মোরা চাহিনা তব শিক্ষা
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা"

গাহিতে গাহিতে মাঠে সমবেত হইল। বক্তৃতার বিষয় ছিল "জাতীয় শিক্ষা।" এই সভায়ই সভাপতির আসন হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ক্রীক রো'র সুবোধ মল্লিক মহাশয় উক্ত শিক্ষাকল্পে একলক্ষ টাকা দান করিবেন ঘোষণা করেন। সভায় তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া বক্তৃতা করেন স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। হীরেন্দ্রনাথ বলেন—

"জাতীয় শিক্ষা কল্পে আমি যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ ক'রব এই আমার সঙ্কল্প, আমি আজ হ'তে কার্য্যে ব্রতী হলাম।"

ইহার পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ The National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্যার গুরুদাস হন ইহার কর্ণধার। আর এই সময় হইতে হীরেন্দ্রনাথও জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্য একাগ্রচিত্ত হন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়া কয়েকটি অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। এপ্রিলমাসে বরিশাল সহরে প্রাদেশিক সম্মিলনী ছত্রভঙ্গ হয় এবং জুন মাসে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে লোকমান্য তিলক কলিকাতায় সমাগত হন। ১১ই জুন (১৯০৬) ক্রীক্‌রোতে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে লোকমান্য তিলকের অভ্যর্থনার জন্য একটী প্রীতিভোজ হয়। হীরেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজা সুবোধ মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—রাজার একমাত্র ভগ্নী ইন্দুমতিকে বিবাহ করেন। ন্যাশ্‌নাল কলেজ স্থাপিত হয় সুবোধ বাবুর বাড়ীর কাছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী পদে হীরেন্দ্রনাথ বরিত হন। প্রথম হইতে যে কয়জন মাসিক ২৫০৲ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন, হীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ইহার জন্য দান হিসাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ৩১২৫০৲ দিয়াছিলেন।

১৯০৬তে কংগ্রেসের দ্বাবিংশতি অধিবেশন হয় কলিকাতায়; দক্ষিণ কলিকাতার চৌড়ঙ্গীর উপরে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব * হীরেন্দ্রনাথই উপস্থিত করেন। তাঁহার অভিভাষণ শুনিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতায় বেশ যুক্তি ছিল এবং জানিবার জিনিষও ছিল প্রচুর, আর জাতীয় শিক্ষার সহিত জাতীয়তার যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন—স্বরাজের তিনটি দিক, ইনি ত্রিমূর্ত্তি দেবতা—এক দিকে রাজনীতি, অন্যদিকে শিল্প, তৃতীয় বিদ্যা—

Self government was a three-faced deity: Political, Industrial and Educational.

তাঁহার সুললিত কণ্ঠে মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরাজের আওতায় প্রদত্ত শিক্ষা দূরীভূত করিবার জন্য মনীষীরা কি বলিয়াছেন তাঁহাদের ভাল ভাল স্থান উদ্ধৃত করিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে সব বিষয় বুঝাইয়া বলেন—

"বিদেশীর হাতে আপনারা শিক্ষার ভার দিবেন না, ভারতের প্রাণশক্তির উপর বিশ্বাস করুন। আপনার হাতেই আপনার মুক্তি।"

"Trust not your education on aliens. In native souls and native lands, the only hopes of succour rest."

শ্রেণীর অনার্স পাশ করিয়া দুইটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯তে এম্.এ'তে (ইংরাজী) ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হন। ১৮৯৩ খৃঃ ৮০০০৲ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পুরস্কার পান। হীরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯শে জানুয়ারী ১৮৬৮, তিনি চোরবাগানের দত্ত বংশোদ্ভব দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। দ্বারকানাথ বেলি ব্রাদার্সের বেনিয়ান ছিলেন।

* "That in the opinion of the Congress the time has arrived for the people all over the Country earnestly to take up the question of National Education for both boys and girls and organise a system of education—Literary, Scientific and Technical suited to the requirements of the Country on National lines and under National control."

তিনি বুঝাইয়া দেন, "জাতীয় ভাবেই আপনারা দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।" তাঁহার উত্থাপিত প্রস্তাবটি মিঃ জে, এন, রায় ব্যারিষ্টার সমর্থন করেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন। সকলেই বোধ হয় জানেন যে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গলা দেশে মফঃসল সহরে প্রাদেশিক সম্মেলন বসিতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় নিতান্ত মামুলি গোছের হওয়ায় কোনরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হইত না। এই নবভাবের প্রথম অধিবেশন হয় বহরমপুরে, সভাপতি হন স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু। হীরেন্দ্রনাথ তথায় শাসন ও বিচারের পার্থক্যকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন; দ্বিতীয়টি হয় ১৮৯৬তে কৃষ্ণনগরে, সভাপতি হন মাননীয় গুরুপ্রসাদ সেন। হীরেন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে খুব যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব আনিয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের গভীর চিন্তাপ্রসূত ও সারগর্ভ অভিভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইরূপে তিনি প্রাদেশিক সম্মেলনীতে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগদান করিতেন। সুতরাং শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বহুদিন হইতেই অবহিত ও নিঃসন্দেহ ছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে হীরেন বাবু কাশীতে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ী গিয়াছিলেন, তবে সুরাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন কি না জানিতে পারি নাই।

কংগ্রেস অতঃপরে কনভেনসনে পরিণত হইল বটে, কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" অক্ষতভাবে চলিল। হীরেন্দ্রনাথ হইলেন ইহার প্রধান প্রচারক, প্রচার কার্য্যও অবাধে চলিল। ইহার কিছুদিন পরে একেবারে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতেরই সুযোগ উপস্থিত হইল।

১৯০৯, জুলাই মাস। ময়মনসিংহ সহর উৎসাহে বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর গৌরীপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ৺মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এবং আরও দুই একজন জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত করাইতে ময়মনসিংহ পৌঁছিবেন। তাঁহাদের আগমনের কথা শুনিয়া আমারও মনে ভারী আনন্দ হইল। ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহে ১৯০৬এর গোড়াতেই একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুলেখক স্বর্গত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। অন্যান্য শিক্ষক ছিলেন

দ্বারকানাথ দত্ত

বামাচরণ সেন, যতীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। সম্পাদক ছিলেন মহিমচন্দ্র রায় উকীল। মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জাতীয় শিক্ষার অন্যতম প্রচারক ছিলেন। বদান্য স্বদেশবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পাঁচ লক্ষ টাকা দানের সহায়তায়ই জাতীয় শিক্ষালয়ের বিনাশ হওয়ার আশঙ্কা রহিত হয়।

ময়মনসিংহে আরও একটি সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল "মহাকালী পাঠশালা"! ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ছোট লাট স্যার ল্যানসলট হেয়ার এখানে আসিলে আলেকজাণ্ডার গার্লস স্কুলের মেয়েরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করিবে,

স্থির হয়। কিন্তু এই বিজাতীয় ব্যবস্থা অনেকের মনঃপূত না হওয়ায় তাহারা একটি জাতীয় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন এবং স্বর্গীয় প্রসন্ন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলের পরামর্শানুসারে মহাকালী পাঠশালা নামে ও উহার ধারায় ইহা পরিচালিত হইবে স্থির হয়। সেই দিন হইতেই উক্ত মহাকালী পাঠশালার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার আমি গ্রহণ করি। হীরেন্দ্রনাথের আসিবার পূর্ব্বে মহাকালী পাঠশালার মূল বিদ্যালয় হইতে মাতাজী তপস্বিনীর (নাসিকের যমুনা বাঈ) আসিবার কথা ছিল, ক্রমেই দেরী হইতে লাগিল। কিন্তু তখন আমার মন ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য এইরূপ জাতীয় শিক্ষার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। তাই হীরেন্দ্রনাথের শুভাগমনে, যদিও জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম না, তথাপি সবিশেষ হর্ষান্বিত হইয়াছিলাম।

যথাসময়ে ট্রেন আসিয়া ময়মনসিংহ ষ্টেশনে পৌছিল, আগন্তুকগণ নামিলেন, হীরেন্দ্রনাথের দীর্ঘকান্তি, উজ্জ্বল মুখশ্রী এবং সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় আরও মুগ্ধ হইলাম। তিনি প্রায় ৮।১০ দিন ছিলেন, আমি প্রায়ই তাঁহার ওখানে যাইতাম। তিনি সেবার মনোমোহন বাবু প্রভৃতিসহ গোলকপুরের কুমার বাহাদুর উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী থাকিতেন। আমার বাসাও ছিল খুব নিকটে কালীবাড়ীর সম্মুখে, ব্রহ্মপুত্র নদীর ঠিক উপরে।

প্রথম দিন ময়মনসিংহস্থ হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের ত্রুটি দেখাইয়া কিছু মন্তব্য করেন। হীরেনবাবু উত্তর করেন—

"দেখুন, স্বরাজ কথাটা ঠিক রচিত ছত্রপতি শিবাজীর, তাঁকেও তো কত কৌশল অবলম্বন ক'রতে হয়েছিল।"

ময়মনসিংহে হীরেন্দ্রবাবু 'জাতীয় শিক্ষা' সম্বন্ধে কোন সাধারণ সভা না করিয়া বিশিষ্ট নেতাদিগকে ডাকিয়া ঘরোয়া ভাবে বুঝানোই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। একদিন সন্ধ্যাকালে কালীপ্রসন্ন বাবুর আহ্বানে সহরের বিশিষ্ট এবং শিক্ষিত প্রায় জনচল্লিশ লোক একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। প্রথমে মনোমোহন বাবু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়া হীরেন্দ্র বাবুকে খুব উচ্চ প্রশংসা করেন। তারপরে হীরেন্দ্র বাবু এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা চেয়ারে বসিয়াই এমন প্রাঞ্জল ও সহজভাবে জাতীয় শিক্ষার অর্থ ও উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন যে, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমার ধারণা চিরকালের জন্য একেবারে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি বুঝিলাম কি ছেলে কি মেয়েদের জন্য এরূপ শিক্ষারই এখন একান্ত প্রয়োজন। এইখানেই শিক্ষা সম্বন্ধে হীরেন বাবুর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

হীরেন্দ্রনাথ বুঝাইয়া দেন ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্দেশ্য। অতঃপর সেই উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সব দৃষ্টান্ত দেন তাহাতে আমার হৃদয়ে জাতীয়তার যে বীজ সিরাজদ্দৌলা নাটক অভিনয় দেখিবার পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই খাঁটি ভাবে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা আরও সরস হইয়া উঠিল।

হীরেন্দ্রবাবু আরও বলেন, "দেখুন কোন খেলায় একজন দুইজন খুব ভাল খেলোয়ার থাকলেই খেলায় জিত হয় না। যদি combination পাকা ভাবে থাকে, তবেই জিত হয়, এই একভাবাপন্ন হওয়ার গুণ ইংরাজের আছে। এই ভাবটা প্রচলিত শিক্ষায় নাই বলেই আমি 'জাতীয় শিক্ষার' দিকে এতটা আকৃষ্ট হয়েছি।'

ইহার পরে একদিন আমি হীরেন্দ্র বাবুকে 'মহাকালী পাঠশালায়' লইয়া যাই। তিনি বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বলিয়া খুব খুসী হন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, কোল্‌কাতার মূল পাঠশালায় সংস্কৃতে খুব জোর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু দুই একটি মেয়েকে—বিশেষতঃ আমার এক আত্মীয়াকে দেখেছি বাঙ্গলা লিখতে পারে না।"

কিন্তু এখানে দেখিলেন সংস্কৃত অল্প পড়া হয় এবং বাঙ্গলাতে খুব জোর দেওয়া হয়। ১২।১৩ বৎসরের মেয়েরা 'মেঘনাদ বধ' পড়িয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিল তাঁহাতে বিস্মিত হইয়া যান। আর একটি জিনিষ তাহাকে খুব প্রীতি দিয়াছিল যে, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানসমূহ তাহাদের একেবারে ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। মনোরমা সেন

(এক্ষণে স্বর্গীয়া), সুবর্ণলতা সেন ও কুসুমকুমারী বর্দ্ধন এই তিনটি মেয়ে সম্বন্ধে তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁহার লিখিত মন্তব্যও সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিল। ধর্ম্মই জাতিকে রক্ষা করিবে এবং শিক্ষায়ই ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় হইবে, একথা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

পরদিন দুর্গাবাড়ীতে একটি সাধারণ সভা হয়। তিনি ভগবদ্ গীতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার অভিভাষণ দেন। ইতি-পূর্ব্বে তাঁহার "গীতায় ঈশ্বরবাদ" বাহির হইয়াছিল মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবীতে' আমি তাহা পড়িয়াছিলাম। ময়মনসিংহেও গীতার বেশ প্রচলন ছিল। দুর্গাবাড়ীতে বিভুচরণ বটব্যাল নামে একজন উকীল প্রতি রবিবারে গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। সুতরাং হীরেন্দ্র বাবুর গীতার ব্যাখ্যা সকলের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়াছিল।

হীরেন্দ্রবাবু থিয়োজফিষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমার নিকটে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতই তিনি প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিশ্বাসী গোড়া হিন্দু আমি খুব কম দেখিয়াছি। আন্তর্জ্জাতিক থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির তিনি ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং কলিকাতার সোসাইটির ছিলেন প্রেসিডেণ্ট।

বাঙ্গলার থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির কাজের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। সম্পাদক সুকুমার মিত্র তাঁহার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। ময়মনসিংহে হীরেন্দ্রনাথ আমায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন :—

"বঙ্কিমবাবুর ধারণা ছিল গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তীকালের যোজনা—বিশ্বরূপ দর্শনে গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারও কি সেই বিশ্বাস?"

তিনি উত্তর করেন—

"আমারও মনে হয় বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। তবে পূর্ব্বদিকের কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হয়েছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার একবার সাক্ষাতের সময় যে কথা হয়, কথাপ্রসঙ্গে হীরেন্দ্রবাবু তাহাও বলেন। তিনি বলেন—

"বঙ্কিম বাবু জানিতে পারিলেন যে আমি ওকালতি আরম্ভ করিব, বঙ্কিমবাবু আমাকে বলেন—

"হীরেন্দ্রবাবু, তা হ'লে আমরা আপনাকে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে হারাব।"

আমি (হীরেনবাবু)—কেন? আমিতো সাহিত্য-চর্চ্চা কিছুতেই ছাড়বো না।

বঙ্কিমবাবু—"আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে Law কিরূপ Exacting mistress. বিশেষতঃ যে উকীলের সাহিত্য চর্চ্চারূপ দুর্ণাম রটে, মক্কেল তাকে দূর থেকে পরিহার করে।"

হীরেন বাবু আমাকে বলিলেন, "এতে আমি মনে

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, তবে এই পোনের বছর থেকে আমি তো উভয় কুলই বজায় রেখেছি।"

বস্তুতঃ হীরেনবাবু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত উভয় কুলই বজায় রাখিয়াছিলেন। তাই বোধ হয় প্রতিভাবান এটর্নি হইয়াও গিরিশচন্দ্রের 'উকীল কি চিজ' সাব্যস্ত হন নাই, আর অপর দিকে প্রথিতযশা সাহিত্যিক হইলেও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষাগুরু হইবার যে প্রতিভা ছিল, তাহারও সম্যক বিকাশ হইবার সুযোগ হয় নাই। দুইটিরই যে কোনটি হইতে পারিতেন। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং অনুদ্বেলিত মুখমণ্ডল (যদিও অন্তর ছিল বিশুদ্ধ) ছিল প্রথমটির অস্ত্রস্বরূপ এবং দ্বিতীয়টিরজন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রচনা-দক্ষতা ও বিচারশক্তি—সব কয়টি গুণই তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। যাহাহউক হীরেন্দ্র বাবু কলিকাতা ফিরিলেন এবং ইহার পরে আমি হীরেন্দ্র বাবুকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম, তিনিও উত্তর দিতেন।

এক বৎসর মধ্যে আমার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। মহাকালী পাঠশালা ছাড়িয়া, ময়মনসিংহ ছাড়িয়া, সেখানে ওকালতি করিব না স্থির করিয়া ঢাকা আসিয়া আইন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রধান কৌঁসিলি নিযুক্ত করিবার জন্য ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিলাম। এই প্রসঙ্গে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ পি, মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া হীরেনবাবুর চেম্বার্সে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। এইচ, এন, দত্ত এণ্ড কোঃ টেম্পল চেম্বার্সে প্রকাণ্ড এটর্নি আফিস। তিনি আমাকে চিত্তবাবুর সুহৃদ এটর্নি কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। এবং আমার কথাগুলি তাহাকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝাইয়া বলেন—

"পুলিনবাবু দণ্ডিত হ'লে তাকে কেন্দ্র ক'রে পূর্ব্ব বাঙ্গলার বহুলোককে পুলিশ নিগৃহীত ক'রবে।" অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা পুলিন বাবুই ছিলেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রথম ও প্রধান আসামী।

অতঃপরে কুমার বাবুর সঙ্গে যে সমস্ত কথা হয়, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিধায় আর অগ্রসর হইলাম না।

হীরেন্দ্রবাবু কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "এইখান (এই আপিস) থেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনেক কাজ করি।"

অতঃপরে আবার আমি ঢাকা ছাড়িয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে পাকাপাকি ভাবে কলিকাতায় থাকিতে আরম্ভ করি। মাঝে মাঝে আলিপুর জজকোর্টে হীরেন বাবুর সাক্ষাৎ লাভ করিতাম। অন্যতম উকীল শ্রীশ বিশ্বাসকে (যাহাকে লোকে লর্ড বিশ্বাস বলিত) তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াছি। হাইকোর্টে নির্ম্মলকান্ত রায়ের মোকদ্দমার সময়েও নর্টন সাহেবকে সহায়তা করিতে দেখিয়াছি।

১৯১৩, ডিসেম্বর মাস। কলিকাতা হইতে প্রায় দুইশত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত করিতে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। এক-খানি স্পেশাল ট্রেণ করা হয় এবং আলিপুরের প্রায় ৫০ জন উকীলও সহযাত্রী হন, তাহাদের মধ্যে দুই একজন এই অভিযানে পাণ্ডা ছিল। সেই ট্রেণে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহযাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ষ্টেসনে না দেখিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আসিয়া সভায় না দেখিয়া আরও বিস্মিত হন। কিছুক্ষণ পরে স্যার জগদীশ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসেন। তিনি পট্টবস্ত্র পরিহিত ছিলেন এবং উপবিষ্ট হইলে হীরেন্দ্র নাথই অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর সেই জনমণ্ডলীকে যে ব্যথা দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। এইখানে সেই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে হীরেন্দ্রনাথকে এই কারণে কোনরূপ বিচলিত দেখি নাই।

শান্তিনিকেতন হইতে যে মিঠাই মোণ্ডা রাস্তায় দেওয়া হয়, তাহা সকলেই কোলাহল করিয়া উপভোগ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাহাতে হীরেন্দ্রবাবু বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এই

বৎসর হইতেই স্থির হয়, একজন মূল সভাপতি থাকিবেন এবং সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার ভিন্ন ভিন্ন সভাপতি থাকিবেন। তিনি দর্শন-বিভাগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১৯০৭খ্রীঃ বহরমপুরে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে প্রথম অধিবেশন হয়, সেই সময় হইতে কোন সম্মেলনই তিনি বাদ দেন নাই। ১৯১১তে ময়মনসিংহেও তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

১৯১৬ ও ১৯১৭তে টাউনহলে কংগ্রেস সংক্রান্ত জাতীয় সভায় হীরেন্দ্র বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি। বক্তৃতা বেশ মধুর, ঘটনাসম্বলিত এবং ওজস্বিনীপূর্ণ হইত। তিনি জাতীয় দলভুক্তই ছিলেন। রাজনীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম্ম সব দিকেই তাঁহার পারদর্শিতা ছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয় কলিকাতা নগরীতে। মিসেস অ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রী করা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের দলের সহিত জাতীয় দলের বিশেষ সংঘর্ষ হয়। একে হীরেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী, উপরন্তু মিসেস বেশান্তের উপর ধর্ম্মনেত্রী হিসাবে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। মিসেস বেশান্তও তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহাকে নিয়াছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্যের জন্ত বরাবরই চেষ্টা করিতেন। এবারকার অধিবেশনেও আন্তরিকতার সহিতই যোগদান করেন।

১৯১৭ সালের ৩০শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভা আহুত হইয়াছে। বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ২৫৲ টাকা চাঁদা ও ক্রীড্ (সভ্য হইবার সর্ত্ত) সহি করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর দল প্রমাদ গণিলেন, যেহেতু তাঁহারা বেশান্তকে সভানেত্রী না করিয়া মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সেদিন সভায় প্রায় তিনশত সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়। গত দিনের কার্য্যাবলী (Proceedings) পঠিত হইলে দেখা গেল—

"যিনি ২৫৲ টাকা ফি দিবেন, একজন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর একজন কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবেন, তিনিই সভ্য হইতে পারিবেন।"

তখন টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় আপত্তি করিয়া বলেন—

"কেবল ২৫৲ টাকা ফি, ক্রীড্ সহি ক'র্লেই সভ্য হবেন এরূপ কথাই ছিল, প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হবার কথা তো ছিল না। সুরেন্দ্রবাবু সেদিন সভাপতি ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবেন।"

সুরেন্দ্রনাথ—"আমার স্মরণ নাই, (কিছুক্ষণ পরে) আমি যতীন্দ্রবাবুকে সমর্থন ক'র্তে পার্‌লাম না।"

হীরেনবাবু উঠিয়া বলেন—

"এইরূপ কথাই ছিল, যাঁরা সভায় ছিলেন তাঁরা কিছুতেই এই সত্য অস্বীকার করতে পারবেন না।"

"I challenge any one present at the meeting honestly to contradict me."

সুরেন্দ্রবাবু—This is no place for honest men—You are not right.

তখন সভায় তুমুল গোলমাল সুরু হয়, কেহ বলেন, dishonest বলা হয়েছে, কেহ বলেন, ঠিক কথা বলা হয়েছে, কেহ বলেন, ঠিক কথার কদর্থ করা হচ্ছে।

গোলমালে সভা সেদিন বন্ধ হয়, এবং ষ্টেজে সেই গোলমাল বিশেষ দানা বাধে। কিন্তু পরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের চেষ্টায় উভয় পক্ষেই মিটমাট হইয়া যায়। মিসেস বেশান্তই সভানেত্রী পদে বহাল থাকেন।

সেবার কলিকাতায় খুব জোর অধিবেশন হইয়াছিল। মিসেস বেশান্তের অভিভাষণও খুব হৃদয়গ্রাহী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। হীরেন্দ্রবাবু উক্ত অভিভাষণের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দেন।

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি তখন রাজনীতি মতবাদে একই দলভুক্ত ছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে (১৯১৮) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রচিত শাসন সংস্কারের খসরা প্রকাশিত হয়। ১১ই জুলাই, ১৯১৮,

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে এক জরুরী অধিবেশন হয়। এই সভায় চিত্তরঞ্জন, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আমিও এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন—

"অমৃতবাজার কাগজে এই ধস্‌রায় প্রকাশিত শাসন-সংস্কারের দোষ-গুণ আলোচনা ক'রেছি। আপনি এ-গুলো দেখ্‌বেন।"

সেইগুলি পড়িয়া আমি ভাবী শাসন-সংস্কারের দোষ-গুণ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলাম। স্বভাবতঃই হীরেন্দ্র বাবুর যুক্তি বেশ প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ছিল।

তিনি যখন তর্ক করিতেন, তাঁহার যুক্তিতে কোনরূপ আবেগ বা উচ্ছাস দেখি নাই। এদিকে আবার সত্যকথা স্পষ্টভাবে বলিবার সাহস তাঁহার ছিল। এই সময়ে হীরেন্দ্রনাথ অগ্রগামী দলের প্রচার কার্য্যেও নানাস্থানে যান। একবার নিশীথবাবু ও এন, সি, সেন সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেন মহাশয় আসিয়া ভারী প্রশংসা করেন। তবে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও সাহিত্য চর্চায় কোনরূপ ব্যাঘাত হইত না।

১৩২৪-এর ফাল্গুন মাসে ঢাকা সহরে সাহিত্য সম্মেলনীর অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সভাপতি হইবেন স্থির ছিল স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কিন্তু তিনি অসুখে বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন। তাই চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় হীরেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করেন। কিন্তু হীরেন্দ্রবাবু উত্তর করেন—

"বলেন কি? রামেন্দ্রবাবুর স্থলে আমি? আমাকে ছেড়ে দিন।"

কবি চিত্তরঞ্জন—তা হবে না, তৈয়ার হৌন—

(পরে গৈরিশী ভাষায়)—অতি দ্রুত—অতি দ্রুত যাও বীর—

হীরেন্দ্রনাথ—কিন্তু আমি তো আপনার মত বীর নই —ধীর পাদক্ষেপই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের কাছে কোন আপত্তি টিঁকিল না। রওনা হইতে হইল। অভিভাষণ বড় চমৎকার হইয়াছিল—শেষ কথাগুলি এখনও কাণে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

"রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজী অথবা হিন্দী কিংবা হয় তো উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাঙ্গলারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজী অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভাব, অভাব, অনুসন্ধান আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গলাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গলাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সম্বিৎ-ধারা গঙ্গার ন্যায় উত্তুঙ্গ, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম ঘনরাম যে ভাষায় পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কান্তকবি যাহার ধর্ম্মসঙ্গীত রচয়িতা, যে ভাষায় অবসাদ সময়েও ভরতচন্দ্রের মত কবি, দাশু রায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে ভাষায় মধুসূদন কম্বুনাদে মেঘনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র উদাত্ত স্বরে বৃত্রসংহার গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিয়াছেন; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রমেশচন্দ্রের 'শত-বর্ষ' আছে, যে ভাষায় দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকবি, যে ভাষায় রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র গদ্যলেখক, যে ভাষায় হরপ্রসাদ, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার, নগেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র ইতিহাস রচয়িতা, যে ভাষায় কালীবর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, চন্দ্রকান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবান্বিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না

মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজেয়, অমর, অক্ষয়, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

"আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—জয় বঙ্গবাণীর জয়।"

ইহার পরে ১৯২৩ পর্য্যন্ত হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবার অবসর হয় নাই। ১৯২৪এর প্রথম দিকে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বনাম সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষে আবার সম্মুখীন হই, কিন্তু এবার বিপক্ষে। তখন হিন্দু মুসলমান চুক্তি লইয়া দেশে ভয়ঙ্কর বাদানুবাদ উত্থিত হয়, কিন্তু দেশবন্ধু সকলকেই ইহার উপযোগিতা বুঝাইতে সমর্থ হন। ভবানীপুরের হরিশ-পার্কে এই সময়ে আমার উদ্যোগে নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে ঘন ঘন সভা হয়। মনে আছে একটী সভায় হীরেন্দ্রবাবু, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ও সত্যচরণ শাস্ত্রী উক্ত চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে হীরেন্দ্রবাবুর উপর দূর হইতে একটু অশিষ্ট আচরণের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিতে সমর্থ হই। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভায় আসিতেই আলোচনা খুব সরস হয়। দেশবন্ধু এবং হীরেন্দ্রনাথ উভয়েই বক্তৃতা দেন। দুই পণ্ডিতের তর্ক খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবুর সহিত দেশবন্ধুর দলের ঘোরতর মতভেদ ছিল।

ইহার পর দেখা হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে যে একটি বিরাট সভা হয়, তাহাতে তিনিই পৌরোহিত্য করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অনুষ্ঠান হয় বেলুড়মঠে, ১৯২৪ সালে হয় মনোমোহন থিয়েটারে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে। এবার হইল ষ্টার থিয়েটারে। সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, নাট্যাচার্য্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মন্মথমোহন বসু প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। আমিও অন্যতম বক্তা ছিলাম এবং হীরেন্দ্রবাবু আমার অভি-ভাষণের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইল হরিশপার্কের সভার যে একটু মতভেদ জনিত তিক্ততা'র সৃষ্টি হইয়াছিল, অতঃপর তিনি আর আমার প্রতি অপ্রসন্ন নহেন। সভায় সঙ্গীতাচার্য্য দিলীপ রায় মহাশয় গিরিশ-সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে যে অদ্ভুত সমালোচনা শুনিয়াছিলাম, তাহা দুর্লভ মনে হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক চরিত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের জনা, তপোবল, নলদময়ন্তী, সিরাজদৌলা প্রভৃতি নাটকের বিদূষক, সদানন্দ ও করিম চাচার তুলনা করিয়া যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তির পরিচয় দেন, তাহা শতমুখে প্রশংসার যোগ্য। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকের এরূপ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উচ্চাঙ্গের সমালোচনা আমি ইহার পূর্ব্বে বা পরে কখনও শুনি নাই।

ইহার দুই মাস পরে মহাত্মাজী দেশবন্ধুর ভবানীপুরস্থ বাটীতে (১৪৮ রসা রোডে) প্রায় মাসখানেক ছিলেন। দেশবন্ধু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এবং নিজ শ্রদ্ধা বশতঃ আমি তখন মহাত্মার সেবার্থে কিছু কাজ করিতাম। সকাল বেলা যাঁহারা আসিতেন, সাক্ষাৎ করাইয়া দিতাম, আর বৈকালে তাঁহার সহিত সভাসমিতিতে যাইতাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। হীরেন্দ্র বাবু তখন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। তাঁহাকে মহাত্মাজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করাইয়া দিতে (introduce) আমার সৌভাগ্য হয়। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু তাঁহার গ্রন্থ গুলির সবিশেষ পরিচয় দেন।

ইহার পরে কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের এক স্মৃতি সভায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে উপস্থিত হই। সভাপতি হন সাহিত্যাচার্য্য দীনেশ সেন মহাশয়। তখন সাইমন কমিসন রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সনটা বোধ হয় ১৯২৯।৩০ হইবে। হীরেন্দ্রনাথ ফেডারেসনের উল্লেখ করিয়া নবীন সেনের দূরদর্শিতা দেখান যে, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে এইরূপ জাতিসঙ্ঘের কথা উল্লিখিত আছে।

ইহার পরে অনেকদিন আর দেখা হয় না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বোধহয় মার্চ্চ মাসে, একদিন অপরাহ্নে তিনি চাঁদপাল ঘাটে বেড়াইতেছেন। দেখা হইতেই একসঙ্গে

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার উপরে একত্র বেড়াইলাম। তিনি বলেন—

"শরীর বেশী ভাল নেই, তবে আমি এইখানে রোজ বেড়াই।"

কথায় কথায় আমি বলিলাম—

"আপনি তো প্রথম গিরিশ-লেকচারার হ'লেন, গিরিশবাবু সম্বন্ধে অনেক নূতন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা আমরা জান্‌তে পারবো।"

তিনি উত্তর করেন—

"আমার শরীর ভাল নয় ব'লে আমি ও পদটি গ্রহণ ক'রবো না। তবে এই পদতো আপনারই পাওয়া উচিত, আপনি অনেক দিন থেকে চর্চ্চা কচ্ছেন, আপনারই হওয়া উচিৎ।"

এই বিষয়ে আমার বলিবার কিছু ছিল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ স্মৃতি সাব কমিটিতে শ্যামাপ্রসাদ বাবুই আমার নাম প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমালোচক বিপিন পাল মহাশয়ের নাম হইতেই তিনি নীরব হইয়া যান। বিপিন বাবু অনেক দূর লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্তির পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হীরেন্দ্র বাবুও ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার মাসখানেকের মধ্যে খবর পাইলাম যে, প্রথম গিরিশ লেকচারার হওয়ার সৌভাগ্য আমারই হইবে।

ইহার পরে হীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার দেখা না হইলেও কোন একটা নূতন কিছু লিখিলেই আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতাম। তিনিও দুই একখানি বই আমাকে পাঠাইয়াছেন। একবার একখানা পত্রে লিখিলেন, "রসাভাস কথাটি সংস্কৃত শাস্ত্রে উপহাসার্থে ব্যবহৃত হয়।" এইরূপ কিছু লিখিয়া থাকিবেন। আমি অক্ষয় সরকার মহাশয়ের একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া কৈফিয়ত দিয়াছিলাম, তারপরে এবিষয়ে আর কথা হয় নাই। বোধহয় আমারই ভুল হইয়া থাকিবে।

চাঁদপাল ঘাটে যেদিন কথাবার্ত্তা হয়, আমি দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলাম। তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে দেশবন্ধুর প্রতি তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ছিল দেখিতে পাই এবং তাহাই ছিল স্বাভাবিক।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে, ১৩৪৩ সালের ৯ই ১০ই, ১১ই ফাল্গুন চন্দননগরে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ "জাহ্নবী নিবাস" নামক বাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। ইহার পরে আর কোথাও অধিবেশন হয় নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল ভবানীপুরে, এই সম্মিলনের মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হীরেন্দ্র বাবু। তাঁহার অভিভাষণ খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল, তিনি বেদ হইতেও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সভা উদ্বোধন করিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি অভিভাষণে হীরেন্দ্র বাবুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এবং অনেক দিন হইতেই (অন্ততঃ ৩০।৩৫ বৎসর) তাহার প্রতি ঐরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহাও বলেন। সভা বিশেষ জনকোলাহলপূর্ণ ছিল। নিকটে বসিয়া অভিভাষণ শুনিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল।*

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি এইখানে উল্লেখ করিলাম। উদ্বোধন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি সারগর্ভ অভিভাষণ দিয়া হীরেন বাবু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি কথা বলিয়া শেষ করেন—

"এই উপলক্ষ্যে আমি আর একটি কথা ব'লে রাখি। একটা সময় ছিল মাঝখানে, যখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন চলছিল, সেই সময়ের কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে; তখন বাহিরের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল, সেই সময় আমি যখন বক্তৃতা করতাম, তখন বাঁধা সভাপতি আমাদের দেশে অনেক ছিল। যদি কোন সুযোগে হীরেন্দ্র বাবুকে আমি সভাপতি করতে পারতাম, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। সেদিনকার কথা স্মরণ করে, আমি ওঁকে আমার অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

এই অধিবেশন হয় ১৩৪৩এর ৯ই ফাল্গুন (১৯৩৭, ফেব্রুয়ারী ২০শে), ভবানীপুরে হইবার সাত বৎসর পরেই হয়, তারপর একেবারে বন্ধ। সচিবরা যদি না করেন

* রবীন্দ্রনাথের হুবহু কথাগুলি হরিহর বাবু যত্ন করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তবে বৃদ্ধ সভাপতি কি করিবেন? এই শেষ অধিবেশন বড় জমকালো রকম হইয়াছিল। অভ্যর্থনাও খুব সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল। লুচি মাংস তরকারী মিষ্টি প্রভৃতি জলখাবার ছিল। অভ্যর্থনা সমিতি যত্নের কোন রূপ ত্রুটি করেন নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ। তিনিও হীরেন্দ্রনাথের অমায়িক ব্যবহার ও নিরহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতেই তাহার ব্যবস্থা হয়। পরিষদে কমলাকান্তের জবানবন্দীর অভিনয়ও হইয়াছিল। হীরেন্দ্রবাবু তখনও উক্ত পরিষদের সভাপতি। আর বঙ্কিম সম্বন্ধেও তিনি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বিশেষজ্ঞ। তাই তাঁহাকে অনেক স্থানে অভিভাষণ দিতে হইয়াছিল।

ইহার মাস ছ'য়েক পরে 'বঙ্গশ্রী'তে আমি "বঙ্কিম ও মুসলমান" নামে একটা প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি বাহির হইলেই বঙ্গশ্রী পাঠাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখি। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তিনি এতই খুশী হন যে, আমাকে তৎক্ষণাৎ নিম্ন পত্রখানি লেখেন—

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, *
কলিকাতা, ২৯।১।৩৯

কল্যাণবরেষু—

আপনার ২২শে তারিখের পত্রসহ 'বঙ্গশ্রীতে' প্রকাশিত 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধ পাইয়াছি। প্রবন্ধটী পড়িলাম। বেশ ভাল লাগিল। 'প্রচারে' প্রকাশিত সীতারামের এই অংশের কথা সাধারণে ভুলিয়া গিয়াছে, আমারও স্মরণ ছিল না, অথচ এ অংশটী বেশী দরকারী। এ প্রসঙ্গে 'রাজসিংহের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটা Critical সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। এখন দুইখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। সীতারাম এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সীতারাম মুদ্রণকালে সম্পাদকদিগের আপনার এই 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধটি দেখা উচিত। সেই জন্ম তাঁহাদের কাছে প্রবন্ধটি পাঠাইয়া দিলাম।

আমার মানসিক কুশল—আশাকরি আপনি বেশ সুস্থ আছেন।

শুভার্থী—
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটিতে শ্রীযুক্ত কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় তিনদিবস ব্যাপী বঙ্কিম স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন করেন, তাহাতেও হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণ অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অনেকের কাছে আমার "বঙ্কিম ও মুসলমান" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আর বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে তিনি যে বঙ্কিম-স্মৃতি লেখেন এবং যাহা ঢাকা বঙ্কিম শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি বঙ্কিমের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্বন্ধেও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি লেখেন—

"১২৯১ সালে শ্রাবণের প্রচারে প্রকাশিত সীতারামের একাংশ—যাহা সীতারামের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই—তৎপ্রতি সুলেখক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি "বঙ্গশ্রীতে" আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। দেখা যায় চাঁদশা ফকিরের প্রমুখাৎ বঙ্কিম চন্দ্র সীতারামকে বলিতেছেন—"

[হীরেন্দ্রনাথ প্রণীত 'দার্শনিক বঙ্কিম' পৃঃ ২৩৩

এই বলিয়া সমগ্র প্রবন্ধটি তিনি উদ্ধৃত করেন। কেবল তাহাই নয়। আমাকে উপহারস্বরূপ একখানি পুস্তকও নিজের নাম সহি করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে এতটা আগ্রহের কারণ—বঙ্কিমের ন্যায় জাতীয়তার স্রষ্টা ঋষি জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্বেষী হইতে পারেন না, তাহাই দেখাইবার জন্ম তিনি উত্তরে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার পরে বঙ্গশ্রীতে 'রবির পেছনে একটি ছায়া' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও তিনি আমাকে পত্রে উৎসাহিত করেন। এবং উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'মুখ্য' কথাটি যে ভাবে বলিয়াছিলেন তাহাও আমাকে লেখেন।

* দত্ত পরিবার ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চোরবাগান হইতে এই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এই বৎসরেই জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের অনুরোধে আমি যাদবপুরে National Council of Education-এর ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হই। হীরেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। ইদানীং অসুস্থতানিবন্ধন প্রেসিডেণ্ট স্তর পি, সি, রায় কচিৎ আসিতে পারিতেন, তাই হীরেন্দ্রনাথকেই সভাপতিত্ব করিতে হইত। ৩৫ বৎসর একভাবে এই খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করিবার অধিকারী রহিয়াছেন দেখিয়া ভারী আনন্দ হইল। ইনি এবং সত্যানন্দ বসু মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই সামান্ত Technical Institute এখন ভারতের একটী বিশিষ্ট পূর্ত মহাবিদ্যালয়। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোরের পাঁচ লক্ষ টাকা দান, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের আড়াই লক্ষ টাকা, রাজা সুবোধ মল্লিকের লক্ষ টাকা, ভবানীপুরের গোপাল সিংহের এক লক্ষ টাকা, স্তর তারক পালিতের এক লক্ষ টাকা, এবং স্তর রাসবিহারী ঘোষের বার লক্ষ টাকা ব্যতীতও অনেক দানের তালিকা আছে।

হীরেন্দ্রনাথ অনেক বই লিখিয়াছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন, আবার গীতা এবং বৈষ্ণব গ্রন্থও খুব আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম দিতেছি—

(১) গীতায় ঈশ্বরবাদ, (২) উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব), (৩) বেদান্ত পরিচয়, (৪) কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, (৫) অবতার তত্ত্ব, (৬) যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ, (৭) বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, (৮) রাসলীলা, (৯) মেঘদূত, (১০) প্রেমধর্ম্ম, (১১) সাক্ষাৎ পরিচয়, (১২) বুদ্ধি ও বোধি, (১৩) দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—

বেদান্ত ও বিজ্ঞান, বিশ্বতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব এই বই দুইখানি তৈয়ার ছিল কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই।

ইংরাজীতেও দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বহি আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কমলা লেকচারার করিয়াছিলেন এবং জগত্তারিণী মেডেল দিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও সাহিত্যানুরাগের তুলনায় তাঁহাকে আরও সম্মান দেওয়া উচিত ছিল। ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহার সহিত বরাবর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ কলিকাতার বিশিষ্ট কায়স্থ, চোরবাগান দত্ত পরিবারের ছেলে, নিজে এটর্নি, এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাহাতে আমি কখনও কোনরূপ অহঙ্কার বা দম্ভ লক্ষ্য করি নাই। প্রকৃত কালচার ভারতীয়দের খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু হীরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা বিশিষ্টভাবে অনুভব করিয়াছি। ধর্ম্মানুরাগ, দেশপ্রীতি, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, নিরহঙ্কার সমস্ত গুণই তাঁহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও রঙ্গাধ্যক্ষ স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তাহার কনিষ্ঠ সহোদর। থিয়েটারে এরূপ দানশীল ব্যক্তি কম ছিলেন। বংশের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবে এইটুকু উল্লেখ করিলাম।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসু যিনি গিরিশপ্রতিভা প্রণয়ণে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন—তিনি হীরেন্দ্রনাথের মাতুল ছিলেন—মায়ের আপন জ্যাঠতুত কি খুড়তুত ভাই। সেখানেও হীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং তাহাতে শ্রদ্ধাই বাড়িয়াছে। হীরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র হরীন্দ্রনাথকেও দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি। ইনিও একজন সাহিত্যিক। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথও সাহিত্যিক, তৃতীয় রণেন্দ্র, চতুর্থ সৌরেন্দ্র উদীয়মান এটর্নি।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দুই-এক দিন দেখা হইয়াছিল। তখন দেশে ভয়ানক হুলস্থূল। একে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, তার প্রের মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—সমস্ত জগৎ নানাভাবে তখন বিশেষ ভাবে আন্দোলিত। বাঙ্গলায়ও বিশেষ গোলযোগ। হঠাৎ একদিন শুনিলাম হীরেন্দ্রনাথ আর ইহ-সংসারে নাই। সময়টা ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি—১৩ই। বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর তিরোধান হইল। একজন শুভানুধ্যায়ী হিতৈষীর বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিলাম।

দেশবাসীর নিকট আমার এই জিজ্ঞাস্য, কংগ্রেস কনফারেন্সের সহিত সম্পর্ক ব্যতীতই এত বড় তিনটা গঠনমূলক সংস্কৃতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ এবং থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার প্রতি আমরা কতটুকু সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি?

আজ আট বৎসর পরে জাতীয় ঋণ পরিশোধার্থে আমার ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলিতে এই অকিঞ্চিৎকর শ্রদ্ধার্ঘ্যটুকু অর্পণ করিলাম—হে আকাশস্থ নিরবলম্ব মনীষী, এই সামান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু কি তোমার বিন্দুমাত্র শক্তি প্রদানেও সমর্থ হইবে?

চণ্ডুলা তালাও

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

চণ্ডুলা তালাও, প্রাচীন আমলের একটা প্রকাণ্ড দিঘী, জনপদের একেবারে বহিঃপ্রান্তে। মিউনিসিপ্যালিটির সীমা ছাড়িয়েও অনেকটা দূর যেতে হয়। হয়তো এই দিঘীর পেছনে আছে কোন ঐতিহাসিক রহস্য, কিন্তু তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তার কারণ, আমি নিজেই জানিনে ওবিষয়ে কিছু। ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়েছিলুম সাইকেল নিয়ে একা-একাই, ওটা আমার স্বভাব। ফাঁক পেলেই ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, বলা যেতে পারে আমার সেকেণ্ড নেচার। বর্ষাকাল, সে কথাটা মনে করেই ব্যাকিন্‌টস্‌টা বেঁধে নিয়েছিলুম ক্যারিয়ারে। রায়পুর গেটের পাশ ঘেঁসে সোজা বেরিয়ে গেলুম দক্ষিণ মুখো। ক্রমে ক্রমে ছাড়ালুম লোকালয় এবং সহরের জনকোলাহল। ফাঁকা পালিশ করা রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল ছুটিয়ে দিলুম মনের আনন্দে। হাওয়ার সাথে চাকার শলাগুলোর সংঘর্ষণে শাঁ শাঁ করে একটানা শব্দ হতে লাগল। তাতে যেন মনের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আরও জোরে জোরে প্যাডল্ চালাতে লাগলুম।

রাস্তার দু'পাশে শ্রেণীবদ্ধ তরুশ্রেণী সুবিন্যস্ত, তার পরেই অবারিত উন্মুক্ত প্রান্তর,—সুশ্যামল। কাঁচা সবুজের তাজা রং-এ ধরিত্রী যেন সজীব ও তরুণ হয়ে উঠেছে। সহসা মনে হয় না যে, বাংলা দেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে গুজরাটে রয়েছি। মনে হয় বুঝি বাংলা দেশেরই এক পল্লীগ্রামের ভেতরে বেরিয়েছি ভ্রমণে। ক্যালিকো মিল্-এর ঐ পাশটা দিয়ে নিয়েছে বোধ হয় সবরমতী বাঁক। তারই পারে পারে রূপালী রং করা উঁচু লোহার মাস্তুলগুলো, অস্ত-রবির সোনালী আলোতে ঝিকমিক করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঘ জমে উঠছে ধীরে ধীরে। আমি চলছি সামনের দিকে এগিয়ে শাঁই শাঁই করে। নগর প্রান্তে পুলিশচৌকি ছাড়িয়ে চালু পথ ধরলুম। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলুম একটা প্রকাণ্ড ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, প্রাচীনকালের সাক্ষী। তার বিরাট চত্বর সুবিশাল প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। মাঝে মাঝে ধ্বসে গেছে সে-প্রাচীর। কিন্তু প্রবেশ এবং নির্গমনের পথে এখনও রয়েছে বিরাট তোরণদ্বার। তার স্তম্ভগুলো অনেকটা মিনারের আকৃতি। মুসলমান আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এগুলো, তা সহজেই বোঝা যায়।

প্রাসাদ ছাড়াতেই পাওয়া গেল সেই চণ্ডুলা তালাও; যাকে লক্ষ্য করে এতোদূরে আসা। বিপুল সে দিঘী। লোকালয়হীন সবুজ প্রান্তরের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকলে দৃষ্টি গিয়ে ঠেকে দিগন্তের সীমায়। কিন্তু সে-অনুপাতে জল তাতে অল্পই। গ্রীষ্মের উত্তাপ শেষ বিন্দু পর্যন্ত শোষণ করে নিয়েছিল। বর্ষার আগমনে সামান্য সামান্য জল হয়েছে এখানে সেখানে, কিন্তু সেই বিরাট খাদের বাকি অংশটুকু নবতৃণদলের সবুজ সমারোহে সমাকীর্ণ। সহরের বাইরে এতো দূরে কৌতূহলী যাত্রী আসে না বড় একটা কেউ। আমি ছাড়া ছিল আরও দু'চারজন দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া। চুপচাপ কিছুক্ষণ থাকলুম দাঁড়িয়ে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মেঘটা যেন ক্রমেই ঘন নিবিড় হয়ে উঠছে। সঙ্গে বর্ষাতি রয়েছে যদিও, কিন্তু তার ভরসা করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো না। যেমন ঘন কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে চেপে আসছে ধীরে ধীরে, তাতে যে বিপুল এক-পশলা বৃষ্টি শীঘ্রই থেয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। আর তার বেগকে সামান্য ঐ বর্ষাতি রুখবে সাধ্য কী তার! ভাবছিলুম দিঘীর পার ছেড়ে অদূরের ঐ ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যেই আশ্রয় নেবো।

এমন সময় দেখা হলো একজন যাত্রীর সঙ্গে, মনে হলো এই দেশেরই বাসিন্দা। তাকে জিজ্ঞেস করলুম,

তাই বলতে পারো এই দিঘী কে খনন্ করিয়েছিলেন; এবং ঐ ভগ্ন প্রাসাদটাই বা কার আমলের?—আমার কথা শুনে লোকটা রীতিমত অবাক হলো, যেন এমন ছেলেমানুষি প্রশ্ন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে আশাই করা যায় না। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ দুটো ছানাবড়া করে বল্‌ল—তাই তো।—বুঝলুম সময় নষ্ট করা বৃথা। ওদিকে দূরের গাছপালা ঝাপসা হয়ে এসেছে, বৃষ্টি নেমেছে সেখানে নিবিড় হয়ে; সময় নষ্ট না করে পড়ো প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলুম। পথে দেখা হলো একজন মাঝ বয়েসী লোকের সঙ্গে। তাঁর বেশভূষা দেখে মনে হলো, আমরা যাঁদের ভদ্রলোক বলি তিনি তাঁদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরিচ্ছন্ন মিহি ধুতির ওপর সাদা ধবধবে গুজরাটী কোট, পায়ে 'বাটা' কোম্পানীর বহু বিজ্ঞাপিত জল-প্রতিরোধক জুতো। হাতে কনুই-এর সঙ্গে লটকানো বর্ষাতি (অর্থাৎ বৃষ্টি নামলেই ওটাকে খুলে গায় দেয়া চলবে), মাথায় তাঁর ছাতা। তাঁকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলুম—আজ্ঞে বলতে পারেন, এই প্রাচীন অট্টালিকার ঐতিহাসিক পরিচয় কিছু?—তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে একটু নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিলেন, সাহ আলমের দরগা।—তার পর চলে গেলেন নিজের পথ ধরে। "সাহ আলমের দরগা", ব্যাস্‌ ঐটুকুই যেন শেষ জবাব। আর যেন বলবার কিছুই নেই।

মনে মনে একটু নৈরাশ্য এবং বিরক্তি বোধ করলুম। ততক্ষণে সেই প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদের প্রধান তোরণের সামনাসামনি এসে পড়েছি। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে করতে ভাবছিলুম এদেশের জনসাধারণের কথা। ব্যবসাক্ষেত্রে এরা সবিশেষ উৎসাহী এবং অগ্রসর কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে এরা শোচনীয় ভাবে বিমুখ। গভীর আগ্রহে এরা প্রতিদিনের বাজারদরের সাথে পরিচয় রাখে। লাভজনক ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ এবং সন্ধানের জন্ত এরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে ঝুঁকে পড়ে। শেয়ারবাজারে গিয়ে লাখ লাখ টাকার ছিনিমিনি খেলে। মোটা বাজি রেখে সাট্টা ধরে বাজার দরের ওঠানামার ওপর। তুলোর বাজারের সর্বশেষ খবর নিউইয়র্ক থেকে পাবার জন্তে অবলীলাক্রমে টেলিগ্রাফ আপিসের দরজায় রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ধন্না দেয়। অথচ ঠিক বাসার সামনেই হয় তো বহু প্রাচীন কোন স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, কিম্বা অতীতের কোন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, অথবা কোন মন্দির কি মস্‌জিদ্‌, সে-সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তার ঐতিহাসিক পরিচয়ের কোন খবর এরা রাখে না এবং রাখবার জন্তে উৎসুকও নয়। ওরা ভাবে এ সব বাজে খবর রাখবার সার্থকতা কী। ওতে তো আর দুটো পয়সা মুনাফার সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ যদি কোন বহিরাগত আগন্তুক কৌতূহল প্রকাশ করে ঐসব ঐতিহাসিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে, ওরা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে যায়, অথবা সোজাই নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে অকুণ্ঠিত চিত্তে।

যাই হোক, প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সাথে সাথেই এলো মুষলধারে বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি প্রথমেই যে-ঘরখানা পাওয়া গেল, তার বারান্দায় সাইকেল তুলে উঠে দাঁড়ালুম বৃষ্টির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ত। সাইকেলটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে গায়ের জল ঝাড়ছিলুম। বৃষ্টির হাত থেকে একেবারে রেহাই পাওয়া যায়নি। প্রথম ঝাপটার একঝলক এসে পড়েছে গায়ের ওপর। এমন সময়ে হঠাৎ নজরে পড়লো বারান্দার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বয়সে সে তরুণী; তার সঙ্গে আছে সাত-আট বছরের একটি ছোট্ট ছেলে। দু'জনেই দু'জনের চোখের পানে পলকমাত্র চেয়ে নামিয়ে নিলুম চোখ। বোধ হয় দু'জনের চোখের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছিল বিস্ময়। কেন না, এমন অদ্ভুত জায়গায় এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে যে সাক্ষাৎকার ঘটবে, এটা যেন ঠিক সম্ভাব্যতার সীমায় অবদ্ধ নয়।

কেন যেন হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটীর মুখখানা আমার চেনা। কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। অবশেষে স্থির করলুম, ও আমার পরিচিতা নয়। ওটা আমার মনের ভ্রম এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে ওটা হয়তো আমার অবচেতন অন্তরের তরুণীসম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতা। একবার যেন মনে হলো, মেয়েটি

আমার পানে চেয়ে একটুখানি মৃদু হেসেওছিল। কিন্তু হাসি ব'লে ভাবতে সাহস হলো না। ওটাও আমার মানসিক দুর্ব্বলতা মনে ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলুম এবং একদৃষ্টে অবিশ্রান্ত বারিপতনের দিকে চেয়ে রইলুম একটা কঠোর গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে আড়াল করে। বারান্দার দুই প্রান্তে দু'জনে আমরা নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম একান্ত আগ্রহে বৃষ্টি থেমে যাবার আশায়। এই দুর্ভেদ্য মৌনতা শুধু ব্যাহত হচ্ছিল বৃষ্টিপড়ার একটানা ঝরঝর শব্দে ; আর মাঝে মাঝে ছোট ছেলেটা অনুনাসিক কণ্ঠে শুধু অনুরোধ জানাচ্ছিল—দিদি, কখন বৃষ্টি থামবে, কখন বাড়ি যাবো !

শ্রাবণের নিবিড় ধারা নেমেছে গহনঘন বরিষণে। আমি অনেকটা উদাসীন ভাবেই চেয়েছিলুম বৃষ্টির পানে। ঘনায়মান সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে মনের ওপর কেমন যেন একটা মন্থর আলস্য গাঢ় হ'য়ে এসেছিল। হয়তো পাশের ঐ অপরিচিতা তরুণীর উপস্থিতির সাথে কিছু তার সম্বন্ধ ছিল। মুট্‌হামসুন বিরচিত সেই বিখ্যাত উপন্যাস "প্যান" এর একটা দৃশ্য মনে পড়লো। এড্‌ভার্ডার সাথে লেপ্টেন্যান্ট গ্লাহনের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় বনানীর বিজন কন্দরে, সেদিনও বৃষ্টি নেমেছিল, আর তার পতনধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল তরুপল্লবের পত্রমর্ম্মরে, ওরা দু'জনেই বৃষ্টি এড়াবার জন্যে বনপথের পাশে একটা ছোট পর্ণকুটিরে আশ্রয় নিয়েছিল। এড্‌ভার্ডা আর লেপ্টেন্যান্ট গ্লাহনের সেই হলো প্রথম শুভদৃষ্টি। দৃশ্যটা মনে পড়তেই কেমন যেন একটু হাসি পেলো। কিন্তু আমার ঠোঁটের কোণে কি সেই গোপন হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম মনের হাসির প্রতিবিম্ব যাতে মুখের ওপরে ফুটে না ওঠে।

ভাবপ্রবণ মনের স্বভাবই এই। সামান্য একটু সূত্র থেকে মস্ত মস্ত অবাস্তব কল্পনার সৌধ সে গড়ে তোলে মনে মনে। লেপ্টেন্যান্ট গ্লাহন এবং এড্‌ভার্ডার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের দৃশ্যটা মনে হওয়ার সত্যি কি কোন তাৎপর্য্য ছিল ? দুটি অচেনা তরুণ তরুণী অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একই আশ্রয়ের নিচে মিলিত হয়েছি। মাত্র এইটুকুই মিল্। এডভার্ডা আর লেপ্টেন্যান্ট গ্লাহনের সঙ্গে আমাদের দু'জনের হয়তো মিল নেই জীবনের আর কোনখানেই। অথচ এই সামান্য একটু সূত্র থেকে মন তার নিজের খেয়ালে কল্পনার জাল বুনতে সুরু করলো।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটি আশ্রয়প্রার্থীর আবির্ভাব হলো সেখানে। একটি হ্যাংলা রোগা কুকুর, জলে ভিজতে ভিজতে উঠে এলো বারান্দার ওপর। টেরিয়ার স্প্যানিয়াড, অথবা আলসেশিয়ান নয়, অনাদৃত কঙ্কালসার একটি দেশী পথের কুকুর যাকে দেখলেই ভক্তি চটে যায় এবং তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করতে প্রচণ্ড প্রলোভন উপস্থিত হয়। কিন্তু মনের দুর্ব্বলতা বশতঃই হোক্, অথবা যে-কারণেই হোক্, বেচারিকে দেখে কেমন যেন মায়া হলো মনে। কুণ্ঠিত ও ভীত হয়ে সংশয়গ্রস্ত এবং শঙ্কিতভাবে ঘুরে একপাশে গুটি সুটি হয়ে দাঁড়ালো। স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে সে আমাদের কাছে আসেনি, একান্ত বিপন্ন হয়েই এসেছে; এটা ওর ব্যবহারে সুস্পষ্ট। বিড়ম্বিত জীবটাকে আর তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলুম না। থাক না হয় এক-পাশে অবহেলায়। মেয়েটাও কোন আপত্তি জানালো না তার উপস্থিতিতে। আমাদের অহিংস উপেক্ষায় বেচারা মনে মনে সাহস পেয়ে, গায়ে একটা ঝাড়া দিয়ে গোল হয়ে শুয়ে পড়লো।

এদিকে বৃষ্টি কিন্তু চলছে সমানেই। যখন সে থামলো, অন্ধকার নেমেছে বেশ গাঢ় হয়ে। মনে মনে একবার ভেবেছিলুম মেয়েটির কথা। নগরের এই উপান্তে একাকিনী ও এলোই বা কী করে আর ফিরেই বা যাবে কার সঙ্গে ? সঙ্গের ঐ শিশুটি কি অবলম্বন হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া লোকালয় এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর। একাকিনী অন্ধকারে এই জনহীন প্রান্তরটুকু কি ওর পক্ষে পার হয়ে যাওয়া খুবই সহজ কথা। পরে ভাবলুম, থাকগে ওসব পরের ভাবনা। যে একাকিনী আসতে পেরেছে, সে নিশ্চয় পারবে একাকিনী ফিরে যেতে। অযাচিত ভাবে সাত তাড়াতাড়ি সহায়তা করবার জন্যে এগিয়ে গেলে আজকালকার মেয়েরা তেমন আর শিভ্যালরাস্ মনে করে না সেটাকে। অত পশ্চাৎ নানা রকম ভেবে অবশেষে বৃষ্টি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই

নিঃশব্দে সাইকেল খানা নিয়ে নেমে পড়লুম বারান্দা থেকে এবং অকপট ভাবে সত্যি বলছি, চলে যেতেই উদ্যত হয়েছিলুম। এমন সময়ে মেয়েটিই প্রথমে কথা কইল—একেবারেই চিনতে পারলেন না বুঝি। অথচ আমার হাতের তৈরী চা খেয়ে এসেছেন এখনও একমাস হয়নি।

বিস্ময় যেন আরও বিস্ময়কর হলো। নিবিড়ভাবে এবং ক্ষীণভাবে যত আমার পরিচিতা মেয়ে ছিল, সবাইকে মনে করতে লাগলুম। এমন কি মিলিটারি ক্যান্টিনে যাদের হাতে চা-বিস্কুট-বিয়ার ককটেল, এবং কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করেছি প্রত্যেককেই একবার মনে আনতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু এ মেয়েকে যে কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। আমার মুখের হতবাক্ বিহ্বল চেহারা সহজেই আমার মনের অবস্থাকে ধরিয়ে দিয়েছিল তার চোখে। সে আবার বল্ল—কেন। আপনার বন্ধু চিনু ভাইএর বোন আমি শান্তা।

"ওয়েল, রাইট, রাইট, রাইট।" মনে পড়লো এবারে সব কথাই। সত্যিই তো, এই তো দিন বিশেক আগে মনিনগরে গিয়েছিলুম ওদের বাড়ীতে। ওর হাতের তৈরী এক কাপ চা-ও খেয়েছিলুম সে কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞের মত একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম বেমালুম ভাবে। অবিশ্যি তার কারণও ছিল। ওকে মাত্র একবারই দেখেছি, তাও খুব অল্পক্ষণের জন্য। আমাদের সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়েই সে চলে গিয়েছিল ভেতরে। এক নিমিষে দেখেছিলুম ওর মুখখানা, তাই মনে ছিল না ঠিক ভাল মত। ওকে এই ভগ্নপ্রাসাদে দেখা মাত্রই, কেন চেনা চেনা মনে হয়েছিল তার কারণ খুঁজে পেলুম এতোক্ষণে। শান্তাকে চোখে মাত্র একবার দেখলেও ওর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, ওর দাদা চিনু ভাই-এর কাছ থেকে।

তার কারণ, শান্তার জীবনে একটা বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ওর শুধু নিজের ভবিষ্যতই অনিশ্চয়তা এবং সংশয়গ্রস্ত নয়, ওদের পারিবারিক জীবনের মধ্যেও ঘোর উৎকণ্ঠা এবং অশান্তির সৃষ্টি করেছে। শান্তার বাবা এবং চিনুভাই (ওর দাদা) ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েছেন। এই সমস্যার কথা আমার কর্ণগোচর হবার প্রধান কারণ এই, চিনুভাই আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের সম্বন্ধ খুব বিশ্বস্ততার। অনেক কথাই যা সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নয়, চিনুভাই অবলীলাক্রমে বলে যায় আমাকে। এমন কি ওর ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনের কথাও অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই বলে আমার কাছে। এমন ধৈর্য্যবান এবং প্রতিবাদশূন্য শ্রোতাও বোধ হয় সে আর পায় না কোথাও।

মেয়েটি যখন পরিচয় দিল—সে চিনুভাইএর বোন শান্তা, মুহূর্ত্তে তার জীবনের সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে। ওর সাথে যে-ছেলেটির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, এমন কি বাগ্‌দান পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয়েছিল, তার নাম নবনীতলাল। বিয়ের আগে শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ সে ছেলেটা বিগড়ে বসেছে। বলছে শান্তাকে সে বিয়ে করবে না। বাগ্‌দানের পর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে, সে খুব নিন্দনীয় ব্যাপার সমাজে, ছেলের পক্ষে অবিশ্যি তেমন কিছু ক্ষতিকর নয়; কিন্তু মেয়ের পক্ষে তার ফল সাংঘাতিক হতে পারে। সে-মেয়েকে অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাইতেই তো শান্তার বাবা ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। আর চিনুভাই নিজে একালের যুবক হলেও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়নি। সামাজিক দুর্নামের ভয় সবাই-কেই করতে হয়। এবিষয়ে একাল-সেকালের মধ্যে পার্থক্য অল্প। সমাজের সমষ্টিগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগমনের ওপরেই নির্ভর করে মানুষের জীবনের ব্যক্তি-স্বাধীনতা। নিজের সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামির কথা ভেবেই চিনুভাই তার বোনের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

যাই হোক, এক মুহূর্ত্তে মেয়েটির জীবনের সমস্ত ইতিহাসটুকু মনে পড়লেও বাইরের ব্যবহারে আভাস দিলুম না তার। বিস্মিত কণ্ঠে বল্লুম—আপনি হঠাৎ এমন অপ্রস্তুতভাবে, সন্ধ্যার অন্ধকারে এতোদূরে এসে পড়লেন কী করে? বিশেষতঃ এই নিবিড় বৃষ্টির মধ্যে?

অপ্রতিভ ও সলজ্জভাবে জবাব দেয় সে,—আর বলেন কেন। এসেছিলুম বৃষ্টির আগেই, হঠাৎ বৃষ্টিটা এসেই তো বিপদে ফেলে দিল, ভাগ্যিস্ আপনার সাথে দেখা

হলো, তা নইলে এই অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টিতে একা একা কী ভয়ানক মুস্কিলেই পড়তুম বলুন তো ?—কুণ্ঠিত অসহায় দৃষ্টি তুলে সে চাইল আমার চোখের পানে। ও দৃষ্টি সবল যুবকের মনেই আনে আত্মপ্রসাদের গৌরব, বুকে জাগায় আত্মত্যাগের সাহস এবং অনুপ্রেরণা। এর পরে ওকে উপেক্ষা ক'রে সাইকেল চেপে চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। শান্তার কোন কাজে লাগতে পারলে আমি যে নিশ্চয়ই আজকের সন্ধ্যাটা সার্থক মনে করবো সে কথা বলাই বাহুল্য। মনে মনে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম ওর পরবর্ত্তী আদেশের আশায়।

শান্তা আবার বলতে লাগল—ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে এসেছিলুম গীতা-মন্দিরে রামদাস স্বামীর বক্তৃতা শুনতে। ফেরবার পথে ফিরছিলুম এই দিককার রাস্তা দিয়েই, পুলিশ চৌকির কাছাকাছি এসে রিক্সটা ছেড়ে দিলুম। ভাবলুম অনেকদিন চণ্ডুলা তালাও দেখা হয়নি, আজকে দেখে যাই। ঐতিহাসিক কীর্ত্তি দর্শন এবং ভ্রমণ এ দুটোতে আমার প্রবল নেশা (ওর শেষের কথাগুলো শুনে বিশেষ প্রীত হ'লাম। কারণ আমারও ঐ একই রোগ)। কিন্তু দেখুন ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা! এখানে এসেই ভয়ানক বৃষ্টিতে আটকে গেলুম।

ওর চোখে আবার ফুটে উঠলো সেই অসহায় দৃষ্টি; তারপর ও বল্‌ল—আপনাকে কিন্তু ছাড়ছি না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চার রাস্তার বাসষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে।—ওর কণ্ঠে একটা মধুর মিনতি ধ্বনিত হলো।

চার রাস্তার বাসষ্ট্যাণ্ড অনেক দূর। কিন্তু তার আগে যে-কোনরকম যান-বাহন পাওয়া যাবে সে রকম আশা করাই বাতুলতা। এই নির্জ্জন অঞ্চলে সাধারণ অবস্থাতেই গাড়িঘোড়া চলে খুব অল্প। তার ওপর এই ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে কেনই বা আসবে তারা!

দূরের পথ সাধারণতঃ মনে ভয় এবং ক্লান্তিই জাগায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে শুনেও বিরক্তি আসে নি আমার মনে; বরং একটু গোপন আনন্দই অনুভব করেছিলুম। একথাটা স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ না হলেও সত্যি কথাই বললুম। শান্তার কথার পিঠে জবাব দিলুম তাকে—আমাকে কি এতোই অমানুষ ভাবেন? আপনি বিপদে পড়েছেন জেনেও আপনাকে ফেলে রেখে সাইকেল চেপে আগে আগে চলে যাবো? শুধু চাররাস্তা কেন, আপনি যদি হুকুম করেন সঙ্গে করে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে আপনার সুবিধে হবে, তাতেও আমি প্রস্তুত।

কোন জবাব দিল না শান্তা। শুধু হাসলো একটু নীরবে। আমরা তিনজনেই প্রাসাদ-তোরণ থেকে বেরিয়ে ঘরে ফেরবার পথ ধরে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগলুম ধীরে ধীরে। শান্তা মাঝে, একপাশে ওর ছোট ভাই আর এক পাশে আমি, তারপরে আমার সাইকেলখানা। পথ চলতে চলতে শান্তা বলে—দাদার কাছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় আপনার পক্ষে সব রকম নিষ্ঠুরতাই সম্ভব। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি ভয়ঙ্কর উদাসীন, তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করেন নি। মেয়েদের বুঝি খুব ঘৃণার চোখে দেখেন? আর দাদার কথাই বা বলি কেন? আমি নিজে চোখেই তো দেখলুম, সারা বৃষ্টিটা দু'জনে প্রায় দাঁড়িয়ে থাকলুম পাশাপাশি, কথা বলা তো দূরের কথা, আমার পানে ফিরেও চাইলেন না একবার।

মনে মনে ভাবলুম, চিনুভাই বুঝি তার বোনের কথাই শুধু বলে আমাকে। আমার কথাও যে সে বলে তার বোনকে এ সন্দেহটা একেবারেই ছিল না আমার মনে। হঠাৎ কথাটা প্রকাশ হ'য়ে যাওয়ায় কেমন যেন একটু নার্ভাস এবং হতচকিত হ'য়ে পড়লুম। বিহ্বলতার প্রথম ধমক সামলে নিয়ে জবাব দিলুম—আপনার সাথে অযাচিত ভাবে কথা কইতে গেলে হয়তো কিছু মনে করে বসতে পারেন, এই জন্যেই কথা বলিনি। এর পেছনে আর কোন কারণ ছিল না। চিনুভাই আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে আর যে সব অভিযোগ করেছে সব মিথ্যে, বিয়ে অবিশ্যি করিনি; তার কারণ এখনও উপযুক্ত সুযোগ এবং যোগাযোগ ঘটে নি বলেই। এ ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য্য নেই এর পেছনে।

এর পরে কথা থেমে গেল উভয়পক্ষেই কিছুক্ষণের জন্য। অনেকটা নীরবেই এগোতে লাগলুম, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় দু'পক্ষই পরস্পরের সম্বন্ধে গভীর

কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য নিয়ে নানারকম জল্পনাকল্পনায় ব্যস্ত ছিলুম। বিশেষতঃ আমার নিজের মন যে সবিশেষ ঔৎসুক্যপরায়ণ হয়ে উঠেছিল, সে কথা আমি নিঃসংশয়েই বলতে পারি। সাধারণ মানুষ যারা, অর্থাৎ যারা খায়-দায় ঘুমোয়, কাজ করে এবং নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করে সন্তান-সন্ততির জন্ত ধন সম্পত্তি রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে মারা যায়, যাদের জীবনে কোন সমস্তা, রহস্ত অথবা বৈচিত্র্যের কোন গূঢ় আভাস নেই, তাদের সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ কম। কিন্তু যদি শোনা যায় কোন মানুষের জীবন ঠিক সাধারণ এবং স্বাভাবিক বাধা খাদ দিয়ে চলে না, তার ভেতরে আছে কিছু ব্যতিক্রম, কোন রহস্ত অথবা সমস্তার ইঙ্গিত, মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি। আমি জানি, শান্তার জীবনের ধারা আর পাঁচজন লক্ষ্মী-মেয়ের মত স্বাভাবিক খাদ ধরে প্রবাহিত নয়, নবনীতলালের সঙ্গে তার আসন্ন বিয়ের সম্ভাবনাটা হঠাৎ ভেঙে পড়বার উপক্রম হওয়ায় তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে একটা জটিল সমস্তা। শুধু তাই নয়, সমাজের কাছ থেকে তাকে পেতে হচ্ছে একটা ইতর সন্দেহ এবং কুৎসিৎ বিদ্রূপ। এই সমস্ত বিড়ম্বনা এবং লাঞ্ছনার আঘাতে শান্তা আর ঠিক স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ নয়, ওর কথা এতো-দিন শুধু চিনুভাই-এর কাছ থেকেই শুনেছি। কিন্তু একজন মানুষের নিজের জীবনের সমস্তা তার নিজের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া অনেক বেশি লোভনীয়। শান্তাকে কাছে পেয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সমস্ত কথা ওর মুখ থেকেই শুনি। কিন্তু কী করে কথাটা উত্থাপন করা যায় বুঝতে না পারায় চুপ করেই থাকলুম।

এমন সময় শান্তাই সুযোগ করে দিল, সে বলে, আমার সম্বন্ধে সব কথাই তো আপনি দাদার মুখে শুনে-ছেন। (আমি একটু বিমূঢ়ভাবে চাইলুম ওর মুখের পানে, ও ঠিক কোন্ কথাটা ইঙ্গিত করতে চায়, ওর মুখের অভিব্যক্তি থেকে সেইটে অনুমান করবার জন্তে।)

একটু মৃদু হেসে ও বলে,—অত বিস্মিত হচ্ছেন কেন? দাদার স্বভাবই অমনি। উনি কোন কথা পেটে রাখতে পারেন না। আপনার কথাও সব আমার কাছে বলে-ছেন এবং আমার কথাও সব বলেছেন আপনার কাছে, নবনীতলালকে চেনেন বোধ হয়। গত পরশুদিন তার বিয়ে হয়ে গেছে আর একটি মেয়ের সাথে।

—অ্যাঁ! বিয়ে হয়ে গেছে!—আমার বিস্ময়টা বোধ হয় মাত্রাতীত হয়ে পড়েছিল। সেইটুকু লক্ষ্য করে শান্তা বলে—অমন অ্যাঁৎকে উঠলেন কেন? অবাক হবার কী আছে এর ভেতরে!

—নাঃ, অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু এটাকে একটা অমার্জ্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলতে হবে। পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি অবশেষে বিয়ে না করা!

শান্তা—আমি কিন্তু ও বেচারিকে তেমন দোষ দিই না। ও সত্যি সত্যি আমায় ভালবাসতো না, আর আমিও তথৈবচ। শুধু পাঁচজনের অনুরোধের জবর-দস্তিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং প্রথম সুযোগেই সে মূলোচ্ছেদ করেছে।—একটু থেমে শান্তা আবার বলে—আমাদের দেশে তো ঐ এক গেরো। যাদের বিয়ে তাদের চেয়ে পাড়াপ্রতিবেশির মাথার ব্যথা বেশি। যাই হোক্, আমি কিন্তু মোটেই ব্যথিত অথবা অনুতপ্ত হইনি নবনীতের ব্যবহারে। তবে সমাজের ভয়ে খুব গোপনে এবং ভয়ে ভয়ে বিয়েটা সারতে হয়েছে ওদের, জানাশুনো খুব অল্প কয়েকজন মাত্র অতিথি নিমন্ত্রণ করেছিল; জাঁক জমক এবং উৎসবের আয়োজন করতে সাহস পায়নি। বলতে গেলে একরকম চুরি করেই বিয়ে হয়েছে। আমার বাবা কিন্তু সব খবরই আগে থাকতে টের পেয়েছিলেন। তিনি তো রীতিমত ক্ষেপে উঠেছিলেন। সমাজের মাতব্বরদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ের আসরে গিয়ে আয়োজন ভণ্ডুল করে দেবেন, এই ছিল তাঁর মনের সঙ্কল্প। অনেক কষ্টে আমিই তাঁকে ঠেকালুম।—এই পর্য্যন্ত বলে শান্তা খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগল।

চিনুভাইএর মুখে শান্তার কথা শুনে যা মনে হয়েছিল তার জীবনের একটা গভীর এবং গুরুতর সমস্তা এবং যার জন্তে চিনুভাইএর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মাঝে মাঝে হা-হুতাশ করতুম, ঠিক সেই ব্যাপারটিই শান্তার নিজেকে এতোখানি তুচ্ছ এবং হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে দেখে বুদ্ধিটা কেমন যেন একটু গুলিয়ে গেল। মানুষের জন্ম-গত সংস্কার সহজে মরে না। সেই জন্তই বোধ হয়

আমি বল্লুম, কিন্তু আপনি যতই বলুন, নবনীতের ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নয়। তার একটা সাময়িক খেয়ালের জন্য অপর একটি মেয়ে সমাজের চোখে চিরদিন হেয় হয়ে থাকবে? একটি নির্দোষ মেয়ের এতোবড় ক্ষতি করার কী অধিকার আছে তার?

মুখ টিপে একটুখানি হাসলো শান্তা। আমি বোধ হয় নবনীতের প্রতি ক্রোধবশতঃ একটু উত্তেজিতই হয়ে পড়েছিলুম। ওকে একটুখানি হেসে চুপ করে থাকতে দেখে বোধ হয় আরও খানিকটা ক্ষেপে গিয়েছিলুম, তাই বল্লুম—না, না, চুপ করে থাকলে চলবে না। আপনি আমার কথার জবাব দিন।

শান্তা ধীরভাবে বলে—আমি তো বেচারি নবনীতের চেয়ে সমাজকেই বেশি অপরাধী মনে করি। বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভাঙলে ছেলেকে যদি সমাজের কাছে হেয় হয়ে থাকতে না হয়, তবে মেয়েকেই বা থাকতে হবে কেন? যে সমাজে এতোখানি পক্ষপাত, তাকেই তো সংশোধন করে নেওয়া উচিত আধুনিক কালের উপযোগী করে, তা নইলে সে সমাজ ভেঙে পড়তে বাধ্য। মেয়েদের অবলা এবং অসহায় মনে করে হা-হুতাশ এবং করুণা প্রকাশের দিন ক্রমেই চলে যাচ্ছে শৈলেন বাবু! সমাজ যদি মেয়েদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করে, তবে ইংরেজের আইন ও শিক্ষা দেবে তাদের আত্মসম্মান, সাবলম্বন আর সমানাধিকার। নবনীতের কৃতঘ্নতায় শান্তাকে কেন হতাশ হয়ে সারাজীবন চোখের জল ফেলতে হবে বলুন তো!

শান্তার দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা ও ব্যবহার আমাকে শুধু বিমূঢ় নয়, কেমন যেন ভেতরে ভেতরে একটু মুগ্ধ করে ফেলেছিল, চিনুভাই-এর চোখ দিয়ে যখন দেখছিলুম ওর জীবনের সমস্যা, কেমন যেন প্রচণ্ড এবং জটিল মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওর সামনা-সামনি এসে ওরই মুখ থেকে যখন ওর নিজের কথা শুনতে পেলুম, আমার ধারণা আগাগোড়া বদলে গেল। মনে হলো এতোদিন একটা ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পোষণ করে একজন মেয়ের জীবনকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে বিচার করে এসেছি, যেটাকে একটা অবগুনীয় সন্থঃহ দুঃখ মনে করে আর পাঁচজনে হা-হুতাশ করছে, প্রকৃতপক্ষে যার জীবন সেই কাল্পনিক দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে সেটাকে আদৌ দুঃখ বলেই মনে করছে না।

যতদূর মনে পড়ে, আমার সাথে আচরণের মধ্যে শান্তার চরিত্রের দৃপ্ততা ও বলিষ্ঠতাই প্রকাশ হয়েছিল। অনাবশ্যক চপলতা ও চটুলতার পরিচয় সে দেয় নি একটিবারও। তবুও কেন বলতে পারি না, ওকে খুব ভাল লাগলো। ও খুব সুলভ মেয়ে নয়, একটা যেমন সম্ভ্রমের অদৃশ্য গণ্ডী দিয়ে সে সুরক্ষিতা, সহজে ওর মনের দুয়ার উন্মুক্ত হয় না এবং সকলের কাছে তো নয়ই নিজেকে আমার ভাগ্যবান মনে হলো। ওদের হৃদয়ের মাধুর্য্য জ্ঞানের দৃঢ়তা দিয়ে সমাবৃত, তাই সকলের অধিগম্য নয় ওর হৃদয়।

অন্ধকারে চলছিলুম আমরা তিনজনে, কিন্তু তা খুব জমাট নয়। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে ঝলসে উঠছিল অন্ধকার, তখন লক্ষ্য করছিলুম ওর মুখের দিকে। থেকে থেকে ভিজে বাতাসের দমক পেয়ে ওর বস্ত্রাঞ্চল উড়ছে এলোমেলো ভাবে। ওর ললাটের ওপর বাঁধনছাড়া অবাধ্য কেশের দু' একগাছি দোল খাচ্ছে আবোল তাবোল, ওর মুখের ওপরে একটা গভীর সহিষ্ণু হৃদয়ের মমতা মাখা ছবি। যত ওকে দেখলুম, ততই ভাল লাগলো।

হঠাৎ বলল শান্তা—এ সব তর্ক বিতর্ক থাক্। শুনেছি আপনারও নাকি খুব বেড়ানোর নেশা! চলুন না, আসছে রবিবার আমরা দু'জনে মিলে সরখেজ-এ যাই।

মন তখনই আনন্দে নেচে উঠলো। ইচ্ছে হলো বলি—নিশ্চয় যাবো—কিন্তু অতখানি সরলভাবে কথা বলা হয়তো ঠিক সভ্য সমাজের উপযোগী নয়। তাই ঘুরিয়েই উত্তর দিতে হলো···আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো, যদি সময় করতে পারি আসবো তা হলে। সরখেজ কোথায়?

—সরখেজ আনন্দ নগরের দিকে, কেন যান নি কখনও ওদিকে? বেশ ফাঁকা যায়গা, একটা গণ্ড গ্রামও বলতে পারেন, তা ছাড়া সেখানে আছে একটা পুরোনো মসজিদ।

কথায় কথায় আমরা এসে পড়লুম চার রাস্তার মোড়ে। এই পর্য্যন্তই আমাদের গন্তব্য। আমি নমস্কার করে বললুম—আচ্ছা আসি এবারে।

ও বলল—আওজো (আচ্ছা আসুন নমস্কার)। তার পরই জিজ্ঞেস করলো—আসছে রবিবার দিন মিলবেন নিশ্চয়!

আমি বলি—কোথায় দেখা হবে আপনার সাথে?

—আমার বাসাতেই আসবেন বিকেলে, আমি আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করবো।

বার্ণার্ড শ' ও বিরস নাটক

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

বার্ণার্ড শ'-এর প্রত্যেক নাটকেই এমন দু' একটি চরিত্র থাকে যারা কথা বার্তায় নিজেদের paradoxical বা বিপরীত ধর্মী যুক্তিপূর্ণ স্বভাবের পরিচয় দেয়। এই নাটকে চার্টারিসও সেই জাতীয় চরিত্রের উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাই নাটকের সূচনায় আমরা তাকে যে-মতবাদ পোষণ করতে দেখি, নাটকীয় কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মতবাদ পরিবর্তিত হয় এবং অবশেষে যে অবস্থার মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটে তা পূর্ব্ব পরিচিত আদর্শ বা ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে চার্টারিস বিবাহ বন্ধনকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে কেবল প্রেমের অভিনয়ই করে এসেছে, সে যখন দেখল যে যারা একদিন তাকে প্রেমাস্পদ জ্ঞানে কাছে টেনে নিয়েছিল, আজ তারা সবাই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে তখন সে জীবনের ব্যর্থতাভরা পরিণতিকে স্মরণ করে এই অনুশোচনা প্রকাশ করছে—

Yes: this is the doom of the Philanderer. I shall have to go on Philandering now all my life. No domesticity, no fireside, no little ones, nothing at all in Curthbartson him.

জুলিয়ার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য সে অনুতপ্ত এবং এ কথা সে অকপটে স্বীকার করছে যে জুলিয়ার জন্যেই সে আত্মসচেতন হতে পেরেছে।

"Oh, what I have learnt from you! From you! From you! who could learn nothing from me! I made a fool of you; and you brought me wisdom: I broke your heart; and you brought me joy: I made you curse your womanhood, and you revealed my manhood to me."

The Philanderer সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিষয়টি শ'-এর বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং শ্লেষ বিদ্রূপ মিশ্রিত পরিহাস রসিকতা বা এই নাটকের প্রত্যেক অংশেই লক্ষ্য করা যায়। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য এইরূপ দু' একটি নির্ব্বাচিত অংশ উদ্ধার করে দেওয়া হল।

প্রথমেই বলা চলে যে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং চিকিৎসকের প্রতি শ'-এর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ যা এই নাটকে ডাঃ প্যারামোরের প্রতি নির্ম্মম আঘাত হেনেছে। ডাঃ প্যারামোর যেন মূর্ত্তিমান ব্যঙ্গ এবং তার রোগী ক্র্যাভেন সেই ব্যঙ্গের অন্ধ ও মূঢ় স্তাবক। তাই তাদের উদ্দেশে চার্টারিসের এই উক্তি সত্যই উপভোগ্য—

"Craven's a devout believer in the department of witchcraft called medical science. He's celebrated in all the medical schools as an example of the newest sort of liver complaint. The doctors say he can't last another year; and he has fully made up his mind not to survive next Easter, just to oblige them"

আবার ডাঃ প্যারামোরের রোগনির্ণয় পরীক্ষা (diagnosis) মিথ্যা প্রমাণিত হলে পর ক্র্যাভেনের উক্তি আরও সরসতাপূর্ণ হয়, যখন সে ব'লে ওঠে—

"Am I to understand, Paramore, that you took it on yourself to pass sentence of death on me: yes, of Death! on the strength of three dogs and an infernal monkey?...Why, confound it, do you realise what you've done? You've cut off my meat and drink for a year! made me an object of public scorn! a miserable vegetarian and teetotatter."

এ ছাড়া 'ইবসেন ক্লাবে'র সভ্য ও সভ্যাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে চার্টারিসের মাধ্যমে শ' বলেছেন—

"Every candidate for membership must be nominated by a man and a woman, who both

guarantee that the candidate, if female is not womanly, and if male not manly.

এই ক্লাবের নিয়মকানুনের অভিনবত্ব সভ্য ও সভ্যাদের কথাবার্তায় চালচলনে পরিস্ফুট : এখানে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তাই আহারের সময় কোন সভ্য যদি কোনও সভ্যাকে এই প্রস্তাব করে—May I take you down ? তা হলে তৎক্ষণাৎ এই প্রতিবাদ আসে—

'No, really : you kno wit's against the rules of the club to coddle woman in any way. Whoever is nearest the do goes first.'

আহারে খাওয়ার প্রথায়ও বৈচিত্র্য আছে কারণ তাও Ibsen Fashion অর্থাৎ unsexed fashionএ হওয়া চাই। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা ডাঃ প্যারামোরের মুখে শোনা যায়। সে নিজের মূলগত স্বার্থের জন্য সত্যকেও স্বীকার করতে রাজী নয়। তাই তার পরীক্ষা ভুল প্রমাণিত হলে রোগীর জীবনরক্ষার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাবার কথা বললে প্রত্যুত্তরে তাকে এই কথা বলতে শোনা যায়—

'Congratulate a man on the worst blow Pathological science has received for the last three hundred years !

এইবার 'বিরস নাটক'-ত্রয়ীর শেষ নাটক অর্থাৎ Mrs. Warren's Profession-এর আলোচনা করা যাক। ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে ১৮৯৪ সালে বার্ণার্ড শ' এই নাটকটি রচনা করবার পর সেন্সর বোর্ড (Lord Chamlains' Examiner of plays) অশ্লীলতার অভিযোগে এর অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মবিশ্বাসী পুরুষ শ' সরকারী নিষেধাজ্ঞায় কিছুমাত্র ভীত না হয়ে যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০২ সালে 'ষ্টেজ সোসাইটি' কর্ত্তৃক এই নাটকের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হ'লে পর লণ্ডনের নাট্য সমালোচকগণ প্রত্যেকে যুগপথ ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রকাশ করলেন। এমন কি তাঁর নাটকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মিঃ গ্রেইন এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু উইলিয়ম আর্চার পর্য্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠলেন। তবু শ' নিজের অন্তরে যা বিশ্বাস করতেন তার অকপট উদ্ঘাটনে কোনদিন পশ্চাদপদ হননি বা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। কেননা তিনি নিশ্চয় জানতেন যে সত্যকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ভণ্ডামী বা ছলনা দ্বারা কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তথাকথিত সভ্যতা, ভদ্রতা, আভিজাত্য ইত্যাদি যে সকল গুণাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে, সেগুলো আসলে এমন অপটু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সামান্য ঝড়া বা ভূকম্পনে তা লয় পায়। এই প্রসঙ্গে Mrs. Warren's Profession নাটকের বিষয়বস্তুর মূল কথা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। Mrs. Warren's Professin-এ শ' সমাজের একটি অতিশয় রূঢ় অথচ বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এখানে তিনি বাইরের আলো এবং হাওয়া-ভরা কাব্যময়ী, সুন্দরী পৃথিবীর নিম্নস্তরের অন্ধকারঘন কুৎসিত মূর্ত্তির ওপর আলোক সম্পাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক সভ্যতার নিকৃষ্টতম যে দান, যা দারুণ অভিশাপের ন্যায় সমগ্র সমাজদেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে, তার মূলে আছে মানুষের চরমতম দারিদ্র্য এবং অন্তহীন দুঃখ ও দুরবস্থার মর্মস্পর্শী ইতিহাস।

আমাদের চিরপ্রচলিত নীতিশাস্ত্রের সহজ বিধানে বলা হয় যে, ভোগ এবং লালসার আতিশয্য থেকেই নাকি সমাজে মানুষের চারিত্রিক স্খলন ঘটে। অথবা অন্য কথায় বলা হয় যে স্ত্রীলোকের সহজাত বিপথগামী প্রবৃত্তি এবং পুরুষের উদগ্র কামনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামেই গণিকা বৃত্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু বার্ণার্ড শ' দেখিয়েছেন যে মানুষ তার দেহ ও মনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বভাবধর্ম্মেই এই পথে অগ্রসর হয়। তিনি এই কথাই তাঁর নাটকের প্রস্তাবনায় বলেছেন :

"Mrs. Worren's profession was written in 1894 to draw attention to the truth that prostitution is caused, not by female depravity and male licentiousness, but simply by underpaying, undervaluing and overworking women so shamefully that the poorest of them are forced to resort to prostitution to keep

body and soul together." অতএব দারিদ্র্য এবং স্বল্প বেতনভোগী জীবনযাত্রা যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ এই মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না "Every man and woman present will know that as long as poverty makes virtue hideous and the spare pocket-money of the rich bachelordom makes vice dazzling, their daily hand-to-hand fight against prostitution with prayer and persuation, shelters and scanty alms, will be a losing one.".

এই নবতম তাত্ত্বিক আবিষ্কার ও উচ্চ গবেষণাপূর্ণ বিষয়বস্তুর অবলম্বনে নাটক রচনা করে আত্মপ্রকাশ করলে রক্ষণশীল নাট্যামোদী সমাজ এটাকে তাদের নৈতিক বিচারে যে অশ্লীল ঘোষণা করবে সেজন্তে শ' গোড়া থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর এই নাটক আদৌ আপত্তিকর নয়। এই জন্তে তাঁর নাটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন :

"I am one of those who claim that art is exempt from moral obligations, and deny that the writing or performance of a play is a moral act, to be treated on exactly the same footing as theft or murder, if it produces equally mischievous consequences."

এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারী কর্মচারীগণ যে অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন, তা তিনি একাধিক যুক্তিপূর্ণ উক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন : "...Mrs. Warren's profession is no mere theorem, but a play of instincts and temperaments in conflict with each other and with a flinty social problem that never yields an inch to mere sentiment."

তিনি আরও বলেছেন :

"I have spared no pains to make known that my plays are built to induce, not voluptuous reverie but intellectual intrest, not romantic rhapsody but humane concern."

আজ থেকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই নাটক রচিত হয় এবং আজকের মত মানুষ যখন ফ্রয়েডীয়তত্ত্বের বিশেষজ্ঞতায় খ্যাতি লাভ করে আপনার অবচেতন মানসের অবদমিত কামনাকে নিরুদ্ধ আবেগে এবং অসঙ্কোচ স্পষ্টতায় উজাড় করে দিতে শেখেনি, সেই যুগে শ' এই নাটকে যে অভিনব সৃষ্টিশক্তির এবং প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সেদিন সারা ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভীক শ' একা স্থির এবং অবিচলিত ভাবে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আমাদের এই বাঙলাদেশের একজন সাহিত্যিকের কথা যাঁকে বার্ণার্ড শ'র মতই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে একদিন অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল যেদিন তাঁর একখানি উপন্যাস ইতিপূর্ব্বে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা থেকে অমনোনীত হওয়ার পরও আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই লেখক বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং উপন্যাসের নাম 'চরিত্রহীন'। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শ'র একজায়গায় প্রভেদ আছে। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতি অবিচারকে বিনাপ্রতিবাদে সহ্য করেছেন, পক্ষান্তরে শ' সাময়িক নীরবতার পর নিজেকে কিরূপ রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশ করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতি থেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায়—

"I am no ordinary playwright. I am a specialist in immoral and heretical plays. My reputation was gained by my persistent struggle to force the public to reconsider its morals. I write plays with the deliberate object of converting the nation to my opinion on sexual and social matters. I have no other incentive to write plays, as I am not dependent on it for my livelihood."

কিন্তু এ আলোচনা স্থগিত রেখে মূল নাটকের আলোচনায় আসা যাক। আলোচনাকালে দুটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমনই যে অধিকাংশ সম্পত্তি ও ব্যবসায় সমৃদ্ধির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে তা অপরের অবনতি এবং পাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদেরই লাভে পরিপুষ্ট। অতএব ঐসকল সম্পত্তি ও ব্যবসায় সত্ত্বাধিকারীর মানুষের অবনতি এবং পাপের

প্রতি মূলগত স্বার্থ (vested interests) জড়িত আছে, দ্বিতীয়তঃ মানুষ এবং তার বিবাহ ব্যবস্থা এমনই যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের প্রাগ্‌বিবাহকালীন চরিত্রের সততা বজায় রাখবার জন্যে কিছু স্ত্রীলোকের গণিকাবৃত্তি গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। একজন মণীষী এই নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Mrs. Warren's Profession is designed to draw the attention of the public to the facts relating to the use of brothels and to awaken its social conscience by their dramatic presentation" (Joad).

অতঃপর যে পটভূমিকায় এই নাটকের কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, সেই দিকে নজর দেওয়া যাক। Mr. Warren বার্ণার্ডশ'র বিদ্রোহিনী নারীবাহিণীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার বৃত্তি গ্রহণের যাথার্থ্য প্রমান করাই এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। বস্তুতঃ যে প্রতিকুল অবস্থার সঙ্গে শৈশবকাল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর মিসেস ওয়ারেন সংসারে আপনার জীবিকা অর্জ্জনের এবং জীবনধারনের জন্ত যে-পথে অগ্রসর হয়েছিল, সামাজিক রীতিনীতির বিচারে যে পথ পিচ্ছিল এবং পাপপঙ্কময়, সেই পথে থেকেই সে নিজেকে এমন সামাজিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করল যে নিজের কন্যার ওপর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে দুর্নিবার আবেগে প্রকাশ পেতে থাকল। কিন্তু তার কন্যা উচ্চ শিক্ষিতা এবং স্বাধীন ভাবে ও স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্থ হওয়ায় মায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকতে সে আদৌ রাজী নয়। একজনের চরিত্র প্রচলিত প্রথার (convention) অনুগামী, আর একজনের চরিত্রে তার স্থান শূন্য। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের দ্বন্দ্বসংঘাতে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিনতির দিকে এগিয়ে গেছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় মিসেস ওয়ারেনের কন্যা ভিভি (Vivie) তার মায়ের অন্যতম বন্ধু মিঃ প্রেইডের (Praed) সঙ্গে আলাপকালে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না দিয়ে তার মায়ের আগমনের সংবাদ শুনে বিস্মিত হয়ে তার ওপর মায়ের নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তৃত্বের প্রতি মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে—

"I fancy I shall take my mother very much by surprise one of these days, if she makes arrangements that concern me without consulting me before hand." মিঃ প্রেইডও যেন ভিভিকে সমর্থন করার জন্যে বলছে..." "I hate authority. It spoils the relations between Parents and Child; even between mother and daughter."

কথা প্রসঙ্গে প্রেইড যখন ভিভির আদর্শের সঙ্গে তার মায়ের আদর্শের পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করল তখন সে (ভিভি) জবাবে এই বলল :

I have been boarded out all my life. My mother has lived in Brussels or Vienna and never let me go to her. I only see her when she visits England for a few days. I con't complain; it been very pleasant; for people have been very good to me; and there has always been plenty of money to make things smooth. পাছে তার মায়ের সঙ্গে তার এই অদ্ভুত রহস্যজনক সম্পর্কের কথার উল্লেখ তাকে বিব্রত করে, ভিভি প্রেইডকে তাই আগে থাকতেই ব'লে দিল :

"But don't imagine I know anything about my mother. I know far less than you do."

বস্তুতঃ একদিকে মাতার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে কন্যার বন্ধনহীন স্বাধীন জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা এই নাটকের কাহিনী ও গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই কন্যার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ মিসেস ওয়ারেন্ যেমন পাদরী গার্ডনারের (Rev. Samuel Gardner) ছেলে ফ্রাঙ্কের (Frank) সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহে সামাজিক বাধাকে অগ্রাহ্য করেও প্রস্তাবকে এক প্রকার অনুমোদন ক'রেই বলছে—If the girl wants to get married, no good can come of keeping her unmarried; তেমনি পরক্ষণেই নিজের কর্ত্তৃত্ব যাতে খর্ব্ব না হয় সেই উদ্দেশ্যে মেয়েকে একান্তে আহ্বান ক'রে ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে এই কথা ব'লে সাবধান ক'রে দিচ্ছে—

Did you ever in your life hear any one rattle on so? Isn't he a tease? Now that I think of it, dearie, don't you go encouraging him, I'm sure has a regular good-for-nothing

কেননা তখন মেয়ের ভবিষ্যতের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে এবং যাতে (Sir George Croft) ক্রফটের সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তির প্রতি তার মেয়ে আকৃষ্ট হয় তারই পথ সুগম করতে সে সচেষ্ট। তাই মেয়ের প্রতি তার আদেশ—

You'll have to make up your mind to see a good deal of Sir Georg Crofts, as he is a friend of mine"—অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই আদেশ স্বাধীনচেতা ও উচ্চশিক্ষিতা কন্যার নিকট অবমানাকর মনে হল। তাই সে আদেশ শিরোধার্য্য না করে সরাসরি প্রশ্ন ক'রে বলল "Do you expect that we shall be much together? You and I, I mean?... Do you think my way of life would suit you? I doubt it...Has it really never occured to you, mother, that I have a way of life like other people?" তখন মিসেস ওয়ারেন রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে বলতে থাকল—"Dont you keep on asking me questions like that, [violently] Hold your tongue...your way of life will be what I please, so it will."

তবুও ভিভি আত্মসমর্পণ করল না বরং মিসেস ওয়ারেনের মাতৃত্বের অধিকারের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করে নিজের সত্য পরিচয়, পিতৃপরিচয় এবং অন্যান্য আত্মীয়দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তখন বাধ্য হয়ে মিসেস ওয়ারেন কন্যার সঙ্গে আপোষ রক্ষা করল। তাদের এই উত্তেজনা প্রশমিত হলে ভিভি কর্তৃত্ব-অভিমানিনী মাকে বুঝিয়ে বলল—

Don't think for a moment I set myself above you in any way. You attacked me with the convetional authority of a mother; I defended myself with the conventional superiority of a respectable woman. Frankly, I am not going to stand any of your nonsense; and when you drop it I shall not expect you to stand any of mine. I shall always respect your right to your own opinions and your own way of life.

এই কথা শুনে মিসেস ওয়ারেন তার অতীত জীবনের ঘটনাবলী—যার ওপর তার বর্ত্তমান জীবন গড়ে উঠেছে এবং যা নিয়তির মত অখণ্ডনীয় ও অপ্রতিরুদ্ধ, সেই অনিবার্য্য প্রাক্তনের কথা স্মরণ করিয়ে বলল—

Do you think I was brought up like you? able to pick and choose my own way of life? Do you think I did what I did because I liked it or thought it right, or wouldn't rather have gone to college and been a lady if I'd had the chance? কিন্তু ভিভির নিকট এই যুক্তি অর্থহীন। নিয়তির বিধানে সন্নিহান জীবনের কোন অবস্থাতেই তার আস্থা নেই। অর্থাৎ তার কাছে মানুষ অবস্থার দাস নয়, অবস্থাই মানুষের দাস। তাই তার এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and, if they can't find them, make them!"

এর পর মিসেস ওয়ারেন আপনার বক্তব্যকে ভিভির বোধগম্য করতে এবং তার সত্যতা প্রমাণ করতে নিজের অতীত জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতে থাকল।

এই অংশেই নাটকের climax দেখা যায় এবং এখানে নাট্যকার শ'র কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। মিসেস ওয়ারেনের গণিকাবৃত্তি গ্রহণের মূলে যে করুন ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা তিক্ত অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং প্রতিকুল অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তার দুইজন বৈমাত্রেয় ভগিণীর দারিদ্র্যের সঙ্গে এবং অবসর হীন পরিশ্রমের ফলে অকাল মৃত্যু বরণ, তার সহোদর ভগিণীর নিরুদ্দেশ যাত্রা, তার নিজের প্রথমে এক রেস্তোরাঁয় একটি মদ্যশালায় প্রত্যহ চতুর্দ্দশ ঘণ্টা শ্রমের এবং সামান্য বেতনের পরিচারিকার কাজ গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনাবলী তার জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা-ই পরে হঠাৎ একরাত্রে তার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাতে এবং দুজনের ভাগ্যের তুলনামূলক আলোচনায় নতুন পথের সন্ধান মিলিয়ে দেয়। এমনকি এই পথের পাথেয় হিসেবে সে তার ভগ্নীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্যও লাভ

করে। প্রসঙ্গক্রমে মিসেস ওয়ারেন ভিভিকে একথাও জানিয়ে দিল যে, যেকোনও স্ত্রীলোকের পক্ষে এই একমাত্র পথ বা অতিবাহন করলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করা যায়। অর্থাৎ এমন অর্থ সঞ্চয় করা যায় যাতে সসম্মানে জীবন নির্বাহ হয়। জীবনে অর্থ সঞ্চয়ই মানুষের একমাত্র কাম্য। সম্রান্ত ঘরের মেয়েদের বিবাহ মিসেস ওয়ারেনের ধারনায় এই অর্থ সঞ্চয়েরই নামান্তর। তাই তাদের বিবাহ নীতিকে সে তীব্র শ্লেষের দ্বারা নাকচ করে দিচ্ছে—

"What is any respectable girl brought up to do but to catch some rich man's fancy and get the benefit of his money by marrying him? as if a marriage ceremony could make any difference in the right or wrong of the thing! Oh, the hypocrisy of the world makes me sick!"

মিসেস ওয়ারেনের এই ব্যবসা গ্রহণের প্রধান কারণ তার আত্মসম্মান বোধ। এই বোধ না থাকলে সে ভিভিকে শিক্ষিতা করে তুলতে পারত না। দারিদ্র্য এসে তাকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করে ফেলত। মিসেস ওয়ারেনের এই নিজস্ব বিশ্বাস এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই তাকে তার কন্যার ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার এনে দিয়েছে—যে অধিকারের বলেই সে আপন ইচ্ছানুযায়ী কন্যার ভবিষ্যত নির্দ্ধারণ করতে কৃতসঙ্কল্প। তাই সে সস্নেহে ভিভিকে এই সাবধানী উপদেশ দিচ্ছে—

"Don't you be led astray by people who don't know the world, my girl. The only way for a woman to provide for herself honestly is for her to be good to some man that can afford to be good to her!"

অতঃপর তৃতীয় অঙ্কে ভিভির নিকট ক্রফ্‌টের প্রেম নিবেদন, বিবাহ প্রস্তাব পেশ, দৃঢ়চেতা ভিভি কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, তার স্বাভাবিক অনমনীয়তা ইত্যাদি নাটকের শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুতঃ এই অঙ্কে শ' অর্জ্জ ক্রফ্‌টের চরিত্রকে নিজের মুখপাত্ররূপে ব্যবহার করে তার জবানীতে সমগ্র সভ্যতার সৌধমূলে শ্লেষ বিদ্রূপের কুঠারাঘাত করেছেন। ভিভির হৃদয় জয় করতে গিয়ে ক্রফ্‌ট সর্ব্বাগ্রে নিজের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার যে-দিক তাকেই উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছে। কারণ চতুর ক্রফ্‌ট ভালভাবেই জানে যে বাক্যের মোহজাল বিস্তার করলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে তাই বলছে:

I'm quite aware that I'm not a young lady's man!...But when I say a thing I mean it; when I feel a sentiment I feel it in earnest; and what I value I pay hard money for...I have my faults, Heaven knows, no man is more sensible of that than I am...But my code is a simple one, and I think a good one. Honour between man and man; fidelity between man and woman; and no cant about this religion or that religion, but an honest belief that things are making for good on the whole.

কিন্তু ভিভিকে সে যত সহজে করায়ত্ত করবে ভেবেছিল তত সহজে সেই কাজ সম্ভবপর নয় দেখে সে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করল। অর্থাৎ তার প্রেমবাণ যাতে নিশ্চিতভাবে ভিভির কোমল হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত হানে, সেই উদ্দেশ্যে সে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাল কিরূপে সমাজের বিভিন্ন শিক্ষা ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান এবং অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এমন সকল উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল যা ভিভির বিচারে অবৈধ বা-দুর্নীতিমূলক। নীতির দোহাই দিলে যে তারপক্ষে যে-কোনও সভ্য সমাজে বাস করা অসম্ভব, তাই বোঝাতে ক্রফ্‌ট ভিভিকে বলছে:

"If you are going to pick and choose your acquaintances on moral principles, you'd better clear out of this country, unless you want to cut yourself out of all decent society!"

তারপর ক্রফ্‌টের এই উক্তি:

"Believe me, Miss. Vivie, this world isn't such a bad place as the croakers make out. As long as you don't fly openly in the face of society, society does not ask any inconvenient questions; and it makes precious short work of the cads who do. There are no secrets better kept than the secrets everybody guesses." প্রকৃত পক্ষে শ'র নিজস্ব দার্শনিকতা এবং অপ্রিয় সত্যভাষণের নিদর্শন।

কিন্তু এত চেষ্টা এবং কৌশল প্রয়োগের পরও ভিভি ক্রফ্‌টের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মতি দিল না ; বরং তার কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে অগ্রসর হতেই ক্রফ্‌ট তাকে বাধা দিল। তখন সে আত্মরক্ষার জন্যে হাতের কাছে বাইরের ঘন্টিটা বাজিয়ে দিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাইফেল হাতে ফ্রাঙ্ক এসে তাদের মাঝে দাঁড়াল। এবার ক্রফ্‌ট বুঝতে পারল যে তার অভিসন্ধি ব্যর্থ হতে চলেছে। তাই সে এই সুযোগে ফ্রাঙ্কের কাছে ভিভির আসল পরিচয় যা এযাবৎ অজ্ঞাত ছিল তা-ই প্রকাশ করে দিল। ভিভি জানতে পারল যে সে পাদ্রী রিচার্ড গার্ডনারেরই কন্যা এবং ফ্রাঙ্ক তারই বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর তাদের বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হতে পারে না জেনে ভিভি স্থির করে ফেলল যে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সে তার অফিসে থেকেই কাটিয়ে দেবে। শেষ অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে ভিভির অফিস বাড়ীরই একটি কক্ষে। ফ্রাঙ্ক দুদিন পরে এখানে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। কথা প্রসঙ্গে সে জানাল, যে তার বাবার সঙ্গে ক্রফ্‌টের দেওয়া খবর নিয়ে তার আলোচনা হয়েছিল এবং তার বাবা তাকে সঠিকভাবে কিছু না বললেও সে আভাষে ইঙ্গিতে বুঝতে পেরেছে যে এই সব কথা ভিত্তিহীন ও অমূলক। কিন্তু ভিভি ফ্রাঙ্ককে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে না দিয়ে জানিয়ে দিল যে ভবিষ্যতে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ভাই-বোনের মতই হবে। ফ্রাঙ্ক প্রথমে নিজেকে এই সম্পর্ক অনুযায়ী কল্পনা করে নিতে না পারলেও শেষ পর্য্যন্ত ভিভির অপরিবর্ত্তনীয় দৃঢ়তার জন্যে এই অবস্থার সঙ্গে সাময়িকভাবে মানিয়ে নিতে বাধ্য হল। অতঃপর প্রেইডের আগমনে তাদের বিশ্রম্ভালাপ অন্যদিকে মোড় ঘুরল। প্রেইড এসে প্রথমেই ভিভির দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনকে লাঘব করতে তাকে ইতালীতে যাবার কথা প্রস্তাব করল। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শ' এই নাটকে প্রেইড চরিত্রকে এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন যে, আপনার শিল্পী জনোচিত ঔদাসীন্যের মাঝেও মানুষের সুখদুঃখের সমান অংশীদার রূপে প্রয়োজনের সময় তাদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে পরাঙ্মুখ হয় না। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নাটকের প্রত্যেকটি অঙ্কে সন্ধিক্ষণে সে আবির্ভূত হয়ে এর অবরুদ্ধ গতিকে ত্বরান্বিত করেছে, একঘেয়েমির আবহাওয়ায় নতুনত্বের স্বাদ এনেছে, এক বর্ণের মধ্যে বহু বিচিত্রের সমাবেশ করেছে। সে মনে প্রাণে শিল্পী। তাই শিল্পীর দৃষ্টিতে সে এই পৃথিবীর অন্ধকার অন্তরের মাঝেও আলোক ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান বলে দেয়, পচা দুর্গন্ধের মাঝে নির্ম্মল সুরভি সৃষ্টি করে—

I am afraid there's nothing else in the world that I can talk about. The Gospel of Art is the only one I can preach—এই তার চরিত্রের সত্যিকার পরিচয়। মানুষ যখন বাস্তব অবস্থার কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন তার মনকে প্রকৃতির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, মানুষের বিপদকালে সে সত্যই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভিভি যখন তার ইতালীতে যাবার প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করে কারণ জিজ্ঞাসা করল, তখন সে বলল—

To saturate yourself with beauty and romance. কিন্তু ভিভি যখন এতেও আশ্বস্ত না হয়ে বলল—

Once for all there is no beauty and no romance in life for me. তখন প্রেইড সোৎসাহে বুঝিয়ে দিল—You will not say that if you come with me to Verona and on to venice, you will cry with delight at living in such a beautiful world.

কিন্তু প্রেইডের এই স্বভাবানুবর্ত্তিতা তার চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। সে একজন উদার মতাবলম্বী সংস্কারমুক্ত পুরুষ। তাই মানুষের প্রতি তার ধারনা কখনও তথাকথিত নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে প্রভাবিত হয় না। সে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যেই শ্রদ্ধা করে এবং তার কাছে কারও জন্ম কুলশীল বিচারের মানদণ্ড নয়। তাই প্রথম অঙ্কে যখন সকলে ভিভির পিতৃপরিচয় জানতে অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে, তখন সে সকল কানাকানি থামিয়ে দিয়ে এই কথা বলে—

We take her on her own merits. What does it matter who her father was? তেমনি আবার চতুর্থ অঙ্কে যখন ভিভির মার আসল পরিচয়

জানাজানি হওয়ার পর সে প্রেইডের সামনে দাঁড়াতে সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব ক'রে অবনত হয়, তখন প্রেইড তাকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—

I feel bound to tell you speaking as an artist and believing that the most intimate human relationships are far beyond and above the scope of the law, that though I know that your mother is an unmarried woman, I do not respect her the less on that account. I respect her more.

এরপর মিসেস ওয়ারেনের আবির্ভাবে ভিভির বিবাদময় চিত্ত পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। মিসেস ওয়ারেন প্রথমেই ভিভির যে আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করল তা হচ্ছে ভিভি কর্তৃক মিসেস ওয়ারেন প্রেরিত মাসিক ভাতা যথারীতি গ্রহণ না করে পুনরায় তা ব্যাঙ্কে প্রত্যর্পন করা। ভিভি তার মাকে একথাও জানিয়ে দিল যে অতঃপর সে স্বোপার্জিত অর্থেই জীবিকা নির্বাহ করবে এবং তার মার দেওয়া অর্থের ওপর নির্ভর করবে না। তখন মিসেস ওয়ারেন যথাপূর্ব ভিভিকে প্রলুব্ধ করতে অনেক বাক-চাতুরীই প্রয়োগ করল—ভবিষ্যতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করে তার সঙ্গে দুঃখ দুর্দশাভরা বৈকল্পিক জীবনের কথা শোনাল:

"I mean that you are throwing away all your chances for nothing. You think that people are what they pretend to be; that the way you were taught at school and college to think right and proper is the way things really are. But it is not, its all only a pretence to keep the cowardly slavish common run of people quiet. কিন্তু ভিভি এই সকল কথায় কর্ণপাত না করে এই বলে তার মাকে বিদায় দিল—If I had been your mother I might have done as you did; but I should not have lived one life and believed in another. You are a conventional woman at heart. That is why I am bidding you goodbye now. I am right, am I not?

নাটকের শেষ অংশে ভিভির চরিত্রের অনবনীয়তা যেমন পাঠক ও দর্শককে আকৃষ্ট করে, তেমনি তাহার মায়ের তিক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তিগুলিও অকাট্য যুক্তির রূপে বুদ্ধিজীবি মানুষের চিন্তার কারণ হয়। যাঁরা সমাজ সংস্কারক বলে নিজেদের পরিচয় দেন অর্থাৎ সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা যাঁদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁরা এই দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রকে পাশাপাশি রেখে বিচার না করলে বা তাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অনুশীলন না করলে তাদের প্রতি সুবিচার করবেন না বা আপনাদের নিরপেক্ষতার দাবী করতে পারবেন না। বস্তুতঃ এই দুটি চরিত্র থেকে তাঁদের অনেক কিছু শিক্ষালাভ করার আছে। কারণ ভিভি যে বিদুষী, আলোক প্রাপ্তা, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না কন্যারূপে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে, তার মূলে আছে তার মায়ের বিরাট ব্যর্থতা, দারুণ নৈতিক বিপর্যয় এবং কন্যার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দুশ্চিন্তায় নিজেকে তিলে তিলে আত্মদান করার কুৎসিৎ অথচ করুণ কাহিনী। বস্তুতঃ মায়ের আর্থিক প্রাচুর্য্যের সুযোগ না পেলে সে কখনই নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। তার উচ্চ শিক্ষা লাভ, তার অভিজাত সামাজিক খ্যাতি, তার স্বাধীন মুক্ত নিষ্পাপ নিষ্কলুষ জীবনাকাঙ্ক্ষা সব কিছুই কুঁড়িতে শুকিয়ে মরে যেত যদি না তার মা তাকে আপনার জীবন দিয়ে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করত। অতএব একজনের খ্যাতি ও মানসিক সমৃদ্ধির অন্তরালে আর একজন যে কিরূপ রিক্ত ক্ষতসর্বস্ব মনে দেউলিয়া অবস্থায় কুখ্যাতির ভার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে মরল, তার দিকে শ' প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সমাজের বিচারে মিসেস ওয়ারেন অপরাধিনী। সেই জন্য কঠোর শাস্তি তাহার প্রাপ্য। কিন্তু শ'র বিচারালয়ে তার প্রতি কোন দণ্ডের বিধান নেই। বরং তার দেহের যেখানে সমাজের নিষ্ঠুর কশাঘাত ক্ষতের চিহ্ন ও কালিমা অঙ্কিত করেছে সেখানে তিনি সমবেদনার ও সহানুভূতির হাত দিয়ে প্রলেপ দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ সমাজকে তার পাশবিক আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে তীক্ষ্ণ ভ্রুকুটিভরা দৃষ্টি হেনেছেন।

'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেসন' নাটকের আলোচনা শেষ করার আগে এই নাটকের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র

সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই চরিত্রটি ফ্রাঙ্ক। ফ্রাঙ্ক বার্ণার্ড শ'র একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। তার স্বভাবের সঙ্গে তার নামের যাথার্থ্য পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। সত্যিই মানুষ হিসেবে সে ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ তার মধ্যে কপটতার কোনও চিহ্নও নেই। হয়ত তার অকালপক্কতা বা প্রগল্‌ভতা স্থানে স্থানে কিছু বেশী প্রকাশ পেয়েছে যার জন্যে সে কিছু লোকের বিরক্তিরও কারণ হবে, কিম্বা হয়তো বাবার সঙ্গে তার অশিষ্ট আচরণের জন্যে কিছু লোকের ক্ষমাদৃষ্টি সে লাভ করবে না, তবু তার সরল মন, তার ধীর অবিচলিত, সহজ অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দর্শক বা পাঠকের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হবে। মানুষকে তার প্রাপ্য মূল্য দিতে সে জানে। জর্জ্জ ক্রফ্‌টের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে তাকে চিনতে পারে। তাই তাকে মনে মনে জর্জ্জের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়—"Hallo! Sort of man that would take a prize at a dog show, aint he?" তারপর ভিভির কাছ থেকে বিদায় লাভ করবার আগে তার মা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে এল এবং কন্যার সাক্ষাতের বিলম্ব দেখে প্রত্যাবর্ত্তন করবে কিনা ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করল, তখন সে বলল—'No I always want you to stay. But I advise you to go away. এখানেও তার প্যারাডক্স উপভোগ্য।

বিরস নাটকত্রয়ীর সুদীর্ঘ আলোচনা শেষে এইবার নাট্যকার শ'কে পুনরায় প্রদক্ষিণ করে নেওয়া যাক। শ'র নাটক সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাতে জগৎ ও জীবনের কোন ভাবগভীর সত্য উপলব্ধি করা যায় না। অর্থাৎ জীবনের যে দুর্জ্ঞেয় গূঢ়তম রহস্যের সন্ধানে যুগে যুগে মানুষ তার অতল অসীমে ডুব দিয়ে অরূপ রতন উদ্ধার করেছে, শ'র নাটকে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তিনি বিরস—নাটকে জীবনের যে দিকটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে বিকট বিরূপ জড়তায় মানুষের অন্তরে ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং বিকর্ষণী শক্তিকেও তার নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে তুলছে—সেই seamy side of life-কেই প্রধান জীবনদর্শন বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই বিষয়বস্তুকে সম্বল ক'রে জীবনের এই বিরূপ দিককেই সত্য বলে গ্রহণ করা আত্মপ্রতারণার নামান্তর। কারণ অশিব এবং অসুন্দর কখনও সত্যের আসন লাভ করতে পারে না। আর সত্য দর্শন লাভ না করলে কোন সৃষ্টিই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না। অধিকন্তু যে-নৈর্ব্যক্তিকতা বা আত্মাবলুপ্তি আদি যুগ থেকে নাটকের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হিসেবে সর্ব্বস্বীকৃত হয়েছে, তাকে ইচ্ছামত লঙ্ঘন করা নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক। নাট্যকার শ'ও এই স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে অভিযুক্ত। কেননা তাঁর নাটকগুলি অনুধাবন করলে সর্ব্বাগ্রেই এই কথা মনে হয় যেন তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্যেই সেগুলি রচিত হয়েছে। বস্তুতঃ যে সুউচ্চ কবি-কল্পনা, নৈর্ব্যক্তিক রচনাশৈলী সেক্সপীয়র, গ্যেটে প্রমুখ নাট্যকারদের পৃথিবীর নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রে অতি সুদূর ভবিষ্যতেও চিরন্তন সামগ্রীরূপে সমাদরের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, বার্ণার্ড শ'র নাটকে সেই সকল গুণাবলীর অনুপস্থিতি এত প্রকট যে কোন কোন সমালোচক (যেমন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস) এরূপ অভিমত পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্ত্তমান যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র নাটকের জনপ্রিয়তাও অবলুপ্ত হবে। একথা অবশ্যই সব অনুমাণ প্রসূত। কারণ শ' আজ থেকে অর্দ্ধ শতাব্দী কালেরও পূর্ব্বে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁর প্রতি শিক্ষিত সমাজের আকর্ষণ শিথিল হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃ তা আরও সুদৃঢ় বন্ধনের আকার ধারণ করছে। অধিকন্তু শ'র কল্পনার বিশিষ্ট মতবাদের প্রাধান্য থাকলেও সময়ে সময়ে তিনি যখন নিছক খেয়ালের বশে বা রসস্রষ্টার অজ্ঞাত স্ফূর্ত্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন তখন তাঁর নাট্য প্রতিভা প্রভাতসূর্য্যের মত দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন তাঁকে নিত্যকালের শাশ্বত উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দর্শন লাভ করা যায়। 'বিরস নাটকে'র বার্ণার্ড শ' তাঁর এই মহাগৌরবময় মূর্ত্তি না দেখতে পেলেও যাঁরা তার পরবর্ত্তী যুগের নাটক—যথা ক্যান্‌ডিডা, সেন্ট জোয়ান, ম্যান এণ্ড সুপারম্যান, ব্যাক টু মেথুশিলা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন, তারা নিশ্চয়ই তা দেখে ভুলতে পারবেন না।

বিশেষতঃ তাঁর 'ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান্' এবং 'ব্যাক্ টু মেথুশিলা' নাট্যসাহিত্যে অতুলনীয়। এই দুইটি নাটকে বার্ণার্ড শ' তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানা দার্শনিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন, বর্ত্তমানকালের চিন্তা ও মননরাজ্যে তা শুধু অনবদ্যই নয় সম্পূর্ণ মৌলিকতাপূর্ণ। তাঁর প্রাণশক্তির (Life force) তত্ত্ব জীবন সম্বন্ধে গভীর এক তথ্য আবিষ্কার করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান' নাটকের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

"Of life only is there no end; and though of its starry mansions many are empty and many still unbuilt and though its vast domain is as yet unbearably desert, my seed shall one day fill it and master its matter to its uttermost confines."

বার্ণার্ড শ' আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রাণশক্তির লীলাই একদিন এই সৃষ্টিকে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মানুষকে সম্পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেবে। অতিশয় বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের কোন সংবাদপত্রে একশ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের মধ্যে শ' ও সেক্সপীয়রের তুলনামূলক আলোচনা দেখা যাচ্ছে। ইঁহাদের মধ্যে একদল যেমন বার্ণার্ড শ'র নাট্য-প্রতিভাকে সেক্সপীয়রের সহিত তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছেন, তেমন আর একদল সেক্সপীয়রকে খর্ব্ব করে শ'কে শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার অধিকারী বলে ঘোষণা করছেন। দুইজন বিপরীতধর্ম্মী বিশিষ্ট প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনা মূঢ়তারই নামান্তর। কেননা সেক্সপীয়র যে ভাবে, যে ভাষায়, যে আঙ্গিকে, যে ছন্দবন্ধে নাটক রচনা করেছেন, তার সঙ্গে শ'র ভাব, ভাষা, রচনারীতি বা আঙ্গিকের কোনও সাদৃশ্য নেই। তাছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, সেক্সপীয়রের যুগে যে নাট্যকাব্য রচিত হয়েছিল, তা একদিক থেকে সেই যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং পরবর্ত্তী যুগে তার পুনঃ প্রবর্ত্তন বা পুনঃ প্রচলন অসম্ভাব্য না হলেও সার্থক হয়নি। কারণ সেক্সপীয়রের পরবর্ত্তী যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু কবি নাট্যকার নাট্য-কাব্য রচনায় মনোযোগী হলেও আশানুরূপ সফলতা লাভ করেননি। তাই ইয়েটস (W. B. Yeats), সিঞ্জ (W. M. Synge), এলিয়ট (T. S. Elliott), অডেন (W. H. Aden), ইসারউড (Christopher Isherwood) প্রমুখ কবিগণের কাব্যগুণ সমৃদ্ধ নাটকের মধ্যে বহুদিন বিস্মৃত কবি-কল্পনার সুর উঁচু সুরে বাঁধা হৃদয়াবেগের মূর্চ্ছনা থাকলেও স্থায়ী রসের অভাবে তা আমাদের মুগ্ধ করতে বা আবিষ্ট করতে পারে না। অপরপক্ষে বার্ণার্ড শ'র সমসাময়িককালে সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে যে সকল নাট্যকার গদ্যরীতিতে নাটক রচনা করেছেন যেমন গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy) প্রিষ্টলী (J. B. Priestly), বার্কার (Granville Barker), মম্‌ (W. Somerset Maughams), কাওয়ার্ড (Noel Coward), ও' কেসী (O' Cassey) ইত্যাদি সকলে সমষ্টিগত ভাবে মানুষকে সচেতন করতে যতটা সমর্থ হয়েছেন, বার্ণার্ড শ'র একা প্রচেষ্টা তার চেয়ে দশগুণ ফলপ্রসু হয়েছে। বার্ণার্ড শ'র নাটক আবেগ প্রধান এবং তা মার্জ্জিত রুচির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একথা হয়তো ঠিক যে এবিষয়ে তিনি সবক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হননি। কেননা বিখ্যাত নাট্যকার ও'নীল (Eugene O'neil), তাঁর নাটকের (Strange Interlude or The Iceman Cometh) মাত্র দু'একটি উক্তির মাধ্যমে যে আবেগ সৃষ্টি করে সমাজকে সচেতন করতে পেরেছেন, বার্ণার্ড শ'র সমস্ত নাটক একত্রিত করলেও তার তুলনা পাওয়া যায় না, তথাপি একথা ভুললে চলবে না যে সমাজকে এমন রঞ্জন-রশ্মি বা অবলোহিত রশ্মির দৃষ্টিতে অবলোকন করে তার দেহাভ্যন্তরস্থ শিরা ও ধমনীর যেখানে সুনিশ্চিত কর্কট্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেখানে নিপুন চিকিৎসকের মত অস্ত্রোপচার করতে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

চুরানব্বই বৎসরেও শ' জীবনীশক্তির উজ্জ্বলতায় প্রাণবান ছিলেন। বিশ্বের সুধীমণ্ডলী তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উন্মুখ। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জোয়াড (C. E. M. Joad.) শ' সম্বন্ধে তাঁর একটি মনোজ্ঞ পুস্তকে যা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন—

"Of all great men he was to me the most congenial; his words came home to me more nearly: they set more bells ringing in my intellectual and spiritual consciousness than those of any other writer with the possible exception of Plato. Such a feeling of affinity is, I suspect, beyond reason, being in fact a matter of original, mental make up...His smiling directness, his wit, his resourcefulness in illustration, his command of metaphor and simile, no less than his power of marshalling fact and ordering argument, make him a superb pamphleteer. His style braves the emotions and rivets the attention."

বালু-বলয়িত বেলা বিষণ্ণ বন্ধুর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চির তৃষ্ণাতুর এ জীবন মরু সাহারার মত,
করুণার একখানি মেঘ দিত যদি কেহ ঋণ।
আশা সাধ কামনার ফসলের ভারে অবনত
মুকুলিত বনবীথি সম জানি হোতো চিরদিন।
জানি না ক এ সংসারে বহে কি না প্রীতি-রসধারা,
হৃদয়ের মেঘে মেঘে ভরে ওঠে কাজরী উৎসব
শত জীবনের মাঝে। কাঁদে মোর দুখে সন্ধ্যাতারা ঃ
শূন্য পথে সুখস্বপ্ন-মৃত্যুসম নিরুদ্ধ নীরব।

সার্থবাহী উষ্ট্রসম ভাবনার মৌন নেত্রপাতে
দীর্ঘায়িত মরীচিকা দৃশ্যাতীত রহস্যের সাথে।
তৃণে পুষ্পে পুলকিত যে মৃত্তিকা সুন্দর মধুর
পরিচয় নাহি তার সনে। মরুঝটিকার মাঝে
রৌদ্রদাহে বালু-বলয়িত বেলা বিষণ্ণ বন্ধুর।
বিক্ষোভের চরম জিজ্ঞাসা জাগে নিত্য মোর কাছে
অনাগত অপেক্ষায় কেন রহি শবরীর সম?
বেদনায় দিন যায়, বহ্নিশিখা বক্ষে জ্বলে মম।

টুকরো কথার মালা

সুশীলকুমার গুপ্ত

[ক]

সব মুছে যাবে জানি মহাকাল-হাতে;
তবুও তোমার রঙিন হৃদয়-পাতে
ক্ষণিকের আশা উল্লাসে মেতে লিখে যাই মোর নাম।
সে কি শুধু ভুল? সে কি মরীচিকা?
নেই তার কোন দাম?

[খ]

আমার হাতে দাও না তুমি ধরা;
তোমায় পাবার প্রয়াসে তাই কথায় রূপে রঙে
জীবন আছে স্বপ্ন-মধুভরা।

[গ]

নামের আখর কুড়িয়ে কি লাভ আছে?
খোঁজ যে-জন লুকিয়ে নামের পাছে।

[ঘ]

ডান চোখে ঝরে অশ্রু-বাদল, বাম চোখ নাচে সুখে;
মুখে গান গাই, অসীম তৃষ্ণা মাথা খুঁড়ে মরে বুকে।

[ঙ]

জানি না পথের শেষ কোথা আছে,
কোথায় বা এর সুরু,
তাইতো চলার ব্যথা ও খুশিতে বুক করে দুরু দুরু।

[চ]

অসীম শূন্য আকাশের নীচে, অশেষ পথের পাশে
প্রেম দিয়ে গড়ি ছোট সংসার জীবনেরি আশ্বাসে।

[ছ]

তোমার খাতার বুকে লিখিলাম নাম,
একটি হৃদয় রাখিলাম!
দাম তারে দাও বা না দাও,
যত ভোল, ভুলে যেতে চাও
ততো তার স্থান
সমস্ত হৃদয় জুড়ে; স্মৃতি-ব্যথা-গান
দুর্লভ মর্য্যাদা দেবে তারে,
না ভোলা প্রাণের অঙ্গীকারে।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

চার

ক্রমে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো তারা, বাল্য ও কৈশোরকে অতিক্রম ক'রে ক্রমে এসে দাঁড়ালো তারা যৌবরাজ্যের প্রথম দুয়ারে। সামাজিক অনুশাসন ক্রমান্বয়ে ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো তাদের জীবনে। বাংলার চিরাচরিত গ্রাম্যসমাজের বিধিনিষেধের গণ্ডি, তা থেকে মুক্ত ছিল না মাধুরা; নবগঙ্গা অনেক জঞ্জাল ধুয়ে নিয়ে গেলেও মানুষের মন থেকে সংস্কারকে মুক্ত ক'রতে পারেনি। সমাজের সেই চিরাচরিত সংস্কার একসময় চক্রান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো তাদের তিনটি জীবনে। বিজন ব্যাটাছেলে, সমাজের চাইতে বেশী ভয় তার মাকে; বিধবা হ'লেও অনেকখানি মুক্ত-হৃদয় নির্ম্মলা, কিন্তু মুক্ত-হৃদয় হ'য়েও কি কেউ সমাজমুক্ত হ'তে পারে? নির্ম্মলাও পারেন নি, বরং পেরেছে অনেকটা বিজন। আর পেরেছে সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে রেবা। ব্রাহ্মঘরের মেয়ে সে, হিঁদুয়ানী সংস্কার তাকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু ছন্দার পক্ষে বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিতে হ'য়েছে শাস্ত্রসম্মত সমস্ত সংস্কারকে। নিজের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে সে ল'ড়তে পারে নি কিছুর বিরুদ্ধে। কাকিমার সংসারে পল্লবগ্রাহী পরগাছার মতো জীবন তার। সমাজ এসে প্রতিমুহূর্ত্তে কাকিমার চোখের মধ্য দিয়ে উঁকি দেয় আজ তার দিকে। ছোট্টবেলার দিনগুলোর মতো আজ আর ইচ্ছে-খুসী মতো চ'লে-ফিরে বেড়াতে পারে না সে। নিজের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে নিজেই শিউরে ওঠে ছন্দা। তার জীবনে এ আজ কিসের পরিবর্ত্তন?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তেমন একটা পরিবর্ত্তন রেবার জীবনেও এসেছে বৈ কি। তবে সে-পরিবর্ত্তন ছন্দার মতো তাকে সঙ্কোচে বিহ্বল করে নি, বেশে-পরিপাট্যে বরং আরও অনেকখানি মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে রেবা।

মাঝখানে অচঞ্চল হিম-গিরির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিজন। মনের একদিকে তার রেবা, আর-একদিকে ছন্দা। খেলাঘরের প্রথম দিন থেকে কবে না-জানি নিজের অজ্ঞাতসারেই বিজন নিজের মনের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছিল এ দু'টি হৃদয়কে একান্ত ভাবে। কেমন একটা মিষ্টি সুর আর মধুর ছন্দে এতদিন ভরা ছিল সেই জীবনটা। আজ চারদিকে তাকিয়ে বড় নিঃস্ব, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে দিনগুলো। খেলা-ঘরের দিনগুলো আজ শুধু অতীতের স্মৃতি হ'য়েই মনে ভাসে। কেমন ছাড়া-ছাড়া, কেমন যেন অসংলগ্ন আজ সব কিছু। ইচ্ছে ক'রেও আজ আর দু'দণ্ড বেশী ব'সে গল্প ক'রবার অবকাশ নেই ছন্দা কিম্বা রেবার সঙ্গে। কেমন যেন বাধো-বাধো ভাব, কেমন যেন সঙ্কোচ আর চকিত লজ্জা! মনে মনে অনুভব করে বিজন, কিন্তু হৃদয় সায় দেয় না।

এদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তার ভালোভাবে উত্তীর্ণ হবার সংবাদ বেরোলো। উদ্যোগ ক'রলো এবারে সে দৌলতপুর কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হ'তে।

এমনসময় রেবা এসে ব'ল্‌লো, 'তোমার কাছে খেতে চেয়ে মুখ হারাবো না। তোমার পাশের খবর যথাসময়েই মার কানে গিয়ে পৌঁছেচে, সন্ধ্যায় তোমার নেমন্তন্ন রইল আমাদের বাড়ীতে।'

রেবার দিকে মুখ তুলে আজ কেন যেন 'তুই' ব'লে তাকে সম্বোধন ক'রতে পারলো না বিজন, কৌতূহলোদ্দীপ্ত চোখ দু'টি তুলে ধ'রে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আজ তবে পেট ভ'রে মিষ্টি খেতে পাচ্ছি মাসীমার হাতে, তাই না?'

—'তা আমি কি জানি, যেয়ো তো, সে যা বুঝবেন।' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো রেবা।

এমন সুন্দর হাসি এর আগে কোনোদিন দেখ্‌বার অবকাশ হয় নি বিজনের। মুখ টিপে হাসির মধ্যেও মানুষের এত লাবণ্য স্পষ্ট লক্ষ্যে পড়ে!

সন্ধ্যায় গিয়ে সত্যিই সে মিসেস মল্লিকের হাতে পেট ভ'রে মিষ্টি খেয়ে এলো।

শুভকামনা জানিয়ে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'দীর্ঘজীবী হও, কৃতকার্য্য হও জীবনে! আজ তোমার মার কত বড় সুখের দিন, ভেবে দেখ তো বিজন!'

বিজন কি উত্তর দেবে, ভেবে পেলো না।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বড় হ'য়ে মার দুঃখ ঘোচাবে বিজু, এই আশাতেই যে দিনরাত বুক বাঁধছেন তিনি।'

মল্লিক দম্পতির আলোচনার মধ্যে একসময় উঠে প'ড়লো বিজন।...

নির্ম্মলার হাতেও রেবা আর ছন্দার মিষ্টি-যোগটা একেবারে ফাঁকা গেল না।

নিভৃতে একসময় কাছে এসে ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তুমি নাকি কলেজে প'ড়বার জন্যে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছো বিজুদা?'

—'না যেয়ে উপায় কি বল্? লেখাপড়া শিখ্‌তে হবে তো!' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ যদি আমাদের এ মহকুমায় কলেজ থাকতো, তবে কি আর ঘর ছেড়ে ন'ড়তাম!'

কেন যেন বহুক্ষণের মধ্যে এবারে কিছু একটাও আর ব'লতে পারলো না ছন্দা, একটা অব্যক্ত বেদনায় চোখ দু'টি শুধু ছল্ ছল্ ক'রতে লাগলো।

দৃষ্টি এড়াল না সেটুকু বিজনের। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'আমি চ'লে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে, না রে?'

অস্ফুট কণ্ঠে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'না, কষ্ট কিসের!' তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে বিজনের পাশ থেকে স'রে গেল।

স'রে গেল সে শুধু নিজেকে না সাম্‌লাতে পেরে। তার খেলাঘরের জীবন থেকে সুরু ক'রে পরম আত্মীয় ব'লে ভেবে এসেছে সে বিজুদাকে। বিজুদার সান্নিধ্যে তার পরম শান্তি, নির্ম্মলার মতো মাসীমার স্নেহের মধ্যে তার প্রতিদিনের সকল কাজের সকল উৎস। এঁদের সান্নিধ্য ভিন্ন তার ব্যথাহত জীবনে সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? তার আকাশ যখন কালো মেঘে ঢেকে যায়, তখন যে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় বিজুদা আর মাসীমা নির্ম্মলা। বিজন চ'লে যাবে শুনে অবধি মনের মধ্যে কেমন যেন একটা তীব্র অস্বস্তি পোড়া বালির মতো ঝিকি ঝিকি জ্ব'ল্‌ছিল, নিভৃতে এসে একসময় তা অশ্রু হ'য়ে ঝ'রে প'ড়লো।

বিষণ্ণতায় নির্ম্মলার মনও কম অস্থির ক'রছিল না। সারা ঘরের একমাত্র অবলম্বন তাঁর বিজন। সে চ'লে গেলে একা ঘরে তিনিই বা কী নিয়ে থাকবেন? তাই বিজন যখন অনুমতি চেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো, ছেলের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সমস্ত-কিছু বুঝেও মত দিতে গিয়ে অশ্রুতে দু'চোখ ভ'রে উঠলো নির্ম্মলার।

প্রবোধ দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'মিছেমিছি এম্‌নি ক'রে চোখের জল ফেলে আমাকে বাধা দিওনা মা। উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে একদিন তোমার মুখ উজ্জ্বল ক'রবো, এই আশা নিয়েই তো যাচ্ছি মা! আশীর্ব্বাদ করো আমি যেন কৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরতে পারি! তোমার আশীর্ব্বাদ যে আমার জীবনের অক্ষয়-কবচ মা! হাসিমুখে তোমার পায়ের ধুলো দাও আমার মাথায়।'

নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদের স্নেহকর প্রসারিত ক'রলেন নির্ম্মলা বিজনের মথায়, স্বভাবজাত কণ্ঠে আর-একবার উচ্চারণ ক'রলেন তিনি স্বামীর উদ্দেশে: 'তুমি যে-লোকেই আজ থাকো না কেন, আশীর্ব্বাদ করো তোমার বিজুকে।'

মিথ্যে আর কালবিলম্ব ক'রলো না বিজন। নবগঙ্গার ঘাটে নৌকো বাধা ছিল। মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে এক-

সময় গিয়ে উঠে ব'স্‌লো সে নৌকোয়। গলায় কি একটা ভাটিয়ালী সুর ভেঁজে তীর ছেড়ে মাঝগাঙে এসে বৈঠা ধ'রলো মাঝি। তীরে দাঁড়িয়ে নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু গোপন ক'রে নিলেন নির্ম্মলা। সে অশ্রু বিজনের চোখেও কম বইল না। খেলাঘরের প্রথম জীবন থেকে আজ পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত কথা মনে প'ড়ে কেবলই আলোড়িত ক'রে তুল্‌তে লাগলো তাকে। কেউ তা দেখ্‌লো না, কেউ তা জান্‌লো না, শুধু তার মনের কথা দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে নবগঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে গেল।...

পাঁচ

ক্বচিৎ কখনো সুযোগ পেলেও ইদানীং আর আগের মতো মাসীমা নির্ম্মলার কাছে এসে দু'দণ্ড ব'সে যেতে কেন যেন মনের দিক দিয়ে বড়-একটা সাড়া পায় না ছন্দা। বর্ষা-শেষে শুক্‌নো চরের মতো একেবারে খাঁ খাঁ করে এদিকটা। বিজুদা আজ গ্রাম-ছাড়া, একথা ভাব্‌তেও যেন মনটা কেমন বিবিয়ে ওঠে। মাসীমা নির্ম্মলার স্নেহ—প্রতিমুহূর্ত্তে তা মায়ের মতো ক'রে আকর্ষণ করে তাকে, সে স্নেহটুকু ছাড়া তার বাঁচা কঠিন। অথচ বিজুদার অভাবে আজ মাসীমার স্নেহটুকুও যেন কেমন অতি দূরের ব'লেই মনে হয়।

মাঝখানে রেবা এসে দিন দু'য়েক ঘুরে গেছে। শূন্য ঘরের বিবাদে ভরা নিজের অদৃষ্টকে যতখানি সম্ভব তুলে ধরেছেন নির্ম্মলা তার কাছে: 'চেষ্টা ক'রছিস বুঝি মাসীমাকে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে, না?'

—'না মাসীমা, ভুল্‌বো কেন, এই তো এলাম!' ব'লে কতকটা নিজেকে গোপন ক'রে নিয়েছে রেবা: 'আজকাল বড় হ'য়েছি ব'লে যা ইচ্ছে খুসী মতো আমাকে দিয়ে যখন-তখন কাজ করিয়ে নেয়। সময় যে কোথা দিয়ে চ'লে যায়, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে।'

—'তবু ভালো যে দিদির দুঃখ এতদিনে ঘুচ্‌লো।' নির্ম্মলা বলেন, 'তবু তার মধ্যেই কি ইচ্ছে থাক্‌লে সময় হয় না একবারটি এসে ঘুরে যেতে? তোরা ছাড়া এ শূন্য পুরীতে আজ আর আমার কে আছে, বল্‌ তো মা?'

এবারে জবাব দেওয়া শক্ত হয় রেবার পক্ষে। কিছুক্ষণ এ-কথায় সে-কথায় কাটিয়ে একসময় আবার বাড়ীর পথ ধ'রেছে সে।

দিনগুলি আবার তেমনি নিঃসঙ্গতায় ভ'রে উঠেছে নির্ম্মলার। ক্বচিৎ-কখনও মিসেস মল্লিক এসে দু'দণ্ড গল্প ক'রে যান, সপ্তাহেও তা একবার হবে কি না সন্দেহ। চেষ্টা ক'রে নিজেকে প্রশমিত ক'রতে হয় নির্ম্মলাকে।

সেদিন বিকেলের দিকে কাকিমার চোখ এড়িয়ে একসময় ছন্দা এসে দাঁড়ালো নির্ম্মলার সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'বিজুদার খবর কি মাসীমা, কুশলে আছে তো, অসুবিধে হ'চ্ছে না তো কিছু? আমার কথা বুঝি কিচ্ছুটি লেখেনি চিঠিতে?'

—'লেখে নি কি রে পাগ্‌লি, তোদের ছেড়ে গিয়ে একটা মুহূর্ত্তও ওখানে মন টিক্‌ছে না বিজুর, কত ক'রে লিখেছে। তুই তো দিনান্তেও একবারটি এ মুখো হবি নে, জানবি কি করে?' ব্যথাকাতর চোখ দু'টিএকবার তুলে ধরলেন নির্ম্মলা ছন্দার দিকে।

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'এ অনুযোগ যে সইতে হবে, জানতুম মাসীমা। কিন্তু কেন যে আসতে পারি না, সেটুকুও তো বুঝতে পারেন! এমন অদৃষ্ট ক'রে আসিনি যে, দু'দণ্ড এসে আপনার কোলে মুখ লুকিয়ে শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরবো।'

এবারে স্বল্পক্ষণের জন্য থাম্‌লেন নির্ম্মলা, তারপর ব'ল্‌লেন, 'হ্যাঁরে, কাকা তোর কিছু বলেন না?'

—'কাকাকে কিছু বলবার মতো সুযোগ দিলে তো কাকিমা!' ব্যথাহত কণ্ঠে ছন্দা ব'ললো, 'কাকাকে বড় একটা দেখা যায় না বাড়ীর ভিতরে, এক খাবার সময়ে এসে নীরবে খেয়ে উঠে চ'লে যান।'

—'অন্তরে তাঁরও দুঃখ কম নয়। শান্তি পেলেন না জীবনে ভদ্রলোক।' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ধন্যি মেয়েমানুষ তোর কাকিমা, অমন শিবের মতো স্বামী পেয়েও তাঁর মনে একটা মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি দিতে পারলে না!'

বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'মাঝে মাঝে ভাই ভাবি মাসীমা, নিজের সংসারে যেখানে কাকাই জীবনে সুখী নন্, আমি সেখানে কোন্ ছার।'

—'তাই ব'লে সংসারে একটি মানুষ শুধু অত্যাচার ক'রেই যাবে, তার কোনো প্রতিকার নেই?'

—'নেই কেন মাসীমা, আছে। এ সংসার থেকে বিদেয় হ'য়ে যেতে পারলেই প্রতিকার, তার আগে নয়। তা যাক্ গে।' থেমে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'বিজুদার কথা বলুন মাসীমা।' খুব শীগ্‌গিরই আবার ফিরে আসচে তো বিজুদা?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'খুব শীগ্‌গির আর কোথায়? সাম্‌নে পুজোর ছুটি, তার আগে কি আর বিজু আস্‌তে পারবে!'

—'এবারে আপনি যেদিন চিঠি লিখবেন, আমিও কিন্তু দু'কলম লিখে দেবো সেই সঙ্গে, মনে থাকবে তো মাসীমা?'

—'আমি কবে লিখবো আর তুই কবে আসবি, তার কিছু ঠিক আছে!' নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'পারিস তো কাল সকালেই দিয়ে যাস্ দু'কলম লিখে, পেয়ে খুসীই হবে বিজু।'

কিন্তু পরদিন সকালে এসে আর বিজুদাকে চিঠি লেখা হ'লো না ছন্দার। নির্ম্মলার কাছ থেকে উঠে যখন সে ঘরে ফিরলো, সন্ধ্যার আবছায়ায় তখন চারদিক ভ'রে উঠেছে। ঘর থেকে বেরোবার সময় কাকিমার চোখে পড়ে নি সে, কিন্তু ফিরে এসে ঘরে দাঁড়াতেই এক অনর্থ ঘ'টলো। সাম্‌নে এসে অঞ্জনা একেবারে ফেটে প'ড়লেন: 'বলি, এই ভর সন্ধ্যায় কোথা থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরলি? ঘর-সংসারের কাজ কি এর মধ্যেই মিটে গেল! একটু চোখের আড়াল হয়েছি কি অম্‌নি ফুর-ফুর ক'রে ঘর ছেড়ে পাড়া বেড়াবার ধুম পড়ে যায়! বলি, বুনো বাগ্দীদের মতো যদি অত পাড়ায় পাড়ায় বেড়াবারই সখ, তবে ঘর ছেড়ে পথেই যা না, আমিও নিশ্চিন্তি হই, তুইও বাঁচিস! ধিঙ্গী মেয়ে হ'য়েছে, এখনও লজ্জাসরমটুকু পর্য্যন্ত হ'লো না। এদিকে সারা বাড়ী চেঁচিয়ে মরে' মন্দের ভাগী হই আমি।'

মাথা নীচু ক'রে নিজের কাজে গিয়ে মন দিল ছন্দা। টু-শব্দটি পর্য্যন্ত ক'রলো না। কিন্তু আত্মগ্লানিতে নিজের মধ্যে একেবারে ভেঙে পড়লো সে। নিশ্চিত বুঝে নিল ছন্দা—বিজুদাকে ঘরে ব'সে হয় ত চিঠি লেখা সম্ভব, কিন্তু মাসীমা নির্ম্মলার হাতে গিয়ে তা পৌঁছে দিয়ে আসা আদৌ সম্ভব নয়। সকালে উঠে তাই ব'লে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে, কিন্তু যখন দেখলো—খাড়া প্রহরীর মতো অনবরত কাকিমা তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরচেন, তখন সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে শুধু একবার উচ্চারণ করলো সে: 'আমার কোনো কিছুই তো তোমার জান্‌তে বাকী নেই বিজুদা, চিঠি দিতে পারলুম না ব'লে তুমি যেন চিঠি দেওয়া বন্ধ কোরো না!'

ততক্ষণে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে আবার কি একটা নিয়ে ফেটে প'ড়েছেন অঞ্জনা।

সেদিকে কান না দিয়ে নীরবে আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল ছন্দা।

দুই

মাঝখানে বার দু'য়েক চিঠি এসেছে বিজনের। তাতে দূরে গিয়ে মার অন্ন কষ্টটাই ফুটে উঠেছে বিশেষ ক'রে। তা-ভিন্ন আর-একটা অভাবও একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়। চিঠির এখানে ওখানে বার বার ক'রে উল্লেখ র'য়েছে রেখা আর ছন্দার। সাথীহীন একাকিত্বের মধ্যে দিনগুলি যে কতখানি দুঃখে কাটছে বিজনের, মা হয়ে নির্ম্মলার কাছে সেটুকু অজ্ঞাত নয়। নিজের মনে দুঃখ পাওয়া ভিন্ন আজ আর কিছু ক'রবার নেই তাঁর। কিন্তু এর বাইরেও আশ্বস্ত হবার মতো কিছু সংবাদ ছিল চিঠিতে। হোষ্টেলে সিট পেয়ে সুস্থ'মতো ব'স্‌তে পেরেছে বিজন, পড়াশুনো গোড়া থেকেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে চেষ্টা চলেছে কিছু একটা টুইশনি পাবার।

সেদিন মিসেস্ মল্লিক বেড়াতে এলে এ-কথা সে-কথায় টুক্‌রো টুক্‌রো নানা আক্ষেপের সুর তুলে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ওখানে গিয়ে ছেলের আমার বুদ্ধি হ'য়েছে, যাই বলুন দিদি। নিত্যদিনের অভাবের সংসার থেকে কিছু গিয়ে যে তার হাতে পৌঁছাবে না, একথা বিজু ভালোভাবেই

জানে। চেষ্টা ক'রছে তাই কাছে-পিঠে কোনো ছেলে পড়িয়ে ওখানকার খরচটা তুলে নিতে। মন্দ কি!'

মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'অত পরিশ্রম কি ওর সইবে? কোনোদিন তো কষ্ট ক'রতে হয়নি জীবনে, হঠাৎ এমন কষ্টের মধ্যে প'ড়ে পড়াশুনোর তো ক্ষতি হবে না বিজুর?'

—'না, না, ক্ষতি কেন হবে!' একান্ত আশ্বস্ত চিত্তেই নির্ম্মলা ব'ললেন, 'কত ছেলে ওর চাইতেও কত কষ্ট ক'রে পড়ে, তাদের কি আর লেখাপড়া হয় না! আপনাদের শুভেচ্ছায় ওর কোনো কষ্টই গায়ে লাগবে না।'

মিসেস মল্লিক এবারে চুপ ক'রে গেলেন।

থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'আমারও হ'য়েছে তেমনি অদেষ্ট দিদি। মাত্র তো মুঠোখানেক জমি, কর্ত্তা বেঁচে থাকতে চাষীরা ফসল আর খাজনা মিটিয়ে দিতে দেরী করে নি। আজ খবর দিয়ে পর্য্যন্ত তাদের ডেকে পাওয়া ভার। খাজনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, দু'দানা ফসলের পর্য্যন্ত আজ আর মুখ দেখতে পাই না। এই যদি অবস্থা হয়, তবে কি ক'রে সংসার চালাই, বলুন তো?'

সমবেদনা জানিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'সংসারে ব্যাটাছেলে না থাকলে যা হয়। চাষী তাড়িয়ে বেড়ানো কি মেয়েদের কাজ! বিজু এসে নিজের চোখে সব দেখাশোনা ক'রলেই এ সমস্যা আর থাকবে না। তখন দেখবেন দু'বেলা চাষীরা এসে আবার দুয়োরে ধন্না দেবে।'

—'কিন্তু সমস্যা তো তাতে ঘুচলো না!' নির্ম্মলা ব'ললেন, 'আজই যদি বিভুঁয়ে থেকে বিজুকে কষ্ট ক'রতে হ'লো, তবে ভবিষ্যতের সুখ দিয়ে আমার কি হবে?'

—'বিজুর জীবনে তার প্রয়োজন আছে। আজকের জীবনের বাইরে যে তার অনন্ত কাল প'ড়ে র'য়েছে, সেটুকুও তো ভেবে দেখবেন!' উঠে বিদায় নিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি; মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনিই চালিয়ে নেবেন, দুঃখ ক'রে মানুষ কতটুকু কি ক'রতে পারে!'

সত্যিই পারে না, নিজের ইচ্ছায় কিছুই ক'রতে পারে না মানুষ। ভগবান ভিন্ন অক্ষম হৃদয়ের নির্ভরতা এ পোড়া সংসারে সত্যিই কি কোথাও আছে! যুক্ত হাত কপালে স্পর্শ ক'রে সেই ভগবানের উদ্দেশেই একবার প্রণাম জানালেন নির্ম্মলা, তারপর উঠে সম্ভবতঃ কিছু একটা কাজের উদ্দেশ্যেই কোথায় একদিকে চ'লে গেলেন।...

চোখের উপর দিয়ে বর্ষার মেঘ গড়িয়ে গেল। আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবনের পর এলো ভাদুরে ধারা। দু'কূল ছাপিয়ে উছলে পড়লো নবগঙ্গা। গ্রামের সব চাইতে ভীষণ এবং সাহসী পুরুষ হরি মুখুজ্জে পাড়া চড়িয়ে বেড়ান নানা কথার সূত্র টেনে। তিনিই একসময় রটালেন—এবার নাকি বান ডাকবে নবগঙ্গায়। শুনে ভয়ে ত্রাসে বুকখানি একবার দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো নির্ম্মলার। এখনই নদীর যা অবস্থা হ'য়েছে, এরপর বান ডাকলে বাস্তু-ভিটে-টুকুও আর রক্ষা করা যাবে না। এতদিনের বাড়্ বো পরিবারের সমস্ত স্মৃতিটুকুই তবে একদিনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

কিন্তু যত বড় গলা ক'রে হরি মুখুজ্জে কথাটা রটালেন, ঠিক তত বড় ক'রে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর নবগঙ্গাকে প্রসারিত হ'তে দেখা গেল না। কিছুকাল ঘরে ব'সে গুড়গুড়িতে তামাক টেনে নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলেন তিনি। ধীরে ধীরে জল ক্রমে সরে গিয়ে শরতের স্বচ্ছ নীলাঞ্জনকে আহ্বান জানালো নবগঙ্গা।

শারদীয়ার সমারোহে চারদিক মুখরিত হ'য়ে উঠলো। কলেজের ছুটি হ'লে একটা দিনও আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। সোজা রওনা হ'য়ে এলো সে বাড়ীতে। ইচ্ছে ছিল—দৌলতপুর বাগেরহাট ঘুরে বেড়া আর মার জন্য ভাল কিছু উপহার কিনে নিয়ে আসবে সঙ্গে: শারদীয় উপহার। কিন্তু তবিল হাতড়ে দেখলো—শূন্য। যা আছে, উপহার কেনা তো দূরের কথা, পথ-খরচার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। মুহূর্ত্তের জন্য একবার বিষণ্ণতায় সমস্তটা মন ভার ভ'রে উঠলো। মনের এই সামান্য সাধটুকু মেটাবার মতও তার অবস্থা নয়। বড় দুঃখে একবার ধিক্কার দিল সে নিজের অদৃষ্টকে। শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে এলো দু'জনের জন্য দু'খণ্ড কলেজ-

ম্যাগাজিন। বিজনের একটি সদ্য রচিত কবিতা বেরিয়েছে তাতে। জীবনের ব্যথা-বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে কবিতাটি রচিত। উপহার হিসেবে এই বা একেবারে তুচ্ছ কি! জীবনের প্রথম রচনা নিজের হাতে উপহার দিচ্ছে সে, পৃথিবীর অনন্ত সম্পদের মধ্যে এ-ই কি কিছু কম?

মাকে এসে আবৃত্তি ক'রে শোনাতে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'এ ভাব তুই পেলি কোত্থেকে বাবা?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'কেন, তোমার কাছ থেকে, তোমার চোখের জলের মধ্যেই যে আমার প্রথম কাব্যের উৎস লুকিয়ে আছে মা! প্রফেসারেরা খুব প্রশংসা ক'রেছে কবিতাটার। মনে হ'চ্ছে—চেষ্টা ক'রলে ভবিষ্যতে আমি খুব ভালো সাহিত্যিক হ'তে পারবো। কেমন, পারবো না মা?'

—'কেন পারবি নে বাবা, নিশ্চয়ই পারবি।' অলক্ষ্যে নিজের মধ্যে একটা আনন্দের নিঃশ্বাস চেপে নিলেন নির্ম্মলা।

ম্যাগাজিন নিয়ে যখন রেবা আর ছন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বিজন, তখন দেখা গেল—বাজারের কেনা উপহারের চাইতে বিজনের উপস্থিতিতে তার কবিতাটাই বিশেষভাবে মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে।

বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে শিখলে কবে থেকে বিজুদা?'

মুচকি হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'খেলোয়ার হ'য়ে শুধু মেডেল জিতে আন্‌তেই দেখেছিলি, খাতা খুলে কবিতা লেখবার তো কোনোদিন অবকাশ হয় নি, জান্‌বি কি ক'রে?'

—'এতদিন তবে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতে, বলো?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'এবারে দিলুম তো অবাক ক'রে!'

—'তা ক'রলে বটে।' ব'লে একবার মুগ্ধ হাসি হাস্‌লো রেবা।

ছন্দা কিন্তু কবিতার কথাটা একেবারেই উল্লেখ ক'রলো না। বিজনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টিটুকু একবার তুলে ধ'রে শুধু ব'ল্‌লো, 'এতদিনে তবে দেশের কথা তোমার মনে প'ড়লো বিজুদা? এতদিনও মানুষ দেরী করে?'

—'ছুটি না হ'লে কলেজ-পালিয়ে এলে যে পার্সেন্টেজ কাটা যায়, তাও কি জানিস্ নে বোকা? ছুটি হ'লে কি একটা দিনও দেরী ক'রেছি?'

'পার্সেন্টেজ' শব্দটা একেবারেই নতুন ছন্দার কাছে, তবু সে আভাবে এটুকু বুঝে নিল যে, কলেজ কামাই ক'রলে কিছু একটা ক্ষতি হ'তো বিজুদার, এবং সে ক্ষতিটা নিতান্তই কম নয়। ব'ল্‌লো, 'কতদিন ভেবেছি চিঠি দিই, মাসীমাকেও ব'লেছি কতবার, কিন্তু সংসারের যাঁতা-কলে ঘুরে একটা দিনও কি ছাই পেরেছি কাগজ কলম নিয়ে ব'স্‌তে! একটুও তাতে শান্তি পাই নি বিজুদা।'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে কিছুক্ষণ থেমে কি যেন একবার চিন্তা ক'রলো বিজন, তারপর ব'ল্‌লো, 'এবার থেকে বড় ক'রে চিঠি দিস্! বিভুঁয়ে একা একা কি ক'রে যে দিন কাটে, জানিস্ না তো! সব সময় আকর্ষণ করে এখানকার সব কিছু।"

কেন যেন এবারে চোখ দু'টো তুলে একবার ভালো ক'রেও তাকাতে পারলো না ছন্দা বিজনের মুখের দিকে! স্বল্পক্ষণ কেটে গেলে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'কিছু সাত তাড়াতাড়িই আবার চ'লে যাচ্ছো না তো বিজুদা?'

—'থাকলেই বা এমন কি সুবিধে, তুই তো পালিয়ে পালিয়েই বেড়াবি!' বিজন ব'ল্‌লো, 'নইলে ছুটি হাতে আছে এখনও পুরো এক মাস।'

—'তবে তুমি আছো নিশ্চয়ই।' ব'লে আর এক-মুহূর্ত্তও দেরী ক'রলো না ছন্দা। কাকিমার সংসারে কাজ থেকে তার অবকাশ নেই। এখনও এক পাঁজা বাসন মাজা বাকী। গিয়ে আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল ছন্দা।...

মিসেস মল্লিক সেদিন কাছে বসিয়ে ফল, মিষ্টি আর ঘরে তৈরী আচার খাওয়ালেন বিজনকে, মিঃ মল্লিক এসে খানিকটা পিঠ চাপড়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'তোমার কবিতার রসাস্বাদ থেকে আমাকেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত ক'রে

নি রেবা। মাইকেলের পর মনে হ'য়েছিল বাংলা অমিত্রাক্ষরে ভাঁটা প'ড়লো, কিন্তু তোমার কবিতা প'ড়ে সে মত পরিবর্ত্তন ক'রতে আমি বাধ্য হ'য়েছি। বাস্তবিকই স্প্লেন্‌ডিড্‌, অপূর্ব্ব। মাইকেলও এই যশোরেরই লোক ছিলেন, তুমি তাঁর উত্তর-সাধক; তোমাকে আজ আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বিজু। বড় হও, দীর্ঘজীবী হও, যশস্বী হ'য়ে ওঠো তুমি।'

এমন প্রশংসা জীবনে এই প্রথম। লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল বিজন। অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে দেখলো—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাস্‌চে রেবা। মানুষের প্রশংসায় যে নিজেকে এতখানিও অপ্রস্তুত বোধ ক'রতে হয়, তা এই প্রথম বোধ ক'রলো বিজন। মিঃ মল্লিকের অভিনন্দনের উত্তরে কিছু-একটাও না ব'ল্‌তে পেরে নীরবে উঠে সে একবার প্রণাম ক'রতে গেল তাঁকে।

বাধা দিয়ে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ছিঃ ছিঃ, প্রণাম কেন ক'রবে তুমি। বামুনের ছেলে হ'য়ে ওটা ভালো দেখায় না।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'জাতের বিচারটাই বড় হ'লো, মানুষ কিছু নয়? এমন সমাজের ভালো দেখাদেখির মধ্যে আমি নেই মেসোমশাই।'

—'মাইকেলও ঠিক এমনি ছিলেন।' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কিন্তু দেশাচার কি এক দিনেই বদ্‌লানো যায়, না সম্ভব। তা ছাড়া ওটা দাসমনোবৃত্তির লক্ষণ। মাথা উঁচু রেখে সবসময় চ'ল্‌বে, কোথাও তাকে নোয়াতে যেয়ো না। সেটা বড় হবার লক্ষণ নয়।'

নম্রকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'তবু গুরুজনদের ক্ষেত্র তো স্বতন্ত্র বটেই। তাকে অস্বীকার ক'রলে যে মানুষের মনুষ্যত্ব ব'লে আর কিছুই থাকে না মেসোমশাই।'

মিঃ মল্লিকের পক্ষে এবারে উত্তর দেওয়া শক্ত হ'লো। কথাটাকে প্রসঙ্গান্তরে টেনে নেবার চেষ্টা ক'রে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'দিদির মুখে শুনেছিলাম তুমি ট্যুইশনি খুঁজ্‌ছো, তা পেলে কিছু বাবা?'

—'হাঁ পেয়েছি, পনেরো টাকা মাইনে। ক্লাশ সেভেন আর এইটের দু'টি ছেলে, সকাল বিকেল পড়াতে হয়। অবস্থা ভালোই, তবে ওর বেশী আর দিতে চায় না।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তা—ওর বেশী কেই-বা আর দিতে চায় আজকাল। আমার হোষ্টেল আর কলেজের খরচাটা উঠে গেলেই হ'লো, না কি বলেন মাসীমা?'

—'তা হ'লেই যথেষ্ট।' মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কিন্তু আমি ভাবৃচি—দু'বেলা তুমি যদি ট্যুইশনিই ক'রবে, তবে নিজের বই নিয়ে বস্‌বার সময় কোথায়?'

—'আমিও প্রথমটা এ-কথাই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম—সময় ক'রে নিলে ঠিকই হ'য়ে যায়।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। বিকেলের রোদ তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেছে। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আহ্নিকে ব'সেছে মা। উঠে সে এবারে সোজা বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

অনুমান তার মিথ্যে নয়। আহ্নিকে বসা নয়; আহ্নিক সেরে সবে উঠ্‌লেন তখন নির্ম্মলা। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কোথেকে কাটিয়ে এলি এতক্ষণ বিজু?'

ঘরে গিয়ে গা থেকে জামা খুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বিজন ব'ল্‌লো, 'ওবাড়ীর মল্লিক-মাসীমার হাতে পেটপুরে খুব ফল, মিষ্টি আর আচার খেয়ে এলাম মা। খাসা আচার, জলপাই আর কৎবেলের। তুমিও কেন অম্‌নি ক'রে তৈরী করো না মা? বেশ লাগে খেতে।'

মুখ টিপে হেসে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'পাগ্‌লা ছেলে, কার জন্যে আচার ক'রবো বল্ তো?'

—'কেন, কার জন্যে আবার। ভেবেছ আমি বাড়ী নেই ব'লে আচার ক'রতেও নিষেধ আছে? বানিয়েই দেখ না, এমনি এক একটা ছুটিতে এসে তোমার ভরা বয়োম সব খালি ক'রে দিয়ে যাবো।' ব'লে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে হেসে ফেল্‌লো বিজন।

ঝাল, মিষ্টি আর টক মিলিয়ে খেতে সে যে কত ভালোবাসে, মায়ের প্রাণে তা অজানা ছিল না নির্ম্মলার। নিজের অক্ষমতার জন্য মনে মনে এই নিয়ে বড় কম দুঃখ পেলেন না তিনি। ব'ললেন, 'আচ্ছা, এবারে বানিয়ে রাখবো, দেখবো কত আচার খেতে পারিস তুই।'

হাস্‌তে হাস্‌তেই এবারে লুটিয়ে প'ড়লো বিজন মায়ের কোলের কাছে।—'ভেবেছ, আমি বুঝি একটা রাক্ষস। আচার বানাতে গিয়ে তোমাকে আর পরিশ্রম ক'রতে হবে না। কবে ছুটি পাবো, তবে আসবো, ততদিনও আবার আচার থাকে নাকি! ও দিয়ে কাজ নেই মা।'

—'আচ্ছা, সে দেখবো।'—বিজনের মাথাভর্তি এক-বোঝা চুলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

আরামে চোখের পাতা বুজে আসছিল বিজনের।

স্বল্পক্ষণ থেমে পুনরায় নির্ম্মলা ব'ললেন, 'এবারে তুই থাকতে থাকতে চাষীদের দু'কথা ব'লে যা বিজু। আমি যে আর পেরে উঠ্‌ছিনা ওদের নিয়ে। ঘরে না আসচে দু'দানা ধান, না পাচ্ছি খাজনা। এমনি হ'লে সংসার চালাই কি ক'রে?'

বিজন ব'ললো, 'তোমাকেই যখন ওরা অবজ্ঞা ক'রতে শিখেছে মা, তখন কি আমার কথাই কিছু একটা শুনবে ওরা?'

—'না শুনলে শোনাবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ঘরে কোনো পুরুষ-ছেলে না থাকলে এ কি আমার কাজ, বল্ তো বাবা?'

এবারে সত্যিই ভাবতে হ'লো বিজনকে। ভাবলো—কালই তসর আলীদের পাড়ায় গিয়ে এর একটা হিল্লে ক'রে আসবে সে।

পরদিন তাই ঘুম থেকে উঠেই সোজা সে রওনা হ'য়ে পড়লো ঘর থেকে। চাষীদের অনেক ক'রে বুঝিয়ে তবে সে ফিরলো।…

বিকেলের দিকে স্থানীয় সমবয়সী ছেলেরা এসে হঠাৎ চেপে ধ'রলো তাকে: প্রতি বছরের মতো এবারও শারদীয়ায় তারা বারোয়ারী-তলায় থিয়েটারের ব্যবস্থা ক'রছে, সেই সাথে কৃষ্ণলীলা আর পুতুল-নাচ। তাদের সাথে অবশ্যই গিয়ে যোগ দিতে হবে বিজনকে।

আপত্তি তুলে বিজন ব'ললো, 'থিয়েটারে অভিনয়ে আমি তো কোনোদিনই অভ্যস্ত নই, আমি গিয়ে কি ক'রবো। বরং দর্শক হিসেবে উপভোগের সুযোগ পাবো অনেকখানি।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো আপত্তিই টিকলো না তার। নানা ওজোর তুলে চেপে ধ'রলো ছেলেরা: 'থিয়েটারে পার্ট নিলেই কি চুকে গেল সব, অনুষ্ঠান আয়োজনের দিক দিয়ে কাজের কি কিছু অন্ত আছে! পালিয়ে থাকলে চ'লবে না।'

পালিয়ে থাকা তো দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত দু'টো সীনের পার্ট দিয়ে তবে তাকে ছাড়লো সকলে। জনমতের দাবী, অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন এখানে বড় নয়। বাধ্য হ'য়ে এবারে নিয়মিত রিহার্সালে গিয়ে যোগ দিতে হ'লো বিজনকে। দেখা গেল—অনভিজ্ঞতাকে জয় ক'রে উঠেছে সে। কবিতা লেখার মতো এটাও বড় কম কৃতিত্বের কথা নয় তার জীবনে। দিনে দিনে পোষাকেই রীতিমত সে আসর জমিয়ে নিল রিহার্সালে।

শুনে ছন্দা আর রেবা তো অবাক। বিজুদার থিয়েটার দেখবার জন্ত একটা দুরন্ত বাসনায় অনবরত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল তারা। তা ছাড়া পুতুল নাচ কোনোদিন দেখেনি তারা জীবনে। অবকাশ মতো ছন্দাই একসময় কথাটা পাড়লো: 'আমাদের নিয়ে যাচ্ছো তো বিজুদা? খুব কাছাকাছি নিয়ে কিন্তু বসিয়ে দিতে হবে, নইলে কিছু শুনতে পাবো না। তুমি কেমন ক'রে পার্ট ক'রবে বিজুদা, লজ্জা ক'রবে না স্টেজে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে কথা বলতে?'

—'লজ্জা, তখন আবার লজ্জা নাকি, বল্—ভয় ক'রবে কিনা!' থেমে বিজন ব'ললো, 'তবে কি জানিস, দিয়েছি সবাইকে তাক্ লাগিয়ে। সেদিন যেমন ওবাড়ীর মল্লিক মেসোমশাই একরকম মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গেই তুলনা ক'রে বসলেন আমাকে, এবারে থিয়েটার ক'রে ভাবচি—রাতারাতি গিরিশ ঘোষ হ'য়ে যাবো কিনা! পারিস তো মেয়েদের মধ্য থেকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তুই একটা স্বর্ণ-পদক ঘোষণা ক'রে দিস্।'

শুনে অনেকক্ষণ ধ'রে মুখ টিপে টিপে হাসলো ছন্দা। পরে ব'ললো, 'কি ব'লে ঘোষণা ক'রবো?'

—'তাও ব'লে দিতে হবে? ব'লুবি—মহিমার্ণবের অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অভিনেতাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেল্লো বিজন। ব'ললো, 'শ্রোতারা তখন কী অদ্ভুত বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে, বল্ তো ছন্দা?'

ঠাট্টা ক'রে ছন্দা ব'ললো, 'তোমার দিকে না আমার দিকে?'

—'প্রথমটা তোর দিকে, পরে আমার দিকে।'

—'তবে আর আমার বলা হ'লো না।' ঠোঁট উল্টিয়ে বার কয়েক ঘাড় নাড়লো ছন্দা।

বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো,'কেন ব'লতে পারবি নে, বল?

—'সর্বনাশ, তবে কি আর তার পরের দিন মুখ দেখাতে পারবো পাড়ায়। আমাকে নিয়েই শেষ পর্য্যন্ত কিছু একটা অভিনয় সুরু হয়ে যাবে। অভিনয়ের মধ্যেই যে আছি বিজুদা, জানো তো?'

—'নে, যথেষ্ট হ'য়েছে, দেখ্‌লাম ঠাট্টাটুকুও তুই ক'রতে পারিস নে।' হেসে বিজন ব'ললো, 'তোরও যেম্‌নি মাথা খারাপ, আমি ক'রবো থিয়েটারে পার্ট, তার আবার পদক ঘোষণা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি!'

এবারে মনে বড় আঘাত পেলো ছন্দা, ব'ললো, 'ছিঃ, এমনি ক'রে কেন ব'লছো নিজেকে বিজুদা? তুমি কানাও নও, পদ্মলোচনও নও, তুমি যা ঠিক তা-ই।' তারপর আর এক মিনিটও দেরী ক'রলো না সে। কাকিমার সংসার বড় বেশীক্ষণ কোথাও তাকে সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। তারও উপরে আছে এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর উদ্ধত দৃষ্টি। চারপাশে ছড়িয়ে র'য়েছে তার বেড়াজাল। সে জাল ছিন্ন করা যে কতখানি কঠিন, তা সে জানে। জানে ব'লেই এই সতর্কতা, প্রতিমুহূর্তের এই উৎকণ্ঠা। নইলে বিজুদাকে ছেড়ে সত্যিই কি একটা মুহূর্তও সে মনে শান্তি পায়? পায় না। তবু ছেড়ে যেতে হয় তাকে, লুকিয়ে রাখতে হয় নিজেকে কাকিমার ধারালো কথা আর শ্যেণ দৃষ্টির আড়ালে।...

যথাদিনে এবং যথাসময়েই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বেঁধে অভিনয় সুরু হ'লো বিজনদের। রেবা এসে দিব্যি সামনে ব'সেই দেখতে পারলো অভিনয়। রেবার সাজটাও দেখবার মতো। ফ্রক সে অনেকদিনই ছেড়েছিল, কিন্তু শাড়ি পরে, রেবাকে বুঝি এমন সুন্দর আর কখনও দেখা যায় নি। মেয়েদের মধ্যে এই নিয়ে কাণাঘুষো হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু যথাসময়ে রওনা হবার উদ্যোগ ক'রেও কাকিমার সংসার থেকে ছুটী পেলো না ছন্দা। তার উপর ছেলেদের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অঞ্জনাই বরং পাড়া থেকে দু'পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে ঘটা ক'রে এসে ব'সলেন দর্শকদের আসরে। দুঃখে দু' চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল ছন্দার। চেষ্টা ক'রেও সেটুকু সে সম্বরণ ক'রতে পারলো না। পুতুলনাচ আর কৃষ্ণলীলা চুলোয় যাক্, তা' দেখবার জন্য মন কাঁদে না তার; কিন্তু বিজুদার অভিনয়, এ যে আজ কতখানি তাকে হারাতে হ'লো, এ কথা সে ভিন্ন আর কে বুঝবে সংসারে? নির্জ্জন হেঁসেলে ব'সে কতক্ষণ যে সে বুক ভাসালো, তা নিজেই বুঝতে পারলো না ছন্দা।

বুঝতে পারলো না তেমনি বিজনও—আজকের অভিনয়ের সার্থকতা তার কোথায়! শুধু রেবা আসবে, এ তো সে আশা করে নি! ছন্দার সঙ্গে এত কথা, এত ঠাট্টা হবার পর সে-ই কিনা আসতে পারলো না তার অভিনয়ে! থিয়েটারের সমস্ত আনন্দটাই মাটি হ'য়ে গেল বিজনের। ঘরে ফিরেও যে নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমোতে পারলো, তা নয়। অভিনয়ের মহিমার্ণব নির্জ্জন রাত্রিশয্যায় অনবরত যেন তাকে ব্যঙ্গ ক'রে সমস্ত হৃদয়টাকে একেবারে তোলপাড় ক'রে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। তার মধ্যেই একবার কঠিন বিদ্রোহে জ্ব'লে উঠলো সে অঞ্জনার বিরুদ্ধে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কাছে তার নিজের ব্যর্থতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। কি ক'রতে পারে সে অঞ্জনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে! তাতে কি ছন্দার জীবনের নিগ্রহ কিছু ক'মবে?

কয়েক দিন ধ'রে এম্‌নি ক'রেই নিজের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌লো বিজন।

নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'ক'দিন ধ'রে তো দিব্যি কাটিয়ে দিলি বাইরে বাইরে, এতদিনে তবু যা হোক্ থিয়েটারটা ঢুকে গেল! কিন্তু হঠাৎ এমন তুই গম্ভীর হ'য়ে গেলি কেন, বল্ তো বাবা!'

—'গম্ভীর আবার আমাকে দেখ্লে কোথায়? এই তো দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি কথা ব'ল্ছি।' থেমে বিজন ব'ল্লো, 'কখন্ কি যে বলো তুমি মা, তা তুমি নিজেই জানো না।'

—'জানি না, তবে বুঝ্তে পারি। আমার কাছে কি কিছু লুকানো থাকে রে!' ম্লান হেসে নির্ম্মল ব'ল্লেন, 'একদিন তোকে গর্ভে ধ'রেছিলাম, আজ কি তোর মনের কথাটুকুও জানি নে?'

—'কি জানো বলো?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার চোখ তুলে মার মুখের দিকে তাকালো বিজন। একটা তীব্র সংশয়ে অনবরত নিজের মধ্যে আন্দোলিত হ'চ্ছে সে। মার কাছে কি সত্যিই তবে সে ধরা প'ড়ে গেল?

কিন্তু নির্ম্মলা আর দ্বিরুক্তি ক'রলেন না। নীরবে উঠে গিয়ে নিজের কাঠের মালা নিয়ে আহ্নিকে ব'সলেন তিনি।...

ছুটি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল বিজনের। এবারে গ্রামে এসে অনেক প্রশংসাই অদৃষ্টে লেপে নিতে পারলো সে। অনেক দিন মনে থাক্‌বে এই স্মৃতি, স্মৃতির সঙ্গে বেদনাটুকুও। কলেজ খুল্তে দু' একটা দিন বাকী থাক্‌তেই মাকে খানিকটা সান্ত্বনায় অভিষিক্ত ক'রে বেরিয়ে প'ড়লো আবার সে গ্রাম ছেড়ে। নবগঙ্গার উপর দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল মাওরা, মিলিয়ে গেল ছুটির অবকাশের খণ্ড ছিন্ন মুহূর্ত্তগুলো। [ক্রমশঃ

ফাঁকি

জ্যোতির্ম্ময় ভড়

আমি ভেবেছিনু, আমি বুঝেছিনু
প্রথম দেখার মোহে,
সত্য সে শুধু দূরের মায়ায় মেলে;
দেহের দয়া তো ফাঁকি,
বুঝি একেবারে ফাঁকি।

প্রথম প্রেমের রূপালি আবেশে
উদ্দাম দেহ-তটে
দূরের তারারা ক'রেছিলো ভিড়
জ্যোৎস্না-মদির রাতে:

সেদিন শুধুই প্লেটোর আত্মা
আমায় চমকে দিলো,
যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি
যোড়শী মেয়ের বেশে।

আজ বুঝি হায়
স্বপ্নই শুধু ফাঁকি:
তুমি যা চেয়েছো দিইনি চরণমূলে,
সত্য সে শুধু দেহের মিলনে মেলে।

গ্রীক্-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

আরিষ্টটলের দর্শন

আরিষ্টটল বিস্তৃত ভাবে বন্ধুত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সৎ লোকের মধ্যেই পূর্ণ বন্ধুত্ব সংঘটিত হইতে পারে। বহু-সংখ্যক লোকের সহিত বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। উচ্চতর পদস্থ লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা কর্ত্তব্য নয়, যদি সে অধিকতর ধার্ম্মিক না হয়। ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব অসম্ভব, কেননা ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসিতে পারেন না। কেহ নিজের বন্ধু হইতে পারে কিনা, আরিষ্টটল সে প্রশ্নেরও আলোচনা করিয়াছেন। যদি সে সৎ লোক হয়, তাহা হইলেই নিজের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব সম্ভবপর। দুর্ব্বৃত্তেরা আপনাদিগকে অনেক সময়ে ঘৃণা করে। সৎ লোকের আপনাকে ভালবাসা উচিত, কিন্তু সে ভালবাসা "মহৎ" হওয়া চাই। দুর্ভাগ্যের সময় বন্ধুদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া বন্ধুদিগকে অসুখী করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকেরা এবং স্ত্রী-স্বভাববিশিষ্ট পুরুষও এইরূপ করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যের সময়েই যে বন্ধুর প্রয়োজন, তাহা নহে, সুখের সময়েও সুখের অংশ লইবার জন্য বন্ধুর প্রয়োজন।

সুখের আলোচনায় আরিষ্টটল সুখকে (pleasure) আনন্দ (happiness) হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন, যদিও সুখ ব্যতীত আনন্দ সম্ভবপর হয় না। তিনি বলেন—সুখ সম্বন্ধে তিন মত আছে। প্রথমতঃ সুখ কখনই কল্যাণকর নয়; দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি সুখ ভাল, অধিকাংশই মন্দ; তৃতীয়তঃ সকল সুখই ভাল, কিন্তু সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ নহে। তিনি প্রথম মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কেননা কষ্ট যখন নিশ্চয়ই মন্দ, তখন সুখকে ভাল বলিতেই হইবে। যন্ত্রণাদায়ক Rack এর উপর শায়িত কেহ সুখী হইতে পারে; ইহা বলা মূর্খতামাত্র। আনন্দের জন্য বাহ্যিক সৌভাগ্য কিছু আবশ্যক। সমস্ত সুখই যে শারীরিক তাহাও আরিষ্টটল অস্বীকার করিয়াছেন। সৎলোক যদি দুর্ভাগা না হয়, তাহা হইলে সুখ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বদা এক অবিমিশ্র আনন্দ ভোগ করেন।

অন্যত্র সুখ-সম্বন্ধে আরিষ্টটল যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি লিখিত মতের সম্পূর্ণ মিল নাই। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, এমন সুখও আছে, যাহা সৎলোকের নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে। সুখের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ভাল ও মন্দ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধের জন্যই সুখ ভাল কিংবা মন্দ হয়। সুখ অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া গণ্য বস্তুও আছে। শিশুর বুদ্ধি লইয়া জীবন অতিবাহিত করা সুখের হইতে পারে, কিন্তু কেহই তাহা চাহিবে না। মানুষের উপযুক্ত সুখ প্রজ্ঞার সহিত সংসক্ত।

পূর্ণ আনন্দ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া হইতেই পাওয়া যায়। ধ্যান সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া। আনন্দের জন্য অবসরের প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অন্যবিধ কার্য্য হইতে ধ্যান উৎকৃষ্টতর, কেননা ধ্যানে অবসর পাওয়া যায়। কর্মনৈতিক ধর্ম্মে যে সুখ, তাহা গৌণ; প্রজ্ঞার সক্রিয়তাতেই পূর্ণতম আনন্দ, কেননা প্রজ্ঞাই মানুষ। মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ধ্যানযোগী হওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু মানুষ যতটা ধ্যান-পরায়ণ হয়, ততটা ঐশ্বরিক জীবনের অংশভাক হয়। ঈশ্বরের কর্ম্ম অন্য যাবতীয় কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর সুখকর; সে কর্ম্ম ধ্যান। সকল মানুষের মধ্যে দার্শনিকের কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্যের অতিতম অনুরূপ। সুতরাং দার্শনিকই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক। দার্শনিক দেবতাদিগের প্রিয়তম।

রাষ্ট্রনীতি: আরিষ্টটলের Politics গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধ ও রচনা সংকলিত হইয়াছে। বহু তথ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। ১৫৮টি রাষ্ট্রের গঠন তন্ত্রের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে আছে এথেন্স্ রাষ্ট্রের গঠন তন্ত্র। ঐতিহাসিকের নিকট Polity of the Athenians গ্রন্থ বহু মূল্যবান্। বলিতে গেলে ইহা হইতেই গঠনতান্ত্রিক ইতিহাসের (Constitutional History) সূত্রপাত। কিন্তু ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির অত্যন্ত অভাব। "ঐতিহাসিক বোধ" (historic sense) আরিষ্টটলের ছিল না। প্লেটোর গ্রন্থে নাটকীয় কথোপকথন সুকৌশলে অতীতকালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে কাল-ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আরিষ্টটলের গ্রন্থে উক্তরূপ কৌশলের পরিচয় নাই। ইহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Politics উচ্চ স্থান

অধিকার করিয়া আছে। তাহার কারণ আরিষ্টটলের তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে আরিষ্টটল বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মানুষ দুইটি সহজাত প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—কাম এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার অথবা অন্য কর্তৃক শাসিত হইবার ইচ্ছা। কোন কোন জাতি যে অন্যের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আরিষ্টটল বিশ্বাস করিতেন। মানুষের আদেশ পালন করিবার জন্যই যে স্ত্রীলোকের জন্ম, তাহাও আরিষ্টটল বিশ্বাস করিতেন। আরিষ্টটলের সময়েও এই মত প্রতিক্রিয়াসম্ভূত বলিয়া গণ্য হইত। প্লেটোর Academyর শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু আরিষ্টটলের ধারণা ছিল যে, যদিও কাম-প্রবৃত্তিবশতঃ পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত হইতে পারে, তথাপি তাহাদের স্থায়ীভাবে একত্র অবস্থানের ইহাই যথেষ্ট হেতু নহে। পরিবারের সৃষ্টি রাষ্ট্রসৃষ্টির মূল। পরিবারের স্থায়িত্বের কারণ এই যে, স্ত্রীলোক ও দাসগণের অন্তরে শাসিত হইবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। তাহারা স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা করে না। পরিবারের সৃষ্টি হইলে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ পরিবার সকল লইয়া গ্রামের সৃষ্টি হয়; এবং বহুসংখ্যক গ্রাম একত্রিত হইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্র বলিতে আরিষ্টটল নগর রাষ্ট্রই (Polis) বুঝিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রের একটা বড় হওয়া দরকার, যাহাতে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এত বড় নয় যে, রাষ্ট্রের যাবতীয় পুরুষের একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্র-কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে আরিষ্টটলের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। নগররাষ্ট্রের দিন যে ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আরিষ্টটলের জীবিতকালের মধ্যেই মাসিডোনিয়া কর্ত্তৃক গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি বিধ্বস্ত হইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরাক্রান্ত পারসিক সাম্রাজ্যের কথাও তিনি জানিতেন সুতরাং নেশান রাষ্ট্রের সম্বন্ধে তিনি যে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা বলা চলে না। তবুও তিনি নগররাষ্ট্রের কথাই বলিয়াছেন। ইহার কারণ নগররাষ্ট্রেই মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। নেশান রাষ্ট্রকে তিনি নগররাষ্ট্রের তুলনায় নিকৃষ্ট জাতীয় সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য করিতেন।

"নাগরিক প্রাণী" বলিয়া তিনি মানুষের সংজ্ঞা (political animal) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণও ঐ। নগরে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াই মানুষের বিকাশ হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য নগররাষ্ট্রের মূল্য যে অত্যধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত সমস্যাই নগররাষ্ট্রে বর্ত্তমান। অল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনায় আরিষ্টটল আরও বলিয়াছেন—যদিও আবির্ভাবের কাল ধরিলে রাষ্ট্র পরিবারের পরবর্ত্তী, তাহার "প্রকৃতি"তে রাষ্ট্র পরিবার এবং ব্যক্তিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। যখন কোন দ্রব্য পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরিণত অবস্থাকে তাহার "প্রকৃতি" বলা হয়। পরিণতি-প্রাপ্ত মানব-সমাজই রাষ্ট্র ব্যক্তি পরিবার রাষ্ট্রের অংশ। সেই জন্য সমগ্র রাষ্ট্র তাহার অংশের পূর্ব্ববর্ত্তী। জৈবশরীরের (Organism) সহিত তুলনায় বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। দেহ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার হাতকে আর হাত বলা যায় না। অর্থাৎ হাতের যাহা কাজ, যাহা তাহার উদ্দেশ্য, তাহা দ্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয়। যখন দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখনি হাত দ্বারা তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সেইরূপ সমাজে যুক্ত না থাকিলে ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারে না। রাষ্ট্রের যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মতো উপকারক আর কেহই জন্মে নাই। কেননা ব্যবস্থা (Law) বিহীন মানুষ পশুর সমান, এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপরই ব্যবস্থা নির্ভর করে। রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য সৎ জীবন, রাষ্ট্রের মধ্যে বাস দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কেবল পরস্পরের সাহচর্য্যে বাসের জন্য নয়, মহৎ কার্য্যের জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের প্রয়োজন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আরিষ্টটল দাস-প্রথার অনুমোদন করিয়াছেন। গ্রীকদিগের দাস হওয়া তিনি সমর্থন করেন নাই। নিকৃষ্ট জাতির লোক উৎকৃষ্ট জাতীয় লোক দ্বারা শাসিত হওয়ায় তাহাদের মঙ্গলই হয়, ইহা তাঁহার মত। পরের শাসনাধীনে যাহাদের বাস প্রকৃতির অভিপ্রেত, তাহারা যদি অধীনতা স্বীকার করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্যায় নহে। তাহারা বিজিত হইলে তাহাদিগকে দাসে পরিণত করাও অন্যায় নহে, আরিষ্টটলের যুক্তি হইতে ইহা অনুমান করা যায়।

আরিষ্টটল ছোট বাণিজ্য অর্থোপার্জ্জনের স্বাভাবিক উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। কৃষি ও গৃহের সুবন্দোবস্ত দ্বারা অর্থোপার্জ্জন-কেই তিনি স্বাভাবিক উপায় বলিতেন। এইভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটা সীমা আছে, কিন্তু বাণিজ্যে উপার্জ্জিত অর্থের সীমা নাই। অর্থোপার্জ্জনের যত উপায় আছে, সুদে টাকা ধার দেওয়া তাহার মধ্যে নিকৃষ্টতম। বিনিময়ে ব্যবহারের জন্যই অর্থ, সুদে বাড়িবার জন্য নহে। যাবতীয় সুদগ্রহণের আরিষ্টটল নিন্দা করিয়াছেন, কেবল অতিরিক্ত সুদের নহে।

আরিষ্টটল প্লেটোর Republic গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর কমিউনিসমের কল কলহ। ইহার ফলে অলস লোকের উপর পরিশ্রমী লোক কষ্ট হইবে। সম্পত্তি ব্যক্তিগত থাকাই ভাল। কিন্তু জনহিতে লোকদিগকে অভ্যস্ত করিলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও সাধারণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে। জনহিত ও বদান্যতা নৈতিক ধর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে তাহাদের কোনও অর্থই থাকিবে না। পারিবারিক প্রথার বিলোপ সম্বন্ধে আরিষ্টটল বলিয়াছেন, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা, তাহা যদি না জানা থাকে; তাহা হইলে অপরিচিত পুত্রের সমবয়স্ক সকলের উপরেই যে পুত্রস্নেহ জন্মিবে ইহা অসম্ভব। যখন সমবয়স্ক বহুসংখ্যক লোকের যে কেহ পুত্র হইতে পারে, তখন তাহাদের কাহারও উপর পুত্রস্নেহ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পিতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। স্ত্রীলোক যদি সকল পুরুষের সাধারণ সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিবে কে?

আরিষ্টটল সাম্যবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর সমান অধিকার তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যদি দেশের শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই সেই শাসনকে ভাল বলা যায়। কিন্তু যখন শাসকদিগের মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য, তখন তাহা মন্দ। তিন প্রকার শাসনপ্রণালী আরিষ্টটল ভাল বলিয়াছেন, এবং তিন প্রকার মন্দ বলিয়াছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাত তন্ত্র এবং নিয়মতন্ত্র ভাল। যথেচ্ছাচার তন্ত্র (tyranny), শ্রেণীশাসন তন্ত্র (oligarchy) ও প্রজাতন্ত্র মন্দ। কিন্তু শাসকদিগের চরিত্র দ্বারাই শাসনতন্ত্রের ভাল মন্দ নির্দ্ধারিত হয়, শাসনতন্ত্রের গঠন দ্বারা নহে। শ্রেণীশাসন তন্ত্রে দরিদ্রদিগের মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া ধনীরাই শাসন করে। প্রজাতন্ত্রে ধনীদিগের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রেরা দেশ শাসন করে। অভিজাততন্ত্র নিয়মতন্ত্র অপেক্ষা ভাল। রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যথেচ্ছাচার-তন্ত্র শ্রেণীশাসনতন্ত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শ্রেণীশাসনতন্ত্র প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

প্রজাতন্ত্র-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রীক প্রজাতন্ত্রের চালনা আধুনিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন ছিল। শাসক- সম্প্রদায়কে "লট" দ্বারা নির্ব্বাচিত করাই প্রজাতন্ত্র-সম্মত ছিল, এবং এথেন্সে বহুসংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেট 'লট' দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইত, তাহাদের সঙ্গে বিচার-কালে জুরী থাকিত না। দলাদলি দ্বারা তাহারা যে প্রভাবিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সভা আইনের সাহায্য না লইয়াই স্বাধীনভাবে বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা করিত। যে প্রজাতন্ত্রে সক্রেটিসের মত লোকের প্রাণদণ্ড সম্ভব হইত, তাহাকে ভাল মনে না করিবার কারণ ছিল। কল্পনা শক্তির অধিকারী প্লেটো নির্দ্দোষ শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; আরিষ্টটল যে যে শাসন প্রণালীর সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগেরই সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষভাগে আরিষ্টটল শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানাই যথেষ্ট নয়; ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক। তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশে যে শাসনপ্রণালী প্রচলিত তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। অর্থকরী শিক্ষা শিশুদিগের দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। শারীরিক ব্যায়ামের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম যাহাতে অর্থকরী না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। অলিম্পিক ক্রিড়ার জন্য যে সমস্ত বালককে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতে দেখা গিয়াছে। মানব-দেহের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির জন্য চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা বাঞ্ছনীয়। নৈতিক-ভাবব্যঞ্জক চিত্র ও ভাস্কর্য্য বুঝিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে হইবে। সঙ্গীত উপভোগ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাও আবশ্যক আছে। কিন্তু "কালোয়াত" হইবার প্রয়োজন নাই। লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্ম্মলাভ, সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধি নহে। জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থোপার্জন ইহার উদ্দেশ্য নহে।

আরিষ্টটলের রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি-সম্পন্ন "ভদ্র" লোকের সৃষ্টি—বিদ্যা-ও-কলার-প্রতি-অনুরাগ-ও-আভিজাত-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সৃষ্টি। পেরিক্লিসের যুগে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোবৃত্তি ও বিদ্যা ও কলার প্রতি অনুরাগ বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পেরিক্লিসের তিরোধানের পূর্ব্বেই ইহার বৈলক্ষণ্য হইতে আরম্ভ হয়, এবং সংস্কৃতিবিহীন লেখক সংস্কৃতিবান্ লোকদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। [ক্রমশঃ

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

তিন

বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দুদের একজন নামকরা চাঁই; হিন্দু আইনের একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ। তাঁর সহ-যোগীরা সৌজন্যপূর্ব্বক 'শাস্ত্রী' উপাধী দিয়েছেন তাঁকে। তাঁর মত লোকের বেশী দিন বিপত্নীক থাকলে শাস্ত্রের প্রতি, সমাজের প্রতি, এমন কি সহযোগীদের প্রতিও অশ্রদ্ধা দেখানো হবে। তাঁর সুমুখে কঠিন সমস্যা। তিনি কি করবেন? পত্নী-প্রেমে, পুত্র-স্নেহে অটল থাকবেন, না শাস্ত্র, সমাজ ও সহযোগীদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবেন? তিনি একটি সংক্ষিপ্ত চিন্তার দ্বারা শাস্ত্রাদির অনুকূলেই রায় দিলেন এবং অবিলম্বেই লোক-দেখানো শোকের একটা অদ্ভুত অভিনয় সুরু করে দিলেন।

এখানেই তিনি চালে ভুল করলেন। 'কি' দিয়ে রায়ের নকল কেউ না নিলেও তিনি নিজেই নিজের ব্যবহারের দ্বারা রায়ের রহস্য ভেদ করে দিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় শ্মশানে গিয়ে ধুপ দীপ জেলে মা'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতেন, থান-কাপড় পরতেন, নিরামিষ খেতেন। একাদশীতে ভাত না খেয়ে ফল-মিষ্টি, লুচি-পরোটা, দুধ-দই দিয়ে ফলার করতেন।

তাঁর এই কঠোর বিধবার আচার দেখে ঠাকমার বুক ফেটে যেত, চোখ দিয়ে জল ঝরত। বড় দুঃখেই একদিন বলেছিলেন—মধু, আর যা করতে হয় কর, নিষেধ করিনে; কিন্তু একটু একটু মাছ খা তুই।

বাবা জিভ কেটে উত্তর করলেন—ছিঃ! তাকি হয় মা। তোমার বউ যদি বিধবা হতেন, পারতে তাঁকে একথা বলতে?—একথা বলে বাবা এমন একটা নাটকীয় ভাব আমদানী করলেন মুখে, যা দেখে মনে হয়েছিল—ঠাকমা বুঝিবা ফাঁসিকাঠেই ঝুলাতে চাইছিলেন তাঁকে। বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে ঠাকমার চোখে অঝোরে অশ্রু বর্ষণ হল। বাবার মুখের দিকে চাইতেই আমার মনে হল তিনি যেন ঠিক এমনিটি চাইছিলেন।

চার

সাধারণতঃ দেখা যায় লোকের স্ত্রী বিয়োগ হলে পুনর্বিবাহের প্রস্তাব আসে শত দিক হতে—শতমুখী গঙ্গা প্রবাহের মত।

বাবার বেলায় কিন্তু এমন ধারা প্রস্তাব কেউ পেশ করল না। কুমারী কন্যাদের কোন আত্মীয়-স্বজন কি অভিভাবকও আমাদের বাড়ী অভিযান করল না। এর ফলে বাবার দ্বিতীয় বার বিয়ের প্রসঙ্গ কিছুদিনের জন্য ধামাচাপাই রইল।

এই নজীরহীন ব্যাপারে বাইরের লোকদের মনে বিস্ময় জাগলেও বাড়ীর কি পাড়ার লোকদের মনে জাগেনি। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না। তার কারণ আমাদের সুপরিচিত মহলের স্ত্রী-পুরুষ সকলে জানত, কী সুনিবিড় ভাবে মাকে ভালবাসতেন বাবা। তার ওপর ঠাকমার উদাসীনতা আর বাবার লোক দেখান শোকের অভিনয়ও হয়ত পরিচিত মহলকে হত-বুদ্ধি করেছিল।

পাড়ার লোক ও আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমাদের শোকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। মাসী পিসিও এল। প্রাণের টানে, সামাজিকতার খাতিরে সকলেই আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে, সহানুভূতি দেখিয়ে সরে পড়লেন, কিন্তু আকাশের ধ্রুব তারাটির মত যে নিত্য আসা-যাওয়া করত সে ছিল ক্ষেমী পিসি। ইচ্ছামত মুখোস পরে সুখ-দুঃখ সব রকম অবস্থার মধ্যেই নিজেকে কি করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, সে তা' জানত। মা'র জন্য সে যত চোখের জল ফেলল, তেমনটি আর কেউ পারেনি। মার কাজের দিন আত্মীয়-স্বজন অনেকেই

একটি ছোট গ্রাম — শিল্পী—বিমল রায়

এলেন, কিন্তু সকলের চেয়ে দরদ দিয়ে খাটল ক্ষেমী পিসিই। তার মত ধৈর্য্যের সহিত বিনিয়ে বিনিয়ে আমাদের শোক লঘু করতে আর কেউ পারলনা। এমন নিপুণ ভাবে সে অভিনয় করে গেল, অন্যের দূরের কথা, ঠাকুমাও কোন ছল-চাতুরীর গন্ধ পেলেন না। আমার মনের মাঝে যে বেয়াড়া দৈত্যটা ক্ষেমী পিসিকে দেখলে মাথা ঝাড়া দিয়ে তিরিক্ষি হয়ে উঠত, সেও তার আচরণে শিষ্ট শিশুর মত আরামে ঝিমিয়ে পড়ল।

মার কাজ চুকে' যাওয়ার দিন-সাতেকের মধ্যেই এক বিকেল বেলায় ধুমকেতুর মত ক্ষেমী পিসি এসে হাজির হল। এবার আর মুখে সহানুভূতির মুখোস নাই, অভিনয়ের অভিপ্রায় নাই। এবার এসেছিল সদ্য খোলস-মুক্ত কালসাপের মত আমাদের প্রাণ-রক্ত নিঃশেষে পান করতে।

খানিকক্ষণ আজে বাজে কথা চালিয়ে হঠাৎ সঙ্কোচ-হীন ভাবে ঠাকুমাকে বললে—বউয়ের কাজ ত ভালয় ভালয় চুকে গেল জেঠী, এবার দেখেশুনে মধুদার জন্যে একটি যুগ্যি বউ ঘরে আন। আহা, মধুদার মুখের পানে চাইলে বুক যেন ফেটে যায়। আমার ভয় হয় জেঠী, কোন্ দিন বা গেরুয়া পড়ে সরে পরেন। সময় থাকতে থাকতে পায় একটি নতুন বেড়ী পরিয়ে দাও। সেই যে ননদের মেয়েটির কথা বলেছিলাম, তার বিয়ের কথা এখনও পাকা হয়নি কোথাও। বল ত সেখানেই আবার কথা পাড়ি। মেয়ে ত নয়, যেন পটের ছবি—ডানা-কাটা পরী!

ঠাকুমা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—তুই খেপেছিস, ক্ষেমী? দেখ্‌ছিসনে বউর শোকে ছেলে আমার কি রকম হেদিয়ে পড়েছে? আমরা শোকে-তাপে পুড়ে মরছি আর তুই এলি ডানা-কাটা পরীর কথা পাড়তে! শোকের এই বাড়াবাড়ির সময় কি বিয়ের কথা কানে তুলবে মধু? আহা কী ভালবাসাটাই বাসত বউকে।

—তা তুলবেন বই কি কানে! একটিবার পেড়েই ছাখোনা কথাটা?

—না বাপু, আমি কি এখন তা পারি? দেখছিস ত কি রকম বেসামাল হয়ে পড়েছে।

একটু জিদের সঙ্গেই ক্ষেমী পিসি বললে—দেখছি বলেই ত বলছি জেঠী। সোমত্ত বয়সে বউ মরলে সকলেরই পেরথম পেরথম ঐ রকম হয়। ফিরে বিয়ে দিতেই সামলে ওঠে।

—না রে না, আমার মধু আর বিয়ে করবে না।

—কী যে বল জেঠী—বিয়ে করবে না! বিয়ের নামে ঘাটের মড়ার মুখেও হাসি ফোটে আর মধুদা'র ত এই সোমত্ত বয়স, সে বিয়ে করবে না? আমার কথাটি রাখো জেঠি। তোমার ঘরে আবার মিষ্টি হাসির ফুটফুটে জোছনা ফুটবে আর মধুদা নতুন বউয়ের রাঙা পায় ভোমরা হয়ে লুটবে।

—তোর ও কথা আমি মানিনে, ক্ষেমী।

—কেন মানবে না জেঠী? বউ মরলে সবাই বিয়ে করে। মধুদাকে শুধিয়ে ত্তাখো বিয়ে করবেন কি না।

ঠাকুমা বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বললেন—বলিহারি যাই তোর বুদ্ধিকে। সবাই যা করে আমার মধুও তাই করবে! তোর কাছে দেখছি মুড়ি-মিছরীর এক দর!

ক্ষেমী পিসি অভিমানের তান করে বললে—কেন জেঠী তা হবে কেন? আমরা গরীব হলেও মুড়ি-মিছরীর দর জানি।

কথাটা বলেই সে মুখখানি ভার ভার করে তুললে। স্বভাবে ও অভ্যাসে 'কিল খেয়ে কিল চুরি' করার মত মনের গড়নটি হলেও 'ঝোপ বুঝে কোপ' মারার সুযোগ পেলে ছাড়বার পাত্রী ছিল না শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী। ঠাকুমা তা জানতেন। জেনেও নিজের কথার চুকটুকু সেরে নেবার জন্ত গলার সুরটা নরম করে বললেন—হাঁ৷ রে ক্ষেমী, তুই রাগ করলি? আমি কি তোকে গরীব বলে ঠাট্টা করতে পারি? আমি বললাম—তোরা সবাইকে সমান দরের লোক মনে করিস। বউ মরলে কি সবাই বিয়ে করে? বাবার তিরিশ বছরের সময় আমার মা মারা যান। কই, তিনি কি বিয়ে করেছিলেন?

ঠাকুমাকে খুশি করবার সুযোগ পেয়ে ক্ষেমী পিসি বললেন—তোমার বাবা ছিলেন জেঠী শতকে একটি। কই অমন আর একটিও ত নজরে পড়ল না। তাঁর কথা ছেড়ে দাও। মধুদা'র বয়সী কত লোক একবার ছেড়ে কতবার বিয়ে করছে। তোমাদের অত খাতিরের মুখুজ্জে সে ত তিনবার বিয়ে করেছে।

—অন্তে যা করে করুকগে, আমার মধু সে ধরণের ছেলে নয়। বেঠের কোলে পঞ্চাশে পা দিয়েছে; ও কি আর বিয়ে করবে? আর কিই বা দরকার বিয়ের! ক' বছর বাদে খোকনের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে ঘরে; সেইত সুন্দর হবে।

—তুমি ত জেঠী সুন্দর হবে বললে। মধুদা বলে তবেত। ঐত আসুচেন মধুদা, বলত তাঁর কাছেই কথাটা পাড়ি।

ঠাকুমা তড়কে গিয়ে বললেন—কী যে বলিস ক্ষেমী! যা যা, এখন বাড়ী যা। সবে কোর্ট থেকে তেতেপুড়ে এল, একটু ঠাণ্ডা হতে দে।

বাবা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাচ্ছিলেন। ক্ষেমীপিসিকে দেখেই হো'ক বা ঠাকুমার কথা কানে যেতেই হো'ক থমকে দাঁড়ালেন। এই সুযোগে ক্ষেমীপিসি ছুটে গিয়ে বাবাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। তার কাণ্ড দেখে ঠাকুমা ও আমি দুজনই অবাক হয়ে গেলাম।

ক্ষেমীপিসি আর আমাদের কাছে ফিরে এল না। বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কি-সব ফিস্ ফিস্ করে উলকা-মুখীর মত থক্ থক্ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে পড়ল পথে বাবার সঙ্গে গোপনে কথা কয়ে সে হাসতে হাসতে কি কাঁদতে কাঁদতে গেল তা জানতে না পেরে আমরা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করছিলাম।

[ক্রমশঃ

গুপ্তিপাড়া

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

গুপ্তিপাড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমানে একটি গণ্ড গ্রাম হইলেও, প্রাচীনকালে এইস্থান বঙ্গের সুসমৃদ্ধ গ্রামগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত ছিল। কারণ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই গ্রাম তৎকালে বাংলার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভাগীরথী গুপ্তিপাড়ার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া যেন গ্রামখানিকে আলিঙ্গন করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গুপ্তিপাড়ার ব্যবধান পনের মাইলের মধ্যে হইবে; মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতির দেবালয়শোভিত কালনা নামক স্থান। কালনা হইতে পূর্ব্বদিকে দেখিলে গঙ্গাবক্ষে গুপ্তিপাড়ার শ্যামল শাদ্বল শোভিত বেলাভূমি আজও দর্শককে বিমোহিত করে। ইহার উত্তরে গঙ্গার পরপারে শান্তিপুর অবস্থিত। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে গুপ্তিপাড়াও গঙ্গার পূর্ব্বদিকে ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থানটিও নবদ্বীপের ন্যায় গঙ্গার পশ্চিম দিকে আসিয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

> বাহ বাহ বল্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।
> বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া ॥
> উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
> মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥

'মহাপুরুষ চরিতম্' নামক গ্রন্থে গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইরূপ :

> তস্মিন্ হুগলি প্রথিতবিষয়ে গুপ্তপল্লীতি নাম
> পল্লী রম্যা কুসুমদশনা নূত্নদূর্ব্বাম্বরী চ।
> গঙ্গা যস্যা রজতসলিলা হার-শোভাং বিধত্তে
> হিত্বা বৃন্দাবিপিনবসতিং বর্ত্ততে যত্র কৃষ্ণঃ।

অর্থাৎ হুগলীতে গুপ্তপল্লী নামক পল্লী আছে। ইহা সুন্দরী কুসুমদশনা ও নূতন দূর্ব্বা-বসনা। রজত-সলিলা ভাগীরথী তাহার হারের ন্যায় বর্ত্তমান। বৃন্দাবন-বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বর্ত্তমান আছেন।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' কাব্যের গুপ্তিপাড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া

> অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে
> রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া;
> উল্লাসে উলায় গতি বটমূলে ভগবতী
> চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চোর-ডাকাত ও বাঁদরের জন্য এই স্থান বিশেষ খ্যাত ছিল; উনবিংশ শতাব্দীতেও গুপ্তিপাড়ায় ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পনেরটি টোল ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য দর্শন শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী" রচনা করিয়া ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে গুপ্তিপাড়ার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন এবং দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তখন গুপ্তিপাড়া ন্যূন ছিল না।

"শ্যামকল্পলতা" প্রণেতা শোভাকর বংশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত কবি মধুরেশ গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিত সভার শিরোমণি গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রুতিধর পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা ও

বাক্‌পটুতা তৎকালীন বঙ্গসমাজে যে কিরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা কাহার অজানা আছে?

গুপ্তিপাড়ার অতি সাধারণ ব্যক্তিও তৎকালে পণ্ডিতগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া সঙ্গগুণে শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। আজও গুপ্তিপাড়ার বালকদের মুখে ক্রীড়াকালে যে সমস্ত প্রবাদবাক্য উচ্চারিত হয় তাহা এইরূপ :

"গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে
দেবের ভাষা মানুষ জানে।"
"বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত
আর্ক ফলার লম্বা বোটা নেড়া মথা যত।"

বস্তুতঃ গুপ্তিপাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সংস্কৃত চর্চ্চার খ্যাতি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সেই সময় পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

বঙ্গদেশে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—যথা "উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিশহরের তেঁদর" অর্থাৎ তখন উলা পাগলের জন্য, গুপ্তিপাড়ার অসংখ্য বাঁদরের জন্য ও হালিসহর মাতালের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেইজন্য অদ্যাপি প্রাচীন ব্যক্তিগণ গুপ্তিপাড়ার অধিবাসীকে "গুপ্তিপাড়ার বাঁদর" বলিয়া পরিহাস করিতে শুনা যায়।

এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"As Guptipara is noticed for its monkey, Halisahar for its drunkards, so is ulla for fools, as one man said to become a fool every year at the mela."—The Banks of the Bhagirathi.

স্বর্গীয় ভোলা নাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindu নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-বানরী আনাইয়া অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি তাহাদের বিবাহ দেন এবং তদুপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া তাহাদিগকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করেন।

গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা খুব বাচাল বলিয়াও একটি প্রবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—

"উলার মেয়ে কুল কুলটি।
নদের মেয়ের খোঁপা॥
শান্তিপুর নথ নাড়া দেয়।
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

অর্থাৎ উলার মেয়েরা কুলের বড়াই করে, নদীয়ার মেয়েরা খোঁপার পারিপাট্যের বড়াই করে, শান্তিপুরের মেয়েরা মুখরা এবং গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা বাচাল, সমস্ত কথার চোপা করিয়া উত্তর দেয়।

গুপ্তিপাড়ায় বহু দেবায়তন আছে—তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহা 'গুপ্তিপাড়ার মঠ' বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। গুপ্তিপাড়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের আবির্ভাবকে এক অপূর্ব্ব দেবলীলা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমৎ সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ি হইতে গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটি নামক বিজন বনে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সম্বন্ধে পরিব্রাজক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী "শ্রীশ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মহাযোগী সত্যদেব গদ্‌গদ্‌ভাবে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পেস্তের বনে নিজ নির্জ্জন কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রেমের জলে নিত্য স্নান করিয়া প্রভুর নিত্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ফলতঃ সিদ্ধ সাধক সেবিত জাগ্রত দেবতার চরণ স্পর্শেই গুপ্তিপাড়ার পূর্ব্ব মহিমা আরও বিশেষরূপে বিকশিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রই গুপ্তিপাড়ার শ্রী ও সৌষ্ঠব, প্রতিষ্ঠা ও গৌরব। কৃষ্ণবাটির অনেক লোকই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভোগ না হইলে স্বয়ং ভোজন করেন না।"

গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্বন্ধে "দাট-পর্য্যটনে" নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনপাড়াবাসী শ্রীরামকিঙ্কর ঠাকুর।
গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি।

বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোথাও সত্যদেব কোথাও বা সত্যানন্দ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা আজ সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহাকে 'সত্যদেব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও উক্ত নামটি গ্রহণ করিলাম।

স্বামী সত্যদেব সরস্বতীর শিষ্য রাজা বিশেশ্বর গুপ্ত বা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বিষয় অবগত হইয়া, তিনি নিজ ভূমিখণ্ডে বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করাইয়া, তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি দেব সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন। যে স্থানটিতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করেন—স্বভাব-সৌন্দর্য্যে সে স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য লোকে ইহাকে "গুপ্ত বৃন্দাবন" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনজীউ ও তাঁহার বিরাট মন্দির

গুপ্তিপাড়ার গৌরব ও সম্পদ। এইরূপ বিরাট কারুকার্য্য খচিত মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। লাল ইট দিয়া নির্ম্মিত ও মন্দিরগাত্রে গ্রথিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি দর্শককে বিমোহিত করে। দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় ও মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি দৃশ্য মন্দিরের বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরের ছাদ চালাঘরের ধরণে নির্ম্মিত—সেই চালার উপরে আবার একটি ছোট থাক ও তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপন করা আছে। মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়াগুলি শান্তিপুরের পার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জাগ্রত দেবতা; তাঁহার মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানের মাহারাজা বহু সম্পত্তি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। নবদ্বীপাধিপতিও তাহার ন পাড়া গ্রামের জমিদারী দেব-সেবার সমর্পণ করেন। ক্রমশঃ বিজন বিহারী বংশীধারী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বহু ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, কেহ ইহার জমী, বাগান বা পুষ্করিণী ফাঁকি দিয়া ভোগ করিলে নির্ব্বংশ হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় গঙ্গা নারায়ণ সরকার বহু অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কাহারও কাহারও মতে সেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় অষ্টদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তবে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখে আর একটি বৃহৎ মন্দির আছে; তন্মধ্যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বামদিকে আর একটি পৃথক মন্দিরে মহাপ্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। একমাত্র গুপ্তিপাড়া ব্যতীত দণ্ডী স্বামীদিগের সেবায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দিরগুলির মধ্যে হয়তঃ কোন একটি মন্দির সেওড়াফুলির রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দেন অনুমিত হয়।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা গুপ্তিপাড়ার একটি সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব। এইরূপ অত্যুচ্চ রথ বাঙ্গলাদেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র পুরী ব্যতীত কোন রথ এত সুদীর্ঘ পথও অতিক্রম করে না। রথযাত্রা উপলক্ষে এইস্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয়, তখন গুপ্তি-পাড়ার রথতলা একটি ছোট শহরে পরিণত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতা রিভিউ (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) পত্রে উল্লিখিত আছে। উক্ত মেলা দেখিতে আসিবার সময় ৪৫ জন স্ত্রীলোক গঙ্গাবক্ষে নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

সার্ব্বজনীন পূজা আজ ভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত; কিন্তু এই পূজা সর্ব্বপ্রথম ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়া হইতে সুরু হয় এবং ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

"About thirty years ago at Gooptipara near Santipur a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges a number of Brahmins formed an association for the celebration of a Pooja independently of the rules of the Shastras.…On the succesful termination of the scheme they determined to render the Puja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity."—Friend of India, May 1820.

গুপ্তিপাড়ার ঐতিহাসিক খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানের পণ্ডিতগণের সম্মান বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত শোভাকর, পণ্ডিত দেবীবর, পণ্ডিত বাণেশ্বর, পণ্ডিত মধুরেশ প্রভৃতি মনীষীগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরো যে কতশত স্বনামখ্যাত ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে কয়েকজনের বিষয় সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম ভারতীয় ইংরাজী অধ্যাপক, ও প্রথম প্রধান শিক্ষক ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্তিপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহার চেষ্টায় হয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ছাত্র ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ হিসাবে যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তিনি ঈশানচন্দ্রের মুখে শুদ্ধ ইংরাজি শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়:

"He was one of the Bengalis who before the Universities were established, distinguished themselves by their proficiency in the English language. An old Calcutta Reviewer, he wrote English like an acomplished Englishmam."—Reis and Rayyet, 17th June, 1893.

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ স্বামী কৃষ্ণানন্দ বলিয়া সমগ্র ভারতে প্রখ্যাত হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যখন বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মের অবস্থা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল ঠিক সেই সময় তিনি তাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্তিভাবের কথা ভারতবাসীগণকে আস্বাদন করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্য সঞ্চার করিবার জন্য সাধন অভ্যাসের প্রভাবে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার কণ্ঠে আবির্ভূতা হন এবং তাঁহার চেষ্টায় সর্ব্বত্র হরিসভা, ধর্ম্মসভা, সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশী যোগাশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, এতদ্ভিন্ন তিনি রামগীতা, শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলী, পঞ্চামৃত, নীতিরত্নমালা প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে তাঁহার দেহান্তর হয়। গত বৎসর তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুপ্তিপাড়ার এক সভায় স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তথায় "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" নামে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে; উক্ত মন্দিরে তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি ও যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত হইবে এবং নিত্য হরিনাম কীর্ত্তন, শাস্ত্রানুশীলন, নীতিশিক্ষা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি কার্য্য যাহা স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহার সুব্যবস্থা থাকিবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি রক্ষা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন, আমরা আশাকরি যে তাঁহার চেষ্টায় সত্বর এই মহাপুরুষের স্মৃতিভবন নির্ম্মিত হইয়া দেশবাসীর একটি অভাব বিদূরীত করিবে।

নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল ও বঙ্গের সুবিখ্যাত মন্ত্রী রাজা মাণিকচন্দ্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গোপালভাড়, আশানন্দ ঢেঁকি এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্থানে বিবাহ করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বজরা করিয়া যাইবার সময় গুপ্তিপাড়ায় বিপর্য্যস্ত হন।

প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রা এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি কবিগান করিয়া সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হন। খ্যাতনামা সলিসিটার সুরেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার পুত্র সুশীলচন্দ্র সেন গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সুশীলবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ও মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে গুপ্তিপাড়ায় একটি চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ দান করেন।

আজ আর গুপ্তিপাড়ার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই—আধি-ব্যাধি গৃহ-বিচ্ছেদ, ঈর্ষা দ্বেষ, মামলা-মোকদ্দমা গ্রামখানিকে কঙ্কালসার করিয়া দিলেও এখনও প্রতি দিন যখন পল্লবাভ্যন্তরে কোকিলকুল কুহু কুহু করিয়া কূজন করিতে থাকে ও নিবিড় আম্রকাননে আচ্ছাদিত বনভূমির অন্তরাল হইতে যখন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের চূড়া ও জগন্নাথদেবের গরুড়ধ্বজ রথের শিখরদেশ দর্শকের নয়নপথে উদয় হয়, তখন তাহার মনে হয় যে স্রষ্টা যায়—কিন্তু তাহাদের সৃষ্টি এই ঘোর নীরবতার মধ্যেও যেন মানবনশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে।

একটা থেকে দুটো

রথীন্দ্র কৃষ্ণ দেব

রাত তখন প্রায় একটা হবে। শব্দ মুখর কলকাতার বুকে ধীরে নামে নিস্তব্ধতা। বহু দূরের এক একটা ট্যাক্সির ইলেক্‌ট্রিক হর্ণ খালি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয় মহানগরী কখনও একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে না, পড়তে পারে না। ব্রজেনের চোখে আজ আর কিছুতেই ঘুম আসেনা। ক্লান্তিতে তার সারা শরীর ভেঙ্গে পড়ে। একটু ঘুমোতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু ঘুম তার কিছুতেই আসতে চায় না। চোখ বুজলেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রতনের মুখখানা। ছেঁড়া নোংরা একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ফুটপাথের উপর রতন বসে ছিল। ব্রজেন তাকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। মুখটা যেন বড় চেনা চেনা লাগছিল। হঠাৎ ওর দিকে ফিরে রতন বলে, "চারটে পয়সা দাও না; কাল থেকে একটা দানাও পেটে পড়েনি, চার পয়সার মুড়ি কিনে খাই।" এইবার ব্রজেন ওকে চিনতে পারে। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। এই কি সেই সদাহাস্যময় রতন? মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। পকেটের মধ্যে হাত ভরে দিয়ে যা হাতের মুঠোয় উঠে আসে, তাই রতনের হাতে ঢেলে দিয়ে ও ছুটে পালিয়ে যায়। একটা কথাও বলতে পারে না। রতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথের পানে। তারপর টলতে টলতে উঠে পাশের খাবারের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বহুদিন সে ভাল করে খেতে পায়নি। সব ক'টা পয়সাই সে দোকানির সামনে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "আজ আর আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না, দাও আমায় অনেকটা খাবার দাও, আমি পেট পুরে খেতে চাই।" উত্তেজনায় আর লোভে সে কাঁপতে থাকে। দোকানি তার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার তুলে দেয়। সে ফুটপাথের উপরেই বসে পড়ে খাবারগুলো গিলতে থাকে। এক সঙ্গে সবটাই মুখে পুরতে পারলে সে বোধ হয় সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হত। তার ভয় হয়—হয়ত দোকানি তাকে বেশী খাবার দিয়ে ফেলেছে, দেরী হলেই আবার সেটা ফিরে চাইবে।

•

অথচ, অথচ এমন ত ছিল না রতন এই সেদিনও। কাগজের অফিসের সে ছিল সাধারণ বেয়ারা। চাকরির গোত্রে অপাংক্তেয় হলেও রোজগার নেহাৎ মন্দ ছিল না তার। মাইনে আর উপরি মিলিয়ে তার যা আয় হত তাতে তার ছোট সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও অসচ্ছলতাও বিশেষ ছিল না। একটু পাগলাটে ধরণের এই ছেলেটাকে সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কেরানিরা পর্য্যন্ত সকলে প্রীতির চোখেই দেখত। বিশেষ করে ব্রজেনদের কাজেই থাকতে হত বলে ওরা তাকে বিশেষ স্নেহ করত।

নানান দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের দিনগুলো গেল কেটে। সবাই সুদিনের স্বপ্ন দেখে। ভাবে—এইবার বুঝি বাজার কিছু সস্তা হবে। কিন্তু কালোবাজারের কল্যাণে সস্তা ত দূরের কথা, জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলে। সারা ভারত জুড়ে দেখা দেয় হাহাকার। মানুষের বুকে অসন্তোষের জোয়ার। ফলে অফিস, কারখানা সর্ব্বত্রই সুরু হয় ধর্ম্মঘট। বিপর্য্যয়ের সূত্রপাতেই ইংরাজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে যান তথা সাম্রাজ্য বাঁচান। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে; ভাবে— 'দেশ ত এবার স্বাধীন হল, এবার আর আমাদের দুঃখ কষ্ট কিছুই থাকবে না,' কিন্তু সকল আশা ভেঙ্গে দিয়ে জিনিষপত্রের দাম ক্রমশঃ বেড়েই চলে। কালোবাজারিদের রথচক্র সাধারণ মানুষকে পিষ্ট করে দুর্ব্বার বেগে এগিয়ে চলে। স্বাধীন দেশের কর্ণধারেরা পারে না তার গতি রুদ্ধ করতে। রতনের সংসার প্রায় অচল

হয়েও গড়িয়ে চলে কোনক্রমে। সাধারণ মানুষ আবার যুদ্ধ সুরু করে তাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ধর্ম্মঘটের সাহায্যে। ব্রজেনরাও প্রস্তুত হয়। রতন বুঝতে পারে না—কি তার করা উচিত। ব্রজেনদের সংঘের নেতারা বুঝায়, "বাঁচতে হলে মানুষের মতই বাঁচা উচিত। এমন তিলে তিলে শুকিয়ে মরার চেয়ে বরং একেবারে মরাই ভাল। এ ছাড়া জাতীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য আমরা। সর্ব্বভারতীয় নেতারা রয়েছেন আমাদের পেছনে। ধর্ম্মঘট করলে আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব।" সর্ব্বভারতীয় নেতাদের নেতৃত্বের আশ্বাসে ব্রজেনরা সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। তবুও তারা চুপ করেই থাকে। যুদ্ধ যে তাদের সুরু করা চাইই।

ধর্ম্মঘট সুরু হয়। রতনও যোগ দেয় তাতে। মালিক বাইরে থেকে দালাল এনে কাজ চালিয়ে যায়। নেতাদের উপদেশে শ্রমিকেরা বাধা দেয় না; ওদের আবার ভাবনা কি? সর্ব্বভারতীয় নেতারা যখন ওদের সহায়! ব্রজেনরা আবার ভুল করে। শ্রমিকদের এ মোহ তারা ভেঙ্গে দেয় না। ছ'মাস যায় কেটে। মালিক তার কাজ ভাল ভাবেই চালিয়ে যায়। শ্রমিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এই সময় নেতারা করে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। সমস্ত ধর্ম্মঘটি শ্রমিক যায় বরখাস্ত হয়ে। নেতারা তা স্বীকার করে নেয়। ব্রজেনদের ভুলের মাশুল পুরাদস্তরই দিতে হয়। শত চেষ্টা করেও তারা আর শ্রমিকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে পারে না। ধর্ম্মঘট যায় ভেঙ্গে। মালিক ইচ্ছামত কয়েকজনকে পুনর্ব্বহাল করেন। শতকরা নব্বই জনের চাকরি থাকে না। রতনেরও চাকরি যায়।

*

বেশ কিছুদিন যায় কেটে। যারা ছিল একদিন এক, তারা আজ কে কোথায় চলে যায়, কেউ তার খোঁজ পায়ও না, রাখেও না। চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় না, তবুও ব্রজেন আজও একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। কোনও রকমে সে সংসারের অচল চাকাটাকে সচল রাখবার চেষ্টা করে। একটা চাকরির ধান্ধায় আজ বেরিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে ফুটপাথের উপর আজ তার রতনের সাথে দেখা।

দূরে আবার বেজে ওঠে হঠাৎ-যাওয়া একটা মোটরের ইলেক্‌ট্রিক হর্ণ, পেঁচ-কাটা ময়লা কলটায় একটানা ছর্ ছর্ শব্দে প'ড়ে চলে জল; টুংটাং করে ঘড়িটায় দুটো বেজে যায়, ব্রজেন তবুও ঘুমোতে পারে না। ভিখারি নয় তবুও যে রতন আজ ভিক্ষা করে, খেতে পায় না, এর জন্য কে দায়ী? রাষ্ট্র, না সমাজ, না নেতারা, না তারা? কে দায়ী, বার বার তার মনে খালি এই প্রশ্নই দোলা দিয়ে যায়।

বাণী-কীর্ত্তন

হরিপদ দত্ত

শ্বেত কমল-দল আসনে
অলক্ত রঞ্জিত কমল চরণ
তুষার মণ্ডিত হিমগিরি শিরে
বালারুণ-কর চমকে যেমন।

অমল ধবল কান্ত অঙ্গে
চিকুর তরঙ্গ খেলিছে রঙ্গে
নীলাম্বু যমুনা বিবিধ ভঙ্গে
শুভ্র শৈল সৈকতে যেন॥

বাদিত শ্রীকরে বীণা সুললিত
মধুর ঝঙ্কারে দিগন্ত প্লাবিত
বিশ্ব জুড়ি' ওঠে মোহন সঙ্গীত
পুলক আবেশে হাসে গো প্রকৃতি—

উর সরস্বতী উরস আসনে
খোল মা জ্ঞানের উৎস পরাণে
বিদ্যাদায়িনি কলা-বিদ্যা দানে
কর মা কিঙ্কর কামনা পূরণ॥

কাব্যে চিত্তরঞ্জন

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ঔজ্জ্বল্য ও সাফল্য তাঁহার কবিপ্রতিভাকে অনেকটা ঢাকিয়া দিয়াছে। যে বিপুল ত্যাগের মহিমায় তিনি ভাস্বর, যে অগ্নিময় সহানুভূতিতে তিনি দীপ্যমান, যে অনির্ব্বচনীয় আবেগে তাঁহার স্বদেশপ্রেম স্পন্দিত নন্দিত ও মুর্ত্ত, তাহাদের আবির্ভাব আকস্মিক নহে।

কবিতায়, প্রবন্ধ ও গানে তাঁহার অন্তরের বৈরাগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ বৈরাগী নিজের মোক্ষ লাভের জন্য কৃচ্ছ সাধনায় 'বঞ্চিত প্রাণের আত্ম অস্বীকারে' ব্যাপৃত নহে, এ বৈরাগী প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, 'সব দিতে সব নিতে' দ্যুলোকে ভূলোকে কমণ্ডলু বাড়াইয়া দেয়—এ বৈরাগীর 'জনম বিশ্বের করে পরার্থে কামনা।"

তাই এ বৈরাগী কবি, স্রষ্টা ও ভক্ত; বিরাটের সহিত সুন্দরের অপূর্ব্ব আত্মিক সমন্বয়; সাগরের প্রাণলীলায় তাঁহার সাধনা, মানবতা তাঁহার দেবদেবী; Suinburne-এর মতো তিনি বলিয়াছেন—'Glory to man, for man is the highest.'

তাঁহার সাহিত্য-সেবা লোকরঞ্জন বা অর্থাগমের উদ্দেশ্যে নহে—শুধু নিজের অন্তরের আনন্দের জন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে, ইহার বিপর্য্যয়ে তিনি অধীর হইয়াছেন—নিয়মের ব্যতিক্রমে ব্যথিত হইয়া স্বাভাবিক পরিণতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এইগুলি তাঁহার আবেগচঞ্চল সাহিত্য-জীবনকে গতিবেগ দিয়াছে।

ম্লান চন্দ্রালোকে শান্ত-সিন্ধু যেন স্বপ্নভরে টল্ টল্ করিতেছে—কবি এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে আচম্বিতে কৌতুকময়ীর দর্শন পাইয়া 'ছন্দাতীত' ছন্দে, পরিপূর্ণ শব্দহীন অন্তরের মণিকোঠায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন।—উষায়, প্রভাতে, সায়াহ্নে, সন্ধ্যায় রজনীর অন্ধকারে সিন্ধুর বিচিত্র নীলাবিলাস তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে ভরিয়া দিল; 'মুক্ত' চিদাকাশে অনন্তের ছায়া-

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভরা পরাণে অনন্তের সাড়া জাগাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিল—তিনি গাহিলেন—

> "কী মোরে করেছ আজ! মনখানি মম
> শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম—
> পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
> গরবে গৌরবে আজ উঠিছে ভাসিয়া।"

সারাদিনমান এই সঙ্গীত শুনিয়া ইহার মাঝে কবি আপনাকে খুঁজিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের আঁখি খুলিয়া গেল, তাঁহার "কুঁড়ির মতো পরাণ" ফুটিয়া উঠিল, তিনি অপূর্ব্ব আলোকে অতুল ঐশ্বর্য্যে নিসর্গলাবণ্যে ডুবিতে চাহিলেন না—তিনি শব্দতরঙ্গে প্রাণ ভাসাইতে চাহিলেন—

> "চাহিনা কুসুমকুঞ্জ চাহি শুধু গান
> শব্দতরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ!
> তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া
> সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া
> আমার নয়ন পটে! আমি অন্ধ হব
> শব্দসাগর মাঝে আমি ডুবে রব!

আর কিছু রহিবে না! ভুবনমণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।"

মনে প'ড়ল, 'তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা।'

মনে পড়িল পূর্ব্বজন্ম—কতো পুণ্যফলে দুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়াছেন! সমুদ্রবক্ষে 'পরিপূর্ণ চাঁদ'—তাঁহার কাছে পূর্ব্বজনমের স্বপনের ছায়ারূপে ভাসমান হইয়া তাঁহার পরাণে শত জনমের হাসি অশ্রুভরা শত স্মৃতি জাগাইল,—মনে হইল—

"সকল জনম যেন এক হ'য়ে গেছে
একটি পুষ্পের মতো স্বপ্নে ভাসিতেছে।"

মেঘপূর্ণ দিনে ধূসর আঁধারে অশান্ত বেদনাভরে প্রলয় তুফানে যেদিন "তরঙ্গ তরঙ্গের পরে ঝাঁপাইয়া পড়ে," কবির বক্ষে সেদিন মহা হাহাকার জাগিয়া উঠে—ছিন্ন পাল ভগ্নহাল কবির মনতরী অনন্ত আঁধারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে, ভয়শূন্য কবি তখন অবারিত বক্ষে 'মৃত্যুরূপী সিন্ধুরাজের' আসন পাতিয়া জগতের হিতের জন্য অপূর্ব্ব প্রার্থনায় নিবিষ্ট হন—

"হে রুদ্র মরণ দেব! জটি জটাধর
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে
আপন হৃদয়-কুঞ্জে আপনার গীতে!
অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল
আপনারি সুখে দুঃখে করে টলমল;
অনন্ত সঙ্গীত ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে
হে রুদ্র প্রলয়সিন্ধু! বাঁচিতে মরিতে।"

এই কয়টি ছত্রে কবির মানবদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। ফুলের মতো মানুষ সুন্দর পবিত্র শোভাময়—গন্ধে গানে মাধুর্য্যে তাহার জীবনের বিকাশ, হে রুদ্র! এই আনন্দের রাজ্যে তাহাকে অকালে অকস্মাৎ বিনষ্ট করিও না—স্বাভাবিক নিয়মে তাহাকে ফুটিতে দাও, ঝরিতে দাও।

এই জীবন রহস্যময়, ছলনাময়, ক্ষণস্থায়ী—ভোগ ইহাতে সুখ দিতে পারে, কিন্তু আনন্দ দিতে পারে না; স্বার্থ ইহার সাধনাকে ব্যর্থ করে, দৈন্যে ভরিয়া দেয়। উপার্জ্জন কিসের জন্য? জীবন কিসের জন্য?

"জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্বপ্ন ভাঙি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন কিরণে
একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে—ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।"

এই প্রেরণাই কর্ম্মজীবনে কবিকে ত্যাগের রাজটীকা পরাইয়াছিল।

মনের অন্তঃপুরে প্রভাত-পুষ্পের মতো মধুর, যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিত বাসনা নিখিলের আনন্দরূপ ধরিয়া গোপনে 'স্বর্গের স্বপন' জাগাইলেও কবি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই—চিনিলেন, যখন সে বাহির হইয়া আসিল—

"হে আমার আপনার! হে আমার পর!
হে আমার বাহিরের, হে মোর অন্তর
হে আমার! হে আমার চির মর্ম্মময়!
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়।
আছিলে গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে।
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলজ্জ চরণে—
বাহিরিলে, দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব ধরণে,
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন
আমি অন্ধ, দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন!"

বৈষ্ণবপ্রাণ কবি, পদাবলীর মূল সুরটি ধরিয়া তাহাকে বিচিত্রভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। অভিনব ছন্দে কিশোর-প্রেমের উন্মেষের পরিবর্ত্তন কি সরসভাবে আঁকিয়াছেন—

"সেদিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে।

ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম।
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম।
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে।

"প্রেমসত্য" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন—

"জ্ঞান চক্ষু দিয়ে, তোমারে দেখিনি প্রিয়ে।
তোমারে দেখেছি শুধু হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর এত ভালবাসা
বিচার করিলে, তুমি শুভ্র কি কালো
বিচার করিলে, তুমি মন্দ কি ভালো
কাননের পুষ্পসম, ওগো পুষ্প মম!
যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি, বাসিয়াছি ভালো
তাই মোর এত ভালবাসা।

কবির রচনায় ও কর্ম্মজীবনে একাগ্রতা ও তীব্রতার মাত্রাধিক্য তাঁহার এইরূপ ভাবপ্রাধান্যের ফল। আক্রমণের তীব্রতা ও নির্ম্মমতার জন্য ব্যবহারিক জীবনে তিনি প্রসিদ্ধ। "কাব্যের কথা"র কয়েকস্থানে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণ স্বীকার না করিয়া কঠোর ভাবে বলিয়াছেন—"ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া আমরা কি শেষে বাংলা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব?" "নারায়ণ" পত্রিকার কয়েকটি রচনায় যুক্তিসহ সাহিত্যালোচনার অভাব দেখা যায়।

তাঁহার সহিত অনেকের মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা কেহই অস্বীকার করিবে না।

প্রধানতঃ তিনি ভক্ত, তাই তাঁহার আত্মনিবেদন প্রাণস্পর্শী ও মহিমাময়। তাঁহার 'কিশোর-কিশোরী', 'মালা', 'মালঞ্চ', 'অন্তর্যামী', 'সাগরসঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা পুস্তক তাঁহার অন্তরের পরিচয়। Carlyle-এর মতো তিনি 'নীরবতাকে' পূজা করিয়াছেন,—

"পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা
হে নীরব! হে মহান্! তোমারে বরিছে!
পূর্ণ করি দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।"

কবি "সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী" শুনিতে ব্যাকুল—গান গাহিবেন, তাই অনন্তের মহাগানের স্পর্শ ভিক্ষা করিতেছেন, নতুবা গানের কথাগুলি শুধু 'প্রভাহীন বাক্যদলের' সমতুল। অবসাদের মুহূর্ত্তে জীবনকে যখন মহাশূন্য বা স্বপনের ভ্রান্তি বলিয়া মনে হয়, কবি তখন ভবিষ্যতের চিত্রপটে অতীতের আশার স্বর্গকে আঁকিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিতেছেন—

"মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্বসংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেনগো ক্রন্দন?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও।"

"প্রেম ও প্রদীপ" শীর্ষক একটি করুণ কবিতায় নিজ জীবনের আলো-আঁধারির খেলা, আশা-নিরাশার লুকো-চুরি, মেঘ ও রৌদ্রের মায়ালীলার মতোই বর্ণিত হইয়াছে।

দেশবন্ধুর রচনার সংখ্যা অধিক নহে; করুণ ও শান্তরস তাঁহার অধিকাংশ কবিতাকে বাণীলাবণ্য দিয়াছে—আর যেখানে এই দুইটি রসধারা তাঁহার অন্তরের ভক্তির উৎসের সহিত মিলিয়াছে—সেই পুণ্য ত্রিবেণী সঙ্গমের রচনাগুলি আত্মনিবেদনের মহিমা পাইয়াছে।

প্রচণ্ড ঝটিকার অবসানে সমুদ্র প্রশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে—'বিগলিত করুণায়' তরঙ্গদল নাচিয়া চলিয়াছে, মধুর কীর্ত্তনরোলে চরাচর মুখরিত—কবি ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া গাহিলেন—

"হরিবোল! হরিবোল! করতাল বাজে যেন—
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন;
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি! কি মধু বিরহ দিয়া!"

কবির আর কিছু চাহিবার নাই—শুধু প্রার্থনা—

'প্রাণারাম প্রাণারাম, তোমা পাই কি না পাই
সঙ্গে রেখো চিরকাল।'

* *

"এপার ওপার করি পারি নাত আর
পার ক'রে দাও মোরে ওগো পারাবার।"

কবির পরাণ ভাসিয়া গেল—কূল নাই, কূল নাই, তাই অকূলই সার করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় মহামিলনের জন্ত ব্যাকুল, বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ তাঁহার নিস্পন্দ ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুভূতির অতীত—"সাড়া নাই, শব্দ নাই, পরাণ মাঝারে।"—নূতন রসসিন্ধুর মাঝে তিনি ঢেউ-এর মতো দুলিতেছেন—'কাঙাল পরাণ রাজার মতো উজল' হইল। এই অপূর্ব্ব আনন্দরসে ডুবিয়া আর একজন ভক্তকবি গাহিয়াছিলেন—

"সখা! তোমারে পাইলে আর
এ জনমে আর কিছু চাহি না চাহি না।"

দেশবন্ধু গাহিলেন—

"খুঁজেছি তোমারে কতো তরঙ্গের মাঝে
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে।
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম-সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।"

ভাড়াটে ভাঁড়

মণি দাশগুপ্ত

আমরা ভাড়াটে ভাঁড়,
পরেরে হাসাতে ডিগ্‌বাজি খেয়ে
ভাঙি পাঁজরের হাড়,
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়।

আপন গণ্ডে মেখে চুন কালি
মঞ্চে দাঁড়ায়ে লভি করতালি,
কেহ বলে আহা রস-সমুদ্র,
কেহ বলে রস-ষাঁড়!
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়।

পয়সা পাইলে হাসি নাচি গাই,
হাসি বেচে মোরা উদর চালাই,
রোগে শোকে বুক ভাঙে তবু, কভু
মুখ করিনেকো ভার,
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়।

বিরহের ব্যথা বুকে চেপে রাখি,
শোকের কান্না হাসি দিয়ে ঢাকি,
উদরের কাছে দুঃখ দৈন্ত
সব কিছু মানে হার—
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়।

মান ও মনের নাহিকো বালাই,
রাগ অনুরাগ নাহি কিছু নাই,
ফরমাসি রস যোগাই আমরা
ধারিনা রুচির ধার—
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়,

কাগজে কাগজে লিখি হিউমার
রঙে রাঙাইয়ে যত রিউমার,
পড়ে' কারো হেসে ফাটে টিউমার
কাহারোও বা কিছু আর,
আমরা ভাড়াটে ভাঁড়।

পরিব্রাজক কাম'নীত

কার্ল গিয়েলারুফ

অনুবাদক—শুদ্ধোধন সেন

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সন্ধ্যা

এক সময় কামনীতর মধ্যে একটা অস্বস্তি, একটা শূণ্যতাবোধের উদ্ভব হল।

অজ্ঞাতেই কামনীতর অনুভূতি সর্ব্ব পূর্ণতার উৎস-স্বরূপ লক্ষব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হল। কিন্তু তাতে চিন্তা দূরীভূত হল না। বরং কয়েকশত সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাও বেশ বোধগম্য ভাবে বর্দ্ধিত হ'তে থাকে।

বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে অবাধ সময়স্রোতে বাধার সৃষ্টি হ'ল, যেন স্রোত মধ্যে সহসা একটা দ্বীপের উদ্ভব হ'য়েছে; নিস্তরঙ্গ স্রোতপ্রবাহ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে নবোদ্ভূত দ্বীপ-প্রান্তে প্রতিবাদস্বরূপ টুকরা টুকরা হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ছে। আবার চলছে। স্রোতে এখন একটা "পূর্ব্বে" ও একটা "পরে"-র উৎপত্তি হ'ল।

কামনীতর বোধ হ'ল লক্ষব্রহ্ম আর পূর্ব্বের মত জ্যোতির্ম্ময় নন।

তখন কামনীত পঞ্চাশ লক্ষ বর্ষ ধরে লক্ষব্রহ্মের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখলেন। মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধ'রে দেখছেন; কিন্তু তথাপি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারলেন না।

তখন বশিট্‌ঠীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

লক্ষ্য করলেন, বশিট্‌ঠীও মনোনিবেশ সহকারে ব্রহ্মকেই দেখছেন।

সে দেখে কামনীতর মন বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ল। বিষণ্ণতা হ'তে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধ হ'তে চিন্তা, চিন্তা হ'তে উচ্চার্য্য উক্তির উৎপত্তি হল।

তিনি তখন বললেন:

"বশিট্‌ঠী, তুমিও কী এটা লক্ষ্য করেছ?" লক্ষব্রহ্মে কী সঙ্ঘটিত হচ্ছে?"

লক্ষ বর্ষ পরে বশিট্‌ঠী উত্তর দিলেন—

"লক্ষ ব্রহ্মে যা সঙ্ঘটিত হচ্ছে, সে হচ্ছে তাঁর জ্যোতির হ্রাস।"

সমকাল অতিক্রান্ত হবার পর কামনীত বললেন, "আমারও তাই বোধ হচ্ছে। জ্যোতি হ্রাস পাচ্ছে সত্য, কিন্তু এ একটা চলমান অস্থায়ী অবস্থাও হ'তে পারে। তথাপি স্বীকার করি, লক্ষব্রহ্মে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে দেখেও আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

বেশ কিছুকাল—লক্ষ লক্ষ বর্ষ—পরে কামনীত পুনরায় উক্তি করলেন—

"তীব্র আলোকে আমি অস্পষ্ট দেখছি কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা বশিট্‌ঠী দেখতো, লক্ষব্রহ্মের জ্যোতিঃ আবার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে না?"

পাঁচ লক্ষ বর্ষ পরে বশিট্‌ঠী উত্তর দিলেন—

"লক্ষব্রহ্মের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হচ্ছে না, স্থিরভাবে হ্রাস পাচ্ছে।"

কর্ম্মকারের লৌহকুণ্ডে অবস্থিত শ্বেত-তপ্ত লৌহখণ্ড বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যেমন লোহিতবর্ণ ধারণ করে, লক্ষব্রহ্মের শ্বেত জ্যোতিঃ সেইরূপ এখন লোহিতাভা প্রাপ্ত হয়েছিল।

"এ আবার কী হল?" কামনীত মন্তব্য করেন।

"বন্ধু, এ হল লক্ষব্রহ্মের জ্যোতিঃ—যে একদিন নির্ব্বাপিত হবে, তারই নিদর্শন।"

"অসম্ভব, বশিট্‌ঠী, অসম্ভব। তাহলে এই বিপুল ব্রহ্মলোকের ঔজ্জ্বল্য ও শোভার কী অবস্থা হবে?"

"উচ্চলোকের আলোকপানে জীবন ছোটে
সেও শেষে বিনাশ মানে।
জেনো, ভবিষ্যৎই নিবিয়ে দেবে
ব্রহ্মের ও জ্যোতির্ব্বানে॥"

একথা বলবার সময় তাঁর মনে এই অবস্থার আবির্ভাব হয়েছিল।

মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর সময় পরেই চিন্তান্বিত ও প্রায় রুদ্ধশ্বাস কামনীতর প্রশ্ন শোনা গেল—

"কে এই ভয়াবহ, জগৎ-ধ্বংসী উক্তি করেছেন?"

"প্রভু, মানব-জ্ঞাতা, পূর্ণাত্মা বুদ্ধ ব্যতীত কে আর বলবেন!"

কামনীত চিন্তাযুক্ত হলেন। বেশ দীর্ঘকাল তাঁর চিন্তা মাঝে কেটে যায়; বহু কথা স্মরণ হয়। তারপর বললেন—

"বশিট্‌ঠী, পশ্চিম স্বর্গ সুখবতীতে একদিন তুমি বুদ্ধের একটী উক্তি আবৃত্তি করেছিলে; উক্তির সত্যতাও আমরা তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। স্মরণ হচ্ছে, সেই উক্তি-সমন্বিত বক্তৃতাটী সেদিন তুমি বিশদভাবে আবৃত্তি করেছিলে। এই জগত-ধ্বংসী উক্তিটী কিন্তু তার মধ্যে ছিল না। তাহলে, বশিট্‌ঠী, তুমি কি প্রভুর অন্য কোন বক্তৃতা শুনেছ?"

"বহু, বন্ধু। আমি তাঁকে ছয়মাসকাল প্রত্যহ দেখেছি; এবং প্রতিদিন তাঁর শ্রীমুখ হতে উচ্চারিত বাণী শ্রবণ করেছি।"

সশ্রদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে কামনীত তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন। বলেন—

"এই হেতুই আমার বোধ হ'চ্ছে সমগ্র ব্রহ্মলোকে তুমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। কারণ, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থিত নক্ষত্র দেবতাদের দিকে চেয়ে দেখছি, তাঁরা ম্লান, নিষ্প্রভ, কম্পিতশিখা, এমন কি স্বয়ং লক্ষ-ব্রহ্মও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন; তাঁর নিষ্প্রভ জ্যোতিঃ হ'তে মাঝে মাঝে এক-একটা তীক্ষ্ণ রশ্মি স্ফুরিত হ'চ্ছে; আমার ধারণা এ তাঁর ক্রোধের স্ফুরণ। কিন্তু চঞ্চল বায়ু হ'তে রক্ষিত দীপের মত তোমার জ্যোতি আজ-ও অক্ষুণ্ণ, অম্লান। আরও দেখ, আকাশ গঙ্গার তীর হ'তে আমরা পূর্ব্বে ঘণ্টাধ্বনির মত মুহুর্মুহু জগৎচূর্ণনের বজ্রধ্বনি শুনেছিলাম, সেই শব্দ এখন আমাদের চতুষ্পার্শ হ'তে উত্থিত হ'চ্ছে—এও তো, বশিট্‌ঠী, অশান্তির লক্ষণ। এতে বোঝা যায়, ব্রহ্মলোকের অবাধগতি বাধা পাচ্ছে, সামঞ্জস্য আর নাই, জগত-শক্তি সমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশ্লেষণ এসে গেছে। জ্ঞানীর উক্তি আছে, 'যেখানে অভাব সেখানেই শব্দ, আর প্রাচুর্য্য থাকলেই শান্তি।' তোমার উক্তিতে আর আমার সন্দেহ নাই, বশিট্‌ঠী। এই ব্রহ্মলোক ধ্বংস হ'চ্ছে, এখনই মৃত্যুলাভ করবে, এই ধ্বংসশীলতার মধ্যে তুমি পূর্ণাত্মা সম্বন্ধীয় তোমার স্মৃতি বর্ণনা কর, আমিও তা হ'লে ধ্বংসের মধ্যে স্থৈর্য্যলাভ করব। এখনও আত্মার কথা অন্য আত্মাকে জানাবার জগতে আছি, কিন্তু এমনও হ'তে পারে—এই শেষবার আমরা মিলিত হ'য়েছি। তোমার কথা আর হয়তো শুনতে পাব না, তোমার সমগ্র জীবনকথা বল। অঙ্গুলিমালের সন্ন্যাস-গ্রহণ-কথা শুনেছি, তথাপি উজ্জেনীতে তার উপস্থিতি এখনও রহস্যময় থেকে গেছে। তার উপস্থিতির জন্যই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রবৃত্তি পেয়েছিলাম, সেইজন্যই নিম্নগামী না হ'য়ে সুখবতী লাভ ক'রেছিলাম, সেস্থান হ'তে তোমার সাহায্যে উচ্চতম এই লোক লাভ ক'রে অপরিমেয়কাল দেবত্বভোগ করেছি। আমার একটা ধারণা আছে, আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রবৃত্তি তোমার নিকট হ'তেই এসেছিল। এর মূল সত্য এখন আমি জানতে চাই। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমায় বল, কেন তুমি উচ্চতর কোন লোকে অস্তিত্ব গ্রহণ না করে আমার মুক্তির জন্য সুখবতীতে প্রবেশ ক'রেছিলে?"

এদিকে যখন একটী লক্ষ বর্ষ হ'তে আর একটী লক্ষ বর্ষ কালের মধ্যে ব্রহ্মের নিষ্প্রভত্ব এবং নক্ষত্রদেবতাদের ম্লানতা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছিল;

যখন, নক্ষত্র দেবতারা অনিয়মিত শিখা নিক্ষেপে কখন জ্বলে উঠ্‌ছিলেন, কখন প্রভাহীন হ'য়ে প'ড়ছিলেন, ব্রহ্মের চতুষ্পার্শে ম্রিয়মান অগ্নিবৃত্ত ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হ'চ্ছিল, আর তিনি অনন্ত ব্যোমের সর্ব্বত্র বিরাট বিরাট ভুজসম অগ্নিশলাকা নিক্ষেপ ক'রে তাঁর আসন্ন আসন্ন জন্য দায়ী অদৃশ্য শত্রুর সন্ধান করছিলেন;

যখন, নক্ষত্রভূত দেবদেহগুলির অনিয়মিত অশান্ত গতির ফলে উত্থিত একটা ঘূর্ণি ব্রহ্মলোক হ'তে নক্ষত্র জগতকে কোন অসীমে অপসারিত ক'রে নিয়ে গেল, আর ভগ্নপোতে প্রবেশকারী সাগরের অন্ধ-আবেগময় জলরাশির মত পুঞ্জীভূত অন্ধকার তীব্রবেগে ছুটে নক্ষত্রদের পরিত্যক্ত শূন্যস্থান পূর্ণ করল;

যখন, অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে ধ্বংসক্রিয়া সম্পন্ন হ'য়ে এসে মহাবিশ্বে এক অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি ক'রে বিস্ফোরিত নক্ষত্র-পুঞ্জকে গুচ্ছ গুচ্ছ উল্কাপিণ্ডের মত ব্রহ্মের জ্বলন্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করতে লাগল;

যখন, মুমূর্ষুর শেষ শ্বাস কষ্টের মত, নক্ষত্র সমূহের পরস্পরের সজ্ঘর্ষ-জনিত অনিয়মিত মহানাদ ব্রহ্মলোকের একপ্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তর প্রপূরিত করল;

তখন—একটুও বিপন্ন বা বিষণ্ণ বোধ না ক'রে অচঞ্চল স্থির কণ্ঠে বশিট্‌ঠী তাঁর পূর্ব্বজীবন-কথা কামনীতর নিকট বর্ণনা করতে লাগলেন। [ক্রমশঃ

ঐশ্লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্বপ্রগতি

আজহার উদ্দিন খাঁন

ভূমিকা

"ইসলাম ও পাকিস্থান" নামে আমার একটি প্রবন্ধ 'যুগান্তরে' প্রকাশিত (১৬।৪।৫০) হবার পর অনেক বন্ধু-বান্ধবেরা ইসলাম সম্বন্ধে আরও প্রবন্ধ লেখবার জন্তে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাই ইসলাম সম্বন্ধে এরূপ জিজ্ঞাসুপ্রবণ মন দেখে ঐশ্লামিক চিন্তার কতকগুলি সাধারণ কথা লিখছি। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে ঐশ্লামিক চিন্তার কি দান ও বর্ত্তমান বিশ্বপ্রগতি পথেও তার কি কি চিন্তা কাজ করছে, সেগুলিকেই সংক্ষিপ্তাকারে বলবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে।

ভাল ও খারাপ এই দুটি জিনিষের সংমিশ্রণে প্রত্যেক জাতির ইতিহাস লিখিত হয়। ইসলামের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এতে সোনার চেয়ে খাদের ভাগই বেশী। জহুরীর কাছে সোনার যেরূপ মূল্য থাকে, খাদের সেরূপ থাকে না। মাটির খনির মধ্যে যে সোনা পাওয়া যায় তাতে শুধু সোনার ঢেলা স্তূপাকৃতি হয়ে নেই। আমি জহুরীর মতো ইসলামের ইতিহাসের ভাল অংশটাকেই দেখেছি, খাদ থেকেও কিছু রস নিংড়ে বের করেছি, তাই আমার এ নিবন্ধ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরপেক্ষ আলোচনা মাত্র।

দুর্যোগের কালো ছায়া নেমেছে সারা ভারতের বুকে; সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভারতের আকাশে। তবু গাঢ়তম কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টির প্রেরণায় সে এগিয়ে চলেছে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টির পথে আজও যাঁরা, বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে বাস করা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে বিদেশী বলে মনে করেন, তাঁদের ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ঐ মনোভাবকে সামান্ত জিনিস বলে উড়িয়ে দেয়া চলতো, কিন্তু এই মনোভাবেরই দরুণ ঐশ্লামিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ভাল দিকটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই আজ ইসলাম মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কি দিয়েছে তা বিশেষ করে জানার গুরুত্ব প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দুর কাছে অপরিসীম। ভারতীয় মুসলমানদের কাছেও হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণার গুরুত্ব সমধিক। রবীন্দ্রনাথের মতে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ই হল সাম্প্রদায়িক কলহ নিরসনের একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলীর বহু স্থানেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই ভাবেই এর সমাধানেরও পথ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলেই আমরা দেখব বাহিক আচার অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে যাই পার্থক্য থাক না কেন, সর্বধর্ম্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের দরুণ আমরা এই ঐক্যসূত্রটি নিতে পারিনে। অনুদার আত্ম-কেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে নিজের নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মনীতির মূল তত্ত্বগুলি অপরাপর সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা এখনো নীরব কেন? স্বচ্ছ ও নির্ম্মোহ দৃষ্টি সম্পন্ন বাঙালী পাঠক সমাজের অভাব হবে না জেনেই এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ঐশ্লামিক সংস্কৃতি

জীবনবোধ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব একটা সম্পদ। এই জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে কোন জাতিই নিজস্ব সত্তা গড়ে তুলতে পারে না। সৃষ্টির আদিম প্রত্যুষ থেকে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন আদর্শ গড়ে উঠেছে। তাই মানবসমাজে সহস্র বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আছে। একের সঙ্গে অপরের মেলে না; এক জাতির

সংস্কৃতির সঙ্গে অপর জাতির সংস্কৃতির মিল নেই, কিন্তু বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির মধ্যে সাধারণ কতকগুলি মিল লক্ষ্য করা যায়। এই সাধারণ মিলগুলি বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়—আর রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির ভাল ভাল গুণগুলি। আরবীয় বা ঐস্লামিক সংস্কৃতি বলতে শুধু লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী দেশের কথা বোঝায় না। আরবীয় সভ্যতা ও প্রভাব যে যে দেশে ইসলামের সহায়তায় ব্যাপ্ত হয়েছিল সেই বিশাল ভূভাগের কথাই হল আরবীয় বা ঐস্লামিক সংস্কৃতি।

ইতিহাসের পটভূমিকা

ইতিহাসের পটভূমিকায় মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিষয়টিকে বাস্তব দৃষ্টিতে যাচাই করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কোন নতুনরূপ প্রকাশিত হয়েছে—ঐস্লামিক সংস্কৃতি কি করে সকল জাতির সংস্কৃতির মতো এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপায়িত হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় জগতে আঁধার যুগ। গ্রীস, রোম, মিশর, আরব, পারস্য, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই সত্যের আলোক নিভে গিয়েছিল। 'আইয়ামুল আরব' নামক গ্রন্থে দেখি তখনকার আরবেরা এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু ছিল। আল্লা-বিস্মৃতি, কাপট্য ও লাম্পট্য এবং শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা আরবীয় জীবনকে নিশ্চেষ্ট করে তুলেছিল। প্রাচীন গ্রীক ও পারস্য পুরোহিতদের অনাচার খৃষ্টান পাদ্রীদের যীশু খৃষ্টের বিকৃত শিক্ষা ও বিধান, অত্যুগ্র, গোঁড়ামি ও বীভৎস তাণ্ডবলীলায় মানুষ হয়ে উঠলো দিশেহারা, সীমাবদ্ধ হোল তার জ্ঞান, পাপপ্রবণ হোল তার মন, তাই তার জীবনে এলো পদে পদে ভ্রান্তি আর পদে পদে প্রলোভন। ইসলামের আগমনে তারা এক নতুন জীবন লাভ করল। এ ধর্ম্মমতের সরল ও অনাড়ম্বর রূপের প্রতি তারা সহজে আকৃষ্ট হল। এইরূপে ধর্ম্মের নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের আশ্রয়রূপে ইসলাম ছাড়িয়ে গেল। ইসলামের উত্থান ও বিস্তৃতির নাটকীয় অধ্যায়ের মূলে যে অন্তর্নিহিত সত্যটি ছিল, প্রথিতযশা ঐতিহাসিক গীবণ 'Decline and Fall of the Roman Empire' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "......More pure than the system of Zoroaster, more liberal than the land of Moses, the religion of Mohammad might seem less inconsistent with reason than the creed of mystery and superstition which, in the seventh century, disgraced the simplicity of the Gospel.."

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ খৃঃ) একশ বছরের মধ্যে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আরব-বিজয়ের ঢেউ যেভাবে সমস্ত রাজা, রাজ্য, সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয় তার তুলনা কম মিলে ("One of the most memorable revolutions which has impressed a new and lasting character on the nations of the Globe."—Gibbon.)। এই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে, স্পেনে ইসলাম ধর্ম্ম ও আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের প্রান্তসীমা থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির অধীশ্বর তারা হল। ইসলামের প্রাণশক্তির প্রেরণায় আরবজাতির অভ্যুদয়ের এই নাটকীয় গতি নির্দ্ধারণে আর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক H. A. L. Fisher 'A History of Europe' গ্রন্থে বলেছেন—

"Nowhere was there a vestige of an Arabian state, of a regular army, or of a common political ambition. The Arabs were poets, dreamers, fighters, traders; they were not politicians. Nor had they found in religion an establishing an unifying power. They practised a low form of polytheism. A hundred years later, these obscure savages had achieved for themselves a great world power. They had conquered Syria and Egypt, they had overwhelmed and converted Persia, mastered Western Turkistan and part of the Punjab. They had wrested Africa from the Byzantines and the Berbars, Spain from the Visigoths. In the west they threatened France, in the East

Constantinople. Their fleets, built in Alexandria or the Syrian ports, rode the waters of the Mediterranean, pillaged the Greak islands and challenged the naval power of the Byzantine Empire. Their success had been won so easily, the Pusians and Berbars of the Attas Mountains alone offering a serious resistance, that at the beginning of the eighth century it must have seemed an open question whether any final obstacle could be opposed to their victorious course. The Mediterranean had ceased to be a Roman lake. From one end of Europe to the other, the Christian state found themselves confronted with the challange of a new Oriental civilisation founded on a new Oriental faith."

আজও অনেকের ধারণা যে ইসলাম বলপূর্ব্বক মানুষকে ধর্ম্মান্তরিত করেছে, আল্লার নামেই তার তরবারি চালিত হয়েছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। কয়েকজন ধর্ম্মান্ধ খলিফা ও মোল্লারা জোরপূর্ব্বক যে ধর্ম্মান্তরিত করেছে তার উল্লেখ পাওয়া যায়; আর স্বভাবতই মুসলমানরা ধর্ম্মভীরু জাতি এ কথাও সত্য। তবে কয়েকটি উল্লেখ একত্রে সন্নিবেশিত করে সমগ্র ইতিহাসের সত্যকে অমর্য্যাদা করা উচিত নয়। J. W. Draper 'History of the Intelectual Development of Europe' (Vol. I) গ্রন্থে বলেছেন,

"It is altogether a misconception that the Arabian progress was due to the sword alone. The sword may change an acknowledged national creed, but it cannot affect the consciences of men. Profound though its argument is, something far more profound was demanded before Mohammadanism pervading the domestic life of Asia and Africa···The explanation of this political phenomenon is to be found in the social condition of the conquered countries. The influence of religion in them had long ago ceased; it had become supplanted by theology.... "They were taught that on those doctrines the salvation or damnation of the human race depended....They··· saw that personal virtue or vice were no longer considered; that sin was not measured by evil works but by the degrees of heresy......In such a state of things what else could be the result than disgust or indifference? Certainly men could not be expected...to give help to a system that had lost all hold on their hearts. When, therefore, in the midst of the wrangling of sects...and anarchy of countless disputants, there sounded through the world......the dread batle cry, 'There is but one God',...is it surprising, that the hubberb was hushed? Is it surprising that all Asia and Africa fell away?" Finlays 'History of Byzantine Empire' গ্রন্থে বলেছেন, "In almost every case in which the Saracens conquered a Christian Nation, history unfortunately reveals that they owed their success chiefly to the favour with which this progress was regarded by the masses of the conquered people. To the disgrace of most christian Governments, it will be found that their administration was more opperesive than that of the Arab conquerors...The inhabitants of Syria welcomed the followers of Mahomet; the copts of Egypt contributed to place their country under the domination of the Arabs; and the Christian Berbers aided the conquest of Africa. All those nations were aduced by the hatred for the government of constantinople to place themselves under the sway of the Mohammadans. The treachery of the nobles and the indifference of the people made Spain and South of the France easy prey to the saracens."

সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি উদারতাই ইসলামের বিধান। সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শান্তিতে বাস করাই হচ্ছে তার লক্ষ্য। অন্য ধর্ম্মের প্রতি কটূক্তি করা ইসলামের নিষেধ, দেব-দেবীকে গালাগালি দেয়াও নিষেধ। বিধর্ম্মীদেরকে বিধর্ম্মী বলা অন্যায় কেননা ইসলামে নির্দ্দেশ আছে যে যদি কোন বিধর্ম্মীর মৃত্যুর খবর কোন মুসলমানের কাণে আসে তাহলে তার মৃত আত্মার সদগতির জন্যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। খাজরাজ নেতা

আবদুল্লাহবিন-উবাই মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু হজরত তাঁকে কোন দিন "কাফের" বলে বলেননি। আবদুল্লাহর যখন মৃত্যু হয় তখন হজরত তাঁর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার জন্যে নিজের উত্তরীয় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জানাজা কার্য্যেও যোগদান করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্যে আল্লার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। হজরতের পিতৃব্য আবুতালেব কোনদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেননি, কিন্তু হজরত তাঁকে এই কারণে কোনদিন অশ্রদ্ধার ভাব দেখাননি; মৃত্যুকালে তাঁর জন্যেও তিনি আল্লার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। হজরত নিজেই বলেছেন:

"যার কথায় ও কাজে মানবজাতি নিরাপদ হয়, সেই জনই খাঁটি মুসলমান।"

"যতক্ষণ এক মানুষ আর এক মানুষকে ভালবাসতে পারে না, ততক্ষণ তারা আল্লাকেও ভালবাসতে পারে না।"

"লোককে অপমান করা মুসলমানের পক্ষে জঘন্য কাজ। লোককে অভিশাপ দেয়া, গালাগালি দেয়া এবং মিথ্যা কথা বলা মুসলমানের ধর্ম্ম নয়।"

কোরাণে আছে:

"তাহারা (পৌত্তলিক) আল্লার পার্শ্বে যে সমস্ত দেবতাদিগকে স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।" (সুরা আনাম—৮:১০৯)

"(হে মোহম্মদ বিধর্ম্মীদেরকে বল) তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।" (সুরা কাফেরুণ)।

কোরাণ বলে, "ধর্ম্ম প্রচারে বলপ্রয়োগ নাই।" (সুরা বকরা) তাই ধর্ম্ম অভিযানকে আমি ঘৃণা করি। কোরাণ বলে, "এমন কোনো জাতি নাই—যেখানে আমি (আল্লা) কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই।" (সুরা ফাতির—৩৫:২৪) অন্যত্র "প্রত্যেক জাতিরই এক একজন পয়গম্বর ছিল।" (ইউনুস—১০:৪৭) তাই আমার বিশ্বাস কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের মহাঋষিরা ভগবানের দূত ছিলেন।

ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে পাকিস্থান আজ কার নির্দ্দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে, তা জানিনে। হজরত মহম্মদ বলেছিলেন, "বিনয় আর নম্রতা হচ্ছে ইমানের দুটি শাখা। বৃথা বাক্য ও মিথ্যা বাক্য হচ্ছে ভণ্ডামীর দুটি শাখা।" [ক্রমশঃ

অসুখ হয় কেন ?

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'শরীরং ব্যাধি মন্দিরং' : এই শাস্ত্রবাক্য ত আর মিথ্যা হবার যো নাই। শরীর যখন আছে অসুখ করবেই। তাই নানান অসুখের সৃষ্টি। অবশ্য অসুখ আদিম যুগেও ছিল; এখনও আছে। তবে কিছু ইতর বিশেষ। আগেকার দিনে স্বাভাবিক আবেষ্টনির মধ্যে জীবনযাপন করাতে রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি ছিল বিপুল। আর এই সভ্য সমাজে অ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের ফলে সে শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আগেকার দিনে অসংখ্য রোগ-শত্রুর মধ্যে বাস করেও—যদিও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ছিলাম—আমরা স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পেরেছিলাম। আর আজকাল তাদের চিনেছি ভাল করে; তাদের ধ্বংস করবার অস্ত্রও আবিষ্কার করেছি অনেক। তাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবার জন্ত দেহদুর্গকে সুরক্ষিত করেছি অনেক প্রকারে; বার মাসে তেরটি ইন্‌জেক্সান নিয়ে। তত্রাচ ব্যাধির তাণ্ডবলীলা চলেছে সমান ভাবে। দেহ আর মনকে জর্জ্জরিত করছে অহরহ।

যুদ্ধের উন্নততর মারণাস্ত্রের আবিষ্কারও যেমন পররাজ্য, পরসম্পদ অপহরণকারি জাতিসমূহের উদ্দাম লালসা সংযত করতে পারছে না, তেমনিই উন্নততর ঔষধের আবিষ্কারও দেহ, সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসকারী ব্যাধির বিস্তারকে সংযত করতে অপারক।

টোটকা ঔষধ, হাতুড়ে চিকিৎসক, ঝাড় ফুঁক, মাদুলির দিন যখন ছিল, রোগ তখন ছিল কম। মনের বল ছিল তখন অসীম ও বিশ্বাস ছিল অটুট। তখন রোগ সম্বন্ধে সকলে বিশেষ সজাগ ছিল। 'শতহস্তেন বাজীন' মত রোগের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতো। স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে সকলেই যত্নশীল ছিল—অবশ্য জাগ্রত মনের অগোচরে। ধর্ম্মপ্রাণ দেশ আমাদের। তাই ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কঠোর সমাজ শাসনের মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব দেশকে মহিমান্বিত করেছিল। আদিকাল থেকে ঠাকুমা, দিদিমারাই এই স্বাস্থ্যনীতির বাণী বংশানুক্রমে প্রচার করে এসেছিলেন।

কিন্তু সভ্যসমাজে এখন ও সব কুসংস্কার। তাই অচল। আমরা এখন শিখেছি অনেক, বুঝি বেশী। নূতন নূতন চমকপ্রদ ঔষধের আবিষ্কার আমাদিগকে এমনই মোহে আবিষ্ট করে রেখেছে যে, রোগের ভয়াবহ দিকটা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েছি। ফলে 'শতহস্তেন বাজীনা' এখন আদিম সংস্কার বলে বর্জ্জন করে রোগের সঙ্গে কোলাকুলি করতে যেন ব্যাকুল হয়েছি।

যৌন ব্যাধিকে ভয় কিসের? পেনিশিলিন, সালফা-ড্রাগ সব আছে, দু'চার দিনেই সায়েস্তা করে দেবে। অবৈধ সহবাসে ভয় কি? রাবার শুড্‌স রক্ষা করবে। এটা খেয়োনা, ওটা খেয়োনা, উদরাময়, পেট খারাপ হবে, কড় ভয় দেখাচ্ছ? সালফাগুয়ানেডিন প্রভৃতি ওষুধ সব আছে কেন? ভাত খেওনা, মিষ্টি খেওনা, আলু খেওনা। তবে খাব কি? জীবনটাকে ভোগ করব কি করে? ডায়াবিটিস্ না হয় হয়েইছে—ইন্‌সুলিনের সৃষ্টি হয়েছে কেন তবে?

এত সব অমোঘ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ঐ সব রোগ ঘরে ঘরে কিন্তু বিরাজমান। আগেকার দিনে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ব্যাধি হয়ত মারাত্মক হয়ে পড়তো। আর আজকাল সেখানে জীবন্মৃত অবস্থায় এনে রাখে, এই যা তফাৎ।

সুষ্ঠু মানসিক অবস্থাই রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি বাড়ায়। আমাদের দেহ-যন্ত্রের যন্ত্রী হলো 'মন'। এই মন আহত হয় বেশী সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার ঘাত প্রতিঘাতে। আহত মনই দেহের অসুস্থতার কারণ হয়ে পড়ে। তাই অ-সুখ রোগের নামান্তরে পরিণত হয়েছে।

জীবন সংগ্রামের কোন এক বিশিষ্ট পরাজয়ের প্রথম অভিব্যক্তি হচ্ছে খাদ্যে অনিচ্ছা। অর্থাৎ পরিপাক যন্ত্রের বিকল অবস্থা। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও তার কার্য্যকারিতার কোন অবনতি দেখা যায় নাই। যখনই এই পরাজয়ের চিন্তা মনকে অবিভূত করতে থাকে, তখনই মাথাব্যথা, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গ এসে যায়। অর্থাৎ স্নায়ু ও হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যদক্ষতার অভাব হয়। অথচ কিছুদিন আগেও ত তারা বেশ সবল ছিল। পরাজয়ের গ্লানি যতই মনকে আচ্ছন্ন করতে থাকে, ততই জীবনের প্রতি উদাসীনতার মাত্রা বাড়তে থাকে। তখনই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নানারূপ রোগের সম্মুখীন হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। এবং তার শেষ পরিণতি হয় দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্ত মাদক দ্রব্যে আশক্তি—যার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে সকলেই অবহিত। পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহা যখন বলবতী হতে থাকে, মনের উত্তেজনা ততই বাড়তে থাকে— যার ফলে 'ব্লাড্ প্রেসার' বেড়ে গিয়ে শরীরকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করে দেয়।

এমনি করেই হয় অসুখের সৃষ্টি।

মনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে চালাক যারা, তারা বেশ কিছু রোজগার করে নেয়। জীবনযাত্রার মান উন্নততর করবার প্রয়াসে স্বাস্থ্য সম্মত সাধাসিদা খাদ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্যকর রসনা ও নয়ন তৃপ্তকর মূল্যবান খাদ্যই এই সভ্য সমাজে আভিজাত্য প্রদান করবে। তখন মন নিজেই বলবে—"খাদ্য বলে গুচ্চের শাক-পাতা খেয়ে কি গরু ছাগলের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়াবো?" তখনই আশ্বাসবাণী আসবে "ভাবনা কিসের? ভিটামিন ট্যাবলেট পাঠিয়েছি। খাওয়ার পর দু' চারটা খেয়ে ফেল—ভিটামিনের অভাব চুকে যাবে।" মন যখন খোসগল্প করে 'রাজা-উজীর' মারতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে, তখনই অলিতে-গলিতে রেস্তরেঁার আবির্ভাব হয়েছে। খাও প্রাণ ভরে চা, চপ্, কাটলেট, আর লেগে যাও প্রাণ খুলে দেশোদ্ধারের তর্কে। টিবি সংক্রামিত হবার ভয় যেন কোরো না চা খেতে গিয়ে? বাজারে স্ট্রেপ্‌টোমায়সিন এসে পড়েছে। ভয় কি? গয়লার দুধে বীজাণু কিল্ কিল্ করছে—আর সার পদার্থ ত কিছুই নাই, কেবল জলে ভর্ত্তি, খেয়ে শরীর খারাপ হবে। হরলিকস্, ওভালটিন, গুড়ো দুধ যথেষ্ট বাজারে আছে। নির্ভাবনায় খেয়ে যাও। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছ না? তারজন্ত হয়েছে কী? কেমন সব ফ্যাসান দুরস্ত চশমা বাজার ছেয়ে রয়েছে। চোখে দিয়ে নিজে কৃতার্থ হও, আর দশজনের দৃষ্টিসুখের কারণ হও।

এমনি করেই চালাকদের প্রলোভনের খপ্পরে প'রে আমাদের ধনে-প্রাণে শেষ হবার যোগাড়। এদের উপরে আবার টেক্কা মেরেছে অতি চালাক যারা। অর্থাৎ মুনাফাখোর কালোবাজারিরা। "Good comes out of the evil" কথাটার যথার্থতা আবার হয়ত একদিন প্রমাণ করবে এইসব অতি চালাকরা। বিদেশজাত চমকপ্রদ ঔষধ পথ্যাদি বাজার হতে সহসা অদৃশ্য হওয়া এবং সাধ্যের অতীত মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় "সাপে বর" হবে অনেকের কাছে। তখন হয়ত তাঁরা সাবধানতা অবলম্বন করতে শিখবেন অসুখের কবলিত না হবার জন্ত। তখনই হয়ত স্কুলে স্কুলে "হাইজিন" পড়ানোর সার্থকতা হবে। এখন স্বাস্থ্যতত্ত্ব কেবল পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষার খাতায় সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে চিকিৎসকের উপদেশ লোকে খেয়াল খুসীমত গ্রহণ বা বর্জ্জন করছেন। তাঁরাও তাই উপদেশ দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করেন। সেটা যথাযথ পালন হলো কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কেননা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁদের অনুকূল নয়। অথচ উপদেশ উপেক্ষা করার অনিবার্য্য ফলের অনেক ঝুকি তাঁদেরই উপরে এসে পড়ে।

এই রকমে অসুখে ভুগ্‌তে ভুগতে হয়ত একদিন লোকের শুভবুদ্ধি উদয় হবে। তখন রোগের ভয়াবহ দিকটা সম্বন্ধে সচেতন হবেন বেশী। ফলে তখনই নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতিতে সাহায্য করবেন তাঁরা। *

শঙ্করাচার্য্য ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন

সৃষ্টি সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত বিস্তারিত ভাবে বেদান্তভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার গীতাভাষ্যে ও উপনিষদের ভাষ্যে—এই মত অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। গায়ত্রী ভাষ্যে শঙ্করের মত সংক্ষেপে এইরূপ—

"যন্মে স্বরূপং তৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতং···চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইতি।" আমার যে স্বরূপ, তাহা সকলের অধিষ্ঠান, তাহা চৈতন্যস্বরূপ, তাহা ব্রহ্ম।

যাঁহারা শঙ্করের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত নন, তাঁহাদের জন্য বলা যাইতে পারে যে, আমরা দেখিতে পাই, চারিদিকের বস্তুগুলির সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে; আমরা আরও দেখিতে পাই বস্তু এক নয়, নানা। এই যে চোখের দেখা, ইহা ব্যবহারিক সত্য হইলেও, শঙ্করের মতে মূলতঃ ভুল। সমস্ত পরিবর্ত্তন, সমস্ত নানাত্ব একটি মূল অবলম্বন করিয়া হইতেছে। সেই যে মূল অবলম্বন, শঙ্করের ভাষায় তাহার নাম অধিকরণ বা অধিষ্ঠান। চোখে দেখা, কানে শোনা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা সমস্তই ভুল।

সকল পদার্থের ভিতরকার যে একমাত্র মূল অবলম্বন বা অধিষ্ঠান, তাহা আবার আমারও প্রকৃত স্বরূপ। তাহা শুধুই চৈতন্য (বস্তু নয়), এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম বা বৃহৎ।

শঙ্কর বলিতেছেন, ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান বা প্রকৃত সত্তা। পৃথক পৃথক বস্তু ব্যবহারিক ভাবে আছে, মূলতঃ তারা নাই। মূলে আছে এক ব্রহ্ম। এখন দেখা যাক, পাশ্চাত্য দেশের বর্ত্তমান বিজ্ঞান পদার্থের মূল সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

পদার্থসমূহ ব্যবহারিক ভাবে একরূপ, এবং মূলতঃ অন্যরূপ হইতে পারে। জল মূলতঃ হাইড্রজেন-অক্সিজেন গ্যাস্। যে পরিমাণ হাইড্রজেন অক্সিজেন লইলে জল হয়, জলে পরিণত না করিয়া সেই পরিমাণ হাইড্রজেন অক্সিজেনের দ্বারা আমাদের স্নানপান হয় না। স্নান পানে ব্যবহারের জন্য জল সত্য, মূলতঃ জল সত্য নয়; হাইড্রজেন অক্সিজেন বরঞ্চ সত্য। লাল নীল্ রং মূলতঃ একই কম্পমান পদার্থের ছোট বড় ঢেউ। কিন্তু কি জাতীয় পতাকা প্রস্তুতকরণে, কি সুন্দরীর সাড়ী নির্ম্মাণে নানারঙেরই প্রয়োজন, কোন পদার্থ বা তরঙ্গ সেখানে সত্য নয়।

এখন দেখা যাউক, মূলতঃ পদার্থগুলি এক, না—বহু? এক হইলে, সেই এক কি? আমরা যে বস্তু যেমন দেখি তেমনটি প্রকৃতিতে নাই। একটি বস্তু যখন দেখি, তখন সেই বস্তু হইতে আলো-রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। আসিতে আসিতে রশ্মিগুলির আকার বদলাইয়া যায়, তারপর চোখে আসিয়া স্নায়ুপুঞ্জকে চালিত করে। এখন বস্তু হইতে আগত আলোর স্বকীয় ও পরকীয় কাজ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্কের কাজ আরম্ভ হয়। মস্তিষ্ক কল্পনা করে—যেখান হইতে আলো আসিয়াছে সেখানে বস্তুটি আছে। বস্তু-তত্ত্ব-বিদ্‌গণের আধুনিক মত এই যে, যা দেখা যায়, তাহা প্রকৃত বস্তুর সূচক, বা ছায়া, বা symbol মাত্র। সেইরূপ কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাও প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান নহে। তাহা প্রকৃত বস্তুর আভাস দিতে পারে বা সূচনা করিতে পারে মাত্র।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোর একটি বর্ণনা এইরূপ—মনে কর, একটা পর্ব্বতের গুহায় কতকগুলি লোক এইরূপ ভাবে বন্দী রহিয়াছে যে, তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সম্মুখে আবদ্ধ। তাদের পশ্চাতে প্রজ্জ্বলিত আগুন। আগুনের সম্মুখে, কিন্তু বন্দীদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে কতকগুলি বস্তু। বন্দীরা বস্তু দেখিতে পায় না, দেখিতে পায় বন্দীদের সম্মুখে গুহার দেওয়ালে পতিত বস্তুর ছায়া। ইংরাজ বস্তু-তত্ত্ব-বিদ্ স্যার জেম্‌স্ জীনের মতে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাও প্লেটো-বর্ণিত

গুহাস্থিত বন্দীর জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানের একটা আভাব বা ছায়া মাত্র।

বর্ত্তমান বস্তু-বিজ্ঞান বস্তুর একটিমাত্র অংশের সংবাদ রাখে, যে অংশ মাপিতে বা গণনা করিতে পারা যায়, শুধু সেই অংশের সংবাদ। জলের আর্দ্রতা ধরা যায় না, মাপা যায় না। ইহা বিজ্ঞানের বিষয় নয়। বরঞ্চ জলকে পরিমাণের যোগ্য হাইড্রোজেন অক্সিজেনে পরিণত করা বিজ্ঞানের কাজ। ইংরাজ বস্তু-তত্ত্ববিদ্ এডিংটন্ এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—একটা হাতী পাহাড়ের একটা ঢালু স্থান দিয়া গড়াইয়া পড়িলে, বৈজ্ঞানিক হাতীর আশঙ্কা আকাঙ্খার সংবাদ লইবেন না, পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইবেন না। তিনি শুধু জানিয়া লইবেন—হাতীর ওজন, পতনের গতিবেগ, এবং ঢালু স্থানটি সমান্তরাল সরল রেখার সঙ্গে কত ডিগ্রি কোণ তৈয়ারি করে, তাহার পরিমাণ। এডিংটনের মতে এইরূপ একদেশদর্শী বিজ্ঞান বস্তুর সম্যক পরিচয় দিতে পারে না।

উনিশ শতকের বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে, বস্তুগুলি কতকগুলি অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি। আধুনিক কালে পরমাণু বিভাগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে স্থানে বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কল্পনা করা গিয়াছিল, সেখানে রহিয়াছে ইলেক্‌ট্রন্, পজিট্রন্, নিউট্রণ প্রভৃতি নামধারী সদা-ঘূর্ণ্যমাণ বৈদ্যুতিকশক্তির সংহতি। বিশ্লেষণ প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে, ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎশক্তির সবটুকু সর্ব্বদাই নিজ পরিধিতে অথবা বস্তুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কখন কখন বাহিরে যায়, কখন কখন বস্তুটির মধ্যে, এমনকি নিজ পরিধিতে আসে। মনে হয়, ইহাদের যাওয়া আসা নিজেদের ইচ্ছামত। বস্তুমধ্যে সর্ব্বদা যাহা থাকে, তাহা বস্তু নয়, শক্তি নয়। তাহা এমন একটা কিছু যাহা গণিতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের জানা অজানা অনেক বস্তুকে চিত্রে প্রকাশ করা যায়। চিত্রের কয়েকটি মাত্র রেখার সাহায্যে সমগ্র চিত্রের একটা মাপ-জোখ চলে। যাঁহারা একটু বেশী গণিত জানেন (যেমন ম্যাটিকুলেশন্ শ্রেণীর ছাত্রেরা), তাঁহারা জানেন, ব্যাসার্দ্ধের বর্গকে একটি বিশেষ সংখ্যা দ্বারা (সংখ্যাটি—২২/৭) গুণ করিলে বৃত্তের পরিমাণ জানা যায়। আবার দুইটি অজানা সংখ্যার সঙ্গে কয়েকটি জানা সংখ্যা মিশাইয়া সরল রেখার গতি জানা যায়, যেমন $3x+2y=13$—একটি সরল রেখা। উল্টা দিক হইতে বলা যায় যে, গণিতের (বিশেষতঃ সমীকরণের) জ্ঞান হইতে চিত্রের জ্ঞান, চিত্রের জ্ঞান হইতে বস্তুর জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়।

উচ্চতর গণিতের সাহায্য লইয়া ইউরোপের পদার্থ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, যেখানে একটি বস্তু তাহাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র অংশে আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া একদিকে দেখা যায় কতকগুলি স্বচ্ছন্দ বিহারী শক্তি, অপরদিকে কতকগুলি গণিতের সমীকরণ অঙ্কে প্রকাশযোগ্য সংখ্যা। এই সকল সমীকরণের অজানা সংখ্যাটি জটিল। কিন্তু এই সংখ্যা না জানিলে, সৃষ্টিরহস্য এই পথে জানা যায় না। গণিতজ্ঞ প্ল্যাঙ্ক একটি সংখ্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে এই সকল সমীকরণের সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে।

পরমাণুর ভিতরকার জটিল অঙ্ক এবং তাহাদের অদ্ভুত সমাধান দেখিয়া স্যার্ জেম্‌স্ জীন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের ন্যায় গণিত আলোচনায় সক্ষম মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট, হয়তবা তিনি শুধুই ঐরূপ একটি মস্তিষ্ক। পরমাণুর পরম অস্তিত্ব প্রকৃতিতে নাই, আছে শুধু মনে। গণিত ও বস্তুতত্ত্ববিদ্ এডিংটন্, প্ল্যাঙ্ক, শ্রোণ্‌ডিংকার এবং আইনষ্টাইনের মতও প্রায় এইরূপ।

অপরদিকে, পরমাণুর ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে দ্রুত গবেষণা চলিতেছে। প্রতি ৩।৪ বৎসরে এক একটি নূতন মত স্থাপিত ও খণ্ডিত হইতেছে। আমরা স্থূল জগতে যে ভাবে বস্তু এবং বিদ্যুৎশক্তির ক্রিয়া দেখি, পরমাণুতে তাহা নাই। পরমাণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ভগবান আছেন, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও সপ্রমাণ করে নাই, কিন্তু এরূপ কল্পনা এখন আর অসম্ভব কল্পনা নয়।

বস্তুর বস্তুত্ব লইয়া দীর্ঘ দুই শতক ব্যাপিয়া যে ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল, পরমাণুর সূক্ষ্ম অংশে প্রবেশ করিলে তাহা সহজেই ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃত তত্ত্ব

জানিতে হইলে, শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে বস্তু দেখিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে সহজ জ্ঞানের সাহায্যে, অন্তর্জ্ঞানের (intuition) সাহায্যে, আর্টের চোখে, দর্শনের চোখে, ধর্ম্মের চোখে। দার্শনিক জোয়াডের মতে আগেকার লেখা কাঠ কলক মুছিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, বিজ্ঞানবলে বস্তুতে পাওয়া গিয়াছে প্রকৃত বস্তুর ছায়া, তাতে আর প্রয়োজন নাই। এখন নূতন লেখকদের সময় উপস্থিত।

বস্তুতত্ত্ববিদ্ দেখিয়াছেন, পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম অংশে যে বিদ্যুৎ শক্তি রহিয়াছে, তাহার আচরণ দেখিয়া মনে হয়, তাহারও যেন নিজেরই ইচ্ছা আছে, এবং ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিও আছে। প্রাণতত্ত্ববিদ্ জানিতে পারিয়াছেন, যেখানে প্রাণ, সেখানে এ রহস্য আরও সুস্পষ্ট। শিশু কাঁকড়ার একটা ঠ্যাং খসিয়া পড়িলে আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিবিবেচনা-হীন কাঁকড়া নিজে নিজেই সেইস্থলে আর একটি ঠ্যাং সৃষ্টি করিয়া ফেলে। ও দেশী স্যামন্ মাছ, এ-দেশী ইলিশ মাছ ডিম রক্ষার সুবিধার জন্য অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া সাগর ছাড়িয়া দূরে দূরে চলিয়া যায়। প্রাণতত্ত্ববিদ্ ড্রাইয়েচ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন কোন অবস্থাতে একটি ভ্রূণকে বিখণ্ডিত করিলে, খণ্ডিত প্রত্যেক অংশই একটি সম্পূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হইতে পারে।

একটি সজীব বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া যে যে অংশ পাওয়া যায়, সজীব বস্তুটি সে সব অংশের সমষ্টি মাত্র নয়। বস্তুটিতে তদতিরিক্ত আরও কিছু আছে। তাতে আছে ইচ্ছা, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি। বর্ত্তমান ক্রম-পরিণতি বা evolution এখন আর ডারুউইন্ বা লামার্কের ক্রম-পরিণতিবাদ নহে। অতি নিম্নপ্রাণী আসিয়া কিরূপের অতি উচ্চ হইতে পারে, ইঁহাদের থিওরী তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না। বর্ত্তমান পরিণতিবাদ অনুসারে একজাতির এক শ্রেণীর প্রাণী সমজাতীয় অন্যশ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হইতে পারে, এমন কি অন্যজাতীয় প্রাণীতেও পরিণত হইতে পারে। পরিণতির প্রত্যেক ধাপে প্রাণবান দেহ স্বীয় জাতীয় স্বকীয় শ্রেণীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রাণীতে পরিণত হওয়ার ইচ্ছা, জ্ঞান ও শক্তি রাখে। সে আবার যেমনই উন্নত হয়, তেমনই উন্নততর হওয়ার ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্ষমতা নূতন করিয়া লাভ করে। ইহারই নাম সক্রিয় ক্রম-পরিণতি।

স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে আধুনিক সক্রিয় ক্রম-পরিণতির কথা বৈজ্ঞানিকেরা তুলেন নাই। প্রাণবানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নব নব ইচ্ছা ও শক্তির আগম, ইহাও তাঁহারা জানিতেন না। কিন্তু তখনই তিনি নানাস্থলে বলিয়াছেন, পরিণতি-যোগ্য বস্তু পূর্ব্ব হইতে অন্তর্নিবিষ্ট না থাকিলে, উন্নতিশীল পরিণতি অসম্ভব। Involution ছাড়া Evolution হইতে পারে। ইহার ব্যাপক অর্থ এই যে—জীবের ভিতরে ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে, পথে পথে পদে পদে বাধাসত্ত্বেও সেই শক্তির স্ফুরণে ক্রম-পরিণতি। স্বামীজির মত আধুনিক মত হইতেও উন্নততর।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন, প্রাণহীনের অন্তরের অন্তরে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তি, আবার প্রাণবানের অন্তরগুহায় ইচ্ছাশক্তি ত আছেই, তা ছাড়া পরিণতির ধাপে ধাপে নব নব বৃহত্তর ইচ্ছা গৃহীত ও ক্রিয়া-রত হইতেছে। অথচ জীবে নির্জ্জীবে কোথাও বস্তু নাই, আমরা সাধারণতঃ যাকে শক্তি বলি, তাহাও নাই। তাহা হইলে, সদাপরিবর্ত্তনশীল এই যে জগৎ, তাহাতে আছে কি ? এ সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। এখন পাওয়া যাইতেছে নানা মুনির নানা মত। স্যার্ জেমস্ জীনের মতে গণিতের প্রণালীতে চিন্তা-রত মন, প্রফেসার এডিংটনের মতে বিশ্বব্যাপী মননক্রিয়া, প্রফেসার হোয়াইট্‌হেডের মতে একটি মাত্র চৈতন্য বা চৈতন্যময় পুরুষ, বের্গসনের মতে সদা বহমনা জীবন-স্রোত, প্রফেসার প্লাঙ্কের মতে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, আইন্‌ষ্টাইনের মতে— ইহা ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নহে। আবার এমনও বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহাদের মতে বস্তু তন্মাত্রই সারবস্তু, অথবা বস্তু ও প্রাণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রধান বিষয়।

এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম— পৃথিবীর সমস্তই ব্রহ্ম। শঙ্কর বলিতেছেন, মানুষের এবং জগতের সমস্ত বস্তুর স্বরূপ হইতেছে ব্রহ্ম। বৈজ্ঞানিকদের

রাখাল [ফটো—রামকিঙ্কর সিংহ

কারো কারো চিন্তা শঙ্করের চিন্তার নিকটবর্ত্তী, যদিও এক নয়।

ইউরোপের এক একজন বৈজ্ঞানিক বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যখন দেখিতে পায়, বস্তুর মূলে বাস্তবতা নাই, চৈতন্ত নাই, ঈশ্বরত্ব নাই, তখনই চঞ্চল ইউরোপের একদেশদর্শী দার্শনিক যুক্তির লহর তুলিয়া প্রচার করিতে থাকে জগতের অস্থায়িত্ব, নিরীশ্বরতা। তখন মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়ে, মানুষ হয় কুক্রিয়াশক্ত পরপীড়ক, আত্মহত্যাকারী। যুগে যুগে ইউরোপ নিজ নিজ জীবনের মূল্য হারাইয়া গড্ডালিকা-প্রবাহে মত্ত হইয়া মানুষের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। প্রথম বিশ্বসমরের উৎসাহ দিবার জন্ত ক্রিয়াশীল ছিল দার্শনিক নী-সের নাস্তিবাদ। কিছুই যখন নাই, তখন আর আত্মপর হত্যায় বাধা কোথায়? শঙ্কর-দর্শনে মানবজীবনের মূল দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত, নিজের ও পরের উন্নতি সাধনের অনন্ত উৎসাহ। বিশ্বশান্তির গোড়ার কথা ব্যক্তিগত জীবনের স্থিতি ও ক্রমপরিণতি। এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও বিবেকানন্দ কৃত ভারতীয় দর্শনের যে ব্যাখ্যা সংক্ষেপে দেওয়া হইল, শুধু সেই পথেই ব্যক্তিগত শান্তি ও বিশ্ব-শান্তি সম্ভবপর।

শীত-সমাগমে

শীত-সমাগমে প্রতি বৎসরই কলিকাতা নগরী আনন্দমুখর হইয়া ওঠে। এ সময়ে সার্কাস, নৃত্য, ম্যাজিক ও বিশেষ বিশেষ অভিনয় নাগরিক জীবনকে অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্যও তাহাদের দৈনন্দিন দুঃখ-তাপ হইতে ভুলাইয়া রাখে। এবারও তাহাতে ত্রুটি ঘটে নাই। বিশেষতঃ ইডেন উদ্যানে কমন্‌-ওয়েল্‌থ একাদশ ও ভারতীয় ক্রিকেটদলের সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতা জনসাধারণের চিত্তে এক অপূর্ব্ব দ্যোতনার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যাদুকর পি. সি. সরকার তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত যাদু-বিদ্যা প্রদর্শনের দ্বারা মানুষের মনে যে আনন্দের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সেই আনন্দকে আরও সুদূরপ্রসারি করিয়া তুলিতে তুলিতে কলিকাতার সুরম্য প্রেক্ষা-গৃহে পুনরাবির্ভাব ঘটিল বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করের। নিউ এম্পায়ার ও ছায়া মঞ্চে শঙ্কর-দম্পতির লীলা-উচ্ছল নৃত্য-ঝঙ্কার নাগরিক জীবনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। পূর্ব্বাপর বৎসরে তাঁহারা যে সব আঙ্গিকের নৃত্য দ্বারা জনসাধারণকে মোহিত করিয়া-ছিলেন, এবারে তাহার বহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল।

এতদ্ব্যতীত আর-একটি প্রধান আকর্ষণ হইল 'স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ান আইস রিভিউ'—যাহাকে বাংলায় বলা যায় তুষারনৃত্য। এই নৃত্য প্রদর্শনে মঞ্চকে প্রথমতঃ শোলাদ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, তৎপর তাহার উপর ত্রিপল ও নল খাটাইয়া তিন চারি ইঞ্চি পরিমাণ বরফের গালিচা রচনা করা হয়। বরফকে জমাট রাখিবার জন্য বিশেষ ধরণের কয়েকটি রেফ্রিজারেটরকে সক্রিয় রাখা আবশ্যক। কোপেন-হেগেন-আগত এই নৃত্য-সম্প্রদায় এই বিশেষ নৃত্য-প্রদর্শনের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের কৌতুহল সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙালী জীবনের সঙ্গে এতদিন এই নৃত্যের পরিচয় ছিল না। এবারের শীতসমাগমে সেই পরিচয় ঘটিয়া গেল। কিন্তু টিকিটের হার ও এ্যামিউজমেণ্ট্-ট্যাক্সের অত্যধিকতায় কত সংখ্যক বাঙালী এই তুষার নৃত্য দর্শনের সুযোগ পাইয়া শীতাতপ ভোগ করিবে, তাহাও চিন্তার বিষয়। তথাপি বলিতে হয়—শিল্প-বৈচিত্র্যের এই অধ্যায়টি বাঙালী-জীবনে কম বড় উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়।

উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর

জিজ্ঞাসা ঃ তরুণ রায়। 'বলাকা' প্রকাশিত, ৩১।এ, চক্রবেড়িয়া রোড্ সাউথ, কলিকাতা। দাম—২৷৷০ টাকা মাত্র।

'জিজ্ঞাসা' পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে বাংলাকে যে দুঃখ বরণ করিতে হয়, তাহার প্রধান স্বাক্ষর বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা। লেখক পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বাঙালী জীবনের যে বাস্তব ঘটনালীর সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাকেই সাহিত্যরসে রূপ দিয়া বাঙালী সমাজের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ছিন্নমূল জীবনের পরিণতি কি, জীবন ধারণের অবলম্বন কোথায়, নিরাপদ আশ্রয়ের ভিৎ কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ?—এই জিজ্ঞাসাই অনুসন্ধিৎসু লেখকের মরমী চিত্তে বিশেষ ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই জিজ্ঞাসা আজ দরদী, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার একমাত্র সার্থক উত্তর রহিয়াছে রাষ্ট্রের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু রাষ্ট্র অবলা নারীর মতোই ম্রিয়মানা; যে হতভাগ্য জীবনগুলির অসহায়তা ও চরম দুর্ভোগ কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আশু সমাধানে রাষ্ট্রশক্তি সক্রিয় হইয়া না দাঁড়াইলে আর একটি বড় জিজ্ঞাসা দেখা দিবে, তাহা হইতেছে—'বাংলাদেশ কি লুপ্ত হইবে?' 'জিজ্ঞাসা'র পাঠককেই এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীন।

গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থ উদ্বাস্তু নরনারীর জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া লেখক মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

যাযাবর ঃ—কাব্যগ্রন্থ। শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়ণিকা ঃ ১৪০।এ, রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য—১৷৵০ আনা মাত্র।

সুধীর বাবু আবেগধর্ম্মী মরমী কবি। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলার চাপে মনের স্বাভাবিকতা যখন বিলুপ্তির পথে অগ্রসর, সুধীর বাবুর কবিতা তখন মনকে শান্তির রসে অভিসিক্ত করে। অবতরণিকায় কবি বলিয়াছেন ঃ 'যাযাবর কাব্যপুস্তিকায় মানুষের রমাস্তিক বৈরাগীবৃত্তির অনুভূতিকেই রূপায়িত করবার আয়োজন হয়েছে।' অত্যাধুনিক কবিতার কণ্টকাঘাতে এই রূপায়ণ স্নেহপ্রলেপের সান্ত্বনা আনে। 'যাযাবর' সুধীর বাবুর কবিজীবনের সার্থক প্রকাশ।

পূর্ণাহুতি ঃ নাটক। শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক সজ্ঞানতার যুগেও বাঙালী যে তাহার অতীত ঐতিহ্যকে নিঃশেষে ভুলিয়া যায় নাই, 'পূর্ণাহুতি' তাহার একটি সার্থক নিদর্শন। ধর্ম্মমূলক 'মিথোলজিক্যাল ড্রামা' বলিতে যাহা বুঝায়, 'পূর্ণাহুতি' সেইরূপ নাটক। ইহার মূল চরিত্রাংশে দাঁড়াইয়া জন্মেজয়ের কল্পনা-চিত্রিত মহাভারতের প্রাণ-চেতনার রূপ সঞ্চার করিতেছেন ইন্দ্র, বাসুকী, আস্তিক, জরতকারী, তক্ষক ও রেণুকা। ছন্দবদ্ধ যে রীতিতে নাট্যকার নাটক রচনা করিয়াছেন, এই রীতি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাংলা নাট্যজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই রীতির নব প্রবর্ত্তনে নাট্যকাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যকেই মনে পড়িয়া গেল। কিশোরী বাবু সুদক্ষ পাণ্ডিত্য ও বলিষ্ঠ কবিচিত্ত লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার রচনা সুষ্ঠু ও সাবলীল, স্থানে স্থানে তাহা বিশেষ আবেগময় রূপ পাইয়াছে। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা এই নাটক মঞ্চস্থ হইলে জনসাধারণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিবে।

সম্পাদকীয়

উনিশ-শো একান্ন

এইবারকার নববর্ষটির সূচনা নিছক নূতন বছরের গৌরব নিয়া নয়। পঞ্চাশ সালের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত শুধু একটা মাত্র বছরই গরাইয়া শেষ হইয়া গেল না, বিংশ শতাব্দীর আধখানা অংশও সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

নিজের-নিজের আমলকে মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠতম আমল বলিয়া মোক্ষম রূপে ধরিয়া নেওয়া মানবমনের এক অতি বিচিত্র অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের প্রশস্তিতে বিংশ শতকীর মানুষেরা আপন আমলকে বলিয়াছে, বুদ্ধি ও যুক্তির মার্গে শীর্ষস্থানীয় কাল। এইচ, জি, ওয়েলস্ তো বলিতেন যে, প্রাক-বিশংশতকীয় তিন-তিনটা শতাব্দী ধরিয়া মানববিশ্ব জীবনবৃক্ষে যতনা পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছে, তার চেয়ে অনেক অধিক সমাজ-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশটা বছরে। ওয়েলস্ মহাশয়ের এই কথাটি বোধ হয় নিছকই আমলগত আত্মম্ভরিতা নয়। সত্যই, বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম আধখানি পর্ব্ব কী না দিয়াছে মানুষকে? হাতে খ-বাহন তুলিয়া দিয়া এ পর্ব্বমান বিশ্বকেদিয়াছে আকাশপতি ইন্দ্রের মর্য্যাদা, বেতার ও টেলিভিশনের উপহারে দিয়াছে ত্রিভুবনজ্ঞ ও ত্রিভুবনদর্শীর কৃতিত্ব। বিংশ শতাব্দীর যে আটম বোমা তাহা তো পৌরাণিক ব্রহ্মাস্ত্র পাশুপত অস্ত্র প্রভৃতি মহায়ুধগুলিকেও মশক দংশনের চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া ছাড়িয়াছে। গত তিন শতাব্দীর হিসাব তো কোন্ ছার। তারপর বিংশ শতাব্দীর এই একই পর্ব্বেতে মাত্র পঁচিশ বছর ব্যবধানের মধ্যেই এই যে দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধ, তাহার তুলনা কি মহাকাব্যের সীমাহীন কল্পনার যুগের মানুষেরা কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? ইহা ছাড়াও আরও কত অভূতপূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব দ্রব্য বিংশ শতাব্দীর মানুষকে দিয়াছে ভিটামিন, ডি, ডি, টি, পেনিসিলিন, দিয়াছে স্কাইস্ক্রেপার, শুকনা দুধ, চিউইং গাম আর টেষ্টটিউব বেবি। মনঃসমীক্ষণ আর জন্ম শাসনের অর্ঘ্যও তো এই শতাব্দীর যুক্তি ও বুদ্ধির তপস্যা হইতেই আসিয়াছে! অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে বিশ শতকের এই অর্দ্ধাঙ্গ মানবেতিহাসকে সেই স্বর্গীয় বস্তুটা দিয়াছে যাহার আরেক নাম শ্বেত গণতন্ত্র। উনিশ শ' একান্ন সালের উদ্বোধনের মধ্যে বুঝি এই সুমহান যুগটারই অবসান হইয়া গেল!

প্রকৃতির কত অমোঘতাকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিয়াছিল বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্দ্ধ; বুদ্ধি ও যুক্তির এমন সর্ব্বংজয় কেতন উড়াইয়া দিয়াছিল। আমরা এই প্রকৃতি-জিৎ আবহাওয়ারই মানুষ। ইহা আমাদেরই আমল। অথচ ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা আমাদের যে, আমরা আমাদের এই আমলের সুবর্ণসাফল্য লইয়া যে পরবর্ত্তী শতাব্দী-অর্দ্ধের মানুষদের কাছে একটু বড়াই গাহিয়া যাইব, সে উপায়টুকু আমাদের নাই। লজ্জার কথা কি বলিব, আমাদের এই যে নিরুপায় দশা, ইহার জন্য দায়ী যাঁহারা, তাঁহারাও আবার আমাদেরই মতো এই শতাব্দীরই মানুষ। তাঁহারা হইলেন সব হৃদয়ের কারবারী। বিংশ শতাব্দীর কবি শিল্পী আর দার্শনিকের দল। ভাবিতে অবাক লাগে, ইঁহারা যে প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই শতাব্দী-অর্দ্ধেরই জীবনমণ্ডল হইতে, যে অন্নজল গ্রহণ করিয়াছেন সেও এই অর্দ্ধেরই দাক্ষিণ্যের দান। তবু এই শতাব্দী-খণ্ডের কথা বলিতে গিয়া তাহাদের শিব-সুন্দর আনন ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠে জাগিয়াছে ক্রুদ্ধ বেদনার সুর। এই পর্ব্বের কথা বলিতে গিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে, মঙ্গলের অবমাননার যুগ এটা, দর্পিত বৈশ্যবাদের হর্ষিত ধনবিকারের যুগ। মানুষের ভিতরকার দানবটা যে কত নৃশংস হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, অগণ্য শুভ্র মানুষের রক্তের স্বাক্ষর নিয়া এই যুগ সেই নৃশংসতারই চূড়ান্ত সাক্ষ্যরূপে

মানবেতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় আতঙ্কের নিদর্শন হইয়া বিরাজ করিবে।

বুঝিবা হৃদয় কারবারীদের কথাটাই ঠিক। নহিলে যুক্তি ও বুদ্ধির কারবারীদের কাছে নাজেহালের একশেষ হইত না হৃদয়কারবারীরা। অবশ্য অভিযোগের প্রথম ধাকাতে বুদ্ধি ও যুক্তিবাদীরা চটিয়াছিলেন খুব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জমাখরচের হিসাব-নিকাশ করিয়া তাঁহারাও পর্য্যন্ত এই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, শুভ-প্রয়াসী মানবাত্মাকে তাঁহারাও কোনো সত্যকারের আশ্রয় দিতে পারেন নাই। সেই আশ্রয় যদি দিতে পারে কেউ, তাহারা হইল আগামী কালের যুক্তি ও বুদ্ধির কারবারীরা, যাহারা হৃদয়কারবারীদের সমর্থন না নিয়া মানুষকে কিছু দিতে সাহসী হইবে না। যাহারা বিজ্ঞান বলিতে বুঝিবে না বৈশ্য সৌভাগ্যের রথচক্র। শূদ্র-বিশ্বের অন্যতম হইয়া যাহারা শুধু সেই আপন বিশ্বেরই কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিবে, বিংশশতাব্দীর সেই আগামী অর্দ্ধ ভুবনজোড়া শূদ্র কল্যাণের যুগ।

উনিশ শ' একান্নর বায়ু প্রবাহে কি আমরা গত-অর্দ্ধের পথপ্রান্তরা সেই নূতনেরই পদধ্বনি শুনিলাম ?

শান্তি ও কমনওয়েলথ

প্রায় অহি ও নকুলের মত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই বুঝি উপরোক্ত শব্দ দুটি বারবার এত ঘনিষ্ঠ হইয়া এক সাথে উচ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি লণ্ডনেতে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে যে সলাপরামর্শ চলিতেছে, সেই বৈঠকে বর্ত্তমান বিশ্বের বহু আকাঙ্খিত শান্তির একটা সদ্‌গতি হইয়া যাইবেই।

আমরা বৃথা আশা পোষণ করিতেছি না। কমনওয়েলথের সকল কীর্ত্তি ও শান্তির পবিত্র আদর্শকে সকল দিক হইতে বিচার করিয়া তবেই এই স্থির আশ্বাসের সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে পারিয়াছি।

বিভিন্ন গোঁজামিলের এক অপূর্ব্ব চোলাই-যন্ত্র এই কমনওয়েলথ। এই যন্ত্রে 'কমন' ব্যাপারটি যেমন পরিপূর্ণরূপে শূণ্যপরিমাণযুক্ত হইয়া স্থান পাইয়াছে, তেমনই ইহার সমস্ত 'ওয়েলথ' কেবলই জমা হইয়া গিয়াছে শুধু একটি সদস্যেরই অপূর্ণ জঠরে। ইহার উদার প্রাঙ্গণে কোনো কিছুরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে যেমন ঠাঁই পাইয়াছে প্রজাতন্ত্র দেশ, তেমনই ইহার সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকৃত রহিয়াছে এক প্রজাপীড়ক সাম্রাজ্যবাদে। ইহার মধ্যে গণতন্ত্রেরও যত আদর, ফ্যাসিবাদেরও তত। সাদা-কালোও ইহার মধ্যে পাশাপাশিই বসিয়া আছে। শুধু যে গায়ের রঙে সাদা তা নয়, প্রত্যহ, 'হোয়াইট মেনস্ বার্ডেন' আর শ্বেত মাহাত্ম্যের জিগীর না তুলিয়া যাহারা জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না সেই সব সাদার দল পর্য্যন্ত। তারপর যাহারা মনে প্রাণে যুদ্ধের মুনাফা-কল্যাণে বিশ্বাসী, তাঁহারাও যেমন এই চোলাই যন্ত্রেরই সহায়তায় আপন আদর্শকে চোঁয়াইয়া নামাইতেছেন, তেমনই যাহারা অহিংসায় বিশ্বাসী, তাহারাও। এমনকি, এই সুখী পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া ইহার কোনো সদস্য যদি অপর সদস্যের সঙ্গে কথায় কথায় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইয়া রাখেন, তাহা হইলেও অত্যন্ত সুচারুরূপে সেই ঝগড়া বছরের পর বছর ধরিয়া জিয়াইয়া রাখা চলে। শান্তিরক্ষার অজুহাতে এই অত্যাবশ্যক বিবাদটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য কোনো অপচেষ্টারই প্রয়োজন হয় না।

শান্তির বাস্তব প্রতীক কমনওয়েলথ, শান্তির পারাবতটিকে সে সযত্নে সিন্দুকেই পুরিয়া রাখিয়া দিয়াছে। মালয়ের দুর্ব্বিনীত স্বদেশকামীরা, কাশ্মীর ও পাখতুনিস্থানের দুরাচারী স্বাতন্ত্র্যবাদীর দল আর দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধনকাতর কালা বর্ব্বরের জাত—ইহাদের সাধ্য কি যে শান্তির এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে ইহারা নাড়াচাড়া দিবে। সমতা আর স্বাধিকারের নামে কলঙ্কিত করিবে ইহার সুবর্ণসুযোগের প্রতিমূর্ত্তি ?

শান্তিবীর ট্রুম্যান, একিসন আর ম্যাক্ আর্থারের অক্লান্ত চেষ্টায় শান্তির শুভ সংকারটি সুসম্পন্ন হইবার ব্রতে যেটুকু বাকি আছে এখনও, এইবারকার কমনওয়েলথ কনফারেন্সের বেদীমূলে যে সেটুকুও পরিপূর্ণ হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

আইন-সভা হইতে আদালত

যাত্রাটি যে শুভ নয় একেবারেই, মাদ্রাজের পর সে কথা আরেকবার প্রমাণ করিল কলিকাতা হাইকোর্ট।

ইতিপূর্ব্বে এক হেবিয়াস কর্পাস মামলার বিচারে মাদ্রাজের হাইকোর্ট নূতন ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটি বিধানের নজির উত্থাপিত করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের ভারতীয় পার্লামেণ্টকৃত 'প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশন' আইনটিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উক্ত রায়ের ফলে সেই রাজ্যের কমিউনিষ্টপার্টি অবৈধ-করণ আদেশটিও বাতিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই সম্ভবতঃ পশ্চিম বঙ্গের আটক রাজবন্দীরাও স্থানীয় হাইকোর্টে এক হেবিয়াস কর্পাস-এর বিচার প্রার্থনা করে। এবং সেই বিচারের ফলে কলিকাতা হাইকোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের দৃষ্টান্তের অনুসরণেই সম্ভবতঃ এই রাজ্যস্থ কমিউনিষ্ট পার্টি অবৈধ-করণকে এবং রাতারাতি পাস্ করাইয়া লওয়া প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শুধু এটুকু করিলেও তবু কথা ছিল। এক কাটি উপরে উঠিয়া কলিকাতার বিচারপতিরা আবার এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এক মন্তব্যও জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিচারপতি পদে সমাসীন আছি বলিয়াই আমরা ভারতীয় নাগরিকদের কেহ যে কোনো অবৈধ অপকাণ্ডের দ্বারা নিপীড়িত হইবে, তাহা হইতে দিতে পারিব না। তা এই অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কোনো ব্যক্তিবিশেষই হোক, রাষ্ট্রের শাসন বিভাগই হোক, চাই কি আইন সভা স্বয়ংই হোক্।"— কলিকাতার বিচারপতিদের এই মন্তব্যের সারার্থটি অত্যন্ত সহজ ও সরল। 'প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশন' আইন চালু করিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং আইন কর্ত্তাদেরই তাঁহারা আইনবিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

স্বখাতসলিল রূপকটির বাস্তব অর্থ বুঝি এমনই একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি ভবিষ্যতে এমন স্বখাতসলিলটি বুজাইয়া দেওয়ার কী বন্দোবস্ত করা যায়? কমিউনিষ্টরাই যখন একবার পথ দেখাইয়া দিল যে রাষ্ট্রবিরোধী অনেক অপকার্য্য করিয়াও শেষপর্য্যন্ত শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রেরই ছিদ্র পথে সকল নিরোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তখন দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি কি আর ভবিষ্যতে ছাড়িয়া কথা কহিবে? সামনেই ইলেকশন আসিতেছে, তখন খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের নাম করিয়া বাজার মাত পূর্ব্বক ভোট জয়ের সমস্ত পথ কণ্টকাকুল করিয়া তুলিবে না?

কথাটা সবদিক হইতে এখনও ভাবিয়া দেখিতে পারি নাই। এই কারণেই এই সম্ভাবিত আপদ হইতে কী উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে খুব নির্ভরযোগ্য কোনো পথের সন্ধানটি ঠিক মাথায় আসিয়া জমিতে পারিতেছে না। শুধু একটা কথা মনে পড়িতেছে। যে সব সজ্জনবৃন্দ আমাদের বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসগুলির আরামবাসে বসিয়া বসিয়া কূটনীতির কিস্তির চাল চালিতেছেন, তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিয়া এই বিচার-পতিদের আসনে অভিষিক্ত করিয়া দিলে কেমন হয়?

হিন্দু-মহাসভা

ইলেকশন আসিতেছে। ভবিষ্যতের স্ব স্ব বিজয়-প্রভাতের আশাপথ চাহিয়া সকলেই তোড়জোড়ে প্রবৃত্ত। অতএব হিন্দুস্থানের হিন্দুমহাসভাই বা ঘুমাইয়া থাকিবে কোন্ ভরসায়? সেও জাগিয়া উঠিয়াছে। পুনায় সর্ব্ব-ভারতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সে তাহার এই জাগরণ আর তোড়জোড়ের সংবাদও ঘোষণা করিয়াছে। হিন্দুমহাসভা আগামী নির্ব্বাচনে স্বদেশভঙ্গকারী কংগ্রেসকে একহাত লইয়া দেখাইয়া দিবে— অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র কাকে বলে!

কংগ্রেসকে কংগ্রেসেরই অস্ত্র দিয়া ঘায়েল করা যে কতদূর অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক, সেকথা আমরা গত মাসে খুলিয়া বলিয়াছিলাম। কিন্তু হিন্দুমহাসভার হিন্দু মাহাত্ম্যটি আরও জটিল ব্যাপার। ইহার পাণ্ডা-স্থানীয়েরা যেমন কমনওয়েলথে ভারতভুক্তির অবসান ঘটাইতেও উৎসুক, তেমনই উৎসুক ভারতবর্ষকে ডলার-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিতেও। হিন্দু সভার আদর্শ শুধু ভারত জুড়িয়া এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। আর কিছু নয়। ইহার জন্য যদি ভারতকে একেবারে যুদ্ধের কবলেও নিপতিত করিতে হয়, তাহাতেও হিন্দুসভার পাণ্ডাচক্র প্রস্তুত। এই হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেই,

হিন্দুমহাসভা বলিয়াছে যে, হিন্দুর সকল সমস্তারই সমাধান হইয়া যাইবে। কারণ এতদ্বারা একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের একমাত্র সেবকগোষ্ঠী হিন্দু পুঁজিপতিরাও অ-হিন্দু কমিউনিষ্টদের উৎপত্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, তেমনই অহিন্দু রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্রের বোঝা হইতেও স্বধর্মীরা অব্যাহতি পাইবে। এবং তার ফলে কাশ্মীরের মুসলমান শেখ আবদুল্লাকেও যথোচিত ভাবে শাস্তি দিতেও আর কোনো বাধা থাকিবে না। এমনকি নেপালের হিন্দু রাজাবংশকেও বহাল তবিয়তে রাজত্ব করিতে দেওয়া সম্ভব হইবে।

ইহা আমাদের মনগড়া কথা নয়। সম্প্রতি পুনায় অনুষ্ঠিত ২৯ তম সাধারণ অধিবেশনে ইহাই হইল সভাপতি স্বয়ং ডাঃ খারের মুখ-নিঃসৃত বাণী। ভারতবর্ষের সবই সম্ভব। নেপাল বাবার সর্ব্বরোগহর ইন্দ্রজালের মাহাত্ম্যেই যখন হাজারখানেক লোক মহামারীর প্রসাদে পঞ্চত্ব লাভ করিতে পারিল, তখন ডাক্তার খারেই বা কেন এমন একটা সর্বভারতীয় ইন্দ্রজালের চোটে আগামী ইলেকসন-সংগ্রামে বাজি মাত করিতে অপারগ হইবেন? জিন্না সাহেব পারিয়াছিলেন না। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি একেবারে অধুনাতন কালপরিস্থিতিতে যে-কালে শুধু ধর্ম্মের নামেতে পাকিস্থানেই চিরা ভিজানো সম্ভব হইতেছে না, তখন ভারতবর্ষেই কি······

কথাটা শেষ করিয়া লাভ নাই। ভবিষ্যতই না হয় ইহার উত্তর দিবে।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

ধর্ম্মতত্ত্ব বলি, দর্শন বলি, আর সংস্কৃতিই বলি, এমনকি রাজনীতিই বা বলি না কেন—বিশ্বাসের এই মহামহিম তত্ত্ব আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের একেবারে গোড়ার কথা। শুধু বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই যে সকল পরমার্থই লাভ করা যায়, এ শিক্ষা আমরা ভারতবাসীরা বোধোদয়ের সাথে সাথেই রপ্ত করিয়া লই। বিশ্বাসকে অটুট রাখিলে যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, এ আশ্বাসও আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতারা উঠিতে বসিতে দেন। সুতরাং গুটিকয়েক বিশ্বাস-আদর্শী লোক যদি উড়িষ্যার এক গণ্ডগ্রামে এক নেপাল বাবাকে খাড়া করাইয়া সর্ব্ববিশ্বের রোগতাপ দূরীকরণার্থে কোন এক সর্ব্বরোগহর ঔষধির ভেল্কি প্রচারে উদ্যোগী হইয়া উঠে, তাহা হইলেই বা তাহাতে দোষের কি আছে? গেলই বা কয়েক লক্ষ টাকার জলা-গুলি। হাজার খানেক মুমুর্ষু ভারতবাসীর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলেই বা এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল! বিশ্বাসের সাধনা অত সহজ নয়। এর জন্য কিছুটা আত্ম-ত্যাগ করিতে হয়ই।

শুনিলাম উড়িষ্যার রাজ্যপ্রধানেরা—নেপালবাবাকে মূলধন করিয়া যে দলটি একটি চমৎকার ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল—তাহাদের সকলকে ধরিয়া জালিয়াতির অভিযোগে উপযুক্ত দণ্ড প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন। তা করুন। দণ্ড যখন হাতে আছে তখন একজন না একজনকে তাহা প্রদান করিতে হইবেই। কিন্তু একটা বড় সংশয়ে পড়িয়া গিয়াছি আমরা। এইসব অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই ধুরন্ধর। তাই আশঙ্কা হইতেছে যে, বিচারের কালে এই সব ধুরন্ধরেরা যদি আত্মপক্ষসমর্থন কল্পে ফস্ করিয়া বলিয়াই বসে যে, এই বিশ্বাসের ব্যবসায়ে তাঁহারা আমাদের জাতীয় শাসকদের কাছেই দীক্ষিত হইয়াছেন। হাতে কলমে না হইলেও একলব্যের মতন। ভারতের রাষ্ট্রীয় দেহেরও তো কত রোগ, কত উপসর্গ। অশিক্ষায় সে দেহের মন বিকল, নিয়মিত উপবাসে সে দেহের স্নায়ুতন্ত্রীনিচয় ক্ষয়-জর্জ্জর। কিন্তু ভারতের জাতীয় শাসকরা তো এই সমুদয় রোগ উপসর্গের জন্য শুধু মাত্র 'রামরাজ্যের' সর্ব্বরোগহর দাওয়াইটা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহারা ঔষধ ছাড়িয়াছেন 'ভারতীয় আদর্শের 'প্রোভিস অব পেবিস'-এর, মায় 'বনমহোৎসবে'র পর্য্যন্ত। সে তুলনায় তাদের কৃতিত্ব আর কতটুকু?

এই তো আমেরিকা

পি-টি-আই—রয়টার খবর দিতেছেন:

"'এ' অক্ষরে এ্যাপেল জানো"—এই বিধির বর্ণপরিচয় পদ্ধতি শীঘ্রই ওয়াশিংটনের স্কুল সমূহ হইতে বিসর্জ্জিত

হইবে। পুরাতন পদ্ধতির স্থলে যে নূতন পদ্ধতি বর্ণ-পরিচয় বিধি প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে লেখা হইবে 'এ' অক্ষরে এ্যাটম হয়।" এই শান্তিহুক সূত্র।

সম্প্রতি এই নবতম বর্ণপরিচয়বিধির এক নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়াশিংটনের শিক্ষাবিভাগ রাষ্ট্রের কোমলমতি শিশুদিগকে যাহাতে একেবারে শৈশব হইতেই দেশ রক্ষার আদর্শে পোক্তভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যাইতে পারে, এই উদ্দেশে এই নূতন বর্ণপরিচয়কে সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিতে অবিলম্বে চালু করিবার নির্দেশ জারি করিয়াছেন। এ্যাটমতত্ত্বটি আসলে কি, কিভাবে সেই এ্যাটম দিয়া বোমা ফাটানো যায় এবং কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়, সেই ফাটা-বোমা হইতে—এই সব অতি-জ্ঞতব্য শিশু কৌতূহলেরই অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই নূতন বর্ণপরিচয় পদ্ধতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

এই নূতন পদ্ধতি হইতে এবার থেকে মার্কিন শিশুরা শিখিবে :

'এ' অক্ষরে এ্যাটম—সেই অবিভাজ্য পদার্থ যাহাকে বিভক্ত করা হইয়াছে।

'বি' অক্ষরে বোমা—একটি নূতন বিস্ফোরণ প্যাকেজ, যাহার নামকরণ হইয়াছে এ্যাটমের নামানুসারে

'সি' অক্ষরে—সিভিল ডিফেন্স—আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষা।

'জেড্' অক্ষরে 'জিরো'—যে, মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে।

ইহারই দিন কয়েক পরে উক্ত পি-টি-আই এর মারফৎ আরও এক খবর আমরা পাইয়াছি। এবারকার নববর্ষের উৎসবে নাকি এক নিউইয়র্কেই উৎসবের দাপটে মানুষ মারা গিয়াছে প্রায় শ' তিনেক। গতবছরের উৎসবে মৃত্যু সংখ্যা ছিল আরও বেশী।

আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই যে, শান্তিবাদী ট্রুম্যান সাহেব যীশুখৃষ্টের জন্মদিনেও মধ্যযুগীয় ক্রুসেড্ যুদ্ধের জন্য নিখিল খৃষ্টীয়বিশ্বের উদ্দেশে আবেগপূর্ণ আবেদন পাঠান। ডলারের মায়ারাজ্যে বুঝি সবই সম্ভব।

শোক-সংবাদ

গত কয়েক দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যু-সংবাদ আত্মিয়-বিয়োগ-বেদনার মতই আমাদের হৃদয়কে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। তিনটি জীবনই সংস্কৃতি জগতে কম বেশী খ্যাতিমান ছিল : কথাশিল্পী পরিমল মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী ও সিনক্লেয়ার লুইস্।

প্রথম জীবনে সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া পরিমল মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পরে অল্ বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন এবং ক্রমে উহার সম্পাদক হন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার তিন খানি গ্রন্থ বাজারে আত্মপ্রকাশ করে : 'দিল ডাক' —গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস, 'রেইনবো' —রুশলেখক ভাণ্ডা ভাসিলিয়েভ্স্কা লিখিত ষ্টালিন-পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ এবং 'পট-ভূমি' গল্পগ্রন্থ। এই সামান্য রচনা দ্বারাই বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার আসন স্বিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি শিল্পরসিক ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ক্লাসিক সঙ্গীতেও তাঁহার কম দক্ষতা ছিল না। দুই বৎসরের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং 'কলিকাতা সাহিত্যিকা'র তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পূর্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবতন 'জার্নালিজ্‌ম' ক্লাসে ছাত্ররূপে যোগদান করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বঙ্গশ্রীতে তাঁহার বহু গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই নয়, বন্ধুবৎসলতার জন্যও তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই।

নিরুপমা দেবীর লোকান্তর প্রায় পরিণত বয়সেই ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৯০৪।৫ সালে ভাগলপুরে একটি সাহিত্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরুপমা দেবীকে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে এই সঙ্ঘের সদস্যা হইতে দেখা যায়। 'ছায়া' নামে একটি হস্তলিখিত মাসিকপত্রে তিনি প্রথম রচনা সুরু করেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই সময় তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রায় ১৪।১৫ খানি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে। তন্মধ্যে 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'শ্যামলী,' 'দিদি' প্রভৃতি প্রধান। প্রবাসী, ভারতী, বিচিত্রা ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁহার অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়। সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি পদক দ্বারা সম্মানিত করে, তন্মধ্যে জগত্তারিণী পদক অন্যতম। অনুরূপা দেবীর তিনি 'গঙ্গাজল' ছিলেন। পরিণত বয়সে ধর্মালোচনার দিকে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। শেষ জীবনে আমৃত্যু তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন।

মার্কিন ঔপন্যাসিক সিন্‌ক্লেয়ার লুইস আমেরিকাবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নোব্‌ল পুরস্কার লাভ করেন। আমেরিকার বিভিন্ন সহরের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, কপট ও লাজুক সম্প্রদায় এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী সমাজ সম্পর্কে তিনি যে অন্তর্ভেদী ও তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা সৃষ্টি করেন, তাহাতে বিদ্বৎসমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দুই বৎসর তিনি আইওয়া ও সানফ্রান্সিস্কোর সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসাবে এবং ওয়াশিংটনে একটি সংবাদপত্রের অন্যতম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর নিউ ইয়র্কের একটি পুস্তক প্রকাশালয়ে সামান্য বেতনে চাকুরী সংগ্রহ করেন। ইহার পর প্রায় বৎসর পাঁচেক তিনি প্রচুর ছোট গল্প রচনা করিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন। উহাতে তাঁহার স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগি অর্থাগম হইতে থাকে। ১৯১৪ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'আওয়ার মিঃ রেণ' প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত 'দি ট্রেল অব দি হক,' 'দি জব,' 'দি ইনোসেণ্টস্‌' ও 'ফ্রি এয়ার' ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ইহার কোনটিই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় নাই। কিন্তু ১৯২০ সালে 'মেন ষ্ট্রীট' নামক উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশ ছড়াইয়া পরে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'ব্যাবিট' সেই যশকে আরও সুদূরপ্রসারি করিয়া তোলে। ১৯২৪ সালে 'অ্যারোস্মিথ' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহাকে 'পলিৎসার পুরস্কার' দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে অস্বীকার করেন। অতঃপর তাঁহার 'ম্যান্‌ট্র্যাপ', 'এল্‌মার গ্যান্ট্রি', 'দি ম্যান্‌ বু গ্নু কু লজ' ও 'উড্‌সওয়ার্থ' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় ও লুইসের খ্যাতি প্রসারিত করে। ১৯৩০ সালে তাঁহাকে সাহিত্যে নোব্‌ল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা 'অ্যানেভিকাস' ও 'ওয়ার্ক অব আর্ট'। ১৮৮৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ষ্টেটে সাউক সেণ্টার নামক গ্রামে লুইস জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

এই তিনটি অমূল্য জীবনের লোকান্তরে বাংলা ও আমেরিকান সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নয়। আমরা তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

বনানী [শিল্পী—বাণীকুমার মজুমদার

অষ্টাদশ বর্ষ — ফাল্গুন—১৩৫৭ — ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

৫।

ঋগ্বেদে ও এড্ডায় সৃষ্টির কথা

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ৮ম অষ্টকের ৯০তম সূক্ত পুরুষ সূক্ত নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। পুরুষসূক্তের পুরুষটি আর্য্যদের কল্পিত বিরাট পুরুষ। বিরাট পুরুষের সহস্র শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ বলিয়া বর্ণণা আছে, ফলে তিনি অবস্তিক অহুর মজ্‌দা ও এড্ডিক (Eddic) Æsir-এর সহিত তুলনীয়। অবস্তায় দেখা[1] যায় "হওম" (=সোম) জরথুস্ত্রের কাছে এসে অহুর মজ্‌দা কর্ত্তৃক সৃষ্টির বর্ণণা করছেন। আর এড্ডায় দেখা যায়[2] Sibyl বর্ণণা করছেন Æsir ও অন্যান্য সহায়কদেবতা কর্ত্তৃক সৃষ্টির কথা। সহায়কদেবতা বলতে আছেন Woden বা Odin, Lodur, Thor ও Honir বা Hoenir। Edda-র Woden[3] বৈদিক বুধের সমস্থানীয়। Lodur রুদ্রের সমান। Thor ছিলেন[4] Thunor<Thonor<Stanar (√স্তন্‌ ধাতুনিষ্পন্ন); অর্থ হয় শব্দকারী। ইনি বজ্রের দেবতা; এঁর তুল্য বৈদিক পর্জ্জন্য। Honir বা Hoenir বৈশ্বানরের সমান।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে অবস্তিক অহুর মজদা সংস্কৃত অসুর মেধার সমান। অসুর মেধা শব্দের অর্থ মহা-ধী-সম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক। Semitic দেবতা Bel, Belus বা Baal-এর অন্যতর নাম ছিল Assur এর

১ Selections From Avesta-Part I—I. J. S. Taraporewalla, C. U.. publication (first few pages)

২ Edda And Saga—by Bertha S. Phillipots—Home-univ—Library-pub. p. 129-137.

৩ Wooden কে ভুল করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত identify করিয়াছি—দ্রষ্টব্য বৈশাখ—১৩৫৬-র প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধ "ধ্বনি ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম।"

৪ For a detailed list of Eddic gods and goddesses—see ibid.

থেকে বুঝা যায় যে জাতি অর্থ ছাড়া ঐ শব্দের আরেকটি অর্থ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। সেটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বা দেবতা৫। পরন্তু এই শেষের অর্থই ছিল মৌলিক ও একক। এর থেকে অসুর দেশ ও অসুর জাতির নামকরণ। এরকম ব্যাপার প্রাচীন জাতিগুলির উচ্চাহংভ-সম্পন্নতার পরিচয়। ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর কয়েকটি শাখা নিজেদের "অর্য্য" বা "আর্য্য" কিনা পূজনীয় শব্দের দ্বারা চিহ্নিত ক'রে আত্মপ্রসাদ ভোগ করতেন। ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠী সেমিটিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে এই অসুরদেবতার মূল ধারণা ও শব্দটি ধার করেন৭ ছিলেন। তাই তাঁদের শব্দভাণ্ডারে ঈশ্বর বুঝাতে "দ্যৌঃ", দ্যাবঃ, "দ্যৌঃপিতৃ" প্রভৃতির পাশাপাশি "অসুর" বা "অসুরমেধা" শব্দ সংযোজিত হয়েছিল। তার প্রমাণ বলতে আমরা ঋগ্বেদে ও এড্ডায় অসুর শব্দ এবং জেন্দ'বস্তায় অহুর মজদা বা অসুর মেধার দেখা৮ পাই। আবার দ্যৌঃ, দ্যাবঃ-এর উল্লেখ ঋগ্বেদে ও গ্রীক পুরাণ-উপকথায় মধ্যে পাওয়া যায়।

যেহেতু জেন্দবস্তায় অহুর মজদা কর্ত্তৃক এবং এড্ডায় বুদ্ধ: Æsir কর্ত্তৃক সৃষ্টি হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায় সেই হেতু ঋগ্বেদোক্ত বিরাট পুরুষকে আমরা অসুরের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। বর্ণনায় দিক দিয়ে যা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি তাতে অসুরের সঙ্গে বিরাট পুরুষের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে।

এড্ডায় সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে৯ :—

"(3) In earliest days when ymir১০ lived
Was neither sand nor sea,
nor surges cool ;
No world in being, above, no heaven
The void yawned vast, was verdure
no where."

প্রায় এর অনুরূপ আমাদের :—

"নাসদো আসীন্ন সদা সীত্তদানীং
তমঃ আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং।"

ইহার পর কয়েক লাইনের একছত্রে নরউইজীয় বৈশিষ্ট্য মধ্য রাত্রির সূর্য্যের বর্ণনা আছে। তারপর সৃষ্টির বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে :—

(5) The sun knew not where she had her
sanctuary,
The stars knew not where they had
their Station,
The moon knew not what might was his."
(6) To their thrones of power thronged
the gods,
Counsel they held, the high and holy :
To night and her children names
they gave,
To dawn and mid day, winter's dusk
and summer's
Time they established to tell
the years withal.
(7) The Æsir১১ foregathered on Ida১২
meadows
Shrines and high fanes framed—
they of timber ;
Forges erected, rich things they wrought,
Tongs devised and tools they forged.
(8) They played draughts in the meadow :
merry their days ;
Gold and treasure untold was theirs,
Till the troll-born maidens, O'er
mighty three,
Came into Asgard১৩ from Jotunheim১৪.

---

৫ Rigveda—Astaka I—Edited by K. M. Banerjee. Introduction p. XI.

৬ Superiority complex.

৭ Rigveda—Astaka I. Edited by K. M. Banerjee Introduction X.

৮ Rigveda—Astaka I. Edited by K. M. Banerjee—Introduction X.

৯ Edda and Saga—S Bertha Phillipots page 13৮. ১০ ymir—তমঃ।

১১ Æsir=অসুর। ১২ Ida= অধঃ। ১৩Asgard= স্বর্গ। ১৪ Jotunheim=দিতে- দানাং ধামঃ।

(9) To their thrones of power thronged
the gods,
Counsel they held the high and holy."

ইহার পর অনেকখানি অর্থাৎ ৭টি ছত্র পাওয়া যায়নি। আবার :—

"(17) Till from out that host to the house
came three
Mighty, well-wishing, from the world
of gods;
They found on the shore, with fates
unuttered,
Ash and **Embla**[15], in them no strength.

(18) No breath had they, no warmth,
no motion
And bright hued faces, breath
gave **Honir**[16].

(19) An Ash-tree I know, **Yggdrasill's**[17]
tree;
On its lofty boughs fall limpid showers;
Thence came the dews in the dales
that fall;
The well of **Urd**[18] is for ever green.

এর পর Sipyl দেবাসুরের বা প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেবকুলের মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন মায়াবী **vanir**[19] মায়াবলে যুদ্ধে সফলকাম[20] হইলেন। তারপর আবার দুটি ছত্র :—

"(25) To their thrones of power thronged
the gods,
Counsel they held, the high and holy,
Who had mingled with evil all the air,
And had pledged **Freyja**[21] to the
giant folk.

(26) **Thor**[22] alone Smote there, wrathful
of spirit,
Seldom he dallies when of danger
he hears:
Plighted words were broken, pledges
and vows,
The sacred oaths uttered by either side.

Edda-র সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে পরবর্ত্তীকালীন সংযোজনের মাত্রা অল্পই; পাওয়া যায়নি এমন অংশই বেশী। আরেকটি বিশেষত্ব—এর মধ্যে সাবেক ছাঁচ ভাব অনেকখানিই আছে। পরিবর্ত্তন যা কিছু হয়েছে তা আপাত দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। অন্য দিকে ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই (পুরুষসূক্তে) পরিবর্ত্তন যথেষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে অন্যত্র অসুর[23] হিসাবে দেবতাদের বহুল উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এখানে অসুর হয়েছেন বিরাট পুরুষ। বিরাট পুরুষের সৃষ্টির মাধ্যম হল যজ্ঞ। ফলে সমগ্র সূক্তটি রূপকের আকার ধারণ করেছে। এ ছাড়া চতুর্ব্বেদ ও ও চতুর্ব্বর্ণএর উল্লেখ ত' আছেই। এই ভাবে দেখা যায়

---

১৫ Embla—অম্বর। ১৬ Honir—বৈশ্বানর। ১৭ yggdrasill—দক্ষশিরঃ বা ঊর্দ্ধশিরঃ। ১৮ urd—ঊর্দ্ধঃ। ১৯ vanir—বেণ বা বৈণ্য।

২০ Edda and Saga—page-133—S. Bertha Phillipots. ইরাণীয়-আর্য্য ও ভারতীয়-আর্য্যদের মধ্যে যে দেব—ভাওভা, অসুর—অহুর [মজ্দা]-রূপ বৈপরীত্য দেখিয়া মণীষীরা যে কুলগত দ্বন্দ্বের নির্দ্দেশ দেন, তার অনুরূপ ব্যাপার Edda-তেও দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ ঋগ্বেদের মধ্যেও অসুরের অর্থ যে লঘু হ'তে হ'তে কদর্থে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাও বেশ স্পষ্ট; দ্রষ্টব্য—Rigveda-Astaka I. Edited by K.M. Banerjee. Inrod. pp. IX—Foot note.

২১ Freyja—প্রেতঃ। ২২ Thor—বজ্রের দেবতা।

২৩ ঋগ্বেদ :—১।১৭৪—১; ১।৫৪—৩; (৮) ৯০—৬ (১০) ৫৫—৪; (৯৬) ১১; (৯৯) ১২; (১০৫) ১১ ১।২৪—১৪; (২) ১৭—১০; ২৮—৭; (৪) ৫৩—১; (১) ২।৭—৯। মরুৎগণকে অসুর বলা হয়েছে—(১) ৬৪—২। রুদ্রকে—(১) ১১০—৩। প্রজাপতিকে—(১০) ১০—২। অগ্নিকে ১২—১; ১৫—১; ২৭—১। সরস্বতীকে—(৭) ৯৬।১। বায়ুকে—(৫) ৪২—১। পূষাকে—(৫) ৫১—১১। সাবিত্রীকে—(৫) ৪৯—২। পর্জ্জন্যকে—(৫) ৬৩—৩—৭; ৮৩—৬ এবং (৭) ৩৬—২; (৭) ৬৫—২; (৮) ২৫—৪; (১) ১৩১—১; (৫) ৪১—৩; (৫) ১২—১; ২৭—১; (৮) ৪২—১; (১০) ১৭৭—১ এবং অন্যত্র।

যে আর্য্যদের সৃষ্টি সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা ঢেলে সাজা হয়েছে পুরুষসূক্তে। আসলে ইন্দো-য়ুরোপীয়দের মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তার অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়—Edda-য়, অবস্তায় ও উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কেন প্রভৃতিতে। গ্রীক পুরাণ-উপকথার মধ্যে যে সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায় তা ঋগ্বেদের মতই অনেকখানি পরিবর্ত্তিত। তার সঙ্গে Eddicও অবস্তিক সৃষ্টির বর্ণনার মিল খুব অল্পই।

এইবার পুরুষসূক্ত উদ্ধৃত ক'রে আমরা প্রবন্ধ শেষ করব :—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪
তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং[২৪] গ্রীষ্ম ইধ্মঃ[২৫] শরদ্ধবিঃ ॥৬

তং যজ্ঞং বর্হিষিপ্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্ তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরূ পাদাউচ্যেতে ॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মানি
প্রথমান্যাসন্ ।২৪
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যা
সন্তি দেবাঃ ॥১৬

২৪ বৈঃ-সং গ্রীষ্ম—Eddic Hrym
২৫ বৈঃ-সং শরদ্—Eddic Surt

ভাগ্যচক্র

মুন্সী প্রেমচন্দ

অনুবাদ—পারুল ঘোষ

রাত্রি দশটা। বোম্বাইএর সুসজ্জিত বিদ্যুতালোকিত প্রাসাদ-কক্ষে সরকারী কন্ট্রাক্টর মিলমালিক খুবচাঁদ উপবিষ্ট আছেন। এক পাশে জড়ো করা রয়েছে রাশি রাশি ফল, সন্দেশ, খেলনা ; তাঁর-খাজাঞ্চী একটি তালিকা থেকে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরিয়াদের নাম পড়ে যাচ্ছেন, আর তিনি পদমর্য্যাদা অনুযায়ী যথানামে উপহারের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে যাচ্ছেন। সরকারী মহা-জেলখানার স্বর্গলোকে যে দেবতারা বাস করেন, তাঁদের উদ্দেশে পূজা নিবেদনের পুণ্যতিথি, বড়দিন আসন্ন কি না!

খুবচাঁদ একবার বার বছরের জন্তে সহরের মেয়র ছিলেন, এখনও তিনি বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী অথবা প্রেসিডেন্ট। তার এই পদগরিমা কতখানি পর্য্যন্ত এই সরকারী পূজার ফল, তা কেউ-ই জানে না, তবে এটা সবাই জানে যে, এই পূজার ব্যাপারে প্রতি বৎসর তাঁর পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হয়। কতক লোক তাঁকে নিন্দা করে এজন্তে, কিন্তু তাতে কি যায় আসে তাঁর? বাঁহাত কি করে, ডানহাতকে তা জানতে দেন না যাঁরা, তিনি তাঁদের দলে নন।

যাঁরা তামাকে সোনা করতে জানেন, সেই সব নকল দেবতার পূজার চিন্তায় খুবচাঁদ যখন নিমগ্ন, সেই সময় গৃহদেবতার পুরোহিত এসে বললেন, আরতির সময় হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ খুবচাঁদ বললেন দাঁত খিঁচিয়ে, দেখছো না, আমি কি করছি? আমার যা কিছু দরকার, তোমার ঠাকুরতো দেবার ক্ষমতা রাখেন না; তাছাড়া পেট ভরা থাকলে তবেই ধর্ম্ম কর্ম্ম। আরো আধ ঘন্টাটেক দেরী করতে বলো তোমার ঠাকুরকে। এক্ষুণি পূজা এবং নৈবেদ্য না পেলে তাঁর মৃত্যু হবে, এমনতো মনে হয় না। মুখ ছোট করে পুরোহিত ফিরে গেলেন।

খুবচাঁদের জীবনের মূল মন্ত্র হলো টাকা কামানো—সমস্ত কার্য্যকলাপ তাঁর চালিত হয় ঐ লক্ষ্যে। লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, সদাব্রত করা, ক্লাবে যাওয়া এমন কি সকাল বিকেল উপাসনা করা পর্য্যন্ত তাঁর এই টাকা করার পথে ছোট বড় উপায় হিসাবে গণ্য। ঘন্টাখানেক পরে পুরোহিত আবার হাজির হলেন। তাঁকে দেখে খুবচাঁদ রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বললেন, দূর হও, আমার এখন পুজো ফুজোর সময় নেই। আমি এখন টাকার ধান্দায় ব্যস্ত। আরে, আমি জানি, টাকা যদি না থাকে, তোমার ভগবান পর্য্যন্ত জানালা টপ্‌কে দৌড় দেবেন। পুরোহিত আর একবার ফিরে গেলেন।

খুবচাঁদের প্রাণের বন্ধু কেশরাম ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুবচাঁদ বললেন, এক্ষুণি তোমার ওখানে যাবার কথা ভাবছিলাম। কেশরাম হেসে বললেন, এখনও দোকান বিছিয়ে বসে আছো? বড় দিনের এখনো একদিন দেরী—বন্ধ করো ওসব, মনে নেই আজ রাত্রের কর্ম্মতালিকা।

খুবচাঁদ ঘাড় দুলিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন একটা মনে করবার চেষ্টা করলেন, বললেন, কি তালিকা বলোতো?

মিনিট খানেক পরে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেলো, এমনিধারা ভঙ্গী করে বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব কি দেরী হয়ে গেছে?

—জলদি চলো, একটুও দেরী চলবে না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি সেখানেই গেছো, তাই সরাসরি সেখানে হাজির হয়েছিলাম, সেখান থেকেই তো দৌড়ে আসছি।

খুবচাঁদ সৌজন্য করে বললেন, দেরীর জন্তে আশা করি সে অসন্তুষ্ট হবে না।

কেশরাম বললেন, আগেই ভাবছো কেন? চলো, তার পর দেখা যাবে।

খুবচাঁদ তবু বিনয় সহকারে বললেন, তা হলেও আমার হয়ে তাঁর কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিও।

—তাতে আমার বায় আসে কি? আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আমি যখন গিয়েছিলাম, দেখলাম সে রেগে কাঁই হয়ে আছে। সে বললে, তুমি যেমন তাঁর জন্যে কোন গরজ বোধ করো না—সেও তেমনি তোমার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়াবে। অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করেছি। একটা কোন ওজর দেখাতেই হবে।

শয়তানী মুখ করে খুবচাঁদ বললেন, সোজা বলে দেবো লাট সাহেব আমায় ডেকেছিলেন, জরুরী কাজ ছিলো।

—অমন কম্মও করো না, সে বিশ্বাসই করবে না। তা ছাড়া তার সঙ্গে পরামর্শ না করে লাটপ্রাসাদে যাওয়ার দরুণ সে ধমকানি দেবে। বেকুবি করো না। আরে রূপ আর যৌবনের কাছে লাট বেলাটের দাম কি?

—তাহলে বলোতো কি ফন্দী করা যায়?

—তাকে বলো, তোমার ১০৩° জ্বর উঠেছিল, আজ বিকেলে মাত্র ছেড়েছে।

দুই বন্ধুতে হো হো করে হেসে উঠলেন। তার পর দুজনে রওনা দিলেন স্থানীয় উর্ব্বশীর বাড়ী মুখো।

খুবচাঁদের কাপড়ের কল দেশের বিখ্যাত কলগুলির অন্যতম। স্বদেশী কাপড় পরার হিড়িক হয়ে পর্য্যন্ত এর ব্যবসা গেছে দ্বিগুণ বেড়ে, যদিও মালিক গজ-পিছু দু' আনা করে দাম চড়িয়েছেন, তবু বিক্রী কমেনি। এদিকে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে। অতি লাভের নেশায় খুবচাঁদ দিলেন শ্রমিকদের মাইনের হার কমিয়ে। এতেই তারা রেগে আগুন হয়ে গেলো কয়েক দিন ধরে মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে বোঝা পড়ার বৈঠক চললো, কিন্তু খুবচাঁদ রইলেন অচল অটল—যেহেতু তিনি জানেন পুরোণো লোক ছাড়িয়ে স্বল্পতর বেতনে নতুন লোক নেওয়া কিছুই কঠিন নয়। কোন সন্তোষ জনক বোঝা পড়া না হওয়ায় শ্রমিকরা শেষ পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ করলো।

পরের দিন সকালে মিলের সামনের উঠান ভরে গেলো শ্রমিকদের জনতায়। কতক আনাগোনা করছে, কতক একত্রে জটলা পাকিয়ে হল্লা করছে। ফটকে ইতিমধ্যে বসলো পুলিশ পাহারা। পুরো ধর্ম্মঘট সুরু হলো।

ঘুরে দেখা গেলো, একটি লম্বা শীর্ণ গম্ভীর মুখ যুবক এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখামাত্র মজুরেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। সমস্বরে প্রশ্ন উঠলো, মালিক কি মত ধরলেছেন?

তাদের প্রতিনিধি যুবকটি বললেন, না, তিনি নিষ্পত্তিতে রাজী নন।

তাহলে আমরাও আর তাঁর পা চাটবো না—এক সঙ্গে সবাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

যুবকটি তখন মজদুরদের আহ্বান করে বললেন, মালিক মাহিনা ছাঁটাই করবেনই। গত বৎসর মিল দশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে—এ সম্ভব হয়েছে শুধু আমাদের পরিশ্রমের ফলে, কিন্তু এর পুরস্কার স্বরূপ আমাদের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করেছেন বেতন ছাঁটাইএর। কি অন্যায়, কত বড় অবিচার, সত্যিই ধনীদের লোভ সীমাহীন, দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষ হয়ে দাঁড়াতে কেউ নেই। বণিক সভা, গবর্ণমেণ্ট, কারবারের খবরাদার গোষ্ঠী, সবাই মালিকদের পক্ষে। কিন্তু আমার ভরসা আছে, ঈশ্বর আমাদের বর্জ্জন করেন নি।

একজন বিদ্রূপ করে বললো, আমাদের মালিকও তো ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত।

তাদের নেতা হেসে বললেন, হ্যাঁ, তিনি মস্ত ভক্ত। এই সহরে এমন একটি মন্দির নেই, যা তাঁর গৃহদেবতার মন্দিরের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যে ও জাঁকজমকে পাল্লা দিতে পারে। সারাদিন তাঁর মন্দিরে পেতলের ঠাকুরদের পূজো চলছে, কত তার আড়ম্বর, কতো সুখাদ্য, ধূপের তাঁর নৈবেদ্য! সেই জন্যেই লোকে তাঁকে মস্ত ধার্ম্মিক বলে মনে করে, অন্য মিলের চেয়ে তাঁর মিলের কাপড় বেশী বিক্রী হয়। এই জন্যেই কি আমাদের বেতন কমবে? শ্রমিক বন্ধুগণ এসো আমরা প্রতিজ্ঞা করি—কিছুতেই আমরা বাইরের লোককে মিলে ঢুকতে বা আমাদের জায়গায় কাজ করতে দেবো না। এজন্যে যদি গুলির সম্মুখীন হতে হয়, তাতেও আমরা রাজী।

হঠাৎ ভীড়ের ভেতর থেকে একজন চীৎকার করে উঠলো : মালিক আসছেন, মালিক আসছেন।

ভয়ে মজুরদের মুখ নীল হয়ে গেলো, বেশির ভাগই হয়ে পড়লো খুব চঞ্চল। কতক পুলিশদের অনুরোধ করতে লাগলো তাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিতে, কতক গিয়ে লুকালো তুলার বস্তার পেছনে। মাত্র কয়েকজন দৃঢ় সাহসে দাঁড়িয়ে রইল। ব্রহ্মাণ্ডকে অগ্রাহ্য করা মুখভঙ্গী নিয়ে মালিক গাড়ী থেকে নামলেন—দরজার পাহারাওয়ালাদের হুকুম করলেন, উঠান থেকে মজুরদের ঘাড় ধরে বের করে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা লাঠি চালালো, নির্দয় ভাবে ঠ্যাঙাতে লাগলো মজুরদের। জনা দশেক মাটিতে পড়ে গেলো, অন্যেরা চোঁ চাঁ দৌড় দিলো। যুবক নেতা এবং তার আর দু'টী সহকর্মী কিন্তু এক পা নড়লো না।

ক্ষমতার দম্ভ এমনই জিনিষ যে তা ক্ষীণতম বিরোধিতাও সহ্য করতে পারেনা। ওদের এই দৃঢ়তায় বিচলিত হয়ে খুবচাঁদ তাঁর রিভলভার বার করলেন, বললেন, হয় সরো, নয় মরো। কিন্তু লোকগুলি এক পা নড়লোনা। উত্যক্ত হয়ে তখন তিনি হেড্ কনষ্টেবল্‌কে হুকুম করলেন পাজের গোদাদের গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু কনেষ্টবল্‌রা তাদের হাতকড়া পরিয়ে যেই ফটকের কাছাকাছি নিয়ে গেছে, অমনি হাজার খানেক মিল মজুর তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—খুন হবার ভয়ে কনেষ্টবলরা তাদের ছেড়ে দিয়ে দিলো চম্পট। মালিক মহাশয় রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন—পারলে পুলিশ এবং অপরাধী উভয়কেই তিনি সাবাড় করে দিতেন কিন্তু নিজের প্রাণের ভয় তো আছে তাঁর! তবে মজুরদের সঙ্গে বোঝাপড়া বা আপোষ নিষ্পত্তিতে তিনি তখনও রাজী হলেন না, এমনই তাঁর বড় মানুষীর জেদ।

জনতা মালিককে লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হচ্ছিল, এক জায়গায় এসে তারা থেমে দাঁড়ালো—তাদের দলপতি একাই এগিয়ে এলেন। মালিক ভাবলেন, বুঝি তিনি আক্রান্ত হবেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুলী চালালেন, যুবক হতচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মজদুরদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবার ভূমিকম্পের মতো ফেটে পড়লো—লাঠি, ছোরা, ঘুসি, যে যা পেলো, তাই নিয়ে চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেললো। নিরুপায় হয়ে খুবচাঁদ উঠে পড়লেন এক উঁচু তুলার বস্তার ওপর এবং সেখান থেকে রিভলভারে তাক্ করতে লাগলেন। জনতার মধ্যে একজন বললো, দাও বস্তায় আগুন ধরিয়ে। দেশলাই নিয়ে চার দিক থেকে ছুটে এলো ক্রুদ্ধ জনতা, ইতিমধ্যে আহত যুবক রক্তাপ্লুত দেহেই উঠে দাঁড়ালো। উল্লসিত জনতা মুহূর্তে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো, 'গোপীনাথ কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। যুবক ডান হাত তুলে তাদের স্থির শান্ত হতে বললেন। তিনি তাদের হিংসার আশ্রয় না নিতে বললেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর গরীবের প্রাণের ঠাকুর, তিনি প্রেমময়, তাঁর ওপর যাদের প্রত্যয় আছে—হিংসা তাদের শোভা পায় না।

অসন্তোষের একটি মৃদু গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু নেতার আদেশ অমান্য করা বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার মতো মন কারুরই নেই, এতই অনুগত তারা তাদের নেতার। তারা পথ ছেড়ে দিলো, সেই পথে মালিক নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন। যখন তিনি মোটরে উঠলেন, গোপীনাথ হাত জোড় ক'রে বললেন, হুজুর, আমাকে আসতে দেখে আপনি ভুল ক'রেছিলেন—আমি শুধু বলতে আসছিলাম যে আপনার ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু আপনি আমাকে গুলী করলেন, জানিনা ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো এতে। মোটর কয়েক গজও যায় নি, ইতিমধ্যে গোপীনাথ আবার ঘুরে মাটিতে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনাবসান হলো।

খুবচাঁদ মোটরে চ'ড়ে সবেগে বাড়ী ফিরছেন। গোপীনাথের রক্তাক্ত মূর্তি বার বার তাঁর মনশ্চক্ষে ফুটে উঠছে। আপন মনেই তিনি ভাবছেন—গোপীনাথ কি সত্যই তাঁর শত্রু? তিনি তো মৃত্যুর মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে কেন গোপীনাথ তাঁর জীবনরক্ষা করলেন? গোপীনাথের প্রেতাত্মা যেন হাতকড়া পরা দু'টী হাত তুলে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন প্রশ্ন করছে—কেন তুমি একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করলে?

ধনরত্ন প্রায়ই মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে। কিন্তু আজ খুবচাঁদের অন্তরাত্মায় ঈশ্বরের স্পর্শ জেগে উঠলো—যে ঈশ্বর সশরীরে আজ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সামনে জাগ্রত ন্যায়ের মূর্ত্তিতে, বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছুবার আগেই মুখমণ্ডল তাঁর অনুতাপ ও বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে গেলো। গাড়ী থেকে নামামাত্র তার স্ত্রী প্রমীলা ছুটে এলেন, অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর কি? ধর্ম্মঘট ভেঙেছে? কোন গোলমাল হয়নি তো?

খুবচাঁদ ত্বরিৎ পায়ে বৈঠকখানায় হাজির হলেন এবং একটা সোফায় সারা শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, ভগবানের দয়ায় আজ প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। গুণ্ডা ব্যাটারা চারদিক থেকে আমায় ঘিরে ছিলো—একবার তো মরি এমনই অবস্থা, তখন আর কি করি? নিরুপায় হয়েই গুলী চালিয়েছি।

ভীত কণ্ঠে প্রমীলা বললেন, সর্ব্বনাশ! কেউ জখম হয়নি তো?

—হয়েছে, মিল-মজদুরদের নেতা গোপীনাথ গুরুতর রকম জখম হয়েছে। লোকগুলি এতেই ক্ষেপে উঠে চারদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরলো—উপায়ন্তর না দেখে আমি উঠে পড়লাম উঁচু এক রাস্তার গাদায়। তারা তখন মতলব করলো বস্তায় আগুন দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মারার। বেঁচে গেলাম শুধু গোপীনাথের কৃপায়—তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও সে উঠে দাঁড়ালো, ডান হাত তুলে সে তার অনুচরদের এই দুরভিসন্ধি থেকে নিবৃত্ত হতে বললো।

প্রমীলা কেঁদে উঠলেন, বললেন, আজ সকালে তোমাকে আমি একা মিলে যেতে বারণ করেছিলাম, তুমি আমার কথা শুনলে না। কাল আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। যা-ই হোক, আহত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তো? খুবচাঁদ বিমর্ষমুখে বললেন, খুব সম্ভব আমি ফেরার পরই বেচারী মারা গেছে।

প্রমীলা ভক্তিমতী মহিলা। ঈশ্বরে তাঁর অগাধ প্রত্যয়—সংসারের ঘূর্ণিবাত্যায় জীবনের নৌকো যখন টলমল করে, ঈশ্বরকেই তিনি তখন একমাত্র কাণ্ডারী বলে মনে করেন। মনে মনে তাই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পায়ে লুটিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুবচাঁদ দার্শনিক গাম্ভীর্য্য সহকারে বললেন, গোপীনাথ নিশ্চয়ই একটা মহাপুরুষ, তা না হলে যে তার প্রাণনাশ করলো তাকে সে অমন করে বাঁচাতো না।

প্রমীলা বললেন, সৎচিন্তা যে আমাদের মনে জাগ্রত হয়, সে ভগবানেরই অনুগ্রহ।

খুবচাঁদ কৌতূহল সহকারে বললেন, তাহলে অসৎ চিন্তারও মূল তিনিই?

জীবনের অর্থ যাঁরা সার্থক ভাবে বুঝেছেন, প্রমীলা তাঁদেরই মতো স্থির প্রত্যয় নিয়ে বললেন, ভগবান আনন্দস্বরূপ—আলো থেকে কি অন্ধকার আসে?

খুবচাঁদ তখনও প্রমীলার শেষ কথাগুলি ভাবছেন, ইতিমধ্যে বাইরের একটা কোলাহল তাঁদের সচকিত করে তুললো। তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলেন হাজার হাজার লোক কালো পতাকা উড়িয়ে তাঁরই বাড়ীর দিকে আসছে! তাদের পিছনে পুষ্পমাল্য ভূষিত একটি শবাধার। মানুষের সে যেন এক বিরাট সমুদ্র—গোপীনাথের শবযাত্রা চলেছে। গোপীনাথের শোচনীয় মৃত্যুর খবর সারা সহরে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত মিলের কুলী কাজ বন্ধ করে দলে দলে তাঁর মৃতদেহের চারদিকে জড়ো হয়েছে। সমস্ত দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। মিল-মজুরেরা তাদের প্রিয় নেতার এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চায়।

খুবচাঁদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কি করবেন, তাই তিনি ভাবতে লাগলেন পাগল হয়ে। ইতিমধ্যে মজুরদের মস্তবড় একটা দল তাঁর অফিস ঘরে ঢুকে পড়লো, আলমারী ভেঙে, খাতাপত্র টেনে বের করে তারা আগুন ধরিয়ে দিলো। তহশীলদার, খাজাঞ্চী ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভয়েই সরে পড়লেন। পুলিশ-কমিশনার এই সময় একদল বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন—জনতাকে তিনি পাঁচ মিনিট সময় দিলেন, এর ভেতর তারা সরে তো ভালো, নচেৎ তিনি গুলী চালাতে বাধ্য হবেন। মজুররা 'গোপীনাথ কি জয়' এই একটিমাত্র ধ্বনিতেই তাঁর হুকুমের জবাব দিলেন।

একঘণ্টা আগেও এই ঘটনা ঘটলে খুবচাঁদ অন্ধ চোখে দেখতেন, পুলিশ গুলীবৃষ্টি করে জনতা ছত্রভঙ্গ করলে তিনি কিছুই মনে করতেন না, কিন্তু বিবেকের দংশনে এই সময়ের ভেতর হৃদয় তাঁর দ্রবীভূত হয়েছে। প্রমীলার দিকে ফিরে তিনি বললেন, আমি জানালায় গিয়ে আমার দোষ স্বীকার করি, তা না হলে বহু হতভাগ্য অকারণ খুন হবে।

প্রমীলা উত্তর দিলেন, সোজা ওদের বেতন বাড়িয়ে দাওনা!

—ওরা আমার রক্তের জন্ত তৃষিত, বেতন বৃদ্ধির আশ্বাসে আর ফল হবার ভরসা নেই।

অশ্রুপূর্ণ চোখে প্রমীলা বললেন, তাহলে ওরা যে তোমায় নরহত্যার দায়ী করবে!

খুবচাঁদ শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, এ-ই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তাহলে অক্ষম মানুষ আমরা কি করে বাধা দেবো? নিশ্চয়ই আমার জীবনটা এতো মূল্যবান নয় যে এর জন্তে শত শত জীবন বলিদান হবে।

এই কথা শুনে প্রমীলার মনে হলো স্বয়ং ভগবানই যেন তাঁর অন্তঃকর্ণে এই কথাগুলি আবৃত্তি করলেন। স্বামীকে সাদরে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন, যাবার সময় আমাকে কি বলে যাচ্ছ?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, ঈশ্বরই তোমায় রক্ষা করবেন। এই বলে তিনি নীচে নেমে গেলেন—আর প্রমীলা লুটিয়ে পড়ে বুকভাঙা কান্নায় উদ্বেলিত হতে লাগলেন।

খুবচাঁদ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, তাঁর মনে হলো তাঁর সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য যা তিনি তোষামোদী, জুয়াচুরি ও অন্যায়ের দ্বারা আহরণ করেছেন, যেন সব তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে। তবু তিনি অণুমাত্র কাতর হলেন না, তিনি বুঝলেন, তাঁর যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন হবে, তাঁর কারবার ছারখার হবে, তাঁর প্রেমময়ী পত্নীকে আর তিনি দেখতে পাবেন না—তবু তিনি অধীর হলেন না। করযোড়ে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করলেন—শ্রমিকদের তিনি বললেন, ক্রোধ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে তিনি অন্যায় আচরণ করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতিতে শ্রমিকরা কিন্তু বিচলিত হলো না। পুলিশ-কমিশনার এগিয়ে এসে তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

একসপ্তাহ হাজত বাসের পর খুবচাঁদের মামলা সুরু হলো।

বোম্বাই এর একজন বিখ্যাত উকীল গোপীনাথের হয়ে মামলা পরিচালনা করতে এলেন, যতই মোটা হোক তাঁর দক্ষিণা, মজুরেরা তাদের প্রিয় নেতার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্ত তা বহন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আদালত-গৃহের চতুর্দ্দিক কৌতূহলী জনতায় লোকাকীর্ণ—এতবড় মামলার পরিণতি সবাই লক্ষ্য করতে এসেছে। কিন্তু আসামী স্বমুখে নিজ অপরাধ কবুল করায় দুদিনেই মামলার ওপর যবনিকাপাত হলো। খুবচাঁদের উকীল শুধু যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডের জন্তে আবেদন করলেন।

খুবচাঁদের বিদায়-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও তাঁর পরিবারের ওপর বিরূপ হলেন। এক বৎসরের মধ্যে দেনার দায়ে তাঁর বিশাল সম্পত্তি বিকিয়ে গেলে। ইচ্ছা করলে প্রমীলা তাঁর অলঙ্কার পত্র বাঁচাতে পারতেন, তারও দাম কয়েক লক্ষ টাকা—কিন্তু বৈরাগ্যের আগুনে তিনি সবই আহুতি দিলেন, এমন দারিদ্র্যের মধ্যে নেমে এলেন তিনি, যাতে তাঁকে ছোট্ট একটি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতে হলো। খুবচাঁদের কারাদণ্ডের সাতমাস পরেই তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল—নবজাতকের মুখ দেখেই তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা।

সন্তানকে প্রমীলা বহু কষ্টে মানুষ করতে লাগলেন। তাঁর বান্ধবীরা, হিতৈষীরা তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কারুর সাহায্যই তিনি নিলেন না। মেয়ে মহলে হাতের তৈরী জিনিষপত্র তিনি বেচা সুরু করলেন। ছেলের বয়স যখন প্রায় এক বছর, তখন তার তদারকের জন্তে তিনি একটি চাকরাণী রাখলেন—সারাদিন শ্রমের পর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে যখন শিশুটিকে তিনি বুকে নিয়ে আদর করতেন, কল্পনার পাখায় ভর করে তাঁর মন উড়ে যেতো আন্দামানের সেই নির্জ্জন বন্দীনিবাসে যেখানে আছেন তাঁর প্রিয়তম স্বামী। ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন

তিনি প্রার্থনা করতেন, মেয়াদ অন্তে তাঁর স্বামীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে। এইভাবে একদিকে খুবচাঁদ, অন্যদিকে প্রমীলা শুধু আশার উপর নির্ভর করেই চৌদ্দ বৎসর বিরহের কঠিন দিনগুলি পাড়ি দিতে লাগলেন।

*

সন্ধ্যা হয়েছে। প্রমীলার ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র, এখন তার বয়স তেরো, মার কাছে বসে আছে। তার মুখটি বিমর্ষ। মা বললেন, খোকা, আজ তোমার এক্জামিন শেষ হলো—না? কৃষ্ণচন্দ্র বললো, হ্যাঁ, কিন্তু পরীক্ষা আমি ভালো দিতে পারিনি মা। আসলে পড়ায় আমার মনই লাগছে না।

এই কথাগুলি বলতে দু'টি চোখ তার জলে ভরে এলো। তার মা এটি লক্ষ্য করলেন এবং মমতাময় কণ্ঠে বললেন, কিন্তু বাবা, তোমাকে যে ভাল করে পড়াশুনা করতে হবে।

ছেলে উত্তর দিলো, মা দিনরাত্রি আমার বাবাকে মনে পড়ে। এতদিনে তিনি নিশ্চয় খুব বৃদ্ধ হয়েছেন। আমি ভাবি তিনি যখন ফিরবেন, মনে প্রাণে আমি তাঁর সেবা করবো। কত বড় বঞ্চনাই জীবনে তাকে ভোগ করতে হলো। জানো মা, গোপীনাথের আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিয়েছি—তাঁর স্ত্রী আছেন, বৃদ্ধ মা আছেন, আর আছে একটি মেয়ে। মা এবং স্ত্রী দুজনেই একটি কারখানায় কাজ করেন, মেয়েটি আমার চেয়ে বছর দুয়ের বড়ো।

প্রমীলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এতো খবর তুমি কি করে পেলে খোকা?

কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ উজ্জল চোখে বললো, যেখানে গোপীনাথ গুলী খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, মিলের সেই জায়গাটা আজ আমি দেখতে গিয়েছিলাম—কিন্তু অনেক নতুন বাড়ী উঠেছে, তাই জাগাটা ঠিক করতে পারলাম না আমাকে দেখে অনেক কুলী ছুটে এলো, চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বললো, আমি নাকি ঠিক গোপীনাথের মতোই দেখতে। তাদেরই একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোপীনাথের কেউ বেঁচে আছেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটে গিয়ে গোপীনাথের স্ত্রীকে ডেকে আনলো, মা, তাঁর সেই বিষন্ন ব্যথিত মুখ দেখে আমার ভারী কষ্ট হয়েছে, আমার ইচ্ছা করছে আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করি।

প্রমীলা ভয় পেলেন, ছেলে পাছে মজদুর-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে, তাই তাকে পড়াশুনায় ভাল করে মন দিতে বললেন। এই সঙ্গে তিনি বললেন, ওদের পরিবারে যদি তুমি কিছু সাহায্য করতে চাও, তাহলে মাসে পাঁচ দশ টাকা দিতে পারো।

কৃষ্ণচন্দ্র কোন উত্তর দিলোনা, কিন্তু মনে মনে সে ঠিক করলো, স্কুল থেকে ফেরার পথে রোজই একবার করে সে গোপীনাথের বাড়ীতে উঁকি দিয়ে আসবে, আর হাত খরচের পয়সা থেকে ওদের জন্ত কিছু কিছু ফলমূল ও তরী তরকারী কিনে দিয়ে আসবে।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ী ফিরতে দেরী হলো। প্রমীলা চিন্তিত হয়ে চারদিকে খোঁজাখুজি সুরু করলেন। অবশেষে এক সরু গলির অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন ঘরে তিনি দেখলেন তাঁর ছেলে গোপীনাথের রুগ্না স্ত্রীকে হাওয়া করছে। মাকে দেখে কৃষ্ণচন্দ্র বললো, মা, আজ আমি বাড়ী যাবো না, ঠাকুমা অন্ধ, তিনি কিছুই করতে পারেন না, মেয়ে রান্না করছে, মাকে দেখবার কেউ নাই।

কথা শুনে প্রমীলা একটু আহত হলেন, বললেন, খোকা এমনিই অনেক দেরী হয়ে গেছে, একা বাড়ীতে আমার বড় কষ্ট হয় বাবা। এখন চলো, কাল সকালে বরং আবার এসো।

প্রমীলার কণ্ঠস্বরে গোপীনাথের পত্নী চোখ মেললেন, তাঁকে বসতে অনুরোধ করে বললেন, জানিনা কেন আপনার ছেলে আমাকে এতো ভালবাসে। আমার আপন ছেলে থাকলেও বুঝি এতো সেবা করতোনা।

প্রমীলা সেই অপরিচ্ছন্ন কক্ষে ধূম-কলুষিত দেওয়ালের দিকে তাকালেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো গোপীনাথের একখানি ফটোগ্রাফের উপর। কৃষ্ণচন্দ্রের মুখের সঙ্গে ছবির মুখের এমন আশ্চর্য্য মিল যে তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ ছবিখানা কবে নিয়ে এসেছো? কৃষ্ণচন্দ্র বললো, ঐ তার ছবি নয়, গোপীনাথের ছবি। কিন্তু মা বিশ্বাস করলেন না, তিনি বললেন, আমাকে বোকা বুঝিও না। গোপীনাথের পত্নী তখন লজ্জা-কম্পিতকণ্ঠে

বললেন, আজ্ঞে, ওখানা আমার স্বামীরই ছবি। আপনার খোকা দেখতে ঠিক তাঁরই মত। যখন আমার বিয়ে হয়, তখন তিনি এই রকমই ছিলেন—শুধু চেহারা নয়, আপনার ছেলের গলার আওয়াজ এবং ভাবভঙ্গীও ঠিক তাঁরই মতো। যখন থেকে আপনার খোকা আমাদের বাড়ী আসছে, তখন থেকে শুধু আমার, আমার শাশুরীর, আমার কুকুর নয়, এই গলির সমস্ত মজুরেরই জীবনটা সুখের হয়েছে।

প্রমীলা কোন জবাব দিলেন না, তীব্র একটি বিষাদের ছায়া যেন সহসা তাঁর মুখে পরিব্যাপ্ত হলো। যেন তাঁর চোখের সামনে একটি দুঃস্বপ্ন ফুটে উঠলো। জোর করে ছেলের হাত ধরে তিনি যখন তাকে দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন, হঠাৎ তার মনে হলো কে যেন অলক্ষ্যে জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে তাঁর হাত থেকে। দরজা থেকে নেমে বাইরে পা দেওয়া মাত্র গোপীনাথের পত্নী করুণ কণ্ঠে বললেন, মাঝে মাঝে আপনার খোকাকে দেবেন আমার কাছে আসতে, ওকে না দেখলে আমি মরে যাবো।

*

মেয়াদ শেষ হতে খুবচাঁদ বাড়ী ফিরলেন। জাহাজ যখন বোম্বাই বন্দরে পৌঁছালো, কেউ তাঁকে চিনতে পারলো না। চেনার মত কিছুই ছিলোনা তাতে আর তাঁর কোমর বেঁকেছে, ললাটে উঠেছে কুঞ্চনরেখা, দাঁত পড়েছে, মাথার চুল পেকেছে, মুখে হয়েছে একমুখ দাড়ি। তিনিও চাইলেন না কারুর কাছে আত্মপ্রকাশ করতে। খালি মনে হতে লাগলো তাঁর প্রমীলা কি আজও বেঁচে আছেন? যদি থাকেন, কোথায় আছেন তিনি, কে জানে! লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন তিনি—কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর তিনি এলেন সেই বাড়ীর সামনে, অতীতে একদিন যেখানে তাঁর অফিস ছিলো, এরই কাছে ছিলো ছোট্ট একটা পানের দোকান। খুবচাঁদ এগিয়ে গেলেন দোকানীর কাছে। বললেন, হ্যাঁ, ভাই, এটাই কি খুবচাঁদের অফিস?

পান-ওয়ালা জবাব দিলে, আগে খুবচাঁদের অফিস ছিলো—এখন এটা ধনী মহাজন দেশরাজের অফিস।

খুবচাঁদ বললেন, অনেক দিন পরে আমি এই সহরে এসেছি, শুনেছি খুবচাঁদের দীর্ঘমেয়াদ হয়েছিলো, তাই কি?

পানওয়ালা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে কি জানেন, চেষ্টা করলে তিনি রেহাই পেতে পারতেন, কিন্তু সাধুতা বশতঃ তিনি অপরাধ কবুল করে দণ্ড মেনে নিলেন।

—তাঁর পত্নীর খবর কি?

—তিনি এখনও বেঁচে আছেন, ওঁদের একটি ছেলেও আছে।

ছেলের কথা শুনে খুবচাঁদের অন্তরাত্মায় একটি আশা ও আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেলো। তিনি বললেন, ওঁরা কোথায় থাকেন বলতে পারো? আমি একবার দেখা করতে চাই। বহু বৎসর আমি খুবচাঁদের নিমক খেয়েছি কিনা!

পানওয়ালা তাঁকে প্রমীলার বাড়ীর হদিস বলে দিলো—হাওয়ার বেগে ছুটে চললেন খুবচাঁদ, কয়েক পা যেতেই তাঁর সামনে পড়লো একটি মন্দির—তিনি গিয়ে ঢুকলেন তার ভেতর এবং ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম জানালেন। কৃতজ্ঞতার অশ্রু নেমে এলো তাঁর দুই চোখ ভরে—তাঁর মনে হলো, এই দীর্ঘ নির্বাসনের ভেতর ঈশ্বরের প্রেমময় বাহুই তাঁকে এতদিন বেষ্টন করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছে এমন একটা পরিতৃপ্তি, যা অনির্ব্বচনীয়। বিলাস ব্যসনের ক্রোড়ে যখন তিনি দিন কাটিয়েছেন, এ অনুভূতি তাঁর লাভ হয়নি। সত্যই ঘোলা জলে সূর্য্য কিরণ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় না।

তিনি মন্দির থেকে বেরুনো মাত্র একটি মহিলা সেখানে প্রবেশ করলেন। খুবচাঁদের হৃদয় নেচে উঠলো। ইনি প্রমীলা। যখন থেকে তাঁর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তিনি শুধু তাঁকেই স্মরণ করেছেন, মনের পুরোভাগে জাগিয়ে রেখেছেন তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। আজ যখন তিনি তাঁকে দেখলেন আবার রক্ত-মাংসের চেহারায়, তাঁর মনে হল যেন তিনি ঈশ্বর-প্রেমে উৎসর্গীকৃত প্রাণা কোন উদাসিনী সন্ন্যাসিনীকে দেখছেন। তাঁর মনে হল, তক্ষুণি তিনি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন, বলেন, দেবী,

আমাকে ধুলো থেকে উঠিয়ে নাও। কিন্তু পারলেন না, কে জানে যদি তিনি না চিনতে পারেন তাঁকে। দীর্ঘ অদর্শনে চেহারা তাঁর এতই বদলেছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে কারুরই চেনার উপায় নাই। তাই তিনি মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো, তাঁরই অনুসরণ করে তাঁকে যে বাড়ী য়েতে হবে।

অল্প পরে প্রমীলা মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরলেন। খুবচাঁদ দূর থেকে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। একটি একতালা বাড়ীর সামনে এসে প্রমীলা ভেতরে প্রবেশ করলেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। খুবচাঁদ থেমে দাঁড়ালেন—ভাবতে লাগলেন, কি করবেন, ইতিমধ্যে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একটি সুদর্শন বালক। খুবচাঁদকে দেখেই কৃষ্ণচন্দ্র চমকে উঠলো এবং তাঁর পদধূলি মাথায় নিলো। ছেলেটিকে দেখে খুবচাঁদের অন্তর একটু দমে গেল, কারণ দেখতে সে ঠিক হুবহু গোপীনাথের মতো।

কৃষ্ণচন্দ্র বললো, বাবা, আপনি আজ আসবেন, এ আমরা আশা করছিলাম, মাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে আমরা জাহাজঘাটায় যাবো বলেও ঠিক করেছিলাম। আপনার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে বাড়ী খুঁজে বের করতে। আসুন, ভেতরে আসুন বাবা।

কৃষ্ণচন্দ্রের পিছু পিছু খুবচাঁদ বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন। কিন্তু তাঁর মনে হতে লাগলো, যেন তিনি এক কণ্টকাকীর্ণ পথে একা পাড়ি দিচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মুখচ্ছবি তাঁর মনে জাগিয়ে দিয়েছে সেই পুরাণো ধর্ম্মঘট এবং তার শোচনীয় পরিণামের স্মৃতি। সহসা সিঁড়ির কাছে থেমে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলো, মা, মা বাবা এসেছেন। পিতার হৃদয় এবার বিগলিত হয়ে গেল—গভীর অনুরাগে তিনি পুত্রকে বুকে চেপে ধরলেন।

খুবচাঁদ ফেরবার এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় খুবচাঁদ যখন মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাবেন, সেই সময়ে গোপীনাথের কন্যা বিনি এলো প্রমীলাকে প্রণাম ক'রতে। বিনি বললো, মার আজ শরীরটা খুব খারাপ, কেষ্টকে তিনি একবার দেখতে চাইছেন।

প্রমীলা বললেন, সে তো যেতে পারবে না মা, তার বাবা এসেছেন কি না।

কৃষ্ণচন্দ্র ছিল পাশের ঘরে, কথাবার্ত্তা শুনে সে বেরিয়ে এলো। বললো, না মা, বাবার মত নিয়েই আমি বিনির মাকে একবরে দেখতে যাবো—এক্ষুণি ফিরে আসবো আমি।

প্রমীলা যেন একটু অবাক হলেন, রাগত কণ্ঠে তিনি বললেন, জানি না গোপীনাথের পরিবার কি দিয়ে তোমাকে যাদু করেছেন, সেখানে গেলে আর তুমি ফেরবার নামটি করো না।

কৃষ্ণচন্দ্র অনুনয় করতে লাগলো, কিন্তু প্রমীলা কিছুতেই মত দিলেন না। অবশেষে খুবচাঁদ মধ্যস্থ হলেন, অনুরোধ করলেন স্ত্রীকে ওকে যেতে দিতে।

কৃষ্ণচন্দ্র ও বিনি চলে যেতে প্রমীলা তাঁর স্বামীকে বললেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখতে এতখানি গোপীনাথের মতো যে এক এক সময় আমারও ভয় হয়, হয়তো ওর ভাগ্যও গোপীনাথের মতোই হবে।

খুবচাঁদ তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, প্রথম যখন ওকে দেখি আমারও গোপীনাথ বলেই ভুল হয়েছিল।

প্রমীলা বললেন, গোপীনাথের স্ত্রীও বলেছিল, ওর চেহারা, কণ্ঠস্বর হাবভাব সব নাকি গোপীনাথের মতো।

ম্লান হেসে খুবচাঁদ বললেন, ভগবানের কি খেলা। যাকে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি, সে এসে জন্মালো আমার পুত্র হয়ে। তার পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, দেখো, ঈশ্বর যা করেন আমাদের ভালোর জন্যই করেন—মূর্খতাবশতঃ আমরা মনে করি তাঁর সকল আমাদের বিরুদ্ধে। তিনি মঙ্গলময়, এই চিন্তাই আজানুরানে আমার বুকে ভরসা দিয়েছে—আমি বুঝেছি তিনিই একমাত্র নিরাপদ বান্ধব। তাঁর দয়া না থাকলে জীবনের নৌকা আমার কোথায় ভেসে যেতো কে জানে! হয়তো দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তে আজও হাবুডুবু খেতাম আমি।

কৃষ্ণচন্দ্র বিনির সঙ্গে কয়েক পা অগ্রসর হতেই বিনি বললো, তোমাকে একটা মিছে কথা বলেছি। মার কোন অসুখ করেনি—এদিকে অনেক দিন তুমি যাওনি,

তাই না তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, অবশ্য একটা দরকারী পরামর্শও আছে তোমার সঙ্গে।

আশ্চর্য্য হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বললো, পরামর্শ আমার সঙ্গে? আমি কি পরামর্শ দিতে পারি? বাবা এসেছেন কি না তাই এ ক'দিন তোদের বাড়ী যেতে পারিনি।

বিনি বললো, তোমার বাবা? তা হলে আমি যখন গিয়েছিলাম, তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করছেন আমি কে!

—না কিছু জিজ্ঞেস করেন নি।

—তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন আমি একটা কাজিল মেয়ে—না?

—বাবা সে রকম লোক নন। বাবা যদি জানতেন তুমি কে, তা হলে গভীর স্নেহেই কথা বলতেন তিনি তোমার সঙ্গে। সত্যি বলছি, বাবা খুব স্নেহপ্রবণ। কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো? কি নিয়ে মা পরামর্শ করতে চাচ্ছেন আমার সাথে?

—তা আমি কেমন করে জানবো? যদি আমি জানতাম তোমার বাবা এসেছেন, তাহলে আজ কখনো তোমাদের বাড়ী আসতাম না। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন এমন বাড়ী মেয়ের এই ধেই-ধেই করে বেড়ানো উচিত নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলো, তার পর দুষ্টুমী ভরা চোখে বললো, ভেবেছেনই তো! আমি ফিরে আসি, তারপর তাঁকে বলবো তোমার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা।

বিনি লাল হয়ে উঠলো, চড়া গলায় বললো, কি বলবে শুনি? আমি ধেই-ধেই করে বেড়াই? তোমাদের বাড়ী ছাড়া আর কারুর বাড়ী আমি যাই?

—আমার যা খুসী আমি বলবো, নইলে বলো কি জন্মে মা ডেকেছেন?

বিনি জবাব দিলো, কাল বোধ হয় আমাদের মিলে ধর্ম্মঘট হবে। ম্যানেজার এমন কড়া যে কারুর পাঁচ মিনিট দেরী হলেই তার আধ-রোজের মজুরী কেটে নেয়। বার বার আমরা এই কঠিন ব্যবস্থা রদ করার দাবী জানিয়েছি, কিছু হয়নি। মা এবং মিলের অন্যান্য কুলীরা চান তোমাকে প্রতিনিধি করে আর একবার ম্যানেজারের কাছে পাঠাতে। যদি তিনি রাজী না হন, আমরা কাজ বন্ধ করবো।

কৃষ্ণচন্দ্র ভাবনায় ডুবে গেলো।

বিনি বললো, ম্যানেজার মনে করেন আমরা নিরুপায় তাই তিনি কোন বোঝাপড়ায় আসতে চান না। কিন্তু আমরা দেখাতে চাই যে আমরা না খেয়ে মরবো, তবু অবিচার সহ্য করবো না।

কৃষ্ণচন্দ্র বললো, যদি তোমরা ধর্ম্মঘট করো, আবার গুলী চলবে, আবার বহুলোক মরবে। সগর্ব্বে বিনি উত্তর দিলো, কি যায় আসে তাতে? আমার বাবা এতেই প্রাণ দিয়েছেন—গুলীকে আমি ভয় করবো কেন?

বিনিদের বাড়ী পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র দেখলো দরজায় বহু মজুর জমায়েত হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখেই তারা চীৎকার করে উঠলো, আমাদের নেতা, আমাদের নেতা এসেছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো, কিছুই ফল হোলো না। মজুরেরা তাই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করতেই বাধ্য হলো। পরের দিন মিলের প্রাঙ্গন ভরে গেলো মজদুরদের জনতায়। হাঙ্গামার ভয়ে ম্যানেজার সামরিক বাহিনী ডাকলেন মিল পাহারা দিতে। মজদুরদের কোন ইচ্ছাই ছিলো না কারুর কোন অনিষ্ট করার, কিন্তু সশস্ত্র সিপাহীদের দেখেই মেজাজ তাদের চড়ে গেলো।

কৃষ্ণচন্দ্র তাদের জিজ্ঞেস করলো, মিলে ঢুকতে গিয়ে কতক লোক যদি গুলী খেয়ে প্রাণ হারায়, তবু তারা ঢুকতে প্রস্তুত তো?

মস্তবড় একটা দল এককণ্ঠে বলে উঠলো, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কৃষ্ণচন্দ্র বললো, যাদের পরিবারবর্গ আছে তারা ফিরে যাও।

বিনি তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে সে বললো, না, ভগবান আমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করবেন। যারা হতাশ হয়ে পড়েছিলো, তার কথায় তারা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

হাজারখানেক শ্রমিক একযোগে কটক অভিমুখে এগিয়ে চললো। তাদের অগ্রসর হতে দেখামাত্র সিপাহীরা বন্দুক চালালো—কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম প্রাণ হারিয়ে মাটীতে পড়লো, তারপর পড়লো একে একে আরো কয়েকজন। শ্রমিকরা ভয়ে ভেঙে পড়লো।

এই মুহূর্ত্তে খুবচাঁদ খালি পায়ে, খালি মাথায় দৌড়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন। ভূমিতল-শায়িত মৃত পুত্রকে দেখে তারস্বরে চীৎকার করে তিনি বললেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র কি জয়', তারপর বুকে চেপে ধরলেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য হতাশ্বাস শ্রমিকদের আবার উদ্দীপ্ত করে তুললো।

খুবচাঁদ ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করে উঠে দাঁড়ালো, শ্রমিকদের উদ্দেশ করে বললো, বন্ধুগণ, ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ একমাত্র পুত্রকে আজ আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলি-স্বরূপ উৎসর্গ করলাম—আমায় তোমরা অভিনন্দিত করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে প্রাণ দেয় সে-ই প্রকৃত বীর—সেই বীরের আমি পিতা।

হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'কৃষ্ণচন্দ্র কি জয়'। তারপর দলে দলে কাতারে কাতারে লোক এগিয়ে চললো ম্যানেজারের অফিসের দিকে। ম্যানেজার রিভলবার তুললেন, কিন্তু জনতার পুরোভাগে খুবচাঁদকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, লজ্জাবনত মুখে বললেন, মহাশয়, দুর্ঘটনার জন্তে আমি দুঃখিত।

খুবচাঁদ ক্রুদ্ধ জনতাকে থামতে বললেন, তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে বললেন, ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্তেই করেন। যদি আমার পুত্রের এই আত্মবিসর্জ্জন শ্রমিকদের দুঃখ লাঘবের সহায়ক হয়, তাহলেও আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।

ম্যানেজার বললেন, আমি তো হুকুমের চাকর—মনিবের আদেশ পালনই আমার কর্ত্তব্য।

কর্কশকণ্ঠে খুবচাঁদ বললেন, সত্য কথা, কিন্তু আপনি যদি বোঝেন শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, তাহলে অত্যাচারিতদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়ানোই আপনার কর্ত্তব্য—নতুবা অত্যাচারীদেরই সমর্থন করা হবে আপনার।

ম্যানেজার, মালিক ও খুবচাঁদের মধ্যে একটি মোলাকাতের ব্যবস্থা করলেন, যেমন দুই তরফে হিসাব কিতাব ও বোঝাপড়া চলছে, কৃষ্ণচন্দ্রের সৎকার নিয়ে মজুররা তখন হয়েছে অতিশয় ব্যস্ত। খুবচাঁদ বেরিয়ে এসে বললেন, বিলম্বে হাজির হওয়ার দরুণ বেতন কাটা মালিক বন্ধ করতে রাজী হয়েছেন—কুলীরা শুনলো, কিন্তু সেদিকে তাদের নেই আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ, তাদের প্রিয় বন্ধু ও নেতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতেই বুক তাদের ভেঙে গেছে।

মৃতদেহ যখন তারা তুলছে, শোকে বিহ্বল উন্মাদিনী প্রমীলা ছুটে এলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর একমাত্র সম্বলকে। সকলের চোখ জলে ভরে গেলো—কাঁদলেন না শুধু খুবচাঁদ। স্ত্রীর কাঁধে ডানহাতটি রেখে তিনি বললেন, কেঁদো না, কথা শোনো। ন্যায়ের জন্তে সত্যের জন্তে আমাদের ছেলে প্রাণ দিয়েছে—ধন্যবাদ দাও ঈশ্বরকে।

প্রমীলা শান্ত হতে পারলেন না—তার চোখের সামনে থেকে সব আলো যেন নিভে গেছে, ঈশ্বরে প্রত্যয় তাঁর টলে গেলো, স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ তোমার বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু আমি আর বিশ্বাস করি না।

শোকে বিদীর্ণ হৃদয় প্রমীলা সেই রাত্রেই প্রাণ হারালেন। খুবচাঁদ বেঁচে ছিলেন আরো কয়েক বছর—নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অসহায় শ্রমিকদের সেবা ও সহযোগিতাই ছিল তাঁর এই ক'বছরের একমাত্র কাজ।

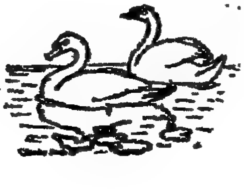

বঙ্গবীর শ্যামাকান্ত

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাঙ্গালা দেশের যে সমস্ত বীরপুরুষ দৈহিক শক্তিতে যে কোন দেশের যে কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টির সম্মুখে একা নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে পারিতেন অথবা তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ ছিলেন, ব্যাঘ্র-বিজয়ী শ্যামাকান্ত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারত-সম্রাট বীর শেরশা নিজ হাতে একটী ব্যাঘ্র নিহত করিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসার স্বামী শের আফগানও ঐরূপ একটি ব্যাঘ্র হননে কৃতকার্য্য হন। তাই উভয়েরই উপাধি হয় 'শের'। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের শের শ্যামাকান্ত যে কতবার ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইয়া উহাকে পরাভূত করিয়াছেন, তাহার সন্ধান কে রাখে? কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় যে, কি আমাদের ছাত্রগণ, কি বাঙ্গালার জনসাধারণ, কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই বাঙ্গালী বীর শ্যামাকান্ত সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। এরূপ আত্মবিস্মৃতি ইতিহাস-বীতস্পৃহ জাতির পক্ষেই কেবল সম্ভব।

ঢাকা সহরে আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আসিয়া যখন জুবিলি স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, তখন হইতেই শ্যামাকান্তের নামের সহিত আমরা পরিচিত। সেই সময়ে বছর তিনেকের মধ্যে দুইবার তাঁহার ক্রীড়া প্রদর্শনে দর্শক হিসাবে উপস্থিতও ছিলাম। আমাদের শিক্ষক স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ (পার্শ্বনাথ ডন্‌গির) মহাশয়ের কাছেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতাম। পূর্ব্বে তিনি এবং শ্যামাকান্ত একসঙ্গে লক্ষ্মীবাজার শ্রীধর ঘোষের আখড়ায় ডনকুস্তি শিখিতেন, উভয়েই তাহার সাকরেদ ছিলেন। উপরন্তু শ্যামাকান্ত যখন দল লইয়া ঢাকা আসিতেন, পরেশবাবুও তাহাদের একজন হইয়া যাইতেন, এমন কি নিজেও কোন কোন খেলায় আসিয়া অবতীর্ণ হইতেন। উভয়েই সহোদরাধিক পরস্পরকে স্নেহ করিতেন।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামাকান্তের সঙ্গে প্রফেসার কৃষ্ণ বসাক যাদুকর (এক্রোবেট) কে দেখিয়াছি। একজন তারের উপরে উঠিয়া খেলিতেন, তাহার কথাও মনে হয়, সুশীলা প্রমুখ ২।৩টি মহিলাও খেলা দেখাইত; কুকুর, বানর, ঘোড়া ও হাতীর খেলাও হইত। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় ছিল শ্যামাকান্তের নিজস্ব দুইটি খেলা—বাঘের সঙ্গে লড়াই ও বুকে পাথর ভাঙ্গা। এই দুইটিতেই খুব বেশী ভিড় হইত। প্রথমটিতে লোহার খাঁচার ভিতরে তিনি ঢুকিয়া পড়িতেন, বাঘ রুখিয়া আসিত, উভয়ে মল্লযুদ্ধ হইত, কিন্তু বাঘ না পারিয়া হটিয়া যাইত। ভীষণ বাঘের সম্মুখেও শ্যামাকান্তের মধ্যে কোনরূপ ভয় লক্ষিত হইত না। এইসব বাঘ পোষাও ছিল না, অথবা কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে নির্জ্জীব করিয়া রাখাও হইত না। আর পাথর ভাঙ্গা যাহা দেখিয়াছি তাহা অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত, যেন স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়। তিনি চীৎ হইয়া একটা বিছানার উপরে শুইয়া পড়িতেন, কয়জন লোক ধরাধরি করিয়া

একটা এগারো বারো মণের পাথর আনিয়া তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিত, সকলে নির্ব্বাকভাবে বসিয়া থাকিত, একজন ষণ্ডাগোছের লোক ২৮ পাউণ্ডের (১৪ সের ওজনের) একটা লোহার হাতুড়ী দিয়া ভীষণ জোরে আঘাত হানিত, পাথর হইতে ধূম্র উদ্গারিত হইত, আর পরেশবাবু প্রভৃতি 'নো মোর' (no more) 'নো মোর' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিতেন —কিন্তু শ্যামাকান্ত বাবু কোনরূপ ভ্রুক্ষেপই করিতেন না, একটুকুও হেলিতেন না বা দুলিতেন না। পরে গাকটা মুছিতে মুছিতে ভিতরে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। এরূপ শক্তির পরিচয় দিতে অপর কোন ব্যক্তি পারিত কি না শুনি নাই। এই সময় (১৮৯৭ খৃঃ) আমাদের একটী সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু গল্প করিল যে, সে এবং অপর কয়েকটী টোলের ছাত্র পরীক্ষা দিবার জন্য হালিয়া কান্দি হইতে গয়না-নৌকায় নারায়ণগঞ্জ আসিবার জন্য ঘাটে আসিয়া দেখে—প্রায় ১৮।২০ জন কাবুলী পূর্ব্ব হইতেই নৌকা দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকেও উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের টাইটেল পরীক্ষা—অনুপস্থিত হইলে বৎসরটি যায়। দৈবক্রমে শ্যামাকান্ত কুমিল্লা জিলার মুরাদ নগর হইতে আসিতে-ছিলেন। তিনিও ঐ গহনার যাত্রী। ছেলেরা ধরিলে হাতের লাঠি দিয়া এমনভাবে একটি গাঁইট ঘুরাইয়া দিলেন যে ভয়ে কাবুলীরা জায়গা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক এপর্য্যন্ত শ্যামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই বা তাঁহার মুখে নিজের কোন কথা কিছু শুনি নাই। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর পরে অপ্রত্যাশিতভাবে সেরূপ শুনিবার একটী অভাবনীয় সুযোগ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের একটী ঘটনা।—সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা, আমি তখন বাঁকীপুরে দ্বিতীয় বার বি-এ পরীক্ষার জন্য তৈয়ার হইতেছি। য়াংলো সংস্কৃত স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম ও বাড়ীতে নিজেই পড়িতাম। তখন কার্ত্তিক মাস, শারদীয়া দুর্গাপূজা সেবারে একটু দেরীতে হইয়াছে, একটু শীতের হাওয়ার আভাসও পাইতেছিলাম। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি প্রাতে আন্দাজ নয়টার সময় হঠাৎ দেখিলাম বিরাটকায়, মোটা গেড়ুয়া ধুতি ও গেড়ুয়া চাদর পরিহিত দীর্ঘ কেশ দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত একজন সাধু বেশধারী বাঙ্গালী একখানি ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর আমার অভিভাবক স্বর্গীয় গঙ্গাধর দাশ মহাশয় উঠিয়া আসিয়া তাহাকে কোলাকুলি করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর বাবু ছিলেন গৌরবর্ণ, ঈষৎ স্থূলকায়, দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সুপুরুষ। উভয়ের আলিঙ্গন আমাদের কাছে বড়ই প্রীতিকর মনে হইয়াছিল। পূর্ব্বে উভয়ে ঢাকায় এক মেসে থাকিতেন। এই আগন্তুকই দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ শার্দ্দুল-বিজয়ী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—কিন্তু সেদিন মূর্ত্ত হইলেন এক অভাবনীয় সন্ন্যাসীর বেশে।

প্রফেসার শ্যামাকান্ত বানার্জ্জি আসিয়াছেন, দুই এক দিন মধ্যেই সহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি একাদিক্রমে প্রায় ১৫ দিন সেখানে ছিলেন।

দ্বিপ্রহরে গঙ্গাধর বাবু কাছারী গেলে শ্যামাকান্ত বাবু বৈঠকখানায় একা থাকিতেন। আমি তখন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে শুনিয়া লইতাম। যে কারণেই হৌক, তিনিও আমাকে খুব পছন্দ করিতেন। এক সময়ে হয়তো কার্ড ছাড়া দেখা হইত না, আজ নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলিতে আগ্রহশীল, মাঝে মাঝে ভাবিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইতাম।

সেদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। রাত্রে বসিয়া গল্প শুনিতেছি, বাহিরেরও কয়েকজন ভদ্রলোক নৈশভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লুচি ভাজা হইতেছে, শীঘ্রই খাবার ডাক পড়িবে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে সংবাদ আসিল, একটা ভয়ঙ্কর সাপ রান্নাঘরে ভীতি সঞ্চার করিয়াছে এবং গৃহকর্ত্রী (গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী) ভীত হইয়াছেন। এ রান্নাঘর সরকারী রসুইখানা নহে, গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী এখানে স্বহস্তে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী তৈয়ার করিতেন। সংবাদটি শুনিবামাত্র শ্যামাকান্ত বাবু তৎক্ষণাৎ

সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমি মনে ভাবিয়াছিলাম বাঘেরই মত সাপটি বোধ হয় তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া লুটিয়া পড়িবে, কিন্তু তিনি একটা লাঠি লইয়া আস্তে উহার মাথাটা চাপিয়া দিলেন, আর তখনি ওটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতঃপরে সাপটাকে পোড়াইয়া ফেলা হইল।

ভোজনের সময় দেখিলাম বেশ খাইতে পারেন, তবে সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু বেশী মাত্র। তেমন অসাধারণ মনে হইল না। যাহা হউক, কয়দিনের আলাপে তাঁহার নিজ মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই আমাদের দেশবাসীর কাছে আজ আমি উপহার দিব। একটা কথা বলা হয় নাই। এ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল ৪৫ বৎসর। অনুমান ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। এসময়ে তাহার দাড়ি-গোঁফ প্রায় সবই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, সামান্য কিছু লাল হইয়া থাকিবে। বোধ হয় গায়ে তখন তেল মাখিতেন না। পাদুকা তখন ব্যবহার করিতেন না, তবে গঙ্গাধর বাবু ফরমাস দিয়া একজোড়া জুতা আনাইয়া বলিলেন—

"আমার সঙ্গে তোমাকে সব জায়গায় যেতে হয়, সহরের রাস্তায় বড় কঙ্কর, তোমার পায়ে লাগ্‌লে পাহাড়ে উঠ্‌তে বাধা প'ড়বে।"

তিনি তখন হিমালয়যাত্রী, ক্রমে উত্তরের দিকে উঠিবেন। হিমালয়ের পথেই বাঁকীপুর আসিয়াছিলেন।

তাঁহার দেশের বাড়ী ছিল আড়িয়ল বিক্রমপুরের একটা গণ্ডগ্রামে—এ গ্রামটি আমার জন্মভূমি বিদগাঁও হইতে ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত—ভিতরের দিকে। এই গ্রামেই তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নড়িয়ার বাসগৃহ স্থানান্তরিত করেন। ইহার কারণ নড়িয়া ষ্টীমারের অন্যতম ষ্টেসন, আর আড়িয়ল ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী, সার্কাস দল নিয়া দ্বিতীয় স্থানে যাতায়াত সম্ভব নয়, প্রথম স্থানেতে সম্ভব। তাঁহার পিতা ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমিল্লার জজকোর্টে কাজ করিতেন। প্রথমে তিনি মুরাদনগরে ছিলেন, পরে কুমিল্লা সদরে বদলী হন।

আমরা বাল্যকালে শুনিতাম, আড়িয়ল গ্রামের দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণকে তিনি অনেকবার সায়েস্তা করেন। আড়িয়ল গ্রামে অনেক মুসলমান বাস করিত, তাহারা কাগজ তৈয়ার করিত বলিয়া তাহাদিগকে 'কাগজী' বলা হইত। এরূপ সাধারণ লোকের পয়সা থাকায় জন্য স্থানীয় লোকদের নিকটে ইহাদের উদ্ধত ব্যবহার বড় পীড়াদায়ক এবং সময় সময় অসহনীয় হইত। হাটে বাজারে ইহারা নিরীহ হিন্দু দোকানদারের উপর অত্যাচার করিত। এই সব অত্যাচার নিবারণ কল্পে অনেক সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্যামাকান্ত একা পঁচিশ ত্রিশজনকে লগুড়ের প্রহারে জর্জরিত করিয়া উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। কয়েকবার এইরূপ শিক্ষা পাইয়া ঐ সব ব্যক্তি উক্তরূপ দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়।

এবার তাঁহার নিজের মুখের কথাই যেমন যেমন শুনিয়াছি, বিবৃত করিতেছি—

অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি এত মান যশ টাকা কড়ি ছেড়ে ফকির হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন? এর পরে কষ্ট হ'তে পারে!"

বুকে পাথর ভাঙ্গারত শ্যামাকান্ত

উত্তরে তিনি বলেন—"মান যশ টাকা কড়ি আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমার গলায় অসংখ্য স্বর্ণপদকের মালা প'রে আমি ক্রীড়াস্থলে আসতাম, সকলে দেখে বিস্ময় বোধ করত। অর্থও আমি কম রোজগার করিনি, আঠারো বছরে ত্রিশ লক্ষটাকা—একটা প্রকাণ্ড জমিদারের আয়।"

একজন বলিলেন—

"আরও তো হ'ত, এসব ছাড়লেন কেন ?"

শ্যামাকান্ত বাবু উত্তর করেন—

"মান, যশ, অর্থে শান্তি নাই, কোথায় শান্তি পাওয়া যায়, তাই খুঁজতে আমি বেরিয়েছি।"

প্রঃ—হঠাৎ কি আপনার এরূপ ত্যাগের ভাব এল ?

তিনি উত্তর করেন—"না, না, পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম, সময় মত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ব। তারপর বাবাও মারা গেলেন (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) বাবার আদেশ ছিল তাঁর মৃত্যুর পর যেন বাঘ নিয়ে খেলা না করি।"

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ও বলেন, অনুমান ১৯০৪ খৃঃ শ্যামাকান্ত ঢাকায় রাধিকা মোহন রায়ের বাড়ী বসিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"আমি বৈরাগী নই, সন্ন্যাসী—আমি দেখেছি ধন মান যশের ভোগে শান্তি নাই, শান্তির জন্যই সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি।"

সেই রাত্রে বিনোদ মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনি পূর্ব্বে কখনও আলোচনা করেন নাই ?

তিনি বলেন—"করতাম্। কুমিল্লা জিলার মুরাদাবাদ নগরে একজন মুসলমান ফকির আছেন। তিনি একজন বড় বৈদান্তিক এবং সর্ব্বজাতিতে সমদর্শী। তাঁর কাছে আমি কিছু জ্ঞান লাভ করেছি। আমার বাবাও তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ত্তেন।"

যাহা হউক, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত হইয়া তাঁহার শারীরিক বল ও সাহসের কথা সম্বন্ধেই বলিতেছি। যে সমস্ত বিপদের মুখ হইতে তিনি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মতই আশ্চর্য্য এবং চমকপ্রদ—আর সাধারণ লোকের পক্ষেও অসম্ভব, কিন্তু শ্যামাকান্তের পক্ষে সবই সত্য—Truth is stranger than fiction.

শ্যামাকান্ত ঢাকার একটি মেসে থাকিয়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। যখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কতকগুলি শিখ সৈন্যের মধ্যে কুস্তীর প্রতিযোগিতা হয়। দূর হইতে দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া শ্যামাকান্ত তাহাদের কাছেই চলিয়া যান। একজন সৈনিক যেন বাঙ্গালী ছেলের এইরূপ হঠকারিতা দেখিয়া একটু ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠে :

"ক্যা দেখতে হো, লড়োগে ?"

শ্যামাকান্ত ঘাড় নাড়িল।

"আচ্ছা আও", বলিয়া শিখ অগ্রসর হইল। তখন সত্যই সেই দীর্ঘকায় শিখের সঙ্গে বালক শ্যামাকান্ত কুস্তীতে লাগিয়া গেলেন। বলবান শিখ তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু চিৎ করাইতে পারে নাই। কুস্তীতে একজন চিৎ না হইলে হার-জিত সাব্যস্ত হয় না। তাই সব কয়জন শিখই বালকের বীরত্ব দেখিয়া 'বাহবা' 'বাহবা' 'সাবাস' 'সাবাস' বলিতে লাগিল। তাহার পিঠ চাপড়াইল এবং কিছু মিষ্টি উপহার দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল। অতঃপরে যতদিন ঐ দলটি ঢাকায় ছিল, শ্যামাকান্ত রোজ তাহাদের কাছে যাইতেন ও কিছু কিছু শিখিতেন।

তারপরের ঘটনা হয় বিক্রমপুরের মিরকাদিমের হাটে। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ পাড়ের নিকটে বহু কলু বাস করিত। ইহারা বড় দুর্দ্ধর্ষ ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী নিরীহ গ্রামবাসী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিত। লুণ্ঠন, প্রবঞ্চনা, নারীহরণ ইহাদের ব্যবসা ছিল। তিনি অনেকবার তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করেন। কিন্তু একদিন তাহার জীবন বড়ই বিপন্ন হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি—

মিরকাদিমের প্রসিদ্ধ হাট সপ্তাহে দুইবার জমে। একদিন বহু ধানের নৌকা আসিয়া জমিয়াছে। শ্যামাকান্তও মায়ের তাগাদায় বাড়ীর মাড়াই ধান নৌকা বোঝাই করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন—তাহার সঙ্গে ছিল দুইজন ভৃত্য আর দুইজন নৌকার মাঝি। ঐ হাটের ধানের ব্যাপারীরা তখন লোককে বড় ঠকাইত।

শ্যামাকান্তের সঙ্গেও ওজনে তো গোলমাল করিলই, আবার মূল্য দেওয়ার সময়েও চুক্তির মূল্য দিতে অস্বীকার করিল। শ্যামাকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যা বলছো, তাই দাও।" এই কথা পাইয়া যেই ব্যাপারী থলেটি খুলিয়া টাকা বাহির করিবে, অমনি শ্যামাকান্ত সব থলেটিই জোড়ে কাড়িয়া লয়। লোকটি সামনে আসিয়া মারিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তিনি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন। তাহার সঙ্গী দুইজনও ধাক্কা খাইয়া হোঁচট খাইয়া দূরে গিয়া পড়িয়া যায়। অমনি চীৎকার হইতে লাগিল: হাটে ডাকাত পড়িয়াছে। হাটবার, প্রায় হাজার লোক জমিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সবই সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। শ্যামাকান্ত ভৃত্য দুইজনকে নৌকায় কোন রকমে উঠাইয়া দিয়া নৌকা হইতে একটা কাঠের দাঁড় খুলিয়া লইয়া একাই সেই হাজার লোকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। 'মার' 'মার' শব্দ হইতে লাগিল, একা তিনি ফিরাইতে লাগিলেন। কয়েকজনকে ফেলিয়াও দিলেন। তাহারা আরও উত্তেজিত হইল। ইত্যবসরে গোলমাল শুনিয়া জল-পুলিসের দারোগাবাবু আসিয়া পৌছিল। হাটের এই ধানের ব্যাপারীগুলিকে তিনি ভালভাবেই জানিতেন। শ্যামাকান্তের কাছে সব ঘটনা শুনিয়া ব্যাপারীকে তাহাকে যথার্থ মূল্য দিতে বাধ্য করেন। হাট ঠাণ্ডা হইল, শ্যামাকান্তও টাকা লইয়া নিরাপদে বাড়ী চলিয়া আসেন।

শ্যামাকান্ত বলেন, "ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যখন পড়ি তখন সেই স্কুলের বিপরীত দিকে অধর ঘোষের একটী আখড়া ছিল, তাতে আমি, পরেশনাথ ঘোষ, প্রসন্ন গুহ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু ডন-কুস্তি শিখতাম। এই সময় ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকার 'কুটী'রা বড় উপদ্রব করতো। পল্লীগ্রাম থেকে আগত নিরীহ স্ত্রীলোকদের গায়ে পড়তে চাইত, খারাপ ইসারা করতো। আবার সময় সময় মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার খবরও পেতাম। আমরা এই দুষ্ট লোকদের অত্যাচার নিবারণ করবার জন্য একটা দল গঠন করি। প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর সময় আমরা সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাহারা দেওয়ার ফলে কুটীদের কৃত মিছিলকালীন উপদ্রব কিছু কমে যায়।

এইরূপ ঘটনা ঢাকা থাকিতে আমরাও শুনিয়াছি। এবং শ্যামাকান্ত ও পরেশ বাবুর জন্য কুটিদের অত্যাচার

জীবন্ত হিংস্র ব্যাঘ্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে শ্যামাকান্ত

যে অনেকাংশে কমিয়া যায়, আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বিনোদ মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "কুটী কারা?"

তিনি বলেন, "ঢাকা সহরস্থ নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ইহারা বাঙ্গলায় কথা বলে। কদর্য্য ভাষা, না বাঙ্গালা না হিন্দুস্থানীতে কথা বলে, খাঁটি বাঙ্গলা বল্‌লে আরও কদর্য্য হয়। 'বে' কথাটা বড্ড বেশী ব্যবহার করে।

বিনোদবাবু—এরা কি বাঙ্গালাদেশস্থ?

"না, খাঁটি বাঙ্গালা দেশের নয়, ঢাকার নবাব বাড়ীতে বহু দাসী এবং নীচজাতির পরিচারিকা থাকৃত। তাদের উত্তর-পশ্চিম বা পাঞ্জাব হ'তে আনা হত। তাদের যে সব অবৈধ-জাত ছেলে পুলে হ'তো, তারা এবং তাদের

ছেলেপুলেরাই কুটী নামে পরিচিত। এখন এদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এরা বড় কুকর্মপরায়ণ। এদের দয়ামায়া নেই, উৎপাৎ করতে এরা সিদ্ধহস্ত।"

ডাঃ ত্রৈলোক্য বাবু—তবে এদের দমন করায় ঢাকায় বেশ শান্তি থাকৃত।

শ্যামাকান্তবাবু—শান্তি থাকৃতো, আবার থাকৃতোও না। এদের দমন হ'ত বটে, কিন্তু কুটীরা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহরে মুসলমানরাও হিন্দুদের উপর বিদ্বেষপরায়ণ হ'ত। তাই ঢাকা সহরে হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত সদ্ভাব কখনো হয়নি।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র মিত্র—নবাব সাহেবও তো মুসলমান! তিনি কিরূপ ব্যবহার করুতেন?

তিনি উত্তর করেন—মুসলমান বটে, কিন্তু আবদুল গণি মিঞা সাহেবকে হিন্দু ব'ললেও অত্যুক্তি হ'ত না। তিনি বড় দয়ালু ও ন্যায় পরায়ণ মুসলমান জমিদার ছিলেন। তাঁর পুত্র নবাব আসানুল্লাও ন্যায়পরায়ণ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ক্রমেই অসদ্ভাব বাড়ছে।

প্রঃ—ঢাকায় কতদিন আপনি ছিলেন?

উঃ—১৯ বছরের সময়ই ছেড়ে যেতে বাধ্য হই।

প্রঃ—কেন?

তিনি বলেন—জনৈক প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তির আদেশে তার লোকজন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রীকে তার বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যায়—উদ্দেশ্য পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। সেই বড়লোকের নায়েব আমাদের খবর দিতে আমরাও সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ী ঢুকে পড়ি। সেও পূর্ব্ব হ'তে তোয়ের হ'য়ে লাঠিয়াল গুণ্ডা বাড়ী রেখেছিল। আমরা অপহৃতা মেয়েটাকে ধরে আন্‌বার সময় যে মারামারি হয়, তাতে সেই বড় লোকটি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে যায়। মনে হ'ল তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে—কিন্তু তা ঠিক নয়? আমরা জানতুম আমাদের নামে ভারী মোকদ্দমা হবে। আমরা পালিয়ে এলুম।

প্রঃ—এই বড় লোক কে?

উঃ—তার নাম এবং সে কোন্ জাতি, তা আমি এ যাবৎ প্রকাশ করিনি, এখনও করব না।

মিঃ বি-এন্ দাস (অধ্যাপক)—আর কোনরূপ অত্যাচার দমন করেছেন?

তিনি উত্তর করেন—নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যে সব ষ্টীমার যাতায়াত ক'রত তার কর্ম্মচারীরা সবই প্রায় ছিল মুসলমান—সারেং, শুকানী, ড্রাইভার, খালাসী সবই ছিল মুসলমান। স্ত্রীলোক দেখলেই এদের লোভ হ'ত এবং সময় সময় অত্যাচার ক'রত। সারেং সকলের উপর ছিল, কিন্তু সে বাধা তো দিতই না, বরং আসকারা দিত। কয়েকজন সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে কয়েকবার আমি ষ্টীমারে চলাচল ক'রে অনেকদিন তাদের উত্তম মধ্যম দিই। আমাদের কয়েকবার যাতায়াতের ফলে এরূপ অত্যাচার অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

বিনোদ বাবু—যাক্, ঢাকা হ'তে পালিয়ে যাবার পর কি করলেন?

উঃ—তারপরে ত্রিপুরার মহারাজা স্যার বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কাছে যাই ও সেখানে কাজ করি। কিছুদিন অতীত হ'লে তার এডেকং (দেহরক্ষক) নিযুক্ত হই। তিনি আমাকে খুব ভাল বাসতেন, কিন্তু সেখানে বড় একটা দুঃসাহসিক কার্য্য ক'রে ফেলেছিলাম। এবং তাতে আমাকে মহারাজা বড় তিরস্কার করেন।

বিনোদ মজুমদার—কি রকম?

উঃ—তার অধীনে একজন শিকারী ছিল, সে বাঘমারা সম্বন্ধে অনেক গল্পটল্প করতো। তার নাম ছিল রামজীবন। তার কাছে নানা রকম শীকারের গল্প শুনতাম। শুনে শুনে আমারও শীকার করবার জন্য খেয়াল হ'ল। এক দিন তার সঙ্গে শীকার করবার জন্য একেবারে ভয়ঙ্কর গভীর জঙ্গলের ভিতর চ'লে গেলাম। একটা জায়গায় দু'জনে অনেকক্ষণ ব'সে অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু বাঘ আর দেখতে পেলাম না। তবে দেখলাম যে একটা সদ্য মৃত মোষ পড়ে রয়েছে। প্রায় ৪।৫ মাইল জঙ্গলের ভিতরে চ'লে গেছি, বাঘও পেলাম না, ফিরতেও ইচ্ছা হ'ল না। রামজীবন তো ভারী অধীর হ'য়ে পড়ল, ক্ষুধার নাম ক'রে সে চলেই গেল। পরে ঘণ্টা দুই পরে সত্যই একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে উপস্থিত হ'লো। আর এলেই মোষটার গলা চাটতে লাগল। বাঘটা তখনও আমায় দেখে নাই, আমি বুঝলুম এই সময় গুলি ক'রলে ঠিক মারা পড়বে। মরি কি মারি।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে গুলি ছুড়লাম, গুলিটাও একেবারে বাঘটার চক্ষুর মণি ভেদ করে চলে গেল, বাঘটা তখনই মারা গেল। কিছুক্ষণ পরেই রামজীবন ফিরে এলো। শীকার দেখে তারও ভারী আনন্দ হ'ল। মহারাজার কাছে বাঘটা নিয়ে গেলাম। তিনি দেখে ভারী খুসী হ'লেন বটে, কিন্তু আবার তিরস্কারও খুব কল্লেন যে, এতটা অসমসাহসিকতা কেন দেখাতে গেলাম! তার পরে সেই বন্দুকটা আমায় পুরস্কার দিয়ে দিলেন।

"মহারাজার কাজে আমি প্রায় দুই বছরছিলাম, কিন্তু রাজবাড়ীর এক কুমারের সঙ্গে একটু মনোবাদ হওয়ায় ছেড়ে দিই। তার পরে বরিশাল গিয়ে জিমনাষ্টিক শিক্ষকের কাজ করতে লাগলাম।"

"এই সব কুস্তী ও শীকারে আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি ইংরাজী বাঙ্গলা ডন কুস্তী, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর খেলা দেখিয়ে একটি সার্কাসের দল গঠন করি। চার পাঁচ বৎসরকাল ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু রোজগারও হয়। ক্রমে দলটি নিয়ে আমি শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জে যাই। সেখানে কয়জন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানকে একটি সদ্য-ধৃত চিতাবাঘ খাঁচায় পুরে উহা হাটবাজারে দেখিয়ে কিছু কিছু পয়সা রোজগার ক'রছে দেখলাম। আমার কেমন মনে হ'ল এই চিতাবাঘটাকে বশ করা যায় কিরূপে? তা হ'লে বেশ ইংরাজ সার্কাসওয়ালার মত খেলা দেখানো যাবে। আমি ব'লে ক'য়ে উহাদের কাছে চিতাটা কিনে নিলাম। তিন চারদিন বাইরে থেকে উহার সঙ্গে ইসারা করতাম, ক্রমে চিতাটা বশ মানলো, মনে হ'ল এখন বেশ পারব। চতুর্থ দিনে আমি খাঁচার ভিতরে ঢুকেই খেলা দেখালাম। সকলে ভারী বিস্মিত হলেন। আমারও সাহস বেড়ে গেল। ইহা প্রায় চৌদ্দ বৎসরের কথা, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এরূপ হবে। ঐ চিতাটা আমার কাছে দু' বৎসর ছিল, তারপর ম'রে যায়! এরপর পর পর আমি তিনটা চিতা নিয়ে খেলা করি।

"ক্রমে বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ সুন্দরবনের ভীষণ বাঘের সঙ্গে খেলা কর্ত্তে ইচ্ছা বেড়ে গেল। একটা বড় বাঘ জোগাড় হ'ল, এর সঙ্গে খেলা ক'রে লোককে স্তম্ভিত কর্ত্তাম। এই বাঘটার নাম দিয়েছিলুম "গোপাল"। অনেক দিন পর্য্যন্ত গোপালের সঙ্গে খেলেছি। গোপাল কখনও আমার উপর রুখে আসেনি। দুর্দ্দান্ত শার্দ্দুল, তবু আমার বেশ বশ ছিল।"

বিনোদবাবু—আচ্ছা বাঘ বশ কর্ত্তে আপনি কি কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন কর্ত্তেন?

শ্যামাকান্ত—না কখনও না।

মিঃ দাস—তবে কিরূপে তা সম্ভব হ'ত?

সোঽহং স্বামী

শ্যামাকান্ত—সেটা ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা। তবে আমি জীবনে কখনও বাঘকে ভয়ের চোখে দেখি নাই। ভয় ক'রলে বাঘ কখনও বশ মানতোনা। আমার সাহসেই বাঘ তাহার তীব্র চক্ষু-জ্যোতিতেও আমার দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারতোনা।

গোপালের সঙ্গে খেলা দেখে লোকে বাঘ ছেড়ে আর চিতার খেলা দেখতে চাইত না। তাই কুকুর পুষে চিতা ও কুকুরের খেলা দেখাতে লাগলাম। ক্রমে আরও ভীষণ

বাঘের সঙ্গে খেলা করবার সুযোগ মিলে যায়। এই সময় একবার আমি সার্কাস নিয়ে পাটনায় যাই সঙ্গে আমার ঐ বেঙ্গল টাইগারটি ছিল—যার নাম বলেছি গোপাল। পাটনার নবাব বাহাদুর আমার খেলা দেখতে আসেন। গোপাল বাঘটার সঙ্গে আমার খেলা শেষ হ'লে নবাব বাহাদুর আমায় বলেন, "এটা আপনার একটা পোষা বাঘ, আর আপনি একে নির্জীব করে ফেলেছেন এর সঙ্গে খেলায় কেরামতি কি? আমার পিঞ্জরায় একটা বাঘ আছে, তার সঙ্গে ওর খাঁচায় ঢুকে যদি খেলতে পারেন তবে আপনার বাহাদুরি বুঝতে পারবো।"

আমি বল্লাম, "বাঘটা না দেখে আমি হাঁ না বলতে পারবোনা।

নবাব—বেশ কাল আপনি আমার বাড়ীতে—

"মেরে গরীবখানাকে তসরীফ ফরমাইয়েগা"

পরদিন তাহার বাড়ীতে গেলাম, তিনি তাহার চিড়িয়াখানায় আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি কয়েকবার বাঘটাকে খাচার বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তারপরে বল্লাম—"আমি প্রস্তুত, কিন্তু এক সর্ত্ত, বাঘটি আমায় দিতে হবে।"

নবাব বাহাদুর—"বহুৎ-খুব, কব্ খেলেঙ্গে?"

আমি বল্লাম, আমি এখনি পারি, তবে বিজ্ঞাপন ও ঘোষণাপত্রে একটু সময় লাগবে—আমাকে ৩।৪ দিন সময় দিতে হবে।

নবাব বাহাদুর—বেহতর হ্যায়, আপ ইন্তিজাম কিজিয়ে। বন্দোবস্ত করুন।

"বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। নবাব সাহেবের দুর্দ্দান্ত বাঘের সহিত খেলা! নির্দ্দিষ্ট দিনে লোকে লোকারণ্য হ'ল, পাটনার গুলজারবাগের তো কথাই নাই, বাঁকীপুর, মিঠাপুর, দানাপুর হ'তেও বহুলোক এলো। সকলেই উল্লসিত, কিন্তু সন্ত্রস্ত—জংলী বাঘের সঙ্গে খেলা! ঠিক সময়ে যেমনি আমি বাঘের খাঁচায় ঢুকবো, নবাব বাহাদুর দৌড়িয়ে এসে আমায় বাধা দিয়ে বল্লেন, 'মাত ঘুষিয়ে বাবু সাহেব,ম্যায় ফৌরণ্ আপ্‌কো এহি শেরটো ইনাম দে দেতে হ্যায়, আপ পিঞ্জরাকি অন্দর মাত যাইয়ে'—কিন্তু আমার এখন উৎসাহ চড়ে গিয়েছে, বল্লাম

"না, তাতো হতে পারেনা নবাব সাহেব! এত লোককে বিজ্ঞাপন দিয়ে আনা হয়েছে, তাদের বঞ্চিত করতে পারি না, আমাকে ভিতরে ঢুকতেই হবে।"

"এই ব'লে আমি আর কোন কথা না ব'লে খাঁচায় ঢুকে পড়ি এবং অনেকক্ষণ খেলবার পরে একেবারে অক্ষত দেহে বাইরে ফিরে এলাম। দর্শকবৃন্দ পুলকে বিস্ময়ে ঘন ঘন জয়োল্লাস করতে লাগল।

"উদারচেতা নবাব বাহাদুর সানন্দে বাঘটিতো আমায় দিলেনই, একহাজার টাকাও নগদ পুরস্কার দিলেন। আর দুইটি আরবি ঘোড়াও উপঢৌকন দিয়েছেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওটা বাঘ নয়, বাঘিনী—সেটি শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে ছিল, নবাব বাহাদুরের উপঢৌকন ব'লে উহার নাম রেখেছিলাম 'বেগম'।

"বেগমের সঙ্গেই তখন বেশী খেলা করতাম। এবং পরে ভাওয়ালের রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় একটা বাঘ উপহার দেন। এর বয়স ছিল ৩।—৪ বৎসর। এটা যেমন বড় তেমনি হিংস্র ছিল। রাজা বাহাদুরের উপঢৌকন ব'লে এর নাম দেওয় হয় 'রাজা'। আমি রাজা ও বেগম এই দুইটা বাঘ নিয়েই—কখনও এটা কখনও ওটা—খেলা করতাম।"

সকলে—বাঘ নিয়ে আপনার কখনো কোন বিপদ হয়নি?

শ্যামকান্ত—মাঝে মাঝে বাঘ থাবা মারতে চেষ্টা করতো, কিন্তু কিছু করতে পারতো না, তবে একবার বড় বিপদ হয়েছিল। তখন ১৩০৭ সাল—দেশে বাড়ীতে বাবা অসুস্থ। টাইফয়েড জ্বরে ভুগছিলেন। গৌরীপুরে বায়না হয়েছে, যেতেই হবে, তবে মনটা ভাল ছিল না। পরেশবাবুকে বলায় তিনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন। খেলা আরম্ভ হ'লে 'রাজার' খাঁচায় যখন ঢুকেছি, রাজা ভয়ঙ্কর রুখে এসে কামড়াতে এলো। থাবা মারলে, আমি হাত দিয়ে ধরে ফেল্লাম, কিন্তু নখের আঁচড়ে মুখের বাঁ-দিকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। 'রাজা' সেদিন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরেছে।"

প্রঃ—আপনি কি ভয় পেয়েছিলেন?

তিনি—আমি ভয় পাইনি। তবে এরা যদি দেখে কিছুতেই ভয় পাব না, ওদেরই ভয়ের কারণ আছে, তখন বেশ খেলবে! কিন্তু যদি দেখে আমাদের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা আছে, তখনই আক্রমণ করতে আসবে। সেদিন আমি ভয় না পেলেও, আমার চেহারার দিকে চেয়ে বাবার অসুখের জন্য এমন কিছু আমার চেহারায় দেখতে পেয়ে থাকতে পারে যে, বাঘটার ভয়ের কারণ ছিল না, তাই রাজা আক্রমণ করতে এসেছিল

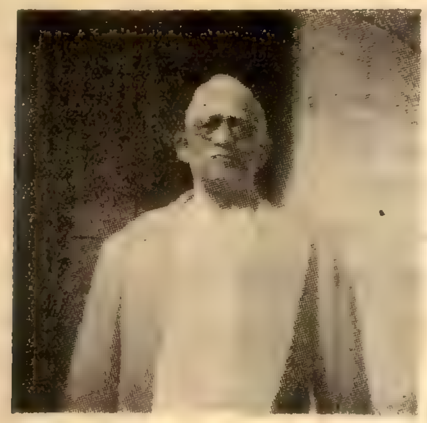

শ্যামাকান্তের কণিষ্ঠ শ্রীশীতলাকান্ত

সকলে (ঔৎসুক্য সহকারে)—তারপরে কি হ'ল ?

তিনি বললেন—আমিতো খুব ঠেকাতে লাগলাম, কিন্তু পরেশবাবু প্রভৃতি ভয় পেলেন। বন্দুক সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুলি করবো ?"

"সর্ব্বনাশ, তখন গুলী করলে বাঘ মরতে মরতেও আমাকে মেরে ফেলতো। আমি বললাম, "না, গুলী করবেন না, তাহলে আর নিস্তার নাই। নিকটে একটা মাংসখণ্ড এনে ধরুন। খাসির একটা রক্তাক্ত বড় ঠ্যাং ধরা হ'ল। বাঘ যেন কিছুতেই ছাড়তে চায় না। হঠাৎ কি খেয়াল হল রক্তাক্ত মাংসের লোভে আমায় ছেড়ে দিয়ে ওটা কামড়াতে রুখে গেল, সেই ফাঁকে আমিও খাঁচার বাইরে চলে এলাম। এইবারই সবচেয়ে বেশী বিপদ হয়েছিল"—

—"আপনি কখনও বিদেশে গিয়েছেন ?"

তিনি বললেন—না, একবার ইউরোপে গিয়ে বাঘ-সিংহের খেলা দেখাব ভেবেছিলাম, কিন্তু ডাক এলে আর সব ছেড়ে দিয়ে এখন হিমালয়ের পথযাত্রী হয়েছি।

গঙ্গাধরবাবু—পাথর কত মণ পর্য্যন্ত তোমার বুকে ভাঙ্গা হ'ত ?

তিনি বলিলেন—"দশ মণ পর্য্যন্ত। কাকিনায় গিয়েছি, সেখানকার মহারাজা একদিন খেলা দেখে বললেন, এতো পারেন, আপনার সাহস আছে মানি, কিন্তু যাতে শক্তির পরিচয় হয় এমন কাজ পারেন তো বুঝতে পারি। আমার একজন পাঞ্জাবী পালোয়ানের বুকের উপর তিন মণ পাথর রেখে ভাঙ্গা হয়। আপনি তা পারবেন কি ?"

"আমি বললাম, হাঁ পারি। সেখানেই বুকের উপর ছয় মণের পাথর রেখে ভাঙ্গতে দিয়েছিলাম, ক্রমে ১০।১২। ১৪ মণও পারতাম।

সাধক জীবনে শ্যামাকান্ত

সকলে—লোকে বলত—হয় বাঘে খেয়ে ফেলবে নয় বুকে পাথরের অংশ ঢুকে প্রাণ যাবে—তাই আপনি সব ছেড়ে দিয়েছেন, একথা কি ঠিক ?

তিনি—আমার তা মনে হয় নাই, তবে আমার দিন এসেছে তাই আমি সব ছেড়ে এখন সন্ন্যাসী হ'য়েছি।

প্রশ্ন হইল—আপনি কি কখনও কোনরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতেন ?

তিনি বলিলেন,"না, কখনও না, চা কাফি পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নাই।"

—কি খেতেন ?

—দেড়সের আন্দাজ মাংস, ডিম আর কিছু ভাত।

প্রঃ। তামাক সিগারেট ?

উঃ। সিগারেট নয়, তবে আমি খুব গড়গড়া টানতাম।

বিনোদ মিত্র—আপনার সাহেবদের জব্দ করা সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, সে সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

তিনি বলেন—"একবার বাঁকীপুর থেকে ট্রেনে যাচ্ছি, দেখি কয়টা সাহেব কিছুতেই বস্‌তে দেবে না। সেকেণ্ড-ক্লাসে সাধারণতঃ ইতর শ্রেণীর সাহেবেরাই উঠে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—মনে মনে বললাম, রসো, মজা দেখাচ্ছি, মোকেমায় একটা সাহেব একবার কিছুক্ষণের জন্য নেবে যায়। আমি তার বিছানাপত্রগুলো নীচে ফেলে দিয়ে আমার বিছানা পেতে উপরের বাঙ্কে শুয়ে পড়ি। সাহেবটা এসে ছাখে, আমি নাক ডাকাচ্ছি, কিন্তু কিছু বলতে কারও সাহস হলো না। কিলুয়ায় যখন মুখ ধোবার জন্য লেভেটারীতে যাই, তখন একটা সাহেব একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কল্লে, "আপনি কি প্রফেসার বানার্জ্জি?"

আমি উত্তর কল্লাম হাঁ—

সাহেব—আমাদেরও ঠিক তাই মনে হয়েছিল।

—"আর একবার চুঁচুড়া হতে কোলকাতা যাচ্ছিলাম, খেয়া পার হয়ে গঙ্গার অপর পারে নৈহাটি এসে ট্রেণ ধরি। দমদম গোড়াবাজার ষ্টেসন হ'তে কতকগুলি সাহেব উঠল। একটা সাহেব আমার গায়ে তার একটা পা উঠিয়ে দিলে, আমি অমনি আমার দুটো পা তার গায়ের উপর উঠিয়ে দিলাম: সে জোরে উঠে যেই ঘুষি ধরবে, অমনি তার কাণের কাছে কে যেন বল্ল, "চেপে যাও, প্রফেসার বানার্জ্জি।" অমনি কাণে যেন কে কি মন্ত্র দিল, মন্ত্রৌষধি বশের মত তৎক্ষণাৎ ব'সে পড়ল।

—"আর একবার কোলকাতা কলিঙ্গা লেন দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বড় দিনের সময় কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ নাবিক মদ্য পান করে সারি বেঁধে রাস্তা দিয়ে পুব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল, আমি অপর দিক হ'তে আস্‌ছিলাম, একটা লোক আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইল, আমি অমনি তাকে এমন ধাক্কা দিলাম যে লোকটা হোচট খেয়ে অপর ফুটপাথে পড়ে গেল। দলের লোক সব বোধ হয় ভয় পেয়েই আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করে চলে গেল।

—"আর একবার বড় ভীষণ কাণ্ড হয়—আমি আরা ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠেছিলাম, দানাপুর হ'তে কতকগুলি সাহেব আমার নিকটেই একটা সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় উঠল দেখলাম, কিছুক্ষণ পরে একটি বাঙ্গালী মেয়ের চীৎকার শুন্‌লাম। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, উপায়ান্তর নেই দেখে আমি গাড়ীর পাদানি বেয়ে সেই কামরার ভেতর ঢুকলাম, দেখলাম একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক গাড়ীর এক কোণায় গিয়ে লুকিয়ে বসেছেন। আর পাষণ্ডগুলি স্ত্রীলোকটীকে অপমান করতে উদ্যত হয়ে হাসি ঠাট্টা করছে। সাহেবেরা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বোধ হল সৈনিক শ্রেণীর হবে। আমি বাধা দিতেই আমাকে একজন ঘুষি মারলে, আমিও ঘুষি চালালাম। একা সাতজনের সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব নয়, তাই একটাকে ধরে লাঠির কাজ কর্ত্তে লাগলাম, ওটাকে দিয়ে বাকি কয়টাকে এমন ভাবে পিটতে লাগলাম যে ক্রমে তারা নিস্তেজ হ'য়ে পড়ল। স্ত্রীলোকটি 'বাবা' বলে আমার দিকে এল। পরের বাঁকিপুর ষ্টেশনে এদের জন্য সুব্যবস্থা করে দিই। আর পুরুষটিকে খুব ধমকিয়ে বললাম—

"মশায়, স্ত্রীলোকের মান রাখতে পারেন না, আবার স্ত্রী নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে আসার ঝোঁক কেন বলুন তো! স্ত্রীলোকটিকে মেয়ে গাড়ীতে দিলেই তো পার্ত্তেন।"

"আর একবার খুলনা থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসে আসছিলাম, একটী মুন্সেফ এবং তার স্ত্রী আমার সামনে বসেছিল। দমদম গোড়াবাজার ষ্টেশনে দুটো গোরা এসেই মুন্সেফ পত্নীর দুইপাশে অসভ্যের মত বসে প'ড়লো, মুন্সেফটি মুখে ভয়ানক আপত্তি করতে সাহেব দুটো আরও অশ্লীল ব্যবহার কর্ত্তে লাগলো, তখন আমি দুটো নরপশুর মাথা দু'হাতে ধরে এমন ঠুকতে লাগলুম যে, ক্রমে অসহ্য হ'য়ে দুটোই কাঁদতে আরম্ভ করলে। নাক দিয়ে ওদের রক্তও বেরুলো—শিয়ালদহ ষ্টেশনে আস্‌তেই সকলে অবাক হ'ল। কেউ কেউ মুনসেফটিকে দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৪ ধারায় মোকদ্দমা কর্ত্তে পরামর্শ দিলে। আমি নিষেধ করে বল্লাম তা করবেন না, তাতে ফল খারাপ হবে। এই সবের জন্য আমি সর্ব্বদা যুবকদিগকে শক্তি সঞ্চয় করতে উপদেশ দিতাম। যেখানে যেতাম সেখানেই ছেলেদিগকে ডন কুস্তির জন্য সমিতি কর্ত্তে উপদেশ দিতাম। আর স্ত্রীলোকদিগকেও সাহস সঞ্চয় করবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার খুব সমর্থন কর্ত্তাম। স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য আমি অনেক টাকা ব্যয় করেছি—কিন্তু

লোকের অজ্ঞাতসারে। যুবশক্তি এবং স্ত্রীশক্তিগঠন আমার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল।"

ঢাকা থাকিতে পূর্ব্বে তিনি যেরূপ ভঙ্গিমায় কথা বলিতেন, তাহা ঢাকাস্থ কুটীদের কথার মত, বোধ হয় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ডন কুস্তি করিতে হইত বলিয়া ঐরূপ কথা আয়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এবার আমরা দেখিলাম তিনি পশ্চিম বাঙ্গালার লোকদের সঙ্গে খাঁটি কলিকাতার কথায় এবং আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ববাঙ্গালার ভদ্রলোকের ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন। তারপরে আমার বন্ধু শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দাসের কাছে শুনিয়াছি—৩।৪ বৎসর পরে হিমালয় হইতে একবার ফিরিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় আসেন, তখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল

সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত ও তিব্বতী বাবা

বেদান্তের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। ভূপেন্দ্র বলেন, "আমার মনেই হয় নাই এক সময় এই লোক কিরূপ অসভ্য কুটীভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে অভ্যস্থ ছিল!"

দিন পোনের থাকিয়া তিনি যে চলিয়া গেলেন, ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে আর দেখা হয় নাই। তবে তাঁহার কিছু পুস্তক দেখিয়াছি আর কিছু কিছু ঢাকার লোকের কাছে অবগত হইয়াছি।

হিমাচল প্রদেশে শ্যামাকান্তের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নইনিতালের নিকট ভাওয়ালী নামক স্থানে এবং পরে আর একটিও নইনিতালের নিকটেই হয়—জেউলীকোটে। অনেক ইউরোপীয় সাহেবও সেখানে আসিতেন। অনুমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীবাবার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তখন তাঁহার নাম হয় "সোহহং স্বামী"। দাঁড়ি গোঁফ আর ইহার পরে ব্যবহার করিতেন না। তিব্বতীবাবা একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। তাঁহার অনেক শিষ্য আছে।

অনুমান ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দেখিতে পাই স্বর্গীয় রাজমোহন গাঙ্গুলীর বাসায় ভবানীপুর কেদার বসু লেনে। রাজমোহন বাবুর কাছে আমরা জুবিলী স্কুলে পড়িতাম, এসময়ে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এবার সোহহং স্বামীকে দেখিলাম বেশ লম্বা গরম কোট পরিহিত। কথা ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃতে তিন রকমেই বলিতেছেন। এবার আমার বেশী সময় ছিল না, তাই আর দ্বিতীয় বার আসিতে পারি নাই। তবে এই শেষ দেখা।

হিমালয়ে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত

শ্যামাকান্ত অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থই বেশী। তাঁহার পিতার গুরু ফকির সাহেবের ন্যায় তিনিও ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম—

সোহহং গীতা, সোহহং তত্ত্ব, সোহহং সংহিতা, বিবেক গাথা, ভগবদ্গীতার সমালোচনা, ট্রুথ, কমনসেন্স প্রভৃতি। তিনি নিজেও ছিলেন যেমন স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন ভাবেই সব আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকারী আমি নই, তাই এখানে ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু ধর্ম্ম অপেক্ষাও তাঁহার মৃত্যু তাঁহাকে অমর করিবে। যে পাহাড় দুইটিতে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল বড় মনোরম।

চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিমালা, পর্ব্বতগাত্রে লতাপুষ্প শোভিত নানা বৃক্ষ রাজি, শাখায় শাখায় বিহঙ্গের কলগীতি, অদূরে কলকলনাদিণী শৈলসুতা প্রবাহিতা। আর নিকটে রজত-শুভ্র সঙ্গীত-মুখরা প্রবাহরাজির কলতান ধ্বনি। কি সুন্দর দৃশ্য! কিন্তু জীবনসূর্য্য তখন অস্তাগামী। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস—পাহাড়ের কন্‌কনে শীতের মধ্যে পাহাড়ীয়া ব্যক্তিদিগের সেবায় নিরত থাকাবস্থায় তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন। সে সময়ে war-fever নামে এক রকম জ্বর আসিয়া গাড়োয়াল পাহাড়ে মড়ক আনিয়া দিল। বালক মরিল, বৃদ্ধ মরিল, স্ত্রীলোক মরিল, পশ্বাদিও বাদ রহিল না। বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ছিল না, তিনি তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং একটী সন্ন্যাসী শিষ্যসহ (স্বামী বেদানন্দ বোধ হয় নাম), ঐ সকল লোকদের মধ্যে গিয়া ঔষধপত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। দিনের পর দিন অনবরত সেবাকার্য্যে নিরত থাকিবার পর সেই সংক্রামক ব্যাধি তিনজনকেই আক্রমণ করিল, তিনজনই দুই একদিনের আগে পরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অদ্বৈতবাদী সোহহং স্বামী লোক সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সেই পাহাড়স্থ আশ্রমে তিরোধান করেন। আশ্রমটি এখনও আছে। Guest Houseএর অনেকটা অংশ বিবেকানন্দ মিশনকে দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতক তাঁহার গ্রন্থরাজি, কতক শিষ্যদের কার্য্য তাহাকে খাঁটিভাবে পরিচয় করাইয়া দিবে। কিন্তু তাঁহার লৌকিক জীবনের বৈশিষ্ট্যই ছিল বরাবর তিনি দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি বিধান করিতেন। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন এবং আজন্ম স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যে দিক্‌টা যুবক, বালক, বৃদ্ধকে মুগ্ধ করিবে তাহা এই যে, এত বড় একজন শার্দ্দুলবজয়ী পরাক্রান্ত ভারতীয় বীর, যাঁর কীর্ত্তি যশ খ্যাতি সুদূর সমুদ্রপারেও বিঘোষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সর্ব্বদাই যাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়াছে, সাংসারিক জীবনে ভোগতৃপ্তির জন্য যাঁহার কাছে উপচারের কখনও অভাব হইত না, সেই বিরাট পুরুষ এক কথায় যে ধন, মান, ঐশ্বর্য্য পদাঘাত করিয়া ভিন্নাশ্রমে চলিয়া গেলেন সংসার উপেক্ষা করিলেন, ফকিরী গ্রহণ করিয়া বনগমন করিলেন এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে করিতে পরসেবায় জীবনাহুতি দিলেন তাহা একমাত্র বাঙ্গলা দেশের মাটিতেই সম্ভব —যে দেশে বুদ্ধ চৈতন্য, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, দেশবন্ধু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এরূপভাবেই হেলায় সবই বর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; বঙ্গযুবকের নিকটে এই কথা কয়টি বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্যামাকান্ত বাবুর সহোদরদের সঙ্গেও আমি বিশেষ পরিচিত ছিলাম। দ্বিতীয় ভ্রাতা নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের স্বগ্রামে বিদগাঁয়ে আসিয়া বিবাহ করিয়া পরে নিজেই সেখানে বাড়ী করেন, তাহারও চেহারা বেশ বলিষ্ঠ ছিল। তৃতীয় ভ্রাতা সূর্য্যকান্ত ঢাকায় উকীল ছিলেন, বার-লাইব্রেরীতে দেখাশুনা হইত, সূর্য্যকান্ত একটু স্থূলকায় ছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা শীতলাকান্ত সুপুরুষ এবং কর্ম্মী। সেবার (১৯০২) শ্যামাকান্ত বলিয়াছিলেন, "আমার কনিষ্ঠ সহোদর শীতলের হাতের গড়ন ঠিক স্যাণ্ডোর মত"! আমিও সেরূপ দেখিয়াছি। ইনি এখন আমাদের বাসার নিকটেই জনক রোডে থাকেন। এখনও মাংসপেশী খুব শক্ত আছে।

বীর শ্যামাকান্তের কথা মনে করিলে আত্মশ্লাঘার যদি বাঙ্গালী ছেলেরা গৌরব বোধ করেন, আর আত্মরক্ষা দেশরক্ষা স্বজন রক্ষায় শক্তির উপাসক হইতে উদ্বুদ্ধ হন তবেই এই অতীত কাহিনীর জন্য আমার লেখনী সার্থক হইবে, ফলপ্রসূ হইবে আর স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বঙ্গযুবকের অপরিসীম শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।*

* ফটো এবং কিছু কিছু পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে শীতলবাবু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ।
—লেখক।

অমৃতলালের প্রহসন

শ্রীকালিদাস রায়

অমৃতলাল ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাঙালী জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বধর্ম, তাহার মতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী। তাঁহার চোখে যে সকল আচরণ বিসদৃশ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইত, তিনি সেইগুলিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিতেন। এই ব্যঙ্গের বাচিক রসই তাঁহার প্রহসনগুলির প্রধান অঙ্গ। 'সধবার একাদশী'র মত সম্প্রদায়বিশেষ, 'আনন্দবিদায়ে'র মত ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার লক্ষ্য নয়। অসঙ্গত বা বিসদৃশ কতকগুলি আচরণের সমবায়ে তিনি এক একটি চরিত্রের কল্পনা করিতেন—এই চরিত্র একটা বাস্তব চরিত্র নয়, একটা ভাববিগ্রহ মাত্র। পরিহাস্য ও উপহাস্য করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অসঙ্গতিগুলিতে একটু বেশী Emphasis দিতেন। ইহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গেরই প্রাধান্য হইত বলিয়াই তাঁহার প্রহসনগুলি উপভোগ্য হইত এত।

রঙ্গরসের বাক্যগুলি যেন লেখকের রসভাণ্ডারে আগে হইতেই সংগৃহীত থাকিত, লেখক সেইগুলিকে কল্পিত চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাত্রপাত্রীর মুখে বসাইতেন। স্বভাবতঃ রঙ্গরসিকের মুখেও কৌতুকময় বাক্য খুব ঘন ঘন আসে না। লেখক নাট্যোক্তির অল্প পরিসরের মধ্যে সেইরূপ বাক্যাবলী বেশ ঘন করিয়া সাজাইয়া দিতেন—তাহার ফলে হাস্যের উদ্দীপনা শিথিল হইতে পারিত না।

অমৃতলালের প্রহসনগুলি অল্পশিক্ষিত জনসাধারণগণের জন্য নয়। সাধারণতঃ বিজাতীয়-ভাবাপন্ন উচ্চ ইংরাজীশিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গসমাজ (যাহাদের পিতৃভূমি বঙ্গদেশে, মাতৃভূমি লণ্ডনে) ও নানা শ্রেণীর রাজনীতিক সম্প্রদায়ের চিত্রই তিনি অঙ্কন করিয়াছেন এবং ঐ সমাজ ও সম্প্রদায়ের অসঙ্গত আচরণ লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমাজ ও সম্প্রদায়ের চালচলন গতিপ্রকৃতির সহিত পরিচিত নহেন এবং ইংরাজি ভাষার সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষরূপ পরিচয় নাই—এ প্রহসনগুলি তাহাদের উপভোগ্য হয় না। বিজাতীয় সমাজদ্রোহী ও ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযানটা তাহাদের তৃপ্তি দিতে পারে—কিন্তু সাহিত্যের উপভোগ স্বতন্ত্র জিনিস। অমৃতলাল প্রহসনগুলির বাগ্‌বিন্যাসের কুহরে কুহরে যে বাচিক রসের সঞ্চার করিয়াছেন—তাহা উচ্চশিক্ষিত লোকদেরই উপভোগ্য। ইঙ্গবঙ্গসমাজের সম্পর্কে নাট্যকার যেসকল অল্পশিক্ষিত লোকদের অবতারণা করিয়াছেন—তাহাদের মুখে ইংরাজি শব্দের ও বাচনের বিকৃতরূপ ও বিকৃত উচ্চারণ, ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ ও ইডিয়মের ভুল বসাইয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ Malapropism-এর নিদর্শনগুলির মধ্যে যে কৌতুকরস আছে, তাহা উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাই উপভোগ করে—সামান্য ইংরাজি জানিলে সে রস উপভোগ্য হইবে না। ইংরাজি সাহিত্য হইতেও অনেকস্থলে উৎকলন আছে। উৎকলনের ভুলভ্রান্তিও কৌতুকাবহ।

অমৃতলালের ঐ শ্রেণীর চরিত্রগুলি—Executor-কে Exectioner, Minister-কে Monster, Infamous-কে Infections, Bleeding-কে Building, uprightness-কে uprightment, straightforwardness-কে straightforwardity, Imperative duty-কে Interjective duty misappropriation-এর স্থলে misapprobition বলে, Frailty, thy name is woman—Shakespear এর এই লাইনকে O woman Fraternity is thy name, Pay him in his own coin-কে pay him in his own queen বলে। মুচিরামের মুখের কলিকাতা বর্ণনা কৌতুকাবহ—And have you condistanted to confirm the inestimatable grass of honorable hono- of this City of Palaces and Palicies?

This sanititarium of stables and statues? On this town of taxes and taxicabs? Of rates and rats of riches and ditches and rupees and রুপসীজ—এই সমস্তের মধ্যে wit ও humour ও যাহা আছে তাহা সুশিক্ষিত ইংরাজিনবীশদেরই উপভোগ্য। অনেক স্থলে ইংরাজী কথার আক্ষরিক তর্জ্জমার দ্বারাও কৌতুকসৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়।

সেকালের অনেকের ইংরাজি লেকচার ছিল অন্তঃসার শূন্য, কতকগুলি নিরর্থক আনুপ্রাসিক শব্দাড়ম্বরের সমবায় মাত্র। মুখস্থকরা শব্দের ঘনঘটায় বক্তা অল্পশিক্ষিত লোকদের তাক লাগাইয়া দিতে চাহিত। অমৃতলাল তাহাদের ইংরাজি ভাষাকে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

যেমন—Most serious serpentine problem of poetical rapadox. The corinthian cataloub of concoursive concussion.. The future fate of febrile India hangs on the hair of Doomocles.

ইংরাজি নামকরণের মধ্যেও রসিকতা আছে—Swindle Smuggle and Co. Humbug Brothers ইত্যাদি।

অনেক নকল সাহেবের দল বাংলা ভাল জানি না বলিয়া গৌরব করিতেন। তাঁহারা ইংরাজি বাক্যের আক্ষরিক তর্জ্জমা করিয়া বহু কষ্টে বাংলায় ভাবপ্রকাশ করিতেছেন এইরূপ ভাব দেখাইতেন। কোন কোন চরিত্রের মুখে এইরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে। বাবু নাটকে বস্তী লেকচার অভ্যাস করিতেছে—

If I live—if I am permitted to breathe the air of this terestrial globe—if the steam that animates this cosporal mechanism is aot exhausted, if the scarlet fluid called blood flows in my vains, if pulsation remains regular in my radial artery, then I promise you I give you my most solemn assurance, Ladies and Gentlemen, with all the emphasis and command that I will shake the Empire to its very foundation.

ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক নূতন হাস্যোদ্দীপক শব্দরচনায় দৃষ্টান্ত এবং বাংলায় Malapropism এর দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যায়। যেমন—বিদুষীর পুংলিঙ্গে বিদূষক, স্বর্গীয়ের স্থলে স্বর্গীয়ান, যাজ্ঞসেনীর স্থলে যাত্তলজিনী, অনুপ্রাসের স্থলে হনুপ্রয়াস, উচ্চারণের স্থলে পুরশ্চরণ, জবাইয়ের স্থলে জবাধ্যায়।

অল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে অমৃতলাল সংস্কৃত শ্লোকের ভ্রান্ত উৎকলন, একাধিক শ্লোক মিলাইয়া অর্থহীন শ্লোকরচনা, সংস্কৃতের ভ্রান্ত উচ্চারণ, সংস্কৃত শ্লোকাংশের ভুল ব্যাখ্যা (যেমন—স্ত্রীবুদ্ধি দুষ্কুলাদপি—স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দুকুল যায়), গ্রন্থের নামকরণে ভ্রান্তি, অকারণে সংস্কৃত বলিবার প্রয়াস ইত্যাদির দ্বারা রসিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাংলা চলতি কথাকে সংস্কৃত রূপ দিয়াও নাট্যকার কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন—পটোল তোলা, শিঙা ফোঁকা—পটোল উৎপাটনম্, শৃঙ্গ নিনাদনম্।

ভৃত্যের উদ্দেশে হলাহলানন্দ স্বামীর সংস্কৃতে কথা বলার মধ্যেও যথেষ্ট কৌতুক আছে।

সূক্ষ্মধরণের রসিকতাও এমন অনেক স্থলে আছে, যাহা ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু স্বদেশীয় কালচারের অপেক্ষা করে। খাসদখলে একস্থলে কঠোপনিষদ্‌কে Dramatise করার কথা আছে—ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নূতন শব্দ রচনা করার কথা ত আছেই।

মোক্ষদা গিরিবালাকে আলিঙ্গন করিতেছে—কবি মোহিত বলিতেছে—এ যেন কমলে কুমুদে আলিঙ্গন। এক দেহে আমি রবিচন্দ্র নই কেন? এই সকল রসিকতা রবীন্দ্রনাথের রসিকতার মত। এই ধরণের রসিকতা অমৃতলালের রচনায় বহু স্থলে আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের প্রহসনের তুলনায় এইগুলি যথেষ্ট মার্জ্জিত ধরণের এবং সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্টতর।

ইহা ছাড়া অমৃতলাল যে সকল স্থলে কৌতুক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই সর্ব্বজনের উপভোগ্য।

যেমন—কথার মুদ্রাদোষকে অবলম্বন করিয়া রসিকতা। যেমন—খাসদখলের নিতাইএর Is the ব্যবহার। এই Is the ব্যবহার একটু বেশী ঘন ঘন হইয়া গিয়াছে।

দাসদাসীদের মুখে গ্রাম্য ভাষা, নিম্নশ্রেণীর লোকদের অস্বাভাবিক শুদ্ধ ভাষায় কথা বলিবার চেষ্টা, তোৎলার মুখের কথা, হাবা ও খোনার মুখের কথা, বাঙালীর মুখে অশুদ্ধ ইংরাজির মত অশুদ্ধ হিন্দী বুলি, হিন্দুস্থানীর মুখে অশুদ্ধ বাংলা বুলি, মুসলমানের মুখে ফারসি আরবি শব্দে বোঝাই ভাষা—বহুকাল পশ্চিম প্রবাসীর মুখের অদ্ভুত বাংলা আর সব চেয়ে যে চরিত্র প্রকৃতিস্থ যে চরিত্রের মুখে তীব্র শ্লেষ বাক্য ইত্যাদির দ্বারা যে কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সর্ব্বজনের অধিগম্য।

অমৃতলালের প্রহসনের কতকগুলি চরিত্রই থাকে কমিক। তাহাদের আচরণই হাস্যোদ্দীপক। কতকগুলি চরিত্রের রচনভঙ্গীই কৌতুকাবহ। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি কৌতুকরস সৃম্বন্ধে কতকগুলি সচেতন, কতকগুলি সচেতন নয়। যাহারা সচেতন তাহারা পরিহাসরসিকতার জন্যই কৌতুকাবহ কথা বলে। যে সকল টুকরা টুকরা রসিকতা লেখকের বহুদিন হইতে সংগৃহীত থাকে—সেইগুলি তাহাদের ভাষণে বসাইয়া দেওয়া হয়। যে সকল চরিত্র কৌতুক সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন নয়—তাহারা হাসাইবে বলিয়া কথা কয় না—রঙ্গ রসিকতা সৃষ্টি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের বাচনভঙ্গীই স্বভাবত এমন যে তাহা শ্রোতার হাস্য উদ্রেক করে। পল্লীগ্রাম হইতে আগত দাসদাসীর কথা, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের কথা, উড়িয়া পাচক ও চাকর, তোৎলা, খোনা ইত্যাদির কথা এই শ্রেণীতে পড়ে।

অমৃতলালের প্রহসনের গানগুলি সুরচিত এবং রঙ্গরসে ভরা। এই গানগুলিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মত অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত মিলের আমদানি করিয়াও হাস্যরসের উদ্দীপন করিয়াছেন। দুইজনের বাক্যবিনিময়ের মধ্যে মিল দিয়া কথা বলাও এক প্রকার রসিকতা।

যেমন—প্রকাশ—১৩৩এর C. D. F.,

ব্যাঙ্ক বইয়ে বোঝাই ব্যারিষ্টারের সেফ,

সারদা—সারারাত তোমার মেসোর মতন

পোষ মাসেতে পাখা যোরে মুড়ি দিয়ে লেপ।

অমৃতলালের ব্যঙ্গরসিকতার বিষয়বস্তু যাহা কিছু অসঙ্গত, বিসদৃশ, অপ্রকৃতিস্থ; যাহা কিছু ন্যাকামি, ভণ্ডামি এবং বানরবৎ পরের অন্ধ অনুসরণ। অসঙ্গত বলিতে বুঝিতে হইবে—নাট্যকারের মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বজাতিভক্ত, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পক্ষপাতী, খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থের চোখে যাহা অসঙ্গত ঠেকিয়াছে তাহাই।

অমৃতলালের ব্যঙ্গের পাত্র—অতিরিক্ত স্ত্রৈণ স্বামী, স্বার্থান্বেষী দেশনেতা, তথাকথিত সমাজ সংস্কারকের দল। ভণ্ড ব্রাহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তি, অর্থলোভী অল্পবিদ্য শঠ চিকিৎসক, সাহেবিয়ানার ভক্ত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। সদাচারভ্রষ্টা বিলাসিনী ইংরাজিশিক্ষিতা মহিলা, স্বপ্নবিলাসী অক্ষম কবি সাহিত্যিক, ব্যসনাসক্ত সমাজদ্রোহী যুবক, লম্বশাট-পটাবৃত মূর্খ, ভোটভিখারীর দল। লেখক পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছেন—ইংরাজি শিক্ষায় দোষ নাই, কিন্তু ইংরাজের পদলেহন করিও না, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না। নারীগণকে শিক্ষিতা কর, কিন্তু নারীকে হিন্দুনারীর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিও না। দেশ উদ্ধার করিতে পার কর, আগে নিজের গ্রাম অন্ততঃ নিজের পরিবারকে বাঁচাও। পতিতের উদ্ধার করিবে কর, কিন্তু উন্নতকে অযথা নামাইও না। সমাজসংস্কারের নামে যাহা প্রচার করিতেছ—নিজে তদনুসারে আগে চল, ভণ্ডামী করিও না। দেশের বিধবা ভগিনীদের জন্য ভগিনীপতির অন্বেষণ করিবে কর, কিন্তু নিজের কুমারী ভগিনীর বিবাহের চেষ্টা আগে কর এবং যে সধবা ভগিনীও পতি থাকিতে বিধবার মত—তাহার উপায় কর। খদ্দর পরিবে পর, কিন্তু খদ্দরের মান রাখিও। ডাক্তার হইয়া কী বাড়াইবে বাড়াও, কিন্তু রোগীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। ঠাকুর দেবতাকে না মানা না-ই মানিবে—তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি নাই—কিন্তু স্ত্রী, উপস্ত্রী, গাড়ী, বাড়ী, ব্যাঙ্ক ও সাহেবদের ঠাকুর দেবতা বানাইয়া পূজা করিও না।

অমৃতলাল কেবল ইংরাজি শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি লোকদেরই ব্যঙ্গ করেন নাই—সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবের লোকদের অসঙ্গত আচরণকেও অব্যাহতি দেন নাই। খাসদখলে পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিরাজ, বিবাহবিভ্রাটে ঘটক, অবতারে অর্থলোভী ভোজনলুব্ধ কপট স্বামীজি এবং একাধিক নাটকে পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতরাও তাঁহার

ব্যঙ্গের পাত্র হইয়াছে। ইহাদের প্রসঙ্গে রসিকতার মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

প্রায় প্রত্যেক নাটকে একটি করিয়া প্রকৃতিস্থ চরিত্র থাকে—সে গম্ভীর ভাবে অসঙ্গতির শাসন করে না—সে অসঙ্গতিগুলির রস উপভোগ করে। সে যেন নাটকের ভিতরকার দ্রষ্টা। অর্থাৎ নাট্যকার নিজে ঐ চরিত্রের অন্তরালে বাস করেন।

অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে সমাজসংস্কারের প্রয়াস কোথাও উৎকট হয় নাই—সামাজিক অসঙ্গতি, ভণ্ডামি, ইতরতা লইয়া রঙ্গব্যঙ্গের সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা নির্ম্মল আমোদপরিবেশ ছাড়া প্রহসনগুলির অন্য উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

অমৃতলালের কৌতুকনাট্যগুলি সবই ক্রমবিবর্ত্তনশীল নাগরিক সমাজ লইয়া রচিত। ইহাই তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের লক্ষ্য। বিবাহবিভ্রাটের উপজীব্য নাগরিক সমাজের পণপ্রথা। ইহাতে পণপ্রথার কুফল দেখানো নয়, পণমূলক বিবাহের একটা চিত্র দেখানো হইয়াছে। ইহা ঠিক সমাজসংস্কারমূলক নাটক নয়। বিবর্ত্তনের যুগে পিতা পুত্রের মধ্যে আদর্শের দূর ব্যবধান ঘটিয়া যাইতেছে ইহাতে তাহাই দেখানো হইতেছে। সে হিসাবে নাটকখানির মূল্যবত্তা এখনো সমানই আছে। ঐ সমস্যা বরং আরও বেশি ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে।

বিদুষী মহিলার চিত্রটি ইহাতে গর্ভাঙ্কস্বরূপ আসিয়াছে। ইহাকে হাস্যোদ্দীপক করিবার জন্য একটু বেশি Emphasis দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে এই চিত্রটির অবশ্য আর মূল্য নাই। এখন নাগরিক সমাজে ঘরে-ঘরে গ্রাজুয়েট নারী। বিলাসিনী কারকর্ম্মার চিত্র এখন আর অসঙ্গতির সৃষ্টি করে না। একাকার নাটকখানি জীবিকা সমস্যা ও জাতিগত ঘেষাঘেষি লইয়া রচিত। নাট্যকার জাতিবৈষম্যকে মানিয়া লইয়া জাতিগত বৃত্তি অনুসরণকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। কর্ম্মকার পুত্র রাধানাথ বলিতেছে—"এই গ্রামার ছেড়ে হামার ধরেই ভাই সাম্য ভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধার প্রবৃত্ত হয়েছি। ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের উমেদারি করতে গিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাশীর খিঁচুনি খেয়ে এসেছি। এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু' পাঁচজন দরওয়ান…কর্ত্তে আসে।" অবশ্য নাটকখানির পক্ষে ইহাই বড় কথা নয়। বিষয়বস্তু যাহাই হউক, ইহাতে প্রচুর রসসৃষ্টি হইয়াছে। গঙ্গার ঘাটে কলু বৌ ও ধোপা বৌ-এর বক্রোক্তিমূলক রসকলহটি বড়ই উপভোগ্য। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যাদব ও রাধানাথের কথোপকথন জীবিকা সমস্যা সম্বন্ধে একটি সুরচিত প্রবন্ধ। নাট্যকারের নিজস্ব অভিমত রাধানাথের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে।

সরকারী অফিসের দরজায় দৃশ্য ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের দৃশ্যও উপভোগ্য। সাহেবি আমলের কেরাণী জীবনটি সরসভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জাতি লইয়া ইহাতে এত বেশি বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান যুগে ইহার মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। কালাপানির মত কৌতুক নাট্যের মূল্য আরও কমিয়া গিয়াছে।

অমৃতলালের বাবু নামক কৌতুকনাটকটির একসময়ে খুবই আদর ছিল। এই নাটকে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব খুব স্পষ্ট। নাট্যকার তাঁহার সময়ে যেগুলিকে আমাদের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে অসঙ্গত আচরণ মনে করিয়াছিলেন—এইগুলিকে লইয়া ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়াছেন। রসিকতাসৃষ্টির জন্য অনাচারগুলিতে একটু বেশিমাত্রায় Emphasis দিয়াছেন—তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ খুব তীক্ষ্ণ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক Emphasis সত্ত্বেও সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। এই গর্ভাঙ্কে গর্ভধারিণীও সন্তানের বাগ্‌বিনিময়ের মধ্যে আবেদনের চিরন্তনতা আছে। অন্যান্য অংশগুলিতে সর্ব্বজনীন আবেদন নাই—যে সময়ের চিত্র সেই সময়েই উহার আবেদন পরিচ্ছিন্ন।

অমৃতলাল সমাজদ্রোহীদের সাধারণতঃ হিন্দুসমাজের নিম্নজাতীয় লোক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সত্য আছে। লেখাপড়া শিখিলেও নিম্নজাতীয় লোকেরা হিন্দুসমাজে জাতিজন্মের জন্য উপেক্ষিত হইত। সেজন্য তাহারা সমাজ ত্যাগ করিবার জন্য উৎসাহিত

হইত। ইহা কল্পনামাত্র নয়। হিন্দুসমাজের এই অবিচারের জন্য নিম্নজাতীয় লোকেরা নাট্যকারের সহানুভূতি পায় নাই, তাহারা নাট্যকারের ব্যঙ্গের পাত্রই থাকিয়া গিয়াছে। এখন দিনকালের বদল হইয়াছে। এখন তাহাদের লইয়া সহানুভূতিশূন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর উপভোগ্য হয় না।

অমৃতলালের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে ভারত উদ্ধার বা দেশের স্বাধীনতা লাভ একটা শশবিষাণবৎ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত—তখনকার তথাকথিত দেশ-ভক্তদেরও অকপটতা ও চরিত্রদৃঢ়তা ছিল না। সেজন্য অমৃতলাল যে তাহাদের লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বার্দ্ধক্যে দেশভক্তদের অন্যরূপ দেখিয়া গিয়াছেন—ভারতের স্বাধীনতাও শেষপর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাঁহার কৌতুক নাট্যগুলি সেকালের দেশসেবার ঐতিহাসিক উপাদান কিছু যোগাইলেও বর্ত্তমান যুগ সেগুলিকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিবৈষম্য, বিধবাবিবাহ ইত্যাদির চিত্রে একটু বেশিমাত্রায় রঙ চড়াইয়া বিসদৃশতার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই সেগুলি এখনো উপভোগ্য হইয়া আছে—নতুবা সেগুলিও এযুগে অচল হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অমৃতলালের কৌতুক-নাট্যগুলি নগরের ইংরাজি শিক্ষিত লোকদের জন্য এবং ইংরাজি শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি সমাজকে লইয়া ব্যঙ্গ করিবার জন্য রচিত। লেখক দাসদাসীরূপে নিম্নশ্রেণীর নরনারীর চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের মুখের ভাষা যথাযথই রাখিয়াছেন—তাহাতে অভিনব কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা ছাড়া, তাহাদের দ্বারা আর এক প্রকারের কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারা মনিবের সকল দোষত্রুটি গ্লানিকলঙ্ক নির্ব্বুদ্ধিতার ছন্দে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিতেছে—মনিব যাহা কিছু গোপনে রাখিতে চায় তাহাদের অশিক্ষা ও মুখরতার জন্য কিছুই গোপন থাকিতেছে না। তাহারা মনিবের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার সাক্ষী—কাজেই তাহারা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া প্রভুভক্ত নয়; নাট্যকার তাহাদের সারল্য ও মূঢ়তার আবরণে তাহাদের মুখে মনিবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য, তিরস্কার ও শ্লেষব্যঙ্গ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। অথচ তাহারা এ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন—এতদ্দ্বারা চমৎকার কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে।

অমৃতলাল নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষার এমন চমৎকার নিদর্শন দিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনচিত্রকে চমৎকার নাট্যরূপ দিতে পারিতেন। কিন্তু নিজে রঙ্গমঞ্চের লোক ও অভিনেতা ছিলেন বলিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হ'ন নাই, কেবল নাট্যলেখক হইলে কথা ছিল না। ইহাতে সমস্ত নাটকখানিতে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা বসাইতে হইত, তাহা নগরের শ্রোতাদের উপভোগ্য হইত না তাহা ছাড়া, ভদ্রশিক্ষিত লোকদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর নরনারীর অভিনয় দেখানো তেমন চিত্তাকর্ষকও হইতনা, নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই রঙ্গমঞ্চে স্থান দিতে পারিলে তাহা সম্ভব হইত। তাহাদের লইয়া প্রহসন রচনা ত চলেই নাই—তাহারা দুঃখী কাঙাল, তাহাদের জীবন লইয়া হাস্যপরিহাস করা যায় না, বিজন ভট্টাচার্য্যের নবান্নের মত নাটক লেখা যায়। দীনদুঃখীদের দাবী লইয়া নাটক লেখার কথা গিরিশচন্দ্রেরও মাথায় আসে নাই। অমৃত লালের দরদীদৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের মতই নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর নীচে নামে নাই।

অমৃত লালের ভাষায় অসাধারণ অধিকার আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দেয়। সর্ব্বোচ্চশিক্ষিত পুরুষ হইতে চাষার পর্য্যন্ত, উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাসারী পিসী পর্য্যন্ত যাহার মুখের ভাষা যেমনটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নাট্যকার ঠিক তেমনটিই বসাইয়াছেন। নাট্য-কারের রঙ্গব্যঙ্গের ক্ষেত্র কলিকাতা নগরী। কলিকাতা cosmopolitan city, এখানে সকল জাতির সকল প্রদেশের সকল জেলার লোকের সমবায়। নাট্যকার সকল শ্রেণীর লোককেই তাঁহার নাটকে স্থান দিয়াছেন কোন-না-কোন প্রসঙ্গে। যাহারা নাটকে কথা বলিবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা পথ দিয়া নিজেদের ভাষায় গান গাহিয়া গিয়াছে। সকল প্রকার সকল ভঙ্গীর ভাষায় কেবল অধিকার নয়, ঐ সকল ভাষায় রঙ্গব্যঙ্গের সৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভারই নিদর্শন।

জোঁক

সুরুচি সেনগুপ্তা

নায়িকাকে নিয়েই একটু মুস্কিলে পড়া গেছে। সর্ব্ব প্রথমেই নায়িকার চাই পূর্ণ যৌবন, তার উপর চাই তিল-ফুল-জিনি নাসা, বিম্বফল তুল্য ওষ্ঠাধর, পটল-খণ্ডিত-নয়ন, মৃণাল-নিন্দিত ভুজযুগল আর নব-জলধর সদৃশ চিকুর গুচ্ছ! নায়িকা হবে গজগামিনী বিলোল-হাসিনী, মিহি-ভাষিণী অভিমানিনী, স্বপন-চারিণী তরঙ্গিনী। নৃত্য সঙ্গীত আর অভিমান অশ্রুপাত হবে নায়িকার একচেটিয়া সম্পত্তি! কিন্তু এ গল্পের নায়িকার রূপ আর গুণ বর্ণনায় ওসব উপমার স্থান নেই। সে এগারো বছরের সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ে, যুবতী নয়, কিশোরী! সেতার হাতে সে শরণিতে চলাচল করে না, একবোঝা বাসন নিয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধ'রে মাজতে যায় ঘাটে। কলেজী খোঁপা বেঁধে সে কলেজে যায়-না, তার মায়ের হাতের খোঁপার এমনি বজ্র আঁটুনি যে, সে উচ্চ বলিষ্ঠ খোঁপার কণ্টকাকীর্ণ অঙ্গ থেকে একগাছি চূর্ণ কুন্তলও দখিনা হাওয়ায় স্খলিত হয়ে তার ললাটের উপর লটপট্ করবার সুযোগ পায় না। বাতাসে তার শিথিল অঞ্চল চঞ্চল হয় না, দোলে নাকের নোলক; হাঁটতে পায়ের চপ্‌পল চট্‌পট করেনা, পায়ের মল বাজে ঝম্ ঝম্ ক'রে। কম্যুনিষ্টদের সভায় মেয়েটি বক্তৃতা করেনা, মাঝে মাঝে ভাই বোনের সঙ্গে কলহ করে, দেশ সেবার কোন নেশা তার নেই, মা, বাপ ভাই বোনদের সেবা করে প্রাণপণ ক'রে। তাদের বাড়ীর আনাচে কানাচেও আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগেনি, তাই লিলি, ডলি, শিপ্রা, সাহানা, পূরবী, করবী এই সব নামের পরিবর্ত্তে তার নাম হ'য়েছে কালীদুর্গা। সকলে তাকে 'কালী' ব'লে ডাকে। এ, হেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের নায়িকা নিয়ে আধুনিক কালের গল্প লেখা—

যাক্ সে কথা—

কিন্তু কালীদুর্গা আমাদের একেবারে হতাশ করেনি; একটা গুণেই তার সাত খুন মাপ হয়ে যেতে পারে। এই বয়সেই সে প্রেমে পড়েছে।

যখন তার বয়স দশ কি এগারো হবে, ডুরে শাড়ীর আঁচলখানা কোমরে জড়িয়ে যখন সে কুল, পেয়ারা, জাম আর জামরুল গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে কাঁচা পাকা নির্ব্বিশেষে ফল সংগ্রহ ক'রে তার তরুণ ও বলিষ্ঠ দন্তপুট দ্বারা ছেদন ও চর্ব্বণপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করত, সেই সময় মৈনাক নামধারী গ্রামের একজন পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোরের সঙ্গে সে প্রেমে পড়ল।

এই প্রেমাস্পদটী তখন গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ত আর বিধবা মায়ের চোখ এড়িয়ে সর্ব্বপ্রকার নাটক নভেল গলাধঃকরণ ক'রে প্রেম সম্বন্ধে বেশ অবহিত হ'য়ে উঠেছিল।

কিছুদিন প্রেমচর্চ্চার পরেই ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মৈনাক কলকাতায় এলো কলেজে পড়তে। সেখানে কলেজে-পড়া অসংখ্য মুখরা, প্রখরা, বিধুরা, মধুরা, রঙ্গিণী সঙ্গিনীদের সাহচর্য্যের সুযোগ লাভ ক'রে তার চিত্ত গ্রামের সেই পুঁচকে মেয়েটার প্রতি একান্তই বিমুখ হ'য়ে উঠল। তার নাবালককালের সেই প্রেমকে নিছক ছেলেখেলা ভেবে সেদিকে সে নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কালীর সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে গ্রামে যাওয়া সে ছেড়েই দিল একেবারে। দু'বছর পরে সে আই, এ, পাশ করে। এখন কালীর প্রতি ভাব আর ভীতি দুই-ই তার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। কালো একটা শ্রীহীনা গ্রামের মেয়ে, তাকে একদিন ভালো লেগেছিল ব'লে নিজের রসবোধের উপরেও তার অশ্রদ্ধা এসে যায়। কালীরও কোনো সাড়াশব্দ নেই; মনে মনে হাসে মৈনাক, একে মেয়েজাত, তাতে গেঁয়ো ভূত, তাদের আবার প্রেম।

মৈনাকের মেধা ভালো ছিল, ইউনিভারসিটির সিঁড়িগুলো সহজেই অতিক্রম ক'রে গেল সে, আর তার চেয়েও সহজে একটা ভালো চাকুরী পেয়ে গেল। মনের মধ্যে তখন রোমান্স নতুন ক'রে সুড়্সুড়ি দিতে সুরু করেছে, ঘটকের আনাগোনা নিয়মিত হ'য়ে এসেছে। সত্ত প্রসূত মধুমাস অতিক্রান্ত হবার আগেই তার জীবনের বাঞ্ছিত মধুলগ্নের আবির্ভাব হবে এবিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না; এই সময় একখানা চিঠি তার হস্তগত হ'ল। চিঠি বল্লে অতিশয়োক্তি হয়, অসংখ্য বানান ভুল, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা ময়লা একখানি কাগজ।

কালী লিখেছে—

তার দশমবর্ষীয় প্রেমকে সে ভোলেনি। ভগবানকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার ইহ-পরকালের সমস্ত বোঝা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মৈনাকের বলিষ্ঠ স্কন্ধে আরোপিত করবার দাবী জানিয়েছে সে।

এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

খেটেপিটে বি, এ ডিগ্রি করায়ত্ত ক'রে ভালো চাকুরী পেয়েছে, মাসের পয়লায় গোছাভরা নোটের স্পর্শ কুমারীর প্রথম স্পর্শের মত তার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, ঘটকের আশাভরা মধুর বাণী জীবনটাকে স্বপ্ন কুহকময় ক'রে তুলেছে—মেয়েটির নাম অঞ্জনা, খঞ্জন পক্ষীর মত তার গতি-ভঙ্গি।

অকস্মাৎ—

কালো বেঁটে একটা মেয়ে, 'মা কালীর বাচ্চা' ছাড়া যার অন্ত উপমা নেই, বিত্তের দৌড় যার 'কথামালা' পর্য্যন্ত, শিল্পকলা আটুকে আছে ঐ কাঁথা সেলাই আর শিকে পাকানোর মধ্যে, না জানে ছলাকলা, না জানে বাক্য-বিন্যাস; না জানে কবিতা, না জানে সঙ্গীত। সেই মেয়ে—

কাগজখানাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে মৈনাক, টুকরোগুলো অভিমান ক'রে বাতাসে কেঁপে কেঁপে দূরে সরে যায়। দুঃসাহসিকাকে চূড়ান্ত শাসন করা হ'য়েছে ভেবে মৈনাক স্বস্তি আর সান্ত্বনা লাভ করে। যে প্রেম এতদিন নাকডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল, ভালো চাকুরীর খবর পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে সে আজ জেগে উঠেছে। এ টাকার প্রেম, প্রাণের নয়। গ্রামের একটা মূর্খ মেয়ে, 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়েনি, 'বিষবৃক্ষ' চোখেও দেখেনি, 'রোমিও-জুলিয়েটের' নাম পর্য্যন্ত শোনেনি, প্রেমের সে জানবে কি?

দূরে গিয়ে কাগজের টুকরোগুলো তখন ভূমি আশ্রয় ক'রেছে।

আপদ গেল।

কিন্তু যায়নি—

ছুটির দিন; আকাশের ঘোলাটে চোখ থেকে ছিঁচ্কাঁদুনে মেয়ের মত ঝির্ ঝির্ করে জল ঝরছে। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ, উঠবার তাড়া ছিল না ব'লে মৈনাক বিছানায় পড়ে গড়াচ্ছিল। হঠাৎ চোখ খুলে দেখে দরোজার ফাঁকে আধময়লা একখানা আঁচল উড়ছে। আঁচল থাকলে শাড়ী আছে, শাড়ী থাক্লে শাড়ীর অধিকারিণী—

রোমান্স—

টপ ক'রে উঠে বসে মৈনাক—'কে'?

টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ, ভিজে বাতাসে নির্ব্বাক আঁচলখানা তেমনি কাঁপছে।

'কে?'

'আমি' বলেই ঘরে ঢোকে একটি মেয়ে, তরুণী, হ্যাঁ তরুণীই বটে—

ছুটির দিনে বৃষ্টি-সজল প্রভাতের ভিজে মাটির গন্ধ, বাদল-ধারার অস্ফুট গুণগুণানি যেন কোন্ বিরহিণী বধূর অস্ফুট আক্ষেপ; অকাল-মেঘের দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠ।

এমনি একটা মোহময় মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকল অতি সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ে। তার না আছে রূপের ঠমক, না আছে প্রসাধনের চমক।

গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীর অপরিচ্ছন্ন বন্ধুর তটভূমিতে বসে, সন্ধ্যার পিঙ্গলবর্ণ খণ্ডিত চাঁদকে সাক্ষী ক'রে একদা মৈনাক যে মেয়েটীর কাণে কাণে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' ঘরে ঢুকেছে সেই মেয়েটি।

'কে কালী?' দায় সারা ভাবে বলে মৈনাক।

নতনেত্রে দাঁড়িয়ে সে শাড়ীর খুট পাকায়; তির্য্যক দৃষ্টিতে মৈনাক তার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে; সেই কিশোরী

মেয়েটীর পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুলের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে। টইটম্বুর হয়ে উঠেছে মেয়েটি! কিন্তু তাতে উচ্ছলতা নেই, আছে সাগরগর্ভের মত শান্ত-গভীরতা। এই বয়সে যে মেয়ের চোখের কোণে একটু চপল ইসারা নেই, ঠোঁটের কোণে চটুল হাসি নেই, আবেগ নেই, প্রবাহ নেই, তার নিরর্থক যৌবনকে ধিক্কার দিল মৈনাক। এই মেয়ের প্রেমে পড়েছিল সে কোন আশায়? ছেলেবেলাতেই কি তাকে ভীমরতিতে ধরেছিল নাকি?

'করে এলে?' তবু ভদ্রতার খাতিরে বলে; 'কেন এলে?' বলতে গিয়েও সে থেমে যায়।

'বোসো'। তাও বলতে হয় অবশেষে।

মেয়েটী বসে না, দাঁড়িয়ে থেকেই যা লাভ কি? ছুটির এমন সকালটাই মাটি!

মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়ায় মৈনাক; কথা খুঁজে না পেয়ে রীতিমত অসহায় মনে করে নিজেকে। কয়েক বছর আগে যার সঙ্গে আবোল তাবোল কথার অন্ত ছিল না, অত্যন্ত তুচ্ছ কথা; যার না ছিল অর্থ, না ছিল সঙ্গতি না ছিল প্রয়োজন। মনে হ'লে হাসিও পায়, দুঃখও হয় যে, এখন বলবার মত একটা কথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘরের মধ্যে ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ করে। ঐ ছোট্ট টিক্ টিক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়, সেই কথা বলাই হয়তো তার উদ্দেশ্য।

অবশেষে মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। সে চোখে বিদ্যুৎ কটাক্ষ নেই, আছে ভীতি আর মিনতি।

যাক্—মৈনাকের দুর্ভাবনা দূর হল; গ্রামের একটা হাবা-গোবা মেয়ে, না জানে গুছিয়ে কথা বলতে, না জানে ইঙ্গিত ইসারা করতে। একে দেখে ভয় পাবার কি আছে? চাঙ্গা হয়ে উঠবার চেষ্টা করে মৈনাক।

'আমার চিঠি পেয়েছিলে?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

মৈনাকের মনে পড়ে চিঠির অংশগুলো কেঁপে কেঁপে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে।

'জবাব দাওনি যে!' আবার প্রশ্ন।

কণ্ঠের কাঠিন্যে চমকে ওঠে মৈনাক। 'জবাব? তা—তা—

'জবাব না পেয়ে জবাব নিতে এসেছি।'

'কিসের জবাব?' অজ্ঞতার অভিনয় করে মৈনাক, যেন জবাব দেবার মত কোনো দিনই কিছু ঘটেনি।

মেয়েটী স্থির কণ্ঠে বলে, 'তুমি কি আগের দিনের কথা ভুলে গেছ?'

বিচারকের মত প্রশ্ন শুনে মৈনাক নিজেকে একটু বিব্রত বোধ করে।

'শুনলাম তুমি বিয়ে ক'রছ? তবে ভুলে গেছ সব'। নিদাঘ মধ্যাহ্নের মত কণ্ঠে তীব্রতা।

যে ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে, তার উল্লেখ মাত্র হয়নি, সে ঘটনা যে মনে নেই, সে তো ধ'রেই নেওয়া যায়। এইটুকু বুঝবার মত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নেই গ্রামের মেয়েদের!

মুখের উপর এক জোড়া চোখের দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব ক'রে মৈনাকের সমস্ত সাহস নিভে যায়, বুকের ভিতর কেমন যেন ধুক্ ধুক্ করে।

কি দুর্বল যে প্রাণে, নিশ্বাস ফেলে কালী বলে, 'কিন্তু আমি তো আর কাউকেই বিয়ে করতে পারব না—'

না পারলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে, বিংশ শতাব্দীতে কি কুমারী মেয়ের অভাব আছে নাকি?

কিন্তু ভয়ে ভোলবার নয়—আবার বলে, 'সত্যি কি তুমি সব ভুলে গেছ?'

এবার তার কণ্ঠ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মনভোলাতে না দিয়ে কঠিন স্বরে মৈনাক বলে, 'ভুলে গেলেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কি? সত্যি একথা উচ্চারণ ক'রতে পারলে তুমি? ক্ষতির পরিমাণ তুমি বুঝবে না, কারণ তুমি পুরুষ, মেয়েদের নিয়ে খেলা করাই তোমাদের স্বভাব।'

কথাগুলো নিতান্ত হাবা গোবা মেয়ের মত নয়—প্রতিপক্ষের দৃঢ়তা অনুভব করে রীতিমত ভড়কে যায় মৈনাক। ক্ষণে ভয় দিয়ে মেয়ে দুটি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে।

তবু শেষ চেষ্টা করে সে, 'সে কি নিতান্তই ছেলেখেলা নয়?'

—'তোমার কাছে ছেলেখেলা হ'তে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী সাক্ষী, আমার জীবনে সে-ইই যথার্থ সত্য।'

যে মেয়ের বিছে 'কথামালা' পর্য্যন্ত, তার ভাষার ভণিতা শুনে গা' জ্বলে যায়। মৈনাকের মনের মধ্যে অনেক কটু কথা ভীড় করে, কিন্তু তার বাক্‌যন্ত্র নিশ্চল হ'য়ে পড়ে।

—'এমন ক'রে একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করবার কি অধিকার ছিল তোমার?'

মৈনাক যা ভেবেছিল তা নয়, বেশ সওয়াল জবাব করতে শিখেছে তো? কালীর কণ্ঠ আবার কান্নায় কেঁপে কেঁপে ওঠে।— 'কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যে কথা ব'লে ভয় দেখাচ্ছ। যে আধখানা চাঁদ সাক্ষী ক'রে তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে, সে চাঁদ তো আজও উদয় হয়, সর্ব্বময় ভগবানও তো সাক্ষী আছেন। বল, বল, যা বলেছ, সব মিথ্যে?'

ভগবানের সাক্ষ্য পর্য্যন্ত যখন অটুট রয়েছে তখন ভরসার আর কি আছে? ঠাণ্ডার দিনেও ঘেমে ওঠে মৈনাক। সহরের মেয়ের উগ্র প্রেম প্রায়ই ধোপে টেঁকে না, কিন্তু গ্রামের মেয়ের ভীরু নির্ব্বাক নিস্তরঙ্গ প্রেম যেন কাঁঠালের আঠার মত জড়িয়ে থাকে, এ কথা মৈনাক আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে।

মৈনাক বিয়ে করল; অঞ্জনাকে নয়, কালীদুর্গাকে

ভরপুর সংসার।

এখনো সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠে, দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মৈনাকের।

কৃতজ্ঞতায় না কৃতঘ্নতায় কে জানে?

তোমায় আমি ডাক দিয়েছি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমায় আমি ডাক দিয়েছি
সারা জীবন গানে গানে,
দ্বারে দ্বারে ঘর ফিরেছি
শুধিয়ে গেছি কানে কানে।
গান গেয়েছি—কোথায় তুমি
সে কোন স্বর্গ সে কোন ভূমি।
গানে আমার সেই বেদনার
বাণী তাহার কে না জানে।
কোথায় তুমি তুমি কোথায়
এই মরতে, সেই অমরায়—
তীর্থ পথের ধূলায় ধূলায়
তীর্থ পথিক যায় যেখানে?

গোপন পথে খেয়াল মতে
গিয়েছিলাম অন্ধকারে,
হায়রে আশা! হায় দুরাশা!
যায় কি পাওয়া হঠাৎ তারে?
অন্ধকারে ধ্রুবতারা
নির্নিমেষে দেয় পাহারা,
রাত পোহানো ভোরের তারা
অন্ধকারের পরপারে।
শুক গগনের আগমনী
গেয়ে ওঠে ভোরের পাখী,
অরুণ হ'ল হায় অমনি
প্রভাত রাঙা স্বর্ণ মাখি;
কণ্ঠে আমার আনন্দে প্রাণ
আকণ্ঠ গান ভরায় তানে।

ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্বপ্রগতি

আজহার উদ্দিন খাঁন

সংস্কৃতির বিকাশ—জ্ঞানসাধনা

জ্ঞানসাধনাই হচ্ছে ইসলামের সর্ব্বপ্রধান বাণী। কোরাণের সর্ব্বপ্রথম বাণী হচ্ছে: "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত মানব ওঠ, জাগো।" (সুরা মুজাস্সির) হজরত মহম্মদও বলেছেন:

"জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।"

"এক মুহূর্তের জ্ঞান-চিন্তা সহস্ররজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।"

"জ্ঞান-সাধনার জন্ত যে ঘরের বাহির হয়, সে আল্লার পথে চলে।"

"জ্ঞানানুসন্ধানের জন্তে যদি সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত যেতে হয় যাও।"

"প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা ফারজ।"

আরবদের জ্ঞান সাধনায় স্পৃহা ছিল অদম্য। কিন্তু প্রথম প্রথম তারা প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিল। কোরাণ ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তক তারা পড়ত না; তারা ভাবত কোরাণ ছাড়া অন্ত কোন জ্ঞানের বই নেই। যখন তারা বিভিন্ন দেশ জয় করতে আরম্ভ করল, তখন সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এর ফলে তাদের পূর্ব্বধারণা লুপ্ত হয়ে গেল। মরুভূমির বিজেতা আরবেরা শুধু ইহুদী-খৃষ্টান ধর্ম্ম নয়, নানাজাতির সম্পর্কে এল, গ্রীক, রোম সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সুসভ্য পৌর জীবনযাত্রার সৌন্দর্য্য দেখতে পেল, সহরে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ পেল। এসব সহর সভ্যতার মারফতে পেল ইরাণী ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার দান, ভারতীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের খোঁজ পেল সেদিন সে। নানা জাতি ও নানাদেশের সংস্পর্শে এসে সংগ্রামী ইসলাম আর উগ্র রইল না, অনেকটা পরমত-সহিষ্ণু হয়ে উঠল। পূর্ব্বে তাতার থেকে পশ্চিমে স্পেন পর্য্যন্ত যখন বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হল, তখন থেকে তারা নতুন পথ-ঘাট, প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও নতুন বিজয়ের উপযোগী রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতিও প্রণয়ন করতে সুরু করে দিল। এভাবে কালচারের তাগিদে রিলিজন ক্রমশঃ হটিতে থাকে, সে তার নিয়ম-কানুন সংশোধন করতে থাকে। ওমাইয়াদ বংশীয় খলিফারা আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন দামাস্কাসে। এই দামাস্কাস ৬৬১ খৃঃ থেকে ৭৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত আরবী কালচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এর পর ৭৬২ খৃঃ আরব খলিফা আল মনসুরের আমলে বাগদাদে আরবী রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বাগদাদ থেকে আরবী সভ্যতার আর এক জীবন আরম্ভ হয়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে অষ্টম শতাব্দীতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্তে বিশাল অখণ্ড সাম্রাজ্য দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ রইল আর পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হোল স্পেনের অন্তর্গত কর্ডোবা। প্রায় আটাশ বছর ধরে স্পেন সমগ্র ইউরোপে শিক্ষা ও সভ্যতার বাণী প্রচার করে। নানারূপ কলাবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই সময় এখানকার মুসলমানরা আশাতীত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হতে তখন এ খানে দলে দলে শিক্ষার্থীর সমাগম হত। সে সময় এখানে প্রায় ৭টি পাঠাগার ছিল। গোয়াডিলকুইভার, গোয়াডিয়ালা ও দারো নদীর তীরে অল্পদিনের মধ্যে অগণিত হর্ম্ম্যমণ্ডিত নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। ভুবনমোহন আলহামরা তারাই প্রতিষ্ঠা করে। কার্ডোবা নগরের ধনীব্যক্তিদের ৫০০০ হাজার সুনির্মিত হর্ম্ম্য ছিল। সাধারণ লোকের লক্ষাধিক আবাস গৃহ ছিল। ৭৫০টি মসজিদ এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের

অন্ত ৯০০ শত স্নানাগার ছিল। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবদার রহমানের সময়ে যে মসজিদ নির্ম্মিত হয়েছিল সেটি সমগ্র ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মন্দির বলে স্বীকৃত। এই মসজিদটি বহু প্রসারিত খিলানে নির্ম্মিত এবং ১২৯৩টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ পথিকদের লুব্ধ দৃষ্টি এখনও আকর্ষণ করে। রাত্রিকালে উপাসনার সময়ে অনেক আলো জ্বলত। কেন্দ্র স্থলে যে মোমের বাতিটি দিবারাত্রি জ্বলত তার ওজন ছিল ২৫ সের। কর্ডোবার উপকণ্ঠে একটি নগর বসিয়ে তৃতীয় আব্দর রহমান তদীয় পত্নী এল্‌ জাহারের নামাঙ্কিত করে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন তা দেখে এখনও লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়। প্রাসাদের প্রবেশ দ্বার ছিল ১৫০০০ হাজার। প্রাসাদের মাঝখানে একটি পারদের সরোবর ছিল। গৃহের উজ্জ্বল মণিমুক্তা যখন তার ওপর প্রতিফলিত হত তখন প্রাসাদটিকে আরও সুন্দর করে তুলত। প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন,—

"Whatsoever makes a kingdom great and prosperous, whatsoever tends to refinement and civilisation was found in Moslem Spain."

(Moors in Spain)

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ইসলামের আবির্ভাব কালে জগতে অন্ধকারময় যুগ চলছিল। গ্রীক, রোম, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে সভ্যতার আলো নিভে গিছল। ইসলামই সপ্তম শতাব্দীতে প্রগতির দুয়ার আরব সমাজের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেয়। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ধারাটি যখন রোম সাম্রাজ্যের পতনে খৃষ্টানদের হাতে পড়ে অবলুপ্ত হতে বসেছিল, তখন এই আরবেরা গ্রীক ধারাটিকে সযত্নে রক্ষিত করে ইউরোপকে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবেষ্টনী থেকে আলোকের পথে নিয়ে এলো। আজকে যাঁরা গ্রীকসভ্যতা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করেন তাঁরা জানেন যে এই আরবীয়দেরই মারফৎ আধুনিক যুক্তিবাদের জনকেরা ও বৈজ্ঞানিক গবেষকেরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। আরবীয়দের সযত্নে রক্ষিত উজ্জ্বল ধারাটির ওপরই আধুনিক সভ্যতাগর্বী ইউরোপের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই এদিক দিয়ে ঐস্লামিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাচীন ফিনিশীয় জাতির মতন আরবীয়রা বিভিন্নদেশে ভ্রমণ করে বিভিন্নদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, জীবন-প্রণালী ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে নিজেদের সভ্যতায় সংযোজিত করত। দেশবিদেশের পণ্ডিতদের ও তাঁদের বইগুলি বাগদাদে তারা নিয়ে আসতো। বাগদাদের খলিফারা তাঁদের বইগুলি আরবীতে অনুবাদিত করবার জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুবাদ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতেন। গ্রীস, রোম, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য ও প্রাপণীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে দিকে দিকে উপযুক্ত লোক পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। বাগদাদের আব্বাসীয়, আফ্রিকার ফতেমীয় এবং স্পেনের ওমাইয়াদ বংশীয় সুলতানদের সুশাসনের ফলে এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আরবীয় সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগণিত পণ্ডিতেরা দেশবিদেশের পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিনম্রচিত্তে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠগুলি খৃষ্টানদের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে গ্রীকপণ্ডিতদের তারা তাড়িয়ে দেয়। বাগদাদের খলিফারা তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তাঁদের শুধু আশ্রয় দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চ্চার জন্যে উপযুক্ত সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা প্রাচীন গ্রীসের মূল্যবান গ্রন্থগুলি সংগ্রহার্থে প্রচুর অর্থ খরচ করে দিকে দিকে লোক পাঠালেন। এরূপে এথেনিয়ান কালচার নবজীবন লাভ করে। সক্রেটিস, প্লেটো, পিথাগোরাস, প্লাটিনাস, এরিষ্টটল, ইউক্লিড, হিপারকাস, এ্যাপেলো-নিয়াস, হিপোক্রেটাস, গ্যালেন, টলেমি প্রভৃতি মনীষীদের বইগুলি উদ্ধারিত হয়ে সাধারণকে শিক্ষিত করবার জন্যে আরবী অনুবাদ হয়। এই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় পণ্ডিতেরা গ্রীক পণ্ডিতদের রচনাগুলিকে সমালোচনায় সুসমৃদ্ধ করে তুললেন। এই সমস্ত অনু-বাদকদের মধ্যে ইসাক ইবন হুনাইন, হুনাইন ইবন

ইরাক, জাবিত, ইবন কা-আবা, মা—আতা ইবন ইউনুস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আরবদের গ্রন্থাগার গঠন করবার দিকে স্পৃহা ছিল সব চেয়ে বেশী। স্পেনেই প্রায় ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল। কর্ডোবা গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষেরও অধিক; কাইরো গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। খলিফাদের প্রত্যেক খলিফার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল; তাঁরা রাজকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে জ্ঞানচর্চ্চা করতেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণা বিস্তারের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিজেও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁরাই খোদার সত্যিকারের সেবক যাঁরা জ্ঞান সাধনার উৎকর্ষে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। খলিফা আলমানসুরের সময় বাগদাদে একদল ভারতীয় পণ্ডিত গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি বই নিয়ে যান। ব্রহ্মক নামক এক ভারতীয় পরিবার প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ লাভ করেন। ব্রহ্মক পরিবারের চেষ্টায় বাগদাদের খলিফাদের সাহায্যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বাগদাদে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হারুণ অল রসিদের পীড়ার সময় ভারত থেকে মানক নামক এক চিকিৎসক বাগদাদে যান। মানক সেখানকার একটি বড় হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আরবীয় পণ্ডিতেরা মানক ছাড়া আরও সে সময়কার ছয়জন ভারতীয় চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেছেন। বাগদাদে ঐস্লামিক সংস্কৃতির চরম উন্নতি হয়। বাগদাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমশঃ মধ্য এশিয়া থেকে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে; এরই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গণিত বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ভারতের সঙ্গে আরবের মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই আরবীয়-দেরই মারফৎ যে ইউরোপ গণিতে ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে একথা অনস্বীকার্য্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, "The intellectual curiosity, the adventurous in rationalist speculation, the spirit of scientific inquiry among the Arabs... are very striking". (The Discovery of India). বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আরবীয়দের সশ্রদ্ধ অনুরাগই কি এতে সূচিত হচ্ছে না?

বর্ত্তমান বিশ্বপ্রগতিতে ঐস্লামিক চিন্তার স্থান

দর্শন :—প্রথম আরব দার্শনিক আলকান্দি নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে দর্শনকে গণিত বিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক দার্শনিক ফ্রান্সিসবেকন ও ডেকার্ট এই মতবাদ প্রচার করেছেন। আলকান্দি জ্যামিতি, গণিত, দর্শন, বায়ুতত্ত্ব, আলোক বিজ্ঞান এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সার্দ্ধদ্বিশত গ্রন্থ প্রণয়ন করে স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করে। দশম শতাব্দীর ইবনেসিনা একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। তাঁর দর্শনের মূলভিত্তি ছিল উদারতা। একাদশ শতাব্দীর দার্শনিক আলগাজ্জালী বলেন, 'সত্য নির্দ্ধারণের মানদণ্ড আত্মচেতনা।' আধুনিক দার্শনিক ডেকার্ট তো এই কথাই বলেছেন। প্রাচ্যভাববিশারদ রেঁণা দার্শনিক আলগাজ্জালী সম্বন্ধে বলেছেন যে, আধুনিক সংশয়বাদের জন্মদাতা হিউম হলেও সাত শ বছর পূর্ব্বের এই আরব দার্শনিকের তথ্যের ওপর নতুন তথ্য একটিও তিনি বলতে পারেন নি। ঐস্লামিক দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে F. A. Lange 'Thy History of Materialism (Vol. I) গ্রন্থে বলেছেন, "...in connection with the brilliant outburst of Arabian civilisation, a free philosophical spirit, which exercised a powerful influence primarily upon the Jews in the middle ages, and so indirectly upon the Christians of the west." নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইরাকে সুফী সাধক সম্প্রদায় দেখা দেয়। এঁদের দার্শনিক চিন্তধারা ইসলামকে এক বিশিষ্ট মর্য্যাদা দিয়েছে। সুফী দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়, যেমন— কেবলা দ্বৈতবাদ, বিশ্বাত্মবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি। অদ্বৈতবাদী সুফিগণের মতে আল্লাহ একমাত্র সত্য আর সব মিথ্যা। মুক্তির পথ সম্বন্ধেও সুফীদের মধ্যে নানা মতবাদ আছে। সনাতনপন্থী সুফীদের মতে মুক্তির অর্থ হচ্ছে পার্থিব আসক্তি পরিহার করে ঈশ্বরের দাসরূপে অবস্থান করা। বিশ্বাত্মবাদী

ও একাত্মবাদী স্ফীদের মতে মুক্তির অর্থ ঈশ্বরের একত্বসাধন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী স্ফীগণের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর গুণাবলী মাত্র লাভ, তাঁর স্বরূপ লাভ নয়। স্ফীদের মতে ঈশ্বর এক এবং প্রত্যেক মানবই সেই জন্যই ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মানবে, মুসলমানে অমুসলমানে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন ভেদ নেই। পরমত-সহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেম স্ফীমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদান্ত দর্শনের মত স্ফীদর্শন সারা জগতের দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদরূপে যুগে যুগে সম্মানার্হ হয়েছে। ভারতবর্ষে স্ফী প্রভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় স্নীতি বাবু বলেন, "স্ফীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্য যুগে খৃষ্টীয় পনের শতক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। কবীর প্রভৃতি সন্তগণের অনুভূতিতে ও শিক্ষায় ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরেও পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।" দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঐস্লামিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ইবনে রুশদের আদর্শ ছিল প্রকৃতির রহস্য উদ্ভাবন করে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করা। এই পথেই তাঁকে এবং তাঁর স্বরূপকে জানা যায়। তাই তিনি সত্যকে বিচার বুদ্ধির একমাত্র উৎস বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তাই ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন,—

"Nature was interpreted by Iben Rushud."

ইবনে রুশদের মতে প্রচেষ্টা ও যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলাই হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। নিছক পাণ্ডিত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে ইউরোপীয় মানবতাকে মুক্ত করার জন্যে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে এই দার্শনিকের মতবাদ প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছে। বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তা ইবনে রুশদের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। পণ্ডিতপ্রবর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ইবনে রুশদ ও তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধীয় উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

"The fierce contest between Faith and Reason, between despotic ignorance and freedom of thought, which rocked Europe and shook the foundation of the Catholic Church from the twelfth century onwards, drew inspiration from the teachings of the Arab philosophers, Averroes (Iben Rushud) and Averroism dominated the scientific thought of Europe for four hundred years."

(The Historical Role of Islam)

[আগামী বারে সমাপ্য

★

পূর্ব্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তার নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যবধান

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

সুলতা, আমার পাশেই রয়েছো শুয়ে
আকাশের বুকে ছায়া আছে রাত্রির,
ক্লান্ত বাতাস খুঁজে খুঁজে ফেরে পৃথিবীর নীল বুক
খুঁজে খুঁজে ফেরে পাতালের ছায়া নীড়।
তুমি আর আমি প্রভেদ ত' নেই
দেহে ও মনের ব্যবধান নেই
আলো ও ছায়ার লুকোচুরিটুকু নেই—
এখনও জ্যোৎস্না উছল ধরিত্রীর,
এখনও আকাশে স্বপ্নেরা করে ভীড়।

এই ত' ছুঁয়েছি দু'হাতে তোমায়
ছুঁয়েছি বক্ষে চোখে,
ছুঁয়েছি দেহের প্রতি পরমাণু দিয়ে,
মিশেছি বুকের অন্তরতলে গিয়ে;
হৃদয়ের কথা শুনেছো কি কভু মোর?
পেয়েছো কি দেখা,
মর্ম্মগভীর বৃথা বেদনার লোর
পড়েছে কি চোখে?
তোমায় দেখেছি আমি?
প্রয়োজন কিসে?
এই ত রাতের আড়ালে বসেছি স্বপ্নজড়ানো চোখে,
আহ্বান আছে মত্ত দেহের কামনা সমুদ্রের
প্রেমের স্বপ্নলোকে
মাটির ধরাকে উপহার দিই জন্মরহস্যের,
এই ত' অনেক ভালো,—

পরিচয় আছে দেহে আর লোভে
কর্ম্মে মর্ম্মক্ষোভে,
পরিচয় আছে ধর্ম্মপালনে অর্থলালনে আর
নবজাতকের জন্মক্ষালনে, সম্মানে আর নামে
রুক্ষদিনের বাঁচিবার সংগ্রামে;
দৈন্যে ক্ষুধায় কলঙ্কে মোহে পুণ্য পাপের পর
নির্ভর করি দিনে ও রাত্রে আমরা পরস্পর;
শুধু মাঝ থেকে প্রশ্ন জড়ানো সৃষ্টি সমস্যার,
বিপুল পৃথিবী—কে যে চেনে কাকে
প্রয়োজন কিসে কার?

তার চেয়ে এই ভালো,
তুমি মোর গৃহলক্ষী, প্রেয়সী, সচিব সংসারের,
আশা আকাঙ্খা বুদ্ধি দীপ্তি ক্ষমা—
পৃথিবীর পথে পথে
আমি ভুল করি পথ ভেঙ্গে পড়ি,
আবার চলিয়া যাই—
সংশয় নাই,
তুমি আর আমি আছি।
প্রশ্ন কোরোনা সন্দেহাকুল
সত্য সন্ধানীরা,
প্রশ্ন কোরোনা পরস্পরের জীবনপ্রান্ত দিয়ে
একে আর ওকে চেনাচিনি হ'লো কিনা!
বিপুল ধরায় কেইবা কাহাকে চেনে?
শুধু মাঝ থেকে সমস্যাভারে
প্রশ্ন এনো না টেনে॥

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

সাত

কিছুকাল কেটে গেলে দেখা গেল—ছন্দার বিয়ে নিয়ে বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠেছেন অঞ্জনা। রসিকলাল যেমন সংসার-উদাসীন মানুষ, এ ব্যাপারে অঞ্জনার তাই তৎপর না হ'য়ে উপায় নেই। মেয়েটা চিরকালের দু'চোখের কাঁটা তাঁর কাছে। তার ভরন-পোষণের ব্যাপারে আর অধিক দূর অগ্রসর হ'তে তিনি না-রাজ। নিজের ছেলে-মেয়ে রয়েছে, তাদের জন্যেই কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারছেন না তিনি। তা ছাড়া মেয়ে সবিতা তো ছন্দার বয়সীই, মা হ'য়ে দু'দিন বাদে কি তাকেই তিনি কোনো বাজে ছেলের হাতে তুলে দিতে পারবেন? ভালো বর, ভালো বর পেতে হ'লে ভালো অর্থ চাল্‌তে হয় মেয়ের পিছনে। অথচ সেই অর্থের সঙ্গতিই বা কোথায়? কাঁটার মতো সবিতার পথ আগ্‌লে আছে ছন্দা। এ কাঁটা আগে বিদেয় না ক'রতে পারলে শান্তি নেই অঞ্জনার।

নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে কিছুকাল তিনি এখানে ওখানে ছেলে দেখলেন। অথচ যার জন্যে ছেলে খোঁজা, তার কাছে কিন্তু সমস্ত বিষয়টাই একেবারে অস্পষ্ট র'য়ে গেল।

সবিতাই বরং দু'একবার ঝগ্‌ড়ার সূত্রে শাসানির সুরে গলা তুলেছে: 'যাওনা এবার শ্বশুর-বাড়ী, দেখবে মজা কেমন!'

অর্থাৎ—এখানে যেন সুখে থাক্‌তেও সুখের নিকুচি ক'রছে ছন্দা, ভাবখানা এরকমই।

ব্যাপার আর কিছু নয়। চুলের কাঁটা আর ফিতে নিয়ে ঝগ্‌ড়ার সূত্র টেনে আপ্‌নি থেকেই মুখিয়ে উঠেছিল সবিতা। ছন্দা শুধু বলেছিল, 'আমি কারুর জিনিষ ছুঁই না।' অমনি তাই নিয়ে একটা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। তবে সেই রামায়ণ থেকে এতদিনে একটা বড় জিনিষ বুঝে নেবার অবকাশ পেলো সে, সেটা তার বিয়ে। ভাবতে গিয়ে সহসা একবার নিজের মধ্যে আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো ছন্দা।

কিন্তু নিজের উদ্যোগে যত চেষ্টাই করুন অঞ্জনা, ছেলে পছন্দ ক'রে বার করা শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কাছে সত্যিই কঠিন হ'লো। শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর শূণ্য দেখে অনেকে পিছিয়ে গেল, কেউবা মোটা পণ চেয়ে বিমর্ষ মুখে বিদায় ক'রে দিল অঞ্জনাকে। বিক্ষুব্ধ চিত্তে একসময় এসে বহির্ব্বাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঝাল ঝাড়্‌লেন তিনি স্বামীর উপর। —রসিকলাল তখন কি একটা জরুরী মোকদ্দমার ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ঘরে মক্কেল ছিল না। সহসা সরোষে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন অঞ্জনা: 'বলি, এবাড়ীতে কি কেউ পুরুষ মানুষ নেই? একা মেয়েমানুষ হ'য়ে ক'দিক সাম্‌লাই আমি! এদিকে গাঁয়ে তো মুখ দেখানো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। লোকেরই বা দোষ কি! ধিঙ্গী মেয়ে ধিন্ ধিন্ ক'রে বেড়াবে, মানুষ তো আর অন্ধ নয়, ব'ল্‌বে বৈ কি! পুরুষ মানুষের অপেক্ষায়ই কি থেকেছি, দেখ্‌লামও তো দু'পাঁচ ঘর, তা গাঁয়ে ছেলে না মিল্‌লে গাছ-কোমর বেঁধে আমি বিভুঁয়ে বেরোলে এবাড়ীর সম্মানই কি কিছু রক্ষা পাবে?'...

স্বতঃউৎসারিত কণ্ঠে আরও কিছু ব'ল্‌তে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা। একটা লাল ফিতে দিয়ে হাতের জরুরী ফাইল-

গুলো উপস্থিত মতো বেঁধে রেখে শান্তকণ্ঠে রসিকলাল ব'ল্লেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে অমনি ক'রে কি সব ব'ল্‌ছো? এস না, ভিতরে এসে বসো।'

—'হ্যাঁ, ব'স্‌লেই আমার সাতপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে আর কি!' ঝাঁঝালো কণ্ঠেই আবার থরথরিয়ে উঠলেন অঞ্জনা: 'আমাকে না হয় বুঝ্‌লাম সহ্য করা কষ্ট, কিন্তু গাঁয়ের লোক? তাদের মুখ ঢাকবে কি ক'রে? মেয়েটার কি দেখে-শুনে গতি ক'রতে হবে না?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবারে ভিতরে এসেই ব'স্‌লেন অঞ্জনা।

পুরু কাঁচের চশমার ফাঁকে একবার চোখ তুলে তাকালেন রসিকলাল স্ত্রীর মুখের পানে: 'তা—সবি'র এমনই বা কি বয়স হ'লো যে, এক্ষুনি ওর জন্যে ছেলে না দেখ্‌লে নয়?'

ললাটে করাঘাত ক'রে অঞ্জনা ব'ল্লেন, 'হাঁ রে আমার অদেষ্ট, সবি'র কথাই তবে ব'ল্‌ছি এতক্ষণ!'

—'তবে?'

—'ন্যাকা আর কি! এদিকে আইন ক'রে মাথা পাকালে, অথচ ঘরের কথা কি ঢোকে মাথায়, তা ঢোকে না। ঢুকবে কেন, ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে তো ঢুকবে!' —নিজের মধ্যে জ'লে ম'রতে লাগ্‌লেন অঞ্জনা।

রসিকলাল কিন্তু এতটুকুও চ'ট্‌লেন না। তেম্‌নি শান্ত কণ্ঠেই ব'ল্লেন, 'তবে কি ছন্দার কথা ব'ল্‌ছো?'

—'নয় তো কি আমার কথা ব'ল্‌ছি!' অঞ্জনা ব'ল্লেন, 'ঘরে আমার এমন ন'শ পঞ্চাশ মজুৎ নেই যে, চিরকাল পাঁচজনের জন্যে দেখে শুনে ক'রবো। সোমত্ত বয়স হ'য়েছে মেয়ের, আর কেন! এবারে দেখে শুনে আহ্লাদের ভাইঝিটিকে কারুর হাতে তুলে দিয়ে আমাকে উদ্ধার ক'রলেই তো হয়!'

—'এ তুমি কি ব'ল্‌ছো?' শান্ত দৃষ্টিতে এবারে খানিকটা বিস্ময় এসে যুক্ত হ'লো রসিকলালের চোখে। —'ছন্দা আর সবি'র মধ্যে পার্থক্য কি? বয়সে তো ওরা প্রায় পিঠেপিঠিই ব'ল্‌তে গেলে! তা ছাড়া নতুন ক'রে আজ ওর জন্যে এমন কি সংসার-খরচাটা তোমার বাড়লো, তাও তো বুঝ্‌তে পারছি নে সবি'র মা!'

—'সংসার হাতে নিয়ে তা এসে নিজে বুঝ্‌লেই তো হয়, আমাকে তবে আর এমন ক'রে ম'রতে হয় না।' কি মনে ক'রে এবারে উঠে দাঁড়ালেন অঞ্জনা।—'কাজের মধ্যে তো ঘরে ব'সে মক্কেল তাড়ানো আর আপিসে গিয়ে দিন ভ'রে গলা বাজানো, গাঁয়ের লোকের কথা তো আর তোমাকে শুন্‌তে হয় না! বুঝবে কি ক'রে?'

সত্যিই বুঝ্‌তে পারেন না রসিকলাল। অবুঝের মতো আত্মখেয়ালে বুঝ্‌তেও তিনি রাজি ন'ন্‌ কোনো কিছু। স্বল্প থেমে তিনি ব'ললেন, 'গাঁয়ের লোকেরা কি একচোখো, তারা ছন্দাকে দেখে, তোমার মেয়েকে দেখে না?'

এবারে ওষ্ঠাগ্রে উত্তর এসেও কেন যেন ভাষা থেমে গেল অঞ্জনার কণ্ঠে। জলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো চোখ দু'টোকে একবার দৃঢ়ভাবে স্বামীর চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে তৎপরমুহূর্ত্তেই তিনি ঝড়ের চাইতেও তীব্র গতিতে রসিকলালের সামনে থেকে দ্রুত প্রস্থান ক'রে অন্দর-মহলের দিকে চ'লে গেলেন। বহির্ব্বাটিতে এসে স্বামীর মুখোমুখি এই তিনি প্রথম দাঁড়ালেন আজ।

মোকদ্দমার ফাইল নিয়ে কাজে আর মন ব'স্‌লো না রসিকলালের। অথচ জরুরী মোকদ্দমা। বাদী আর আসামী পক্ষে জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া, শেষ পর্য্যন্ত রক্তারক্তি ব্যাপার। ফৌজদারী আদালতে দু'দিন ধ'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে এই নিয়ে। আসামী-পক্ষের উকীল তিনি, হাত গলিয়ে পয়সার অঙ্কটা একেবারে মন্দ আসেনি পকেটে। মোকদ্দমার মারপ্যাঁচ নিয়ে চিন্তা ক'রতে হ'চ্ছে নানাভাবে। অকস্মাৎ ছেদ প'ড়লো সেই চিন্তায়। খানিকক্ষণ নিজের মধ্যে অর্থহীন ভাবে ব'সে রইলেন তিনি। হঠাৎ ভিতরবাড়ী থেকে অঞ্জনার শানিত কণ্ঠের উদগ্র ধ্বনি এসে কানে বিঁধ্‌লো তাঁর। এতক্ষণে গিয়ে আবার সম্মুখসমরে প'ড়েছেন তিনি ছন্দাকে নিয়ে।—'বলি, মিণ্টুর প্যাণ্ট কেচে সাবান রেখেছিস কোথায়, আগে বল্‌? হতচ্ছাড়িকে কতবার বলি—যেখানকার জিনিষ সেখানে যেন থাকে। তা নয়, সারা বাড়ী খুঁজে মরলেও যদি কাজের জিনিষ প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে

পাই। বলি, আমাকে না মেরে কি তোর শান্তি নেই? এতবড় আইবুড়ো ধিঙ্গী মেয়ের এখনও যদি কিছু ছিরি হ'লো! দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তো আমাকে উদ্ধার ক'রছিস্; আর কত ক'রবি, বল?'

উদ্ধার যে কে কাকে ক'রছে, ভগবানই জানেন। দুঃখে ইচ্ছে হ'লো একবার ডুকরে কাঁদে ছন্দা, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিল সে। একদিনও চোখের জল না ফেলে অন্ন গ্রহণ করে নি সে কাকিমার সংসারে, আজও ক'রলো না। প্রতিবাদের কণ্ঠ নিয়ে তাকে পাঠান নি ভগবান সংসারে। কোথায়ই বা প্রতিবাদ ক'রবে সে? বোবাকণ্ঠেই এখানে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে সে, প্রতিবাদ ক'রলে হয়ত আর দ্বিতীয় রাত্রি বাস করা চ'লতো না এখানে। আজও সে নীরবেই মুখ নিচু ক'রে কাকিমার সামনে থেকে স'রে গেল। সাবান ঠিক যথাস্থানেই রেখেছিল সে, তারপর কার হাতের স্পর্শে তা উধাও হ'য়েছে, তা সেও জানে না। অথচ সংসারের খুঁটিনাটি অধিকাংশ ব্যাপারের মতো আজকের এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটার জন্যও অপরাধের বোঝা বহন ক'রতে হ'লো তাকেই।

বহির্বাটির নিভৃতে ব'সে বিষয়টা নিয়ে আজ একটু বেশীই ভাবতে হ'লো রসিকলালকে। যে ভাবে একটু আগেই অঞ্জনা এসে দাপট ক'রে গেলেন, তাতে একথা অন্ততঃ রসিকলালের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ছন্দার কিছু-একটা সত্বর ব্যবস্থা না ক'রলে এবাড়ীতে তার পক্ষে থাকা ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। অঞ্জনা আজ শুধু রসিকলালের জীবনটাকেই নয়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ছন্দার অদৃষ্টটাকেও। অথচ অমিয়মাধবের মৃত্যুশয্যায় তার কাছে একদিন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ছন্দাকে গ্রহণ ক'রেছিলেন রসিকলাল যে, তাঁর যদি কোনোদিন দু'মুঠো ভাতের অভাব না হয়, তবে ছন্দারও অভাব হবে না জীবনে। অথচ সংসারের সেই দু'মুঠো ভাতের অভাবই আজ বড় ক'রে দেখা দিল ছন্দার। নিজে কর্মক্ষম থেকেও এর চাইতে মনুষ্যত্বের আরও বড় কিছু কি অপমান আছে রসিকলালের জীবনে! উঠতে ব'সতে দিন রাত মেয়েটার হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে অঞ্জনা। অদৃষ্টের আশ্চর্য্যকর পরিহাস!

বহুক্ষণ ধ'রে বহুভাবে চিন্তা ক'রে দেখলেন তিনি বিষয়টাকে। শেষে একরকম মন স্থির ক'রেই ফেললেন। একসময় নিভৃতে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন তিনি ছন্দাকে, সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললেন, 'প্রতিদিন সংসারে যা ঘ'টচে, তা চোখের আড়ালে হ'লেও এ-দুটো কানে এসে আমার সবই বাজে। তার জন্যে দুঃখ করিস নে মা। ভালো ঘর খুঁজে দেখি কোথাও তোকে দিতে পারি কি না। তবে তোরও শান্তি আমারও শান্তি।' ব'লতে গিয়ে কণ্ঠ একবার আর্দ্র হ'য়ে উঠলো রসিকলালের।

উত্তরে কিছু-একটাও মুখ ফুটে ব'লতে পারলো না ছন্দা। শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল দিয়ে নীরবে কাকার কথার সমর্থন জানালো। না জানিয়ে উপায় ছিল না তার। শেষ পর্য্যন্ত ছন্দা স্পষ্টই বুঝে নিয়েছিল—কোথাও চ'লে যাওয়াই প্রতিদিনের এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু কোথাও অর্থে পথ খুঁজে কিছু পায় নি সে। এবারে সে-পথের কিছু একটা নির্ভরযোগ্য আভাষ পেয়ে অতি দুঃখের মধ্যেও মুহূর্ত্তের জন্য একবার বুকখানি দুলে উঠলো তার। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার একটা তীব্র অস্বস্তিতে নিজের মধ্যে বিষিয়ে উঠলো ছন্দা। বিজুদাকে ছেড়ে কেমন ক'রে জীবনে সে সুখী হবে? বিজুদা ভিন্ন আর কিছু যে জানে না সে!

নীরবে একসময় কাকার সামনে থেকে স'রে এসে ঘাট থেকে জল আনবার অছিলায় কলসী নিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে সে নদীর ঘাটে। নির্জ্জন নিস্তব্ধতায় ওকূল থেকে একূলে এসে আছড়ে প'ড়ছে নবগঙ্গা। কতক্ষণ যে নির্জ্জনে ব'সে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রলো ছন্দা, তা সে নিজেও জানলো না। অশ্রু তার ধারা হ'য়ে নদীর জলে মিশে গেল।...

* *

ইতিমধ্যে আর-একবার মুখোমুখি কথা-কাটাকাটি হ'য়ে গেল অঞ্জনার সঙ্গে রসিকলালের। শান্ত মানুষ, ক্রমেই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি সংসারে। অঞ্জনার শাণিত জিহ্বা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লেছে।

পাঁজি দেখে একদিন দুর্গা নাম স্মরণ ক'রে তাই বেরিয়ে প'ড়লেন রসিকলাল পথে। পথেই বেরিয়ে প'ড়লেন সত্য; কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট পথে নয়। ভিতরে ভিতরে কিছু-দিন ধ'রে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। অবশেষে রাইহরণ সিকদার একটা ভালো সন্ধান দিলো। রাইহরণকে বিশ্বাস না হবার কথা নয়। দীর্ঘকালের মক্কেল সে রসিকলালের। ঠাকুর্দ্দার আমলের কিছু জমিজিরেত র'য়েছে রাজসাহীতে, সেই সূত্রে মাঝে-মধ্যে যাতায়াতও আছে সেখানে। সম্বন্ধটাও খাস রাজসাহীর। উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি, তবু যদি কিছু একটা সম্পর্ক দাঁড়ায় উত্তর বাংলার সাথে!

একসময় এসে রাজসাহীতেই পৌঁছালেন রসিকলাল। পাঁজি দেখে তবে তিনি কাজে নেমেছেন, খারাপ অদৃষ্ট নিয়ে বেরোন নি পথে। সেই অদৃষ্টের জোরেই একসময় পাত্র মিলে গেল। ছেলে শ্যামলকান্তি নতুন ডাক্তারী পাশ ক'রে সম্প্রতি সহরের উপরেই ডিস্‌পেন্‌সারি দিয়ে ব'সেছে। সংসারে স্ত্রীলোক ব'লতে কেউ নেই; পিতা তারিণীমোহন আর পুত্র শ্যামলকান্তি। ঠাকুর চাকরে চালিয়ে নেয় সংসার। জ্ঞাতি সম্পর্কে তারিণীমোহনের দু'এক ঘর আত্মীয় র'য়েছেন পাশাপাশি ভিটায়। আপদে বিপদে তাঁরাই এসে পাশে দাঁড়ান। শ্যামলকান্তির বয়স কিছুটা বেশী হ'লেও একেবারে বেমানান হবে না ছন্দার সঙ্গে। স্বভাবচরিত্র ভালো, দেখ্‌তে শুন্‌তেও দৈর্ঘে এবং স্বাস্থ্যে মিলিয়ে চমৎকার। তবু একটা আশঙ্কা এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল মনে: পারবেন তো তিনি এঘরে ঠাঁই ক'রে দিতে ছন্দাকে? তেমন ক'রে তো লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি তিনি তাকে! আজকালকার দিনে একটু বেশী লেখাপড়া জানা মেয়েই চেয়ে থাকে সকলে। শ্যামলকান্তিই বা না চাইবে কেন?

তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'তা—লেখাপড়া যা জানে শুন্‌লাম—ভালোই জানে। ঘরে ব'সে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছে, আবার কি! তা ছাড়া গ্রামের মেয়ে ব'লেও দোষের কিছু নয়। গ্রামের মেয়েই আমি চাই। আধু-নিক সহুরে সভ্যতা আমি ঠিক সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারিনে। জানি, আমার ছেলেরও তার বাপের মতেই মত হবে। আমি চাই কুললক্ষ্মী, এঘরে এসে সে-ই হবে সর্ব্বেসর্ব্বা। আপনি গিয়ে বরং প্রস্তুত হন, আসচে মাসের ১৭ই দিন সাব্যস্ত করা গেল। ঐদিনেই বিয়ে হবে। আপনাকে এক পয়সাও এ বিয়েতে খরচা ক'রতে হবে না।'

হাতে যেন আকাশ পেলেন রসিকলাল। ভগবানের অমোঘ বিধান জয়যুক্ত হোক্: মনে মনে একবার প্রণাম ক'রলেন তিনি ইষ্টদেবতাকে। নিজের মেয়ে সবিতার জন্য হ'লেও সম্ভবতঃ এতখানি সুখী হতেন না তিনি। যতখানি কষ্ট নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবারে তার চাইতেও বেশী শান্তি নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

ক্রমে এ-কান থেকে সে-কানে হ'য়ে হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো সংবাদটা। গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাচস্পতিরা ফুর্সিতে তামাক টান্‌তে টান্‌তে খানিকটা প্রতীক্ষমান হ'য়ে রইল নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে। এর আগে তারাই কান লাগিয়েছিল গ্রামে। প্রাচীন পল্লী-বাংলার কুখ্যাত সংস্কার নিয়ে আজও এরা তাম্রকূটের আসর জাঁকিয়ে বেঁচে আছে।

কিন্তু এতবড় একটা সুসংবাদেও অঞ্জনার মুখে কিন্তু হাসি ফুটলো না। তিনি যথারীতি পূর্ব্বের মতই চ'লতে লাগলেন। বরং এই ভেবে আরও অশান্তিতে দগ্ধ হ'তে লাগলেন যে, ভালো ঘর পেয়ে বাঁচলো মেয়েটা।

অথচ এমন বাঁচা ছন্দা কিন্তু আদৌ বাঁচতে চায়নি। বার কয়েক গিয়ে সে ইতিমধ্যে মাসিমা নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে। নির্ম্মলা ভিন্ন তার এই দগ্ধ হৃদয়ের কোথাও শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই। বিজুদাকে কেন্দ্র ক'রে পারে না কি সে চির জীবন নির্ম্মলার পায়ে প'ড়ে থাকতে? কিন্তু এখানকার সমাজ হয়ত এতবড় বর্ণ-মিলনটাকে একেবারেই উদার হৃদয়ে স্বীকার ক'রে নেবে না। বিজুদা ব্রাহ্মণ, তারা কায়স্থ। কিন্তু জাতীয় বর্ণ-বৈষম্যটাই কি সব, হৃদয়টা কিছু নয়? বুকের মধ্যে অশান্ত হৃদয় বার বার হাহাকার ক'রে ওঠে ছন্দার। কি ক'রবে সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। একদিকে কাকিমার সংসার ছেড়ে গিয়ে বাঁচা, আর-একদিকে বিজুদাকে চিরদিনের মতো না পেয়ে তিলে তিলে দগ্ধে' দগ্ধে' মরা। বিভ্রান্ত চিত্তে অজস্র চিন্তার আবিলতায়

একসময় দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল ছন্দার, তারপর নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো সে বিজুদাকে। বরের বেশে এসে দাঁড়িয়েছে সে সামনে, আর ছোটবেলার মতো নিজের হাতের গাঁথা মালা তাকে গলায় পরিয়ে দিয়ে নতজানু হ'য়ে তাকে প্রণাম ক'রলো সে।

কিন্তু নিশার স্বপ্ন-সুখ—সে কতক্ষণ?

যথাদিনে সানাই বেজে উঠলো বাড়ীর দেউড়িতে।

এতদিনে আজ এই প্রথম উদ্যোগী হ'য়ে চিঠি লিখলো ছন্দা বিজনকে। এমন মুহূর্ত হয়ত আর কোনোদিন আসবে না জীবনে। এ ক'দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে সে। সামান্যই আর সময় আছে লগ্নের। তারপর চিত্রকরা পিঁড়িতে এসে ব'সবে শ্যামলকান্তি। চির জীবনের মতো আশ্রয় পেয়ে দূরে চলে যাবে ছন্দা। যাবার আগে তাই আজ এই শেষ চিঠি তার বিজুদাকে:

'...দূরের বাঁশীর ডাক এসে হঠাৎ কানে বাজলো। ছোটবেলার খেলাঘর যে এম্‌নি ক'রেই একদিন তচ্‌নচ্ হ'য়ে যাবে, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বিজুদা। এমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছিলাম যে, সংসারে ঠাঁই হলো না। তাই এই নতুন সংসারপথে যাত্রা। কাকার ব্যবহার উপর কথা বলি নি; কাকার হৃদয় তো জানি! বাবা দিলে হয়ত অন্য কিছু ঘ'টে যাওয়া বিচিত্র ছিল না তাঁর জীবনে। কিন্তু এ যাওয়া যে আমার কতবড় দুঃখের যাওয়া, তা হয়ত তুমি বুঝবে। তোমার কাছ থেকে স'রে যাওয়া—এর চাইতে যে আমার মরণও ভালো ছিল। পারো তো ভুলে যেয়ো অভাগীকে।...'

টস্ টস্ ক'রে দু'ফোঁটা চোখের জল প'ড়ে কাগজের একটা পাশ ভিজে গেল। তার এ জীবনের সমস্ত ভালো-বাসার শেষ দান।...

পরের দিন বর আর কণের যাত্রালগ্নে একান্ত কর্ত্তব্য-বশেই নির্ম্মলা এলেন আশীর্ব্বাদ ক'রতে। শুধুই ধান-দূর্ব্বো নয়, তার সঙ্গে একজোড়া সূক্ষ্ম কাজ করা শাখা। ধীরে ধীরে ছন্দার হাতে পরিয়ে মাথায় ধান দূর্ব্বো দিয়ে ব'ললেন, 'চিরায়ুষ্মতি হ'য়ে সুখে থাকো মা। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিও, নইলে একটুও শান্তি পাবো না।'

কথা না ব'লে তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো ছন্দা।

সান্ত্বনা দিয়ে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'ছিঃ, এমনি ক'রে চোখের জল ফেল্‌তে নেই মা, ওতে অমঙ্গল হয়। সবাই এম্‌নি ক'রেই নতুন নতুন স্বামীর ঘরে যায়, তারপর সে ঘর তার নিজেরই হয়।'

নিজের আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন তিনি ছন্দার।

কিন্তু কেউ দেখ্‌লো না—সবার আড়ালে ব'সে অশান্ত হৃদয়ে ছেলেমানুষের মতো কতক্ষণ ধ'রে কাঁদ্‌ছেন রসিকলাল। স্ত্রীর সংসারে দু'গ্রাস ভাতের অভাবে আজ নির্ম্মম ভাবে দূরে সরিয়ে দিতে হ'চ্ছে মেয়েটাকে। এর চাইতে পাপ, এর চাইতে পরাজয় আর কি আছে জীবনে?

সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল। একটা মূর্চ্ছাতুর বিষাদের সুর আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে প'ড়ছে সানাই থেকে।

বেহারাদের কাঁধে একসময় পাল্কি উঠে গেল। তার মধ্যে বর্ষাক্রান্ত রজনীগন্ধার মতো এক পাশে নিথর নিস্পন্দ অবস্থায় ব'সে রইল ছন্দা। পাল্কি চ'ল্‌লো সামনের পথ ধ'রে।

আট

যথাসময়েই ছন্দার চিঠি এসে বিজনের হাতে পৌঁছালো। একবার, দু'বার, তিনবার—কতবার ক'রে যে চিঠিখানি প'ড়লো বিজন, তার ইয়ত্তা নেই। প'ড়তে প'ড়তে অভিভূত হ'য়ে গেল সে। এত গভীর ভাবে তবে তাকে ভালোবাসতো ছন্দা? সে তবে একাই চেয়েছিল না তাকে, ছন্দাও মনে প্রাণে কামনা ক'রেছিল বিজনকে। আজ তবে তার ভালোবাসা সার্থক হ'লো। কিন্তু এ সার্থকতার সত্যিই কি কিছু অর্থ আছে? অদৃষ্ট-চক্রে আজ কোথায় চ'লে যেতে হ'লো ছন্দাকে, আর কোথায় অধ্যয়ন-তপস্যায় ডুবে আছে বিজন! কিছু ক'রবার নেই তার, কিছু ক'রবার ছিল না তার কোনো-

দিনই। শুধু ভালোবেসেই ভালোবাসার মর্য্যাদা দেওয়া ভিন্ন আর কি ক'রতে পারে সে ? ভাগ্য নিয়ে তবু বেঁচে গেল ছন্দা। কিন্তু বিজন, বিজন বাঁচবে এরপর কি নিয়ে ? যখনই সে গ্রামে ফিরবে, খাঁ খাঁ ক'রে উঠবে ছন্দার জন্যে বুকখানি—যেমন ক'রে খাঁ খাঁ ক'রছে এখন এই মুহূর্ত্তে।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে কতক্ষণ যে অভিভূতের মতো ব'সে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। এক একটা দিনের টুকরো টুকরো কথা ভেসে এসে মনটাকে তার আকুল ক'রে তুল্‌লো। সেই এতটুকু বয়স থেকে আজ এই অবধি—কত কথা, কত ঘটনা, এ সে কাকে বোঝাবে ? চিঠির শেষে ছন্দা লিখেছে—'পারো তো ভুলে যেয়ো অভাগীকে।' ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ, ইচ্ছে ক'রলেই কি মানুষ ভুলে যেতে পারে তার অতীতকে ? অতীতের উপরেই যে দাঁড়িয়ে আছে তার সমস্তটা বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ! চিরদিন নির্য্যাতনের মধ্যে থেকে নিজেকে অভাগী ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারে নি ছন্দা, কিন্তু যত ছোট ক'রে নিজের অদৃষ্টকে সে কল্পনা ক'রেছে, বিধাতা হয় ত ঠিক্ তত ছোট ক'রেই তাকে পৃথিবীতে পাঠান নি। সুখে থাক্ ছন্দা, সুখী হোক্ সে জীবনে, অতীতের সমস্ত ব্যথা ভুলে যাবার অবকাশ দিন্ তাকে ভগবান, এ ভিন্ন আজ আর কি কামনা ক'রতে পারে সে ছন্দার জন্য!

এই প্রসঙ্গে মনে মনে একবার মা'র উপরও বড় কম রাগ হ'লো না তার। মা হয়ত ইচ্ছে ক'রেই বিষয়টা চেপে গেছেন তার কাছে, নইলে মা অনায়াসেই এ বিয়ের ব্যাপারটা ইতিপূর্ব্বেই তাকে লিখে জানাতে পারতেন। কিন্তু কেন যে পারেন নি নির্ম্মলা, সে কথা একটি বারের জন্যও বুঝতে চেষ্টা ক'রলো না বিজন।

আর-একবার চিঠিখানি আগাগোড়া প'ড়ে ভাঁজ ক'রে বাক্সে তুলে রেখে দিল সে। হোষ্টেলের অন্যান্য সীটের ছেলেরা মাঝে মাঝে যা-নয়-তাই নিয়ে বড়-বেশী ইয়ার্কি ঠাট্টায় জ'মে ওঠে। তাদের কারুর চোখে চিঠিটা অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে প'ড়লে তাকে নিয়ে হুলুস্থুল বেধে যাবে সারা হোষ্টেলে। এই নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ক্লাসে গিয়েও তিষ্ঠোনো দায় হ'য়ে উঠবে। চিঠিখানিকে তাই বাক্সে তালাবন্ধ ক'রে রেখে একসময় উঠে প'ড়লো বিজন। ট্যুইশনির সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার টিউটোরিয়াল নোট নিয়ে ব'স্‌তে হবে। ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকাতে গেলে চোখ দু'টো ঝাপ্সা হ'য়ে আসে। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র মাস তিনেকও দেরী নেই, তা ছাড়া সামনেই টেষ্ট। পাশ তাকে ক'রতেই হবে। নইলে তার জীবনের সমস্ত আশাই ধুলায় লুটিয়ে যাবে।

কিন্তু ট্যুইশনি থেকে ফিরে এসে টিউটোরিয়ালের নোটের পাতা খুলে বসাই মাত্র সার হ'লো, এতটুকুও মন ব'স্‌লো না তাতে। ঘুরে ফিরে নানা সূত্রে ছন্দার কথাটাই কেবল বার বার ক'রে মনের মধ্যে ঘুরতে লাগ্‌লো। চেষ্টা ক'রেও বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ ক'রতে পারলো না বিজন।

দিন কয়েক কেটে গেলে সমস্ত বিষয় জানিয়ে নির্ম্মলা চিঠি দিলেন তাকে। নিজের স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে লিখলেন :

...'ইদানিং শরীর আমার মোটেই ভালো যাইতেছে না। গ্রামে আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া কেমন জ্বর জ্বর বোধ করিতেছি। কেবলই ভয় হয়, কখন্ চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যাই। এখানকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইয়াছে; তুমি এবৎসর পাশ করিয়া আসিলে তিনি এখানে ইস্কুলে তোমাকে চাকুরী দিবেন। যদি হয়, ভগবান তবে মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তোমাকে কাছে পাইয়া আমিও তবে দুইদিন নিশ্চিন্তে বাঁচিতে পারিব। পারো তো ইতিমধ্যে বাড়ীতে আসিয়া একবার ঘুরিয়া যাইও। ছন্দা নাই, রেবারাও এখান হইতে যাই যাই করিতেছে। আজকাল বড় একা পড়িয়া গিয়াছি। পারো তো একবার আসিও...'

চিঠি প'ড়ে নতুন ক'রে আর-একবার ভাবতে ব'স্‌লো বিজন।—রেবারাও তবে এতদিনে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবার উদ্যোগ ক'রছে, অথচ কেন ক'রছে—তার কারণ অজ্ঞাত। সময়ের কি অদ্ভুত ক্রিয়া, ইতিহাসের কি

অদ্ভুত ধারা! আসা যাওয়ার পথের পাশে মানুষের শেষ পদচিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকে না, সময় তার নির্ম্মম হাতে একদিন সব কিছু মুছে নেয়। কালস্য কুটিলা গতি—কালের গতি কোথাও মানুষকে জানান্তিক দিয়ে প্রধাবিত হয় না; তার পথ একেবারেই স্বতন্ত্র, একেবারেই অজ্ঞাত তা' মানুষের কাছে। এম্‌নি ক'রেই কালস্রোতে ভেসে চ'লেছে মানুষের জীবন।

কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে মা আজ এ কি ইঙ্গিত ক'রে পাঠালেন! তার শিক্ষার সার্থকতা গিয়ে পৌঁছাবে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের একটা নগন্য স্কুল-মাষ্টারীতে! ত্রিশ টাকা মাইনের শিক্ষক! এই জন্তেই কি মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উচ্চ-শিক্ষার অভিলাসে একদিন সে পা বাড়িয়েছিল এই কষ্টস্বীকৃত বিভুঁয়ে? মা তাঁর নিজের অভাবটাকেই হয়ত আজ বড় ক'রে দেখতে ব'সেছেন, নইলে তার শিক্ষার মূল্য তিনি অনায়াসে বুঝতেন।—মনে মনে বড় অভিমান হ'লো বিজনের। তাকে বুঝবার মতো আজ তবে এ সংসারে একটি প্রাণীও নেই! কিন্তু বেশীক্ষণ যে অভিমান নিয়ে ব'সে থাকতে পারলো বিজন, তা নয়। আর-একবার চিঠির অক্ষরগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে মায়ের জন্ত মমতায়, দুঃখে সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল তার। নিজের কথাটাকেই বরং এতক্ষণ বড় ক'রে ভাবতে গিয়ে মাকে ছোট ক'রেছে সে। বৈধব্যের ভারে অবনত জীবন, আজ আর এমন লোকটি কেউ নেই—যে আপদে বিপদে দেখতে পারে মাকে। এতদিন ছন্দা থাকতে এ প্রশ্ন কখনও মনে জাগেনি। ছন্দার উপর নির্ভর ক'রে সুখ ছিল, রেবা সম্পর্কে সে নির্ভরতার প্রশ্ন কোনোদিনই আসে না। যেমন ক'রে ক্রমেই অসুখে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছেন মা, কবে না জানি সত্যিই তবে হারাতে হয় তাঁকে। মা-ই যদি সংসারে না রইলেন, তবে কি সুখ তার সে সংসারে?

বিরুদ্ধ দুই চিন্তাসূত্রে কতক্ষণ যে আবদ্ধ উর্ণনাভের মতো নিজের মধ্যে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ব'সে রইল বিজন, ত সে নিজেই বুঝতে পারলো না; পরে একসময় হাতের মুঠোয় কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চিঠিটার জবাব লিখতে ব'সলো মাকে। তার মোটামুটি বক্তব্য হ'চ্ছে—মার শরীরের কথা চিন্তা ক'রে সে অত্যন্ত উতলা হ'য়ে পড়েছে। এসম্পর্কে সে তাদের ভাগ-চাষি তসর আলীকে স্বতন্ত্র চিঠি দিচ্ছে, সে যেন সর্ব্বদা এসে মার খোঁজখবর ক'রে প্রয়োজন মতো হাট-বাজারের কাজ-কর্ম্মগুলো চালিয়ে দেয়। সামনে পরীক্ষা এসে যাওয়ায় তার পক্ষে এখন আর মাগুরা যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তার ইচ্ছে নয় যে, এত সত্বরই মা সরস্বতীর পায়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে গ্রামে যেয়ে ত্রিশ টাকার মাষ্টারী করে সে। এতে যেন দুঃখ পান না মা; শিক্ষার একটা স্বতন্ত্রই মূল্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সে মূল্য সে আদায় ক'রে নিতে চায়। ছন্দা চ'লে যাবার পর তবু রেবারা ছিল এতদিন, দু'টো কথা ব'লবারও অন্ততঃ মানুষ ছিল তবু, আজ কেন যে তারাও হঠাৎ চ'লে যেতে উদ্যোগী হ'চ্ছে—এই কথাটাই আজ তাকে বারবার বিস্মিত ক'রছে। এম্‌নি ক'রেই কি গ্রাম একদিন ফাঁকা শ্মশান হয়ে যাবে? আর সেই শ্মশান-ভূমিতে ব'সে খেজুর, তাল আর ঝাউয়ের শাখা গুণে গুণে দিনগত পাপক্ষয় ক'রতে হবে তাদের?...

* *

গ্রাম একদিন সত্যিই ফাঁকা হয়ে যাবে কিনা, সেটা অবশ্য দূরের কথা; তবে মিঃ মল্লিক যে আর মাগুরায় থাকতে ভরসা পাচ্ছেন না, একথা নিশ্চিত। নিতান্ত অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই ইতিপূর্ব্বে বিজনকে চিঠি লেখেন নি নির্ম্মলা। মিসেস মল্লিকই একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে তুলেছিলেন কথাটা।

ম্যালেরিয়ার বীজাণু উড়ে বেড়াচ্ছে সারা যশোহরের আকাশ দিয়ে। সেই বিষাক্ত বীজাণু এসে আক্রমণ ক'রেছে মাগুরার মাটিকে। দীর্ঘকালের মধ্যে না-কি এ অঞ্চলে এরকম ম্যালেরিয়া দেখা যায়নি। এটা অবশ্য মিঃ মল্লিকের উক্তি, নইলে এ অঞ্চলের মানুষেরা এমন ম্যালেরিয়ার সঙ্গে পরিচিত জন্মাবধি। গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, জ্বরের মধ্যেও তাই অন্নপথ্যটা বাদ যায় না। কিন্তু মিঃ মল্লিক একটু স্বতন্ত্র জাতের মানুষ। চিরকাল সৌখীন প্রকৃতির লোক তিনি। তা ছাড়া রোগপীড়া সম্পর্কে আতঙ্কটা তাঁর চিরকালের। বিশেষ ক'রে কি

একখানি বিলেতী জার্ণাল থেকে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে কোন্ এক ইউরোপীয় ডাক্তারের একটা থিসিস্ প'ড়ে রোগটা সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। এখানকার মাটি ত্যাগ ক'রে যেতে পারলে তিনি শ্বাস ফেলে বাঁচেন।

নেপথ্যে আর-একটা কারণও যে না ছিল, এমন নয়। রেবা ক্রমেই বয়সের উর্দ্ধসীমায় এগিয়ে চ'লেছে। এখানে থেকে ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ নেই। সারা বংশের একমাত্র মেয়ে, নানা আশা পল্লবিত হ'য়ে উঠচে ওকে কেন্দ্র ক'রে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে, সঙ্গীতে রেবা হবে সবার মূর্ত্তিমতী আদর্শ। অভাব নেই জীবনে। অভাবটা শুধু পরিবেশের। মাগুরার মতো গ্রাম্য-মহকুমার বুক আঁক্‌ড়ে প'ড়ে থাকলে কোনোদিকেই রেবাকে উজ্জ্বল ক'রে গ'ড়ে তোলা যাবে না। কিছুদিন থেকেই চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রছিলেন তাই মিঃ মল্লিক। ক'লকাতায় তাঁদের নিজেদের সমাজের বহু লোক র'য়েছে, আত্ম-পরিজনে ছড়িয়ে র'য়েছে সারা ক'লকাতা। তারাও আগ্রহ ক'রে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। অতএব আর কালবিলম্ব নয়। অকস্মাৎ যদি ম্যালেরিয়ার অতর্কিত আক্রমণে শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়তে হয়, সমস্ত আশাই তবে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।...

দিন দেখে একসময় তাই সত্যি সত্যিই রওনা হ'য়ে প'ড়লেন তিনি ক'লকাতায়।

আক্ষেপ ক'রে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'সুখে দুঃখে জড়িয়ে ছিলাম এতদিন দিদি, রক্তের সম্বন্ধ ভিন্ন ভাবতেই পারিনি কিছু। এমন ক'রেও আজ কাঁদিয়ে যেতে পারলেন?'

জবাব দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ থামলেন মিসেস মল্লিক, তারপর ব'ললেন, 'আমিই কি আপনাদের ছেড়ে খুব শান্তিতে যেতে পারছি! উনি হঠাৎ ক'লকাতায় চিঠি লিখে সব কিছু পাকাপাকি ক'রে ফেললেন ব'লেই না—'

কথাটা শেষ ক'রতে পারলেন না মিসেস মল্লিক।

রেবা এসে একসময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে সে ঢিপ ক'রে নির্ম্মলাকে প্রণাম ক'রে ব'ললো, 'কখনও ক'লকাতায় গেলে নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের ওখানে যাবেন মাসীমা। আমি ওখানে পৌঁছেই ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবো।'

—'আমার অদৃষ্টে হবে আবার ক'লকাতা দর্শন!' খেদোক্তি ক'রে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'কবে শুনবি মাসীমা তোদের চক্ষু বুজেছে।' আদর ক'রে রেবার চিবুক স্পর্শ ক'রতে গিয়ে অলক্ষ্যে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল নির্ম্মলার। ব'ললেন, 'ধ'রে রাখবার মতো তো জোর নেই, নইলে ব'লতাম—থেকে যা মা।'

কিন্তু যাত্রাপথ ততক্ষণে প্রসারিত হ'য়ে গেছে নবগঙ্গা-প্লাবিত মাগুরার উপলখণ্ড থেকে বহুজনপদ-পরিকীর্ণ ক'লকাতার রাজন্ত-পরিবেশে।

পিছনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধ'রে যে অপলক-নেত্রে তাকিয়ে রইলেন নির্ম্মলা—কারুরই তা চোখে প'ড়লো না।

একসময় এসে উঠলেন তাঁরা ক'লকাতায়। মিঃ মল্লিকের পত্রানুযায়ী আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা হ'য়ে ছিল। রাসবিহারী এভিন্যুর উপর কলাপ্‌সিব্‌ল্ গেটওয়ালা দ্বিতল বাড়ী। সামনে লনের মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বাড়ীটা নতুন না হ'লেও একেবারে পুরনো নয়। উপরে নীচে মিলিয়ে তিনখানি শোবার ঘর, তা ছাড়া যাবারি হল-ঘর একটি। সব দিকেই সুবিধে। ইজিচেয়ারে একসময় টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে একবার আরামের নিশ্বাস টান্‌লেন মিঃ মল্লিক।—'আঃ—, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আপাতত মুক্তি পেয়ে বাঁচা গেল।'

সমস্ত দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠে এতদিনে নিশ্চিন্ত হ'লেন মিঃ মল্লিক। [ক্রমশঃ

সাহিত্য সমাজ

শান্তি রায়

সভ্য সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান, সুগঠিত নাগরিক জীবন সংস্থা যেমন প্রয়োজন, সাহিত্যেরও তেমনি প্রয়োজন। কেন এ প্রয়োজন, কি কি—প্রয়োজন সাহিত্য মাধ্যমে মিটিবার সুযোগ ঘটে। ব্যক্তির ও সমাজের বহুধা বিভক্ত আয়োজনে সাহিত্য কতটা রস সিঞ্চনে, জ্ঞান সঞ্চারে আয়োজনকে সৌষ্ঠবপূর্ণ করে, পূর্ণতর করে, সে সব প্রশ্ন গুরুতর প্রশ্ন, এবং উত্তর দানে কিঞ্চিৎ মনীষা, মননশীলতা, উদারতা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির প্রয়োজন রাখে। একাধারে বহুতর গুণ-সমন্বয় ঘটলে তবেই এ সব কিছুর সম্যক সমাধান, তথা উত্তর দান সম্ভব। সে প্রকারের কোন চেষ্টা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের চেষ্টা অতি ক্ষুদ্র এবং সামান্য। বলা চলে ভাষা দ্বারা একটি চিত্র অঙ্কন যদি সম্ভব হয়, এবং অঙ্কিত চিত্র যদি ভাবের মাধ্যম হ'তে পারে তা হ'লে এ প্রবন্ধে সেরূপ চেষ্টাই করা হবে।

এখানে কোন প্রশ্ন নয়, সমস্যাও নয়। এখানে শুধু মাত্র সমাজ মধ্যে ক্ষুদ্রতর একটি সমাজের বহিঃপ্রকাশকে শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। নিঃসন্দেহে চিত্রকর অঙ্কিত বনভূমি কিংবা উদ্যানাংশ যেরূপ সীমায়িত প্রকাশ মাত্র উহা বনভূমি কিংবা উদ্যানাংশ নহে, এক্ষেত্রে বৃহত্তর কিংবা বিশিষ্ট কোন মানবিক সমাজের অন্তর্দেশে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠি বিরাজমান, তাহারই একটি প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু প্রতিফলন মাত্র, সে গোষ্ঠি নহে।

গোষ্ঠী নাম ঐতিহাসিক কারণে অত্যন্ত সাময়িক, সংস্কার সম্পৃক্ত এবং গণ্ডিবদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। যে কারণে সমাজাংশ অধিকতর প্রযোজ্য—মানবিক সমাজ এক বহুধারা সমন্বিত বৃহৎ গোষ্ঠী, কিন্তু ইহারই আশ্রয়ে ক্ষুদ্রতর অনেকানেক অংশ বর্ত্তমান। ক্ষুদ্রতর অংশ নিঃসন্দেহে বৃহত্তর দেহে লীন; কিন্তু এই বিভিন্ন অংশ-গুলিরও কতক কতক নিজস্ব নিয়ম বর্ত্তমান, এবং যে নিয়ম-কানুন ঐতিহাসিক কার্য্যকারণেই খানিকটা স্বকীয় ধ্যান ধারণা ও পরিচালনাবদ্ধ। স্থূল কথা এই যে, বৃহত্তর সমাজের অনুবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য মার্জ্জিত, বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার নিজস্ব কতগুলি নিয়ম-কানুন বর্ত্তমান।

এই সব নিয়ম-কানুনকে আশ্রয় ক'রে যুগে যুগে সাহিত্যের সমাজও ধারাবাহিকরূপে চলে আসছে। ক্ষুদ্রতর অর্থে এর নাম আমরা দিতে পারি সাহিত্যিকের সমাজ। সুষ্ঠু অর্থে ইহাকেই সাহিত্য সমাজ বলা চলে। অনেকানেক সাহিত্যিক তাঁদের বিভিন্ন ধারা দিয়ে বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজকে পরিপুষ্টি দেন, বায়বীয় দেহে রক্তমাংস চিন্তা অনুভূতির যোগান পড়ে এবং সাহিত্যের সমাজ গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে আদান প্রদান ব্যবস্থা বহু পরিমাণে সাহিত্যের এই সমাজ কর্ত্তৃক নিয়মিত, পরিচালিত ও সংহতি প্রাপ্ত হয়।

এই সাহিত্য সমাজ তথা সাহিত্যিক সমাজের বর্ত্তমান স্ব-রূপের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভাষা মাধ্যমে ভাব প্রকাশ তথা এ সমাজের বহির্দিক থেকে চিত্রটি কি, তার অঙ্কন চেষ্টাই এখানে উদ্দেশ্য।

এই সূত্রে অতীত ইতিহাসের দুটি চিত্র মনে পড়ে। একটি অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের, আর দ্বিতীয়টি উনবিংশ শতকের প্যারিস।

প্রথমটি ডক্টর জনসনকে কেন্দ্র ক'রে যে সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার কথা। নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য সমাজের পুরোপুরি বাস্তব রূপটি জনসন-কেন্দ্র গোষ্ঠী থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেকটা প্রতিফলিত। সে যুগের গরীব এবং গরীবদরদী লেখক গোল্ডস্মিথ, বাগ্মীপ্রবর বার্ক এবং শেরিডান, শিল্পী রেনল্ডস্, জীবনীকার এবং স্কচদেশীয় প্রায় অসাহিত্যিক (?) বস্ওয়েল এবং কেন্দ্র সাহিত্যিকের

চেয়ে মানুষ বড় জনসন। জনসন ছিলেন একজন ওজনদার সিধে মানুষ। ইংরেজীতে বলা চলে 'একজন সাহিত্যিক বুলুই (bully)। এরা পাঁচটি লোক একত্রিত হন প্রায় সন্ধ্যায়। কফি খেয়ে, গল্প ক'রে, আলোচনা এবং তর্ক ক'রে এঁদের সময় কাটে। কিন্তু এ গোষ্ঠীর প্রাণের টানটি কোথায়? কিসের টানে এরা 'পাঁচ জন' আসেন, বসেন, গল্প করেন? একটা টান সময় কাটানো। আর একটা টান বোধ হয় এঁদের আন্তরিক বিশ্বাস—এঁরাই সে কালীয় সাহিত্য আর সংস্কৃতির পরিচালক। তাছাড়া প্রাণের টান হিসেবে কিঞ্চিৎ পরস্পরের সাহায্য ত ছিলই। কিন্তু একান্ত মুখ্যভাবে পরস্পরে গল্প করা অর্থাৎ যা দিতে পারলেন না এবং অন্যে যা দিয়েছে তা নিয়ে কপ্চান। গোল্ডস্মিথ দরিদ্র, তাঁর বই প্রকাশে সাহায্য ক'রে তাঁকে দু' চার, দশ টাকা দিয়ে গোষ্ঠীমন বেশ খুসী। প্রকাশ্যে এ-সবই ধরা পড়ে। অপ্রকাশ্যে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে, সেটা প্রভাব—ব্যক্তি প্রভাব। আবার ঠিক ঠিক ব্যক্তি প্রভাবও নয়। ব্যক্তি প্রভাব আরও পাঁচটা মনের ভিতর দিয়ে চুইয়ে যেটুকু ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে, সেই প্রভাব। জনসন-এর কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রের খাস জন বুলিয় (John Bull) মনোভাব কি বাগ্মী প্রবর বার্ককে তাঁর ফরাসী বিপ্লব নিয়ে চিন্তাধারায়, কিংবা তার ব্রিটিশ বিধি ব্যবস্থা নিয়ে মতবাদে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নি? কিংবা গোল্ডস্মিথের সাবলীল স্বচ্ছধারায় জনসনীয় বাক্যস্রোত কি কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি করে নি? কিন্তু এ হচ্ছে একান্ত প্রশ্ন। জনসন কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডীয় সাহিত্য সমাজের আংশিক প্রতিবিম্বন। সুইফ্ট সে যুগেরই লোক, কিন্তু তিনি এর ধার-পাশেও নেই। কবি পোপ সাহেবও দূরে ছিলেন। বস্তুতঃ গ্রাব ষ্ট্রীটের (Grub Street) লেখক বর্গ এখানে একান্ত ভাবেই অনুপস্থিত। ইতিহাসে তাঁদের কথা শুধু ঐ টুকুই লেখে: হাবাতে সাহিত্যিকের দল, শুধু হাবাতে নয়, ভিক্ষুক গোষ্ঠীর সমপর্য্যায়ভুক্ত। পোপের ঠাট্টায় কিংবা অন্য সাহিত্যিকদের উদার কিংবা অনুদার উল্লেখে এইসব লেখকবর্গের কথা জানতে পাই। সুইফ্ট, পোপ, গ্রাব ষ্ট্রীট আর জনসন কেন্দ্র গোষ্ঠী—এই এঁদের নিয়ে লণ্ডন সহর (তখন সাহিত্য সহরের সীমাতেই বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিল)। দেখা যাচ্ছে, সে সমাজের আইন কি, কানুন কি, গতি পদ্ধতি, বিধিনিষেধ, চলাচলের ধাঁচ ইত্যাদি কি? এক কথায় এর উত্তর 'মধ্যযুগীয়'। অর্থাৎ লাটবেলাট কাউকে খুসী ক'রে মার খেয়ে মার দিয়ে সুবিধা বুঝে দলে বেদলে নাম লিখিয়ে এবং সুবিধা বুঝেই নাম খারিজ ক'রে কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালে বেশ ভালই, —আর নয় ত ঐ গ্রাব ষ্ট্রীটে আশ্রয় কিংবা অন্য কিছু পথে পা বাড়াও। অবশ্যি সবটাই একেবারে স্থির ধীর নয়, পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু মোটা ফ্রেমটা এই।

এরপর ঊনবিংশ শতকের প্যারি। গোটা তিনেক বিপ্লবের ধাক্কাকে কাটিয়ে প্যারি নগরী যেসব সাহিত্যিকের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁদের গোষ্ঠী,—ইকোল স্ত মেদাঁ, স্যাচারেলিষ্ট সাহিত্যিক বর্গ, —এবার তাঁদের কথা।

কাল বদ্লেছে। সমাজের ব্যবস্থাদি পাল্টে গেছে। খবরের কাগজ, মাসিক কাগজ, প্রকাশক বর্গ,—সবাই সামাজিক প্রয়োজনে বেশ ঠাঁই পেয়ে গিয়েছেন। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্কটা পূর্ব্বের চেয়ে সহজ হয়েছে, সোজা হয়েছে। খাতায় লেখা আইন তৈরী হয়েছে। সাহিত্য জীবন ধারণের একটা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে গিয়েছে। তাতে মাদাম পাঁপেদোরের নামাঙ্কনের প্রয়োজন ঘটছে না, ডিউক অমুককে প্রশস্তি জানাবারও প্রয়োজন ঘটছে না।

এবারের গোষ্ঠী গড়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে এমিল জোলাকে কেন্দ্র ক'রে। উদ্দেশ্য জোলার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া নয়, বুদ্ধি নেয়া কিংবা দার্শনিক ইঙ্গিত নেয়া নয়, উদ্দেশ্য সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তন। ফরাসী সাহিত্য নানা ঐতিহাসিক কার্য্য কারণে নূতন পথে পথ খুঁজছে; সেই পথের পথিকরা ক্রমে ক্রমে জুটছে একসঙ্গে। জোলার বাড়ীটি নির্ঝঞ্ঝাট। স্ত্রী আর মা ছাড়া কেউ নেই। তারাও নির্ব্বিবাদি-লোক। বাড়ীটি সে রাড়ীর সবচেয়ে উঁচুতে। প্রাণ ভ'রে রাত ভোর চেঁচিয়ে গেলেও কেউ বাধা দেবার নেই। আর পকেটের অবস্থা প্রায় সবারই সমান। অর্থাৎ সাহায্য ক'রতে গেলে সত্তর

জনেই পেতে পারে। না ক'রলে কেউ দাবী করছে না। এ হচ্ছে বাইরে থেকে। আর নিজেদের ভেতরে? অবশ্যি যে যতটা পারে একে অপরকে টাকা দিয়ে নয়, পুস্তক প্রকাশে, গল্প প্রবন্ধ ছাপানোয় সুযোগমত সুবিধা-মত সাহায্য ক'রছে। আর ক'রছে সমালোচনা নিজেদের, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী অতীতের। নিজেদের আলোচনায় ধাঁচ ধরণটা লক্ষ্য ক'রবার মত। স্যাচারে-লিষ্ট ধাঁচটা কোনদিক দিয়ে কিরূপ নেবে, তারই আলোচনার ঝোঁক বেশী। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারটাই প্রধান, বাকীটা যার যার কর্ম্মফল। এই রাতভোর গোষ্ঠীতে একদিন এলেন মস্ত যোয়ান এক ভদ্রলোক। যেম্‌নি উঁচু, তেম্‌নি চওড়া। পুরুষ্টু এক জোরা গোঁফ। পায়ের ধাপে বাড়ী কাঁপে। কথা বলেন সোজা সোজা। যেম্‌নি স্বাস্থ্য তেম্‌নি তার পেশা,—তিনি জাতে (?) কেরাণী। জাত সাহিত্যিক দলে জাত কেরাণী এসেছে আড্ডা দিতে। অত বাঁধা কোথায়ও নেই। ক্রমে পরিচয় হ'ল। জানা গেল ইনি বেনামীতে গী দ্য মোপাসাঁ। কোনদিন গোষ্ঠীতে আসবার আগেই তিনি যেমন খুশী লিখেছেন, এবং যখন আড্ডা দিতে এলেন, তখন প্যারির প্রায় সম্রাট যোগ্য ব্যক্তি, ইউরোপ থেকে সুদূর রাশিয়া পর্য্যন্ত তার জয়গানে উন্মুখ। গী দ্য মোপাসাঁ এলেন, বসলেন, গল্প করলেন, তারপর গল্প লিখতে চলে গেলেন। কি লিখবেন, কি নিয়ে লিখবেন সে ভাবনা তাঁর যেমন নেই, সে ভাবনা এঁদেরও তেম্‌নি নেই। কে কি লিখছে সেটা ওদের ভাবনা নয়। ওদের ভাবনা প্যারির প্রান্তবাসী দৈত্যসম (!) প্রতাপশালী ভিক্তর হুগোর আওতা থেকে মুক্তি পেল কিনা,—ওদের ভাবনা সাহিত্য বাস্তবের চিত্র হ'য়ে উঠতে পারছে কিনা। তাতে সাহিত্যিক যা খুসী ফুটিয়ে তুলুক, যেমন খুসী ভাষা হোক, শুধু যা লেখা হচ্ছে সেটা যেন যা দেখা হয়েছে তার চিত্র হয়,—তারপর জোলা বলুন তাঁর বইয়ে খৃষ্ট ধর্ম্মের ভ্রান্তির কথা, আর মোপাসাঁ খুঁজে বেড়ান প্রতি মুহূর্ত্তে একটা জীবন্ত মানুষ সেই বিপদসঙ্কুল অনবরত মানুষের জন্ম বিচরণে ক্লেশে দুঃখে মোপাসাঁ যদি পাগল হ'য়ে যান, উপায় কি? জোলা যদি নির্ব্বাসিত হন দেশ থেকে দেশেরই জন্যে, উপায় কি? আরও আছেন। আছেন গোঁক ভ্রাতৃদ্বয়, হ্যুসো, দিদেরো, দোদে, আর দূর প্রান্তদেশে নিঃসঙ্গ হুগো এবং আরও দূরে নিভৃত গ্রামে সেই প্রৌঢ়া মহিলা, —যিনি প্রতি রাত্রে দশ পৃষ্ঠা ক'রে লেখেন। কেন লেখেন তা তিনি অনেক আগে ভেবেছেন, তখন আর তা নিয়ে ভাবনা নয়,—তিনি জর্জ স্যাণ্ড। এইতো এঁরা, আর আঁতোল ফ্রাঁস একটু দূরে, একটু বা কাছে," কিন্তু প্রাবল্যটি নেই। নেই তা নিয়ে ঠাট্টা কিম্বা বিদ্রূপ। লেখ, লেখা নিয়ে ছাপাও। মানুষ যদি চায় তোমার লেখা, ভাল্, না চায়, লড়াই কর, আরও লেখ কিংবা স'রে পড়। আদর ক'রে ডেকে তোমায় নেবে, মানুষে নেবে, সাহিত্য সমাজ নেবে। অবিশ্যি যদি সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে থাক কিংবা থাক সৃষ্টির চেষ্টায়। বুনো আইন কি ছিল না? হয়তো ছিল। রেশারেশি দ্বন্দ্ব? তাও ছিল, কার চেয়ে কে বেশী ভাল লেখে, কে মর্য্যাদাটা বেশী পায়! কিন্তু ঢাক পিটিয়ে কিংবা পিটোবার ব্যবস্থা ক'রে রাতারাতি না হোক দু' চার দশ রাতে কিংবা দু' চার দশ মাসে—সে পথটি তখনও সে সমাজ জানতে পায় নি। অপর পক্ষে পাওনাগণ্ডা দেওয়াই রীতিনীতি। পাওনাগণ্ডা সাহিত্যিক সমাজ কি আর দেবে? টাকাও নয়, পয়সাও নয়। বড় জোর সভা ক'রে একটা ফুলের মালা আর গোটা দশ পনরো বক্তৃতা, তারপর যার যার সাধ্যমত সমালোচনা। এক কথায় স্বীকৃতিটা সাহিত্য সমাজের রেওয়াজ ছিল,—ভাল ব'লে হোক, মন্দ ব'লে হোক, অগ্রাহ্য কখনই নয়। আর একটু গভীরে গেলে সাহিত্য সমাজের কার্য্যকারিতা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে। ওরা যে সময়ের লোক, তখন সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য সমাজ এবং যে কেউ সাহিত্য সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট, তিনিই সমাজভুক্ত।

এবার অত দূরে নয়। না কালে, না দেশে: ঘরের কাছে ব্যক্তিগত একটা চিঠি থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দেবার সুযোগ নেব। "এখানে যা ঘটছে ত ঘটছে নাকের ডগায়। ঘটছে মানে বদ্‌লাচ্ছে, বদ্‌লে যাচ্ছে তাই দেখি। হাত পা গুটিয়ে দর্শকের মত দেখা আর মনে তার ছাপ নেয়া, এই ত কর্ম্ম। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যদি বদলায়, সেখানে কর্ম্মের অসুবিধে, ছাপ নেয়ার কাজটাই সুবিধের। কিন্তু আপাতত দুইটি কারণে এই

ছোপছাপটা দেখাতে পারছি না। এক নম্বর এটা এখনও চলছে, আর দুই নম্বর ব্যক্তিজীবন (?) এসে যাবে। অতএব সেটা থাক। তুমিতো ঊনবিংশ শতকের ছাত্র, সাহিত্যেরও ছাত্র। তুমি আজ এখানে থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে ভাল। ওদিকে আমার তেমন দখল নেই, তাই সাদা চোখে খোলা মনে যা দেখি তাই বিস্ময়কর মনে হয়। সন্দেহ হয়, প্রশ্ন জাগে, এ ভাবেই কি সাহিত্য বৃদ্ধি পায়?"

চিঠি থেকে মতোদ্ধারটা অই পর্য্যন্ত। আরও দু' চারটে লাইন ছিল, তাও থাক। যাকে লিখেছিলাম সে পড়াশুনো করে। আর মাসমাহিনাও পায় ভাল। অতএব সেখানে আলাদা কথা।

এখানে সামাজিক রূপটা অন্তরূপ। সমাজ আছে বৈ কি, সমাজ ছাড়া কি সাহিত্যের চলে? প্রতিজনে সমাজ, প্রতিজনে গোষ্ঠী। দু'দিন, চারদিন একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, আবার ভেঙে বা ভেসে যায়। গোষ্ঠীর গোড়ায় সাধারণতঃ থাকে আদর্শ বা বাস্তব দৈনন্দিন প্রয়োজন। এছাড়াও থাকে। আদর্শ নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজন নয়, দৈব দুর্বিপাক আর বদহজম। তা সে বদহজম জমানো কথার জন্যেই হোক কিংবা হোক মানবেতর স্বভাবের উন্মেষে।

সাহিত্য সমাজের একটা বড় প্রয়োজন বৃহত্তর সমাজ থেকে নিরন্তর রস সংগ্রহ আর পরিবেশন, তার চেয়েও বড় কথা রসবাহী ক্রমাগত আসছে, ভিড় করছে, যা দেবার দিচ্ছে, তার পর অন্তিম দরজা দিয়ে সরে পড়ছে। তা সে অন্তিমটা ব্যক্তিই হোক্ কিংবা হোক্ দেয়া নেয়ার অন্ত। এই আসা যাওয়ার পথটি খোলা থাকা এর জীবনের সবচেয়ে বড় জীবনী।

কিন্তু সাহিত্য সমাজটা যখন ঢিলেঢালা অথচ পুরোনো আদব কায়দা যখন পুরোপুরি বজায় আছে, তখন প্রবেশ নিষ্ক্রমণের পথটিও সেখানে রুদ্ধ। প্রবেশও নেই, নিষ্ক্রমণও নেই। ব্যাপারটা এই মত—সাহিত্যিক, পাঠক, প্রকাশক, সম্পাদক সবাই মিলে কাছে, দূরে, একটা বৃহত্তর জীবনের চাহিদা মেটাতে একটা সমাজ গড়ে তুলছে। তার জীবনে প্রতিনিয়ত নবীনের আগমন, প্রাচীনের নবজন্ম আর ফসিলের অপসরণ। সর্ব্বব্যাপী একটা স্বীকৃতি, অদৃশ্য এক নৈতিক প্রয়োজনের দাবীতে এদের একত্রন এবং কর্ম্মের যোগান। কিন্তু এসমাজটা হঠাৎ থমকে গেল। এগিয়ে যাবার সাহস হ'ল না, দাঁড়িয়ে থাকলে মৃত্যু সুনিশ্চিত অতএব পিছিয়ে পড়ল। পিছিয়ে যাওয়াটা সাময়িক, কারণ জীয়ন-কাঠি পাঠক গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঁধা,—অতএব বদ্ধ কক্ষে প্রতিনিয়ত পদচারণা। পাঠক গোষ্ঠী পিছিয়ে যেতে পারে না, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার একান্ত আত্মীয়তা। সামগ্রিক জীবন থেকে যে সমাজ পিছিয়ে গেল আর শুরু করল আবর্ত্তন—তার জন্য একটা দাম সে দিলে,—সে দাম প্রতিনিয়ত আত্মমন্থন আর আত্ম ধ্বংস। ফলে সমাজটা খান খান হ'য়ে আকাশকুসুম সৃজনের একতরফা কর্ম্মতার অধিকরী হ'য়ে রইল।

এই সূত্রে শ্রদ্ধেয় কোন সমালোচকের কথা মনে পড়ে। একদা পথিমধ্যে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলছিলেন, কানে গেল: লিখব না। এবার শুধু পড়ব। আমার লেখা পড়বে শুধু রামবাবু আর রামবাবুর লেখা পড়বো শুধু আমি, সেটা এবার থাক।

বাকী কথাটা ট্রামে উঠে পড়ার শোনা হয় নি। কিছু ক্ষতিও হয় নি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যা কিছু তাও ভাল বইয়ের ভাল কথা। সাদা মোটা কথাটা অতি সহজ। সমাজের দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন ওখানে প্রবেশের দ্বারও বুঝি রুদ্ধ। ও সমাজের অন্তর্দ্দেশে যাঁরা বিরাজমান তাঁরা চকিতেই জেনেছেন ভেতরে কেউ আসবে না, ক্রমে এও জানছেন—বাইরেও কেউ থাকে না। ও আবদ্ধ ঘরে মরিচীকার মায়াজালই একমাত্র সৃজন সম্ভব আর সেটাই তাঁদের একমাত্র করণীয়। ওখানে জীবনের ফসল ফলে না।

কিন্তু হা হতোস্মি, ভূতের উপদ্রব। অবস্থা নেই, ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনকে নানা প্রয়োজনেই গলা টিপে মারা হয়েছে। ভূতটা থেকে গিয়েছে। সরগরম সভা, তীক্ষ্ণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা তথা নির্দ্দেশ দান, বয়োজ্যেষ্ঠের অতীত দাবীতে অর্থহীন জ্যেঠামি—থেকে গেছে এবং কেন? একেই বলে ইতিহাসের

বাস্তবটা মরে যায়, ধাচ ধরণটা বেঁচে থাকে। সে হচ্ছে ভূতের উপদ্রব।

এবারে সমাজটা কি দাঁড়াল? এখানে জনে জনে সম্পর্কটা কি? এ সমাজের প্রয়োজন আয়োজন কি? নিয়ম নিষ্ঠা কি? কি তার ধরণ, কি তার বচন বিন্যাস?

বন্বাদারের আইন নয়, কারণ কলা আছে, কৌশল আছে। আধিভৌতিক মন্ত্র তন্ত্র নয়, যদিও সে চেষ্টা আছে। অষ্টাদশ নয়, ঊনবিংশ নয়, একেবারে বিংশের মধ্যভাগ।—অর্থাৎ ধ্বংসের বিধি ব্যবস্থা যখন চরম সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হয়েছে। আর ভীতি সঞ্চার হয়েছে অদ্বিতীয় দর্শন।

অতএব বাকীটা অঙ্ক কষে-বার করা চলে। অর্থাৎ এ সমাজের আভ্যন্তরীন অবস্থা অনায়াসেই অনুমেয়। যেটা অনুমান করে চলে না, চোখ খুলে দেখা দরকার সেটা বাইরের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ। সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্য সমাজের অস্তিত্ব, কিন্তু সাহিত্যটা যখন উপলক্ষ্য, সমাজটা সেখানে অস্তিত্বহীন। সেখানে ব্যক্তি সম্পর্কে কৌশল, সৃষ্টিতে কায়দার প্যাঁচ, অবস্থানে বিভীষিকা অবস্থান নিয়ে আর ক্রমাগত 'হাসান হোসেন' জয়ঢাক—কিছু হচ্ছে না। যেখানে পাকেচক্রে দক্ষিণ হস্তে কলম পেষণ, বাম হস্তে দক্ষিণা গ্রহণ। তারপর যা ঘটে তা ঘটুক, যা জোটে সেটাই বাস্তব।

এরপর আছে কালোরাতের কানাকানি, দিনের আলোকে স্মিত হাসি, আর কালেভদ্রে কালের দোহাই দিয়ে যা হচ্ছে তাই যে হবে এবং যা হ'তে পারে তা যে কিছুতেই হতে পারে না, ক্রমাগত তারই পতাকা উত্তোলন। কেউ লিখবেন এরা ভাষা জানে না, কেউ বলবেন এ যুগে বড় কিছু হতে পারে না, কেউ কাদা ছুঁড়বেন, কেউ বা ইটপাটকেল, লক্ষ্য একই—প্রয়োজনটা অনস্বীকার্য্য।

অর্থাৎ গোষ্ঠী না থেকেও আছে, আইনকানুনও আছে। পাকা হাড়ের পাকা ব্যবস্থা। পাকা হাড়ে তা নয়, কিন্তু (একদা) কাঁচা হাড়ে অতশত বোঝেনি। তারা ক্রমাগত ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়ে, তারপর না পেকে দরকাঁচা মেরে গিয়েছে। পাকা হাড়ের এই পাকচক্রের দরকাঁচার দল জেনে বুঝে চোখ বুজে যোগান দেয়, কারণ দরকাঁচাদের বিপদ ভারি। তারা ছাড়তেও পারে না, রাখতেও পারে না। তারা বড়জোর বড়দের খবরদারির কাজটাই করতে পারে, তাতে টেবিলের উপর থেকে না জুটুক তলা থেকে কুড়িয়ে কাচিয়ে জুটবেই। বড়রাও ছিটেটা ফোঁটাটা অবস্থানের প্রয়োজনেই ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে যান। পাকাদের আতংকিত স্বরক্ষণ, দরকাঁচাদের লম্বাচৌরা লাঠি প্রদর্শন, অবশেষে আসছে (পরবর্ত্তী) কচি হাড়—কি সাহিত্যিক, কি প্রকাশক, কি সম্পাদক,—সবই কুম্ভীপাকের স্রোতে পড়ে হয় তলিয়ে যায়, যদি ওজন থাকে; আর নয়ত ভেসে থাকে, ছিটকে সরেও যায় দু'একটা। যারা ভেসে থাকে তাদেরই কথাটা যাহোক কিছু বলা চলে। ভেসে থাকতে ভেলা চাই। ভেলা তৈরি হয় কদলীর কাণ্ডে, এখানে ভেলা তৈরি হয় কদলী প্রদর্শনে। কোন প্রকারে ভাসতে ভাসতে কদলী প্রদর্শন, অতীতকে, বর্ত্তমানকে, ভবিষ্যৎকে, সম্ভাবনাও বাদ যায় না, সুনীতি দুর্নীতিও বাদ পড়ে না। সে কদলীও যদি পাকা হত! কিন্তু পাকবার অবসর নেই। প্রতি মুহূর্ত্তে নিমজ্জন আশঙ্কা, প্রতি মুহূর্ত্তে কদলী প্রদর্শন। আবার কদলী না হয়ে সেটা ছুরিছোরা গুলি বারুদও হতে পারে। তবে তার আয়ুষ্কাল কম, ছুরি বা গুলি মারবার মত কিছু থাকলে তবেই ওসব চলে। এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ চল্লেই বন্দুক বিকল হয়, ছুরিতে ধার কমে আর বস্তুরও অভাব ঘটে। দম ফুরোয়। ছুরিতে শান দিতে সময় যায়। ইতিমধ্যে ছুরি মারার মত কিছু বেরোয়—তবেই আবার ছুরি দর্শন চলতে পারে। ভেসে থাকার ভেলাতে তিন নম্বর হচ্ছে খাঁটি মাল। খাঁটি মাল এ যুগে একমাত্র মানব মানবীর দেহ। আর দেহ তত্ত্বের উপর ভর ক'রে ঝকঝকে বিজ্ঞানের নিশান উড়িয়ে ভেসে চলায় যা আমদানী হয়, তাও ভেজালহীন। এ ভেলার কাণ্ডারীরাও জানে কুম্ভীপাকের স্রোতে পাক খেতে খেতে চলাই একমাত্র সম্বল, অতএব কাণ্ডারী সাবধান, ভেসেও থাকবে আবার ডুবিয়েও মারবে। যারা ভাসতে ভাসতে ডোবে আর ডুবতে ডুবতে ভাসে আর

ভাবে, 'মন তুমি বাইতে জান না', তাদের করুণ অবস্থা। ছিঁটকে যারা বেরিয়ে আসে, তারা বোধ হয় বেরিয়েই আসে, অবিশ্যি জীবনের জন্ত মমতা বোধে। বেরিয়ে আসতে গিয়ে আবার যারা ছুটে গিয়ে পড়ে, তারা ভোগে। ভোগে মানে দুঃখ পায় তা নয়, ভোগে মানে ব্যামোতে ভোগে। তাদের দৈহিক মানসিক বিপর্য্যয় ঘটে। খানিকটা দিশেহারা খানিকটা দিকবিদিক শূন্ততায় ঘুরে ঘুরে নাভিশ্বাস টানে আবার ছুটে যায়। অথচ কিসের টানে?

গোড়ার কথায় ফিরে এলাম। এলাম একটু অন্ত পথে। ইতিমধ্যে সাহিত্য সমাজকে যারা খাজনা দেয়, অর্থাৎ যারা পকেটের পয়সা দিয়ে বই কেনে,—তারা? তারা অভ্যাসের দায়েই এখনও কেনে, কিন্তু প্রয়োজনটা মেটে না। মিটবে কি ক'রে? এ অবস্থায় মিটবার কথাও নয়। নরকের অগ্নিস্রোত যেখানে প্রবাহিত, সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত, চার দিকে কি ঘটছে তা দেখার সময় কোথায়? অতএব ট্যাক্স আদায়ে ঝকমকে শিরস্ত্রাণ পরে চৌকিদার পুজো-পার্ব্বণে ট্যাক্স আদায় ক'রতে বেরোয় ঠিক, কিন্তু টাকা মেলে না। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তথা পাঠকগোষ্ঠির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সাহিত্য সমাজের সম্পর্কটা শুকিয়ে উঠে ক্রমে খসে যায়। পাঠকদল অন্তদিকে মন দেয়। সিনেমা আছে, খেলার মাঠ আছে, রং তামাসা বাজি কৌতুক আছে। অবিশ্যি সিনেমায় গিয়ে ঠেকেই শেখে, এটা ওরই আর এক পিঠ। কিন্তু সেকথা এখানে নয়। অতএব ফল কি দাঁড়ায়? ফলে দাঁড়ায় দাবানল, অন্তর্দ্দাহন, আর বিভীষিকা। সেই আশ্রয়ে সাহিত্যের প্রাণ বে'রয়, আর সাহিত্য সমাজ কঙ্কালের দন্তপাটি বিকসনকে নকল ক'রে হাসে, আর চিত্রগুপ্তের খাতা চোখের উপর খোলা থাকতেও সই ক'রেও সই করে না।

★

যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিন্দুমাত্রও বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই। যেখানে আপাত দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেইখানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মানুষের কার্য্যের বিষয় এবং রকম অনুসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্ত্তিত শক্তিসম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব, সেইখানেই বুঝিতে হইবে মানুষের কার্য্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন-না-কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, সে তাহার কার্য্যের বিষয় ও রকম বাছিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব, তাহার কার্য্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।—সচ্চিদানন্দ

তিব্বতের রাজধানী লাসা

সমুদ্রের তীর থেকে প্রায় ১২,০০০ ফিট উঁচুতে, চারদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত হ'য়ে, সাহসী বীর লামাদের দ্বারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত, তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরী যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে পর্য্যটকদের এবং আবিষ্কারে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের আকর্ষণ ক'রে আসছে। তথাকথিত এই নিষিদ্ধ নগরীর অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রথম একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী প্রবেশাধিকার পান। তৎপর ১৮১১—১২ সালে টমাস ম্যানিং নামে একজন পর্য্যটক লাসাতে প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি কোনো বিবরণ রেখে যাননি। শোনা যায়, উইলিয়াম মুরক্রফ্‌ট নামে একজন ইংরেজ মুসলমানের ছদ্মবেশে এখানে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করেন। তাঁদের পর লাসায় শ্বেতাঙ্গ মানুষের যাত্রা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়। তৎসত্ত্বেও একদল লোক এই নগরীতে প্রবেশের আশায় অনুমতি চেয়ে বহুবার বিফলমনোরথ হ'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮৮৯ সালে রাজকুমার হেন্‌রী ডু অর্লে‌ন্স্‌-এর নাম উল্লেখযোগ্য, এতদ্ব্যতীত কুমারী টেলার নামে একজন ইংরেজ রমণী এবং মিঃ ও মিসেস্ লিট্‌ল্‌ডেল যথাক্রমে লাসার ১৫০ ও ৮০ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হন ; বিখ্যাত সুইডিস্ পর্য্যটক ডাঃ স্তেন হেডিনের নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ পণ্ডিত নইন্ সিং, পণ্ডিত কৃষ্ণ, শরৎচন্দ্র দাস প্রমুখ কতিপয় ভাগ্যবান ভারতবাসীর নাম করা যেতে পারে। নইন্ সিং দু'বার লাসায় গমন করেন, প্রথমতঃ ১৮৬৬—৬৭ সালে, পরে ১৮৭৪ সালে। পণ্ডিত কৃষ্ণ ১৮৭৮ সালে এবং শরৎচন্দ্র ১৮৭৯ সালে লাসায় যান। শরৎচন্দ্র ছিলেন দার্জ্জিলিংয়ের এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁকে তশিলহুন্‌পো মঠে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

পোতালা প্রাসাদ

১৯০৪ সালে লেঃ কর্ণেল (পরে স্যার ফ্রান্সিস্) ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালনা করার পর এই নগরীর নির্বিঘ্নতা ভঙ্গ হয়। এরপর ১৯২০ সালে তিব্বতের বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার চার্লস্ বেল্ তিব্বত সরকার কর্ত্তৃক লাসায় নিযুক্ত হন। এই মৈত্রীর কারণ অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায় যে, ১৯১০—১১ সালে চীন কর্ত্তৃক তিব্বত আক্রান্ত হ'লে ভারত সরকার দলাই লামাকে দার্জ্জিলিংয়ে আশ্রয় দান করেন। ১৯২২ সালে লাসার সঙ্গে ভারতের টেলিগ্রাফে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এ পর্য্যন্ত তিব্বতে কোনো রকম যান্ত্রিক উদ্ভাবনী ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। যানবাহনের পরিবর্ত্তে 'সিউল ট্রাক্‌স্' বা অশ্বতরই সুউচ্চ হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। দুর্গম গিরিপথ দিয়ে এরকম পথ বহু আছে। কালিম্পং—লাসা বাণিজ্যপথ ছাড়া এই সমস্ত গিরিপথই শীত ও বসন্ত কালে বরফে অবরুদ্ধ থাকে। তিন শ' পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত এই রাস্তাটি গ্যাংসীর বাণিজ্য কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে এবং কতকগুলো সুবিধেজনক চটিতে বিভক্ত হ'য়ে চ'লে গেছে। এই সব চটিতে রাত্রে বিশ্রাম নেওয়া, নূতন ঘোড়া বা অশ্বতর নেওয়া এবং টাট্‌কা সব্জী কেনা হয়। এই পথে সব রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর হয়। কোথাও তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা, কোথাও সমতল ভূমি থেকে উচ্চ তৃণশাদ্বলহীন পর্ব্বতচূড়া, কোথাও নীল উপত্যকা ও সমতট। কোথাও বা চারদিকে বেষ্টিত হ্রদ এবং নদীর কর্দ্দমাক্ত উপলখণ্ড, কোথাও আবার স্বচ্ছ পাহাড়ী ঝর্ণা। পথের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে হ'লে যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণুতা ও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন।

দলাই লামা

লাসা নগরী চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত এক-প্রকার সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। এর দক্ষিণ পাশে সহর থেকে আট মাইল দূরে—কিইচু নদী প্রবাহিত হ'য়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে (ব্রহ্মপুত্রের উর্দ্ধধারা) সাংপোর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। লাসার চারদিকের পর্ব্বতরাজী শীতকালে অনুর্ব্বর থাকলেও গ্রীষ্মকালে সবুজ ঘাসে ও রঙীন ফুলে শোভা-সমৃদ্ধ-শালিনী হ'য়ে ওঠে। বৃত্তাকার এই সহরের অনেক স্থলই উর্ব্বর। এর মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের বাগান আছে। রাস্তাগুলো সরু হ'লেও প্রায় বিসর্পিল। বাড়ীগুলো সাধারণত মাটি এবং রোদে-পোড়ানো ইঁট দিয়ে তৈরী। কিন্তু বিশিষ্ট অভিজাত শ্রেণীর বাড়ীগুলো প্রায়ই ইঁট এবং পাথরের। তা ছাড়া কেবলমাত্র ভেড়া কিম্বা গরুর শিং দিয়ে মাটির গাঁথুনীতে তৈরী বাড়ীও দেখা যায়, এদের বেশীর ভাগই রুক্ষ ভাবের, তবে শক্ত গাঁথুনী ও দেখ্‌তে ছবির মতো সুন্দর বাড়ীও আছে।

পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়ে লাসার অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ র'য়েছে। সহরে প্রবেশ করা মাত্রই সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের চোখ পড়ে পোতালা পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ অট্টালিকার দিকে—যেটি হ'চ্ছে তিব্বতীদের ইহলোক পরলোকের, প্রাত্যহিক এবং পরমার্থিক জীবনের কর্ত্তা দলাই লামার দুর্গপ্রাসাদ। একজন বিদেশী পর্য্যটক এই প্রাসাদ সম্বন্ধে ব'লেছেন: 'এই রমণীয় চিত্রের মধ্যে কোনো কিছুরই অভাব নেই; স্থাপত্য শিল্প, গাছপালা, বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র, নদী, খাল, পাহাড়, পর্ব্বত—সবই এখানে উঠলে দেখতে পাওয়া যায়।' পোতালা থেকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে শহরের মাঝখানে এক সম চাতুষ্কোনিক কেন্দ্রে—যা বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে 'জো' বা ভগবান বুদ্ধের মন্দির

প্রতিষ্ঠিত—জোকাং নামে যা সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত। জোকাংয়ের সিংহদ্বারে একটি স্তম্ভ আছে—যা ৮২২ সালে তিব্বতের রাজা ও চীন সম্রাটের শান্তি-চুক্তির শিলালিপি বহন ক'রছে।

পোতালা পর্ব্বতের উপর সুউচ্চ প্রাসাদ থেকেই দলাই নববর্ষের উৎসব নিরীক্ষণ করেন। পনেরো দিন-ব্যাপী এই উৎসবে তিব্বতীরা মুখোসনৃত্য ও অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকে। হিন্দুদের বিজয়া ও মুসলমানদের ঈদের ন্যায় তিব্বতীরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরস্পর শুভেচ্ছার আদান-প্রদান ও মিষ্টান্ন বিতরণ করে। নববর্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য—প্রায় ৫৫০ বছর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত মোনলামের জয়ন্তী বা প্রার্থনা। এই উপলক্ষ্যে লাসায় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়—কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্ব পৃষ্ঠে ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে থাকে প্রার্থনাচক্র ও রন্ধনপাত্র এবং তারা প্রার্থনার স্তোত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে আসে।

বর্ত্তমান দলাই লামা শাসকগণের মধ্যে চতুর্দ্দশ উত্তরাধিকারী। ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই সীমান্তবর্ত্তী আমদো জেলার তাগচেরে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দলাই লামার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিব্বতীদের মধ্যে এই বিশ্বাস বলবৎ যে, দলাই লামার মৃত্যুর পর তিব্বতের কোনো না কোনো গৃহেই তাঁর পুনরাবির্ভাব হয়। এবং এখানকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাকে অনুসন্ধান ক'রে ঐ পদে বরণ করা হয়। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ কাল অনুসন্ধানের ফলে বর্ত্তমান দলাই লামাকে পাওয়া যায়।

—শ্রীদীপঙ্কর

প্রশ্নবাণ

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

আর কতদিন বাণীর সুধায় মারবে ক্ষুধা মহাপ্রাণী,
পেটে জ্বলে টাটার উনুন, জ্ঞান নিয়ে আজ টানাটানি ?
ভরা পেটে মিষ্টি কথা কানে লাগে বড়োই মিঠে,
তা' নইলে সে বাচালপণা—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

ক্ষুধা-কাতর অন্ন চাহে, তার মুখে আর সবই তিতো,
বেদ, বাইবেল কিংবা কোরাণ, ক্যাপিটাল বা গীতামৃত।
নিত্য নূতন বাণী, শ্লোগান, দলেদলে চুলোচুলি,
ফুটপাতে যে ধুঁকছে ক্ষুধায়, তারে কে নেয় কোলে তুলি ?

হৃদয় গেছে ম'রে, শুধুই ভুয়ো দরদ, সস্তা খেয়াল,
মাথায় কেবল টুপির বাহার—হলদে, সাদা কারো বা লাল।
হায়রে চির লোভনীয় লঙ্কাপুরীর সিংহ-আসন,
তোমার বুকে বসতে পেলেই রাম হয়ে যায় রাজা রাবণ।

ভোটের আগে ঠোঁটে যাদের মিষ্টি হাসি, স্পষ্ট কথা,
ভোট ফুরোলেই তাদের লেজে দড়ি দেবে কার ক্ষমতা ?

বহুরূপী

শ্রীমতী টুনু ঘোষাল

পৌষ মাস, হিমের জড়তায় চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু শীতের হাওয়া ছুটছে পাগলের মত,শিশু আর সালের বনে উঠছে মর্ম্মর ধ্বনি। আঁকা বাঁকা ঢালুপথ নেবে গেছে গাঁয়ের পথের দিকে। সৃষ্টির রুদ্ররূপ এখানের প্রকৃতিকে রুক্ষ করে রেখে দেয় যেন বারমাস, তবু আমার ভাল লাগে, শিল্পীর চিত্রপটে রঙবেরঙের তুলির আঁচড় দেখে দেখে ঝলমলে মন নিয়ে যেদিন বাংলাদেশ ছেড়ে বিহারের প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম, ভারী অবাক লেগেছিল। পাথরের পাহাড়ের কোলে শুকনো নদী আর পত্রবিহীন তরুকুঞ্জ মনকে আহত করেছিল বই কি প্রথমে, কিন্তু আজ আমার ভাল লাগছে বড়।—কথাগুলো টেনে টেনে বলছিল তন্ময় তার বন্ধু আবেশকে। আবেশ নিরুত্তরে হাসলো বিদ্রূপের হাসি। সে একটা রিয়্যাল ম্যান, সেন্টিমেন্টের কোন মূল্য নাই তার কাছে। দুদিন এসেছে আনন্দ করতে, ছুটি কাটলেই পালিয়ে বাঁচবে। পশ্চিমের জানালাটা খোলা ছিল, দমকা শীতের হাওয়া আসছে বারবার, আবেশ উঠে ধপাস করে বন্ধ করে দিলো জানালাটা। উঃ, কি কড়া শীত, জমে গেলাম। তন্ময় বলে—শীত আবার কড়া কিরে? আমরা কবির দেশের লোক, তেমনি করে যদি ভাবতে পারিস এই শীতকে, এত খারাপ লাগবেনা রে। জানিস না কবির সেই 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন' গানটা বিদেশে কি আদর পেয়েছে, তবুতো সে বরফের দেশ।

আবেশ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—দুত্তোর! দে দেখি একটা সিগারেট।

তন্ময় হাতের স্কেচটাতে আবার কলম চালাতে সুরু করলো। আবেশ সিগারেট জ্বালিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে বসলো, ঠিক এমনি সময় দোর ঠেলে ঢুকলো অশান্ত। আপাদমস্তক প্রায় ঢাকা। কোটের ওপর চাদর মোড়া, হাত দুটো অতি কষ্টে বার করলে সে, তারপর মাথার পট্টি খুলে বসতে বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল। মজা দেখে তন্ময় হাসি চাপতে পারল না। অশান্ত গেল চটে: বলি ঘরের দোর দিয়ে আছো তোফা, বাইরে যে ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে, টের পাও কিছু?

আবেশ অঙ্গভঙ্গি করে সুরু করলো,—'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকীর ঐ—'

অশান্ত আরো ক্ষেপে গেল,—ইয়ারকি হচ্ছে? ষ্টুপিড। বাবুগিরি দেখাতে এসেছ, লজ্জা করে না নিজেদের দেশের হাজার হাজার মা-বোন, ভাই একটুকরো আচ্ছাদনের অভাবে পথে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে, দেশ পালানো কাঙালের দল পথের কুকুরের মত দোরে দোরে ভিক্ষা করছে অন্ন বস্ত্রের জন্যে। ছিঃ, ছিঃ! দে, দে, একটা সিগারেট। অশান্ত তন্ময়ের দিকে হাত বাড়ালো। আবেশ উল্লাস করে হেসে উঠলো এবার—তার পর বল্লে সে—'দেখলি তো? সাধে কি বলি তোর সেন্টিমেন্ট চাপা দিয়ে রাখ। আর কিছু না পারিস, কিছু জমি কিনে তামাক গাঁজা-লাগা,দেশের ইন্‌ডাষ্ট্রি বাড়বে, মানুষের প্রতি মানুষের আত্মিক স্পীরিট বাড়বে।' এ কথা বলে আবেশ আবার হাসতে লাগলো প্রাণখুলে। অমন হাসি বড় একটা শোনা যায় না। এমন করে হাসে আবেশ মাঝে মাঝে। ঠিক এমনি সময় মমতা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো তন্ময়ের দিদি মমতা। শুধু তন্ময়ের দিদি বললে খুব সত্যি বলা হয় না, মমতাকে সংসারশুদ্ধ দিদি বলেই জানে। শ্রদ্ধা, ভালবাসা দিয়ে সবাই যেন তাকে একটা বিশিষ্ট স্তরে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। মমতাকে দেখে অশান্ত কুল পেলো।—আচ্ছা দিদি, তুমিই বলো এ অন্যায় সওয়া যায় কি না? মানুষ যদি মানুষের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে হাসি আনন্দ দুঃখ বেদনাকে না দেখবে, তবে মনুষ্যত্ব কিসের—হ্যাঁ দিদি?

মমতা বললে—তাতো নিশ্চয়ই ভাই।

অশান্ত ব্যাপারের আড়াল থেকে চাঁদার খাতাটা এবার বের করে ধরলো সবার সামনে—এই দেখ সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার এই সব করতে হচ্ছে। 'পূর্ব্ববঙ্গ রিলিফ'—উঃ, খাটতে খাটতে মরে গেলাম দিদি।

তন্ময়ের বুঝতে বাকী রইলো না, দিদি ভালমানুষ, যা পারেন তুলে দিয়ে দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আবেশ চালাক। মহানগরীর যত চ্যারেটী শো, তা—সে ম্যানেজ করে। সে অশান্তকে শান্ত করে বললে, আরে বোস এসব ব্যাপার খুব মাথা ঠাণ্ডা করে, বুঝলি? কাজটা ভাল: যদি বিধাতা না মারেন, খাটুনিতে মরবি না নিশ্চয় জানিস। তন্ময় দেখলো—কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে, পরামর্শ চলছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ

দুই

মৃত্যুর ঝড় উঠেছে, বহু যুগান্তের পুঞ্জীভূত পাপ সৃষ্টির বুকে কেলিয়ে উঠেছে, অন্ধকারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বকে, তাই মানুষ আজব চেতনায় উন্মত্ত হয়ে ছুটছে দিকবিদিকে, সুন্দরের সৃষ্টিকে মুছে দেবে তারা,—শুধু সর্ব্বনাশ আর বিভীষিকা।

এমনিই দীর্ঘদিন দীর্ঘ রাত্রি দুর্য্যোগের সঙ্গে যুঝে যারা বেঁচে রইলো, তারা মানুষ নয়, মানুষের প্রেতাত্মা, তবু পরিচয় দিতে হলো মানুষের মুখোস পরে, এই হোল চরম শাস্তি।

অনেক কাল পরে বড়লোকদের সখের বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে পিদীম জ্বলেছে। কাতারে কাতারে এতগুলো প্রাণী, তা না হলে যেন সবই পথে পড়ে মরতো। একখানি ঘর, দু'হাত দাওয়া, তাতেই তারা যেন স্বর্গ পেয়েছে আজ। অশান্তকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন উমার মা। উমাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ কথাই ভাবছিলো। সত্যি এমন মানুষ সে জীবনে কখনো কল্পনাও করে নি, কি অপরিসীম দয়া, কি উদারতা, এমন কেনো সবাই হয় না? তবে কি সংসারে এত দুঃখ, এত দুর্য্যোগ আসতে পারতো? উমার জলজলে রূপের ওপর পিদীমের আলো পড়ে কি অপূর্ব্ব রূপ সৃষ্টি করেছিল। অশান্ত ভাবছিল আর ক'টাদিন যদি কাটাতে পারে, মস্ত ভাগ্যবান মানবে নিজেকে। উমা'র ত'ই অমৃত চুপ করে বসে ছিল, কিছু ভাল লাগে না তার। বাবা নাই, দাদারা নাই, ঘর বাড়ী, আশা ভরসা যেখানে যেটুকু ছিল সব গেছে, তবে বেঁচে থেকে কি হবে এমনি করে? অশান্ত ডাকলো তাকে, সে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করলো না, দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অশান্ত এগিয়ে এলো যখন সে ওদিকে চলে গেলো। উমার মা বল্লেন—ওর মনটা আর কিছুতে মানাতে পাচ্ছি না বাবা, কেমন যেন হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না বাবা। এসো একটু বসে যাও।

অশান্ত বল্লে—না মা, এখন আর বসবো না, অনেক কাজ বাকী, আপনি গুছিয়ে নিন, কাল এসে অনেক্ষণ থাকবো, ছুটি আছে। অশান্ত প্রণাম করলো উমার মাকে। তার পর দ্রুত নেবে গেল পথের ওপর। আলো আঁধারে ঢাকা প্রকাণ্ড বাড়ীটা প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ, তার চার দিক ঘেরা ঘন বাগান আর এক প্রান্তে মালীর ঘর, তা'রি এক পাশে পড়ে রইলো উমারা। সাঁওতালী মালী, ভূতের মত চেহারা, মহুয়ার তাড়ী খেয়ে পাগলের মত চেঁচায়, অমৃত বহুদিন দূর থেকে শুনেছে। সে নাকি তাদের পাহারা দেবে। এতদিন তবু বেশ ছিল আর দশজনের সঙ্গে মিলিয়ে রাস্তার ধারে। এখন কি করে চলবে? উমা এসে ধাক্কা দিয়ে বল্লো, এই, ঘুমুচ্ছিস নাকি? অমৃতর রাগ চড়ে যায়, এক থাপ্পোড় বসিয়ে দিলো উমার গালের ওপর। হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছি বইকি। উমা বল্লে—অসভ্য বাঁদর কোথাকার—দিন দিন একটা গরু তৈরী হচ্ছে। উমার মা বল্লে—সত্যি কি লজ্জাটাই করছিল। অমন সোনার চাঁদ ছেলে প্রাণ দিয়ে উপকার করে চলেছে, আর একটা ভদ্র ব্যবহারও করতে পারে না ও তার বিনিময়ে—ছিঃ লজ্জায় মাথা কাটা যায়। উমা বলে, 'ওটা পাগল হয়ে গেছে মা। চলো ঘরটা গুছিয়ে ফেলি, ও থাক বসে একা।' রাগে দুঃখে গরগর করে চলে যায় উমা।

কয়েকদিনের মধ্যেই অশান্ত এদের পরম আত্মী

হয়ে ওঠে। সময় অসময়ে সর্ব্বদা আগলে থাকে ছোট পরিবারটাকে; তবে অমৃত সেই একভাবেই আছে। অশান্তকে সে আজকাল একেবারে সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে ওর জন্যেই আজ তার যেটুকু আশা ছিল তাও যেন গেছে, একেবারে কোনঠাসা করে রেখেছে তাদের—যত ভাবে জলে মরে অমৃত। অশান্তর ছায়া চোখে পড়লে খুন চাপে তার।

অশান্ত সেদিন মমতার হাত থেকে চাঁদার টাকাটা নিয়ে, আবেশের সঙ্গে কথাটা পাকা করে ফেল্লো: যা করতে হয় সাতদিনের মধ্যে, নগদ দু'হাজার টাকা হাতে নিয়ে তবে কাজ করবে সে। কাজটা বড় গুরুতর।

দেখতে দেখতে সময় ঘনিয়ে আসে। আবেশের ছুটি ফুরিয়েছে, আজই সে বিদায় নেবে। মমতার করুণাময়ী নারী-অন্তর বোঝেনা, বলে, আর দুটোদিন থাকলে হতো, এত তাড়াতাড়িতে কিছু পারলাম না করতে! আবেশ পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললো—আবার আসবো দি'দি, বড় কাজ, থাকবার উপায় নাই। তন্ময় বলে, শীত না কমতে আর আসিস না বাপু, না এলে আরো বাঁচি। তোর ছুটি মানে আমার সর্ব্বনাশ। মমতা বাধা দিয়ে বললে—ছিঃ, ওকি কথা ভাই? আবেশ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলে গেল। তন্ময় পশ্চিমের জানলা ভাল করে খুলে দিয়ে বসলো। সম্মুখে রাস্তার ওপারে ধূ ধূ প্রান্তর, প্রগাঢ় অন্ধকার নেবে আসছে ক্রমশঃ। অস্তাচলের পারে মৃদু রক্তরেখা মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যানভে। কুয়াসাচ্ছন্ন গ্রামগুলিতে মিট্ মিট্ করছে আলো জোনাকির মত। উদাসীন উত্তর বায়ু ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়ে আনছে সাঁওতালী বাঁশির মিঠে করুণ রেশ।

মুহূর্ত্তে তন্ময়ের সমস্ত মন প্রাণ উধাও হয়ে যায়। ঐযে দিগব্যাপ্ত নীরব নিবিড় প্রশান্তি ঘিরে আসছে; সমস্ত সত্তায় কি কোমল স্পর্শানুভূতি! যার অনুভূতিতে দিনান্তের ক্লান্ত মন তার সব চেতনার আলোড়ন যায় স্তব্ধ হয়ে, সকল উদ্দাম আসে স্থির হয়ে, রাত্রিদিনের সেই মহামিলনের সন্ধিক্ষণ আজ আবার পরিপূর্ণরূপে মুগ্ধ করে দেয় তন্ময়কে। এ সৃষ্টির সকলি যে বিপুল এক ভাবের অভিব্যক্তি; মানুষ তাকে উপেক্ষা করবে কোন দুঃসাহসে? তন্ময় আপনার মনে বলে—

হে অসীম এ-কি লীলা তব
নব নব রূপে হেরি বার বার।
জীবনের প্রতি প্রভাত সন্ধ্যা আমার,
বিপুল বিস্ময় আনন্দের মাঝে—
দিল লুপ্ত করি সকল চেতনা তাহার।
তোমার প্রাঙ্গণে যব অন্ধ দিল দেখা—
মিলাল উর্ব্বশীর অলক্ত পদ রেখা
আঁধারে ছড়ায়ে গেল শিথিল কেশ তার।
শান্ত মোর ক্লান্ত মন, সকল ভাবনার—
হোল শেষ, দিবসের কঠিন নির্দ্দেশ
হোল সারা, অবসাদ ভরা তাকারে অনিমেষ।
হে সুন্দর, আজি মোর মুগ্ধ এ দেহ মন
তব অনন্তপারাবারে করেছি গাহন
তব নীরব সত্তার।

সন্ধ্যাপ্রদীপ আর ধূপ নিয়ে মমতা এসে দাঁড়ালো, তন্ময় এগিয়ে এসে প্রণাম করে মমতাকে। রোজই সে এমনি করে মমতার পায়ের ধূলো নেয় প্রতি সন্ধ্যায়। তন্ময় বলে, সৃষ্টির কল্যাণীরূপ নারী, মানুষ তাকে স্মরণ করুক। মমতা পিদীম জ্বালায়, ধূপের ধোঁয়ায় ভরিয়ে দেয় সন্ধ্যার বুক, শাঁখ বাজায়, তন্ময় অন্তরের একান্ত নিষ্ঠা দিয়ে তা অনুভব করে।

মমতা বল্লে, আজ বাড়ীটা বড্ডো ফাঁকা ঠেকছে না রে?

তন্ময় বল্লে, হ্যাঁ দিদি তাই, আবেশ চলে যাওয়াতে পাড়াটা ফাঁকা হয়ে গেছে, হতভাগা শীতের ভয়েই পালাল।

মমতা বল্লে,—যাক্, ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে পৌঁছুলে হয়—যা দামাল, আমার তো ভয় করে। আজ দুদিন ধরে অশান্ত আসে না, অসুখ-বিসুখ করেনি তো রে? ঐ আর এক ছেলে।

—না না, তোমার যত ভাবনা। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সবাই তো আমার মত অকেজো নয় দিদিভাই?

—ও আবার কি বিনয় সুরু করলি? কাজ কি সবার এক রকমের হয়? তবু নিজের কাজকেই সব চেয়ে বড় বলে ভাবতে হয়।

মমতা চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালো, —আচ্ছা ভুলা মন হয়েছে, আসল কথাই বলা হয়নি। কাল আমি পরেশনাথ দর্শনে যাচ্ছি, চলনা আমার সঙ্গে —যাবি?

তন্ময় খানিক ভেবে নিয়ে সম্মতি জানালো। মমতা কাজে চলে গেল নিশ্চিন্তে।

তিন

অন্ধকার বাগানের মধ্যে পাগলের মত পায়চারি কচ্ছিলেন উমার মা, মহামায়া। সেই দুপুর বেলা উমাকে নিয়ে গেছে অশান্ত, এখনো ফিরলো না কেনো, কাকে প্রশ্ন করবেন এমন কেউ নেই। পরিচিত যাঁরা ছিলেন উমাদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষায় সরে দাঁড়িয়েছেন সবাই। অশান্তর শুভদৃষ্টি তাঁদের ঈর্ষার একমাত্র কারণ। সে যা হোক এখন কি করে কি করা যায় ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পান না মহামায়া। মায়ের মন, যত অমঙ্গল অবস্থর চিন্তা ভীড় করে আসচে। "তবে কি অশান্ত যে জন্তে অনুমতি চেয়েছিল, কয়েকদিন আগে তাই হোল? কিন্তু এত বড় অপরাধ করবার মত ছেলে অশান্ত নয়। তবু যদি তার কোন গোপন অভিসন্ধি কার্য্যকরী হয়ে থাকে, কি করবেন তিনি? সহায় সম্বলহীনা রুগ্না বিধবা আর একদিকে অর্দ্ধ উন্মাদ ঐ অমৃত, মহামায়ার দু'চোখের ধারা আর বাধা মানে না। অন্ধকার ভেদ করে একটা ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মহামহা অমৃতকে চিনতে পারলেন। তিনি অস্থির ভাবে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

—এ কি মা? তুমি কাঁদছো?

—খোকা, উমাকে তো দিয়ে গেল না, কি করি বল?

মুহূর্ত্তে ক্ষেপে ওঠে অমৃত। সে জানে, খুব ভাল করে জানে একজনকে। যত সর্ব্বনাশের মূল ঐ অশান্ত। চিৎকার করে উঠলো অমৃত—আমি খুন করবো, খুন করবো। সে অন্ধকার হাঁতড়ে ছুটে চল্লো। মহামায়া সম্বিৎহীনা পথের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। অমৃতকে খুব বেশী দূর এগুতে হলো না, অশান্ত প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। বাগানের এ পাশটা বুনো মালতীর গভীর ঝোপ, তার সাথে জড়িয়ে আছে মাধবীলতা, বিরাট একটা পত্রগুল্মের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘকালের নিরাপদ প্রসারতায়, তারি একপাশে পুরাতন ইঁদারা। অমৃত একটু এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে এসে চেপে ধরলো মুখখানা। তারপর তীক্ষ্ণ ছোরাখানা চালিয়ে দিল বুকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো অমৃত, বাধা দিতে পারলো না, কিন্তু সে জেনে গেলো সব। অশান্ত ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখলো, দেহখানা একেবারে নিরাপদ কিনা, তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ইঁদারার মধ্যে ফেলে দিল দেহটা। এরপর আরো খানিকটা সময় কাটলো, তারপর —সে দলের আর দুজনের সঙ্গে কি পরামর্শ করে জামাটা পাল্টে নিলো, তারা চলে গেল পরে। অশান্ত ধীর পদক্ষেপে উমাদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। যেমন করে রোজ আসতো, যেমন করে ডাকতো সে মা বলে, আজও তেমনি করে ডাকতে গেল কিন্তু সে স্বর—হিংস্র জানোয়ারের বিকৃত ধ্বনির মত কেঁপে উঠলো যেনো, অন্ধকার পথের ওপর পড়েছিলেন মহামায়া—অশান্তর সাড়া পেয়ে উন্মাদের মত ছুটে এলেন।

—এসেছো বাবা? উমা, উমা কোথায়?

প্রশ্নটা চমকে উঠলো অশান্ত, সে কণ্ঠ সংযত করে বললে,—তাইতো, ঘর অন্ধকার করে সব কোথায় গেল ভাবছি, উমা! উমা! অমৃত, তাইতো, দাঁড়ান দেখছি, আপনি ঘরে যান মা, আমি দেখছি—কখন বেরিয়েছে বলুন তো?

এবার মহামায়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো, 'কখন বেরিয়েছে সে তুমি জানো না?' ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তাকে সকালে, তারপর আর একটা সকাল আসছে, বলো তাকে কোথায় রেখে এসোছো। কি তোমার অভিপ্রায়? বলো, বলো?

—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না মা, আমি তো তাকে সকাল বেলাই বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছি, দেখুন তো কি মুস্কিলে ফেললো। এখন এই রাতে কোথায় যাই,

কি করি! আপনি স্থির হন মা, আমি এখুনি যাচ্ছি, কিছু ভাববেন না, ঘরে যান মা, আমি এখুনি ফিরে আসবো।

অশান্ত মহামায়াকে আবার স্বপ্নবৎ মূক ক'রে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল। শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে চলা পদধ্বনি মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ দূরে। নিশাচর পক্ষী শাবকের বিকট উল্লাসে আরো বীভৎস লাগছিল। দুরন্ত শীতের রাত, কুয়াসাচ্ছন্ন চারিদিক, ওপরে কালিঢালা আকাশ আর পথের দুধারে দৈত্যপুরীর প্রহরীর মত সারিবাঁধা ইউক্যালিপটাসের গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর এপারে দাঁড়িয়ে আছেন মহামায়া একা, সন্তানহারা জননীর ব্যাকুল আকুতি এ সংসারে কে ক'দিন দাঁড়িয়ে শুনেছে জানিনা, তবু মনে হয়—এ বেদনার ভারে পৃথিবী এবার ভেঙে পড়বে। কিন্তু তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটবে না এ সৃষ্টির বুকে তা জানি। মানুষ অর্থের লোলুপতায় কত নৃশংস অপরাধ করে চলেছে, স্বার্থের তাগিদে গেছে তার ধর্ম্ম, সংস্কার, মান, মর্য্যাদা, মায়া-মমতা; বিবেককে তারা গলা টিপে রুদ্ধ করেছে আপনার হাতে। সংসারের বুক ভরা আছে এমনি অগণিত দুষ্যরূপী মানুষ। কচ্চিৎ কখনো তার বীভৎস আত্মপ্রকাশ দেখা দেয়। অশান্ত সেই স্তরের একজন।

চলন্ত ট্রেনে ছোট্ট একটা কম্পার্টমেণ্টে দু'টী প্রাণী। মাঝ রাত্তিরে জ্ঞান হতেই উমা চারদিক তাকালো ভাল ক'রে, মাথার মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা, বেশী ভাবতে পারে না, তবু এ যে একটী অভাবনীয় অবস্থায় পড়েছে সে, ভাল ক'রে বুঝতে পারলো। তারপর ধীরে ধীরে পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনাটা তার মনে পরতে লাগলো। কোথায় কত দূরে এসে পড়েছে—কোথায়ইবা চলেছে সে, একটু দূরে শুয়ে আছে, কে সে? নিশ্চয় ভদ্রবেশী কোন শয়তান। উমার মনে পড়ে গেল—প্রথম যেখানে আশ্রিত ছিল তারা, সেখান থেকে দু-দু'বার দু'টী মেয়েকে কারা নিয়ে যায়—কেউ জানে নি, কোন খবর পায় নি তার বাড়ীর লোক। উমাকেও কি এমনি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে? মা, অমৃত? কতক্ষণ দেখেনি উমা মনে করে অস্থির হয়ে ওঠে; না, না যেমন ক'রেই হোক ফিরতেই হবে। যা করতে হয়—এখনি করবে সে—আর দেরী নয়। লোকটা জেগে গেলেই মুস্কিল হবে। উমা অতি কষ্টে উঠে বসলো। চারদিক বন্ধ, চলন্ত গাড়ীর প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে ভীষণ শব্দ হচ্ছে। উমা উঠলো, প্রথম ভাল ক'রে দেখে নিলো লোকটা ঘুমিয়েছে কিনা সত্যি, আর, তা না হ'লেও বিশেষ ক্ষতি নেই যদি গাড়ী থামবার আগে একটা জানালা কোনমতে খুলে ফেলতে পারে উমা। ও পাশ ফিরে শুয়ে আছে, এখনই সুযোগ, কিন্তু যদি না ঘুমিয়ে থাকে, যদি টের পেয়ে যায়? হয়তো অত্যাচার সুরু করবে, জীবনে হয়তো আর মুক্তি পাবে না উমা। নিজের অবস্থা ও তার পরিণতির কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো। তারপর উমা গাড়ী থামবা মাত্র জানালা দিয়ে অতি কষ্টে লাফিয়ে পড়লো।

এ-দিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে অনেকটা দূরে ব'লে বোধ হয় লোকজনের সাড়া নাই বিশেষ। দুরন্ত শীতে পা অসাড় হয়ে গেছে, তবু ছুটে চললো উমা। ও পাশে বিপরীত পথগামী একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একটা কুলীকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কামরায় উঠে পড়লো। মেয়ে-পুরুষ পরিপূর্ণ ইণ্টার ক্লাস। চারপাশের লোকজন সকলেই ভদ্রলোক ব'লে মনে হলো। একজন মহিলা অতিরিক্ত ভদ্রতা ক'রে কাছে বসতে দিলেন। উমার ভয়ার্ত্ত করুণ মুখ দেখে তাঁর বড় কৌতূহলও হোল, তিনি বললেন,—কি হয়েছে ভাই তোমার, অত কাঁপছো, সঙ্গে কি কেউ নেই? উমা কম্পিত কণ্ঠে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সব কথা ব'লে ফেল্লো, তারপর—লুটিয়ে পড়লো তাঁর পায়ের কাছে। ছি-ছি, গাড়ীশুদ্ধ লোক বিস্ময় কৌতুকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কচ্ছে, কি হয়েছে ম'শাই ওর? তন্ময় বল্লে—দাঁড়ান দেখছি। তন্ময় মমতার কাছে বসে সব শুনলো, তারপর উমাকে বল্লো, আপনার কোন ভয় নেই আর, ভগবান আপনার সহায়। আমরা ফিরে যাচ্ছি, আপনাকে আপনার মায়ের কাছে পৌঁছে দোব। তন্ময়ের কথা শুনে শ্রদ্ধায় আনন্দে বার বার ভগবানকে স্মরণ করলো উমা। মমতা পরম স্নেহে কাছে টেনে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আবেশ যখন টের পেলো উমা পালিয়েছে খুব বেশী বিস্মিত সে হতে পারলো না। সে যে অন্যায় করছে

একথা বার বার তার অন্তরই তাকে জানিয়ে দিলো। ভদ্র রক্ত যাদের গায়ে, তাদের পক্ষে শয়তানি কবাটা যত আনন্দেরই হোক, তার পেছনে মস্ত এক যন্ত্রনাকে বহন করে চলতে হয়। আবেশ তা থেকে সাময়িক মুক্তি পেলো। অশান্ত যখন উমাকে টেনে এনে গাড়িতে উঠিয়েছিলো, সেই করুণ অৰ্দ্ধ চেতন মুখখানা আবেশের সমস্ত অন্তরকে স্তব্ধ করেছিল যেন। আসন্ন যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে সন্ত প্রস্ফুটিত কোমল কলিকা উমার ঐ সুন্দর দেহলতা অন্ধকার ধূলিপথে যন্ত্রনায় লুটিয়ে পড়েছিল। আবেশ পারেনি একটী কথাও বলতে। পেছনে ছিল বিপুল এক কামনার মূঢ় অভিসন্ধি—যাকগে, ভালই হয়েছে। কিন্তু মন বড় কঠিন যায়গা। আবেশের যন্ত্রনা প্রবলভাবে ধাক্কা দিতে থাকে তাকে। সমস্ত জীবনের যত অপরাধ আজ মুহূর্ত্তের চেতনার ঘায়ে মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় সুরু হতে থাকে। আবেশ অস্থির চিত্তে বলে—'ভগবান, তুমি আমায় ক্ষমা করোনা'। তারপর সে দণ্ডের জন্তে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

কয়েএকদিনের মধ্যেই এতবড় ঘটনাটা আসে পাশে সবার মুখে মুখে জানাজানি হয়ে গেল, শুধু অমৃত জেনে যেতে পারলো না, তাই উমা কাঁদছে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। মমতা আর তন্ময় পাশে বসে তাদের শান্ত করছিলো। দুরন্ত উত্তর বায়ুতে লতা-ঝোপের ওপাশ থেকে ভাসিয়ে আনে অমৃতের অতৃপ্ত আত্মার করুন কান্না, ওঘরে তাড়ি খেয়ে চেঁচাচ্ছে ভূতুড়ে মালীটা। তন্ময় ভাবে, পৃথিবীর রূপ সত্যিই কি এত মুমূর্ষু, এত জীর্ণ? না, না, সে শিল্পী, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের যা কিছু ক্ষয় ক্ষতি, যা কিছু মলিন, সৌন্দর্য্যের প্রলেপ দিয়ে ঢাকতে হবে, সেইতো শিল্পীর সাধনা। তারপর একদিন শিল্পীর কল্পনায় উমাদের ভাঙাঘর আবার নতুন রূপ নিলো। শক্তি সাহস দিয়ে উমাকে তন্ময় দাঁড় ক'রিয়ে দিয়েছিল সংসারের শক্ত মাটীর ওপরে, আপন মহিমায় উমা দিয়েছে তার সম্মান—জগতের কল্যানে দুঃস্থের সেবায় উমা নিজেকে উৎসর্গ করেছে, আর একদিকে আছেন শোকাতুরা জননী। তন্ময় দূরে বসে বসে ভাবে সে কথা আর ছবিতে আঁচড় কাটে আপন মনে, উমাও মনে মনে জানায় প্রণাম

বন্দনা

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বন্দনা রে, বন্দনা।
কোন্ স্বরগের কুঞ্জবনের—
হরবোলা তুই চন্দনা?
পাপ্ড়ি খ'সে পারিজাতের
পড়লি বুকে এই জগতের,
মাতিয়ে দিলি ঘরের বাতাস—
—মন্দ না রে, মন্দ না।
ভুলিয়ে দিলি মন্ত্রে যেন
সকল জ্বালা যন্ত্রণা।
বন্দনা রে, বন্দনা।

*

কি ব'লে আজ করব আদর তাই ভাবি।
আমার কথার মঞ্জুষার যে হারিয়ে গেছে সব চাবি।
জীর্ণ দেহের শীর্ণ হাতে,
জড়িয়ে ধ'রে বুকের সাথে,
দেখবো তোরে—
দু'চোখ ভ'রে—আমার কাব্য-কল্পনা।
অশান্ত এই অন্তরে মোর তুই রে পরম সান্ত্বনা—
বন্দনা রে, বন্দনা।

গ্রীক্‌-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

আরিষ্টটলের অনেক গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। গুণহীন matter ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইতে উচ্চতর form ধারণ করিয়া কিরূপে পরিশেষে মানবের আত্মায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও নভোবিদ্যার তিনিই উদ্ভাবন করেন, বলা যায়।

বিশুদ্ধ সত্তার আলোচনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় নহে। গতিশীল, পরিণমন্ত সত্তাই তাহার আলোচনার বিষয়। "প্রকৃতি" শব্দ আরিষ্টটলের physis শব্দের অনুবাদ। ইংরেজিতে nature শব্দদ্বারা ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে। "Physis" শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত হয়, তাহার ধারণা অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীক দর্শনে প্রচলিত ছিল। ইহার সহিত "গতি" কিংবা পরিণামের ভাবটি জড়িত। কোনও দ্রব্যকে প্রাকৃতিক বলিলে বুঝাইত (১) তাহা কৃত্রিম নহে, কেহ তাহা নির্মাণ করে নাই, আপনা হইতেই তাহা আছে, এবং (২) তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাতে গতির সঞ্চার করিতে পারে। আরিষ্টটল যখন physis-এর কথা বলেন, তখন প্রকৃতির অন্তর্গত যাবতীয় দ্রব্যের অন্তঃস্থিত এই পরিণাম প্রবণতার ভাবটি তাহার মধ্যে থাকে। মানুষের নির্ম্মিত দ্রব্যে এই পরিণাম-প্রবণতা নাই। এই পরিণাম-প্রবণতা সুনিয়ন্ত্রিত এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই তাহা ব্যক্ত হয়। যদৃচ্ছা (accident) বলিয়া প্রকৃতিতে কিছু নাই। উদ্দেশ্য বিনা প্রকৃতি কিছুই করে না; "সর্ব্বোত্তমে"র উৎপত্তির জন্য প্রকৃতি অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। জাগতিক প্রত্যেক দ্রব্যের কোনও না কোনও উদ্দেশ্য আছে। যে উপাদান লইয়া প্রকৃতিকে কাজ করিতে হয়, তাহার সহিত বিরোধ-বশতঃই সর্ব্বদা প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি অথবা পূর্ণতা-লাভে সমর্থ হয় না। matter যেমন প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়, তেমনিই বাধাও বটে। এই জন্যই অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ ফল পাইয়াই তাহাতে অনেক সময়ে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পৃথিবীতে প্রাণের অভিব্যক্তির শেষ লক্ষ্য মানুষ। মানুষের তুলনায় নারী অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃতির অকৃতকার্য্যতার পরিচায়ক। ইতর জীবজন্তু অধিকতর অসম্পূর্ণ। প্রকৃতি অন্ধ ভাবে অজ্ঞানে কাজ করে বলিয়াই এই অসম্পূর্ণতা।

গতি, কাল ও দেশ যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তুর কারণ। পূর্ব্ববর্ণিত শক্যতা ও বাস্তবতাই দেশ, কাল ও গতি। শক্যতা হইতে বাস্তবতায় পরিণতিই গতি। গতির সম্ভাবনাই দেশ; গতির পরিমাপ কাল। দেশ অসংখ্য অংশে বিভাজ্য। কেহ কেহ বলেন, কালের অস্তিত্ব নাই, কেননা অতীত ও ভবিষ্যতের সমবায়ই কাল। অতীতের অস্তিত্ব তো শেষ হইয়াই গিয়াছে। আর ভবিষ্যতের অস্তিত্বের আরম্ভই হয় নাই। আরিষ্টটল এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে গতি সংখ্যাদ্বারা গণনা করা যায়, তাহাই কাল। তবে আত্মা না থাকিলে কাল থাকিত কি না, তাহা বিবেচ্য। কেননা গণনা করিবার কেহ না থাকিলে, গণনা করিবার বস্তুও থাকে না; আর কাল তো গণনারই বস্তু। আরিষ্টটল কালকে, ঘণ্টা, দিন, বৎসরের পুঞ্জ বলিয়া মনে করিতেন বলিয়া প্রতীতি হয়। কোন কোন দ্রব্য সনাতন, তাহারা কালাতীত। বোধ হয় এখানে সংখ্যার কথাই বলিয়াছেন।

গতি চিরকালই আছে, এবং চিরকালই থাকিবে, কেননা গতি ভিন্ন কালের অস্তিত্ব থাকে না। প্লেটো ভিন্ন সকলেরই মত যে, কালের সৃষ্টি হয় নাই, তাহা অনাদি।

গতি হইতে আরিষ্টটল বিশ্বের সম্বন্ধে তাঁহার মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। জগৎ গোলাকার—যাবতীয় আকারের মধ্যে পূর্ণতম রূপ। আকাশ ইথার নির্ম্মিত, তাহা আদিকারণের সহিত অব্যবহিত ভাবে সংযুক্ত। নক্ষত্রগণ সদা ক্রিয়াশীল ও সনাতন। চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিত সমস্ত দ্রব্য জন্ম মৃত্যুর অধীন; চন্দ্র ও তাহার উপরিস্থ যাবতীয় দ্রব্যই অবিনশ্বর—তাহাদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত। প্রাথমিক গতিস্রষ্টা (primemaurs) হইতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত এবং ঐশ গুণও ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত পৃথিবীর

উপাদান। জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী অন্য এক পদার্থে নির্মিত। পার্থিব ভূতগণের গতি সরল রৈখিক; কিন্তু এই পঞ্চম ভূতের গতি বৃত্তাকার। আকাশ সম্পূর্ণ গোলাকার, তাহার উচ্চস্তর সকল নিম্নস্তর অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বরিক ভাবান্বিত।

সমগ্র প্রকৃতিতে ক্রমোন্নতির বিকাশ লক্ষিত হয়—অচেতন জগৎ হইতে উদ্ভিদ ও জীবের অভিব্যক্তি হয়। স্বৈর গতি শক্তিই জীবনতত্ত্ব (principle of life) অথবা আত্মা। দ্রব্যের অন্তঃস্থ জীবনীশক্তিই তাহার আত্মা। উদ্ভিদেরও আত্মা আছে: সেই জন্যই তাহারা বহিঃস্থ দ্রব্য পরিপাক করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, এবং বংশ-বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ইতর জীবের আত্মাই অনুভূতি ও বংশ-বিস্তারের কারণ। মানুষে এতদতিরিক্ত সক্রিয় প্রজ্ঞা আছে। কল্পনাশক্তি, স্মৃতি এবং স্বাধীন ইচ্ছাও আছে। De-Amima গ্রন্থে আরিষ্টটল আত্মার যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আরিষ্টটল জীববিদ্যার উদ্ভাবক (Biology)। প্রায় ৫০০ ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। তাহাদিগের অঙ্গসংস্থান ও অভ্যাস তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। পর্য্যবেক্ষণের জন্য অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিতেন। তাহার পর্য্যবেক্ষণের ফল এখন পর্য্যন্তও প্রশংসিত হইতেছে। দেশ-ভ্রমণকারীদিগের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অনেক সময় ভুল করিয়াছেন। ব্যাঘ্র সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা একেবারেই অবিশ্বাস্য। Genns ও Species অনুসারে তিনি জীবদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরিষ্টটলের একশত বৎসর পূর্ব্বে একপ্রকার অভিব্যক্তিবাদ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, কিন্তু অভিব্যক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেক species চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয়, এবং প্রত্যেকের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই জন্য বংশ-বিস্তারের প্রশ্ন তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। species যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় পিতা হইতে সন্তানে সংক্রামিত হয়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সম্বন্ধে আরিষ্টটল যাহা বলিয়াছেন, তাহা গভীর অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। ডারউইন অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু জীবন-রহস্যের আলোচনা করেন নাই। কিন্তু যে পদার্থ অভিব্যক্ত হয়, তাহার আলোচনা ব্যতীত কোন অভিব্যক্তিবাদই সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আরিষ্টটল ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে জীবনশক্তি (vital force) অথবা বাঁচিবার ইচ্ছার (will to live) বশতঃ উদ্ভিদ এবং জন্তুগণ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিসের জন্য তাঁহারা বাঁচিতে চায়? নিশ্চয়ই তাহাদের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত কোনও উদ্দেশ্য আছে।

আরিষ্টটল সমস্ত জগৎকে একটি মাত্র organism—এক উদ্দেশ্যে পরস্পর সম্বদ্ধ বিভিন্ন অংশসমন্বিত জীবদেহের মত মনে করিতেন। অসংখ্য জীবন্ত দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত একই উদ্দেশ্যে চালিত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাহার সমগ্র চিন্তার গতি এই একত্বের দিকে।

পরিত্যক্ত

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

পরিত্যক্ত বাড়ী।
সুপ্রশস্ত দীঘি-ঘাট
ধ্বংসে পড়ে আছে পানা-জলে
পাড়ে নারিকেল শ্রেণী
কম্পিত ছায়া ফেলে চেয়ে আছে,—
ওদের পিপাসু আত্মারা যেন
শংকিত ধীরে নেমেছে জলের কূলে।

ছাগ-শিশু ঘোরে একা দূরে,—
ধূর্ত্ত শিবা ঠোঁট চাটে নিশ্চিন্ত শিকারে।
পোড়ো দালানের বুকে,
সচকিতে হেঁকে ওঠে আগন্তুক প্রহরী তক্ষক।
কেঁপে ওঠে ঘর থেকে ঘর,—
সভয়ে শিহরি ওঠে গ্রাম গ্রামান্তর।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

পাঁচ

সেই যে বাবার কানে কানে কি-সব ফিস্-ফিস করে বলে গেল, তারপর দিন সাতেক আর ক্ষেমী পিসির টিকিও দেখা গেল না। শিবুর মা কিন্তু প্রায়ই বলত—তার ভাজের সঙ্গে নাকি ক্ষেমী পিসির নিত্যই দেখা হয় চৌ-মাথায়। আমাদের বাড়ী থেকে চৌ-মাথা বড় জোর ছ'রশির পথ। পাড়ায় আসে অথচ আমাদের বাড়ী আসে না, এতে ঠাকুমার মনে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

ঠাকুমা বেশ ভাল করেই জানতেন, তাঁর সেদিনকার কথায় ক্ষেমী পিসির মনে কিছু মাত্র আঘাত লাগেনি। জীবনে স্বার্থই ছিল তার পরমার্থ; যেখানে নিজের ইষ্টের আভাসটুকু পেত, সেখানে মান-অপমানের কোন বালাই ছিল না তার। এ-হেন ক্ষেমী পিসি যে একটা তুচ্ছ কথায় রাগ করে নিজের মেয়ের বিয়ের কথাটা বাবা চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াবে, সে ধরনের মেয়েই ছিল না সে। তাকে বিয়ের ব্যাপারে এতটা আলগোচ থাকতে দেখে ঠাকুমার মনে চমক জাগল।

ক্ষেমী পিসির চাইতেও ঠাকুমাকে বেশী শঙ্কিত করলেন বাবা। তিনি শ্মশানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ঘরেও মার ফোটোর সুমুখে আর ধ্যানস্থ হন না। আইনের নজীর ও ধারা খুঁজতে আর মক্কেলের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতেই তাঁর সমস্ত সময় ফুরিয়ে যেত। বন্ধুদের মধ্যে কে-একজন শ্মশানে না যাওয়ার কারণ কি জিজ্ঞেস করায় বাবা নাকি বলেছিলেন—মক্কেলের কি আক্কেল আছে হে! কত করে বলি নিদেন্ পাঁচটা মিনিটের জন্যে রেহাই দাও। বয়ে গেছে সে কথা শোনবার জন্যে।

এ-সব কথাই ঠাকুমার কানে এসেছিল এবং তাঁকে বিমনা করে তুলেছিল। কিন্তু যেদিন শিবুর মা হাসতে হাসতে এসে বল্লে—গিন্নীমা, বাবার জন্যে আর ভেবো না তুমি। এ ক' দিনেই শোকটা সামলে নিয়েছেন, জামা-কাপড়ে খোসবাই মেখে, টেরি বাগিয়ে বেড়াতে বেরুলেন—সেদিন আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। শিবুর মা'র দিকে চেয়ে শুকনো হাসি হাসলেও আমি কিন্তু তাঁর চোখের কোলে জল টলমল করতেই দেখেছিলাম।

পরের দিন ইস্কুল থেকে এসে জলটল খেয়েছি। বাবা তখনও কোর্ট থেকে ফেরেননি। ঠাকুমা এসে বললেন—চল খোকন, একটিবার মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করে আসি।

প্রতিবেশীদের মধ্যে মুখুজ্জে দাদুই ছিলেন আমাদের সব চেয়ে হিতৈষী ও আপনার লোক। কোন বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োজন হলেই বাবার মতই ঠাকুমাও তাঁরই কাছে ছুটতেন। আমরা গিয়ে বাড়ীতে হানা দিতেই মুখুজ্জে দাদু জিজ্ঞেস করলেন—কি গো বিধু, ব্যাপার কি?

ঠাকুমা ও মুখুজ্জে দাদু এক গাঁয়ের ও এক বয়সী ছিলেন বলে দু'জনই দু'জনকে নাম ধরেই ডাকতেন।

মুখুজ্জে দাদুর কথার উত্তরে ঠাকুমা বললে,—ব্যাপার ত সবই জানো, মুখুজ্জে, এখন কি করি তাই বলো?

—কি আবার করবে? ছেলের বিয়ে দেবে, যেমন আর দশজন দিয়েছে, দেবে।

—যা শোকটা লেগেছে, মধু কি আর বিয়ের নাম করবে?

—মধু না করে, তুমি কর।

—কি যে বলো মুখুজ্জে, এখুনি কি তা পারি? আগে শোকটা সামলাতে দাও। এই ত সেদিন একটু মাছ মুখে দিতে বলেছিলাম বলে ছেলের কি অভিমান!

মুখুজ্জে দাদু হাসতে হাসতে বললে—সে দিন আর এ দিনে অনেক তফাৎ যে গো বিধু। কিছুদিন দেখতে চাও ভাখো; কিন্তু তার আগেই না মধু নিজেই দেখে শুনে বিয়ে করে বসে!

মুখুজ্জে দাদুর কথা শুনে ঠাকুমা মুখ ভার করে বললেন—তোমরা যে কি বোঝ মুখুজ্জে, তা তোমরাই

জান। আমার কিন্তু মনে হয় মধু আর বিয়ে করবে না।

—কেন এমন মনে হয় বলত ?

ঠাকুমা বললেন—যে বউয়ের শ্মশানে ধূপ-দীপ দিত, ছবির সুমুখে বসে ধ্যান করত, যে এখনও নিরামিষ খায়, থান পরে, সে নাকি আবার বিয়ে করতে পারে। না মুখুজ্জে, বিয়ের নাম আর মুখেও আনবে না মধু। বুকে কম শোকটা কি লেগেছে মনে কর।

মুখুজ্জে দাদু একটু পাৎলা হাসির সঙ্গে বললেন—বউ মরলে সকলের বুকেই শোক লাগে। আর সকলের মত আমারও লেগেছিল। একবার নয় বিধু, দু' দু'বার, তবুত তৃতীয় পক্ষ করেছি।

ঠাকুমা বললেন—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু সবাই কি কর, না শোকটা সবার সমান লাগে। দেখছ ত নিজের চোখে মধুর শোকের বাড়াবাড়িটা।

যেখানে শোকের বাড়াবাড়ি সেখানেই বিয়েটা হয় তাড়াতাড়ি। আমাদের যতিনের কথা মনে পড়ে ?

—পড়ে বই কি ? আহা কি ভালই ছিল তার বউটা। যেমন যতিনের বউ, ঠিক তেমনটি ছিল আমার বউমা সাক্ষাৎ সগুণের দেবা। মধু কি কম ভালবাসাটা বাসত ! যে ছেলে নিজের হাতে বউমার চুল বেঁধে দিত, টিপ পরিয়ে দিত, গরমের দিনে পাখার বাতাস করে ঘুম পারাত, সে ছেলেকে বিয়ে করতে বললেই বিয়ে করে বসবে—এ আমি কি করে বিশ্বেস করি মুখুজ্জে ?

মুখুজ্জে দাদু একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখছি মধুর বিয়ে দেয়া তোমারই ইচ্ছে নয়।

ঠাকুমা চারদিকে চেয়ে কে কোথায় আছে না-আছে দেখে নিয়ে সন্তর্পণের সঙ্গে বললেন—ইচ্ছে না হওয়াটা কি দোষের মনে কর মুখুজ্জে ? বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে, এমন সোনার চাঁদ ছেলে রয়েছে, মধুর বিয়ে করবার কি দরকার ?

মুখুজ্জে দাদু প্রশান্তভাবে বললেন—দরকার অ-দরকার অত-সব ভেবে কেউ বিয়ে করে না বিধু ; করে স্বভাবে বা মন গড়া অভাবে। মধুর কাছে অবশ্য কিছু শুনিনি, কিন্তু তার বন্ধুদের মুখে মধুর হালে-দেখা স্বপ্নের কথা শুনে অবধি আমার মনে সন্দেহ জেগেছে—তুমি ঘটকালি কর আর না কর, সে শীগ্‌গিরই নতুন বউ ঘরে আনবে।

—মধু আবার কি স্বপ্ন দেখল ? কই শুনিনি ত কিছু ?

ঠাকুমার প্রশ্নের উত্তরে মুখুজ্জে দাদু সংক্ষেপে যা বললেন তা এই :—মা নাকি কয়েক দিন থেকেই বাবাকে দেখা দিয়ে বিয়ে করবার জন্য জিদ করছেন। তাঁর শোক ও বিরহের প্রখরতায় মা নাকি স্বর্গে থেকেও শান্তি পাচ্ছিলেন না। স্বপ্ন ভঙ্গে বাবা নাকি মাকে মাঙ্গলী মূর্ত্তিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন।

স্বপ্নের কথা শুনে ঠাকুমা সংশয়ের ভারে মুষড়ে পড়লেন।

মুখুজ্জে দাদুর উপর বিশ্বাস ছিল তাঁর আড়াগোড়া। কথাটা তাই মন থেকে সহসা উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

সন্ধ্যা হয় হয় দেখে অপ্রসন্ন মনে একসময় ঠাকুমা উঠে পড়লেন। স্বপ্নের কথা শুনে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল মার জন্য। তাঁর সেই স্নেহ ঢলঢল মুখখানি যেন আমার বুকের মধ্যে মেঘের আড়ালে চাঁদের মত লুকোচুরি খেলছিল। আহা, যদি বাবার মত আমিও মাকে একটিবার দেখতে পেতাম।

ছয়

মুখুজ্জে দাদুর নিকট আশানুরূপ আশ্বাস না পেয়ে, আর বাবার স্বপ্নের কথা শুনে ঠাকুমার মন যে খুবই বেজার হয়েছিল সেটা ছেলেমানুষ হলেও বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। একটা কঠিন বেদনাকে কঠোরতার সঙ্গে বুকে চেপে রাখতে গিয়ে লোকের মুখ যেমন পাণ্ডুর হয়ে ওঠে, তাঁর মুখখানিও ঠিক তেমনি হয়েছিল।

বাড়ী ঢুকতেই সন্ধ্যার আবছা আলোয় দেখতে পেলাম ক্ষেমী পিসি হাঁটুর উপর হাত দু'খানি রেখে রান্না ঘরের রোয়াকে বসে আছে। তাকে দেখেই আমার মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। ঠাকমার মন হয়ত তেলেবেগুনে দপ করে জ্বলে উঠল। তাই তাকে এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে তিনি উপরতলায় যেতে চাইলেন। চতুরের চূড়ামণি শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী তা বুঝতে পেরে শিকারী বেড়ালের মতই যেন

ওৎ পেতে বসেছিল। ঠাকমাকে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে দেখেই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে প্রণাম করে পথ আগলে দাঁড়াল।

ঠাক্‌মা তাঁর মনের-ভাবটা যথা সম্ভব গোপন করে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে ক্ষেমী কখন এলি?

—এই একটুখন আগে জ্যেঠি। শিবুর মা বললে, পাড়ায় বেরিয়েছ। কখন চলে যেতাম; ভাবলাম ম্যাজ্‌দ্দুর যখন এসেই পড়েছি, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না। তাই বসে আছি।

—তা বেশ করেছিস; কিন্তু এদিকে যে সন্ধ্যে উৎরে যায়। যেতেও ত হবে তোকে অনেকটা 'ধুর'। তাইত, তা হলে তুই না হয় আজ উঠেই পর। আমারও-সন্ধ্যে-পিদীম দেবার সময় হল।

ক্ষেমীপিসি ঠাকমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, হাত দু'টি যোড় করে ভেজা-বেড়ালটির মত কণ্ঠে মিহি সুর ভেজে বললে—আমার কথাটি রাখতেই হবে জ্যেঠি; ননদের মেয়েটি নিতে হবে মধুদার জন্যে। তোমাকে আর কোথাও খোঁজাখুজি করতে হবে না। দিব্বি সোমত্ত ও সুন্দর মেয়ে। লতুর সঙ্গে মধুদার চমৎকার মানাবে।

ক্ষেমীপিসির ননদের মেয়ের নাম ছিল লতিকা।

ঠাক্‌মা সহজে রেহাই পাবার মতলবে বেশ মিহি করে বললেন—মধু বিয়ে করতে চায় তবে ত নোব? বলেই তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেন; কিন্তু অত সহজে শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী পরাজয় স্বীকার করে হাল ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বললে—করবেন বইকি, জ্যেঠি তুমি একটিবার বললেই করবেন। এমন মেয়ে আর একটিও পাবে না জ্যেঠি। যেমন ঘর-গেরস্থালিতে গোছালো, তেমনি লেখা-পড়ায় আর বুদ্ধিতে।

ক্ষেমী পিসির সাজান-গোছান কথার মোহেই হোক বা নিজের বে-হুসিয়ারীর দরুণ বুদ্ধির থেই হারিয়েই হোক ঠাক্‌মা ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার মতই বললেন—আখ ত ক্ষেমী, বিধাতা পুরুষের কি বিচার! আমার লক্ষ্মী বউমাকে ঘর-সংসার করতে দিলে না। বল ত বাছা কি অপরাধে এই বুড়ো বয়সে আবার আমায় সংসারের আবিলে জড়ালেন? একা আমি ক'দিক সামলাই—খোকনকেই মানুষ করব, না ঘর-গেরস্থালিই আগলাব?

ক্ষেমঙ্করী যেন অকুল-পাথারে কুল পেল। সে যেন ঠিক এমনিতর একটি সুযোগের জন্যই প্রার্থনা করছিল ভগবানের কাছে। সে তৎপরতার সঙ্গে ঠাক্‌মার অসাবধান উক্তির সুযোগ নিয়ে বললে—আমার কথা বিশ্বেস কর জ্যেঠি; এ মেয়ে ঘরে আনলে তোমাকে ঘর-সংসারের কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। লতুই তোমার নাতিকে মানুষ করবে, ঘর-সংসার দেখবে। খাসা মেয়ে।

ঠাকমা নিজের কথার ফাঁদে ধরা পড়ে ছাড়া পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। কোন রকমে ক্ষেমী পিসিকে বিদেয় করতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন—শোন ক্ষেমী, রাগ করিসনে; সব কথা খুলে বলছি তোকে। মা হয়ে কি ছেলের মন জানিনে মনে করিস? আমার মধুসূদনের এখন বিয়ে করবার মন নেই; মন হলেই তোকে খবর দোব। এখন বাড়ী যা—সন্ধ্যে দীপ জ্বালতে, শাঁখে ফুঁ দিতে দেরী হয়ে···ঠাক্‌মার কথাটা শেষ হতে পারল না। দোতলা হতে বাবা বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই হেঁকে বললেন—কী সব বাজে বকছ মা। তোমার জন্যে কি ছাই বাড়ীতেও দুদণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পাবো না? তাই যদি তোমার ইচ্ছে বল, ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যাই যেদিকে মন চায়।

ঠাকমা ক্ষেমী পিসির সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে সোজা কল ঘরের দিকে চলে গেলেন। ক্ষেমী পিসিও মুচকি হেসে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ল পথে। তার সেই মুচকি হাসি সাপের মত ফণা তুলে আমার বুকে এসে ছোবল মারল। ঠাকমার এই নাহক অপমানের প্রতিশোধ নেবার উপায় না থাকায় আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম।

সাত

সেই যে মুচকি হেসে ক্ষেমী পিসি চলে গেল, ঠিক তার পরের দিন শনিবার—সময় বিকেল সাড়ে চারটে। বাবা বাড়ী নাই,আগড়পাড়ায় কোন এক আগড়ওয়ালার বাড়ী গেছেন—কন্‌সালটেসানে। আমি স্কুল থেকে এসে জলটল খেয়ে রান্না ঘরের রোয়াকে বসে ঠাকুমার সঙ্গে এরিয়ান আর মোহন বাগানের ফুটবল ম্যাচের গল্প জুড়ে দিয়েছি। গল্প শুন্‌তে-শুন্‌তে ঠাকুমা কুটনো কুটছিলেন আর শিবুর মা কলতলায় বাসন ধুচ্ছিল। আ-কার গল্পটা বেশ জমে উঠছিল, কিন্তু বেশী দূর আর এগুতে পারল না। চাটুজ্জে-বাড়ীর বুড়ো গিন্নী লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে বাড়ী ঢুকল। পাড়ার ছোট বড় সবাই তাকে 'দিদি' ডাকত বলে ইনি 'সরকারী দিদি' বলেই পাড়ায় পরিচিত। এত বড় গাল-ভরা নামে সুবিধে হয় না বলে ছেলে-বুড়ো সকলেই 'দিদি' বাদ দিয়ে 'সরকারী' বলত।

'সরকারী'কে বাড়ী ঢুকতে দেখেই ঠাকুমা হেসে বললেন—আজ কি ভাগ্যি! এসো সরকারী, এই খানটিতেই বসো ; আমার কুটনো কোটাও হবে, তোমার সঙ্গে গল্প করাও হবে। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—মা খোকন, একটা কিছু বসতে এনে দে 'সরকারী'কে।

আমি রান্না-ঘর থেকে একখানা পিঁড়ি এনে দিলাম। এতটা পথ খুঁড়িয়ে এসে 'সরকারী' হাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই রকে উঠবার টানা-সিঁড়ির একটা পৈঠার ওপর একপা রেখে লাঠি ভর দিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে অভিমানের সুরে বল্‌লে—ভাগ্যি ত বটেই ; কিন্তু কার, আমার কি তোর ?

ঠাকমা তার কথা কানে না তুলে জিজ্ঞেস করলেন —ওকি 'সরকারী' খুঁড়িয়ে চলছো যে ? লাঠিও হাতে ; বলি ব্যাপার কি গো ?

'সরকারী' সহাস্য মুখে বল্‌লে—ভয় নেই লো বিধু, ভয় নেই। লাঠি নিয়ে তেড়েফুঁড়ে আসিনি তোকে। লাঠি ধরেও যে চলতে পারছি, সে নেহাৎই আমার বরাতের জোর।

—কেন 'সরকারী', কি হয়েছে তোমার ?

—তোরা ত আছিস তোদের তালে। 'সরকারী' মলো কি বাঁচল খোঁজ ত করবিনে। বাতে ভুগে উঠলাম যে ক'দিন।

—কবে থেকেই ভাবছি তোমাকে দেখতে যাবো। তা তুমি যে বাতে ভুগছ তা'ত জান্‌তাম না। একটি বার খবর দিলেই ছুটে যেতাম। এত কষ্ট করে এলে কেন তুমি ?

কোমরটাকে আরো একটু সোজা করে সরকারী বল্লো—যেতিস যে তা কি আর জানিনে, বিধু ? একটা উড়ো খবর শুনে মনটা মুষড়ে পড়ল কিনা, তাই নিজেই এসে পড়লাম সত্যি-মিথ্যে জানতে।

সরকারীর কথা শুনে একটা অজানা আশঙ্কায় ঠাকুমার বুকটা বুঝি ছ্যাৎ করে উঠল। তিনি সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এমন কি খবর শুনলে 'সরকারী' যার জন্যে এত কষ্ট করে এলে ?

এবার 'সরকারী' রোয়াকে উঠে পিঁড়িতে বসে শুরু করলে—এই একটু আগে রেখা এসেছিল আমায় দেখতে। তার মুখে শুনলাম কাশীপুরে জোর গুজব ক্ষেমীর ননদের সেই বিজী মেয়েটার সঙ্গে নাকি মনুর বিয়ে হচ্ছে।

ঠাকমা চমকে উঠে বললেন—অ্যাঁ কি বল্‌লে ? মনুর বিয়ে ?

—আবার কেউ কেউ বল্‌ছে—হবে কি, সে ত কবেই হয়ে গেছে।

—হুঁ হয়ে গেছে! আমার মধু পড়ে-পাওয়া টাকার মত বে-ওয়ারিস মাল কিনা ? কুড়িয়ে নিলেই হল! ও-সব বাজে কথায় কান দিওনা সরকারী। সত্যি হলে কি মধু আমায় বলত না ?

—আমিও ত মেয়েকে সে কথাই বললাম—সত্যি হ'লে কি আমরা পাড়া-পড়শীরা জানতাম না ? আমাদের ক্ষেমঙ্করীর কাশীপুর ত! লোকের ত খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নেই, তাই পথে-ঘাটে খোশ-খবরের ফিরি করছে! মধু কি শিবতলায় টানা-পড়েন করে, বিধু ?

সরকারীর কথাটা শুনে ঠাকুমার মনে বুঝি মুখুজ্জে দাদুর ভবিষ্যদ্বাণী দানার মত হানা দিল। তাঁর মুখের

হাল্কা হাসিটুকু নিবে গেল, টানা-টানা চোখ হয়ে পড়ল ছানাবড়ার মত, আর মুখখানি তাঁর হয়ে পড়ল দীপ্তিহীন, মৃত্যু-মলিন। একটা আসন্ন সঙ্কটের ভারী চাপে তিনি স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। সরকারীর প্রশ্নের যে একটা জবাব দেওয়া দরকার, সেটা পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন।

ঠাকমাকে বাক্শূন্য দেখে সরকারী ফিরে জিজ্ঞেস করল—কিরে বিধু, মধু কি শিবতলায় আনা-গোনা করছে? ক্ষেমীই নাকি যেখানে-সেখানে গুজবটা ছড়াচ্ছে।—ঐ হাবড়া মেয়েটা জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে 'সরকারী'। আমি ছেলের মা, আমি বিয়ে না দিলে কে তার বিয়ে দেয় শুনি? বিয়ে দিলেই হলো। ছেলে-খেলা কিনা?

'সরকারী' হয়ত ভেবেছিল—গুজবটা আমরাও শুনেছি। ঠাকমার কথা শুনে ভুলটা ভেঙে যেতেই সে হকচকিয়ে গেল। বেফাস কথাটার দোষ ক্রটি সেরে-নেবার মতলবে সে বললে—ঠিক বলেছিস বিধু; তুই ছেলের মা তুই জানিসনে, আমরা পাড়া-পড়শীরা জানলাম না, বিয়ের গুজব তুললেই হল। বজ্জাতের হাঁড়ি ঐ ক্ষেমীটা। ওকে ঢুকতে দিস কেন বাড়ীতে?

—শোন কথা! এ যেন শেয়াল-কুকুর, ধমক দিলেই দৌড়ে পালাবে, এ কালীপুরের ক্ষেমঙ্করী। বকো ঝকো, তাড়িয়ে দাও, কালই আবার হসিমুখে হাজির হবে।

—যা বলেছিস্ বিধু! ছাড়া-গরুর মত অমন আলগা মেয়ে মানুষ আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার। থাকগে, মরুকগে ক্ষেমী। মধু কই? তাকে যে দেখছিনে?

—বাড়ী নেই; আগড়পাড়ায় গেছে কি কাজে। কাল সকালে ফিরবে।

ঠাকমার কথা শুনে সরকারী শুধু ছোট্ট একটি 'হুঁ' করেই চুপ করল। তার মৌনতায় ঠাকমা সুখী হতে পারলেন না। তিনি উদ্বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন—'হুঁ' করেই যে থেমে গেলে ভাই সরকারী? মধুর সম্বন্ধে আরো কিছু শুনেছ নাকি?

—নারে না, আবার কি শুনব? যা শুনেছি তাতেই আক্কেল গুড়ুম। তবে একটা কথা বলি বিধু; অনেক দিন ত হয়ে গেল, এবার নিজেই দেখে শুনে মধুর বিয়ে দে। একে পুরুষের মন, তাতে ক্ষেমী যা ফেউর মত পিছে লেগেছে, আমার বড় ভয় বাছা।

ঠাকমা বেজার মুখে বললেন—আমারও যে ভয় না করছে সরকারী তা নয়। মুখুজ্জে যা বলেছে, তুমিও ঠিক তাই বলছ। তোমায় বলতে বাধা নেই সরকারী, আমার কিন্তু ইচ্ছে নয় মধু আবার বিয়ে করে।

—কেন শুনি?

মা'র অন্তিম সময়ে তাঁতে আর ঠাকমাতে যে সব কথা হয়েছিল, ঠাকমা আগা-গোড়া সরকারীকে বললেন। ঠাকমা চোখের জলে সিক্ত হলেন; আমার চোখও শুক্‌নো ছিল না।

আঁচলে চোখ মুছে সরকারী বললে—য্যাদ্দিনে বুঝলাম কেন তুই মধুর বিয়ের কথা পাড়িসনে। কাজটা কিন্তু ঠিক হয়নি, বিধু, তোকে উদাসীন দেখে মধু নিজেই যদি যা-তা একটা মেয়েকে ঘরে আনে তখন কি করবি? ধর যদি ক্ষেমীর ননদের মেয়েটাকে বিয়ে করে বসে, পারবি তাকে নিয়ে ঘর করতে? যা শাশুড়ী-কাটকী মেয়ে ওবাড়ীর!

ঠাকমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন—না পারলে আর করছি কি বল। আমি যে বউমার কাছে কথা খেলাপ করলাম না, এটাই হবে আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

—চালে হয়ত ভুল করলি, বিধু। পাকা খুঁটি কাঁচিয়ে ফেলতে গিয়ে যা সব খুঁটিই তোর কাঁচা থেকে যায়! আজ যাই। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখিস ভাই বিধু।

সরকারী উঠে পড়ল।

ঠাকমাও কুটনো শেষ করে উঠে পড়লেন। সরকারীর কথার জের টেনে বললেন—তা দেখব বই কি ভাই সরকারী। মন যদি তোমার কথায় সায় দেয়, তোমাকেই গিয়ে ধরব মেয়ের খোঁজে।

বাবা পরের দিন সকালে এলেন না। এলেন ঠিক সন্ধ্যা লাগলে; কিন্তু একা নয়—সঙ্গে একটি ডাগোর মেয়ে। একে সন্ধ্যার ঝাপসা আলো, তার ওপর চোখে ছিল না চশমা, ঠাকমা ঠাওর করতে পারছিলেন না

সঙ্গের মেয়েটিকে। তাই বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন—মেয়েটি কে রে মধু?

বাবা অপ্রতিভ, ভাবেই উত্তর দিলেন—বুড়ো হয়েছ, একা একা ঘর-সংসারের কাজ আর রান্না-বান্না করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তোমার। তাই ক্ষেমীর ননদের মেয়েটিকেই ঘরে আনলাম। আর ছেলেটাকেও ত বাঁচতে হবে। ও যা 'মা মা' করছিল দিন-রাত।

মহা বিস্ময়ে ঠাকমা জিজ্ঞেস করলেন—তুই বিয়ে করে এলি মধু?

বুকটা হয় ত তাঁর ধক্ করে উঠল। মুখ বিবর্ণ হল, চোখ দু'টি শিশির-ধোঁয়া অপরাজিতার মত ছল্-ছল্ করছিল। দুঃখে অপমানে তাঁর সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল। সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা-গলায় বললেন—তা বেশ করেছিস, মধু। আগে যদি জানতাম, এয়ো ডেকে বরণ করে ঘরে তুলতাম।

মেয়েটি ঠাক্‌মাকে ঢুপ করে একটা প্রণাম করতেই ঠাক্‌মা তাঁর চিবুক ছুঁয়ে বললেন—আহা বেঁচে বর্তে থাক মা, চির এয়োতি হও।

ঝাপসা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—খোকন, তোর নতুন মাকে প্রণাম কর।

আমি প্রণাম করতেই নতুন মা আমাকে আদর করে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

ঠাক্‌মা বললেন—খাসা বউ, দিব্যি বউ এনেছিস, মধু। দু'টিতে এখানে একটু দাঁড়া—আমি শাঁখটা নিয়ে আসি।

ঠাক্‌মা চলে যেতেই নতুন মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটি খোকা?

আমি বললাম—খোকন।

—ওত তোমার ডাক নাম, ভাল নামটি কি?

আমি বললাম—বিমলেন্দু।

নতুন মা বাবার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—একে কি বলে ডাকবো?

'খোকন বলে'—বাবা বললেন।

ঠাক্‌মা তাঁর মটকা কাপড়খানা পরে লক্ষীর ঘরের শাঁখটি হাতে করে ফিরে এলেন। যেই শাঁখে ফুঁ দিতে গেলেন, অমনি উঃ করে উঠেই শাঁখটি নামিয়ে রাখলেন। বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মা?

কিসে যেন কামড়ালো—ঠাক্‌মা বললেন।

বাবা বললেন—ঝাড়তো খোকন শাঁখটা।

আমি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বললাম—মুখে একটা তেঁতুলে বিছে বাবা।

বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন—যা খোকন ছুটে যা; আমার ঘর থেকে 'লেকসিনে'র শিশিটা নিয়ে আয় গে।

আমি 'লেকসিন্'-এর শিশিটা এনে বাবার হাতে দিলাম। দেখলাম ঠাক্‌মার ঠোঁটটা ফুলে উঠেছে। বাবা ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। নতুন মা কাছটিতে বসে ঠাক্‌মার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

এই দুর্ঘটনায় একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলের মনই ত্রাস, আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ

শ্রীঅরবিন্দ ও মানবের সনাতন প্রশ্ন

শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ দৃষ্ট বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এটা তার চিরন্তন স্বভাব। জ্ঞানের আকাঙ্খা তার দুর্দ্দমনীয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কেহ আছেন কিনা এবং যদি তিনি থাকেন, তাহা হ'লে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায় কিনা?—এই প্রশ্ন শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনকে আলোড়িত করছে। প্রতিযুগেই ঋষিরা এর জবাব দিয়েছেন, কিন্তু তথাপি মনে হয় সংশয়ের অবসান হয়না।

১৯২৫ সালে একদিন এইরূপ প্রশ্নের সমাধান না করতে পেরে আমার মনে শান্তি নেই। শ্রীঅরবিন্দকে কখনও দেখিনি। তাঁর বই কিছু পড়েছিলাম, এবং সেই ত্যাগী ঋষির প্রতি ছিল আমার প্রগাঢ় ভক্তি। মনে হলো তিনি আমার সংশয় দূর করতে পারবেন। তাঁকে লিখলাম, "আপনার উত্তরপাড়া বক্তৃতায় আপনি বলেছেন 'নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া'...। এটা কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অতিশয়োক্তি বা শ্রোতাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস? আমি যদি আপনার ঘরে যাই তাহলে আমাকে যেমন প্রত্যক্ষ করেন, নারায়ণকে কি ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ করে ঐ কথা বলেছিলেন? এরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উপনিষদে পাই। পরমহংস দেবও ঐরূপ কথা বলতেন। কিন্তু তাঁরা মরজগতে নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করি, সেইজন্য আমার সংশয়াকুল চিত্ত তার প্রশ্নের সমাধান চাচ্ছে।"

৭ই নভেম্বর ১৯২৫ পণ্ডিচারী থেকে শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ আমাকে লিখলেন:

"আপনার পত্রখানি শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন, তাঁহার উত্তর নিয়ে লিখিলাম। ভগবান আছেন ইহা খুবই সত্য এবং তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূতিগম্য, অবশ্য বিশ্বাস ভগবানের পথের সহায়; কিন্তু ভগবান যদি শুধুই বিশ্বাসের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনই বিশেষ মূল্য থাকিত না। ভগবান একটা মানসিক সিদ্ধান্ত বা থিওরিতে পরিণত হইতেন। অরবিন্দের পুস্তকাদি আপনি পড়িয়াছেন লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা।"

এই চিঠি অনেকবার পড়লাম, প্রাণে ও মনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। সংশয়ের উদ্দাম তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান মন থেকে সংশয়ের অবসান হ'লো, প্রাণে পেলাম অপার আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় শান্তি।

★

অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু ইহা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটি পচনশীল পদার্থ, হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট ভ্রম, একটা পাপ এবং উহা নিবারণ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম্ম ও পরম কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহা পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝেন, অন্ততঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্য, প্রত্যেক অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগ্নীকে আপনার করিয়া লওয়া, তাহাদিগকে আদরপূর্ব্বক সেবাভাব হইতে স্পর্শ করা এবং স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম মনে করা। অস্পৃশ্যের দুঃখ দূর করা, বর্ষ বর্ষ ধরিয়া আমরা যে তাহাদিগকে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি, তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে যে অজ্ঞানতা দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা ধৈর্য্যের সহিত দূর করা, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং এরূপ করিতে অন্য হিন্দুদের অনুরোধ করা, অনুপ্রাণিত করা।

—মহাত্মা গান্ধী।

ঐ—ঐ—ঐ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা। তিন তিন বার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হইয়া যদুগোপাল দারোগাগিরি পরীক্ষা দিল। তাহার পিতা তাহাকে বুঝাইল—বি. এ. পাশ করিলে কি হইত? হয় মাষ্টারী, নয় ওকালতী। আর দারোগাগিরিতে কাঁচা, পয়সা—অখণ্ড প্রতাপ। শাস্ত্রেও বলে "অর্থকরী চ বিদ্যা"। কেহ কেহ বলে দারোগাগিরিতে ঘুষের পয়সা আছে বটে, কিন্তু বিপদও যথেষ্ট। জেলের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। পিতা কহিল—নিন্দুকে কি না বলে?

তৎকালে যুক্ত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র পুলিশ ট্রেনিং স্কুল ছিল ভাগলপুরে। যদু ছয়মাস ট্রেনিং-এর পর সহজেই ট্রেনিং পরীক্ষা পাশ করিল। তা ছাড়া, বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিবার পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। তাহাকে ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার ছোট দারোগা (Second officer) নিযুক্ত করা হইল।

থানায় একজন বড় দারোগা (Officer-in-charge), দুইজন হেড কনষ্টেবল, একজন রাইটার ও দুইজন লেখা-পড়া জানা (Literate) কনষ্টেবল, এবং দশজন সাধারণ কনষ্টেবল। থানাটী নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত। থানার প্রায় আধমাইল দক্ষিণে মেঘনা নদী, মধ্যে ধান ক্ষেত। নদীর অপর পারে কুমিল্লা জেলা। উত্তর পূর্ব্বে ভৈরববাজার—ময়মনসিংহ জেলা। উত্তরে একটী সিকিমাইল ব্যাপী ভাল রাস্তা পোষ্টাফিস ও স্কুল হইয়া বাজারে শেষ হইয়াছে। রাস্তার পশ্চিমে খেলিবার মাঠ ও গোচারণ ভূমি। তার পশ্চিমে গণিকা পল্লী—শুনা যায় সেই পল্লীতে পঞ্চাশের অধিক বারনারী বাস করিত এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত চর্চ্চা করিত। ইহারা বাইজী নামে অভিহিত হইত।

যেদিন জাহাজে চড়িয়া যদু অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জ হইতে রায়পুরা পৌঁছিল, তার পর দিন বড় দারোগা অনাদিবাবু তাহাকে নিজ বাসায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। যদু গেলে তাহাকে চা, লুচি ও হালুয়া খাইতে দিলেন। পরে প্রশ্ন করিলেন, "এই তো আপনার প্রথম চাকরী?" যদু তদুত্তরে বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমার এই-ই প্রথম চাকরী। দশদিন আগে আমি ভাগলপুর ট্রেনিং স্কুল হতে বেরিয়ে এসেছি।"

অনাদি। আমার দারোগাগিরিতে চব্বিশ বছর হয়ে গেছে। আপনি—তুমি নূতন আগন্তুক। তোমাকে কতকগুলি কথা বলতে চাই। আশাকরি তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং শুনে আমার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করবে না।

যদু। বিলক্ষণ! কি যে বলেন! আপনি আমার গুরুস্থানীয়।

অনাদি। আচ্ছা, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, তুমি জান তুমি কে?

যদু। আমি একজন ক্ষুদ্র পুলিশ কর্ম্মচারী।

অনাদি। এখানেই মস্ত ভুল করলে। তুমি ক্ষুদ্রও নও এবং কর্ম্মচারী মাত্রও নও। তুমি ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। যারা ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করেছে এবং উহার সংরক্ষণ করছে, তুমি তাদেরই একজন।

যদু। আজ্ঞে, কথাগুলির অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অনাদি। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। সৈন্যবাহিনী দ্বারা ইংরেজ ভারত জয় করেছে এবং বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হতে রাজ্যরক্ষার জন্য ওরা নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু পুলিশবাহিনী দ্বারাই আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে এবং দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালাচ্ছে। অতএব ভেবে দেখ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমরা কত প্রয়োজনীয়। ইংরেজ ইহা বিলক্ষণ জানে ও বোঝে।

যদু। তার প্রমাণ ?

অনাদি। অজস্র। এ জন্যই ইংরেজ পুলিশকে প্রচণ্ড ক্ষমতা দিয়েছে এবং পুলিশ ইচ্ছামত সে ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যবহার করতে পারে। পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব এমন কি লাট বেলাট পর্য্যন্ত পুলিশকে বাঁচাবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। পুলিশ চালানী মোকদ্দামায় যদি ডেপুটী বা সাবডেপুটী বাবুরা আসামীকে ছেড়ে দেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাদের কৈফিয়ৎ তলব করেন। পুলিশ কোন বে-আইনী অথবা অন্যায় কাজ করলে উঁচু হতে নীচু পর্য্যন্ত সকল রাজকর্ম্মচারী পুলিশকে সাহায্য করতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। সংক্ষেপে ইংরেজ শাসন নীতির মূল সূত্র এই যে, নিজেদের মধ্যে যত খুসী মারামারি কাটাকাটি করতে পার, কিন্তু সাহেব ও পুলিশের কার্য্যে বাঁধা দেবে না। কারণ, সাহেব রাজ্যের রাজা এবং পুলিশ তাহার সহায়। এইজন্য ইদানীং শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে পর্য্যন্ত লেখা হ'ত, "সাহেব দেখলে সেলাম ক'রবে, পুলিশ দেখলে ভয় ক'রবে।"

যদু। আর একটু বুঝিয়ে বলুন এই নীতির তাৎপর্য্য কি ?

অনাদি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর তুমি ঘুষ খেয়ে আসল চোর বা ডাকাতকে ছেড়ে দিয়ে কোন নিরীহ গরীবকে চালান দিলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে ডেপুটী বাবু তাদের শতকরা আশি জনকে সাজা দেবেন। ধর দোষ স্বীকার করাবার জন্য তুমি, কিম্বা তোমার হুকুমে কনষ্টেবলেরা একটা লোককে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে হাড় ভেঙ্গে দিলে, অথবা মারের চোটে একেবারে মেরেই ফেল্লে, তখন সকল রাজপুরুষ তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ফলে পুলিশকে ভয় না করে ইংরেজের রাজ্যে এমন কেউই নেই—ধনী, নির্ধন, জমিদার, প্রজা, বিদ্বান, মূর্খ, সকলেই পুলিশের নামে সন্ত্রস্ত। লোকে বলে হাতীর চোখ দুটী ছোট এবং এমন জায়গায় আছে যে, সে সমস্ত শরীর দেখতে পায় না। পেলে পৃথিবী লণ্ড ভণ্ড করে ফেলতো। অনেক পুলিশ কর্ম্মচারীও নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা জানে না। হাতীর মত নিজের শরীর দেখতে পায় না। সেজন্যই তোমাকে সব বুঝিয়ে দিলুম। আমার কথাগুলি মনে রেখো। তা হলে পুলিশের কার্য্যে উন্নতি করতে পারবে। স্কুলের ছাত্রদের মত, ন্যায়, ধর্ম্ম, বিবেক প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামিও না।

যদুগোপাল বক্তা

তখন শীতকাল। একদিন একটা কেস্ সম্বন্ধে অনাদি বাবুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাহার বাসায় গিয়াছি, দেখি যে, পাৎলুন ও গলাবন্ধ কোট পরা মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক চা ও জলখাবার খাইতে ব্যস্ত। খাবারের বিপুল আয়োজন—লুচি হালুয়া তো আছেই, তার উপর নানা প্রকার মিঠাই ও পিঠা, পায়স ও নানা প্রকার ফল। অনাদি বাবু আলাপ করাইয়া দিলেন: "ইনি হচ্ছেন আমাদের সরকারী ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার—আর ইনি আমাদের নূতন ছোট দারোগা।" উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করিলাম। পান, তামাক খাইয়া ডাক্তার বাবু বিদায় নিলেন। অনাদি বাবু বাড়ীর গেট্ পর্য্যন্ত উহাঁকে আগাইয়া দিলেন।

আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "দেখ, যদু! পুলিশকে শুধু একটী লোককে সমীহ করে চলতে হয়—সে হচ্ছে সরকারী ডাক্তার। ডাক্তার পুলিশের সহায় থাকলে আর কোন ভয় নেই। তুমি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করতে পার। গুরুতর আঘাতকে ক্ষুদ্র আঘাত এবং ক্ষুদ্র আঘাতকে গুরুতর আঘাতে পরিণত করতে পার। রুলের গুতায় অথবা সবুট পদাঘাতে মৃত্যুকে প্লীহা কাটিয়া মৃত্যুতে অথবা আত্মহত্যায় রূপান্তরিত করতে পার।" তারপর কেস্ সম্বন্ধে অনাদি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিলাম।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম অনাদিবাবু যাহা বলিলেন, তাহা খুব খাঁটী কথা। তদবধি সরকারী ডাক্তারকে সম্মান ও সমীহ করিয়া চলিতাম এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করিতাম।

দুই

তারপর দারোগাগিরির ছয়মাস উর্ত্তীর্ণ হইল। অভিযোগকারী বা আসামীকে অথবা গালিগালাজ বা মারপিট করিয়া অর্থ আদায় করিতে পারিলাম না। চক্ষু

লজ্জাই বল বা বিবেক-বুদ্ধিই বল, ইহাতে বাঁধিত। বড় দারোগা কনেষ্টবলদের নিকটে অগোচরে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমার সম্বন্ধে সকল সংবাদই রাখিতেন।

আবার তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি শঙ্কিতচিত্তে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

এবার তিনি কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন, "দেখ, ছোকরা। কনেষ্টবলদের মুখে শুন্‌ছি তুমি এখনও চক্ষুলজ্জার হাত এড়াতে পার নি। এজন্ত কনষ্টেবলেরা তোমার সঙ্গে মফঃস্বলে যেতে অনিচ্ছুক। তুমি যদি কিছু না পাও, তবে ওরা পাবে কোত্থেকে? এবার আমি তোমাকে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় উপদেশ দেব। দেখ, সাদা চোখে দারোগাগিরি চলে না। চোখ দু'টী একটু রক্তবর্ণ হওয়া চাই। একটু একটু সোমরস পেটে না পড়লে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করবে কি করে? আমরা সব সময় ন্তায় ও ধর্ম্মের পথে চলি না—চলতে পারি না—উপরওয়ালারাও তা চায় না। কাজেই আমাদের লাল চোখের বিশেষ প্রয়োজন।"

বড় দারোগার উপদেশ বেদবাক্যের মত গ্রহণ করিলাম। প্রথমতঃ বিয়ার দিয়া আরম্ভ করিলাম, তার-পর ব্র্যাণ্ডি ধরিলাম। মফঃস্বলে ইহার অধিক কিছু সচরাচর পাওয়া যায় না। এ দুটীর অভাব হইলে দেশী তাড়ি বা ধান্তেশ্বরীও চলিত। চক্ষুলজ্জা, বিবেকদংশন প্রভৃতি কমিতে আরম্ভ করিল। ধনীর নিকট টাকা খাইয়া দরিদ্রের উপর মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইতাম। মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে সাজা দেওয়াইতাম। ধনীদের বিরুদ্ধে চোরাই মাল রাখা বা চোরাই মালের কারবার করার মিথ্যা অভিযোগের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতাম। গ্রামের মধ্যে কোন শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেলে, উহা গ্রামের জমিদার বা কোন ধনী ব্যক্তির বিধবা কন্তার জারজ সন্তান বলিয়া মোকদ্দমা খাড়া করিতাম। এইরূপে বিস্তর অর্থাগম হইতে লাগিল। স্ত্রী সব সময় কাছে থাকিত না। মন্ত পানের অবশ্যম্ভাবী ফল চরিত্রহীনতা। প্রলোভনের সীমা নাই। চরিত্র হারাইলাম। ক্রমাগত বিয়ার ও ব্র্যাণ্ডি পানে যকৃৎ বিকৃত হইল—যাকে বলে hob-nailed liver. মধ্যে মধ্যে যকৃতের বেদনা হইয়া শয্যাগত থাকিতাম। যখন আমার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা এই-রূপ, তখন আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিল।

তিন

তখন দারুণ বর্ষাকাল। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত। এক একটী বাড়ী যেন এক একটী দ্বীপ। এরূপ একটী দ্বীপে রামধন জেলে ও তাহার স্ত্রী চারিটী শিশু-সন্তান নিয়া বাস করিত।

একদিন অপরাহ্নে খবর আসিল রামধন জেলের স্ত্রী গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বড় দারোগা আমাকে এই কেসের তদন্ত করিতে আদেশ দিলেন। দুইজন কনষ্টেবল সাগ্রহে আমার সঙ্গ নিল। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় তাহারা জানিত আমার সঙ্গে গেলে উহাদেরও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। গ্রাম্য চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রামধন জেলের বাড়ী থানা হইতে মাইল খানেক দূরে জলপ্লাবিত ধান্তক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী এক টিলাতে। নৌকা করিয়া যাইতে হইবে। বর্ষাকালে তদন্তের জন্ত একখানি পান্‌সী নৌকা সর্ব্বদা থানার ঘাটে বাঁধা থাকিত। আমরা সকলে সেই নৌকায় রওনা হইলাম। পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সাদা চোখ লাল করিবার জন্ত একটী ব্র্যাণ্ডির বোতল সঙ্গে নিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে নৌকা যখন রামধনের ঘাটে ভিড়িল, তখন ব্র্যাণ্ডির বোতলে বেশী কিছু অবশিষ্ট ছিল না এবং আমার চোখও সাদা ছিল না।

গিয়া দেখি লাস একটী আম গাছের নীচের ডালে ঝুলিতেছে। জিভ সামান্ত বাহির হইয়া আছে। আত্ম-হত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। আরও দেখিলাম রামধন দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে শয্যা-শায়ী—অস্থিচর্ম্ম সার কোটরগত চক্ষু নরকঙ্কাল। চারিটী ছেলেমেয়েও কঙ্কালসার, উত্থানশক্তি রহিত। মাটিতে

শুইয়া মা, মা করিয়া কাঁদিতেছে। আমি গিয়াই রামধনকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলাম। ছেলে মেয়েগুলি আমার ধমক শুনিয়া, ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কান্না থামাইল। আমি কর্কশ স্বরে বলিলাম, "বেটা, স্ত্রীকে মেরে ফেলে, পুলিশকে ফাঁকি দিবার মতলবে গলায় কাপড় দিয়ে লটকিয়ে রেখেছিস। দে বেটা। দশ টাকা দে। নইলে খুনের দায়ে কোর্টে চালান দেব।" আমার কথা শুনিয়া রামধন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "দারোগাবাবু, আজ চার মাস আমি রোগে শয্যাগত। এই চার মাস আমার স্ত্রী ভিক্ষা করে, নিজের দুই একখানা রূপার গহনা যা ছিল এবং থালা-ঘটি বিক্রী করে আমাকে পথ্য দিয়েছে এবং ছেলে মেয়েগুলোকে দুই একদিন অন্তর এক বেলা নুন ভাত খাইয়েছে। আজ ৪।৫ দিন যাবৎ ভিক্ষাও মেলে নি, বিক্রী করবারও কিছু নেই। আমি ও ছেলে মেয়েগুলো ৪।৫ দিন উপবাসী। চোখের উপর আমার ও পেটের সন্তানদের অনাহার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হতভাগিনী গলায় দড়ি দিয়া মরেছে। আমি টাকা কোথায় পাব?" যদি আমি সাদা চোখে থাকিতাম, তাহা হইলে এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া আমার মত পাষণ্ডেরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হইত। কিন্তু তখন রক্তচক্ষু, মত্ত পিশাচ। কনেষ্টবল দুটীকে হুকুম দিলাম "শালাকে টেনে নৌকায় তোল। শালাকে চালান দেব।" একে তো হনুমান, তাহাতে শ্রীরামের আজ্ঞা। অমনি দুইজনে নির্দ্দয়ভাবে টানা, হিঁচড়া করিয়া রামধনকে নৌকায় তুলিল এবং উহার জীর্ণ শরীরে দুই একটা রুলের গুতাও বসাইয়া দিল। রামধন ও উহার স্ত্রীর লাস নৌকায় তুলিয়া নিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। চারিটী ছেলে মেয়ের কি হইবে, তাহা চিন্তাও করিলাম না।

রামধন নৌকায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞানের ভাণ করিতেছে মনে করিয়া মরা গরুর মত টানিয়া আনিয়া থানার গারদ ঘরে বন্ধ করিলাম। উহাকে কিছু খাইতে দিবার কথা কেহ মনে করিল না।

পরদিন বহু বেলায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়াই শুনিলাম রামধন গত রাত্রিতে লক্-আপে মরিয়া রহিয়াছে। দুপুরে খবর আসিল রামধনের চারিটী ছেলে মেয়ে মধ্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রাতে দেখা গেল শৃগালে উহাদের মৃত দেহ অর্দ্ধভুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনায় আমার শিক্ষাদাতা গুরু বড় দারোগা পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়া গেলেন। সরকারী ডাক্তারও কোন প্রকার সাহায্য করিলেন না। আমার নামে উর্দ্ধ্ব কর্ম্মচারীদের নিকট রিপোর্ট হইল। জোর তদন্ত হইল। আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের হইল। বিচারে আমার এক বৎসর কারাদণ্ড হইল। আমি পুলিশ কর্ম্মচারী না হইলে বোধ হয় দণ্ড বহু গুণে গুরুতর হইত।

ঢাকা জেলের ডেপুটী জেলার বক্তা

পূর্ব্বতন দারোগা ভদ্র বংশের ছেলে যদুগোপাল যেদিন আমাদের জেলে আসিল, আমাদের মনে একটু কষ্ট হইল; কিন্তু খাদ্য পোষাকাদি সম্বন্ধে উহার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, কারণ বর্ত্তমানে যেমন কয়েদীদের এ, বি, সি শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তথাপি আমরা উহাকে কঠিন শ্রমজনক কার্য্য না দিয়া জেল-অফিস ঘর ঝাড়া পোছার কাজ দিলাম।

জেলে আসিবার পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই সে সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া ঐ—ঐ—ঐ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ওয়ার্ডার, জেলার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা উহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল এবং ঐরূপ চীৎকার করিতে বারণ করিল। কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হইল না। অবশেষে চীফ জেলার উহাকে দৈহিক শাস্তির ভয় দেখাইলেন। তখন যদু বলিল, "ঐ দেখুন রামধন জেলে, কঙ্কালসার, কোটরগত চক্ষু—ঐ রামধনের স্ত্রী, গলায় দড়ির দাগ, জিভ অর্দ্ধেক বেরিয়ে রয়েছে আর ঐ ওদের চারিটী ছেলে-মেয়ে, কঙ্কালসার, উলঙ্গ—আমার চোখের সামনে ভাসছে, উড়ছে, পড়ছে—শীর্ণ অঙ্গুলি তুলে আমাকে শাসাচ্ছে—ঐ, ঐ, ঐ।" ভয়ে উহার চক্ষু দু'টী কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। আমরা সকলেই স্থির করিলাম উহার এরূপ

আচরণ ও ভয়ের কোন গূঢ় কারণ আছে। নিশ্চয়ই সে চক্ষের সমক্ষে কোন প্রকার ছায়া দর্শন করিতেছে। তখন আমরা জেল ডাক্তারকে সংবাদ দিলাম এবং বন্দুকে একটী পৃথক্ সেলে রাখিলাম। কিন্তু যতক্ষণ সূর্য্যের বা প্রদীপের আলোক থাকিত, সে এরূপ চীৎকার করিত। আলো না থাকিলে একটু শান্ত হইত।

জেল ডাক্তারটী L. M. P. হইলেও বহুদর্শী এবং সর্ব্বদা ডাক্তারী পুস্তক ও পত্রিকায় রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নূতন তথ্যের সংবাদ রাখিতেন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই উহার চক্ষের কোন প্রকার পীড়া হইয়াছে, যার জন্য সে চক্ষের সমক্ষে ভাসমান্ ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পায়। তিনি বলিলেন, "আমাকে একদিন সময় দিন্। আমি চক্ষুর পীড়া সম্বন্ধীয় Dr. Macnamara-র বইখানি পড়ে আমার মতামত জানাব।" পরদিন ডাক্তারবাবু বহিখানি সঙ্গে করিয়া জেলে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি উহার ভয়ের যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি। উহার রোগের নাম Muscae Volitantes (মাস্কি ভলিটেন্টিস্)। যকৃতের পীড়া হতে ইহা উৎপন্ন হয়। চোখের রেটিনার প্রদাহের দরুণ চোখের সামনে ভাসমান্ ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পায়।" পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল উহার যকৃত পীড়িত ও সঙ্কুচিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল শেষের দিকে মদ্যপান করিলেই উহার যকৃতের বেদনা হইত, তথাপি মদ্যপান করিত। জেলে ডাক্তারবাবু যকৃতের নানা প্রকার চিকিৎসা করিলেন। কোন ফল হইল না, বরং ঐ-ঐ-ঐ চীৎকার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। শেষে পাগল হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া উহাকে রাঁচির পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

বুঝিলাম যকৃতের পীড়া ও তৎসহ পূর্ব্বকৃত উৎকট পাপের দারুণ অনুশোচনাই উহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাইয়াছে।

বিস্মরণ

সুনীলকুমার নন্দী

সকাল থেকে আকাশে আজ ভাসিছে সারাখন
মেঘেরা সাদা ফুলিয়ে পাল, আমার দোলে মন।
মেঘের মতো স্মৃতির নাও উড়িয়ে জোর পাল
উজান ঠেলে চ'লেছে কোথা,—কবে কী নাজেহাল!

পেঁজানো সাদা তুলোর মতো মেঘের কিনারায়
বাড়ায়ে চোখ অনেক খুঁজে একটু দেখা যাক্
আকাশ নীল ; বিস্মৃতির ধুলোর পুরু সর
তেম্নি ঠেলে তোমারে খুঁজি ;—আবেগে থরোথর
কাঁপায় আজ সারাটা দিন : আকাশ-নীলিমায়
মেঘের পাড়ে তোমার মিল হাত্ড়ে মরি হায়—

হাল্কা মেঘ উড়োন দিল হয় তো যাদু জানে ;
সকাল থেকে সারাটা দিন কী ছানা শুধু ছানে
নরম হাতে পুরোণো মন হঠাৎ ফিরে পেয়ে
তোমার ছবি আকাশ হ'য়ে হরিয়ে যা'য়া মেয়ে।

অভিনয়ের শিল্প-প্রসঙ্গ : একটি প্রশ্ন

সুনীল দাশগুপ্ত

এ দেশের মঞ্চ ও পর্দার রূপরাজ্য থেকে খেদোদ্বেলিত একটা নালিশ প্রায়ই কানে এসে থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সে-নালিশ আমাদের অভিনেতৃচক্রের। নালিশ ও খেদের কারণ তাঁদের অ-যথেষ্ট সামাজিক সমাদর নিয়ে।

দীর্ঘশ্বাসে ভারি ক'রে এ দেশের নটধামবাসীরা উঠতে-বসতে অভিযোগ তুলে থাকেন যে, দিনরাত রঙকালি মেখে সঙ্ সেজে দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত ফুটলাইট, রিফ্লেক্টার আর আর্ক-ল্যাম্পের চড়া আলোয় দেহ-মন ঝল্‌সে যে-আনন্দ-অর্ঘ্য তারা সমাজকে সমর্পণ করে যাচ্ছেন, নটধামের সে-অর্ঘ্য সমাজ ভোগ করে নিতান্ত স্বার্থপরের মতো। অর্ঘ্যের বিনিময়ে সমাদরের কোন অর্ঘ্য সমাজের কাছ থেকে অভিনেতারা পান না। অভিনেতাদের পরিবেশিত রস নিয়েই সমাজের মধ্যে হল্লা করে প্রীতিভোজের আসর বসে, অথচ সে আসরে খোদ পরিবেশন করছে যারা তারা থাকে হয় উপোষ করে, নয়তো, বড় জোর খুব বেশী হলে, তাদের পাতা গিয়ে পড়ে আসরের বাইরে, যেখানে অপাঙক্তেয় রবাহূতদের পঙক্তি সেইখানে। সমাজের কোনো শ্রদ্ধেয় আসনেই (অভিনেতাদের নালিশ) এতচ্ছ্রেণীয় নট-নটীর কোনো ঠাঁই নেই। তারা শুধুই অবসর-বিনোদনের উপকরণ মাত্র, শুধুই সান্ধ্যবিলাসের সামগ্রী। কিন্তু সমষ্টি কৌলিণ্যের বেলায় তারা গোত্রহীন।... অথচ (নালিশটা এখনও চলছে) তাকাও ইয়োরোপের দিকে, নজর ফেলো আমেরিকায়, চেয়ে দেখ রাশ্যাকে সেখানে অভিনেতারা কি শুধু সমাদৃত? সেখানে তাঁরা বরেণ্য। কবি-চিত্রী, ভাস্কর-স্থপতি এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টাদের পাশেই তাঁদের আসন। শুধু অভিনয় করেই সেখানকার নট 'নাইট' হন, সমাজের সর্বোচ্চতলাবাসীরাও পর্য্যন্ত আপ্যায়নী-সভা ডেকে তাঁদের সম্বর্দ্ধিত করেন। এমনকি অভিনয়-শিল্পীর জীবন গ্রহণ করেছেন বলে উচ্চতম রাষ্ট্রনায়কের পুত্রবধূ হতেও সেখানকার অভিনেত্রীর পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে না।

বলা-বাহুল্য, আড়ি দিয়ে কোথাও কান পাততে হয় না, অভিনেতৃচক্রের এই দীর্ঘশ্বাসের উচ্ছ্বাসটি শোনার জন্যে। রঙ্গজগতে সার্ব্বজনীন সর্ব্বব্যাপ্ত এই খেদোদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাস। আমরা যারা ক্ষুদ্র যোগ্যতার সবে এসে এই চক্রের অর্ব্বাচীনদলে আশ্রয় নিয়েছি, তাদের তো কথাই নেই,—কান খোলা রেখে চললে এই গুরুভার অভিযোগের উদ্দিষ্ট যাঁরা খোদ সেই দর্শকসমাজও এই আমাদের নট-চক্রের খেদবিলাস হামেশা শুনতে পাবেন।

খেদ-বিলাস বৈ কি। ব্যক্তিগত সমাদরের দিকে চেয়ে কথাটা তুললে এবং আমার বিশ্বাস এ ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় লক্ষ্য আমাদের নট-মহলের নেই—এ-জাতীয় অভিযোগ রীতিমতোই একটা উন্নাসিক খেদ-বিলাস। পুরু গদিমোড়া আরামের আশ্রয়ে স্থূলপক্ক শরীরটিকে থিতিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের বনেদী বড় লোকেরা যেমন তুড়ি দিতে দিতে হাই তোলেন আর বলেন, বড়লোকিতে সত্যিই কোনো সুখ নেই,—সামাজিক সমাদরের অভাব কল্পনা করে আমাদের নটচক্রের খেদোক্তি-প্রকাশটাও ঠিক তেমনই একটা আরামদায়ক হাই-তোলা সন্তাপ। সমাদরের ঠিক মাথাটিতে চড়ে তাঁরা সবাই সমাদরের জন্যে বুক চাপড়াচ্ছেন।

সত্য বলতে, ব্যক্তি বা শ্রেণী হিসেবে অভিনয়-শিল্পীদের চেয়ে বেশী বা ব্যাপক সমাদর আমাদের সমাজে আর কোন্ বিভাগের আর্টিষ্টরা পেয়ে থাকেন? দেশের ষাট-সত্তর হাজারী কাগজগুলো পুরো এক-একটা পৃষ্ঠা জুড়ে তাঁদের ছাড়া আর্টের আর কোন্ বিভাগের কথা এমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এমন সচিত্র সমারোহে প্রচার ক'রে চলেছেন? ক'জন আমাদের দেশে নিয়মিত

পয়সা খরচ করেন সাহিত্যরস উপভোগে, আর কত লাখ গিয়ে করেন থিয়েটার-সিনেমাগুলোর উইন্ডোতে। আমাদের সমাজের সুবিরাট নিরক্ষরতার দোহাই দিয়ে লাভ নেই। আমি সাক্ষরদের কথাই বল্‌ছি। ঘরে, পথে, চায়ের দোকানে, অথবা লেকের মাঠ আর পার্কগুলোর সান্ধ্য আড্ডায় এমন কত হাজারো সাক্ষর ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলবে, যারা বলতে পারেন না, 'শেষের কবিতা' কাব্য না কাহিনী না, দুই-ই। অভয়া বা অন্নদা দিদি কে, তা জানতে চাইলে থতমত খেয়ে যাবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হোক্ অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সব শেষের ছবিটা কী? তা হ'লে তৎক্ষণাৎ শুধু প্রশ্নটার যথাযথ উত্তরই না, জিজ্ঞাসিত শিল্পীর নাড়ী-নক্ষত্রের আদ্যন্ত ইতিহাসটি পর্য্যন্ত বসে বসে ঠায় শুনে যেতে হবে।

আমাদের উচ্চ-ভ্রূ শিক্ষাভিমানীরাও এ-ব্যাপারে তেমন কিছু ব্যতিক্রম নন। অবশ্য, প্রকাশ্যত আমাদের সঙ্গে দৈবাৎ তাঁদের কারো চোখাচোখি হয়ে গেলে ঠোঁঠ উল্টে সাত-তাড়াতাড়ি তাঁরা চোখ ফিরিয়েই নেন। অথবা তা যদি না ফেরান তো সে-চোখে চেষ্টা করেন একটি বিশুদ্ধ অনুকম্পা ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু কচিৎ কোথাও দৈব-ক্রমে ছায়াপথের কোনো প্রধান নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়ে যায় যদি, তা হ'লে তাঁরাও সে-ঘটনাকে স্মরণ ক'রে রাখেন একটা গর্ব্বিত অভিজ্ঞতা বলেই। তাঁদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের জানবারই কোনো আগ্রহ নেই যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প, কবিতা এবং জ্যোতির্ম্ময় রায় প্রবন্ধ লেখা ছেড়ে বাংলা সাহিত্যকে কতখানি বঞ্চিত করেছেন। কিংবা যামিনী রায় মানুষটির নাম যাঁদের কাছে একটি দস্তুরমতো খবর অথচ সাধারণ একজন-'ফ্যান' এর মত নগণ্য এক অভিনেত্রীর ভূমিকা তালিকা তাঁরাও মুখস্থ করে রাখবেন। প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্র-জগতে ফিরে আসছেন না বলে তাঁদেরও হা-হুতাশ অনন্ত।

না, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত গৌরবে অভিনেতাদের প্রতি সমাদরের কোনো অভাব আমাদের সমাজে নেই। বরঞ্চ যে বস্তু লঘু-গুরু নির্ব্বিশেষে সমাজ তাঁদেরকে দেয়, সেটা সমাদরের আধিক্য। রস ও আনন্দের অবদাতা হিসেবে এত বেশী বিনিময়-মূল্য আমাদের পাওনা নয়। আমাদের চেয়ে অনেক বড় পাওনার অধিকারী যাঁরা কবি, কথা-সাহিত্যিক আর কলাকার তাঁরা। আর্টের সামগ্রিক অঙ্গনে তাঁরাই তো হলেন প্রকৃত পুরোহিত। আমরা তাঁদের পূজার সজীব উপচার মাত্র। তাঁরা স্রষ্টা, আমরা সে সৃষ্টির ব্যাখ্যাতা। তাঁরা পথের নিশানা আঁকেন, আর আমরা সেই ছক-কাটা নিশানা দেখে পথটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রসভোক্তাদের আছে জমকালো ক'রে দেখাই।

তবু কিন্তু আমি বলবো, এত যে সমাদর, এত যে দু'হাত-ভরা মূল্য আমাদের, এ নিয়েও আর্টিষ্ট হিসেবে আর্টের সামগ্রিক ক্ষেত্রে কবি, সাহিত্যিক আর কলা-কারদের কাছে আমরা অভিনেতাগোষ্ঠীই হয়ে রয়েছি, লজ্জাকর ব্যবধানে হেরে রয়েছি। কৃষ্টি-কৌলিন্যে সমাজে সার্থক তাঁরাই, আমরাই অপোক্তের মতো বঞ্চিত। আমরা অভিনেতারা মূল্য পাই, সমাদরও অজস্র ভোগ করি। আমাদের সখের খাম-খেয়ালিতে গোটা সমাজের পোষাক-প্রসাধনের ফ্যাসানটাও রাতারাতি পাল্টে যেতে পারে পর্য্যন্ত। কিন্তু তারপর? তারপর কী? সমাজের বুদ্ধিমার্গে, যেখানেই হলো সমাজের সত্যকার জীবন,—সেখানে কোথায় আমাদের স্থান? এতটুকু উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিও কি আজ অবধি আমরা অভিনেতারা পেয়েছি সমাজের এই কৃষ্টি পরিমণ্ডল থেকে?

আর্টের অর্থ, একটা পরিণত সমাজে, কোনদিনই শুধু একটা নিছক আনন্দোপচার বা রূপ-প্রয়াস নয়। আর্ট হচ্ছে চিরদিনই দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম ও রাজ-নীতির মতো একটা সচেতন সমাজ-সক্রিয়তা। মানুষের যে-কোনো শুভঙ্করী জীবন-সত্তার মতো আর্টও বাড়ে, কমে ও বিবর্ত্তিত হয়। যে-কোন আইডিয়ার মতো যুগে যুগে এরও রূপের ভেদ ঘটে, গুণের তারতম্য আসে। আর্ট তাই মাত্র একটা হাল্কা চিত্ত-বিলাস নয়, আর্ট হচ্ছে সমাজের একটা পরিপূর্ণ লিভিং ফোর্স। বলা বাহুল্য, এমন একটা শক্তিদীপ্ত জীবন চৈতন্যের মূলে একটা স্থির-বদ্ধ থিয়োরী থাকবেই। থাকবেই একটা শৃঙ্খলার সুসঙ্গতি, সর্ব্ব বৈচিত্র্যকে সুসমঞ্জস করার একটা সর্ব্বমান্য ঐক্য।

এবং এই নিয়ম, শৃঙ্খলা আর ঐক্য নিয়ে গড়ে উঠবে আর্টের বিজ্ঞান, তার রস-সংহিতা, এস্‌থেটিক্‌স্‌। এই এস্‌থেটিক্‌স্‌ই যদি না গড়ে ওঠে কোন সমাজে, তাহলে বুঝতে হবে, সে সমাজের বুদ্ধিসত্তায়, তার সাংস্কৃতিক জীবনক্ষেত্রে আর্টের প্রতিষ্ঠা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নি।

রসকলাপের এই যে শাস্ত্রীয় সর্ত্ত, এই সর্ত্তে যে আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের কাব্য-সাহিত্য এবং শিল্পকলা—এ-সব কটি সৃষ্টি প্রয়াসই সসম্মানে উত্তীর্ণ, এ সম্বন্ধে আশা করি কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। সচেতন হয়ে হোক, চাই অগোচরেই হোক্‌, রস ও রূপের একটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য থিয়োরীকে এই ক'টি আর্ট-মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বথা মেনে চলিই। সঙ্গতি ও সুসমঞ্জসের একটা সযুক্তি বিধান যে এই মাধ্যম ক'টির ক্ষেত্রে সব সময় মশাল হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, এটা কোনো ক্রমেই কেউ উপেক্ষা করতে পারে না আমাদের সমাজে। এরই জন্যে এক নজরে আমরা ঠাহর করে নিতে পারি কেন, বহু চিত্তহর হয়েও মোহনসিরিজের বইগুলো আর্ট নয়, অথচ প্রায় অনাস্তিকে থেকেও প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা' একটি উচ্চাঙ্গ রসকর্ম্ম। বুঝতে পারি কেন অর্থহীন হয়েও সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' আর্ট, কিন্তু নীতি কথায় ভারাক্রান্ত হয়েও বাল্যশিক্ষার ছড়াগুলো আর্ট নয়। বিলিতি ক্যালেণ্ডারের অর্দ্ধনগ্ন ফিরিঙ্গি-বালার বর্ণাঢ্য ছবি আর কালীঘাটের বিরলবর্ণ পটগুলোর মধ্যেও যে রস-সম্পদের লঘু-গুরু কোথায় এবং কেন, তাও আমরা উপলব্ধি করতে পারি এই একই কারণে। কাব্য ও কলার একটি সুপরিমিত শাস্ত্রকে আমরা আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে, আমাদের সমাজ-জীবনের বুদ্ধিমার্গে মাথায় ক'রে রেখেছি। আমাদের সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে তাই এই শিল্পীরা একাত্ম। রসের আসরে ওরা কুলীন।

কিন্তু অভিনয়ের বেলা ?

অভিনয়কেও তো ক্ষেত্রে-বিক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই আমরা অভিনেতারা বেশ গাল-ভরা আত্মপ্রসাদেই 'আর্ট' বলে উচ্চারণ ক'রে থাকি। কিন্তু আর্টই যদি, তবে কী স্বরূপ সে আর্টের ? আর্টের পদ-মর্য্যাদায় অভিনয় সৃষ্টি-ধর্ম্মী না আলঙ্কারিক ? না ব্যাখ্যাত্মক ? এবং আর্টই যদি, তবে কোথায় সে আর্টের এস্‌থেটিকস্‌, তার সযুক্তি সংহিতা ? কোন্‌ ধরণের অভিনয় কিসে ভালো, আর কিসে ভালো নয়, সেই সার্ব্বজনীন প্রশ্নের গরিষ্ঠ-মান্য অকাট্য বিচার কোন থিয়োরীতে হবে ? অভিনয়ের আসল-নকল কোন্‌ রূপতত্ত্ব দিয়ে আমরা বুঝবো ?

জানি, অভিনয়-সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলো শুনে আমাদের নটধামের প্রতিষ্ঠিত প্রবীনেরা রুষ্ট হবেন। সেদিনকার ছোকরার অকালপক্ক ধৃষ্টতায় চোখ মটকে বিদ্রূপের হাসি হাসবেন তাঁরা। এবং হয়তো টেনে টেনে নাটুকে সুরে মন্তব্য করবেন যে, অভিনয়ের আবার থিয়োরী-ফিয়োরী কিসের হে ? অভিনয় হচ্ছে অভিনয়, যা সত্যি নয়,—মানুষের বহুবিধ বাস্তব behaveor এর অনুকৃতি ক'রে যা দিয়ে তাবৎ দর্শককে আনন্দিত করা হয়, তাই।

এটা উত্তর নয় প্রশ্নের, গা-ঢাকা দিয়ে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস। বাস্তবের অনুকৃতি তো নিউজ-রিপোর্টারদের তোলা ফটোগ্রাফগুলোও এবং সেগুলো সব সময় নিরানন্দও করে না যে দেখে, তাকে। অভিনয় কি তাহলে এই ধরণেরই আর্ট ? 'মিমিক' এবং ভেন্ট্রিলোকুইষ্টদের কাজটাও এমনই এক বাস্তবানুকারী এবং আনন্দদায়ক কারু-কৃতিত্ব। অভিনয়ও কি তা-ই ?

আমাদের দেশের রঙ্গ সমালোচকদের কাছে উত্থাপিত হোক্‌ প্রশ্ন কটি। প্রশ্নকর্তাকে তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্রূপ করে ধমকে উঠবেন। বলবেন, অভিনয়ের থিয়োরী ? কেন, ভালো লাগা। মুগ্ধ হওয়া। যে-অভিনয় দেখে মন আবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠলো, তার চেয়ে বড় অভিনয় আর কি কিছু আছে ? আর এই ভালো লাগার বিচার-শাস্ত্র ? কেন, কমন সেন্স। এই সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে আর্টের বড় বিচারক আর কে মশাই ? ঘটে যদি এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু থাকেই, তাহলে এরই কষ্টিপাথরে আর্টের সমস্ত ভালোমন্দ আসল-নকল ধরা পড়বে। যত সব…

আপাত-পাঠে অবশ্যই মনে হবে যে, অভিনয়ের শিল্প-সত্তা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন কটি উঠেছিল, রঙ্গ-সমালোচকদের

এই জবাব বুঝি তার শেষ জবাব, একেবারে মুখের মতো উত্তর। সত্যিই তো, সাধারণ বুদ্ধিতে ভালো লাগার চেয়ে আর্টের বা অভিনয়ের আর কী সর্ত্ত থাকতে পারে?

কিন্তু আর্টের সচেতন রসাভিজ্ঞ যাঁরা, অর্থাৎ যাঁদের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত সমাজের বুদ্ধিমার্গের তার গোটা সাংস্কৃতিক জীবনটাতে আর্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই পূর্ণাঙ্গ হয় না, আর্টের সেই সচেতন সমঝদারেরা জানেন, এই যে সাধারণ বুদ্ধিতে ভালো লাগার সর্ত্তটা, এটাকে রস কর্ম্মের চরম সর্ত্ত ও সংজ্ঞা বলে মেনে নেওয়ার চাইতে বড় অরাজকতা আর্টের ক্ষেত্রে আর কিছু নেই। কেননা এই সর্ত্তটাকে চরম বলে মেনে নেওয়ার অর্থই যে হলো আর্টের ক্ষেত্র থেকে যাবতীয় নিয়ম-সুসঙ্গতি আর অনুশীলন ও অভিনিবেশের সমস্ত বালাইকে সরাসরি নাকচ করে দেওয়া। সাধারণ বুদ্ধিতো পৃথিবীর কোনো-খানেই সুসমঞ্জস বা সঙ্গতিযুক্ত নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে তার প্রসারে ও গভীরতায় দুস্তর প্রভেদ। এবং প্রত্যেক স্তরের সাধারণ-বুদ্ধিই নিজেদের ভোটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে যেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ বুদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না, আনন্দিত করা তো দূরের কথা। শরৎচন্দ্রকে ফেলে সে-সাধারণবুদ্ধি 'বিলাতী গুপ্তকথা' পড়েই অধিক তৃপ্ত হবে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিকে খুসি করার সর্ত্তটাকে পালন করতে পারলো না বলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আর্ট হয়ে উঠতে পারলো না, একথা ভাবা নিশ্চয়ই পাগলা-গারদের অভ্যন্তরে ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়!

কথাটা, কাজে-কাজেই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মুগ্ধ করাটাই আর্টের শেষ কথা নয়, প্রধানতম কথাও নয়। মুগ্ধ করার সর্ত্তটা হচ্ছে আর্টের শুধু একটা প্রথম প্রতিজ্ঞা। তাও মুগ্ধ করা সাধারণ বুদ্ধিকে নয়, তাকে রসানুভূতির যথোচিত শিক্ষায় অনুশীলিত যে উচ্চাঙ্গ রসবুদ্ধিক, তাকে মুগ্ধ করা। এই প্রথম প্রতিপাদ্য পালন করার পর যদি সেই মুগ্ধ করার উপাদান একটা বিশেষ আর্ট-মাধ্যমের আধার (form) ও উপজীব্যের (content) আর আর সমস্ত সর্ত্তগুলো পূর্ণ সঙ্গতিতে পালন করে উঠতে পারল তবেই তা হলো যথার্থ আর্ট পদবাচ্য, নইলে নয়। এস্থেটিক্‌স্ বা রসশাস্ত্র হচ্ছে আর্টের সেই অবশ্য-পালনীয় সর্ত্তাবলী আর তাদের পূরণ করার যাবতীয় অনুশাসনের সংহিতা

অভিনয়ই মানুষের সর্ব্বপ্রথম আর্ট, তার আদ্য রূপ-প্রয়াস। মানুষের মুখে যখন ভাষা ফোটে নি, আদিম গুহার দেয়ালে দেয়ালে আঁক কাটতে শেখেনি গুহা-মানবেরা, তখনও তাদের মধ্যে অভিনয়ের প্রেরণা এসেছিল। মনের বিভিন্ন আবেগ-দশাকে তারা বহিরাঙ্গিক অভিব্যক্তিতে অপরের মনে সঞ্চারিত করতো। মনের গূঢ়কে অঙ্গের প্রকটতা দিয়ে ব্যক্ত করার সেই যে আদিম-উপায় হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্ত্তিত হয়ে তাই এসে দাঁড়িয়েছে সভ্য মানবের অভিনয়-শিল্পে, যে শিল্পের শাস্ত্রীয় নাম হলো Histreonic. সভ্য মনুষ্যের বয়সও হাজার ছয়েক বছরের। সুতরাং এই প্রাচীনতম শিল্পটার যে একটা থিয়োরী থাকবেই, থাকবেই একটা রসবিজ্ঞান, তা কোনো আজব প্রস্তাবের কথা নয়, তা হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য! যে-দেশেই সচেতনতঃ কোনো নাট্যান্দোলন এবং তার অপরিহার্য্য সঙ্গী সাধারণ রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছে, অভিনয়ের একটা বিধি-সম্মত বিজ্ঞান এবং কলাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে সে দেশেই। শুধু বুঝি এক বাংলা দেশ ছাড়া। অথচ ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, হাজার দেড়-দুই বছর পূর্ব্বে এই ভারতেই একদিন অভিনয়ের এমন এক সূক্ষ্ম কারুবিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল যা দেহ-প্রতীকাভিনয়ে (Pantominu) আজও সমগ্র সভ্য বিশ্বের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। 'ভরতনাট্য' আর নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ'—ভারতের সেই প্রাচীন অভিনয়-শাস্ত্রের দু'টি প্রদীপ্ত নিদর্শন।

কিন্তু প্রাচীন গৌরবের দোহাই-পাড়াটা নিরর্থক। আমাদের বর্ত্তমান নাট্যকলা, রঙ্গালয় এবং অভিনয় ধারার কোনোটাই তো প্রাচীনের অনুবর্ত্তনবাহী নয়। ইংরেজী সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় আর তার প্রভাবে যে মিশ্র আধুনিক সংস্কৃতি উনিশ শতক থেকে বাঙালীর সমাজ-জীবনকে রূপায়িত করেছে, সংস্কৃতিবান জনগোষ্ঠী ব'লে একচ্ছত্র আসন দিয়েছে আধুনিক ভারতবর্ষে বাংলার

আধুনিক নাটক-রঙ্গালয় আর অভিনয়ের ধারাও সেই আধুনিক সংস্কৃতিরই উৎস-সম্ভূত। কিন্তু দেড়'শ বছর পার হয়ে গেল সেই আধুনিক সংস্কৃতির। নাটক-রঙ্গালয়ের বয়সও প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ হলো। একশো বছর কোনো আর্টেরই পক্ষে নাবালকের বয়স নয়। অথচ আমাদের অভিনয় শিল্প আজও অ-প্রাপ্ত বয়স্ক। আজও আমাদের দেশে গড়ে উঠতে পারলো না অভিনয়ের একটা সর্ব্বগ্রাহ্য শৃঙ্খলা-সমন্বিত শিল্প-সংস্কৃতি, একটা বৈজ্ঞানিক রসশাস্ত্র, একটা এসথেটিক্স্।

কিন্তু কেন?

তার একমাত্র কারণ, কাব্য, সাহিত্য এবং শিল্পকলার মতো অভিজ্ঞ রসিকের দরদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে আমরা কেউ এপর্য্যন্ত কোনোদিন অভিনয়ের ওপরে কোনোরকম সিরিয়স্ শিল্প-গুরুত্ব আরোপ করিনি। আমরা ভেবেই কখনও দেখিনি যে শিল্পকর্ম্মরূপে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় সম্বন্ধে কত বিচিত্র ও বিপুল সংখ্যক প্রশ্ন আর সমস্যা এসে আমাদের সামনে তর্জ্জনি তুলে দাঁড়ালো। সকলের গোড়াকার প্রশ্নটা আগেই বিবৃত হয়েছে। অভিনয় যদি আর্টই, তবে তা কোন্ স্বরূপের আর্ট—creative, না ornamental, না interpretative. অথবা অভিনয় এ তিনেরই সমন্বিত প্রকাশ?

যদি বা কোনোক্রমে এর উত্তর মিললো, সঙ্গে সঙ্গেই দম ফেলতে না ফেলতে হুড়মুড় করে আসবে অন্যান্য প্রশ্নরা:

আর্টই যদি, তবে কোন্ জিনিষটা সে আর্টের মিডিয়ম? অর্থাৎ কোন্ বস্তুকে ভর করে অভিনয় অভিব্যক্ত হবে? কাব্যে তো হলো ভাষা, তার ধ্বনি, তার অর্থ। চিত্রে রঙ তুলি আর ক্যানভাস্। কিন্তু অভিনয়ে?

তারপর,—কোনটা অভিনয়ের ফর্ম, কোনটা তার কনটেন্ট? কল্পনা (imagination), আবেগ (emotion) এবং বুদ্ধি (intellect)—এই ত্রয়ী চিত্তবৃত্তির ত্রিবেণী ব্যতীত আর্ট-এর অর্থ শব সাধনা। কিন্তু এ তিনের সঙ্গে কোথায় কতখানি সম্পর্ক অভিনয়ের? Rhythm বা ছন্দ তো অভিব্যক্তির আত্মা। অভিনয়ের বেলা ছন্দের অর্থটা কী? অভিনয়ের সঙ্গে অভিনেতার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক কতটুকু? তিনি কি অভিনেয় চরিত্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে অবলুপ্ত করে দেবেন? না, ভূমিকা-চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দ্বৈত-সঙ্গীতের মতো নিজের ব্যক্তিত্বকেও ধ্বনিত করে তুলবেন? অভিনেতার ব্যক্তিত্ব কথাটাকে অনেকেই হয়তো আমলেই আনবেন না। কিন্তু তাকে যদি অস্বীকারই করা যায় তাহলে অভিনয়ের 'ওরিজিন্যালিটি' ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে কেন একই চরিত্রের অভিনয়ে পৃথক ব্যক্তিত্বের দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার দু'রকম রূপায়ণ?

আর্ট হিসেবে তবুও কি প্রশ্নের শেষ আছে অভিনয়ের প্রসঙ্গে? এরপর আসবে অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদানের সমস্যা।—অবশ্য আর্ট-মাধ্যমের সঙ্গে অভিনয়ের কতখানি সম্পর্ক সেই ঠেক বিচার। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কি অভিনয়ের লেন-দেন আছে কিছু? তাছাড়া অভিনয় নিজেই হচ্ছে একটা গোষ্ঠিগত আর্ট। এবং শুধু অভিনেতারা মিলেও সে গোষ্ঠী নয়। নাট্যকার, পরিচালক, দৃশ্যশিল্পী ও আলোকশিল্পী—সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনেতাকে রস সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু কী জিনিষ অভিনয়ের এই গোষ্ঠীবদ্ধতা? কি উপায়ে, কেমন করে এই যুক্ত প্রয়াসের সার্থকতম প্রয়োগ সম্পাদিত হবে? আর যুগে যুগে এই প্রয়োগ-ধারারই বা পরিবর্ত্তন কেন আসে? সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হলো, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকদের যে পারস্পরিক অন্তর-সম্বন্ধ, তার।

এমনি সব অজ্ঞাত বিষয়ের অন্তহীন প্রশ্ন। এত সবের ওপরেও আবার আছে অভিনয় সম্পর্কে আজকের দিনের জটিলতম প্রসঙ্গটা। মঞ্চাভিনয় এবং চিত্রাভিনয়ের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যটা কী?

অভিনয়ের শিল্প-স্বরূপ সম্বন্ধে যেদিন এই প্রশ্নগুলো আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, আমাদের দর্শক ও সমালোচক গোষ্ঠির, এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের সচেতন চিন্তাকে অধিকার করবে,—তারপর সেই চিন্তা সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে পূর্ব্বোক্ত সকল

প্রশ্নের সর্ব্বসম্মত উত্তরকে আবিষ্কার করবে,—সেইদিন একমাত্র সেই অনাগত শুভ দিবসেই আমাদের সমাজে অভিনয়ের এস্থেটিক্‌স্ আবির্ভূত হবে। সত্যকার আর্ট বলেও অভিনয় আমাদের সংস্কৃতি জীবনে অভিষিক্ত হবে শুধু সেইদিন। তা নইলে শত সমাদর, হাজার মূল্য নিয়েও আমরা অভিনেতারা কোনোদিনই শিল্পী জীবনের সমাজ শুভঙ্কর সার্থকতা পাবো না। সমাজের চোখে আমাদের মর্য্যাদা হয়ে থাকবে শুধুই একদল নিপুণ অ্যাক্রোব্যাটদের মতো। এবং তা নইলে আমাদের পঙ্গু নাট্য-সাহিত্য, মৃতকল্প ফিল্ম্-শিল্পও খণ্ড হবে না কোনো-দিন, তাতে মহৎ শিল্পোচিত পরিণতিও কোনোদিন আসবে না। শত নাট্যীয় ফিল্মের শত টেক্‌নিকাল উৎকর্ষের অধিকারী হলেও না।

কারণ, ছবি আঁকার উপায়টাই যদি না পাওয়া গেল, না পেলুম আমরা ছবি আঁকার সাবয়ব উপাদান এবং ছবি যে আঁকবে সেই দরদী মানুষটাকে—তাহলে রঙ তুলি আর ইজেল্ ক্যানভাসের হাজারো উন্নতির বালাই নিয়ে কি আমরা ধুয়ে ধুয়ে জল খাবো শুধু? কিন্তু সেই অনাগত সুদিন আসবে কবে?

চিরন্তনী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নহি আধুনিক, নহি পুরাতন; আমি—আমি শুধু কবি,
মুগ্ধ নয়নে দেখি যাহা কিছু—এঁকে যাই তার ছবি।
আমার এ ভাষা, আমার ছন্দ,
এই রসাবেশ, সান্দ্রানন্দ—
স্তবগীতিসম উঠে উচ্ছ্বসি' অন্তর হ'তে সবি!

লিখিবার তরে লিখিনাকো আমি,—না লিখে পারিনা হায়,
হৃদয়ের কথা কুম্ভের মুখে কলবিম্বের প্রায়—
ফোটে আর টুটে যেন ক্ষণে ক্ষণে
দিবস-নিশীথে শয়নে স্বপনে,—
গেঁথে রাখি সেই পলাতকে আমি সঙ্গীত-মালিকায়!

আমারে বিচার করিও দরদী, আমি যাহা তাই দিয়া,
চাঁপার সুবাস চেয়োনাকো তুমি চামেলীর বনে গিয়া!
বলিবার মোর আছে কিছু কথা—
প্রকাশের লাগি' তাই আকুলতা,
বলিতে পারিলে সেই কথাটুকু—জুড়ায় আকুল হিয়া।

সেই পুরাতন মানুষের মন, পুরাতন সংসার,
শাশ্বত সেই দুঃখ ও সুখ, হাস্য ও হাহাকার—
আমার আবেগে তারে রঞ্জিয়া
কবিতার রূপে তুলি ফুটাইয়া,—
হোক্ সে নূতন—হোক্ পুরাতন, ধারিনা কো তার ধার!

বাংলা নাট্যমঞ্চের দুঃখের পাঁচালী

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

আমার মতে বাংলার নাট্যমঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা গিরিশচন্দ্র ঘোষ—তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রংগমঞ্চকে ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার ভিত্তি করেন ; যেহেতু সেকালে যে সব ধনী ব্যক্তি থিয়েটার খুলেছিলেন, তাদের অধিকাংশই রংগমঞ্চকে একটি "আর্ট" হিসেবে জানতেন না, তাঁদের নজর ছিল সুন্দরী নটীর দিকে—তার মনস্তুষ্টি করার জন্য রংগমঞ্চের জন্য অর্থ দিতেন অকাতরে– কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী ছিল। দাতার সখ মিটে গেলে সেই মঞ্চের বাতি যেত নিভে। দূরদর্শী গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন 'কাপ্তেন' ধরে এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, একে commercial Art পর্য্যায়ে ফেলতে পারলে রংগমঞ্চ স্থায়ী হবে, তখন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব হবে না। তাই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে সখের থিয়েটারকে Permanent Stage বা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে পরিণত করলেন। তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাশে এসে ভিড়ল বাংলার সেকালের তরুণ সম্প্রদায়। গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন নটরাজের একনিষ্ঠ সাধক, নাট্যকার ও শিল্পী। তাঁরই স্বরচিত কয়েকখানি নাটকের অভিনয় দেখে, গিরিশচন্দ্রের সুললিত আবৃত্তি শুনে বঙ্গবাসী হল মুগ্ধ। বাংলা দেশে থিয়েটার দেখবার লোক খুঁজে আনতে হত—নটনটীরা ছিল অপাংক্তেয়, ক্রমশঃ ক্রমশঃ থিয়েটারের প্রেক্ষা-গৃহে জনসাধারনের ভিড জমতে সুরু হল। বাংলার রঙ্গমঞ্চ হল স্থায়ী—কাপ্তেন অধিকারীর আসন নিল ব্যবসায়ী ধনী। গিরিশচন্দ্রের সাধনা সিদ্ধ হল। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অসীম রচনাশক্তি ও শিক্ষাদানের ক্ষমতায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে দৃষ্ট হল কৃতি নট ও নটী। তখনকার দিনের কৃতি আর্টিষ্টদের মধ্যে অমৃত-লাল মিত্র, মহেন্দ্র বসু, চুনীলাল দেব, উপেন্দ্র মিত্র, অতুলচন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, প্রমদা, জগত্তারিণী, তিনকড়ি ও তারা-সুন্দরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বীয় পুত্র সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানীবাবু)-এর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করতেন। আবার সেই সময়ে আরো বহু বিখ্যাত নট শিল্পী বাংলার নাট্যমঞ্চ অলঙ্কৃত করেছিলেন ; তন্মধ্যে অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গেল বাংলারঙ্গমঞ্চের আদি পর্ব্ব, তারপর যে সব শিল্পী নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধশালী করলেন তাদের নাম হল রসরাজ অমৃতলাল বসু,—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রনাথ মিত্র ও দানীবাবু। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় নৈপুণ্য ও নাট্য প্রতিভা প্রতিভাত হয়েছিল তার একমাত্র পুত্র দানীবাবুর উপর। পিতা ও পুত্র উভয়েই ছিলেন সাধক—তাঁদের একনিষ্ঠতা, মনের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার গুণেই বাংলার রঙ্গমঞ্চ দ্রুত উন্নতি লাভ করল। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায়-ব্যক্তি তাই আসতেন তাঁদের অভিনয় দেখতে রঙ্গমঞ্চে।

রঙ্গমঞ্চের সফলতা সম্পূর্ণ-ই নির্ভর করে ভাল নাটক ও অভিনয়ের উপর। গিরিশচন্দ্র, রসরাজ অমৃতলাল, বিহারীলাল প্রমুখ নাট্যকারের নাটক ও পূর্ব্ব উল্লিখিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশে রঙ্গমঞ্চ যে রস সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা নাই। কালস্রোতে প্রগতির যুগে গিরিশচন্দ্র ও রসরাজ অমৃতলাল প্রভৃতির নাটকের অভিনয় বন্ধ হল, তারপর জনপ্রিয় নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কয়েকখানি নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজীরাও ও

সুরেন্দ্রবাবুর যোগল পাঠান জনপ্রিয় নাটক রূপে জমেছিল। প্রগতির যুগে এক নবীন সম্প্রদায় "আর্ট থিয়েটার্স" আখ্যায় খুললেন এক থিয়েটার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নূতন আর্টিষ্ট'দের নিয়ে। তাদের প্রথম নাটক অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন" বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক নবীন আলোকপাত করল—যাকে বলে Revolution-এর সৃষ্টি করল বাংলা নাট্যমঞ্চে। দর্শকমণ্ডলী সমর্থন করল এই নব ভাব, কল্পনা ও রস। প্রাচীনপন্থীরা পড়ে গেল পশ্চাতে। অজানা অচেনা নবীন শিল্পিগণ ভয়ে ভয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'ষ্টারে'র প্রেক্ষাগৃহে, তাদের একাগ্রতা ও সাধনা হল স্বার্থক। সেই সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম আমাকে লিখবার আবশ্যক হবে না এই প্রবন্ধে—শুধু দু'টি নটসূর্য্যের নাম করব শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র। সেই সময়ে অপরদিকে এক প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় বাংলা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে। এই উভয় সম্প্রদায়ের অভিনব অভিনয়, রূপসজ্জা ও মঞ্চের নব সজ্জা সেই যুগে যে রসসৃষ্টি করেছিল তা বাঙ্গালীর পক্ষে অতি গৌরবের বস্তু—সেই স্মৃতি আজও আমাদের প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার করে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, নাটক নির্ভর করে নাট্যকারের বইর উপর আর "আর্টিষ্ট"এর প্রতিভা ও নিষ্ঠার উপর। নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ও শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁদের কয়েকখানি নাটকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের অসীম আনন্দ দান করেছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙলার দুর্ভাগ্য যে, আজ তাঁদের লেখনী পূর্ব্বের ন্যায় রস সৃষ্টি করতে পারছে না।

বাংলার আজ সত্যিই দুর্দ্দিন। যে বাংলা ভারতকে সর্ব্বতোভাবে নেতৃত্ব করত, আজ সেই সোনার বাংলা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্ব্বপ্রকার কৃষ্টির দিক থেকে আছে পশ্চাৎ ভাগে—সকলের নিকট অবহেলিত—"অঙ্গহানি"ই তার কারণ একথা বললেও ঠিক হবে না। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এক বাঙ্গালী মহাপুরুষ বাংলার তথা ভারতের মঙ্গলার্থে ধ্যানমগ্ন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র উপকূলে—তিনি পতিত বাংলাকে উদ্ধার করবেন, কিন্তু সেই মহাযোগীও মহাপ্রয়াণ করেছেন। বাংলা আজ সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত।

একে একে বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য "আর্ট থিয়েটার", "নাট্যভারতী", "মনোমোহন থিয়েটার", "নাট্যনিকেতন", "নাট্যমন্দির", "মিত্র থিয়েটার", "রূপমহল", "মিনার্ভা থিয়েটার" (উপেন্দ্রনাথ মিত্র পরিচালিত) রঙ্গালয়ে রস বিতরণ করে যবনিকার অন্তরালে অন্তর্ধান হল। তাদের এই উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে দর্শকের অভাব ব সাধারণের সহানুভূতির অভাবে তাদের পতন হয়নি। দর্শকগণ পয়সা খরচ করেন কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য—সুষ্ঠু শিক্ষাপূর্ণ ভাল অভিনয় দেখবার জন্য। যখন তারা দেখলেন একই বইর বহুবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—নূতন ভাল নাটকের দুর্ভিক্ষ ঘটেছে বাংলার রঙ্গমঞ্চে, তারা কেন গাঁটের পয়সা খরচ করবেন সেই পুরাতন নাটক দেখতে? রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সেরা বইগুলির সমুদ্র মন্থন করে সাধারণকে অমৃত রস পরিবেশন করলেন; কিন্তু সেই রস বার বার নিংড়ালে কি আর কলিকালে অমৃত ওঠে! জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে গেল—তারা প্রতীক্ষায় রইল নূতনের সন্ধানে! দর্শকগণ কিছুদিন পরে এক নবীন রস উপভোগ করলেন "শ্রীরঙ্গমে" ভাদুড়ীমশাইদের "বিপ্রদাস," "বিন্দুর ছেলে" ও শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালিত রংমহলে "ভোলামাষ্টার" দেখে—কিন্তু তারপর জল-বুদ্বুদের ন্যায় কত নূতন নাটক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে নবসজ্জায় উদ্বোধন হল, আবার অকালে বিলীন হল যবনিকার অন্তরালে প্রাচীরপত্রে দেখা দিল আবার সেই পুরাতনের নব কলেবর—নির্ম্মলেন্দু "সিরাজ" নরেশ ভাদুড়ী "আলমগীর"—কুসুমকুমারী—"উদিপুরী" আর ঘন ঘন সম্মিলিত অভিনয় "মিশর কুমারী", "প্রতাপাদিত্য"—"সাজাহান", "আলমগীর"। হয়ে গেল নূতন-বই-এর দফারফা। যা কিছু উপার্জ্জন হত এই সব "কম্বিনেশন" অভিনয়ে, সব হোমরা-চোমড়া-অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ তা নিয়ে যেতেন আর অধিকারী পাওনাদারের ভয়ে সকাল সন্ধ্যা বাড়ী পালাতেন—কি সুন্দর অভিনয়! আভিজাত্য থিয়েটারের এই দুরবস্থা—নামজাদা অভি-

নেতা অভিনেত্রীর কয়ভারে। একেই বলে "আর্টস্ ফর আর্টস্ সেক"। পূর্ব্বদিকে ভাদুড়ী মশাই চালাচ্ছেন নিজের গুণে ভ্রাতাদের সহযোগিতায়। পশ্চিম দিকে নাভিশ্বাস—আর মাঝখানটাতে চাটুয্যে কাৎ!—দক্ষিণে হাঁসপাঁস!

একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি "ষ্টার থিয়েটারে"র অধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র মহাশয়। পিতা ও খুল্লতাতের নিকট শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তিনি হয়েছেন পাকা জহুরী। সেখানে আভিজাত্যের বালাই নেই—দৈনিক ৫০৲, ১০০৲ বা ২০০৲ টাকার মজুরীর 'আর্টিষ্ট' নাই—সবল সাধারণ শ্রেণীর শিল্পী—কার্য্যে তাদের অসীম আগ্রহ ও নিষ্ঠা। সেখানকার বুকিং অফিসে লোকের ভীড়—প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ। অধিকারী ম'শায় মা লক্ষীর বরপুত্র—তিনিও বাড়ী ফেরেন তাড়াতাড়ি—পাওনাদারের ভয়ে নয়—রাহাজানির ভয়ে!

আমার অনেক বন্ধুকে আমার প্রবন্ধের এই অবধি পড়িয়ে শোনালে তিনি বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখছিলাম তা খাপছাড়া হয়ে গেছে। আক্রমণটা নাট্যকারদের স্কন্ধ থেকে চাপল গিয়ে বড় 'আর্টিষ্ট'দের উপর। আমি বললাম, মোটেই নয়—এ যে একবৃন্তে দু'টি ফুল!

আমার মতে "Both are guilty." আপনারা নাট্যকার বন্ধুগণ in the air-এ—স্বপ্নে, অতি আশায় বেশী যাতায়াত না করে—বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বজায় রেখে বর্ত্তমান প্রগতির যুগোপযোগী নূতন নাটক লিখুন যার পটভূমিকায় রূপায়িত হবে বাঙ্গালীর নবীন ভাবধারা—যার নবালোকে ছন্নছাড়া, পরশ্রীকাতর, ভিটে ছাড়া বাঙ্গালী খুঁজে পাবে তার পথের সন্ধান—আবার তারা মানুষ হয়ে আধিপত্য করবে স্বাধীন ভারতের জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে। আর হে বহুরূপী রসস্রষ্টা শিল্পীবৃন্দ, আপনারা অভিনয় করুন সেই নবীন নাটক এমনি সুদক্ষ ভাবে যাতে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিভোর থাকবে সেই রসপানে—সেই রসধারা সঞ্জীবিত করবে বাঙ্গালীর মনপ্রাণ নবীন ভাবধারায়! আর স্মরণ রাখবেন মঞ্চ আপনার পীঠস্থান—এই স্থানের অধিকারীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—শিল্পকে রক্ষা করা আপনার একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বাংলা সবাক-চিত্রে ধর্ম্মমূলক নাটক

নানারকম 'ism'-এর আবির্ভাবে মানুষের মন হইতে আজ ধর্ম্মভাব অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু এই ism সমূহ যে ভারতীয় ধর্ম্মের আসল প্রাণবস্তু নয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। শিল্প, কলা, সাহিত্যের মতো বাংলা ছায়াচিত্র সম্পর্কেও এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুখের বিষয়, এই ism-প্লাবিত যুগে বাংলা সবাকচিত্রে 'ভক্ত রঘুনাথের' ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মমূলক নাটক অভিনয়ের পরিচালনা করিয়া নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত আমাদিগকে অনেকখানি আশ্বস্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মবিভ্রান্ত জনসাধারণের সম্মুখে এই জাতীয় চিত্রাভিনয় পরিবেশনের আজ বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। দেবনারায়ণ বাবু সেই প্রয়োজন অনেকখানি মিটাইয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রাংশে অভিনেতা অভিনেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকার মর্য্যাদা রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রঘুনাথের জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ সিংহের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন তাঁহাকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী আখ্যায় ভূষিত করেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকায় অভিনয় করেন তারা ভট্টাচার্য্য। 'ভক্ত রঘুনাথে'র জন্ত আমরা নাট্যকার-পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সম্পাদকীয়

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশ স্মৃতিবার্ষিকী

বিগত ১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে দ্বিসহস্রাধিক লোকসমাগমে তাঁহার ত্রয়োদশ স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন ঐতিহাসিক রসস্রষ্টা ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া শরৎচন্দ্রের অমর প্রতিভা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অপরাজেয় কথাশিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বাণী পাঠান শ্রীঅতুল্য ঘোষ, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

সভাপতি ডাঃ দাশগুপ্ত শরৎসাহিত্যের সবচাইতে বড় প্রয়োজনীয় দিকটি অর্থাৎ পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে মর্ম্মস্পর্শী আলোচনা করিয়া বলেন: আজ তাঁহার গ্রাম উন্নয়নরূপ জাতীয় উপদেশই আমাকে যেন ইশারা করিয়া আপনাদিগকে প্রবোধিত করিয়া বলাইতেছে—আ প না রা পল্লীর উন্নয়ন করুন, এখানকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করুন, পুষ্করিণীর সংস্কার করুন, জঙ্গল পরিষ্কার করুন, কলিকাতার মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া গ্রামের সুখ-দুঃখে জড়িত হইতে সকলকে আহ্বান করুন; যদি বাস্তুহারাদের আশ্রয় দিয়া শিল্পদ্রব্যাদি এবং চাষের উন্নতি করাইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করুন,—আপনাদের সমবেত চেষ্টায় যদি ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুর, মুন্সিবাবুদের দেবানন্দপুর, দেবের আরাধ্য দেবানন্দপুর আদর্শ পল্লীতে পরিনত হয়, তবেই শরৎচন্দ্রের আত্মা তৃপ্ত হইবে।' (নিম্নে অভিভাষণটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল)।

শরৎচন্দ্র

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন: 'শরৎচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র জনগণের জীবনশিল্পী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঠিক দুই বৎসর পর ১৯০৭ সালে যেদিন শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সেদিন বঙ্গসাহিত্যের মোড় ফিরিল। শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টি—তাহা শুধু পল্লীর সমাজ-জীবনের দুই ফোঁটা চোখের জল নয়, ইহার মধ্যে আছে আধুনিক যুগের দাবীর কথা। তাঁহার সাহিত্যে দেশের অন্তরের মর্ম্মান্তিক হাহাকার শুধুই নয়, তাহার সমস্যার সমাধানও রহিয়াছে। শুধু প্রশ্ন আছে, উত্তর নাই—এমন নয়; প্রশ্নের উত্তরও তিনি তাঁহার সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা অন্যায় ও অসত্য তাহার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার জন্যই শরৎচন্দ্র অমর। তাঁহার মধ্য দিয়া আমাদেরই কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি আমাদেরই লোক। তাঁহার সাহিত্যে জীবনবোধ ও সমাজচেতনা-বোধ অঙ্কুরিত হইয়াছে। তিনি শুধু যুগশিল্পী নন্, যুগাতিক্রমীও বটেন।'

এতদ্ব্যতীত বহু সাহিত্যিক,

কবি ও ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এই মরমী শিল্পীর অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

কথাশিল্পী শ্রীরণজিৎকুমার সেন বলেন: 'রবীন্দ্রযুগে আমরা দুইজন বিদ্রোহী শিল্পীর সাক্ষাৎ লাভ করি; একজন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, আর একজন কবি নজরুল। দুইজনেই সত্যদ্রষ্টা জীবনশিল্পী। বাংলার অসহায়া নারী ও বিধবার যে অশ্রু একদিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সার্থক কর্ম্মী রূপে সমাজের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে নির্য্যাতিতা বাংলার সেই শোকাপ্লুত অশ্রুই শরচন্দ্রের লেখনীকে দিল জীবনসৃষ্টির উন্মাদনা। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তিনি আনিলেন বিদ্রোহের সুর। তদানীন্তনকালীন রক্ষণশীল সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ বা সহ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী যৌবন তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার সমাজ-জীবনে যে ভাঙন সুরু হয়, তাহারই সুর বিশেষভাবে অনুরণিত হইয়া উঠিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। সমাজের আভিজাত্যের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিলেন। সমাজের মিথ্যা আভিজাত্যের অহং ভাঙিয়া গুড়া গুড়া হইয়া গেল। যাহারা ছিল চির উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণ্য পতিত—অনাদৃত, সেই মাটির মানুষেরাই শরৎ-সাহিত্যের প্রধান নায়ক নায়িকা। এই দিক হইতে তিনি টলষ্টয় ও ডষ্টয়েভস্কির সমগোত্র ছিলেন।'

'হুগলী জেলার ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র তাঁহার অমর প্রতিভার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া শরৎচন্দ্রের স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান। কথাকার শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রী বি, এম, সিংঘীও শরৎসাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহোদয় সমভিব্যাহারে সাহিত্যিকবৃন্দ দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের অমর স্মৃতি বিজড়িত বাসভূমি দর্শন করেন। 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানা, 'মেজদিদি'তে বর্ণিত বিশালাক্ষীর মন্দির, 'দত্তা'য় বর্ণিত জোড়া বটতলা, সরস্বতী নদীর ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি স্থান দেখিতে গিয়া তাঁহারা গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হন এবং ক্ষণকাল নীরবে ঐগুলির দিকে তাকাইয়া দরদী জীবন-শিল্পীর উদ্দেশে তাঁহাদের অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন: 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা দুর্ব্বল, যারা উৎপীড়িত', তাহাদের জন্যই দরদী কথাশিল্পী তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

শরৎ-স্মৃতি সমিতির কর্ম্মসচিব শ্রীবিজেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন: 'শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণার মূলে ছিল একটা মানবপ্রীতি ও মমত্ব বোধ। তাই তিনি ছিলেন জনগণের সাহিত্যিক।' অতঃপর শরৎ-স্মৃতি সাহায্যভাণ্ডারে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়া শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, শরৎস্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে শরৎচন্দ্র-পল্লীপাঠাগার, শরৎচন্দ্র-স্মৃতি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, নিরক্ষর শিক্ষাকেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র—এই কয়টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে। স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে আনুমানিক ৪০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। এই পর্য্যন্ত মাত্র ১৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থাভাবে আরব্ধ ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত না করিতে পারিলে সকলেরই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

বিষয়টি আমরা দেশবাসীকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

প্রসঙ্গতঃ পরিতাপের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, জনৈক সাহিত্য-ব্যবসায়ী ইতিপূর্ব্বে দেবানন্দপুরে গিয়া পল্লীর নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন, এবং পল্লীগ্রামে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নৈরাশ্য প্রচার করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি বাংলার তীর্থক্ষেত্র। পল্লীপ্রাণতায় শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল পূর্ণ; পল্লীর কোথায় দুঃখ, কোথায় হাহাকার, কোথায় তাহার নিরাময়ের পথ নিহিত—শরৎচন্দ্রের সারাজীবনের সাহিত্যে তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পল্লীর বুকে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করিয়া উক্ত সাহিত্য-ব্যবসায়ী যতই আস্ফালন করিয়া আসুন না কেন, শরৎ-মুগ্ধ বাঙালী তাহাতে

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দের আলোকচিত্র]
বাম হইতে : (১)...(২) শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীপ্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, (৪) শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, (৫) শ্রীরণজিৎকুমার সেন, (৬) শ্রীশিবদাস চট্টোপাধ্যায়, (৭) শ্রীবিমল মিত্র, (৮) শ্রীসাগরময় ঘোষ, (৯) শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, (১০) সভাপতি ডাঃ দাশগুপ্ত, (১১) মায়া দেবী, (১২) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৩) শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, (১৪) শ্রীসমীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (১৫) শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী।

ভুলিবার নয়। বরং পরোক্ষে বাঙালীমাত্রের নিকটই তাঁহার ঐরূপ উন্নাসিকতার জন্য সাহিত্যব্যবসায়ী মহোদয় নিন্দার ও উপেক্ষারই পাত্র হইবেন।

ডাঃ দাশগুপ্তের মূল অভিভাষণ

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অন্য কোন ব্যক্তি যে উপন্যাস লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদী শরৎচন্দ্র তাহা বাস্তবতায় পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তো কথাই নাই, বাঙ্গলার শরৎচন্দ্রও জাগতিক ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের উপন্যাসের এই পরিপুষ্টি বড়ই বিস্ময়কর। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে মুখ্যতঃ বাঙ্গলা উপন্যাসের উৎপত্তি। আলালের সহজ ভাষা বঙ্কিমেরও অভিনন্দন লাভ করে, কিন্তু তিনি নিজে উহার গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করিয়া, উর্দ্দু ফারসী শব্দ বর্জ্জন করিয়া, ভাষাকে আরও মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে যে উন্নতির শিখরে আরূঢ় করিয়াছেন, তাহাই শরৎচন্দ্রকে আরও অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে সরল ও সহজবোধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়া 'ইন্দিরা'য় যে ছবি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই শরৎচন্দ্রের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। বঙ্কিম বলিতেন, 'দেশবাসীকে সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সকলের বোধ-গম্য ভাষাই তোমার আশ্রয় হউক'। এই প্রাণস্পর্শী সরল ভাষাই শরৎচন্দ্রের লেখনীতে সৃষ্ট হইয়া যাবতীয় পাঠকের বুঝিবার সুবিধা করিয়াছে; তাহাকে মুগ্ধ

করিয়াছে এবং তাহার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। এই সরল ভাবা সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্র অমরত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছেন এবং বরাবর তাঁহার গল্প ও উপন্যাস সেই অমরত্বের দাবী করিবে। সর্ব্বাগ্রে এই সৃষ্টির জন্যই আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন প্রদান করিতেছি।

শরৎচন্দ্র নানা দিক পরিস্ফুট করিয়া অনেক পুরুষ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—নীলাম্বর, উপেন, সুরেন, বিপ্রদাস, মহিম, সুরেশ, রমেশ, শ্রীকান্ত, গোকুল, গিরিশ, কাশীনাথ, জীবানন্দ প্রভৃতি, আবার স্ত্রী চরিত্রও সৃষ্টি করিয়াছেন প্রচুর—কিরণময়ী, রমা, বিজয়া, অচলা, মৃণাল, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, কমলা, অলকা, মাধবী, বন্দনা, অভয়া, ঊষা, রমা, প্রভৃতি। সব চরিত্রই অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যমূলক। এসব চরিত্র সবই মৌলিক কি না—যেমন বিশ্বেশ্বরী এবং রমেশে গিরিশচন্দ্রের গৃহলক্ষ্মীর বিরজা এবং মন্মথের কোনরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয় কি না, সব চরিত্রই—যেমন কিরণময়ী, অচলা প্রভৃতি সমাজের মঙ্গলদায়িনী কি না,চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে কি বিশেষ উদ্দেশ্যাবলম্বনে রচিত, চরিত্রগুলি বস্তুতন্ত্রমূলক কি ভাবতন্ত্রবিশিষ্ট, চরিত্রগুলি যে সমাজ-আলেখ্যে রচিত তাহা বর্ত্তমান সমাজে প্রযোজ্য কি না, ইহাদের মূলে বিদেশী উপন্যাসের সারবস্তু কিছু রহিয়াছে কিনা—ইত্যাদি বহু প্রকারের পরস্পর-বিরোধী আলোচনা সম্ভব। এরূপ আলোচনা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্বন্ধে বরাবর চলিয়াছে ও চলিতেছে। এই আলোচনা বা তৎসম্পর্কিত কোনরূপ তর্ক বা বিসম্বাদ এখানে নিষ্প্রয়োজন—কি ভাল কি মন্দ, কি প্রকৃত কি অপ্রকৃত বা অর্থমূলক কি নিরর্থক, তাহার বিচার একমাত্র কালই নিরূপণ করিতে পারে। তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সব চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়, বরাবর তাহা শরৎচন্দ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

আবার কোন কোন চরিত্র এতই সজীব আর বলিষ্ঠ যে, সেগুলির শাশ্বতত্ব কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না—যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন উহাদের স্থায়িত্ব একেবারে অবধারিত। একজন পণ্ডিত মহাশয়, একজন বিশ্বেশ্বরী, একজন সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, গৃহদাহের মৃণাল কিম্বা নববিধানের ঊষা সাহিত্যে দুর্লভ। এই হিসাবেও শরৎ-প্রতিভায় বিস্মিত না হইবার কাহারও উপায় নাই।

তৃতীয়তঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় শরৎ-সাহিত্যের করুণ রসাধিক্য। 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' ও 'বিন্দুর ছেলে'তে যে করুণ রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অন্য সাহিত্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। এই গল্প তিনটি রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রেও রূপান্তরিত হইয়াছে। এমন পাঠক এবং দর্শক আমি খুব কম দেখিয়াছি—যাহার চক্ষু হইতে 'বিন্দুর ছেলে' পড়িয়া বা উহার অভিনয় দেখিয়া দরদর ধারে অশ্রু না বিগলিত হইয়াছে। 'বৈকুণ্ঠের উইল' এবং 'নিষ্কৃতিতে'ও এরূপ করুণরস সমধিকভাবে লক্ষিত হয়, আর কেহ কি কখনও দেখিয়াছে—কিরূপ মমতা একটা বুকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে? আমি 'মহেশ' গল্পটির কথা বলিতেছি। কি স্নেহ বা দরদই না করিত গফুর জোলা এই পশুটিকে—যে আট বৎসর বিনা আপত্তিতে তাহাকে খাওয়াইয়াছে। গরীব চাষা গফুর ষাঁড়টিকে চড়াইয়া খাওয়াইতে পারে না, কারণ তাহার অন্ন, চড়িয়া খাওয়ার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারে না, কারণ লোকের ধান এখনও মাড়াই হয় নাই, নিজের খাওয়ার ভাত নাই যে কিছুটা ফ্যানে জলে দিবে, একটা পয়সা নাই বিচালী কিনিয়া দিবে, চাষের ভাগে যা পাইয়াছিল তাও জমিদার বিগত বৎসরের বকেয়া বলিয়া সব ধরিয়া নিয়াছে, চালে খড় নাই যে একটা কুটো পর্য্যন্ত দিবে, ধারও পাওয়া যায় না, গফুরের চিন্তা হইল বুঝিবা মহেশ খাইতে না পাইয়া মারা যায়! তর্করত্নের কাছে কত কাকুতিতে ধার চাহিল—

"তোমার চার চারটে গাদা, কাহন দুই খড় দাও, আমরা বাপ বেটি না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু ও অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

কিন্তু কেহ দিল না, সকলেই মুখ ভেঙচাইয়া পলাইয়া যায়, আর গফুর মহেশকে সম্বোধন করিয়া দুঃখে বলে, "তোকে দিলে না এক মুঠো, তুই আমার ছেলে, তুই আমার আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি না, কিন্তু তুই তো জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি!"

ক্ষুধার্ত্ত গফুর নিজে না খাইয়া নিজের ভাতই দিয়া দিল। কিন্তু পরদিন হঠাৎ মহেশ দড়ি ছিঁড়িয়া জমিদারের বাগানের গাছপালা খাইয়া ফেলিল। গফুরের ডাক হইল কাছারীতে। কত প্রহার তিরস্কার গফুরের উপরে হইল, কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না, কোন শব্দ করিল না, সবই নীরবে সহ্য করিল। এদিকে কোন উপায় নাই, আবার মহেশকে বেচিয়া ফেলিতেও গফুরের প্রাণে সহিল না। মেয়ে অনেক কষ্টে দূর হইতে জল আনিয়াছে, সেই জলই সকলে খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত মহেশের শিঙে লাগিয়া জলপাত্র পড়িয়া যাওয়ায় সে মাটীতে চাটিতে লাগিল। এবার গফুরের রাগ হইল, লাঙলের ফালটা মারিল মহেশের মাথায়, মহেশ গফুরের দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু বুজিল, আর সে চক্ষু মেলিল না। ইহার পরে গফুরও একেবারে অন্তরূপ হইয়া গেল, আর বাড়ীতে মন বসিল না। এতদিন যে মন কলে কাজ করিতে বিতৃষ্ণ ছিল, আজ তাহাকে সেখানে টানিতে লাগিল। গফুর এক ফোঁটা জিনিষ সঙ্গে নিল না, কারণ উহা তাহার মহেশের প্রায়শ্চিত্তে লাগিবে! বাপ ও মেয়ে অন্ধকার নিশীথে একবস্ত্রে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, এগ্রামে আপন কেহ ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই, একবার পিছনে চাহিয়া হু হু করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল :

"আল্লা, আমাকে যত খুশী সাজা দিতে হয় দাও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার একটু জমিও কেউ রাখে নি ; হে আল্লা, যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর যেন কখনো মাফ করোনি।"

এই কাহিনী পাঠ করিয়া কে এমন নির্ম্মম হৃদয় আছে যার প্রাণ না বিগলিত হয়, চক্ষু না আর্দ্র হয়!

আজ গ্রামে গোচারণের মাঠ নাই, অস্পৃশ্যকে জল নিতে দেওয়া হয় না, জমিদারের ঘোর অত্যাচার, এই সব গ্রামের দুঃখের কথাই তো এই ছোট গল্পটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আজ এই গ্রামের কথাই শরৎসাহিত্যে কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই কথাটিই সংক্ষেপে আপনাদের

শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভিটার সম্মুখে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ও কণিষ্ঠ পুত্রসহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়

কাছে বলিব। শরৎচন্দ্রের ন্যায় দরদী রসস্রষ্টা কখনও গ্রামের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। শ্রীকান্তর প্রতি ছত্রে সেই দরদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর সামান্য গ্রামখানিও যে বিদায়ের সময় পর্য্যন্ত শ্রীকান্তের চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিয়াছিল, শ্রীকান্ত-বর্ণিত কয়েকটি ছত্রেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ আমরা দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুরে বসিয়া শরৎচন্দ্রের জন্মভূমির কথাই বলিতে গিয়া সকলকে যেন নিজ নিজ জন্মভূমির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। শ্রীকান্ত তৃতীয় খণ্ডের প্রথম দিকেই শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"রেল ষ্টেশনের উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্য্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গেছেন। আকাবাঁকা গ্রাম্যপথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্দ্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতের বন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম কাঁটালের সারি সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ী যখন অত্যন্ত সাবধানে, অত্যন্ত মন্থর

গমনে চলিতে লাগিল, সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল—এই পথের উপর দিয়া পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল, সেই দিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীগণ তাহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাধি ঘটিল, তখন ধুলারাশির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জ্জন দুর্গম হইয়া যায় নাই। তখনও বোধ করি বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম্ম ছিল, তখনও বোধ হয় দেশের নিরাপদ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই। দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ীর চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'হে আমার পিতৃপিতামহের সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে হাসিকান্নায় ভরা ধুলারাশির পথ, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।' অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, "আজ এই নির্ব্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্ত্তি আমার চোখের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনও ভুলিব না।"

হাঁ, শরৎচন্দ্র তাঁহার গ্রাম, তাঁহার দেশ জীবনে কখনও ভোলেন নাই বলিয়াই আমরা 'পল্লী সমাজের' মত উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাইয়াছি, রমেশের ন্যায় দরদী পল্লীবান্ধবের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, বিশ্বেশ্বরীর মত একজন পল্লীজননী লাভ করিয়াছি। শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, পল্লীর উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উন্নতি! তাই তিনি দরদী কর্ম্মবীর রমেশকে লইয়া আসিলেন দূর বোম্বাই হইতে পল্লীর ভিতরে। দলাদলি, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ গ্রামকে এমন ক্ষত-ব্রণদুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, কাজ করা রমেশের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, প্রতিকার্য্যে সে বাধাও পাইতে লাগিল, এমন কি তাহার সরিকের চক্রান্তে জেলেও সে নিক্ষিপ্ত হইল। এ অবস্থায় গ্রামে থাকা অসম্ভব, তাই রমেশও গ্রাম ছাড়িবে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, "না গ্রাম ছাড়িলে গ্রাম একেবারে উৎসন্নে যাইবে। এই অবস্থায়ও লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সহিয়াই গ্রামের কাজে লাগিতে হইবে।" তাই রমেশ যখন বলিতেছে—

"গ্রাম ছেড়ে যাওয়াই ভাল। এ গাঁয়ের কারও জন্য কিছু কর্ত্তে নেই। এরা এত নীচ যে এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়, এদের ক্ষমা করাও অপরাধ, ভাবে ভয়ে ছেড়ে দিলে"—

শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীর মুখে এই অবস্থায় করণীয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়া বলিতেছেন—

"রমেশ, তোর এখানে থাকাই যে সবচেয়ে দরকার। আর রাগ ক'রে যে জন্মভূমি ছেড়ে যেতে চাচ্ছিস, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য এখানে আছে কে? এরা যে কত দুঃখী কত দুর্ব্বল, তা যদি জানিস্, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনিই লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া ক'রে পাঠিয়েছেন, এদের মধ্যেই থাক্—দেখতে পাবি এই নিভৃত গ্রামগুলির শান্তি স্বচ্ছন্দতা বহু জনাকীর্ণ সহরে নাই। স্বল্পসন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে যায়, একজনের দুঃখে আরেকজন বুক দিয়ে এগিয়ে এসে পড়ে, একজনের সুখে আরেকজন অনাদৃত উৎসব করতে যায়, এই সব হৃদয়ের মধ্যেই রমেশ একান্ত বাঙ্গালীর সত্যকার ঐশ্বর্য্য অক্ষয় হয়ে আছে—"

রমেশ—তাথ জ্যাঠাইমা, এখানে তোমাদের কত জাতিভেদ রয়েছে, এর থেকেই সব মনোমালিন্য হানাহানি, সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ব'লে তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে চায়নি, একথা তুমি জানো না?

জ্যাঠাইমা—জানি বাবা, কিন্তু এর আসল কারণ জাতিভেদ নয়। যা সবচেয়ে বড় কারণ তা এই যে,

যাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলে, একদিন যা এখানে ছিল, তা আজ পল্লীগ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন আচারের কুসংস্কার। আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ—এর কি কোন প্রতিকার নেই জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা—আছে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস্, আছে শুধু সেই পথে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হ'তে পেরেছে, তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আস্ত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে না যেতো, পল্লী-গ্রামের এত দুর্গতি হ'তো না। তুই যখন এসেছিস্, ছেড়ে গেলে জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

রমেশ—জন্মভূমি তো আমার একার নয় জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা—তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাসনে মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিন কিছুই দাবী করেন না। তাই এত লোক থাক্তে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছায়নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই শুন্তে পেয়েছিস্।

রমেশ পল্লী ছাড়িল না, গ্রামেই রহিয়া গেল, এবং ক্রমে ঠেকিয়া শিখিল সেও তাহাদেরই একজন, পৃথক নয়, তাই গ্রামের ভদ্র ইতর ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে তাহাকে বরণ করিয়া লইল। রমা দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার উপরই তাহার সহোদর যতীনের ভার দিয়া গেল—যেন রমেশ সেই ভাইটিকে তাহারই মত স্বার্থত্যাগী করিয়া গড়িয়া তোলে। পূর্ব্বে কেন সাফল্যলাভে বাধা পড়িয়াছিল, এখন কেন সেই বাধা কাটিয়াছে, সে সম্বন্ধেও রমার মুখে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ ক'রতে চেয়েছিলে ব'লেই এত বাধা পেয়েছ। তখন পরের মত তুমি গ্রাম্য সমাজের অতীত ছিলে, এখন হয়েছ তাদেরই একজন। তখন তোমার দেওয়া ছিল বিদেশীর দান, আজ হয়েছে তা আত্মীয়ের স্নেহের উপহার। দুঃখ পেয়ে দুঃখ সয়ে সে তুমি আর নেই। তাই এ আলো আর ম্লান হবে না। এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"

রমেশকে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া গ্রামের উপযোগী হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিত মশাই বৃন্দাবন বৈরাগী একেবারে পরিপূর্ণ মানুষটি। আদর্শ কর্ম্মী নিম্ন শ্রেণীর লোক হইলেও দোকান করিয়া নিজে গোপনে গোপনে মাষ্টার রাখিয়া ইংরাজী শিখিয়াছে,—গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত নিম্ন জাতির ছেলেদিগকে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা দিবে বলিয়া। সে গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছে, গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিধান করিতেছে, গ্রাম্যলোকের কুসংস্কার দূরীভূত করিতেছে। সহরের কেহ কেহ কখনও সাময়িক ভাবে গ্রামের উপকার করিতে আসেন, কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আসেন তাহাতে ব্যর্থকাম হন। কেন বিফল প্রয়াস হন, শরৎচন্দ্রের সেই আদর্শ গ্রাম্য পণ্ডিত বৃন্দাবনের মুখেই তাহা আরোপিত হইয়াছে। পণ্ডিত মশায় সহরে কর্ম্মী কেশবকে বলিতেছেন—

"কেশব, আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল ছাড়া বড় নই, তাই যাদের ছোটলোক বলছ তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেছে, তোমার কাছে যেতে ভরসা করে নি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোট লোক বলে ডাক, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্য্যামী স্বীকার করেন না। তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না। তাই আমাদের অন্তরের দেবতা তোমাদের উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়ার সামিল মনে করেন, তাই মুখ ফিরান।

কেশব—কিন্তু আমরাও তো এই সব লোকের শুভ কামনাই করি—

পণ্ডিত ম'শায়—হাঁ শুভ কামনা কর, আত্মীয়ের মত শুভ কামনা ক'র না, মনিবের মত কর। তাই আমাদের পনেরো আনা লোকই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয় তাতে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপাতে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখ্‌লে চাষাভুষোর ছেলে যে বাবু হ'য়ে যাবে, তখন অশিক্ষিত বাপ দাদাকেও মানবে না। আগে তোমরা আমাদের অর্থাৎ দেশের ছোট লোকদের আত্মীয় হ'তে শেখো, তারপর তাদের মঙ্গল-

কামনা করো, তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। যতদিন তা না করো, ছোট লোক শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় ক'রবে, মান্য ক'রবে, ভক্তিও ক'রবে, কিন্তু ভাই, বিশ্বাস ক'রবে না। তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য ক'রতে পারা চাই। বুদ্ধি বিবেচনায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমাদের নাগাল পাবে কেন?

কেশব—কিন্তু তুমি তো একা, আর এই ছোট্ট পাঠশালাটুকু, জনকতক ছাত্র পড়িয়ে কতটা কি ক'রবে?

বৃন্দা—আমার পাঠশালায় যদি একজন ছাত্রও মানুষের মত হয়, এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। ভাই, নিউটন, ফ্যারাডে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈয়ার হয় না। যদি একটি ছেলেকেও মানুষ ক'রে যেতে পারি—আমার শিক্ষাদান সার্থক হবে।

শরৎচন্দ্র যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, দেশের কর্ম্মিগণ সেই লক্ষ্যানুসরণ করিলেই তাহা সম্ভব হইবে।

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে আজ অনেক কথাই মনে হইতেছে। ১৭ বৎসর তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইয়া তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছি, কংগ্রেসেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বাধীনে সহকর্ম্মী ছিলাম, কিন্তু আজ সে-সব প্রসঙ্গে আপনাদিগকে বিব্রত করিব না, আজ তাঁহার গ্রাম উন্নয়নরূপ জাতীয় উপদেশই আমাকে যেন ইসারা করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছে—

"আজ সারা পল্লীর উন্নয়ন করুন, এখানকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করুন, পুষ্করিণীর সংস্কার করুন, জঙ্গল পরিষ্কার করান, সর্ব্বগ্রাসী অজগড়-সর্প-কলিকাতার মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া গ্রামের সুখ-দুঃখে জড়িত হইতে সকলকে আহ্বান করুন, যদি বাস্তহারাদের আশ্রয় দিয়া শিল্প দ্রব্যাদি এবং চাষের উন্নতি করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করুন—আপনাদের সমবেত চেষ্টায় যদি ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুর, মুন্সীবাবুদের দেবানন্দপুর, দেবের আরাধ্য দেবানন্দপুর আদর্শ পল্লীতে পরিণত হয়, তবেই জন্মভূমির উন্নতিতে শরৎচন্দ্রের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বদেশের ধূলি সত্যই স্বর্ণরেণু হইয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিবে—পল্লীলক্ষ্মীই আমাদের জননী, জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী।

"আপনারা কাজ আরম্ভ করুন। দেবানন্দপুরকে সার্থক করিতে আজ শরৎ-স্মৃতি মন্দিরই প্রথমে দেবমন্দিরে পরিণত হোক। নিশ্চয় জানিবেন, ইহা কেবল শরৎ-চন্দ্রেরই স্মৃতির মন্দির নয়, আপনার পল্লীরও আদর্শ মন্দির, হুগলী জিলার গৌরব নিকেতন—বাঙ্গালীর আদরের ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্থল। আজ আমি আপনা-দিগকে, হুগলীবাসীকে এবং সমগ্র বাঙ্গালীকে গ্রামের উন্নয়নকল্পে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিধ্বজা স্থাপনোদ্দেশ্যেও এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে একান্তভাবে অনুরোধ করি। এই স্মৃতি-মন্দিরের পরিকল্পনা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছে এবং উদ্যোক্তাগণের চেষ্টার ফলে অর্দ্ধ বিঘা জমি সংগৃহীত হয় এবং তাহার উপর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তরও স্থাপিত হইয়াছে। নকসা প্রভৃতি সব তৈয়ার এবং মঞ্জুর হইয়াছে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে, স্মৃতি কমিটি ১২৫০০৲ টাকা ইতিমধ্যে খরচ করিয়াছেন। অর্থ কোষ প্রায় নিঃশেষিত, কিন্তু আরও ২৫ হাজার টাকার দরকার। অ-বাঙ্গালী মহোদয়গণ ১২৫০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যদি আমরা অবশিষ্ট ১২৫০০৲ টাকা উঠাইয়া দিতে পারি, তবেই উক্ত দান পাওয়া সম্ভব হইবে, নতুবা নয়, উচিতও নয়, বাঙ্গালীর অক্ষমতার জন্য বাঙ্গলার কলঙ্কই সপ্রমাণিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী মানুষ, বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে, বাঙ্গালীই স্বরাজ-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া স্বাধীনতা আনিয়াছে। বাঙ্গলার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষ বাঙ্গলার গৌরব। বাঙ্গলার শরৎচন্দ্র বাঙ্গলার দরদী বান্ধব। আজ আমি শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি পল্লীলক্ষ্মী দেবানন্দপুরে শরৎ-স্মৃতি মন্দির পরিপূর্ণ করিবার জন্য আপনাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি। সকলে মিলিয়া এই অবশিষ্ট অর্থ-দানে অর্থভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া আপনার দরদী বান্ধবের স্মৃতিরক্ষা করুন, বাঙ্গলার অপরাজেয় কথাশিল্পীকে তাঁহার জন্মভূমি দেবানন্দপুরেই চিরস্মরণীয় করিয়া জাতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে অগ্রসর হোন, খাঁটি বাঙ্গালীর পরিচয় দিন। বন্দে মাতরম্।"

বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়

সম্প্রতি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন বিভাগ যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই, তাহা শুনিয়া আমরা গভীর বেদনা পাইয়াছি। এই বিদ্যালয়টি খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছিল, কিন্তু নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখানুভব করিতেছি—যেহেতু অন্যান্য বিদ্যালয়েরও এইরূপ দশা হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ দক্ষিণ কলিকাতায় এমন একটি শনিচক্র আছে, যাহাদের কাজই অন্যান্য বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা। এই দলে কয়েকজন উর্দ্ধতন শ্রেণীর শিক্ষকও আছেন—যাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা ও দলবৃদ্ধির জন্য প্রায় বিদ্যালয়েই এইরূপ গোলমালের সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। দক্ষিণ কলিকাতার বেলতলা, তীর্থপতি, চক্রবেড়ে প্রভৃতি বিদ্যালয় এই দলের চক্রান্তে যাদশাগ্রস্ত হইয়াছে। এই দলের প্ররোচনায়ই বাহিরের লোক যে স্কুলের কাজের সময় ছাত্রীদের সঙ্গে মিশিতে যাইত, উহারাই তাহা-দিগকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে শিক্ষা দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কুশিক্ষায়ই আজ একটা প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। উপরোক্ত কয়টি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিদ্যালয়েও ইহারা ছো মারিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে উহাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিদ্যালয় থাকুক কি যাউক, ইহাতে তাহাদের কিছু যায় আসে না, নিজেদের ক্ষমতা বাড়িলেই হইল। কারণ এরূপভাবে পশার বাড়াইয়াই ইহাদিগকে শিক্ষা-বোর্ডে যাইতে হইবে। সময় আসিয়াছে, দক্ষিণ কলিকাতার প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এই সব লোকের প্রভাব হইতে যাবতীয় বিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দোষ নাই; আর স্কুলটি উঠিয়া গেলে এই সব মেয়েদের পড়িবার স্থানই বা কোথায়? কারণ লোকাধিক্যে সব বিদ্যালয়ই ভরপুর হইয়াছে। প্রায় বিদ্যালয়েই স্থানাভাব; এমতাবস্থায় যাহাতে স্থানীয় ভদ্রলোকগণ শ্রীযুক্ত বিচার-পতি জে,পি, মিত্র, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া একটী সভা আহ্বান করিয়া এবং কমিটি গঠিত করিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনুমোদন চাহেন,তবেই সুরাহা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুমোদন প্রদানে কার্পণ্য করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে যে কয়খানি চিঠি আনন্দবাজার ও যুগান্তরে বাহির হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কমিটি প্রকৃত অভি-ভাবকদের দ্বারা গঠিত হয় নাই বলিয়াই প্রকাশ। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইহাই সত্য কথা। এই কমিটি থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া সম্ভব হইবে না, কারণ যাঁহাদের কারসাজিতে এই দশা হইয়াছে, তাঁহারাই যদি কর্ত্তা হন, তবে ছিদ্রকলসে জল ভরার মত হইবে। সুতরাং বিচারপতি মিত্র মহাশয়ও ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনুমোদন চাহিলে কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহাতে গোল ও বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইবে না। অচিরে অভিভাবকগণ ও স্থানীয় শিক্ষানু-বর্ত্তীগণকে ডাকাইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক, ইহাই আমাদের নিবেদন। এবং সকল অভিভাবক ও স্থানীয় যাবতীয় শিক্ষাব্রতিগণকে লইয়া যদি কমিটি গঠিত হয়, এমন কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না যে বিশ্ব-বিদ্যালয় অনুমোদন করিবেন না। আমরা অচিরে এই বিষয়ে সকল শিক্ষাব্রতীকে দক্ষিণ কলিকাতার বিদ্যালয়-গুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি।

আদালতের বাহিরে

ভূতপূর্ব্ব 'নাচঘর'-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় দেখিতেছি একেবারে সবজান্তা হইয়া পড়িয়াছেন! নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বংসহা বসুমতী তাহার বুকে রায় মহাশয়ের লেখনীনিঃসৃত যে সব আবর্জ্জনা স্থান দিয়াছেন, এবং অন্যত্র তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব অমর্য্যাদামূলক কাহিনী লিখিতেছেন, আমরা তাহাও সম্প্রতি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত সাল তারিখের উল্লেখ করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে আমরা হাসিব কি

কাঁদিব, ঠাহর পাইতেছি না। এক সময় (বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে) রায় মহাশয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু অমূলক কথা লিখিয়া বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবাদভাজন ও বিরক্তির কারণ হইয়াছিলেন। এবারে তাঁহার একজন সুহৃদ—যাঁহাকে তিনি একদিন নাচঘরে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিয়া লোক-সমাজে হেয় করিতেন, আজ তাঁহারও তিনি শতমুখী প্রশংসায় উচ্ছ্বল হইয়া উঠিতে পারেন সত্য, কিন্তু যে মৌলিক গবেষণা-প্রসূত 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' সুদূর ইউরোপ এবং আমেরিকায় পর্য্যন্ত সম্মান ও প্রশস্তি লাভ করিয়াছে, রায় মহাশয়ের নিকট তাহা উপহাসের বস্তু মাত্র। অথচ সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতেছি যে, উক্ত গ্রন্থ হইতে হুবহু তারিখসমূহ লইয়া তৎসম্পর্কিত ঋণ স্বীকারটুকুও তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। পরের দ্রব্য না বলিয়া এবং ঋণ স্বীকার না করিয়া ব্যবহার করা যে অপরাধ, তাহা তাঁহার ন্যায় একজন কবি, কথাশিল্পী ও নৃত্যবিশারদের বুঝা উচিৎ কিনা, তাঁহাকেই একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রহণ করিয়াও তিনি তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই। দুই একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র পুনরায় যাইবার পরে তাঁহার নিজ নাটক 'বলিদান'ই প্রথমে মঞ্চস্থ করেন নাই, "হরগৌরী" করিয়াছিলেন, রাণাপ্রতাপের অভিনয় সিরাজদ্দৌলার পরে হয় নাই, পূর্ব্বে হইয়াছিল। প্রথমটি হয় ২২শে জুলাই, দ্বিতীয়টী সিরাজদ্দৌলা হয় ৭ই সেপ্টেম্বর—উভয়েরই সন ১৯০৫। অমৃত মিত্র মহাশয় মেঘনাদ বধে যে রবণ হন, তাহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে নয়, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশ পরিচালিত ন্যাশনালে। আর একটী কথা বলিতেছি, স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নিকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন না। গিরিশচন্দ্রের সহিত তুলনা করিবার আবশ্যক নাই, তবে তিনি যে প্রথম শ্রেণীরই একজন সু-অভিনেতা ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। আশা করি, রায় মহাশয় এবারে ভ্রম সংশোধনের কিছু সুযোগ পাইবেন।

কিসের অভাব ?

প্রায় মাইল দেড়েক করিয়া দীর্ঘ চারিটা মিছিল শহরের চার প্রান্তে নির্গত হইল। মিছিল কি, বরং বলা চলে জনস্রোত—শৃঙ্খলাহীন, সঙ্গতিহীন, আর বুঝি অন্তহীন উদ্বেলতা নিয়া চারদল মানুষ। প্রায় মাইল চারেক পথ পদব্রজে অতিক্রমণ করিয়া সেই চারটি জন-স্রোত আসিয়া মিলিত হইল শহরের একটি বিশেষ প্রাঙ্গণে।

মিছিলের আগে ও পরে আসিল আরও লক্ষ কয়েক মানুষ। একটি স্মৃতিসভা হওয়ার কথা সেই প্রাঙ্গণে। বলাবাহুল্য, মাসাবধি কাল হইতে যেসব সভার কথা দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রাবলিতে দিনের পর দিন নানা কাগজী আড়ম্বরের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে, এটি তেমন কোনো সভা নয়। কাগজে এ সভার কথা প্রকাশিত হইয়াছে নিতান্ত অগোচরে। সভায় বক্তা হিসাবে যাঁহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে, তাঁহারাও কেহ তেমন একটা কেউকেটা মানুষ নন। খবরের কাগজে তাঁহাদের নাম নিতান্ত কালেভদ্রে প্রকাশিত হয়। এবং তাও নিতান্ত অগোচরে। হেড্‌লাইন জোড়া জমকালো বহু নামের পাশে তাঁহাদের সে নাম রীতিমত সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয়। তবুও মিছিল, আর মিছিলের বাহিরের মানুষ মিলাইয়া সেই বিরল-প্রচারিত স্মৃতি সভাটিতে আসিয়া যাহারা সমবেত হইল, তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় দশলক্ষের মতো। সভায় যাঁহারা বক্তৃতা দিলেন, তাঁহাদের কথা সেই দশলক্ষ মানুষ যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিয়া গেল। যাঁহার স্মৃতি পালনার্থে সেই সভা, তাঁহার নামে আকাশ ফাটাইয়া জয়ধ্বনি করিল, এবং একাগ্রচিত্তে সমকণ্ঠে সংকল্প নিল গুটিকয়েক। তারপর সভাভঙ্গের পরেও আবার জ্বলন্ত মশাল নিয়া সেই জনতা বাহির হইল দিকে দিকে।

এবছরের ২৩শে জানুয়ারীর, ২৬শে নয় কিন্তু, ২৩শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানটিকে কলিকাতার মানুষ যেভাবে পালন করিয়াছে, সেই ঘটনাটির খুব একটা অনাড়ম্বর বিবরণ বোধহয় মোটামুটি এইরকম করিয়া দেওয়া চলে।

কেমন যেন অভাবনীয়ের মতো ঘটিয়া গেল ব্যাপারটা। জাতীয় দিবসগুলি আজকাল আমাদের স্মরণ করিতে হয় রীতিমতো ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ রাখিয়া, তাও যেন একটা দিন ছুটি পাওয়া যাইবে এমন একটা প্রত্যাশায়। হুজুকের শহর কলিকাতা। হুজুক করিতেও যেন ভুলিয়া গিয়াছে। অন্তকোনো রকমের সমবেত উচ্ছ্বাস প্রকাশ তো দূরের কথা। কিন্তু বলাকওয়া নেই, হঠাৎ একটা দমকা ঝড়ের মতো একী একটা বহিয়া গেল এই মৃতকল্প শহরটার বুকে? এত উৎসাহ, এত উচ্ছ্বাস আর এত গলার জোর মানুষগুলি কোথা হইতে পাইয়া বসিল? এমন কতকগুলি দিন আমরা দেখিয়াছি বছর চার-পাঁচেক আগে। আমরা দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিল কতকগুলি শ্বেতচর্ম্ম মানুষ। দেখিয়া দাবাগ্নি-ভীত অরণ্যচারিত পশুপালের মতো এদেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

ইতিহাস নাকি আত্ম প্রচারক। নিজের চরিত্রের কথা সে নিজেই সহস্রমুখে লক্ষমুখে ঘোষণা করিয়া করিয়া আগাইয়া চলে। অনেকের ধারনা এই বছরের এই ২৩শে জানুয়ারীর দিনও নাকি এই জনমহাকায়ের মুখ দিয়া ভারতের ইতিহাস তার এক নূতন জায়মান চরিত্রের জানান দিয়া গেল।

কিন্তু ইতিহাসের ভাষা নাকি আবার সকলের কাছে সমান নয়। কেউ নাকি কান না পাতিয়াই শুনিতে পায় এই ভাষা। কেউ পায় না। আবার কেউ কেউ নাকি শুনিয়াও ভান করে শুনি নাই বলিয়া।

মা ফলেষু

কাজ করিয়া সে কাজের ফলের জন্ত নিরাসক্ত হওয়াকেই আমাদের গীতা বলিয়াছেন মহাপুরুষোচিত। জড়বাদী এই ধরাধামে আমাদের মুন্সিজীও হইতেছেন সেই রকমের একজন বিরল নিষ্কাম কর্ম্মী মহাপুরুষ। আজ এই ছয়-সাত মাস কাল যাবৎ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি, মুন্সিজীর যত কাজ, তার কোনোটাই কোনো ফলের প্রত্যাশা নিয়া নয়। দৃঢ় চিত্তে উনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন শুধু কাজেরই তাগিদে। তাঁহার এই কাজের জন্ত যত ফলভোগ, তাহা করার সৌভাগ্য সবটুকুই শুধু দেশের লোকের। তাঁহার বনমহোৎসব, ব্রহ্ম সরকারের কাছ থেকে ভারতের জন্ত তাঁহার চাল কেনায় বলিষ্ঠ কুণ্ঠা, হংকং-এর চিনির অর্ডার বাতিল করিয়া দ্বিগুণ দামে সেই চিনিই আমেরিকা হইতে ক্রয় করার তাঁহার যে সেই নিস্পৃহ তৎপরতা—এ সমস্তেরই মধ্যে আমরা মুন্সিজীর নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রেরণাময় নিদর্শন লাভ করিয়াছি।

মাসখানেক সময়ও অতিবাহিত হয় নাই। সারা ভারতময় খাই-খাই রব উঠিয়াছে আর যেখানে সেখানে বে-সরকারী কাপুরুষদের মুখে শুধু এক কথা,—দেশে পর্য্যাপ্ত খাগ্য মজুত নাই, আবার ১৯৪৩-এর দুর্দৈবটার পুনরাবৃত্তি ঘটিল বুঝি বা! মুন্সিজী তখন কলিকাতায় বড়দিনের সফরে আসিয়াছেন। বে-সরকারী লোকদের মুখে এই আতঙ্ককর গুজব শুনিয়া ধমক দিয়া তিনি দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিলেন, দুষমনদের কথায় কান দিও না। পৃথিবীর চারিদিকে খাদ্যের অর্ডার গিয়াছে, আবেদন গিয়াছে ভারতবন্ধু আমেরিকার দরবারে। দু' সপ্তাহ সবুর কর, দেখিবে দেশ খাদ্যে ভরিয়া গিয়াছে। তখন দেখিব···

গেল দু' সপ্তাহ। আবার একদিন মুন্সিজী বিবৃতি দিবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, খাগ্য আসা অমনি মুখের কথা নয়। জাহাজের কত গণ্ডগোল। সুতরাং দেশকে যদি বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে দেশকে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ খাগ্য বাঁচাইতে হইবে, এবং খাদ্যের দাম দিতে হইবে পূর্ব্বের চেয়ে একচতুর্থাংশ বেশী। কিন্তু তবুও ভয়ের কিছু নাই। পৃথিবীর চারিদিকে অর্ডার গিয়াছে। ভারতবন্ধু আমেরিকা খাগ্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সেই উপঢৌকন আসিল বলিয়া। তখন দেখিব···

রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশ দৈবাদেশের মতো পালনীয়। সুতরাং সারা ভারতবর্ষ এক্ষণে আধপেটা খাবারেরও পৌনে-পেটা হইয়া আহার করিতেছে।

অনেকে হয়তো মনে মনে গোসা করিবেন মুন্সিজীর উপরে। তিন সপ্তাহের আগেকার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে

তাঁহার আজিকার আচরণের মিল নাই বলিয়া। আমরা কিন্তু এই হঠকারীদের বলিব মূর্খ। কেননা, প্রতিশ্রুতিও তো কর্ম্মই। সেই ফল প্রত্যাশা করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেন মুন্সিজী। তা কি তিনি পারেন? গীতায় বলিয়াছে না, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় ইত্যাদি।

একটা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িয়া গেল। ৩০শে—৩১শে জানুয়ারীর কোনো কোনো কাগজে ছোট্ট একটি সংবাদ আমাদের চোখে পড়িয়াছিল। সেটি হুবহু এইরূপ:

London, January 29—If India approached Moscow, she would get all the wheat she needs at the most favourable terms, according to diplomatic circles here. It is not known, whether India has actually raised the question in Moscow yet, and it is felt that Delhi is hesitating because of political considerations.
—U. P. I.

দিল্লী মানে কি মুন্সিজী?

মানাব সই

সহযোগী আনন্দ বাজার পত্রিকা আমাদের জানাইতেছেন: "একটি সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে যে ভারতীয় রেলওয়ের জন্য বিলাতে গ্লাসগো নর্থ ব্রিটিশ লোকোমোটিভ্ কোম্পানীতে ৭৮ ফুট লম্বা ১০০খানি ইঞ্জিন নির্মানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ একখানি ইঞ্জিন আগামী মে মাসের মেলায় ব্রিটেনের জনসাধারণকে দেখান হইবে। ইঞ্জিনখানি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন। উহাকে সমুদ্রপথে লণ্ডনে আনিতে হইয়াছে। কারণ উহা এত বড় যে রাস্তা দিয়া আনা যায় না, এবং এত চওড়া যে ব্রিটিশ রেলওয়েতেও চালানো যায় না।"

এই অতিকায় লৌহ-বিস্ময় ভারতের রেলপথে মানান সই হইবে কিনা এই আশঙ্কায় সহযোগী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একথা কে না মানে যে ব্রিটিশ যন্ত্র বিদ্যার পরীক্ষার ভার বহন করিবার ক্ষমতায় ভারতীয় রেলপথের সহিত কাহারই তুলনা হয় না।

সশস্ত্র শান্তি

পৃথিবীতে যদি সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে সকলের আগে প্রাণপণে অস্ত্রসম্ভার বাড়াইতে হইবে, যুদ্ধ করার নেশা যাহাদের রক্তের মধ্যে সেই জার্ম্মেণী আর জাপানকে সুনিপুণ শস্ত্রী করিয়া তুলিতে হইবে আর ডলারতন্ত্র বিরোধী যত দেশ ও রাষ্ট্র আছে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে মীমাংসার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে বরাবরের মতো। কোরিয়ার বিপর্য্যয়ের পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিচক্র ক্রমাগত যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেই পন্থার আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতিটুকু মোটামুটি এই রকম।—

মাসখানেক আগে, লণ্ডনে তখনও পুরাদমে কমন-ওয়েলথ সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, সেই সময় খুব অল্পদিনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষ একটা শুভলগ্নের আভাষ পাইয়া যেন রীতিমত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে সুরু করিয়াছিল। কোরিয়ার সংকটের সমাধানের জন্য তখন জাতিসংঘের এশীয় সদস্যরা সকলে মিলিয়া একটি চমৎকার পরিকল্পনা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় কথাটা ছিল এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র চীনকে বিশ্বসভার যোগ্য প্রতিনিধি রূপে স্বীকার করিয়া নেওয়ার প্রস্তাব, এশিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে চীনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিয়া যে বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকানো যাইবে না, সেই বাস্তব নির্দ্দেশ।

আর কেহ নয়, যে পরিস্থিতি শুধু এশিয়ারই, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিল এশিয়ার মানুষেরাই, এশিয়ার যে একশো কুড়ি কোটি অধিবাসী, তাহাদেরই সকলকার প্রতিনিধি। এই জন্যই পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষেরা মনে করিয়াছিল, এইবার বুঝি আর এই প্রস্তাব-পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না। কোরিয়া-বিপর্য্যয়ের নির্ব্বিঘ্ন সমাধানের মধ্যে যুদ্ধের করাল ছায়াটাও বহুদিনের জন্য পৃথিবীর বুক হইতে অপসৃত হইয়া যাইবে।

কিন্তু এ প্রস্তাব যে ছিল সত্যকার শান্তি, পৃথিবীবাসী এই সহজ কথাটি বোধ হয় আশাবাদের আতিশয্যে

বুঝিয়াও বোঝে নাই। বোঝে নাই যে এই শান্তির পথ মানিয়া লইতে হইলে এশিয়াকে এশিয়াবাসীর গৃহ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, অস্ত্রসজ্জার-উদ্যোগ বন্ধ করিতে হয়, নিরস্ত্র হইয়া কাজ করিবার সুযোগ পায় এশিয়ার নবজাগ্রত জাতিসমূহ। এ শান্তি আমেরিকার সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী শান্তির প্রতিরোধী। সুতরাং নাকচ হইয়া গিয়াছে এই প্রস্তাব রাষ্ট্র সংঘে। আমেরিকার প্রস্তাব অনুযায়ী এশিয়ার চীনকে সমস্ত এশিয়াবাসীর মতের বিরুদ্ধে এশিয়ার আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ইহার পর বিশ্বশান্তির কথা বলিতে গিয়া কোনো মন্তব্যেরই আর প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের শান্তি আমেরিকার সশস্ত্র শান্তিনীতির অভিভাবকত্বে নিশ্চয়ই নিরাপদ থাকিবে।

তবু একটা কথা।

হয়তো একটু দেরী হইয়া গিয়াছে ভারতবর্ষের। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ বোধ হয় ভারতের সমস্ত মানুষই চিনতে পারিয়াছে—কাহারা মনে মনে প্রকৃত শান্তি-প্রয়াসী আর কাহারা মনে মনে চায় সেই শান্তির সৎকার করিতে।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

মুন্সিজী হাজির

লক্ষ্ণৌ-পরিষদের জনৈক সোস্তালিষ্ট সদস্যের মতানুসারে উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জিলায় এ পর্যন্ত পাঁচটি অনাহার-জনিত মৃত্যু ঘটিয়াছে। উক্ত সদস্যটি তাঁহার এই উক্তির প্রমাণকল্পে একজন অনাহারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর লিখিত বিবৃতি পরিষদ গৃহে দাখিল করেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভুখায় মৃত ওই মানুষটি নাকি পুরা আট দিন ধরিয়া একদানা খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে এবং তাঁহার শাশুড়ী আর তার চারটি ছেলেমেয়েও গত পাঁচ দিন হইতে অভুক্ত রহিয়াছেন।

(স্টেট্‌স্‌, ১৩ই জানুয়ারী)

সরিষার মধ্যেই ভূত

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে ভিক্ষাবৃত্তি আইনের চক্ষে অপরাধ। সম্প্রতি এই অপরাধে পুলিশ কর্তৃক ধৃত দুইজন ভিখারীর যে কাহিনী দিল্লীর একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কৌতুকাবহ। একজন হইতেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। তাঁহার পিতা কোনো স্কুলের হেড মাষ্টার। পুত্রের বক্তব্য এই যে, পিতার সহিত তাঁহার বনিবনা ছিল না। গ্র্যাজুয়েট পুত্রকে বেকার বসিয়া থাকার জন্য প্রায়ই গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত। ফলে একদিন তিনি এই সংকল্প করিয়া গৃহত্যাগ করেন যে, রোজগার করিতে না পারিলে আর বাড়ী ফিরিবেন না। দিল্লীতে চাকুরীর খোঁজে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে চাকুরী পাওয়া দূরের কথা, হাতের সামান্য অর্থও নিঃশেষ হওয়াতে তিনি শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। মলিন শতচ্ছিন্ন বস্ত্র-পরিহিত এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ কিংস্‌ওয়ে দরিদ্র ভবনে রাখিয়া দিয়াছে। অপর ব্যক্তি হইতেছেন এক মহিলা। বয়স ৫০, সম্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক।

(যুগান্তর, ১৫ই মাঘ)

"আর্-এস্-ভি-পি"

উত্তর প্রদেশের জনৈক প্রধানস্তরীয় কংগ্রেসী নেতার অনড় ধারণা যে, হিন্দী ভাষাটা যে ব্যক্তির রপ্ত আছে, তিনিই কার্যতঃ দুনিয়ার সব বিদ্যাকেই গুলিয়া খাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কোনও বৈদেশিক দূতাবাস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। প্রধানস্তরীয় রাজনীতির রেওয়াজ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানটা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সেক্রেটারী মারফত সম্পন্ন করা। সেই রেওয়াজে উক্ত হিন্দিবাদী নেতাটির বৈদেশিক দূতাবাসের এই নিমন্ত্রণ পত্রের প্রাপ্তি-জবাব লিখিবার ফরমাস দেন তাঁহার হিন্দি-বাদী সেক্রেটারীকে।

চিঠির উত্তর লিখিতে গিয়া সেক্রেটারীজী লক্ষ্য করেন যে, ইংরেজীতে লেখা চারিটি অক্ষর R. S. V. P. এবং তার নীচেই সেই বৈদেশিক দূতাবাসের ঠিকানা। হিন্দি-বাদী সেক্রেটারী স্থির বুঝিয়া লন যে, এই R. S. V. P.

অক্ষর ক'টি হইল নিমন্ত্রণ। স্কুডারি সাহেবই চারটি আন্তরিক। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি 'আর্-এস্-ভি-পি'-র নামে একটি বিনীত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। (ভিজিল)

খাদ্য বনাম লিপ ষ্টিক

উত্তর ফ্রান্সের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা তরুণী ম্যাডমোয়াজেল লীজ গ্রেলিস্ দুনিয়ার অনশন রেকর্ড ভঙ্গ করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সম্প্রতি এক কফিনে প্রবেশ করিয়াছেন।... তিনি বলিয়াছেন, আপাততঃ তিনি ষাট দিন পর্য্যন্ত না খাইয়া আহার মহড়া দিবেন—তবে সম্ভব হইলে ১২০ দিন পর্য্যন্ত তিনি অনশনের জের টানিতে পারেন।...শ্রীমতী কফিনে ঢোকার আগে একটি লিপ-ষ্টিক, এককৌটা পাউডার ও একবোতল জল সঙ্গে লইয়াছেন।...এখন বুঝিতেছি, দেশে ভাত নাই, তাহাতে দৃকপাত না করিয়া একদল মহিলা কেন মুন্সিজীকে ঘেরাও করিয়া, বিদেশ হইতে প্রসাধনদ্রব্য আনাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। (যুগান্তর ৭ই মাঘ)

জানি, কিন্তু বলিব না

আনবিক বোমা লইয়া আমেরিকা বহুরকমে প্রচার কার্য্য করিতেছে। ঐই একটি মাত্র মূলধন যুদ্ধের পর আমেরিকার ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়া ঘোষণা করে যে, তাহারাও আনবিক শক্তি হস্তগত করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও আনবিক অস্ত্র লইয়া নাচানাচি থামে নাই। এখন সোজাসুজি আনবিক বোমার ভয় না দেখাইয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ভয় দেখান হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা ষ্টেটের গভর্ণর মিঃ চার্লস রাসেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত বুধবার রাত্রিতে নেভাদা ষ্টেটে আনবিক শক্তির কমিশনের নূতন পরীক্ষাকেন্দ্রে একটি বিস্ফোরণ হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিল, তাহা কি আনবিক বিস্ফোরণ? কমিশন বলিয়াছেন, জানি, কিন্তু বলিব না। (সত্যযুগ, ১৫ই মাঘ)

কলিকাতা ছোট আদালত ক্লাব

গত ২০শে জানুয়ারী শনিবার উপরোক্ত ক্লাবের সাহিত্য শাখা কবি-দম্পতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারানী দেবীকে অভ্যর্থনার জন্য এক বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ মিত্র। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অন্নদা শঙ্কর রায়। সভায় বহু আইনজীবী ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেব তাঁহার ইউরোপ পরিভ্রমণের ইতিহাস বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে এডিনবার্গে আন্তর্জাতিক পি-ই-এন কংগ্রেসের বিবরণ পাঠ করিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত অন্নদা শঙ্কর রায় বাংলার সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ছোট আদালতের প্রধান বিচারক শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আদালতের পক্ষে এরূপ সাহিত্য চর্চা করা বাস্তবিক বিশেষ প্রশংসার্হ। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা আইনজীবী শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্তী মহাশয়কে তাঁহার এই উদ্যমের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

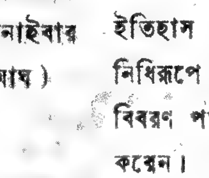

বিদায় সজ্জা [শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা

অষ্টাদশ বর্ষ চৈত্র—১৩৫৭ ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে পাক্-ভারত বাণিজ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অখণ্ড ভারতবর্ষের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় খণ্ডিত ভারতের বাণিজ্যের পরিসর, পরিমাণ ও মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। ভেদ-বুদ্ধি-প্রসূত স্বার্থের পার্থক্য হেতু, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র দুইটির বিভিন্ন মুখীন্ মতি গতি ও প্রকৃতি, উভয়ের মধ্যে অকপট সহৃদয় আদান-প্রদান ও বণ্টন বিনিময়ের ব্যবস্থায় বহু বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তির উদ্ভব ও উৎপত্তি ঘটাইয়াছে। যেখানে সরল ব্যবহারে উভয় রাষ্ট্রের ধন-জনের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটিত, সেখানে কূটবুদ্ধি ও দুরভিসন্ধির ফলে ধন জন ক্ষয়ের সহিত সম্পদ সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি ঘটিয়াছে। সংশয় ও সন্দেহ উভয় রাষ্ট্রের জনমণ্ডলীর সহজ সরল জীবন যাত্রার গতিপথ বিপুল বিঘ্ন-বিপত্তি-সঙ্কুল করিয়াছে। ষ্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত উভয় রাষ্ট্রের একের মুদ্রা মূল্যাবনয়ন এবং অপরের তদ্বিপরীত ব্যবহারের ফলে উভয়ের মধ্যে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের অনতিক্রমনীয় অন্তরায় ঘটিয়াছে; এমন কি বিনিময় ও ক্রয় বিক্রয়ের বিরতি ঘটিয়াছে। গতবর্ষে মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আদান-প্রদান ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎ প্রশমনার্থ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি অস্থায়ী বিনিময় চুক্তি ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি সে চুক্তিরও অবসান ঘটিয়াছে। ষ্ট্যার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সহিত একযোগে মুদ্রামূল্যাবনয়ন নীতি অনুসরণ না করিয়া, পাকিস্থান যে অসহযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার নিবারণ এখনও সুদূরপরাহত। নিখিল জগৎ ধন প্রতিষ্ঠান (World Bank) এবং আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার ফলে, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা প্রকরণের সহিত প্যাকিস্থানের মুদ্রামূল্যের একটি সুসমঞ্জস বিনিময় হার নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অচল অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। দ্বিখণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে যে কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও শিল্পজ সম্পদ একায়ত্ত ছিল, এখন তাহা দুইটি বিচ্ছিন্ন পররাষ্ট্রের আয়ত্তান্তর্গত। সুতরাং ঐ সকল সম্পদ উভয়ের পক্ষে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্তব্য নহে। পাট, তুলা, গম,

চামড়া প্রভৃতি কয়েকটি পণ্য যেমন পাকিস্থানের আয়ত্বে, তেমনি কয়লা, সুতিবস্ত্র এবং পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে হিন্দুস্থানের, অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতের আয়ত্বে। পূর্ব্বে অখণ্ড ভারতবর্ষের মুদ্রা প্রকরণ ছিল এক। এখন পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের মুদ্রা প্রকরণ বিভিন্ন। এবং সম্প্রতি উভয়ের মূল্যমানের বিভিন্নতা হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আদান-প্রদানে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অসহযোগমূলক অসমীচীন পরিস্থিতির বিষম ফল উভয় রাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুপ্রকট। যতদিন নিখিল জগত ধনপ্রতিষ্ঠান (World Bank) এবং আন্তর্জ্জাতিক ধন-ভাণ্ডার (International Monetary Fund) আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-প্রকরণের (Currency) সহিত পাকিস্থানের রৌপ্য মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হার নির্দ্ধারিত না করিতেছে, ততদিন ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আদান-প্রদান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুকর হইবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সংখ্যা-সঙ্কলন (Trade Statistics) এবং ভারতের সংখ্যা-সঙ্কলনের মধ্যে বিষম পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এগার মাসের সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারত-পাকিস্থানের সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য হইয়াছিল এইরূপ :

রপ্তানী	৬৯,১৪,৫৫,৮৩৫ টাকা
পুনঃ রপ্তানী	৬,৯৫,২৮,৩৯৪ ,,
আমদানী	১,০৩,৬৭,৮৮,৫২৫ ,,

ভারতের বাণিজ্য সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জলপথে ভারতীয় পণ্যের পাকিস্থানে রপ্তানীর মোট মূল্য ১২,২৬,৩৩,০৫৪৲ টাকা; কিন্তু পাকিস্থান-সংকলিত সংখ্যা তালিকায় এই অঙ্কের সমষ্টি ১৪,৭৬,৯৫,৮৪৩ টাকা। পাকিস্থানের সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে পাকিস্থানের সমগ্র আমদানীর মূল্য—পূর্ব্ব বৎসরের ৭৩,৪৬,৯৭,৮৪৩ টাকা হইতে ৯১,৩৭,৭০,৪৫৬ টাকা, অর্থাৎ শতকরা ২৪'৩ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বাণিজ্যে ভারতের পণ্য, পূর্ব্ববর্ষের শতকরা ৪৯'৩ অংশ হইতে ১৬'২ অংশে অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্য হইতে পাকিস্থানের আমদানী শতকরা ৮'৯ অংশ, ইতালী হইতে ৫'৫ অংশ, জাপান হইতে ৪'৮ অংশ এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৪'০ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুক্তরাজ্য এবং জাপান হইতে পাকিস্থান অধিকতর পরিমাণে কার্পাস সূত্র ও অন্যান্য সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি (Cotton Textiles and piece goods); ইতালী হইতে কার্পাস দড়ি ও সুতার খেই (Cotton twist and yarn); এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী করিয়াছিল। পাকিস্থান সরকারের খাস আমদানীও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে পাকিস্থান ভারত হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়াছিল—(১) পোষাকপরিচ্ছদ, (২) রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ভেষজ এবং ঔষধ, (৩) কাঁচা পাথুরিয়া ও পোড়া কয়লা, (৪) রঞ্জন ও চর্ম্ম রঞ্জক দ্রব্যাদি, (৫) ফল ও সবজী, (৬) ছুরি কাঁচি ব্যতীত লৌহ পিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, (৭) তৈয়ারী চর্ম্ম ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, (৮) বিমিশ্র উদ্ভিজ্জ তৈল (Vegetable non-essential oils) (৯) কাগজ ও পিচ্‌বোর্ড, (১০) তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য এবং সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি দ্রব্যাদি (Provisions and oil man's stores), (১১) রবার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, (১২) কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতি দ্রব্যাদি (Stationery), (১৩) স্বল্প ব্যবহৃত বীজ (Seeds non essential), (১৪) মশলাপাতি, (১৫) কার্পাস, পাট ও পশম তন্তু নির্ম্মিত বুনট দ্রব্যাদি (Textiles cotton piece-goods, twist yarn, jute manufactures, woollen and worsted piece-goods), (১৬) কাল চা (Tea black), (১৭) তামাক ও তামাক প্রস্তুত দ্রব্যাদি, (১৮) যন্ত্রপাতি এবং কারখানার সরঞ্জাম, (১৯) বিবিধ ধাতু। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত পণ্যের মধ্যে বহুক্ষেত্রে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা দশ : যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, রুশিয়া, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, ফরাসী ও ব্রেজিল।

পাকিস্থান হইতে ভারতে রপ্তানীর ক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে একুন মূল্য শতকরা ৫'৩ অংশ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাকিস্থানের মুদ্রামূল্যাবনয়নে দৃঢ় অস্বীকৃতিই অবশ্য ইহার প্রধান কারণ। পাকিস্থানী পাট ও কার্পাস তুলার প্রধান ক্রেতা ভারত। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের রৌপ্যমুদ্রার মূল্যমানের বিষম পার্থক্য হেতু ভারতের পক্ষে পাকিস্থানী পাট ও তুলার মূল্য ছিল অসঙ্গতরূপে উচ্চ। এই নিমিত্ত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত পাকিস্থান হইতে কিছুই ক্রয় করে নাই। ফলে, পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতের অংশ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শতকরা ১৭'৯ হইতে, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৪'৮ অংশে অবনমিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও ভারতের সংখ্যা-সঙ্কলনের সহিত পাকিস্থানের সামুদ্রিক বাণিজ্য সংখ্যা-সঙ্কলনের

বিষম পার্থক্য। ভারতের অঙ্কসমষ্টি ১২,২৫,৮৩,৯২৬ টাকার তুলনায়, পাকিস্থানের একুন মাত্র ৭,৬৫,২৩,১১০ টাকা। ভারতের সংখ্যাসঙ্কলনে কিছু চলমান (Intransit) মধ্যপথবর্ত্তী পণ্যের অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই গুরুতর বৈষম্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে মনে হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য বর্ষে যুক্তরাজ্য, ফরাসী এবং জাপানে পাকিস্থানে রপ্তানী শতকরা ৪·৪ ; ৩·২ এবং ৮·৫ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুক্তরাজ্যে রপ্তানীর প্রধান পণ্য ছিল কাঁচা পাট। ফরাসী দেশেও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলা এবং পাট প্রেরিত হইয়াছিল।

পাকিস্থানের সৃষ্টির পর হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্যের জমা খরচে, জমার ঘরের উদ্বৃত্ত অঙ্ক পাকিস্থানের অনুকূলে থাকে; কারণ ভারতকে পাকিস্থান হইতে প্রচুর কাঁচা পাট ও কার্পাস তুলা ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, এই এগার মাসে পাকিস্থানের ভারতের নিকট ঋণ হইয়াছিল ৭·৭৬ লক্ষ মুদ্রা। বিনিময় মুদ্রা সহজলভ্য যে সকল দেশে, তাহাদের সহিত বাণিজ্যেও পাকিস্থানের ঋণ দাঁড়াইয়াছিল ২০·৬১ লক্ষ টাকা। তবে ডলার এলাকা এবং যে সকল দেশের চলতি মুদ্রা দুর্লভ, তাহাদের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের অনুকূলে উদ্বৃত্ত জমা ঘটিয়াছিল ৭৮ লক্ষ পরিমাণে। নিম্নে একটি বিস্তারিত অঙ্ক-তালিকা প্রদত্ত হইল।

(এপ্রিল ১৯৪৯ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০)

	রপ্তানী	পুনঃ রপ্তানী	মোট	আমদানী	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
ভারত	৭·৬৮	৭৬	৮·৪৪	১৬·২১	−৭·৭৬
ডলার ও বিনিময়-দুর্লভ দেশ সমূহ	১৬·১৪	৫·৪৫	২১·৫৯	২০·৮১	+৭৮
বিনিময়-সুলভ দেশ সমূহ।	৪৫·৩২	৭৪	৪৬·০৬	৬৬·৬৭	−২০·৬১

ভারতের নিকট পাকিস্থানের এই ঋণের অঙ্ক স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। ভারতের সহিত স্থলপথে বাণিজ্যে পাকিস্থানের জমার ঘরে উদ্বৃত্ত অঙ্কই স্বাভাবিক। কারণ ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্যের শতকরা ৬০ অংশ পণ্যের আদান-প্রদান চলে স্থলপথে।

পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তি ২১শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়; এবং ৩১শে জুলাই ইহার সমাপ্তির দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। পাকিস্থানের অঙ্গীকৃত পাটের চালান শেষ করিবার নিমিত্ত দুই মাসের জন্ম ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ফলে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ২১শে এপ্রিল হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থানে ভারতের রপ্তানী, পাকিস্থান হইতে আমদানীর তুলনায় কম হইয়াছিল। রপ্তানীর একুন মূল্য হইয়াছিল ১১·৬৮ কোটি টাকা; এবং আমদানীর মূল্য ১৫·৭৭ কোটি টাকা। সুতরাং এই বাণিজ্য চুক্তিকালে, ভারত-পাকিস্থান জমাখরচে ধনরাশি অপেক্ষা ঋণরাশির পরিমাণ ভারতের পক্ষে ৪ কোটি অধিক হইয়াছিল। বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে সমুদ্রপথে ভারতের পাকিস্থান-রপ্তানীর একুন মূল্য হইয়াছিল ২০·৯ কোটি টাকা, এবং পাকিস্থান হইতে আমদানীর মূল্য ২৯·১ কোটি টাকা। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ ৮·১ কোটি টাকা। যাহা হউক, মুদ্রামূল্যাবনয়নের সুফলে পাকিস্থানের নিকট ভারতের বাণিজ্য ঋণ গত খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ৫৪·৬ কোটি হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ৮·২ কোটি টাকায় অবনমিত হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে, গত কয়েক বৎসর আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মাত্রাধিক্য হেতু আমাদের পাওনা অপেক্ষা দেনার পরিমাণ অধিক হইতেছিল; অর্থাৎ বহির্ব্বাণিজ্য জমা খরচে ঘাটতি (Adverse balance in foreign trade) ঘটিতেছিল। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রা মূল্যাবনয়ন সম্পাদনের পরে, গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের এপ্রিল, মে ও জুন তিন মাস পুনরায় রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মাত্রা অধিক হইয়াছিল। মুদ্রা-মূল্যাবনয়নের পশ্চাতে, রপ্তানি বৃদ্ধি, খাদ্য-শস্যের আমদানী হ্রাস এবং অন্যান্য বিদেশী পণ্যের আমদানী সংহত (Restriction) করিবার ফলে, এই শুভ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে বর্ত্তমান বৎসরের ক্ষেত্রস্থ ফসল এবং গত বৎসরের সঞ্চিত শস্য বহুল পরিমাণে (প্রায় ২০০ লক্ষ টন) বিনষ্ট হওয়ার ফলে, আমাদিগকে পুনরায় খাদ্য শস্যের এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কৃষিশিল্পোপযোগী পণ্যের আমদানীর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। তথাপি গত আর্থিক বৎসর ১৯৪৯-১৯৫০ খৃষ্টাব্দে, তৎপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ১২৪ কোটি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। বিগত ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য জমাখরচে ঘাটতির পরিমাণ ২১·৬৬ কোটি হইতে ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ৯৩·১৮ কোটিতে অবনমিত হইয়াছিল। মুদ্রা মূল্যাবনয়নের পূর্ব্বে, প্রতি মাসে গড়ে ৩৪·৪০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী হইত এবং মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে এই গড় রপ্তানী ৪৭·৬৮ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। মুদ্রামূল্যা-

বনয়নের পূর্ব্বে প্রতি মাসে আমদানী পণ্যের গড় ছিল ৬১'০৮ ; মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে এই গড়ের পরিমাণ ৪১'৫৮ কোটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে (১৯৪৯-৫০ খৃঃ) ডলার এলাকাস্থিত দেশ সমূহের সহিত আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; এবং আমাদের প্রতিকূল ঘাটতির অঙ্ক প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭'৩০ কোটি টাকার ঘাটতি ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ লক্ষে অবনমিত হইয়াছিল। মুদ্রা মূল্যাবনয়নের স্বাভাবিক ফলে, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস পাইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, ডলার এলাকার দেশ হইতে আমদানী কঠোর ভাবে সংযত করা হইয়াছিল। গত বর্ষের নবেম্বর মাস হইতে ডলার-এলাকাধীন দেশ সমূহের সহিত বাণিজ্যে ভারতের প্রতিকূল ঘাটতি তিরোহিত হইয়া অনুকূল উদ্বৃত্তের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। টাকার বিনিময়ে যে-সকল দেশের মুদ্রা পাওয়া দুর্ঘট (Hard Currency Countries) এবং যে-সব দেশের মুদ্রা পাওয়া সহজ সাধ্য (Soft currency countries) এই উভয়বিধ দেশের সহিত বাণিজ্যেও জমা খরচের অঙ্ক আমাদের অনুকূল হইয়াছিল। বিগত দুই আর্থিক বৎসরে এই দ্বিবিধ দেশের সহিত বাণিজ্যে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছিল এইরূপ :

	১৯৪৮-৪৯ (কোটি টাকা)	১৯৪৯-৫০ (কোটি টাকা)
বিনিময় মুদ্রা-দুর্লভ দেশ	২৩'৮	১৪'৮২
" " সুলভ "	১৫৮'৫৪	৭৬'৮৫

বিগত ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্থল ও জল উভয়বিধ পথে পরিবাহিত সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের একুন মূল্য হইয়াছিল ১,১১১'৯৭ কোটি টাকা। তৎপূর্ব্ব বৎসর এই বাণিজ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল ১,১২৫'০৮ কোটি টাকা। সংবৎসরের সমগ্র আমদানীর মূল্য হইয়াছিল ৬০২'৫৭ কোটি টাকা, সমগ্র রপ্তানীর মূল্য ৪৯৬'২৩ কোটি এবং সমগ্র পুনঃ রপ্তানীর (Re-exports) মূল্য ১৩'১৬ কোটি। পুনঃ রপ্তানীর অর্থ, বিদেশ হইতে আবশ্যকীয় কাঁচা মাল কিংবা খণ্ডাংশ আমদানী করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত পণ্যের রপ্তানী। নিম্নে প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যের নাম ও মূল্য প্রদত্ত হইল :

	কোটি টাকা
ডাল ও ময়দা সহ খাদ্যদানা	১০৮'৭২
যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা	১০৫'৫২
কাঁচা কার্পাস তুলা	৬৮'৮৩
তৈল	৫৯'২১
ধাতু ও ধাতুমল [Ores]	৩১'৮৮
যানবাহন	২৩'৪৬
কাঁচা পাট	২১'১৭
কার্পাস সূতা ও তৎপ্রস্তুত বস্ত্রাদি	১৮'৪১
রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ভেষজ ও ঔষধ	১৬'৪৪
অন্যান্য প্রকার সূতা এবং সূতী বস্ত্রাদি	১৬'০৩
ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি এবং লৌহ-পিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	১৫'৮২
বিজলী সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি	১৩'০২
রঞ্জন দ্রব্যাদি এবং রং	১১'১১
ফল, বাদাম এবং সব্জী	৯'৯৪
কাগজ, পিচবোর্ড এবং মনিহারী	৯'৭১

আমদানী পণ্যের বিশ্লেষণ হইতে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে, প্রধানতঃ কাঁচাপাট এবং ডাল ও ময়দাসহ খাদ্যদানার আমদানী হ্রাস-হেতু সমগ্র আমদানীতে ৬৯ কোটি টাকা হ্রাস ঘটিয়াছিল। কাঁচা পাটের আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের ৭১'২৫ কোটি হইতে ২১'১৭ কোটিতে, এবং খাদ্য দানা ১৩২'৩৫ কোটি হইতে ১০৮'৭২ কোটিতে অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২৪'৫৭ কোটি অধিকতর হইয়া ১০৫'৫২ কোটিতে সর্ব্বোচ্চ সমষ্টি লাভ করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে রপ্তানী পণ্যের একুন মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৪৯'৮১ কোটি অধিক হইয়াছিল। এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল কার্পাস তুলা এবং তৎপ্রস্তুত দ্রব্যাদি, চা, মশলা, চর্ম্ম এবং বীজ প্রভৃতির রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কার্পাস তুলা ও তৎপ্রস্তুত দ্রব্যাদির রপ্তানী ৬২'৩৯ কোটি হইতে ৯২'৬৬ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। চা-এর রপ্তানী ১৯৪৮-৪৯খৃষ্টাব্দের ৬৪'২২ কোটি হইতে ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ৭২'৫৩ কোটিতে উর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জ্জনকারী রপ্তানী পণ্য কাঁচা পাট এবং পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদির রপ্তানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৭২'২১ কোটি হইতে ১৪৩'১৯ কোটিতে অধোগতি লাভ করিয়াছিল। গত আর্থিক বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত প্রধান প্রধান পণ্যের মূল্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	১৯৪৯-৫০ [কোটি টাকা]
কাঁচা পাট ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	১৪৩.১৯
কার্পাস তুলা ও তৎপ্রস্তুত দ্রব্যাদি	৯২'৬৬

চা	৭২'৫৩
মশলা	১৯'১৫
চর্ম	
বীজ	১৮'৫৪
তামাক	১৪'৫৭
তৈল	১২·৮৩

গত আর্থিক বৎসরের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যেমন স্বাধীনতার পূর্ব্বে, তেমনি স্বাধীনতা অর্জ্জনের দুই বৎসর পরেও যুক্ত রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্য ভারতে বিক্রয় করিয়াছিল এবং ভারত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্য ক্রয় করিয়াছিল। তাহার পরেই যুক্তরাষ্ট্র ; এবং যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাতে ভারতের অঙ্গ-বিচ্যুত পাকিস্থানের স্থান। এই তিন দেশের ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্ক এইরূপ :

[কোটি টাকা]

	ভারতে প্রেরিত পণ্য		ভারত হইতে ক্রীত পণ্য	
	১৯৪৮ ৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
যুক্তরাজ্য	১৫২'৩৬	১৪৯.৩২	৯৭'৭০	১১১ ২৪
যুক্তরাষ্ট্র	১০৬'৩৬	৮৭ ৯১	৭০'০৭	৭৭'৬০
পাকিস্থান	১০৭'৩৭	৪৩'৯৩	৭৪'৭০	৩৯'৭৬

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যুক্তরাজ্য ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে যে পণ্য সম্ভার ক্রয় করিয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে তদপেক্ষা ১৩'৫৪ কোটি টাকার অধিক পণ্য ক্রয় করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আমরা পাকিস্থান হইতে যে পণ্য ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৬৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল এবং পাকিস্থানে প্রেরিত আমাদের পণ্যের মূল্যও ৩৪ কোটি পরিমাণ কম হইয়াছিল। আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থান ব্যতীত আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়াছিলাম ২৫'০৮ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি, সিংহলে পাঠাইয়াছিলাম ১৫'৬২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য, বর্ম্মায় ১৩'৫১ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি এবং ক্যানাডায় ১০'৮৩ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী। আমদানী বাণিজ্যে আমরা মিশর হইতে কিনিয়াছিলাম ৩৯'৪৬ কোটি টাকার পণ্য, ইরাণ হইতে ৩২'৫০ কোটি টাকার, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২৫'৯৮ কোটি টাকার, জাপান হইতে ২১'৪১ কোটি টাকার এবং কেনিয়া উপনিবেশ হইতে ১৫'০৪ কোটি টাকার দ্রব্যাদি আলোচ্য বর্ষে এই সমুদায় দেশ হইতে আমাদের আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গত খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে ভারতের রপ্তানী আমদানীর তুলনায় উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ফলে, বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক গত খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধের ১৪৪'৬২ কোটি টাকা ঘাট্তির তুলনায়, ৫'৬৮ কোটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথম ষাণ্মাসে বিনিময়-মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য দেশসমূহে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭৩'৮৪ কোটি টাকা ; এবং ঐ সকল দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৬৯'৭৫ কোটি টাকা। সুতরাং ডলার এলাকায় বাণিজ্যে ভারতের অনুকূলে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক হইয়াছিল ৪'০৯ কোটি টাকা। বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের এই প্রথম ছয় মাসে বিনিময়-মুদ্রা সহজ-প্রাপ্য দেশসমূহে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর মূল্য হইয়াছিল, ১৬৩'১১ কোটি টাকা ; এবং তথা হইতে আমদানীর একুন মূল্য হইয়াছিল ১৬০'৫৮ কোটি টাকা। সুতরাং এই অঞ্চলের বাণিজ্যে ভারতের অনুকূলে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক দাঁড়াইয়াছিল ২'৫৩ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য যে, আমদানী হ্রাস এবং রপ্তানী বৃদ্ধির ফলেই বৈদেশিক বাণিজ্য এই অনুকূল গতিলাভ করিয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্যাবনয়নের এক বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে। মুদ্রামূল্যাবনয়নের ফলে রপ্তানী বাণিজ্যে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমরা যথেষ্ট বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা (Foreign exchange) অর্জ্জন করিয়াছি। পাট-শিল্প যদি অধিকতর পরিমাণে তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানী করিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা অধিকতর পরিমাণে ডলার অর্জ্জন করিতে পারিতাম। সরকারী সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই এক বৎসরে বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে, কিন্তু কার্পাসতুলা সমস্যা হেতু বস্ত্র রপ্তানী খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। এই দ্বাদশ মাসে বিনিময়-মুদ্রা-দুর্ল্লভ দেশসমূহে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৪৩ অংশে ; এবং অন্যান্য দেশে শতকরা ২২ অংশ পরিমাণে। ফলে, আমরা কোন মতে ডলারের প্রয়োজন মিটাইয়া, বিনিময়-মুদ্রা-সুলভ দেশ-সমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে তত্তদ্দেশীয় মুদ্রা অধিগত করিয়াছিলাম। এই এক বৎসরের একুন রপ্তানী-মূল্য একশত কোটির মধ্যে বস্ত্র-রপ্তানীর মূল্য হইয়াছিল ষাট কোটি টাকা ; এবং তৎপশ্চাতে মশলা রপ্তানীর মূল্য দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৯'১৯ কোটিতে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত এগার মাসে রপ্তানীর একুন মূল্য হইয়াছিল ৪৫৮ কোটি টাকা। পূর্ব্ব

বৎসরের ঐ এগার মাসে রপ্তানীর একুন মূল্য ছিল ৩৬০ কোটি টাকা। বিনিময়-মুদ্রা-দুষ্প্রাপ্য দেশে ঐ এগার মাসে ভারতের রপ্তানী মূল্য, পূর্ব্ব বৎসরের ঐ কালীন একুন ৮৯ কোটির তুলনায় ১২৭ কোটি হইয়াছিল; এবং বিনিময়-মুদ্রা-সুলভ দেশসমূহে রপ্তানীর একুন মূল্য হইয়াছিল পূর্ব্ব বৎসরের ঐ কালীন একুন ২৭১ কোটি টাকার তুলনায়, ৩৩১ কোটি টাকা।

বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত আট মাসে পাকিস্থান ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতে ঘাট্‌তির পরিমাণ হইয়াছিল ১১·১৮ কোটি টাকা। পাকিস্থান ব্যতীত ষ্টার্লিং এলাকায় অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের আমদানীর পরিমাণ হইয়াছিল ১৪·৫৪ কোটি টাকা; এবং রপ্তানীর একুন মূল্য হইয়াছিল ১৬৮·৭১ কোটি টাকা। এই আট মাসে বিনিময়-মুদ্রা-দুষ্প্রাপ্য দেশ হইতে আমরা আনিয়াছিলাম ৯৯·২৫ কোটি টাকার পণ্য; এবং ঐ সকল দেশে আমরা পাঠাইয়াছিলাম ৯৭·৪৬ কোটি টাকা; এবং বিনিময়-মুদ্রা-সুলভ দেশ হইতে আমরা আমদানী করিয়াছিলাম ৭৯·৭৯ কোটি টাকার পণ্য; এবং ঐ সকল দেশে পাঠাইয়াছিলাম মাত্র ৪৭·২৫ কোটি টাকার পণ্য। এই উভয়ের মাঝামাঝি মুদ্রা সম্পন্ন দেশসমূহ (Medium Currency) হইতে আমরা কিনিয়াছিলাম ১·৫৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি, এবং ঐ সকল দেশে আমরা পাঠাইয়াছিলাম মাত্র ৭৩ লক্ষ টাকার পণ্য। গত সেপ্টেম্বর মাসের বৈদেশিক বাণিজ্যের পূর্ব্বাভাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী পণ্যের মূল্য ৩·৪৮ কোটি টাকা অধিক হইয়াছিল।

মোটের উপর, গত খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর, এই দ্বাদশ মাসের সমুদ্র ও বিমানবাহী বাণিজ্যের সংখ্যা সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুদ্রামূল্যাবনয়নের এই একটি বৎসরে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য, অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ ৮·৩ কোটি টাকা অধিক হইয়াছিল। এই পরিস্থিতি বস্তুতই আশা ও আশ্বাসপ্রদ। কারণ, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্যাবনয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশ মাসে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে ধনরাশি অপেক্ষা ঋণরাশির উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছিল ২১৩·৮ কোটি টাকা। এই দুই দ্বাদশ মাসের অঙ্ক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

	অক্টোবর হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত		পার্থক্য:
	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	ঘাট্‌তি কিংবা বাড়তি
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
মোট বাণিজ্য	১,০২১·৪	১,০১৬·৭	−৪·৭
আমদানী	৬১৭·৬	৫০৪·২	−১১৩·৪
রপ্তানী	৪০৩·৮	৫১২·৫	১০৮·৭

সুতরাং, মুদ্রামূল্যাবনয়নের প্রথম বৎসরে (১৯৪৯-৫০), ভারতের মোট বাণিজ্যে, পূর্ব্ব দ্বাদশ মাসের তুলনায় ৪·৭ কোটি টাকা কম হইয়াছিল। আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছিল ১১৩·৪ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১০৮·৭ কোটি টাকা পরিমাণে। এই দুই দ্বাদশ মাসের আমদানী-রপ্তানীর অঙ্ক তালিকা এইরূপ:

	আমদানী (কোটি টাকা)			রপ্তানী (কোটি টাকা)		
মাস	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	হ্রাস-বৃদ্ধি	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	হ্রাস-বৃদ্ধি
অক্টোবর	৩৬·৭৯	৪৮·৫৪	১১·৭৫	৩২·৫২	৩৬·২৬	৫·৭৪
নভেম্বর	৪৫·৩৫	৪৩·১৭	−২·১৮	৩৭·১৯	৫২·২০	+১৫·০১
ডিসেম্বর	৪৯·০৬	৩৫·৭৮	−১৩·২৮	৩৫·২২	৫১·৮৮	১৫·৬৬
জানুয়ারী	৫৬·৫৪	৩৮·৪৯	−১৮·১৪	৩৫·১৬	৪৭·৪৯	১২·৩৩
ফেব্রুয়ারী	৫৫·২৪	২৮·৫৪	−২৬·৭০	৩৫·৭৯	৪৪·৫৬	+৮·৭৭
মার্চ্চ	৫৮·৬১	৩৩·২৫	−২৫·৩৬	৩২·৬৩	৫৫·৯১	৩৩·২৮
এপ্রিল	৫১·৮০	৩৮·৩০	−১৩·৫০	৩৪·৫৮	৩১·৯০	−২·৬৮
মে	৬৪·১২	৪৮·৭২	−১৫·৪০	৩৩·৮৮	২৯·৯১	−৩·৯৭
জুন	৫৯·৯৩	৪৬·২৪	−১৩·৬৯	৩৩·৩০	২৯·৬৭	−৩·৬৩
জুলাই	৫৬·৯২	৩৯·২৬	−১৭·৬৬	৩১·৪৭	৩৭·০০	৫·৫৩
আগষ্ট	৫১·০০	৫২·৫৮	+১·৫৮	৩৪·৮৮	৪২·৭৬	+৭·৮৮
সেপ্টেম্বর	৩৮·৬৩	৪১·৯৩	৩·৩০	৩৪·৮২	৪৭·০০	১৫·১৮

মুদ্রা মূল্যাবনয়নের প্রথম বর্ষে মুদ্রামূল্যাবনয়নের ফল ব্যতীত আরও কয়েকটি ঘটনার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোন কোন ঘটনা বাণিজ্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ করিয়াছিল; আবার কোন কোন ঘটনা বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রেরণা দিয়াছিল। মুদ্রামূল্যাবনয়ন যেমন রপ্তানী বৃদ্ধির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং ভারতীয় পণ্য আমদানীকারী দেশসমূহে আমদানী শাসনের কঠোরতা হ্রাস ও তেমনি ব্যবসায় বৃদ্ধির ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু, বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের মূল্যের তারতম্য, এবং পূর্ব্বে যে সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইত, ভারতের অভ্যন্তরে তাহার ব্যবহার-বৃদ্ধি হেতু আমরা মুদ্রা-মূল্যাবনয়নের সুযোগ-সুবিধা সম্যক্‌রূপে কার্য্যকরী করিতে পারি

নাই। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসদ্ভাব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণরূপে রপ্তানী নিরোধ—ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সংকোচ-সাধন করিয়াছিল। যাহা হউক ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্যাবনয়নের ফলে তৎ-পরবর্ত্তী মাস হইতে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য আমাদের আমদানী বাণিজ্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে ঋণরাশি অপেক্ষা ধনরাশির আধিক্য-হেতু ভারতের অনুকূলে জমার ঘরে উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছে। মধ্যে গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে কিছু ঘাট্‌তি ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ, ঐ সময়ে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের ক্রয় হ্রাস করিয়াছিল; এবং পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত চুক্তির (Orders) মাল সরবরাহ ঐ সময়ে আমাদের আমদানীর অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছিল। সাম্প্রতিক সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গত জুলাই মাসের রপ্তানী মূল্য ৩৭ কোটি হইতে আগষ্ট মাসে ৪২'৭৯ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল; সেপ্টেম্বর মাসে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৬'৯২ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল; এবং অক্টোবর মাসে আরও উচ্চতা লাভ করিয়া ৪৮'১৯ কোটিতে শীর্ষস্থান (Record) অধিকার করিয়াছিল। এই চারি মাসে আমাদের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্কের পরিমাণ হইয়াছিল ১৮'৯৯ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দের এই চারি মাসে আমাদের ঘাট্‌তির পরিমাণ ঘটিয়াছিল, ৬৪'০২ কোটি টাকা।

বর্ত্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে ভারতের অনুকূলে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্কের পরিমাণ অতি অল্প; কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ভারতের প্রতিকূল ঘাট্‌তির অঙ্ক যে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত জমায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা মুদ্রামূল্যাবনয়নের প্রকৃষ্ট ফল। প্রকৃতি ভারতের প্রতি প্রতিকূল। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কয়েকটি প্রদেশে ও রাষ্ট্রে বহুল পরিমাণে ক্ষেত্রের পাকা ফসল এবং গোলা-জাত খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়াছে। খাদ্য-শস্যের আমদানী রোধ করিতে পারিলে বৈদেশিক বাণিজ্য জমা-খরচে আমাদের অনুকূল উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক আরও অধিক হইত; কিন্তু বিধি-নির্ব্বন্ধ কে রোধ করিবে?

★

'যা নূতন, সম্ভাবনা-গর্ভ, প্রথা-বহির্ভূত, অভ্যাস-ভঙ্গকারী, তা কখনও অধিকাংশের অনুমোদন লাভ করতে পারে না—সে অধিকাংশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি থাক্‌লেও। তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাতেই যেটা তাঁদের সুপরিচিত, অর্থাৎ যা মামুলী। মনে রাখা দরকার যে, ঠিক যেমন বুর্জ্জোয়াগন্ধী মামুলীত্বের রেওয়াজ ছিল এককালে, আজ তেমনি বিপ্লবগন্ধী মামুলীত্বের দিন এসেছে। এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, আর্টের সব চাইতে বড় গুণ (যে গুণ থাকলে আর্ট শাশ্বতকালের বরমাল্য পায়) কোনো একটি চল্‌তি মত-বিশ্বাসের অন্ধ আনুগত্য নয়—সে মত-বিশ্বাস যত ন্যায্য এবং গ্রাহ্যই হোক্ না কেন। সে গুণ নির্ভর করে এমন সব প্রশ্ন উত্থাপনের উপর যা ভবিষ্যতের প্রশ্নোত্তরের পথনির্দ্দেশক—সেই প্রশ্ন যা এখনও সাধারণের মনে জাগে নি, এবং এখন সেই উত্তর যার বহিঃরেখা এখনও কারও চোখে স্পষ্ট নয়। আর্ট যদি স্বাধীন না হয়, তবে তার কোনো সার্থকতা নেই, কোনো মূল্য নেই।'

—আঁদ্রে জীদ

অবচেতন

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ জানলা দিয়ে অসিত চৌধুরী মস্তবড় হল ঘরের ভেতরে লাফিয়ে পড়লো। বাইরে থেকে এ ঘরটা সম্পর্কে খুব বেশী রকম একটা কিছু ধারণা করা যায় না, কিন্তু ভেতরে এসে দেখা গেল বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, এবং পরিপাটিভাবে সাজানো কোনো ডেন্টিষ্টের চেম্বার বিশেষ। অসিত বাইরে থেকে তা জানতো।

খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে নেমে পড়েও অসিতের চোখ মুখের চেহারা বেশ স্বাভাবিক আর শান্ত মনে হল না, কেমন যেন একটা চাঞ্চল্যের ভাব, কেমন ধারা যেন অস্বস্তির ছাপ। চেম্বারটা খালি ছিল, সে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। বাইরে সদরের দিকের দরজা খোলাই ছিল, এখান দিয়েও সে ঢুকতে পারতো, কিন্তু মনের এই অবস্থায় মানুষ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়, অসিত তবুও ত' এখনো নিজের মনের চৈতন্য ধরে রাখতে পেরেছে।

কিন্তু এখানে ত' বেশীক্ষণ বসা যাবে না, হয় তাকে মিথ্যা করে দাঁতের অসুখ বানিয়ে বলতে হবে, নয় আবার চোরের মতই চুপি চুপি পালিয়ে যেতে হবে—যেমন এসেছে সে নীরবে, ঠিক তেমনই ভাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাইরে ত'—সুতরাং সেটা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে ডেন্টিষ্টের আবির্ভাব ঘটলো। প্রৌঢ়, লম্বা, গৌরবর্ণ চেহারা, একমাথা শাদা চুল, সযত্নে আঁচড়ানো। তিনি এসেই অসিতকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন যে তার কি চাই? আম্‌তা আম্‌তা করে অসিত যা বললো তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, সে দাঁতের যন্ত্রণায় অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছে, গোটা কয়েক দাঁত তার এখুনি না তুলে দিলে সে ডেন্টিষ্টের সামনেই মরে যেতে পারে।

দাঁত দেখা হল। কিন্তু কোন রকম দোষ চোখে পড়লো না ডেন্টিষ্টের। তিনি বললেন—আপনার দাঁত তুলতে হবে আমি মনে করছি না, আর এরকম শক্ত দাঁতে, চওড়া মাড়ীতে—দাঁতের যন্ত্রণা হবার কথাও না।

অসিত বললো—কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, দয়া করে মাড়ীটা এখুনি অপারেশন করে দিন, দেখবেন ভেতরে পুঁজ হয়েছে। ইউরিনান কোনো ট্রাবল নেই আমার।

ইতিমধ্যে ডেন্টিষ্টের ভেতর থেকে ডাক এল, টেলিফোনে কে তাঁকে ডাকছে। আবার ঘরটা ফাঁকা। হঠাৎ দেওয়ালের বড় ঘড়িটা চোখে পড়লো, তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক গতিতে টেবিলের ওপর উঠে অসিত ঘড়িটার সময় এক ঘণ্টা কমিয়ে রাখলো।

ব্যস্তভাবে ডেন্টিষ্ট পুনঃ প্রবেশ করলেন। অসিত নাছোড়বান্দা, অপারেশন না করে তার কষ্ট কমবে না, এবং যত ফীজ লাগে, সে দিতে রাজী আছে, এখুনি এই মুহূর্ত্তে তাকে অপারেশন করতে হবে।

কম্পাউণ্ডার নার্স ইত্যাদিকে ডাকিয়ে আনা হল। দাঁতের অপারেশনকে ডাক্তারী শাস্ত্রে অপারেশন বললেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব নেই, তাই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার দরকার হয় না। তবু যখন মাড়ী চিরে পুঁজ বের করে দিতে হবে, তখন নিশ্চয়ই রোগীকে অজ্ঞান করে নিতে হয়।

অসিতকে শুইয়ে দিয়ে এক দুই গণতে বলা হল। অসিত তখন জিজ্ঞাসা করলে—কটা বেজেছে বলুন ত? কোন সময় আমাকে য়্যানেস্‌থেসিয়া দেওয়া হল জানতে বড় ইচ্ছা করছে।

ডেন্টিষ্ট এবং তার সহকারী দেওয়ালের বড় ঘড়িটা দেখে সময়টা রেকর্ড করে রাখলেন।

•

অসিত বললে—আমি তাকে ভালবাসতাম, আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন যে, এখনো আমি প্রচণ্ড

ভাবে তাকে ভালবাসি। তাই তার অপমান সহ্য করতে না পেরেই আমি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।

ডেন্টিষ্টের হাতে ছুরি, তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অসিতের মাড়ীর দিকে চেয়ে রইলেন।

অসিত বলতে লাগলো—আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না—কি সুগভীর মমতায়, কি সুনিবিড় স্নেহে ও প্রীতিতে আমাদের দুজনের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছিল। শৈশবের কৈশোরের সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল যখন মালতীর বিয়ে হয়ে গেল অন্য এক বিশ্রীধরণের নরপাষণ্ডের হাতে। আমার আর মালতীর এক জাত নয়, আমি কায়েত, আর ও বামুন, তাই মালতীদের বাড়ী থেকে আপত্তি উঠেছিল। বিয়ের পর আমি কোলকাতায় চলে আসি, মালতীর খোঁজ করে বের করি ওকে। ওর স্বামী যখন বাড়ী না থাকতো—আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো; আমি যেতাম, গল্পগুজব করতাম।

সহকারী মাঝখানে একবার বলে উঠলো—পাগল।

অসিত বলে চলেছে তখন—একদিন সেই নরপাষণ্ড মালতীকে সন্দেহ করে মারধোর করে। পরে ওদের বাড়ীর ঝি সব ঘটনা বলে দেয় মালতীর স্বামীর কাছে, এবং সেদিন থেকে আমাকে খুব সাবধানে যেতে হত—আর মালতীর ওপরও মারধোর চলতে লাগল প্রচুর। তাই আমি আজ—

এখানে অসিত একটুখানি চুপ করে গেল, পরে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে বললে—কাল রাত্তিরে যে মালতীদের বাড়ী গিয়েছিলাম—আর ফিরি নি, আজ সকালের দিকে এই ঘন্টাখানেক কি আধঘন্টা আগে আমি সেই নর-পাষণ্ডকে নিজের হাতে খুন করে এসেছি। আমার ও মালতীর মধ্যেকার কাঁটা সরিয়ে ফেলেছি।

সহকারী এবং নার্স—দুজনেই ঈষৎ চমকে উঠলো।

অসিত বললে—খুন করে ভেবেছেন যে পালিয়ে বাঁচবো—তার উপায় নেই, সে ব্যাটা মরেও আমাকে ছাড়ছে না; আমার পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা জ্যান্ত মানুষ যদি ফলো করে তবে তার হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু ভূত যখন পিছু নেয়, তখন নরকে না গিয়ে উপায় নেই। ওই দেখুন নাম করতে না করতেই ব্যাটা এসে হাজির, ওই জানলা টপকে নামলো। গলায় লাল ফিতে বাঁধা ওই যে ছুরিটা—ওটা দিয়েই ব্যাটাকে সাবড়ে দিয়েছি।

অসিত দেখলো মালতীর মৃত স্বামী বীভৎস চেহারায় এসে হাজির হল। গলায় ঝুলছে সেই ছুরি, চোখে মুখে প্রতিহিংসা নেবার একটা হিংস্র ভাব। অসিত ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

নরপাষণ্ড স্বামীটা—যার নাম জীবিতকালে নরনারায়ণ ছিল, হেসে উঠলো, অট্ট হাস্য করলো, তার পর বললে—তুমি চমকে উঠছো কেন বন্ধু। জীবন্ত অবস্থায় তুমি আমার সব চেয়ে বড় শত্রু ছিলে—তাই মরার পর তুমি হলে আমার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। তোমাকে কি এখন চোখের আড়াল করতে পারি? যতই আমাকে ভূত বলে উড়িয়ে দাও—আমি তোমার পিছু ছাড়ছি না। কোন্ মানুষটা না পৃথিবীতে ভূত?

অসিত চীৎকার করে উঠলো—তুমি দূর হও আমার সামনে থেকে, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

নরনারায়ণ বললে—সেটা সম্ভব হয় কি করে? ভেবেছো আমাকে খুন করে তুমি তোমার পথের কাঁটা তুলে ফেলবে—কিন্তু তা কখনো হয়?

অসিত অসহায়ের মত বললো—আমি খুন করেছি আমি জেলে যাবো, বিচারে সাজা যা হবে, আমি তা ভোগ করবো—তোমার কবল থেকে মুক্তি চাই।

তা হয় না বন্ধু, এখন থেকে ছায়ার মত আমি তোমার পিছু পিছু ঘুরবো।—ব্যঙ্গ করে উঠলো নরনারায়ণ।

এমন সময় হঠাৎ মালতীর আবির্ভাব ঘটলো। কস্তাপাড় শাদা ধবধবে একখানা শাড়ী পরণে, সুশ্রী লাবণ্যময়ী চেহারা সুডৌল দেহসৌষ্ঠব—মনোরম পরিবেশ রচনা করার পক্ষে মালতী অপরিহার্য্য; কিন্তু এ রকম সময়ে মালতীর আকস্মিক প্রবেশে অসিত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো। সে বললে—তুমি এখন এলে কেন? দেখছো না পাষণ্ডটা আমাকে ছাড়ছে না, মূর্ত্তিমান যমের মত পিছু নিয়েছে।

মালতী কাতরতার সঙ্গে বলে উঠলো—কিন্তু কেন তুমি ওকে খুন করতে গেলে? আমরা ত' ছিলাম ভালো—ভবিষ্যতে নিষ্কণ্টক জীবনযাত্রার স্বপ্ন রচনা করে দিন কাটছিল, সেই রঙীন সাধের মর্ম্মমূলে কেন তুমি কুঠার হানলে?

নরনারায়ণ একবার কটাক্ষ করলে।

অসিত চীৎকার করে উঠলো—আমি ফাটকে যাবো, পুলিশের কাছে আমি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে জেলে যেতে চাই। তোমার মমতা এবং প্রেম আমার বাকী জীবন অতিক্রমের পথে পাথেয় স্বরূপ হোক—এই কামনা করি।

মালতী বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললে—এ তুমি কি বলছো?

নরনারায়ণ ঈষৎ হেসে লঘুভাবে টেনে টেনে বললে—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই, এই হতভাগ্য লোকটি তোমার বাকী জীবনের সাথী হতে পারবে, তোমার জীবনের পথ ও পাথেয় দুটোই ত' এখন আমাকে কেন্দ্র করে রচনা করতে হবে।

অসিত আর্ত্তস্বরে পুলিশ পুলিশ বলে হাঁক পাড়তে লাগলো। আত্মসমর্পণ করে কৃত অপরাধের যোগ্য সাজা নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

অসিত ডেন্টিষ্টকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কি বলেন ডাক্তার বাবু? দোষ স্বীকার করে আত্মশুদ্ধি করাটাই ভালো নয় কি?

জানালা টপকে পুলিশ এসে হাজির হলো। অসিত তার কাছে নরনারায়ণকে খুন করার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা ব্যক্ত করার পর তাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে অনুনয়বিনয় করতে লাগলো।

পুলিশ বিভাগীয় লোকটি রসিক ছিল কি না জানা যায় নি, সে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে—তোমার দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসে মাথার অসুখের চিকিৎসা করালেও বোধ হয় উপকার হত। পাগল কোথাকার।

অসিত বললে—পাগল কাকে বলছেন মশায়? এ রকম পরিষ্কার কনফেসন আর কোথাও পাবেন না, আমি সত্যিই ওই রাস্কেলটাকে খুন করেছি।

পুলিশ ডেন্টিষ্টকে উদ্দেশ করে বললে—দাঁত তুলছেন কি—এর মাথার গণ্ডগোল সারাবার ব্যবস্থা করুন। এই বলে পুলিশটি সেই জানালা টপকে বেরিয়ে গেল।

নরনারায়ণ এতক্ষণ পরে কথা বললে—এখন আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। সারাজীবনটাই তোমাকে অনুতাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে, আর আমি উপস্থিত থাকলে সেই বোঝার ভারটাও বেশ বেড়ে যাবে, সুতরাং দোষস্খালন করে আত্মশুদ্ধি ঘটার পথে কোনো অন্তরায় থাকবে না।

মালতী বলে উঠলো—কেন তুমি ওকে খুন করলে—তোমার আমার ভবিষ্যৎকে দিলে চুরমার করে। পল্লীর ছায়াতলে নিভৃত কোনো কুটিরে সুখী দুটি কপোত-কপোতীর জীবন থেকে কেন বঞ্চিত করলে আমাকে!

নরনারায়ণ বললে—তোমাকে ঠিক বঞ্চিত করেনি, প্রতারিত হয়েছে ও নিজেই,—তোমার হয়তো জীবনে ফের ঔজ্জ্বল্য আসতে পারে—

অসিত কাতরভাবে ডেন্টিষ্টের হাত চেপে ধরলে, বললে—ডাক্তারবাবু, যে ছুরিটা দিয়ে মাড়ী চিরে দিচ্ছেন, ওটা আমার বুকে বসিয়ে দিন, গলায় বসিয়ে দিন, শেষ করে দিন আমাকে। আপনি যদি না পারেন—আমার হাতে ছুরিটা দিন, আমিই শেষ করে দিই নিজেকে।

নরনারায়ণ বাধা দিয়ে বললে—তাই কি কখনো হয়? মরতে তোমাকে আমি দিতে পারি না। তুমি যে এখন আমার সারাক্ষণের জ্ঞাতাত।

সহকারী বললেন—ভদ্রলোক খুব ভুল বকতে পারেন।

ডেন্টিষ্ট জবাব দিলেন—কারুর কারুর এ রকম ঘটে। সেন্স্ ফিরে এসেছে।

অসিত চোখ মেলে চাইলো—দেখলে ডেন্টিষ্টের হাতে শাদা চাদরটায় খানিকটা রক্ত লেগে রয়েছে। সে চীৎকার করে উঠলো—রক্ত? রক্ত এল কোথা থেকে?

সহকারী তাকে শান্ত করে বললে—ভয় নেই, ও রক্ত আপনারই মাড়ীর। অনেকটা চিরেও মাড়ীতে পুঁজের খোঁজ পাওয়া যায়নি, তাই এ দিকে ও দিকে অনেকটা

কাটতে হয়েছে—তাতেই রক্ত লেগে গেছে খানিকটা। ভয় পাবার কিছু নেই।

ডেন্টিষ্ট নানারকম ডাক্তারী নির্দ্দেশ দান করলেন। অসিত যথাযথ ফীজ দেবার পর বললে দেখুন ডাক্তারবাবু, বলতে বাধা নেই, আমি একটু আগে একজন মানুষকে খুন করে এসেছি। টাটকা, জীবন্ত একটা লোককে—

হেসে ফেললেন ডেন্টিষ্ট, বললেন—ঠিক আছে। ও রকম খুন আমরা রোজ হাজারটা হতে দেখছি মশাই। আপনি ত' শুধু চীৎকার করেছেন, ভুল বকেছেন, হাত পা ছোঁড়েননি তেমন—এর চেয়ে ঢের ঢের খুনী আসামী আমরা দেখেছি মশাই। অ্যানেসথেসিয়া দিলে অনেকেরই ও রকম হয়।

অসিত অসহায়ভাবে বললে—না, না, সত্যিই বলছি, কোন রকম লুকোচুরি না রেখেই আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি।

নার্সটি নিজের কাজ করছিল, এতক্ষণে সে সরু গলায় বললে মিষ্টি ভাবে—আমরাই মিথ্যে বলছি নাকি? আরো সাংঘাতিক খুনীকেও দেখেছি—তারাও এ ভাবে স্বীকার করে যায়, সুতরাং আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

কি আর বলবে অসিত? সে শুধু নার্সের দিকে চেয়ে দেখলে। বেশ দেখতে নার্সটিকে, অনেকটা মালতীর মতই, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, চোখে মুখে মিষ্টি মিষ্টি একটা সৌরভ যেন ছড়ানো রয়েছে।

হে ভারত

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

তোমার কাছে তো অনেক কিছুই প্রত্যাশা করেছিলাম
অনেক শোণিত রাঙানো দিনের মূল্যের বিনিময়ে ;—
অনেক জীবন সঁপেছি তোমার পায়ে
চোখ কাণ বুজে সয়ে গেছি কত নির্ম্মম আচরণ ঃ
হিসাবনিকাশে আজ হেরি একি তুচ্ছ জিনিষই পেলাম!
(এতোদিন ছিনু যে তমঃ বিবরে
তাহাতেই রহিলাম)!
অগ্নিযুগ আর বিয়াল্লিশের স্বপ্নের সঞ্চয়
বুঝি হায় তারা জলের হরফে লিখা।
(প্র[illegible]বির আগুন আভায় সকলি পেয়েছে লয়)!
তাই [illegible]জ মনে হয় ঃ
এখ[illegible] কুটিল সাপেরা রয়েছে অক্ষত অক্ষয়,
এখনও পিশাচ অট্টহাসিতে ফুকারিছে উল্লাস,
এখনো ব্যথার বহে যে দীর্ঘশ্বাস।
জনতার প্রাণ পুড়ে পুড়ে সস হয়ে গেল অঙ্গার
বুকের পাঁজরে গাঁথা হলো হায় ধূসরাভ এ-পাহাড়!

* *

হে ভারত শুধু সঙ্গোপনেই ফেলিবে নয়ন-নীর
বলিতে কি পারো কবে হবে শেষ
তপঃ অমারাত্রির ?—
লক্ষ কোটির কণ্ঠেতে আজি ব্যাকুল এ-জিজ্ঞাসা।
হে ভারত শুধু দুই কাণে শুনে যাও—
জাগায়ে তুলিতে পারো নাকি হায় ক্ষীণতম আশ্বাস ?

জাতীয় সম্পদ

['সাকী' অবলম্বনে]

আশা দেবী

বেড়ালের ভাগ্যেও সিকে ছেঁড়ে।

তাই শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎ একদিন সে পেয়ে গেলো পিসিমার দুশো পাউণ্ডের সম্পত্তি।

সপ্তাহে এক পয়সার সংস্থান ছিলো না, তাতে দুশো পাউণ্ড? এত টাকা নিয়ে কি করবে তাই সে ভেবে পেল না প্রথমটা, তারপর মনে করলে—বিদেশ-ভ্রমণ করলে মন্দ হয় না। সোজা সে চলে গেল ইটালীতে।

দিব্যি দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা। প্রাচীন রোমাণ সভ্যতার অজস্র ধ্বংসাবশেষ। চমৎকার দিন কাটছিলো, কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা বদখেয়াল চাপলো।

উল্কি আঁকার ব্যাপারে ইটালী বিখ্যাত। তারও সখ হলো সে উল্কি আঁকাবে। রোমের সেরা শিল্পীকে সে বায়না করলো তার পিঠ জুড়ে উল্কি আঁকবার জন্য।

মাসের পর মাস ধরে সারা পিঠে এক বিরাট উল্কি তার তৈরী হলো। বিষয় বস্তু ছিলো বোধ হয় ইকারাসের পতন। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিধ্বস্ত বেবিলন নগরী।

সবাই বলে—সাবাস। এমনটি আর হয়নি, হবে না। উল্কি শিল্পের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

কিন্তু জীবনের সেরা কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীর হলো স্বর্গলাভ। অতএব শিল্পীর স্ত্রী এসে পারিশ্রমিক দাবী করে বসলো দুশো পাউণ্ড।

সম্পত্তিই তো মাত্র দুশো পাউণ্ড। তা কবে উড়ে গেছে। সুতরাং সে ঋণ শোধ করতে পারল না। দিন কতক ঝগড়া ঝাঁটি করে শিল্পীর স্ত্রী তার স্বামীর শেষ কাজটি দান করে দিলো ইটালীর জাতীয় সরকারকে।

আর এইখান থেকেই বাধলো যত ল্যাঠা।

তার পিঠ আর এখন তার নয়, এটা এখন ইটালীর জাতীয় সম্পদ। তার চারদিকে সশস্ত্র পাহারা বসলো। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোক তার পিঠ দেখতে আসতে লাগলো। বারে বারেই তাকে জামা খুলতে হয়। তার পিঠের ওপর আঙুল রেখে হাজার হাজার লোক তর্ক করে ঝগড়া করে আলোচনা করে। দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই। খোলা পিঠ নিয়ে রোদে দাঁড়াতে পারে না, পাছে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। সমুদ্রের জলে স্নান করতে পারে না পাছে নোনা জলে চিত্রের রং জলে যায়। গরমের দিনে মোটা কোট পরে থাকতে হয়। হিহি করা শীতে পিঠ খুলে বসে থাকতে হয় দর্শকদের জন্যে। সে পাগল হবার উপক্রম করলো।

তার পিঠের উল্কি নিয়ে সারা বিশ্বের শিল্প-রসিকদের মধ্যে চলতে লাগলো তর্কের কচকচি। এক শো জন প্রবন্ধ লিখলেন। বারো শো জন মোটা মোটা বই লিখলো। দুজন আত্মহত্যা করলো। ফটোগ্রাফারের দল ক্যামেরা নিয়ে তার পেছনে তাড়া করে ফিরতে লাগলো।

জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনবার সে ইটালী ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। তিনবারই তাকে ফিরে আসতে হলো সীমান্ত থেকে। ইটালীর জাতীয় সম্পদ নিয়ে তার চলে যাবার কোনো অধিকার নেই।

মনে মনে সে মৃত্যু কামনা করতে লাগলো।

মুক্তি অবশ্য এলো শেষ পর্য্যন্ত। একদিন এক মদের আড্ডায় ঝগড়া করতে করতে একটা গুণ্ডা গোছের লোক ঢেলে দিলো তার গায়ে এ্যাসিড।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সে অচেতন হয়ে পড়লো। পনেরো দিন পরে যখন সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো তখন তার পিঠ থেকে সেরা শিল্পীর শিল্প চিরতরে মুছে গেছে।

আর তার পরের দিনই ঘাড় ধরে তাকে ইটালীর সীমান্ত পার করে দেওয়া হলো। আর যে লোকটা এ্যাসিড ঢেলেছিলো তার হলো দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

আর সে?

সে এখন লণ্ডনে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু রোজ সে দুবেলা লণ্ডন মিউজিয়ামের সামনে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা জন্মেছে, সে মাইলো দ্বীপের ভেনাস মূর্ত্তি। কবে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভেতরে সাজিয়ে রাখা হবে, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করছে সে।

বিনোদিনী দাসী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিনোদিনী

এবারে একজন গুণশীলা, বিত্তাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার কাহিনী আপনাদিগকে বলিব। এক সময়ে ইনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রেইস এণ্ড রাইয়তের সম্পাদক বঙ্কিম-বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে Primadonna of the Bengali Stage বলিয়া অভিহিত করিতেন।

আমি যখন তাহাকে প্রথমে দেখি তখন তাহার ষষ্টিতম বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোপালেই তাহার প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বড়ই ভাগ্যবতী রমণী ছিলেন। পূজ্যপাদ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে ফললাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্ব্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছিলেন।"

বহুদিন হইল বিনোদিনী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আজ তাহার সম্বন্ধেই কেবলমাত্র কিছু স্মৃতিকথা পাঠককে উপহার দিব।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী লিখিবার সময় বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার আগ্রহ হয়। বিশেষ প্রয়োজনও হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার একখানি আত্মজীবনী আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বহিখানি পড়িয়া স্থানে স্থানে বর্ণনা-বৈচিত্র্যে এমন ভাব-সংঘর্ষ দেখিলাম, যে, মনে হইয়াছিল ইনি তো নাটক লিখিতেও সক্ষম! কিন্তু ৫।৭ বৎসর দেখা হইবার কোন সুযোগ হয় নাই। অবশেষে একদিন উহা হাতের কাছে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

গত ১৯২৪ সালে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "রূপ ও রঙ্গ" সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। বিনোদিনী তাহাতে "আমার অভিনেত্রী জীবন" প্রবন্ধে থিয়েটারের পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখেন। উক্ত কাগজে প্রথম সংখ্যা হইতে আমারও অনেক প্রবন্ধ বাহির হয়। ষ্টার থিয়েটারের নিকটেই বিনোদিনী থাকিতেন। অধ্যক্ষ অপরেশবাবু ছিলেন আমার অন্যতম বন্ধু। আমি প্রায়ই তাহার কাছে যাইতাম। একদিন তিনি ও গিরিশ-জীবনী লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিনোদিনীর বাড়ী লইয়া যান। ঐ দিন হইতেই বিনোদিনী আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। একবার আমার কালীঘাটের হালদার পাড়ার বাসায় আসিয়া আমার সহধর্ম্মিনীকে কতগুলি মূল্যবান জিনিষ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াও যান।

বিনোদিনীর পুত্রকন্যা আত্মীয় কেহ ছিল না। তবে এত বড় সংসারী কাহাকেও দেখি নাই। বিনোদিনী একটি মেয়ে লালন-পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। এই মেয়ের ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাতনী প্রায় ১৬।১৭টিকে লইয়া বিনোদিনী তাহার নিজ বাড়ীতেই বাস করিত। আর উপরে ছাতের দিকে থাকিতেন "শ্রীশ্রীগোপালজী"।

বিনোদিনী গোপালের সেবায় নিরত থাকিতেন এবং গোপালের প্রসাদেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। নাতী-নাতনী-দিগকে বিনোদিনী শিক্ষা দেন, একটি নাতী কলিকাতা পুলিশের দারোগা। আর একটি এটর্ণি অফিসে কাজ

করেন। তাহাদের সঙ্গে অনেদিন দেখা হয় নাই। সকলের খরচই তিনি নিজে বহন করেন। বাড়ীভাড়ার আয়ই তাহার মুখ্য আয় ছিল। বাড়ীও ছিল নিজের বাসেরখানি ছাড়া আরও দুইখানা।

যেদিন প্রথমে তাহার বাড়ী ৪ নম্বর রাজাবাগান ষ্ট্রীটে উপস্থিত হই, তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া আত্মকাহিনী—"আমার অভিনেত্রী জীবন" লিখিতেছিলেন। দেখিলাম হাতের লেখাও বড় সুন্দর। আমাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কেবল গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধেই নয়, রঙ্গালয়ের যাবতীয় আভ্যন্তরীন বিষয়েই অবগত হই। ইনি এবং স্বর্গত চুনীলাল দেব ও ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা না হইলে রঙ্গালয়ের ইতিহাস কেবল ভাসাভাসা হইত। অমৃতলাল, অপরেশবাবু প্রভৃতির সঙ্গেও সম্প্রীতি ছিল, কিন্তু অতো ভিতরের কথা জানিবার অবকাশ হয় নাই, আজ উক্ত তিনজনের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে।

এই সময়ে (১৯২৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় দৈনিক ইংরাজী কাগজ "ফরওয়ার্ডে"র আমি মঞ্চ ও পর্দ্দার সম্পাদক ছিলাম। কোন এক সপ্তাহে বিনোদিনী সম্বন্ধে তাহার অভিনয়ের পরিচয় প্রদান করি। কিছুদিন পরে "গিরিশ প্রতিভায়" তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হয়। অতঃপর তিনি আমাকে যে পত্রখানিতে তাহার স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তাহার আন্তরিকতা ও অদ্ভুত রচনা শক্তির পরিচয়ের জন্য এখানে চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীশ্রী৺হরিপদ ভরসা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়েষু, বাবাজীবন!

আমি আপনার লিখিত বাল্য ও কৈশোর এবং যৌবনের নাট্যজীবন পরিপূর্ণ উদ্যমের সহিত কার্য্য-কলাপের নানারূপ শিক্ষা, উৎসাহ ও প্রাণপরিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা পরম পূজনীয় গিরিশবাবুর নিকট হইতে আন্তরিক যত্নের দ্বারা ও তাহার পরিপূর্ণ আগ্রহের দরুণ বাল্যকালের একটি মাটির ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি অতি হীন বালিকা যে সমাজের অন্ধকার গর্ত্ত হইতে সভ্য সমাজের "সুধীগণ সম্মুখে আসিয়াছিলাম, তাহা আমার গুণই" গুণ নহে, সে সকলই সেই সম্মানিত, ৺শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশবাবুর উদ্যম ও আগ্রহে।

আমি প্রথমে ৺ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনালে যাই, পরে ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ আমায় লইয়া যান। তিনিও একদিন থিয়েটার দেখিতে আসেন ও আমায় লইয়া যান। গিরিশবাবু ছিলেন তখন বাগবাজার। একদিন বেঙ্গল থিয়েটার দেখিতে আসেন ও বলেন যে, এই মেয়েটিকে আমায় যদি দেন, আমি একটি থিয়েটার করি। তিনি রাজী হইয়া স্বীকার করিলেন। সেই হইতেই "ন্যাশনাল থিয়েটার" নামে ভুবনবাবু যে থিয়েটার করেন, সেই থিয়েটারে তিনি আমায় লইয়া গিয়া নগণ্য বালিকা জীবনকে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা নানারূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করিয়া নানারূপ সংশোধিত করিয়া এই সভ্য জগতের সুধীগণ সম্মুখে আমাকে আনিয়াছিলেন। ইহা তাহারই গুণ-গরিমার ফল। আজ বহুদিন হইল সে সকল কথা অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কাহার স্মরণ ছিল, কাহারও ছিল না। এখন এই ফরোয়ার্ড পত্রিকায় আপনার হস্ত-লিখিত সেই পূর্ব্বের কত কালের আধারনিহিত সত্য ও সরল ভাষায় পূর্ণ লেখায় কত লোক কত পড়িয়া কত আন্দোলন করিতেছে। তাহা কেবল আপনার প্রতিভার গুণে এবং যে সকল কথা পাছে লোকের অপ্রিয় হইবে মনে করিয়া বড়লোক তাহা প্রকাশ করে নাই, তাহা আপনি সরলচিত্তে যে প্রচার করিয়াছেন, সেজন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। আর একটি কথা। আমার "আমার জীবনীতে" গিরিশবাবু যখন ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, এই ষ্টার সম্বন্ধে তো সব সত্য লেখেন নাই, কেন? তিনি উত্তর দেন, আমি উঁহাদের অধীনে কার্য্য করি এবং, আমার উপর সকলেই ঈর্ষান্বিত। তোমার কার্য্য অবিদিত থাকিবে না, এখন অন্তরে অন্তরে আছে। একদিন সকল সত্য প্রকাশিত হইবে। তুমি দুঃখিত হইও না। আজ সেই স্বর্গগত মহাজনের বাক্য আপনার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া

সুধীসমাজে প্রতিপন্ন হইল। ইহার কিছুই মিথ্যা নাই। হয়তো কাহারও কথায় আপনার মনে 'কিন্তু' ভাব আসিবে, সেই কারণ আমি এই সরল ভাবে লিখিতেছি, যে সকল কথা গিরিশবাবু লিখিতে পারেন নাই, তাহা আপনার প্রকাশিত হইয়া সেই গিরিশবাবুর ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হইল। এক্ষণে আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সেইসব পূর্ব্বস্মৃতি আজ জীবনের সন্ধিস্থলে হয়তো আমার স্মৃতিলোপ না হইবার জন্ত যে একজনও এ ভাগ্যহীনাকে তুলিয়া রাখিবার প্রয়োজন অনুসারে চেষ্টা করিবেন, এ বিশ্বাস লইয়া জগৎ হইতে চলিয়া যে যাইব, সেজন্য অন্তরের উচ্ছ্বাস জানিবেন। যদি কখনও কেহ ইহার উপর আঘাত দিয়া কোন কথা বলেন, তাহা হইলে আপনি ইহা বলিতে পারিবেন, যাহা সত্য তাহা গোপন থাকে না। অধিক কি বলিব? আমার শরীর ভাল নাই। দুই-পায়ে বেদনা ও জ্বরের মত হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া আমি যে ড্রেফট্‌ করিয়া রাখিয়াছি, সেই উইলখানা একবার দেখিয়া দিবেন, আমার এই নিবেদন। ইতি—সন ১৩৪২ সাল, ১১ই শ্রাবণ।

আপনার মাতৃস্থানীয়—শ্রীবিনোদিনী দাসী।

পুঃ—আর কয়েকটি মৌখিক জানিবারও আছে। আমি বড়ই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, কি করিব, একটু উপদেশ দিবেন, ইহাই মনের বাসনা।

আরেকখানি পত্র—

শ্রীশ্রী৺গোপালজী চরণ ভরসা।

মঙ্গলবার, ৩০শে শ্রাবণ। ৪ নম্বর রাজাবাগান ষ্ট্রীট।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়—

মহাশয়,

বহু দিবস কোন সংবাদ পাই নাই। এবং নানা জড়তায় জড়াইয়া আপনিও জড়িয়াছি। মনের উৎসাহ নাই। সে কারণ—

এক্ষণ আমি সম্প্রতি একটি বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি। আপনার পরামর্শ বড় প্রয়োজন। যাব যাব ক'রে আপনার নিকটে যাইতে সময় হইতেছে না। বিশেষ নানারূপ ঝঞ্ঝাট। আমার বড় বাটী লইয়া একটি বড় গোল হইতেছে। ঐ বাটীর ভাড়াটিয়ার সহিত বিবিধ দুটি চারিটি কথা জানিবার বড় প্রয়োজন। অনুগ্রহ ক'রে আজ বা কল্য প্রাতে আপনার সহিত দেখা করার বড় প্রয়োজন। গতকল্য রাত্রে মণীন্দ্রের বড় জ্বর হইয়াছে; প্রায় অচৈতন্য হইয়াছে। আমি যেতে পাচ্ছি না অথচ বড় প্রয়োজন আপনার সহিত দেখা করিবার। অদ্য সন্ধ্যার পর, কি কল্য সকালে অনুগ্রহ করিয়া যদি একবার দেখা করেন। যাওয়া আসায় যে কষ্ট ও দেরী, কিন্তু আমার প্রয়োজন অতিশয়—আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আপনি আমার শত শত আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আমি বিপদে পড়িলে বড়ই আপনার ভরসা করি। অতি অবশ্য একবার দেখা করিবেন। বড়ই প্রয়োজন জানিবেন। অদ্যই দেখা হইলে ভাল হয়। মণির অসুখের দরুণ মন বড়ই চঞ্চল আছে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

আপনার মা।

দময়ন্তী বেশে বিনোদিনী

এরূপ আরও অনেক পত্র আছে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন তাহার সম্বন্ধেই লিখিতেছি—বিনোদিনী তাহার "জীবন-স্মৃতিতে" লিখিয়াছেন—

"গরীবের মেয়ে ছিলাম। একটি ভাই ছিল, সে ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমরা জাত-বৈষ্ণব ছিলাম। চার-পাঁচ বছর বয়সেই আমাদের তখন বিয়ে হ'ত। আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এই পর্য্যন্ত, স্বামীকে আর কখনও দেখিনি। বিয়ে দেওয়া একটা রীতি ছিল ব'লেই বোধহয় বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। মা তো ভাল ক'রে প্রতিপালন করতে পারতেন না, পাড়ার অবৈতনিক স্কুলে কিছু কিছু পড়তাম, আর খেলা ক'রে বেড়াতাম। মা-ই জোর ক'রে থিয়েটারে দিয়েছিলেন। যদি পেটের ভাত ক'রে খেতে পারি, এই জন্ত।

"প্রথমে আমাকে দ্রৌপদীর পরিচারিকার ভূমিকা দেওয়া হয়, আমি বেরিয়েই দ্রৌপদীকে প্রণাম ক'রে হাত জোর ক'রে, যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই আমার বক্তব্য যা ব'লে গেলাম। খুব সাজ-পোষাক পরা গর্ব্বিতা পাণ্ডবমহিষীর সামনে যেমন সঙ্কুচিত হয়ে ব'লতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনি আমার হয়ে পড়ল, দর্শকদের দিকে ফিরেও চাইনি। কিন্তু তারা আমার অবস্থা দেখে দয়া করেই হোক, কিম্বা যে কারণেই হোক, আমার বক্তব্য শেষ হ'লে আমায় খুব হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন। আমি কোন রকমে কাজ সেরে ভেতরে আসতেই ধর্ম্মদাসবাবু আমার পিঠ চাপড়ে বলেন, "চমৎকার হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে ইত্যাদি।" সেই কথা মনে হ'লে এখনও চোখ সজল হয়ে উঠে। ধর্ম্মদাসবাবু বললেন, "যা যা পোষাক ছেড়ে ফেলগে যা।" লাফাতে লাফাতে সাজ ঘরে গেলুম। যেন দিগ্বিজয় ক'রে চলেছি। এই আমার অভিনেত্রী জীবনের প্রথম পার্ট।"

বিনোদিনী যে সময়ে থিয়েটারে আসেন,তখন তাহার বয়স ১০বৎসর হইবে এবং গঙ্গামণি (পরে ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা) তাহাকে লইয়া যায়। ইহার পরে ১৮৭৫ সালে গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী লইয়া ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় এলাহাবাদ, মীরাট, লাক্ষ্ণৌ, মথুরা, লাহোর প্রভৃতি সহরে যান। অভিনেতাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, অবিনাশ কর ছিলেন, আর অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমণি দেবী, কাদম্বিনী, নারায়ণী, লক্ষ্মী, বিনোদও সঙ্গে গিয়াছিল এবং খুব ছোট বলিয়া সম্প্রদায় তাহার মাকেও সঙ্গে লইয়া যায়। বিনোদিনী এখানে কামিনী, কাঞ্চন, সরলতা প্রভৃতি করিত। সকলে বলিত, "তোকে একটু বড় ক'রে গড়ে নিলে ভাল হয়।"

লাহোর সম্বন্ধে বিনোদিনীর কথার মধ্যে পাই—

"অভিনয়ের পর একটি সভা হয়, আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জলের মধ্যে লাহোরবাসীদের কাছে বিদায় নিই।…

"আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং বলে একজন মস্ত লোক সেখানে ছিলেন, তাঁকে সবাই রাজা বলে ডাকৃত। তাঁর খেয়াল হ'ল আমায় তিনি বিয়ে ক'রে জাতে তুলে নিবেন। মাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর একথাও বল্লেন—মা যদি সেখানে থাকতেও চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই; মাকে তিনি ৫০০৲ টাকা করে দেবেন। মা ত কেঁদেই অস্থির, তাঁর ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে নেন। ধর্ম্মদাসবাবু তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, 'না গো ওরা ভদ্রলোক, ওরা অসদ্ব্যবহার ক'রবে না। আর আমরাও শীগ্‌গির চ'লে যাচ্ছি, ভয় কি?' আমি সিংজীকে দেখেছিলুম, খুব সুন্দর, কিন্তু যে তার লম্বা দাড়ি! দেখেই ভয় হ'ত, আমি ছোট বেলা দাড়িওলা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না।

লক্ষ্ণৌতে সম্প্রদায় কিরূপ বিপদে পড়েন, সে সম্বন্ধেও বিনোদিনী লিখিয়াছেন যে, যখন তোরাপ রোগ সাহেবকে প্রহার করিতে থাকে, স্থানীয় ইউরোপীয়গণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে। সেই দিনই পুলিসের সহায়তায় সম্প্রদায়কে ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়। সাহেবদের সর্ব্বত্রই তখন অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। ফিরিয়া আসিবার পরে ধর্ম্মদাস বাবু ছাড়িয়া দেন, উপেন্দ্রনাথ দাস হন ডিরেকটার ও অমৃত বসু ম্যানেজার। অতঃপরে শরৎ

সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী নিজ ভূমিকায় সাফল্য লাভ করিলেও, তখন পর্য্যন্ত তাহার বয়সের অল্পতায় নায়িকার ভূমিকা পান নাই কিন্তু সরোজিনী নাটকে "সরোজিনী" ভূমিকায় বড় অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেন।

১৮৭৬ সালে গ্রেটন্যাসনাল থিয়েটার মামলা মোকদ্দমায়, নানা গোলযোগে ও অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্ত উঠিয়া যায়। বিনোদিনী তখন বেঙ্গল থিয়েটারে চলিয়া যায়। সেখানকার স্বত্বাধিকারী শরৎ ঘোষ মহাশয়ের শিক্ষা ও ব্যবহারের প্রশংসা বিনোদিনী খুব করিত। বিনোদিনী তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছে এবং আমার নিকটে চিঠিতে সেই কথা পুনরুক্ত হইয়াছে যে গিরিশ বাবু শরৎ ঘোষ মহাশয়ের নিকট চাহিয়া বিনোদিনীকে নূতন দল করিতে নিয়া আসেন। এ বিষয়ে গিরিশ বাবু ঐ জীবন চরিতের ভূমিকায়ই লিখিয়াছেন :

"বিনোদিনী হয়তো কেদার বাবু বা অন্ত কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্ত একথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসার পর, এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল, তাহা বহুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই।"

যাহা হোক গ্রেটন্যাসনাল থিয়েটারেই বিনোদিনীর প্রতিভার স্ফুর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়। গ্রেটন্যাসনালে গিরিশ চন্দ্র প্রথমে মৃণালিনী অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং তিনি হন পশুপতি। এই ভূমিকা হইত একেবারে অপূর্ব্ব। সে সব কথা আমি অন্তস্থানে লিখিয়াছি। অতঃপর কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বেঙ্গল থিয়েটারে যান, সেখানেও মৃণালিনী অভিনয় হয়। বিনোদিনীর এখানে মনোরমার ভূমিকায় অভিনয় নাকি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও মুগ্ধ করে। বঙ্কিমবাবু নাকি লিখিয়াছিলেন, "আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে প্রত্যক্ষ দেখিব

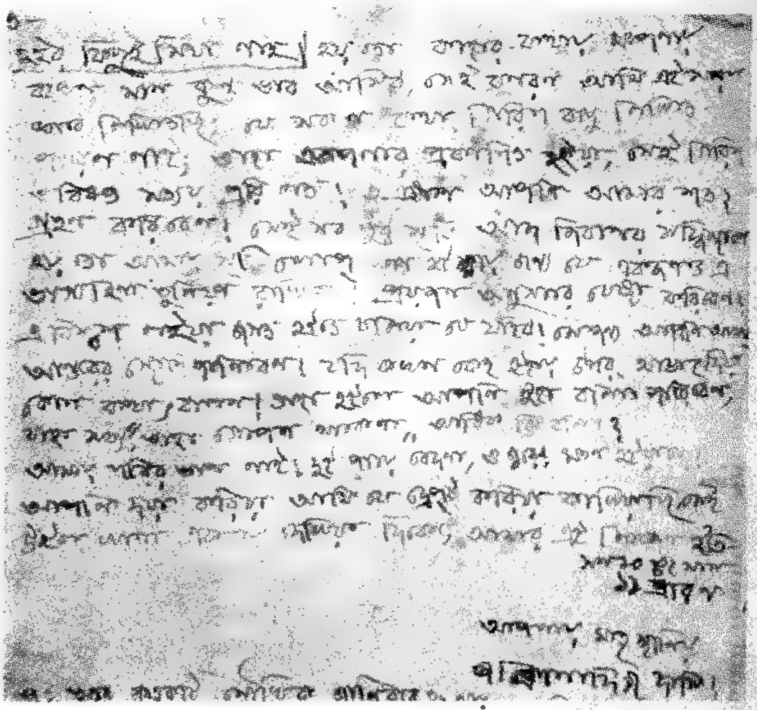

বিনোদিনীর হস্তলিপি

আশা করি নাই, আজ বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।" এ কথার অন্ত কোন পোষক প্রমাণ না থাকিলেও অভিনয় যে বঙ্কিম-চিত্রিত চরিত্রের মতই হইত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্র কেদার চৌধুরীর সহায়তায় নিজ নামে লিজ লইয়া গ্রেট ন্যাসনাল মঞ্চে সম্প্রদায়ের নাম "ন্যাসনাল" দিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন এবং এখানেই গিরিশচন্দ্রের প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বিনোদিনীর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। অমৃত মিত্রও ছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রিয়তম ও বিশেষ কৃতী ছাত্র। ক্ষেত্রমণি দেবী, কাদম্বিনী, মতিসুন্দরী, মহেন্দ্র বসু, অমৃত মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু) রামতারণ সান্যাল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী অভিনেতৃ মণ্ডলী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ

করেন। প্রথমেই 'আগমনী' লইয়া আরম্ভ হয় ১৮৭৭, ৬ই অক্টোবর বিনোদিনী করেন উমা, মেঘনাদবধে করেন প্রমীলা, গিরিশবাবু করেন রাম ও মেঘনাদ, 'পলাশীর যুদ্ধে' গিরিশ বাবু ক্লাইভ, ব্রিটোনিয়া বিনোদিনী, 'বিষবৃক্ষে' গিরিশবাবু নগেন্দ্রনাথ, বিনোদিনী কুন্দ, দুর্গেশ নন্দিনীতে গিরিশচন্দ্র জগৎ সিংহ, বিনোদিনী আয়েষা। মৃণালিনী পুনরভিনীত হইলে গিরিশচন্দ্র হইতেন পশুপতি, বিনোদিনী মনোরমা। সকল ভূমিকায়ই বিনোদিনী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতেন।

এইবার গিরিশবাবুর পরিকল্পনায় বিনোদিনী-অভিনীত মনোরমা ভূমিকার পরিচয় দিতেছি। উক্ত বিনোদিনীর 'আমার জীবনে'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"মৃণালিনীতে আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ মনোরমা সাজিত, অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি, সমস্ত বলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল 'মনোরমার' কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি তাহার কারণ আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুর বর্ণিত সে বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী, আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদছ কেন?" বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা! হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতেই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া"—অসাধারণ অভিনয় চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে আসিয়া বঙ্কিম বাবু কি বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি বিনোদিনীর মনোরমার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনী'র মনোরমা বালিকা-ভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি কোন বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয় কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীরও উচ্চ প্রশংসাস্বরূপ। বিনোদিনী একবাক্যে দর্শকের নিকট সেই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।"

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "সাধারণী"তে লিখিয়াছিলেন—

"অভিনেত্রীদের মধ্যে গিরিজায়া ও মনোরমার অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কখনও মনোরমার হৃদয়ে বালিকা উন্মাদিনীর ছায়া, কখন প্রৌঢ়ার ভাবব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণে কৃতকার্য্যতা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী কপালকুণ্ডলার নাম ভূমিকায়ও নামিত। স্বর্গীয় কেদার চৌধুরী নাকি বলিয়াছিলেন, "এই মেয়েটি যেন প্রকৃত কপালকুণ্ডলা"—

—আমার কথা ৪৪ পৃঃ

এই বিষয়ে গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন: "এক্ষণে যাহারা দেখিতে যান তাহাদের ধারণা মতিবিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহাদের নিশ্চয় ধারণা যে কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে এই যে বাল্যাবধি স্নেহপালিতা না হওয়ায় নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীদের ন্যায় গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামীর বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেমন পিঞ্জর মুক্ত হইয়া বনে প্রবেশমাত্র বন্য বিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহাবদ্ধা কপালকুণ্ডলা অংশ অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই—পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল—এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দর প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল। এখন 'হীরার ফুলে'র অভিনয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনয় দর্শনে মনে হয় রতি "হীরার ফুল" গীতিনাট্যের নায়িকা। কিন্তু যিনি হীরার ফুলে বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাহার ধারণা যে হীরার ফুলে গ্রন্থকার রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়।

কিরূপ শিক্ষায় বিনোদিনী অভিনেত্রী-কুলশিরোমণি হইতে সক্ষমা হন, তাহার আত্মচরিতে আমরা সে কথার আভাস পাই।

বিনোদিনী বলেন—

"সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পাঠ থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পাঠ অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পাঠগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পাঠ মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বসু (ভুনীবাবু), আরও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের বড় বড় বিলাতী কবি—সেক্সপীয়ার, মিল্টন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাবভাবের কথা এক একজন করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়াপাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তিদ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্‌ট্রেস্ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজী থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাড়ী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি রকম দেখে এলে বল দেখি?" আমার মন যেখানে যেমন বোধ হইত তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আবার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সদুপদেশগুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি, আমি যেন সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত·········

"আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস্ সিডনস্ থিয়েটারে কার্য্য ত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন্

গোপা-বেশে বিনোদিনী

সমালোচক কোন্‌স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ এক্‌ট্রেস বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেন্‌টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম—কত বলিব—গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় 'অথরের' কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম।

"নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম। কল্পনার ভিতর আত্মবিসর্জন করিতে পারিতাম, সেই জন্য বোধ হয়, আমি যে পাঠ অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি, ইহা কখনও আমার মনে হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, আমি যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইতাম।

"আমি অতি শৈশবকালে অভিনয়-কার্য্যে ব্রতী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় যেন কেমন উচ্ছ্বাসময়ী করিয়া তুলিয়া ছিল। কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত।"

১৮৭৯ সালে গিরিশচন্দ্র অসুস্থতাবশতঃ থিয়েটার ছাড়িয়া কিছুদিন বাড়ীতেই থাকেন। বিনোদিনী থিয়েটারেই থাকে। ইহার পরে প্রতাপ জহুরী নামে একজন ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী গিরিশবাবুকে আফিসের চাকুরী ছাড়াইয়া থিয়েটারে স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট করে। গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতা ও প্রযোজনায় ১৮৮১ সালের 'হামির' লইয়া জহুরির থিয়েটার আরম্ভ হয়। গিরিশ হন হামির, বিনোদিনী লীলা।

অতঃপরে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মায়াতরু'তে ফুল হাসির ভূমিকা করেন। এখানে ফুলহাসির ভূমিকায় তাহার অভিনয়ের প্রশংসা লোকের মুখে আর ধরে না। রেইস ও রাইয়ত সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি বলেন—

"Binodini was simply charming."

"মোহিনী প্রতিমা"র রামতারণ সান্যাল,—হেমন্ত, বিনোদিনী করেন সাহানা। এই নাটকখানি গিলবার্টের Pygmalion and Galatea অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন। এই সময় সম্প্রদায় অভিনয় করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিল, Galateaর ভূমিকা করিতেন Miss Fanny Enson, গিরিশচন্দ্র শিষ্যবর্গকে লইয়া সেই থিয়েটার দেখিতে যান এবং বিনোদিনী মিস্ এন্‌সনের অভিনয় দেখিয়া ইংরাজ অভিনেত্রীর প্রতিভা যাচাই করিয়াছিলেন। 'আনন্দ রহো'তে বিনোদিনী লহনার ভূমিকা করিত। গিরিশ করিতেন আনন্দ রহো। গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই ম্যাকবেথ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতেই লেডী ম্যাক্‌বেথ তৈয়ার করাইবার জন্য কতকটা ভাব লেডী ম্যাকবেথের অনুকরণে লহনাতে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন।

ইহার পরে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতি নাটকেই নব নব ভাবে বিনোদিনীর প্রতিভা স্ফুরিত হইত। বিনোদিনীর শক্তি দেখিয়া ন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী প্রতাপ জহরি বলে—"বিনোদ তিল সমাত করতি" অর্থাৎ যাদু জানে,তিল অর্থে যাদু। রাবণ বধ ও সীতাহরণে বিনোদিনী হইত সীতা আর সীতার বনবাসে লব। ইনি এবং খোঁড়া কুসুম লব কুশ বেশে নাচিয়া নাচিয়া সে গানটি গাহিত—

"গাও বীণা গাওরে
গাও ইন্দু সনে, ক্ষীরোদ তীরে
অনন্ত শয়ন, অনন্ত নীরে
গাও বীণা গাওরে
ভক্তিপ্রবাহে পরাণ ভাসাও
গাও বীণা গাওরে"—

তাহা দর্শক অতিমাত্রায় উপভোগ করিত। জহরিও এতই খুশী হইল যে গিরিশবাবুকে অনুরোধ করে—

"ম্যানেজার সাব্, ফের নাটক লিখনা তো এই গানা জরুর দেনা।"

গিরিশচন্দ্র তাই "লক্ষ্মণ বর্জ্জনে"ও লব কুশের মুখে ঐরূপ গান আরোপিত করেন—

"কাঁদ বীণা কাঁদরে
গর্ভবতী সতী, সীতা নারী বর্জ্জন
নাম মধুর, রাম নিঠুর
কাঁদি বীণা গাও, হৃদয় ভাসাও
জানকী দুখ স্মরি,
কর ঘন রোদন
নিঠুর নারায়ণ
কাঁদ বীণা কাঁদরে।"

"রামের বনবাসে" কৈকেয়ীর অভিমান বিনোদিনী অদ্ভুত ভাবে পরিস্ফুরিত করিত। আবার অভিমন্যু বধের উত্তরার মৃদু ভূমিকায়ও খুবই অপূর্ব্ব অভিনয় করিত। মাধবী কঙ্কনে হইত হেমলতা। ইহার পরে হয় পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। অভিনয় চমৎকার হইত, কিন্তু অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহুরীর কাজ ছাড়িয়া দেন এবং অমৃত মিত্র বিনোদিনী প্রভৃতিও তাহার অনুগামী হন। উক্ত নাটকের অভিনয় হয় ১৮৮৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী, বিনোদিনী হন দ্রৌপদী।

গিরিশবাবুর চাকুরী ছাড়িবার অনেক কারণ ছিল—একটি কারণ বিনোদিনী কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাহার বেতন কাটা হয়। গিরিশচন্দ্র ইহাতে খুবই ব্যথিত হন আর জহুরির অর্থনীতিও ছিল বড় অনুদার। সকলে চলিয়া যান। তবে শীঘ্রই ষ্টার থিয়েটার খুলিবার সূত্রপাত হয়।

ষ্টার থিয়েটার "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র ৪।৫ মাস মধ্যেই খোলা হয়। গিরিশচন্দ্র শিখ সম্প্রদায়ের জনৈক অর্থশালী যুবক গুর্ম্মুখ রায়কে সত্বাধিকারী করিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এই সময় বিনোদিনীর সহায়তা ভিন্ন উহা কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারিত না। লাহোরের সিংজীর ন্যায় গুর্ম্মুখ রায়ও বিনোদিনীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াই ১১০০০৲ হাজার টাকা দিয়া জমি খরিদ করিয়া থিয়েটার তৈয়ার করেন। ইহা তখন বিডন ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। সেই বাড়ীর অস্তিত্ব আর এখন নাই। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ উহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানেই এক সময় এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর ও মনোমোহন থিয়েটারের অভিনয় হইত। গুর্ম্মুখ বিনোদিনীকে বলে, "থিয়েটার করিবার দরকার কি, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছি, তুমি থিয়েটারের কথা তুলিও না।" বিনোদিনীর আগ্রহ ছিল থিয়েটারের, তাই সে গুর্ম্মুখের আবেদন অগ্রাহ্য করিল। সুতরাং গুর্ম্মুখকেও থিয়েটারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। তবে তাহার প্রকৃত লক্ষ্য থিয়েটার ছিল না।

ষ্টার থিয়েটারের স্থাপনা সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখিতেছে—

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

"গিরিশবাবু" মহাশয় নূতন থিয়েটারের বেশী উন্নতি শিক্ষাকার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সেজন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২।৩টার সময়ে রিহার্সালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম, এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটী বহিয়া পিট্, ব্যাক্‌সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখনও কখনও মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারি কড়া করিয়া কড়ি ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন। আমি, গুর্ম্মুখবাবু আর দুইএকজন রাত্র জাগিয়া কার্য্য করিয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে?"

গুর্ম্মুখবাবু—থিয়েটারের বিনোদিনীর নামে 'বি

থিয়েটার' রাখিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য-কালে "ষ্টার থিয়েটার" নামে রেজিষ্ট্রি হয়। ইহাতে বিনোদিনীর ক্ষোভের সীমা রহিল না। আরও ছোট-খাটো বিষয়ে বিনোদিনী ক্ষুন্ন হইল, কিছুদিন সে থিয়েটার ছাড়িয়াও রহিল কিন্তু, বিনোদিনী বলেন, "গিরিশবাবুর ও সত্ত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল।" যাহা হউক বিনোদিনী কর্ম্মকর্ত্তাগণের ন্যায়োচিত ব্যবহারের দাবী করিবার অধিকারিণী হইলেও থিয়েটার তাহার নামে হইতে না দেওয়ায় গিরিশবাবু খুব উচিত কাজই করিয়াছেন।

ষ্টার থিয়েটার খোলা হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই। অভিনয় হওয়ার পূর্ব্বে গিরিশবাবু একদিন বৈকালে কালী-ঘাটে৺কালীমাতার মন্দিরের সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু হন দক্ষ, বিনোদিনী সতী, অমৃত মিত্র মহাদেব, নন্দী অঘোর পাঠক, ভৃঙ্গী প্রবোধ ঘোষ, প্রসূতি কাদম্বিনী, তপস্বিনী ক্ষেত্রমণি, দধীচি অমৃত বসু, ব্রহ্মা নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু উপেন্দ্র মিত্র, ভৃগুপত্নী গঙ্গামণি, দূতগণ মহেন্দ্র চৌধুরী, পরাণ শীল। এই অভিনয় হয় খুবই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এখানে কেবল সতীর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় প্রতিভার কথা গিরিশচন্দ্রের কথায়ই বলিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"কোন ভূমিকায় চরমোৎকর্ষলাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকা কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্কে অঙ্কে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাষ আনা আবশ্যক। অভিনয়-কালীন ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসজ্জিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মন-চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে—সেই ক্ষণেই অভিনয়ের রস-ভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন; এবং সে সময় অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা 'পলাশীর যুদ্ধ' দেখিয়া 'সাধারণীতে' সমালোচনা,—"ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক, যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু একপ্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী-সঞ্চালন করেন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলাও সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, সেইরূপ অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচক-শ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে চালক ছিলেন। বহু ভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচায়ক। সতীর মুখে একটি কথা আছে, "বিয়ে কি, মা?" এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যজ্ঞকথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে "বিয়ে কি, মা?" শুনিলে ন্যাকামী মনে হয়। সাজসজ্জায়, হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যানমগ্ন বালিকা সংসারজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি, মা?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে—
"ধন্য, ধন্য কলিযুগ"?
ক্ষুদ্র নর অন্নগতপ্রাণ,
রিপুর অধীন সবে;
রোগ শোক সন্তাপিত ধরা,
পন্থা হারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে;
কেন কহ বিশ্বনাথ,—"ধন্য কলিযুগ"?

যোগিনী বেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতিনিন্দা কেন সব?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ—স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।"

এই সতীর অভিনয় সম্বন্ধেও বিনোদিনী 'আমার কথায়' লিখিয়াছেন—

"গিরিশবাবুর 'দক্ষ', অমৃত মিত্রের 'মহাদেব' যে একবার দেখিয়াছে সে বোধহয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে-রে, দে-রে, সতী দে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন, তখন বোধহয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত, তখন সে বোধহয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি-উত্তাপ বাহির হইত।

ইহার পরে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকে বিনোদিনী সুরুচির ভূমিকায়ও কৃতিত্ব দেখান।

অতঃপরে স্বজাতির তাড়নায় গুর্ম্মুখ থিয়েটার ছাড়িয়া দেন।" গিরিশবাবু নিজে স্বত্বাধিকারী না হইয়া অমৃতলাল মিত্র, অমৃত বসু, হরিপ্রসাদ বসু এবং দাসু নিয়োগীকে দিয়া থিয়েটারটি খরিদ করান। দাসুবাবু ষ্টেজ পরিচালনা করিতেন, হরিবাবু হিসাবপত্র বুঝিতেন, অমৃত মিত্র রিহার্সেলে আর অমৃত বসু তত্ত্বাবধানে গিরিশবাবুকে সাহায্য করিতেন। গুর্ম্মুখবাবুর ইচ্ছা ছিল অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্বত্ব বিনোদিনীকে দেওয়া হয়, কিন্তু গিরিশবাবু তাহাতে রাজী হন নাই।

তিনি বিনোদিনীর মাকে বলিলেন, "বিনোদের মা, ওসব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই। তোমরা স্ত্রীলোক, অত ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া আমি তো অন্যত্র কার্য্য করিব না। আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা কার্য্য করিব। বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই! গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।"

গিরিশবাবুকে বিনোদিনীর মা অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার কথাই শিরোধার্য্য করিলেন। ইহাতে বিনোদিনীর মন যে খুব ক্ষুণ্ণ হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গিরিশবাবুর স্নেহে বাধ্য হইয়া অভিনয় করিতে লাগিল।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

অতঃপরে নলদময়ন্তী ডিসেম্বর মাসে ১৮৮৩ অভিনীত হয়। অমৃত মিত্র হন নল, বিনোদিনী দময়ন্তী। অমৃত বসু বিদূষক, কলি অঘোর পাঠক। এই সময় কলিকাতায় গড়ের মাঠে ইণ্টার ন্যাশনাল একজিভিসন নামে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে প্রতিদিন নলদময়ন্তীর অভিনয় হইত এবং স্বত্বাধিকারী বা জমি কিনিবার টাকা অনেকটা উঠাইয়া ফেলেন। বিনোদিনী বলেন, "কত দেশদেশান্তরের লোক কলিকাতায়, আমাদের উদ্যোগ উৎসাহ, আনন্দ দেখে কে? এই সময় আবার আমরা সব ঐক্যবদ্ধ হইলাম। যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিল" —ইহার পরে তিনি বৃষকেতুতে হন পদ্মাবতী, হীরার ফুলে হন শশীকলা ও শ্রীবৎস চিন্তায় হন চিন্তা।

অতঃপরে চৈতন্যলীলা কেবল রঙ্গজগতে নয়, ধর্ম্ম-জগতেও একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিল এবং এই ভূমিকায় বিনোদিনী এত উৎকৃষ্ট অভিনয়ের পরিচয় দেন, যেন স্বয়ং থিওজফিকাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল অলকট রেইস ও রয়েট-এ একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন—

"The poor girl who played Chaitanya may belong to the class of unfortunates (alas: how unfortunate these victims of man's brutishness) but while on the scenes she throws herself into her role so ardently that one sees the Vaisnava saint before him. Not a lewd gesture, not a sensual glance of the eye, not the slightest suggestion of animal desire like those which make up the attraction of nautches to their patron. I am a psychologist and watch faces for signs of hidden emotion. At the Star in Beadon Street, there was not a symptom of any bad influence working in the audience.... So thoroughly does the Star actress feel the emotions of the saint she personates, so intensely arouses in her own bosom the religions ecstasy of Bhaktiyoga she fainted dead away between the acts the evening I was there and a medical man who shared my box had to go behind the scenes each time to administer restoratives."

বস্তুতঃ ঋষিপ্রবর কর্ণেল অলকট যে বিনোদিনীর অভিনয়কালে ভাববিহ্বলতায় যেন সাক্ষাৎ চৈতন্যদেবকে সম্মুখে দর্শন করিয়াছিলেন, এলেনটেরি প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার চেহারা ও হাবভাবে কম গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহার কথাই পূর্ব্বে পাঠককে উপহার দিয়াছি। অতঃপরে 'রেইস্ ও রায়তের' সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যলীলা ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় দেখিয়া গিরিশ-চালিত ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিবার পরে বিনোদিনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও কম প্রশংসা ও গৌরবের কথা নয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"But last not the least, what shall we say of Binodini? She is not only the moon of the Star Company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity for reproducing them. She is certainly a lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the subtle forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genious like faith can remove mountains."

ভাবার্থ—"সর্ব্বশেষে, বিনোদিনীর কথা আর অধিক কি বলিব? কেবল কি সে ষ্টারের অভিনেত্রীবৃন্দের চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবময়ী। বলিতে কি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের সে শীর্ষ-স্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই সেই চরিত্রের অভিব্যক্তি সে অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করে। আর তাহার রুচি বিশেষ মার্জ্জিত

বলিয়া কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। গত বুধবার সে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ চরিত্রে অভিনয় করিয়া উভয় চরিত্রের সম্যক্ সম্মান রক্ষা করিয়াছে। শিক্ষিতা রমণী গ্রাজুয়েট বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে সে 'আধুনিক বঙ্গসমাজে' শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা অদ্ভুত ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছে।

"চৈতন্যের ভূমিকায় আবার যে প্রেমবলে সকল ধার্ম্মিক চরিত্রের অগ্রগণ্যরূপে গৌরাঙ্গদেব অসংখ্য নরনারীর নিকট আজও চিরপূজ্য, যে প্রেমে তিনি পূর্ণ কৃষ্ণাবতার সেই ভক্তি ও প্রেম সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনীর ন্যায় স্বল্পবয়স্কা অভিনেত্রীর পক্ষে চৈতন্যের ভক্তি ও প্রেমের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখান নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাসের মতই প্রতিভা ও পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।"

"এই সম্বন্ধে বিনোদিনী বলেন—

এই থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সৎশিক্ষা দিয়া কার্য্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এইবার "চৈতন্যলীলা" নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই "চৈতন্যলীলা"র রিহার্সেলের সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয়ই মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত-গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকুল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম, "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম; পরে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহা সঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি"; কিন্তু সারাদিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম, তাহা বহু সংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও

মঞ্চশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর

মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম, "কি দেখ মালিনী?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম, আমার মনে

হইত—"ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" "উনিই তো বলিতেছেন, আমি মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ," তখন সত্যই মনে হইত যে, "কেবা কার!" পরে যখন উৎসাহ উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে—

"গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অশরীরি প্রাণী!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

"তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শক-বৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়॥" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি-পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত! উন্মত্ত ভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক এক দিন এমন হইত যে, অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

"একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি, সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক সকল আসিতেন তখন আরও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেক গুণী লোকই আসিতেন। মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপ্‌ সিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন; আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড় দাড়িওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, ইঁহাকে নমস্কার কর। ইঁনি মহা-মহিমান্বিত পণ্ডিত "ফাদার লাফোঁ।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই! আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন! আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া আপন কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হয় নাই; কেন তাহা বলিতে পারি না! এই চৈতন্যলীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদ-ধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্য-লীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের

দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন, "হরি গুরু, গুরু হরি," বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি," তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা, তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্ত্তি, আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস," আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান! কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) "সত্যং শিবং" মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার-কার্য্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেন না আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযূষ পূরিত আশাময়ী বাণী— "হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্নমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, বল—"হরি গুরু, গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নাই। তবে "বক্সে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহু বার দর্শন করিয়াছি।

ইহার পর "দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথমভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ। আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমার প্রায় একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী; কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত সাকার ও নিরাকার বাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ষড়ভুজমূর্ত্তির ধারণ সেই স্থান অভিনয় যে কত দূর উন্মাদকারী, আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনের আগ্রহ যতদূর প্রয়োজন, আবার দেহের শক্তিও ততদূর দরকার। কেননা সেই লঘু হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একভাবে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনি পড়িয়া যাইব। আর সেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার কালাচাঁদ" বলিয়া আত্মহারা! ইহা বলিতে যত সহজ

কার্য্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়। এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুর দয়া ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" আর অভিনয় হয় নাই। এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমি "বিলাসিনী কারফরমার" অংশ অভিনয় করি। কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগতপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আর কোথায় চটুল স্বভাবা পাশ্চাত্য-শিক্ষিতা মহিলা! অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে ভাবি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোন স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয় ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না, ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জ্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড়বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য্যস্থানে যাইতাম, আপনার কার্য্য সমাধা হইলে, ভুনী ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা শুনিতাম এবং কি করিলে কোনখানে উন্নতি হইবে, কোন্ কার্য্যের কোথায় কি ত্রুটী আছে, এই নানারূপ পরামর্শ হইত। পরে বাটীতে আসিলে স্নেহময়ী জননী কত যত্নে আহার করাইতেন। আহারান্তে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু নানা পরিবেশে নানারূপ মনোভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারের কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাহারা এক সঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধ হয় সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই থিয়েটার হইতে আমার অবসর লইতে হইল।

বিনোদিনীর শ্রীচৈতন্য অভিনয় সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেন—

"সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যলীলায় চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় অন্তোপান্তই ভাবুক-চিত্তবিনোদন। প্রথমে বালক গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা"—পুরুষ প্রকৃতি এক সঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই?" বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। পদধূলি লাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিত মণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল, তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেই জন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, 'চৈতন্য হোক।' অনেক পর্ব্বত গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই—অভিনয়ের

নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে—অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থাই হোক, এই মহাছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি সেই ধ্যান প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্ট প্রহর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।"

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন—

লিখিলা চৈতন্য লীলা, হীরক হইল শীলা
নাট্যশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে শিঙা বাজে খোল রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নত শির আঁখিজলে ভেসে যায়
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হইলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গন্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণ পায়
গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে
সেই ইষ্টে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত চক্ষে।

বিনোদিনী অভিনয়কালীন পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলেন—

"অভিনয়কালীন যেমন আমার পার্টের দিকে মন থাকিত তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও যত্ন ছিল। ভূমিকা উপযোগী সাজিবার ও সাজাইবার আমার সুখ্যাতি ছিল। যখন নলদময়ন্তীর নূতন অভিনয় হয়, সেই সময় "নল"কে রং ও ড্রেস করিয়া দিবার জন্য কোন সাহেবের দোকান হইতে এক সাহেব আসিয়াছিল। যেহেতু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, রং ও পরচুলা অনেক টাকার আসিল। আমাকেও অনেকে বল্লেন যে, "তুমিও রং করিয়া লও!" আমি বলিলাম যে, আগে নল মহাশয়ের রং হউক দেখি। পরে "নলে"র রং করা দেখিয়া আমার মনঃপূত হইল না, বরং হাসি পাইল। যেন তেলচিট্টা তেলচিটা মনে হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম যে, "না মহাশয় আমার ড্রেস ও রং আমি আপনি করিতেছি দেখুন।" তখন আমি পোষাক ও রং সম্পূর্ণ করিলাম, সকলে দেখিয়া বলিলেন যে, এই রং বেশ হইয়াছে। সেই অবধি অমৃতবাবু যতবার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রং করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রং করিয়া দিলে তাঁহার পছন্দ হইত না। ইহার দরুন অন্য

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

একট্রেস্‌রা সময় সময় অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (ভুনী) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রং করিয়া দি" অমৃতবাবু তার উত্তরে বলেন যে, "রং ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উত্তম!" আমি সকল সময়েই নিজে নিজের পোষাক ও রং করিতাম ড্রেসারেরা শুধু সংগ্রহ করিয়া দিতেন। আমি এমনি সুরুচিসম্পন্নরূপে ড্রেস করিতে পারিতাম যে আমার পোষাকের কেহই প্রায় নিন্দা করিত না। আমার মাথার চুলগুলিকে যখন যেভাবে প্রয়োজন হইত সেই ভাবেই বিন্যস্ত করিতে পারিতাম। আমার চুলের কার্লিংগুলি এত সুন্দর হইত যে গিরিশবাবু মহাশয় আদর করিয়া বলিতেন যে, "একজন ইটালিয়ান কবি বলিতেন তাঁহার

পুস্তকের একটি সুন্দর বালিকার মুখের এক স্থানের একটি তিলের জন্য তাঁহার জীবন দিতে পারিতেন; তোমার এই চুলের কার্লিংগুলি দেখিলে ইহার কত দাম ঠিক বলিতে পারি না।" হইতে পারে গিরিশবাবু আমায় স্নেহ করিতেন বলিয়া খুব বেশী বলিতেন, কিন্তু আমার ড্রেসের কেহ কখন নিন্দা করেন নাই। এক্ষণকার "ষ্টার থিয়েটারের" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আমার ড্রেস করিবার সুখ্যাতি করিতেন। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের নিজ নিজ পোষাকের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। যেহেতু একজন লোককে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল দশা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শক সমীপে উপস্থিত হইতে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, গম্ভীর নানারূপ মনের অবস্থা দেখাইতে হইবে, তখন একই জনকে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর ভাবও নানারূপ দেখাইতে হইবে। সেই জন্য পোষাকের পরিবর্ত্তন চাই। কেননা "আগে দর্শন ডালি, পিছাড়ি গুণ বিচারি।"

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বিনোদিনী যথার্থ বলিয়াছে যে, তাহার ভূমিকা উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটি দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু "বুদ্ধদেব" দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জা-গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া কন্-সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কন্সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়া-ছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়া-ছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয়কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত অঙ্গভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ—শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখন কুণ্ঠিত ছিল না। বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক, সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটি ভূমিকা একজনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন; দুইটি বৈষম্য-পূর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ নাট্যশক্তির বিকাশ নয়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা এক ভূমিকায় চরমোৎকর্ষ লাভ করা বিশেষ নাট্যশক্তির কার্য্য। চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, তাহা মনঃ-ক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাস আনা প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে,

কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে, সেইক্ষণেই অভিনয়ের রস ভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন।

'প্রহ্লাদ চরিত্রে' বিনোদিনী হইত প্রহ্লাদ, প্রভাস যজ্ঞে সত্যভামা, আর বিবাহ বিভ্রাটে বিলাসিনী কারফরমা আর বেল্লিকবাজারে রঙ্গিনী, তরল ভূমিকার অভিনয়েও বিনোদিনী সমান পারদর্শিনী ছিল। এ বিষয়ে গিরিশ চন্দ্র বলেন—"গুরু গম্ভীর ভূমিকায় (serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে ফতীর ভূমিকায় এবং বিবাহ বিভ্রাটে বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকায় চোরের উপর বাটপাড়িতে গিন্নী, সধবার একাদশীতে কাঞ্চন প্রভৃতি হাল্‌কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত। তাহার বিলাসিনী কারফরমা সম্বন্ধে Reis ও Rayyat-এ লিখিতেছে—

"Her Mrs. Bilashini Karforma the gril graduate exhibited so to say, an iron grip of the queer phenomenon—the Girl of the period as she appears in Bengali Society."

অভিনয়কালে সময় সময় যে কত বাধাবিপত্তি সহিতে হইত সে সম্বন্ধে কিছু বিনোদিনীর নিজের কথায়ই বলিতেছি—

"একটা কথা আমি না বলে থাকতে পাচ্ছি না। আমরা সেজে গুজে যখন ষ্টেজে নামতাম, তখন আমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে যেতাম। আমাদের নিজেদের সত্তা অবধি ভুলে যেতাম। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও গা শিউরে উঠে!

'সরোজিনী' নাটকের একটা দৃশ্য—রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু' তিন হাত উঁচুতে উঠে লকলক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪৷৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাঠ্ জেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের সাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই—

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখরে যবন দেখরে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী

গুর্মুখ রায়

করেই সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবু কারু ভ্রূক্ষেপ নেই—তারা আবার ঘুরে আসছে,

আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

"একবার আমি প্রমীলা সেজে চিতারোহণ করতে যাচ্ছি এমন সময় আমার মাথার রুক্ষ চুল ও চেলির কাপড়ের খানিকটা আঁচলে আগুন ধরে গেছল—আমি তখন এমনই আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলাম যে কিছুই অনুভব করতে পারি নি। আমার চুল জ্বলছে, কাপড় জ্বলছে আমার হুঁস নেই; আমি সেই অবস্থায় আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় রাবণ সেজেছিলেন, আমার এই বিপদ না দেখে, তিনি ত সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে সেই আগুন নিবুতে লাগলেন। তখন যবনিকা সবে অর্দ্ধেক পড়ছে। যাই হ'ক আর পাঁচজন ছুটে এসে কোন রকমে আমাকে ত সে যাত্রা পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। উপেনবাবুর হাত ঝল্‌সে গেছল, আমার দেহের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়েছিল।

"এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে কি চোখে দেখে তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না,—তবে তখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে বিশেষ স্নেহ মমতার বন্ধন ছিল, পরম আত্মীয়ের মত একজন আর একজনকে দেখ্‌তো।

"অভিনয় করতে গিয়ে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাঝে মাঝে আরও কত রকম বিপদে পড়তে হয়! আমারও হ'য়েছিল। এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করব। একবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটেনিয়া সেজে আমি শূন্য পথে আসছি, এমন সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে আমি ধপ্‌ করে ষ্টেজের মাঝে এসে পড়লাম। গিরিশবাবু মহাশয় ক্লাইভ সেজে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ঠিক তাঁর সামনে এসে ত পড়লাম। আমাকে হঠাৎ ধপ্‌ করে পড়তে দেখে তিনি ত চম্‌কে উঠলেন। আমার বাঁ হাতে ছিল ইংলণ্ডের মানচিত্র, আর ডান হাতে ছিল রাজদণ্ড। আমি ত কোন রকমে সেই রাজদণ্ডের সাহায্যে মুখ থুবড়নর থেকে নিজেকে সাম্‌লে নিলাম, নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করে ছিলাম—"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমিরে বাছনি—," গিরিশবাবু যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। ওদিকে সুধী দর্শকবৃন্দের হাতের তালি হাতেই রয়ে গেল। ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন ষ্টেজ ম্যানেজার, গিরিশবাবু ভেতরে এসে তাঁকে এই মারেন ত এই মারেন।

"আর এক বার ষ্টার থিয়েটারে নল দময়ন্তী অভিনয় হচ্ছে। তাতে একটা সরোবরের দৃশ্য ছিল. সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে; মধ্যস্থলের পদ্মটা সব চেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটা কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয়জন কমলবাসিনী বার হয়ে আস্‌তেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হ'ত। প্রত্যহ বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে সখিদের শেখাতেন; এই নৃত্যগীত অভ্যাস করতে গিরিশবাবুর কাছে তাদের যে কত গাল খেতে হ'য়েছিল তার অন্ত নাই।

"সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হ'ত। জহর ধর মহাশয় এই সিনটা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকার একজন কলাবিদ্‌ ছিলেন।

"আমি দময়ন্তী সেজে সাজঘর থেকে বেরিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দেরা খুব হাততালি দিয়ে উঠলেন। শুনলাম একজন সখি না আসায় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে—সিন তুল্‌তে দেরী হচ্ছে, তাই এই ঘন ঘন হাততালি! আর ত দেরী করা চলে না; গিরিশবাবু এসে আমায় ধরলেন, "বিনোদ তোকে বেরুতে হ'বে।" আমি ত হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সর্ব্বনাশ! সেই কম্পমান পদ্মের ওপর সখীদের দেখতেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুর্ দুর্ করে উঠত; আর আমাকেই কিনা সেই পদ্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করিনি। এ ত দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তার ওপর আমি দময়ন্তী সেজে মাথার চুল সব ফিটফাট করে এসেছিলাম, ফুলের মুকুট পরে কমলবাসিনী সাজতে গেলে যে আমার সব চুল খারাপ হ'য়ে যাবে। তখনকার দিনে এত রকমের পরচুলো পাওয়া যেত না। আমায় কখনও পরচুল পড়তে হয় নি। আমার নিজের চুলকে আপন ইচ্ছে মত তৈরী

করে নিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার ছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম ছিল যে যেমন ভাবে ইচ্ছে তাকে কুঁচকিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারতাম। তাই আমায় কখনও ধারকরা চুল পরতে হয়নি। তখনকার দিনে এই কেশপ্রসাধনের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। যাক্ সে কথা, গিরিশবাবু ত আমায় আদর ক'রে মিষ্টি কথা বলে সখি সাজিয়ে ঠেলে-ঠুলে ষ্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। একটা চল্‌তি কথা আছে না, 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে' ; 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।' আমার ঠিক তাই হ'ল। যেমন ক্রেনে চড়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছি, অমনই আমার এলো চুলের রাশি পাক খেয়ে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল – আর চড়চড় করে চুল ছিঁড়তে আরম্ভ হ'ল। আমার অর্দ্ধেক মুখ তখন পদ্ম থেকে বেরিয়েছে, নেমেও পড়তে পারি না, ওদিকে চুল ছেঁড়ার সে কি জ্বালা! 'আরে চুল গেল চুল গেল' বল্‌তে বল্‌তে দাশুবাবু না একখানা কাঁচি এনে তিন জায়গা কেটে আমার মাথাকে ত ছাড়িয়ে দিলেন।

"ভেতরে এসে রাগে আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লুম ; আমি গোঁ ধরে বস্‌লুম আমি আর সাজব না, কিছুতেই সাজব না।

"তখন গিরিশবাবু এসে কেমন আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্‌লেন, 'ও এমন কত হয়। তোর খানিকটা চুল নষ্ট হ'য়ে গেছে ব'লে তুই কাঁদছিস, আর জানিস্ বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকের মাথায় একেবারে চুলই থাকে না, মুখে একটা দাঁতও থাকে না। তুই চুলের জন্যে কাঁদবি কেন? একটা গল্প বলি শোন্, গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে পোষাকটা পরে নে।' এই বলে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন, বিলেতের একজন খুব বড় অভিনেত্রী অভিনয় শেষ করে বাড়ীতে ফিরে এসে প্রথমে পোষাকটা ছেড়ে ফেললেন, তারপর মাথার সেই কোঁকড়ান পরচুলোর রাশ খুলে রাখলেন, তার দু'পাটি দাঁতই বাঁধান ছিল, তা মুখ থেকে টেনে বার করলেন। তাঁর ৫.৬ বছরের একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে, তারপর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাক ধরে টানা-

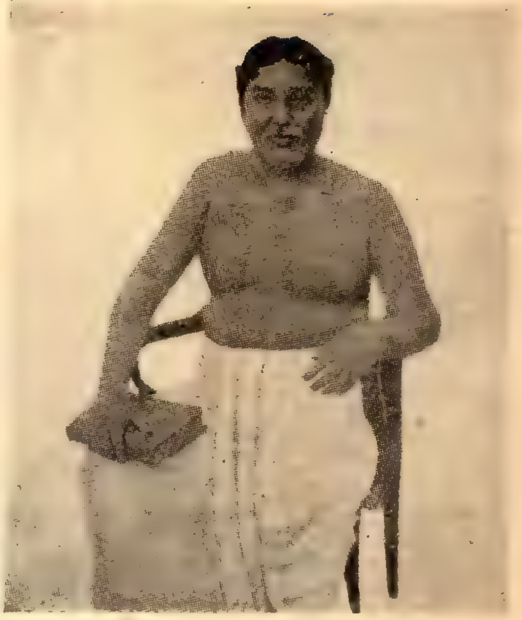

মহেন্দ্রলাল বসু

টানি করতে লাগল। তার ধারণা হয়েছিল, তার মার নাক-কানও বুঝি জোড়া দেওয়া।' আর কি রাগ থাকে, কোন রকমে হাসি চেপে আমি বললাম—"যান্ ম'শায়, আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।" এই বলে হাস্‌তে হাস্‌তে আমি ষ্টেজে গিয়ে নামলুম। তিনিও কাজ উদ্ধার ক'রে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন।

গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার জোর জবরদস্তি, মান অভিমান রাগ প্রায়ই চল্‌ত। তিনি আমায় অত্যধিক আদর দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। আমিও তাই বড্ড বেড়ে উঠেছিলুম, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতুম, কিন্তু তার জন্য তিনি আমায় একটি দিনের জন্যও তিরস্কার করেন নি, আদর অযত্ন ত করেনই নি। তবে আমিও একটা দিনের জন্য এমন কোন কাজ করিনি, যাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর, গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব রচিত অভিনীত হয়। অভিনয় দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক বলেন—

"The artists who maintain the characters of Siddhartha and Gopa acquit themselves in a highly creditable manner. No praise can be

too high for the rendering of Budha's appeal for mercy in the presence of the King Bimbashara which ultimately led to that monarch's conversion and the wailings of Gopa on Budha's secret flight from Kapilavastu."

গিরিশচন্দ্রও লিখিতেছেন,—"পতিবিরহ ব্যাকুলা গোপা"র ছন্দকের নিকট—

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার!
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে!"

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাজ্ঞা একেবারে অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন—এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপ্সরীনিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত যাজ্ঞার সময় তাপশুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত। "Light of Asia" রচয়িতা Edwin Arnold সাহেব এই গোপার অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'Travels in the East' নামক গ্রন্থে বঙ্গনাট্যশালা অতি প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পরে অভিনয় হয় গিরিশচন্দ্রের অমর নাটক "বিল্বমঙ্গল। ইহাতে অমৃত মিত্র করেন বিল্বমঙ্গল, বিনোদিনী চিন্তামণি, অঘোর পাঠক ভিক্ষুক, ক্ষেত্রমণি দেবী থাকমণি, আর বেলবাবু সাধক। এই সম্বন্ধে বিনোদিনী কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। গিরিশচন্দ্রও বিনোদিনী-রচিত "আমার কথা"র ভূমিকায় এই নাটক সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অথচ "চিন্তামণির" চরিত্রাভিনয় অপূর্ব্ব হইয়াছিল। এই বিষয়ের সহিত একটি বিয়োগান্ত কাহিনী জড়িত, সেই বিষয়টি উল্লেখ করিব।

বুদ্ধদেব অভিনয়ের পরে বিনোদিনী রাজা উপাধিধারী এক ধনিকের আশ্রয় লাভ করে। সেই সময় হইতে প্রায় ২৪ বৎসর উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারই অভিভাবকত্বে বাস করিয়াছিল। ইনি ১৩১৮ চৈত্র মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিনোদিনী "আমার কথা"র ১১৪ পৃষ্ঠায় তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলিয়া আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল। মাতামহী মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, রঙ্গভূমের সুখসৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্পদ, বঙ্গ-রঙ্গভূমের সমসাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহ মমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব?"

এই আশ্রয় লাভের ফলে বিনোদিনী তাহার প্রিয়তম সাধের থিয়েটারও ছাড়িয়া আসে। এই সময়ে বিনোদিনী অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় কার্য্যেও অবহেলা পরিলক্ষিত হইত। গিরিশবাবু অনেক সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু আর সহ্য করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। তিনি এবার একটু শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পাগলিনীর ভূমিকাটা খুব সরস করিয়া লিখিলেন। একদিকে গঙ্গাবাইর পাগলিনীর শ্রুতিমধুর কাওলাতি সঙ্গীত, অন্যদিকে ক্ষেত্রমণির সরস থাকমণি, চিন্তার ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় প্রকৃষ্ট হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইল না। বড় কঠোর ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। বিনোদিনীর ক্ষোভ আরও বাড়িল, অভিমান প্রবল হইল, বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়িয়া দিল।

থিয়েটার ছাড়িবার পরেও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাহার দেখা হইত। গিরিশচন্দ্র অনুমান ১৮৯৫ সালে আবার তাহাকে থিয়েটারে আনিতে চাহিয়াছিলেন। বিনোদিনী অস্বীকৃত হয়, উপরন্তু শুনাইয়া দেয়—"তিনকড়ি আছে, এখন আমার দরকার কি?"—তিনকড়ি তখন লেডী ম্যাকবেথ, জনা প্রভৃতি ভূমিকায় খুব যশার্জ্জন করিয়াছেন। বিনোদিনী আর শিল্পমন্দিরে প্রবেশ করা পরামর্শজনক মনে করে নাই।

তথাপি গিরিশচন্দ্রের স্নেহ হইতে বিনোদিনী কখন বঞ্চিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্রই তাহাকে একটা আত্মকাহিনী লিখিতে বলেন, বিনোদিনীও লিখিয়া আনিয়া দেখিতে দিত। গিরিশ দেখিতেন, নিজে কিছু কাটিতেন না, তবে কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া

দিতেন। লেখা শেষ হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র একটা ভূমিকাও লিখিয়া দেন। কিন্তু অভিমানিনী বিনোদিনীর

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র

তাহা মনঃপূত হয় নাই। বিনোদিনী তাহার নিবেদনে লিখিয়াছেন :

"আমার মনের মতন না হইবার কারণ তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না। আমি সে কথা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়।"

যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র আরেকটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হন। এই জন্য বিনোদিনী কয়েকবার তাগাদাও করেন। গিরিশবাবু উত্তর করেন, "তোমার ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া আমি মরিব না।" কিন্তু ব্যাধি গিরিশচন্দ্রকে এমনই উত্থান শক্তি রহিত করিয়া ফেলিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তারপরে অবিনাশবাবুর নিকটে সযত্নে রক্ষিত এই ভূমিকাই বিনোদিনীর "আমার কথায়" সংযোজিত হয়।

'বিনোদিনীর আমার কথা' বাহির হয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, ইহার এগারো বৎসর পর আমার সঙ্গে প্রথম দেখা।

আমি তাহাকে বৈধব্য জীবন যাপন করিতে দেখিতাম। গোপালে তাহাকে বিশেষ ভক্তিমতী দেখিতাম। পাঠে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল—তাহার আলমারীতেও যথেষ্ট পুস্তক ছিল। পুস্তকগুলি আমার পরিচালিত "দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে" দেওয়ার কথা ছিল। স্বেচ্ছায় তিনি আনিতেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানাকারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। অধিকাংশ পুস্তক "National Libraryতে আছে বলিয়া আমার নিজের দিক হইতেও তেমন উৎসাহ ছিল না।

আমি ওকালতি করিতাম বলিয়া তিনি আমার নিকট সব উপদেশ নিতেন, তবে শেষ দিকে যাইতে পারি নাই বলিয়া তাহার বাড়ী ঘরের কি বন্দোবস্ত করিয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না।

একটি বিষয়ে আমি তাহাকে বিশেষ পীড়াপিড়ি করি। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের আভ্যন্তরীন দিকটাও আমার জানিতে আগ্রহ হয়। তিনি মদ্যপান করিতেন, "অমৃত মদিরায়" আছে—তিনি ও অমৃতলাল উভয়ে এইখানে বসিয়াও সুরাপান করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বহুবার বিনোদিনী অকপটে বলিয়াছেন, "আমাকে অতি-

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ

মাত্রায় স্নেহ করিতেন এবং আমার অভিমান আবদার সব সহ্য করিতেন। আমি তাহার প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী ছিলাম। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, বরাবর তিনি আমাকে স্নেহশীলা 'কন্যার' ন্যায় দেখিতেন।" বিনোদিনীর কথায় গিরিশচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বহুগুণে বাড়িয়াছিল।

একটি বিষয়ে তাহার খুব আগ্রহ ছিল। তাহার নিজের একটি মেয়ে হইয়া অল্প বয়সেই মারা যায়। জীবিতাবস্থায় কন্যাটিকে শিক্ষা দিবে—তাহার খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভবা এই অখ্যাতিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। তাহাতে সমাজের প্রতি বিনোদিনীর গুরুতর অভিযোগ ছিল। 'প্রতিশোধ' স্বরূপ সে আমাকে এই শ্রেণীস্থ মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করিতে অনুরোধ করেন এবং ইহাতে তাহার প্রতিবেশিনী প্রখ্যাতনাম্না অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

অনেক দিন নিজের ও পারিপার্শিক কার্য্যে আর তাহাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। তারপরে একদিন হঠাৎ শুনিলাম বিনোদিনী ইহধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালের চরণে আশ্রয় লইয়াছে। শুনিবামাত্রই আত্মীয় বিয়োগের দুঃখ হইল। করিবার কিছু নাই, কেহই চিরদিন থাকে না। কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল মাত্র। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বিনোদিনীকে কৃপা করিয়াছেন, গোপালের সেবায় সে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত, আমি তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অন্যায়, মিথ্যাচরণ বা অধর্ম্ম লক্ষ্য করি নাই—তাই আমার স্থির বিশ্বাস আছে তিনি এখন নিঃসন্দেহে ত্রিদিব বাসিনী। আজ এই স্বর্গতা মাতার উদ্দেশে এই যে ক্ষুদ্র কুসুমটি অর্পণ করিলাম, শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন, পরলোকেও তিনি অপার শান্তি ভোগ করুন।

জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সূর্য্য-স্বপ্ন

শ্রীসুধীর গুপ্ত

যদি সিন্ধু বেলা-ভূমে বালু-স্বপ্ন গড়ি ;
সারাদিন ধরি' ঝিনুক কুড়াই যদি ;
যদি ছোট শঙ্খ, শুক্তি, ফেন-পুঞ্জে ভরি
করপুট ; আঁকা-বাঁকা বহে যেথা নদী,
যদি তার কলস্বনে তরঙ্গ-লীলায়
অভিনব আনন্দের লভি আস্বাদন ;
সুখ-স্বপ্নে যদি দিন গড়াইয়া যায় !—
দিনে দিনে যদি যায় সমস্ত জীবন !

এ জীবন, ক'দিনের এ জীবন বলো !—
মহাকাল-সমুদ্রের তরঙ্গ-মুখর
কয়েকটি ঢেউ শুধু। দাগও তারপর
রহিবে কি তা'র আর ? আঁখি ছলোছলো,
চলো তাই সিন্ধু-তীরে র'বে অন্যমনা,—
দিনান্তের সূর্য্য-স্বপ্ন করিবে রচনা।

স্বর্ণ-দিগন্ত

সুভাষ সমাজদার

এই ফাল্গুন। সন্ধ্যা সাতটা। বাণীর নয় বছরের মেয়ে শোভনাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। বাণী উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। বোধ হয় ভগবানকে ডাকছে। দরিদ্রের ভগবান। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া সে-আর কি করবে। টাকা নেই। তাই চিকিৎসা কোরবার উপায় নেই। অর্থ নেই, তাই পাড়ায় প্রতিষ্ঠা নেই। অর্থকেই মানুষ সম্মান করে, মানুষকে নয়। কাজেই শেষ সময়ে কেউ এলো না তার মেয়েকে দেখতে বা মৌখিক সমবেদনা জানাতে। এমন সময় বাইরে ভাঙা গলায় কে যেন ডেকে উঠ্‌লো—বাণী। বাণী—আছিস্ নাকি রে?

—কে? বীরেনদা, এসো এসো। এলেই যদি আরও ক'দিন আগে এলে না কেন?

বীরেনবাবু হাতে ব্যাগ নিয়ে রোয়াকে উঠলেন। বাণীর দূর-সম্পর্কের ভাই হন। তিনি বেশ ভাল ডাক্তার। ডাক্তারী তাঁর পেশা আর কৃষক-মজদুর ও বর্তমানে বাস্তুহারাদের সীমাহীন দুঃখের প্রতিকার করে বেড়ানো তাঁর নেশা। তাই লোক নিশ্চয়ই ভাল বলতে হবে।

বীরেনবাবু একমুখ হেসে প্রশ্ন কোরলেন—কি রে? ওর অবস্থা এখন কেমন?

—চল না ভিতরে, অবস্থাটা দেখলেই বুঝতে পারবে; বাঁচাবার আশা দুরাশা মাত্র—নিস্পৃহ স্বরে বাণী উত্তর দেয়।

শোভনা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ে একটি ছেঁড়া কাঁথা। সমস্ত শরীরটা ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলে উঠেছে। রক্তের লেশ নেই। গায়ে উত্তাপ খুবই কম। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো জট লেগে সাদা হয়ে গিয়েছে। বাতাসে উড়ছে। পূবের বাতাস। বীরেন বাবুর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝতে দেরী হ'ল না—এটা কি রোগ এবং কেমন করে হয়েছে।

বাণী শোভনার পাশেই বসে আছে। মাথার কাছে ময়লা, বিবর্ণ একটি এ্যালুমিনিয়মের গ্লাস আর এক বাটি জল। শোভনা যখন চিঁ চিঁ করে ডাকে, বিরক্ত স্বরে, তখন বাণী ঐ গ্লাসে একটু জল ঢেলে খাইয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্ত নিশ্চিন্ত। বীরেনবাবু অভ্যাসমত স্টেথিস্কোপে হাত দিলেন। আবার ভাবলেন—বুক পরীক্ষা করেই বা কি হবে। রোগ বাসা বেঁধেছে ওর সর্বাঙ্গে। বাণীকে বল্লেন—'অসুখের আগে, কতদিন ভাত খেতে পায়নি বল তো?'

—তা প্রায় দিন পনেরো হবে—সহজ কণ্ঠে উত্তর দেয় বাণী।

—কি খেতে দিতিস্?

—কোনদিন দু'পয়সার মুড়ি, কোনদিন তাও না।

—এই দীর্ঘকাল্ না খেতে পেয়েই এই কঠিন অসুখটি সৃষ্টি হয়েছে। শরীর দুর্বল হ'লে যে কোন রোগই সহজে আক্রমণ করে কি না...

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যান বীরেনবাবু। ওষুধ দিয়ে কোন ফলই নেই। নাভিশ্বাস উঠেছে। রোগী আর বড় জোর ঘণ্টা পাঁচেক—। তাই বলতে গিয়েছিলেন কি?

আশ্চর্য মেয়ে এই বাণী। সারা জীবন লড়াই করেছে দুঃখের সঙ্গে। বয়স মাত্র সাতাশ কি আঠাশ। কিন্তু বহু রেখাঙ্কিত মুখাবয়ব। সুতীব্র জীবনসংগ্রামের চিহ্ন। বড় ডাগর ডাগর দুটো চোখ। চোখদুটো যেন জ্বলছে খদ্যোতের মত। প্রাণের উত্তাপ, জীবনের দীপ্তি সব যেন ওইখানেই বাসা গেড়েছে। চোখে জল নেই। সন্তানের আসন্ন মৃত্যুতেও না। কত কাঁদবে? একটা মানুষের চোখে জল কত থাকতে পারে? হঠাৎ প্রশ্ন কোরল বাণী—'তোমার বোধ হয় এই ঘরে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, না দাদা?

—না কষ্ট আর কি বোন, তবে ভাবছি এই ঘরে তোরা থাকিস্ কি করে? এখানে সুস্থ মানুষেরই যে অসুখ কোরবে। এত স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘর—

—হ্যাঁ, দীর্ঘ পনেরোটি বর্ষা এই ঘরেই তো কাটিয়ে দিলাম। হেসে ওঠে বাণী। অর্থহীন হাসি।

সত্যিই বীরেনবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘরে একটা উৎকট দুর্গন্ধ। মাত্র একটি জানালা। জানালা না বলে তাকে ঘুলঘুলি বলা চলে। ঘরের এক পাশে একটি বিরাট তোরঙ্গ, তার উপরে শতছিন্ন, ময়লা শাড়ী আর কাপড়-জামার স্তূপ। সেই বাক্সটার পাশে একপাল উলঙ্গ শিশুর দল কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সাতদিন আগে ননী মুদির দোকান থেকে কেনা মেঝের ধুলোবালি মাখানো মুড়ি। তারা জানে এই খেয়েই সারাটা দিন কাটাতে হবে। তাই কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়াল-ঘেঁসে একটি জলচৌকির উপর লাল শালু দিয়ে ঢাকা লক্ষ্মীদেবী। লক্ষ্মী—শ্রী ও সম্পদের দেবী। হ্যাঁ—সম্পদ লক্ষ্মী দিয়েছেন বই কি—সম্পদের চেয়েও অনেক বড় জীবন। সব মিলিয়ে ৪।৫টি সন্তানের জননী বাণী। বীরেনবাবু নিবিষ্ট মনে কি যেন ভাবেন—পৃথিবীর সব দরিদ্র দেশেই লোক সংখ্যা বেশী। সৃষ্টির আদিমতম কামনার তৃপ্তিই দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত দুঃখী জীবনের অতৃপ্তির দুঃসহ জ্বালা কিছুটা জুড়িয়ে দেয়। তাই জৈবিক নিয়মে বাণীর সংসারে একটির পর একটি জীব জন্ম নিয়েছে। বৈকুণ্ঠের বুক প্রাণহীন লক্ষ্মী হয়তো বাণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজায় খুশী হয়েছে। কিন্তু এদেরকে খুশী করবে সে কেমন করে? এরা তো বৈকুণ্ঠের জীব নয়, মাটির জীব। পেট আছে, তাই স্থূল ক্ষুধা আছে। আহার সামগ্রী কিনতে যে টাকা লাগে। টাকা……

খক্ খক্ খক্—খং, সুরেন কাশছে পাশের ঘরে। সুরেন—বাণীর স্বামী। ছিন্ন হয়ে গেল বীরেনবাবুর চিন্তাসূত্র।

সুরেন, সুবোধবাবু মোক্তারের মুহুরী। মোক্তারীর কাজকর্ম ততটা বেশী করতে হ'ত না সুরেনকে, যতটা করতে হ'ত সুবোধবাবুর 'পারমিট' বিলির কাজ। কেরাসিন, টিন, কাপড়ের পারমিট। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাই এইটি তার অনেক কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য। সুবোধবাবু স্বচ্ছল অবস্থার লোক। তিনি যা দেন তা সুরেনের সংসারে অকিঞ্চিৎকর—তবুও সংসার চলতো কোনরকমে। এখন সে পথও বন্ধ। প্রায় ছয়মাস সে শয্যাশায়ী, ক্ষয়রোগ। বাপ-পিতামহের দান। এক ছটাক জমি বা নগদ টাকা কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি, একমাত্র বাস্তুভিটে ছাড়া। দিয়ে গিয়েছেন এই রাজরোগ। এর বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আগামী পুরুষকেও।

আবার কাশির শব্দ। খক্—খক্—খক্—খং। উঃ। জমাট রক্ত। আবার কাশি। থুঃ—সেই বিষাক্ত রক্তের দলা চৌকির নীচে একটি পাত্রে নিক্ষেপ করলো সুরেন।

বীরেনবাবু মাঝখানের দরজাটা পার হয়ে সুরেনের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুটো গহ্বরের ভিতরে চলে গিয়েছে। তবুও কি তীব্র বিস্ফারিত দৃষ্টি। পৃথিবী যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। চোখের নীচে গভীর কালির দাগ। দীর্ঘদিনের অনাহার আর অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কালো ইতিহাস রচনা করেছে।

—কে?—বীরেনদা এসেছো?—তুমি ডাক্তার। তাই তুমি এসেছো। আর তো কেউ আসতে সাহস করে না এক বাণী ছাড়া। সুরেন হাঁপিয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস পড়ে ঘন ঘন।

—আচ্ছা সুরেন—অনাহারে শীর্ণ, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সুবোধবাবুর সেরেস্তায় এত অমানুষিক পরিশ্রম করিতে কেন? বল তো?

—'কেন?' সুরেন হাসে। নিষ্প্রভ, ম্লান হাসি।—আবার বলে—'তুমি তো জানো না বীরেনদা, পারমিট দেওয়ার কাজ কিনা! বেশ উপরি আছে। অভাবের সংসার!'

—সংসারের অভাব পূরণ কোরতে গিয়ে তোমার যে এত বড় ক্ষতি হ'ল—তা পূরণ করবে কে?—তুমি বাঁচলেও যে ওরা বাঁচতো'

—আমি বড় অক্ষম—বীরেনদা, আমিও ওদের জন্ত খাবার জোটাতে পারতাম না, এমনিও পাবে না। না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার জন্তই তো ওরা আমার সংসারে এসেছে। ঐ একটি মরতে বসেছে। যেগুলো ঘরে কিল বিল কোরছে, ওগুলোও মরবে—

খক্-খক্-খং। আবার সেই কাশি। এক একটা কাশির তোড় সামলানো দায়। আবার একতাল রক্ত।

—বীরেনদা, এ রোগ সারে না, না ?—

—সারে-তবে টাকা থাকা চাই। রাজ রোগ কি না, যাদবপুরে চিকিৎসা হয় ভাল। আমার তো জানা শোনাও নেই তেমন, আর—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরেন বলে, 'কয়মাস পৃথিবীর আলো দেখিনি। এখন কি মাস—কত তারিখ। সেই যে বৈশাখের তেতে ওঠা রোদে ধুকতে ধুকতে জর নিয়ে বাড়ী এলাম,—তারপর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

পশ্চিমের ঘুলঘুলিটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ঐ দূরের মেডার মাঠের শিমুল গাছটার পলাশের আগুন ধরা রঙ। সেদিকে তাকিয়ে সুরেন বলে চলে—'এটা বোধ হয় ফাল্গুন মাস, না! তা হলে তো মোহময় বাবুর বাগান বাড়িতে নিশ্চয়ই বসন্তোৎসবের তোড়জোড় সুরু হয়েছে, না বীরেন দা ?'

—হ্যাঁ, রঙীন কার্ডে একটি নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি। বীরেনবাবুর কপালের ত্রিবলী রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিকৃত হয়ে উঠলো তাঁর সর্বদা হাসি মাখানো মুখখানি। মনের গভীরে ভীড় করে আসে অজস্র চিন্তা। বসন্তোৎসব। দলে দলে রাস্তা দিয়ে ছেলে-বৌয়ের হাত ধরে হেটে চলেছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। শীর্ণমুখের অসংখ্য রেখায় লেখা আছে শতাব্দীর দুঃখের ইতিহাস : এরা কারা ? মানুষ না প্রেতলোকের অধিবাসী। সব উলঙ্গ দেহে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো। ভিক্ষা চাইছে। কে দেবে ভিক্ষা ? সবাই যে ভিখারী। ক্ষুধিত, বিক্ষুব্ধ, মূঢ় জনতা আর্তের চীৎকারে, দুঃখীর কান্নায় ধারিত্রী আজ শ্বাসরুদ্ধ। আশ্চার্য্য। তবুও প্রকৃতিতে এসেছে বসন্তের বার্ত্তা। সবুজের বন্যায় সজীব হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। মুকুলিত আম্রমঞ্জরীর আকুল সৌরভে আর পাখীর কাকলীতে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে নতুন জীবনের স্পন্দন। বিশ্বপ্রকৃতির বীণায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে যেন এক অপূর্ব্ব মাঙ্গলিক সঙ্গীত দিকে দিকে। কিন্তু সেই সুরকেও ছাপিয়ে দুঃখক্লিষ্ট অপরিমিত মানুষের ছিন্ন প্রাণের কান্নার ধ্বনি দ্যুলোক ভূলোককে আচ্ছন্ন কোরছে না কি ? জগৎ কি জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার ? শীতের মরা ডালপালায় ফুটেছে নবীন কিশলয় রাজি। প্রাণের ইঙ্গিত। জীবনের লীলা। কিন্তু তাতে উৎসব কিসের ? কারা করবে উৎসব ? যাদের আছে নিশ্চিন্ত সুখী জীবন। অনাবিল আনন্দের লাস্যলয় উচ্ছলতা আছে যাদের প্রাণে—তাঁরা ? সত্যিই বিচিত্র এই পৃথিবী। পাশাপাশি দিনের পর দিন বাস করেও মানুষে মানুষে কত পার্থক্য···

খক্—খক্—খং। উঠলো আবার আরেক ঝলক রক্ত।—আর বাঁচবো না বীরেন দা—সুরেন বলে।

—বেশী কথা বলা ভাল নয় বীরেন চুপ করে শুয়ে থাকো।

ঘরের মধ্যে জলছে একটি কেরাসিনের ডিবে। বীরেন বাবু হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন। রাত প্রায় নয়টা।

বাণী সুরেনের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ভাবছে অতীতের কথা। সোনালী অতীত। এই ঘরটিতেই তার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি কাটিয়েছিল। স্তিমিত দৃষ্টিতে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে থাকে ধুসর বিস্মৃত প্রায় অতীতের দিকে। নাঃ, শুধুই একটানা দুঃখের ইতিহাস। সংসারে মানুষ খুজেখুঁজে সংগ্রহ করে আশাপ্রদ ঘটনাগুলো, গড়ে তোলে সুখস্মৃতির দেউল। মানুষী প্রকৃতি। বাণীর কিন্তু নিরালম্ব, শূন্য জীবন। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সবই এক।

বাঁশ গাছের ডগায় আকাশে উঠেছে দশমীর চাঁদ। উজ্জল জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত পৃথিবী। একটানা সুরে ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে। মঞ্জরিত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে দক্ষিণের মৃদু বাতাস ভারাক্রান্ত। পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসছে হারমোনিয়মের আর ঘুঙুরের বাজনা। আগামী কাল বসন্তোৎসবের মহড়া। জানালা দিয়ে

দেবেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ভেতরটা দেখা যায়। দেবেশবাবু উচ্চ পদস্থ চাকুরে। বারান্দায় সতরঞ্চি বিছানো হয়েছে। শ্যামা হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে। আর অমিতবিক্রম বসু নাচ শেখাচ্ছে শর্ব্বরীকে। শ্যামা আর শর্ব্বরী দেবেশবাবুর দুই মেয়ে। শর্ব্বরী তন্বী, ক্ষীণকটি, বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি। চোখে যৌবন চঞ্চল কটাক্ষ। অমিতবিক্রম ইঙ্গিত করতেই শ্যামা গান ধরলো—'দেবতার মন্দিরে অঙ্গন তলে দেখন দাসী'…ঘুঙুর বেজে উঠলো। এ যেন আরেকটা নতুন পৃথিবী। মা—মা—মা—চিঁ চিঁ ক'রে ডেকে ওঠে শোভনা। বাণী তাড়াতাড়ি উঠে গেল। চোখে-মুখে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা। চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে আসতে চাইছে।

জল খাবি শোভনা? জল?—বাণী মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে।

—না, দাদা কোথায়? আমি দাদাকে দেখব।

—আসবে মা, ও আজকেই আসবে।

বাণীর বড় ছেলে পিণ্টু আজ প্রায় সাত বছর হ'লো বাড়ীছাড়া। পুণায় আছে। টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

হঠাৎ শোভনা হিক্কা দিয়ে উঠলো। বাণী চীৎকার করে ওঠে—'বীরেনদা—শীগ্‌গীর একবার এদিকে এসো তো—

'আগামী কাল বৈকাল চারটায় বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে—আপনি সবান্ধবে…বসন্তোৎসব। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নৃত্য, গীত। বসন্ত—আলো আর রঙ। হাস্যোজ্জ্বল উদ্দীপ্ত তরুণ-তরুণীর আনন্দ-মেলা। কত বৈচিত্র্য। স্বর্গ যেন নেমে এসেছে পৃথিবীতে।—যাবো—যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। তোমাদের প্রাণের লীলার উৎসব, না গেলে চলে!

বীরেনবাবু ছুটে এলেন। আরও বার দুয়েক হিক্কা উঠলো। চোখ দুটো উপরে উঠছে ক্রমশঃ। দৃষ্টি ঘোলাটে। হাত ধরে বসে আছেন বীরেনবাবু। নাড়ীর গতি ক্ষীণ। একবার জোর হিক্কা উঠেই থেমে গেল সব।

শোভনা—শোভনা, শোভনা!—চীৎকার করে বাণী আছড়ে পড়লো শোভনার অসাড়, নিস্পন্দ দেহটার উপর। সুতীব্র ক্রন্দনধ্বনি উঠানের লিচু গাছটার আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষের অশ্রু কালের বুকে দাগ কাটে না।

বীরেনবাবু সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পান না। ভাবেন—কাঁদুক—কান্না দুঃখের ক্ষতিপূরণ মাত্র। দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদে এইজন্যে যে, সে কেঁদে আনন্দ পায়।

বাইরে শুক্ল পক্ষের রাত্রির সপ্রচুর জ্যোৎস্না নবীন বৃক্ষ পত্ররাজির উপরে যেন গলে গলে পড়ছে। হারমোনিয়ম ও ঘুঙুরের বাজনা আর ঝিল্লীর একটানা শব্দ মিলে সৃষ্টি করেছে এক অপরূপ স্বর্গলোক। পৃথিবী সুন্দর। জীবন মধুময়। প্রাণসম্পদে মন ভরপুর। দেবেশবাবুর ঘরের জোরালো আলোতে দেখা যায় তন্বী নর্ত্তকী শর্ব্বরীর তরঙ্গায়িত দেহলীলা। মনে হয় এদের মনের গহনেও কোন দুঃখ নেই। নেই কোন অতৃপ্তি। শুধু একটানা নিরবচ্ছিন্ন সুখ, আনন্দ। আর বাণীর সুদীর্ঘ বেদনার ইতিহাস।

মুমূর্ষু যক্ষাক্রান্ত স্বামীর শয্যার পাশে মৃত কন্যাকে কোলে করে তাকিয়ে আছে দেবেশবাবুর উঁচু বাড়ীটাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে, যেখানে দিগন্তটা শেষ রাত্রির ম্লান চাঁদের আলোয় আবছা হয়ে রয়েছে। ঘরের ময়লা, কালিপড়া হারিকেনের স্তিমিত আলোতে দেখা যায়—বাণীর সেই দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা নয়। তাতে কোন ক্ষোভ নাই, জ্বালা নাই, নাই কোন অতৃপ্তি। শুধু আছে অনন্ত বিস্ময়। একই তো পৃথিবী। এখানে এত সুখ, এত আনন্দ, এত উচ্ছ্বাস। আর বাণীই কি শুধু হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার অভিশপ্ত বলি? হঠাৎ দৃষ্টিটা ধক্ করে জ্বলে উঠলো। প্রাগৈতিহাসিক জীঘংসা? নিষ্ঠুর ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা? না।

তার প্রদীপ্ত দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখছে—দিন আসছে। তাই পুঞ্জীভূত পাপের, অন্যায়ের ও সর্ব্বনাশা বীভৎসতার পাহাড়ের উপর দিয়ে পূর্ব্বাচলে দেখা দিয়েছে অরুণোদয়ের রক্তিম আভাস। ঐ দূরের স্বর্ণ-দিগন্তে এক উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে আগামী পৃথিবীবাসীর জন্য। ইন্দ্রধনুর রঙে তার সুস্পষ্ট সূচনা ফুটে উঠেছে।

সকালের উজ্জ্বল রৌদ্রে পৃথিবী রাঙা হয়ে উঠলো। মহাকালের বুকে দেখা দিল আরেকটি নবীন প্রভাত।

ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও বর্তমান বিশ্বপ্রগতি

আজহার উদ্দিন খাঁন

শিল্প ও বিজ্ঞান :—সমরখন্দ নগরে কাগজ প্রস্তুতের বহু সংখ্যক কারখানা স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে এরাই প্রথমে কাগজ নিয়ে আসে। দীপদান, আয়না এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধবার রীতি এরাই প্রথমে শেখায়। গোলাপ ফুল মুসলমানরাই ভারতবর্ষে এনেছিল; বৃক্ষের কলম করবার নিয়ম এরাই এদেশে প্রথম প্রচলন করে। আতর ও বহুবিধ ফুলের তৈলের ব্যবহার মুসলমানদের সময় আরম্ভ হয়। ইস্পাহান নগরে অত্যুৎকৃষ্ট তরবারি এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হত। হলব্ নগর ভুবনবিখ্যাত আয়নার কারখানা ও তাবিজনগর সালিকাশিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মরক্কো নগরের চর্মশিল্পের খ্যাতি এখনও বিলীন হয় নি। এডমন্ নগরের রেশমশিল্প পৃথিবী-খ্যাত ছিল। পাইপের সাহায্যে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বসরানগরে জল সরবরাহের একটি বৃহৎ কারখানা ছিল। এরা 'সাবুরিয়াহ' নামে লৌহ নির্ম্মিত বায়ুর দিক নিরূপক যন্ত্র আবিষ্কার করে। বিভিন্ন প্রকারের ঘড়ি এরা আবিষ্কার করেছিল। দামস্কাস নগরের বিখ্যাত জামেল মসজিদে যে ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল, সে ঘড়ির নির্ম্মাণ কৌশল অতীব বিস্ময়কর। মসজিদের মিনারের গাত্রে একটি গবাক্ষদ্বারে ছোট ছোট দ্বাদশটি পিত্তল নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী ছিল। আবার প্রত্যেক সোপানে বারটি বাতায়ন ছিল। প্রথম ও শেষ সিঁড়িতে দু'টি বাজপাখীর সম্ম কনির্ম্মিত ছিল। এক ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হলে উভয় বাজপাখী ঈষৎভাবে গ্রীবা লম্বা করে স্ব স্ব চক্ষুর সাহায্যে নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এক একটি পিতলের গুলি সজোরে সম্মুখস্থ পিত্তল গাত্রে নিক্ষেপ করত। তাতে যে শব্দ হত তার দ্বারা সময় নিরূপিত করা হত। ফরাসী পাদ্রি আরুবট ইউরোপে দোলকযুক্ত ঘড়ির ব্যবহার প্রথম প্রচলন করেন, কিন্তু তা তিনি উদ্ভাবন করেন নি; স্পেনে শিক্ষকতা কালে মুসলমান শিল্পিদের নিকট এ বিষয় শিক্ষা করেন। কায়রোর মহাপণ্ডিত ইবনইনাশ ঘড়ির দোলকযন্ত্র আবিষ্কার করেন। খলিফা হারুণ অল রসিদ ফ্রান্সের রাজাকে একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার বিজ্ঞান সভা এর নির্ম্মাণ কৌশল বুঝতে পারেন নি। হাকিম মহম্মাতদীয় অসামান্য প্রতিভাবলে 'নস্‌শরের' কূপ হতে এক প্রকার গোলাকার অত্যুজ্জ্বল প্রদীপবৎ যন্ত্র আবিষ্কার করেন প্রদীপের জ্যোতি দুয় মাইল পর্য্যন্ত যেত। মুসলমানরা ভূগর্ভ হতে তামা, লোহা, পারদ, গন্ধক প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করেছিল। জ্ঞানীপ্রবর আবুল জামান দূরদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর পরিধি গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও সংখ্যা এরই দ্বারা নির্ণিত হয়।

রোগ-পীড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জমা, হিসাব-পত্র ঐসব নিতান্ত বাস্তব কারণেই বিজ্ঞানের উন্নতি হয় পদার্থবিজ্ঞানে আরবেরা ছিল শীর্ষস্থানীয়। Hamboldt 'Kosmos' (Vol. II) গ্রন্থে বলেন, "পদার্থবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি সে-সব জড়বিজ্ঞার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলো আরবেরা।" আরবেরা রসায়ণ শাস্ত্রে কিরূপ সুপণ্ডিত ছিল তা গীবনের উক্তি হতে জানতে পারা যাবে। তিনি বলেন—

"They first invented and named the alembic for the purposes of distillation; analysed the substances of the three kingdoms of nature; tried the distinction and affinities of alkalis and acids; and converted the precious minerals into soft and solutary medicine."

আবু মুসা জাফার রসায়ন বিভায় যশস্বী হয়েছেন। এলজ্যাবরা প্রণীত হতে লাগল। জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি প্রভৃতির প্রসার হোল। বাতানি ত্রিকোনমিতির সাইন-কোসাইন (Sine and Cosine) ও আবুল ওয়াফা সেক্যান্ট ট্যান জেন্ট (Secant and Tangent) আবিষ্কার করে

অমরত্ব লাভ করেছেন। আলহাকিম কায়রোতে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে জ্যোতিষ, আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হত।

দশম শতাব্দীর আলফারাবী আরিষ্টটলের ওপর যে টিকা লিখেছিলেন তার মূল্য আজও কমেনি। চিকিৎসা বিদ্যায় সবচেয়ে প্রখ্যাতনামা ছিলেন দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের ইবনেসিনা। তাঁকে 'Prince of Physicians' বলা হত। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান বই লেখেন। তাঁর বইগুলি তৎকালের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্যালামোরে পড়ান হত। প্রায় পাঁচ শো বছর তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্র বইগুলি ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়া ইবনেসিনা গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ লেখেন। এই বইগুলি আজও তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার অপরিমেয় সাফল্যের স্বীকৃতি বহন করছে। ইসলাম জগতের প্রসিদ্ধ শিল্পী সেরনাদা দেলেনী শূল পীড়ার উপশম কারক একপ্রকার অদ্ভুত যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। একাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আলহাসান আলোক ও দৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম বললেন, "দৃষ্ট বস্তু থেকেই আলোকরশ্মি আসে আর চক্ষুগোলকের পশ্চাদবর্ত্তী ঝিল্লির ওপরে তা প্রতিফলিত হয়।" এই আবিষ্কার করে জগতে অক্ষয় যশ উপার্জ্জন করেছেন। কেপলার দৃষ্টি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে আলহাসানের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

রোজা নামাজের নিয়ম রাখতে গিয়ে, চান্দ্রমাস ও সৌর বছরকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও মানমন্দিরের প্রসার আরব-জগতে বাড়ে। বাদী ওস্তুর্লাবী খগোল সংক্রান্ত বহু যন্ত্রাদি আবিষ্কার করেন। জওয়াল জফমুল আবেদীন ও তাঁর পিতা অল্লোমা তফমুফ হোসেন খাঁ উভয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিবিধতত্ত্ব আবিষ্কার করে অবিনাশী যশের অধিকারী হয়েছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ আবুবকর টলেমির ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করে বললেন, "সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ এক অদ্ভুত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে চলা ফেরা করে তাই তাদের চলাফেরার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না।" এই সত্যের ওপরই গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, জিওরডানো-কর্ণো প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আবুবকরের গ্রহমণ্ডলী সম্বন্ধীয় তথ্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁর শিষ্য আলরিত রুস্তী।

বর্ত্তমান বিশ্বপ্রগতির পথে আজ বিজ্ঞান যে-সব নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে তার সঙ্গে কোরাণেরও কতকগুলি তথ্য মিলে গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দু' একটি উল্লেখ করছি :—

(১) চীনীয় ধর্ম্মপ্রচারক কনফুসিয়াস বলেছিলেন, "To know what we know and know what we do not know—that is wisdom." না-দেখা না-শোনার মধ্যে জ্ঞান লাভ করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য আর এরই ওপর ইসলামের ভিত্তি। এই না-জানা, না-শোনার মধ্যেও যে বাণী আছে তা বিজ্ঞান আজ অস্বীকার করে না। Viscount Samuel বলেন, "Science will not exclude the possibility of authentic messages from without. Cautions in accepting or rejecting theories within her own recognized domain, she will be even more cautious before rejecting, as well as before accepting theories which relate to the vast region that lies as yet outside." আজ বৈজ্ঞানিকেরও সাধনা চলেছে না-জানার রাজ্যে। বৈজ্ঞানিকেরা যেটুকু আজ জেনেছেন সেটুকু জেনেও বলছেন, "We do not know." এই যে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে মানবীয় জ্ঞানের ব্যর্থতা, জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারাও যে চির অজ্ঞাত চির সত্তেয়কে কিছুতেই আজ ধরতে পারা যাচ্ছে না, তাই এই হাহাকার। আজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সত্যকে চিরসত্য বলে গ্রহণ করতে পারছে না। Sir James Jeans 'The Background of Modern Science' বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, "We can never say that any theory is final or corresponds to absolute Truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it." আজ বিজ্ঞানের সাধনা চলেছে অলৌকিক রাজ্যের তত্ত্বানুসন্ধানে, ইসলামের সাধনা ও ধর্ম্ম তাই।

(২) বিজ্ঞান বলে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ এক মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোরাণ বলে, "সূর্য্য চন্দ্রকে ধরিতে পারে না, রাত্রিও দিনের নাগাল পায় না, সকলেই মহা-শূন্যের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।" (সুরা ইয়াসিন: ৪০)

রাষ্ট্রনীতি:—বর্ত্তমান প্রগতির যুগে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বান চারদিক মুখরিত করে তুলেছে। এর মূলে ঐশ্লামিক চিন্তা ও হজরতের আদর্শ বেশ কিছু পরিমাণে কাজ করছে। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদীদের মূলনীতির অনেক আদর্শ হজরত মহম্মদ বহু যুগ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

বর্ত্তমানে সাম্যবাদের সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে সকলে সমান; এখানে বড় ছোট,ইতর ভদ্রের কোন তফাৎ নেই। বহু বছর আগে ইসলাম এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছে, "কানান্নাসো উম্মাতান্ ওয়াহেজাৎ"—সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি। (সুরা বকরা ২: ২১৩) হজরত মোহম্মদও বলেছেন,"আন্নাসু সওআসিয়াহ"—সকল মানুষ সমান—"আক ইনমানু আখু-ল্ ইন্সানি হ'াব্বা আম কারিহা"—ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক, সকল অবস্থাতে মানুষ মানুষের ভাই—"লা য়ুমিনু আহা'দুকুম্ হাত্তা য়ুহি'ব্বুলি আখীহি মা য়ুহিব্বুলি নাফসিহি"—যে পর্য্যন্ত কেউ ভাইয়ের জন্যে তা না ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্যে ভালবাসে, সে পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মবিশ্বাসী হবে না।

হজরতের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িত জনসাধারণকে উদার মানবতার উচ্চ আসন প্রদান করে মানবজাতিকে এক বিরাট ভ্রাতৃত্বমণ্ডলে পরিণত করা; এই ভ্রাতৃত্বমণ্ডলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষী মানুষ গ্রহণ করে বহুর মধ্যে ঐক্যের সংহতি রক্ষা করে প্রত্যেকে অপরের কল্যাণসাধন করবে। তিনি যে শরীয়তী রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তা'তে শুধু ধর্ম্মের স্বাধীনতা দেননি, ধর্ম্ম ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাও ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়ে যে প্রথম সার্ব্বভৌম উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এ যুগের রাজনীতির প্রধান আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষ তো নিজেকে এইরূপ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদকে আজ আর কেউ সমর্থন করেন না। সাম্রাজ্য তন্ত্র তুলে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সাম্যবাদের উদ্দেশ্য। রাশিয়ার সাম্যবাদ রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন করেছে, ইসলামের খেলাফৎ তন্ত্রও প্রায় সেইরূপই শাসনের প্রবর্ত্তন করেছিল। ইসলামের 'খলিফা' বা 'আমিরুল্ মুমেনিন' ও যা, সোভিয়েট রাশিয়ার 'ডিক্টেটার'ও ঠিক তাই। তবে কালের ব্যবধানে রূপ কিছু পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মনীষি Bertrand Russell রাশিয়ার প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনকে খেলাফৎ শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'Education and the Social Order' পুস্তকের একস্থলে তিনি বলেছেন, "In so far as Russia is Asiatic, the communist party takes the place of the Caliphate; while in so far as Russia is European, the Communist party takes the place of the church."

অর্থনীতি:—পুঁজিবাদ ও জোতদারের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের যেরূপ সমর্থ ইসলামেরও সেরূপ অন্ততঃ মূলগত বিষয়ে। কোরাণ বলে, "যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুত করিয়া রাখে এবং আল্লার কাছে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে ব্যয় না করে, তাহাদের জন্য ঘোর শাস্তি আছে এরূপ ঘোষণা করিয়া দাও।"

'সমস্ত সম্পত্তি ষ্টেটের': সাম্যবাদ বলে, আর ইসলাম বলে, 'সমস্ত সম্পত্তি আল্লার', কাজেই আল্লার সম্পত্তিতে সকলেরই ন্যায্য অধিকার থাকবে। তাই কোরাণ বলেছে "তাহারা এই ভীষণ আগুণে পুড়িবে যাহারা এই ধনসম্পত্তি মজুত করিয়া বা বদ্ধ করিয়া রাখে।" (৭০: ১৮)

মহাজনী প্রথাকে কেউ বর্ত্তমানে বরদাস্ত করেন না। ইসলাম বহুপূর্ব্বে বলেছে, "যাহারা সুদ খায় তাহারা উন্নতি করিতে পারে না।"

"হে বিশ্ববাসিগণ, কখনও সুদ খাইও না।"

সাম্যবাদ বলে, "No work no bread" কোরাণও বলেছে 'খাট খাও'। কোরাণ বলছে, "উৎকৃষ্ট পুরস্কার হচ্ছে কর্ম্মীর পুরস্কারে।" (৩: ১৩৫)। "যাহারা অলসভাবে বসিয়া থাকে তাহাদের চেয়ে যাহারা কাজ করে তাহাদিগকেই আল্লাহ ভালবাসেন।" (৪: ৩৮) হজরত মোহম্মদও বলেন, "নিজ হাতে কর্ম্ম করে যা

পাওয়া যায় তার চেয়ে সুন্দর জিনিষ আর কেউ কখনও পেতে পারে না।"

এই অনুশাসনের সঙ্গে পাঠকেরা যদি মুসলিম জাতির ইতিহাস মিলিয়ে পড়েন, তাহলে দেখবেন যে ইতিহাসের ধারা চলেছে অন্য পথে। ধর্ম্মের নামে তারা মানুষের উপর কম অতিরিক্ত অত্যাচার করেনি। সুদ খাওয়া যে নিষেধ একথা তারা মানে নি। মানুষ মাত্রেই যে সমান, খলিফা ও ভিখারীর মধ্যে যে কোন তফাৎ নেই—এ অনুশাসন টেকে নি। খলিফা ও সাধারণের মধ্যে এক ভেদদৃষ্টি রয়ে গেছে। তাই মুসলমান চাষী ও শোষিত মুসলমান আর শোষণবাদী মুসলমান আমীর ওমরাহের জীবনযাত্রাও এক নয়, উভয়ের কালচারও কোথাও এক নয়। এজন্যে গোপাল হালদার বলেছেন, "প্রকাণ্ড 'মুসলমান জগতের' পরস্পরের মধ্যে যে মিলন সে মিলন প্রধানত এক কালচারের নয়, এক রিলিজিয়নের। সে মিল ইসলামের ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু নিয়মনীতির।"

নারীপ্রগতি:—বর্ত্তমান যুগ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করেছে। ইসলামও বলেছে, "পুরুষদের উপর স্ত্রীদের ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে যেমন স্ত্রীদের উপর পুরুষদের আছে। (সুরাবকরা ২ঃ ২২৮) সম্পত্তিতে শুধু যে পুরুষেরই অধিকার আছে তা নয়, নারীরও অধিকার আছে। হিন্দুসমাজে আজকে আইন করে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বর্ত্তমান সাম্যবাদ সম্পত্তির ওপর পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করে। বিবাহকালীন স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীকে দেন মোহর দান নারী সমাজ উন্নয়নের প্রধান দৃষ্টান্ত। স্বামী যে শুধু স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে তা নয় প্রয়োজন হলে স্ত্রীও স্বামীকে ত্যাগ করে। বর্ত্তমান যুগ নারীর এইরূপ অধিকার তো চায়।

বর্ত্তমানে নারীরা পোষাকের দিক দিয়ে যেরূপ 'মিতব্যয়ী' হয়ে উঠেছেন, তাতে পথিকদের লজ্জায় মাথা নত করতে হয়। তাই ইসলাম বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বলেছিল, "বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, তাহারা তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গুপ্ত স্থানগুলি আচ্ছাদিত রাখুক ইহাই তাহাদের পক্ষে পবিত্রতা এবং বিশ্বাসী নারীদিগকেও বল, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গোপনীয় অংশগুলি আবৃত রাখুক এবং যেটুকু না বাহির করিলে চলে না সেইটুকু ছাড়া (অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ) অন্য কোন অংশের অলঙ্কার প্রদর্শন না করে।" (সুরা নূর—২৪ : ৩০-৩১) অন্যত্র আছে: "বিশ্বাসীদিগের স্ত্রী কন্যাদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের গায়ের উপর একটি অঙ্গাবরণ দেয়, ইহাই অধিকতর সঙ্গত হইবে কারণ তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া মানিতে পারিবে এবং পীড়া দিবে না।" (সুরা আহজার ৩৩ : ৫৯)। এরূপ আদর্শকে কদর্থ করে মুসলমানেরা স্ত্রীকে অন্দরমহলে অবরুদ্ধা করেছে। এরই দোহাই দিয়ে ইসলাম নারীকে যে সব অধিকার দিয়েছিল তারা তা কেড়ে নিয়েছে। তাই হারিজ সেলমা এক্রাম বলেন, "পয়গম্বরের তিরোধানের বহু শতাব্দীর পর দুষ্ট শাসনকর্ত্তারা মহম্মদের উপদেশের কদর্থ করে বলল যে পুরু অবগুণ্ঠনে নারীকে আবৃতা থাকতে হবে।" আজকে পোষাকের দিক দিয়ে অত্যাধুনিকের নামে নারীরা যেরূপ হয়ে উঠেছেন তাতে আমাদের মনে হয় ইসলামের বিধান বর্ত্তমানে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কতকটা আশার আলোকপাত করতে পারে।

নারীস্বাধীনতার স্বপক্ষে সুধীশ্রেষ্ঠ ইবনে রুশদ বলেছিলেন, "তরুণের রুদ্রশক্তির সঙ্গে তরুণীর সংগঠন শক্তি সংযোজিত হওয়া চাই।" বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রনায়করাই এই আদর্শই কি চান না?

কথা শেষ

আজ যাঁরা নীচ স্বার্থসাধনের জন্য ঐস্লামিক সংস্কৃতির মধ্যে যেটুকু মহৎ প্রাণ আছে সেইটুকুকেও বিকৃত করে প্রতিহিংসার জঘন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন, তা কার নির্দ্দেশে জানিনে। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে আজকের তথাকথিত নেতারা কাল কোথায় তলিয়ে যাবেন, কোথায় মিলিয়ে যাবে তাঁদের অলীক মরীচিকা। জনগণকে তাঁরা চিরকাল বোকা করে রাখতে পারবেন না। একদিন না একদিন তাদের ঘুম ভাঙ্গবেই।*

---

* মেদিনীপুর আহ্বান সংস্কৃত পরিষদের উদ্যোগে 'মুসলিম কালচার' বিষয়ক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

নবগঙ্গা

রণজিৎকুমার সেন

নয়

ট্যুইশনির কাজ ক'দিন আগেই শেষ হ'য়েছিল। এবারে পরীক্ষা শেষ হ'লে ইচ্ছে ক'রেই দিন কয়েক দৌলতপুরে থেকে গেল বিজন। ইচ্ছেটা অহেতুক নয়। এতদিন মনের উপর দিয়ে তার ঝড় ব'য়ে গেছে, এবারে খানিকটা শান্ত পরিবেশে মনটাকে যথাসম্ভব প্রশমিত ক'রে নিতে চায় সে। ট্যুইশনির টাকা থেকে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গিয়েছিল হাতে। তাই ভাঙিয়েই দিন কয়েক সে ঘুরে বেড়ালো এখানে ওখানে। কিন্তু তাতেও যে শান্তি পেলো—তা নয়। বুদ্ধি দিয়ে সে মনের দুর্ব্বলতাকে যতই ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা ক'রলো, ততই সে মনের মধ্যে বার বার পাক খেয়ে ম'রলো। হোষ্টেলের সীট ছেড়ে দিয়ে এবারে তাই সুবিধে মতো একদিন দেশের দিকেই রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন।

নির্ম্মলা অনেকখানিই শুধ্‌রে উঠেছিলেন। তবে শরীরে আজ আর আগের মতো বাধুনি নেই, অনেকখানিই কৃশ হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি।

বাড়ীতে এসে মাকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই মায়ের স্বাস্থ্যের দিকটা বিজনের চোখে প'ড়লো। ব'ল্‌লো, 'শরীরের উপর কি এমন ক'রেও অযত্ন ক'রতে হয়। আমি কাছে নেই ব'লে তোমার নিজের চোখেও কি নিজেকে কখনো ধরা পড়ে নি মা?'

স্মিতহাস্যে নির্ম্মলা বল্‌লেন, 'এমন বেশী কি হ'য়েছে বাবা। অনেকদিন পরে দেখলে এম্‌নিই মনে হয়। এ কিছু নয়।'

—'একে তুমি কিছু নয় ব'ল্‌ছো?' মায়ের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেখলো বিজন।

সস্নেহে ছেলের চিবুক স্পর্শ ক'রে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'শরীরে যেটুকু গলদ আছে, এবারে তুই দু'দিন আমার কাছে থাক্‌লেই সেটুকু কেটে যাবে বিজু।'

—'আচ্ছা, দেখবো কেমন কাটে।'

উপস্থিত মতো এখানেই কথা শেষ হ'লো বিজনের।

দিন কয়েক কেটে গেলে নির্ম্মলা হিসেব ক'রে দেখলেন—এর মধ্যে স্বতোৎসারিত হ'য়ে বিজনের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোয় নি। ঠাই পেতে খাবার দিয়েছেন তিনি, নীরবে খেয়ে উঠে গেছে বিজন। আগে আগে এই খাবার নিয়ে কী না ক'রেছে সে। ভালো জিনিষকে ভালো ব'লে চেয়ে নিয়েছে, ডালে কি তরকারীতে কখনও লবণ-কাটা হ'লে 'কি ছাই রাঁধো যে' ব'লে নির্ম্মম হাতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যেও কি কম শান্তি পেতেন নির্ম্মলা! আজ খাওয়া নিয়ে এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই বিজনের কোনো কিছু নিয়েই এতটুকুও আব্দার নেই। এ যেন কেমন্‌ই হ'য়ে গেছে বিজন।

একসময় বাটিতে ক'রে গোটা কয়েক পিঠা এনে তুলে ধ'রলেন তার সাম্‌নে নির্ম্মলা: 'নে ধর, মুখে দিয়ে দেখ তো বাবা, কেমন লাগে। কিছু তো ক'রতে পারি নি, তবু অনেক কষ্টে ক'টা চাল্‌তের পিঠা বানিয়ে রেখে-ছিলাম তুই এসে খাবি ব'লে। দেখ্ তো বাবা, কেমন হ'য়েছে।'

—'বেশ হ'য়েছে, রাখো।' ব'লে পাঠরত কি একখানি ইংরেজি ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় পুনরায় মনঃসংযোগ ক'রলো বিজন।

এম্‌নি ভাবেই আজকাল অধিকাংশ সময় কাটে তার। ঘরে থাকলে নিজের পুরোনো প'ড়বার জায়গায় ব'সে কিছু একখানি বই কিম্বা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় ডুবে থাকে সে, কখনও খেয়াল হ'লে ফাঁকা মাঠ কিম্বা নবগঙ্গার পাড় দিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চেষ্টা ক'রেছে, চিন্তা ক'রেছে, বিচার ক'রে দেখেছে, কিন্তু মনটাকে সে আজও জয় ক'রে উঠতে পারলো না। প্রতিমুহূর্ত্তে সে মনের মধ্যে পাক খেয়ে ম'রছে।

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'বেশ হ'য়েছে কি রে, মুখে না দিয়েই ও আবার কি কথা। এত কষ্ট ক'রে বানালাম, মুখে দিয়েই না হয় বল!' হাত বাড়িয়ে ম্যাগাজিন-খানিকে টেনে নিতে গেলেন নির্ম্মলা, কিন্তু পারলেন না।

রাগত কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'আঃ, বড্ড জ্বালাতে পারো তুমি মা। কি চমৎকার ভাবে রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধটা লিখেছে উইলোনস্কি, তুমি আরম্ভ ক'রলে বিরক্ত ক'রতে!'

—'মায়ের এ জ্বালাতন তো আজ নতুন নয় বাবা যে, রাগ ক'রছিস্!' থেমে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন, 'আচ্ছা, তোর কি হ'য়েছে, বল্ তো বিজু?'

—'কি আবার হবে, কিছু না।'

—'আমাকে ফাঁকি দিস নে বাবা। পরীক্ষা দিয়ে এতদিন পরে ঘরে ফিরলি, কোথায় হেসে খেলে দিন কাটাবি, তা নয়—দিন রাত কেবল মুখ ভার ক'রে ব'সে থাকিস। এতে কি আমিই শান্তি পাই?' অলক্ষ্যে বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন নির্ম্মলা।

—'মুখ ভার ক'রে থাকতে কোথায় দেখলে মা?' বিজন ব'ল্‌লো, 'এতদিন তো বই মুখস্ত ক'রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই দিলাম, তার উপরে আত্ম-পরীক্ষাও তো কিছু আছে! জগতে চ'লতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে আজ ভাববার প্রয়োজন আছে বৈ কি অনেকখানি।'

—'সে প্রয়োজন কি এম্‌নি ক'রেই মেটাবি- তবে? সে প্রয়োজনের কাছে আমি পর্য্যন্ত কিছু নই?'

—'তুমি ভিন্ন কি আমি কিছু! তুমি তো র'য়েছই মা।' নির্দ্বিধায় এবারে বাটি থেকে পিঠা তুলে নিয়ে মুখে দিল বিজন। ব'ললো, 'বাঃ, ভারী চমৎকার তো? এর আগে নিশ্চয়ই এ জিনিষ তুমি আর বানাও নি মা, কি বলো?'

এবারে না হেসে পারলেন না নির্ম্মলা, বল্‌লেন, 'সেবার না তৃতীয় সনে হাঁড়িভর্ত্তি বানালাম? ছন্দা আর রেবাকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়ালি তুই। এরই মধ্যে ভুলে গেলি?'

—'এতদিনও তা আবার মনে থাকবার কথা নাকি, তুমিও যেমন—।'

পিঠার বাটিটা নিঃশেষ হ'য়েই গিয়েছিল। এবারে পুনরায় ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ ক'রলো বিজন। রাশিয়ার এক সাংবাদিক উইলোনস্কির লেখা: নতুন বল্‌শেভিক্ শিক্ষা-পদ্ধতিতে কি ভাবে দ্রুত সমাজ-কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার জনসাধারণ—এই নিয়ে বিস্তৃত এক সারগর্ভ প্রবন্ধ। প'ড়তে প'ড়তে অভিভূত হ'য়ে গেল বিজন। একটা দেশ এমন ভাবেও ভাবতে জানে, এমন সুন্দর ক'রেও গ'ড়ে তুল্‌তে পারে তার অগণিত জনসংখ্যাকে! নিজের দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে হতাশায় এক্‌বার বুকখানি ভ'রে উঠলো তার। সুচতুর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কেমন সুন্দর ভাবে নিরক্ষরতার আফিং খাইয়ে রেখেছে ভারত-বর্ষকে! মনে মনেই একবার উচ্চারণ ক'রলো বিজন: 'ক্ষমা ক'রতে নেই এমন গভর্ণমেণ্টকে।' তার-পর ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা বুজিয়ে রেখে একসময় বাইরে বেরিয়ে প'ড়লো সে।

রসিকলালের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো সেই পেয়ারা গাছটা। একদিন এই গাছ থেকে ডাল কেটে নিয়ে সে হকি বানিয়ে তবে ম্যাচ খেলতে গিয়ে জিতে এনেছিল মেডেল। নীচে দাঁড়িয়ে সেদিন পাহারা দিয়েছিল ছন্দা। কত সন্তর্পণ, কত ভয় ছিল সেদিন দু'জনের চিত্তে। আজ তা বাসি হ'য়ে গেছে, বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে সেদিনের ইতিহাস। কিন্তু কালের সাক্ষি হ'য়ে গাছটা এখনও

বেঁচে আছে। কিন্তু সেদিনের মতো গাছটার আজ আর যৌবন নেই। বড় বড় ডাঁসালো পাতার পরিবর্ত্তে আজ কতকগুলো পোকে-কাটা ছোট ছোট লালচে পাতায় ভ'রে আছে ক্ষীণকায় ডালগুলো। অতীতের নিশ্চিহ্নতার মতো একেও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে মহাকালের গর্ভে।...

নানাভাবে আজ বারংবার এসে মনের সামনে দাঁড়ায় ছন্দা। সেদিনের সেই মেডেল জেতা নিয়েই না কি হুলু-স্থূলটাই হয়েছিল! স্বপ্ন, একটা স্বপ্ন মাত্র আজ সে সব কিছু।

সামনের বহির্ব্বাটিতে ব'সে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন রসিকলাল। বছরখানেক হ'লো তিনি বাতে কতকটা পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। বাঁ পায়ের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আজ আর হাঁটতে পারেন না। সঙ্গে তাই লাঠি ব্যবহার ক'রতে হয়। আইনের ঘরে তাতে অর্থের টান প'ড়েছে। দুশ্চিন্তায় আজ নিজের মধ্যে ব'সে হাবুডুবু খাচ্চেন রসিকলাল। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে ব'সে গড়গড়ায় তামাক টান্‌ছিলেন আর জান্‌লার পথে বাইরের দিকে কি যেন অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য ক'রছিলেন তিনি। হঠাৎ বিজনকে চোখে প'ড়তেই সাদরে কাছে ডেকে এনে বসালেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বাড়ী এলে কবে বিজু? শুনেছিলাম এবার তুমি পরীক্ষার এপিয়ার হ'চ্চ, শুনে আনন্দ পেয়েছিলাম। তা বেশ ভালো পরীক্ষাই দিয়েছ তো?'

প্রশ্ন দু'টোর একসঙ্গে জবাব দেওয়া কঠিন হ'লো বিজনের পক্ষে। প্রথম প্রশ্নটাকে তাই চেপে গিয়ে ব'ল্লো, 'ফার্ষ্ট ডিভিসনে যাবো, আশা ক'রছি।'

শুনে খুসী হ'লেন রসিকলাল। ব'ললেন, 'তোমার বাবার একদিন খুব গর্ব্ব ছিল তোমাকে নিয়ে। তখন তুমি একেবারেই ছোট। একদিন তোমাকে কোলে নিয়ে বেড়াতে এলেন আমার এখানে। কথায় কথায় ব'ললেন, বিজুকে আমার মানুষের মতো মানুষ ক'রে তুলতে হবে। আমি হেসে ব'ল্লাম, তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু এমন ক'রে যে মনের আশা বুকে চেপে হঠাৎ সংসার ছেড়ে চ'লে যাবেন তিনি, ভাবতেই পারিনি। এক সঙ্গে পুরো চল্লিশ বছর কাটিয়েছি আমরা পাশাপাশি। আজ মনে হয়, তিনি বেঁচে থাক্‌লে তোমার পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর মতো সুখী বোধ করি আর কেউ হ'তেন না।'

কথা ব'ললো না এবারে বিজন, রসিকলালের মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে নীরবে ব'সে রইল।

স্বল্পক্ষণ থেমে রসিকলাল ব'ললেন, 'এরপর বি. এ প'ড়ছো তো নিশ্চয়ই? তোমার মা কি বলেন?'

—'আমার তো ইচ্ছেই, তবে মার তেমন মত নেই। একা একা মার কষ্ট হয় ব'লেই ছেড়ে দিতে চান না মা আমাকে।' বিজন ব'ললো, 'সংসারে আর কেউ দ্বিতীয় লোক না থাকায় মাকে নিয়ে বাস্তবিকই বড় দুর্ভাবনায় প'ড়েছি। অথচ আমারও পড়াশুনো না ক'রে উপায় নেই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো।'

কিছুক্ষণ গড়্‌গড়ায় ধূম-উদ্গীরণ ক'রে রসিকলাল বললেন, 'সত্যিই বড় অসুবিধায় প'ড়েছ তুমি।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনার শরীর আজকাল ভালই যাচ্ছে তো?'

—'আর ভালো!' হাত থেকে এবারে গড়্‌গড়ার নলটাকে নামিয়ে রাখলেন রসিকলাল।—'শরীর কি আর আছে বাবা, বাতেই আমার সর্ব্বনাশটি ক'রেছে। দোবেলা সমানে ক'ব্‌রেজি তেল মালিস ক'রেও যদি ছোট্টই পেলাম!'

—'যন্ত্রণা হয় খুব, তাই না?'

—'আগে নিয়মিতই হ'তো, এখন একাদশী পূর্ণিমায় বাড়ে, ঠাণ্ডা লাগলে আর কথা নেই, প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়।' নরম হাতে বাঁ পা খানিকে একবার তুলে ধ'রতে চেষ্টা করলেন রসিকলাল। ব'ললেন, 'এ-ই বোধ হয় আমার কাল হ'লো!'

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'ছন্দার চিঠিপত্র পান কিছু?'

—'হ্যাঁ, পাই বৈ কি!' রসিকলাল ব'ল্লেন, 'আগে আগে প্রতি সপ্তাহেই একখানা ক'রে লিখতো, এখন মাঝে মাঝে লেখে। সংসার ঘাড়ে প'ড়েছে, সময় পায় কোথায়! তবে সুখে আছে, এইটুকুই যা শান্তি। আমার বেয়াই মশাই বড় ভালো লোক। তাঁর সাজানো

সংসারে ছন্দা আজ একমাত্র কর্ত্রী। কোনো অভাব নেই, কোনো তাড়না নেই, বেশ আছে মা আমার।'

বেশ আছে ছন্দা, এইটুকু জান্‌বার জন্যেই মনটা এতক্ষণ উন্মুখ হ'য়ে ছিল, এবারে নিজের মধ্যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নিল বিজন। তারপর দু'এক কথায় এক-সময় বিদায় নিয়ে উঠে প'ড়লো সে। উঠে যে বেশী দূরে গেল, তা নয়। সাম্‌নের পথে কিছুটা এগিয়ে আস্‌তেই রেবাদের পরিত্যক্ত বাড়ীটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। রেবার জন্যও মনটা একবার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার বাল্য আর কৈশোরের প্রথম সাথী— ছন্দা আর রেবা। তারা চ'লে গিয়ে বিজনের জীবন-নদীতে যেন রৌদ্রদগ্ধ বিরাট একটা চরের সৃষ্টি ক'রে গেছে। সেই রৌদ্রদগ্ধ মরুসদৃশ চরের বুকে খ্যাপার মতো শুধু পরশপাথর খুঁজে ম'রছে আজ বিজন। দেখ্‌লো—বাড়ীটা ফাঁকা প'ড়ে নেই। নতুন ভাড়াটে এসেছে। কে একজন আধা-বয়সী লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁক্‌চে, বিজনকে ইচ্ছে ক'রেই যেন লক্ষ্য ক'রলো না। ক্রমেই আবহাওয়া বদ্‌লাচ্ছে গ্রামের, একদিন সারা গ্রামটাই অপরিচিত হ'য়ে যাবে তার কাছে।

এ-পথে সে-পথে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো পায়চারি ক'রলো বিজন, তারপর সোজা ঘরে ফিরে আবার বই নিয়ে ব'স্‌লো। পরীক্ষার চাপে প'ড়ে অনেকদিন সে কবিতার খাতা নিয়ে ব'স্‌তে পারে নি, এবারে ভাবলো— পর পর অনেকগুলো কবিতা লিখবে। আশ্চর্য্য কি, একদিন বাংলাদেশের মাসিক আর সাপ্তাহিকগুলোর পাতা ভ'রে উঠ্‌বে তার কবিতায় আর প্রশংসায়। জীবনের বিস্তার ঘটবে তার দিকে দিকে। আত্মখেয়ালেই মনে মনে একবার রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি ক'রলো সে:

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।...'

জীবন মানেই বিস্তার, যেখানে গতি নেই—বিস্তার নেই, মানুষ সেখানে বেঁচে থেকেও মৃত। তেমন বাঁচা বাঁচতে চায় না সে। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে গ'ড়ে তুল্‌বে জীবন, সেই জীবনের মধ্যে পল্লবিত হ'য়ে উঠবে সোনার এই বাংলা দেশ। এ কি স্বপ্ন, একি দুরাশা মাত্র? সংসারের এই গৃহ-পরিবেশ ছাড়িয়ে চোখের পলকে মনটা যে কোথায় কতদূরে ভেসে গেল, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

দিন দু'য়েক কেটে গেলে একসময় নির্ম্মলা একটা খবর নিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন। —'বিলমামুদপুর থেকে একটি বিধবা মেয়ে এসে আশ্রয় চেয়ে দাঁড়িয়েছে। বছর সাতাস-আঠাস বয়েস, সংসারে কেউ নেই, একেবারে নিরাশ্রিত। দেখ্‌লে মায়া হয়। বলিস্ তো রাখি বাড়ীতে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি কি বাড়ীর কর্ত্তা যে আমাকে জিজ্ঞেস্ ক'রছো?'

—'নয়ই বা কেন।' নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বাড়ীতে কেউ থাক্‌বে, তোর ইচ্ছে অনিচ্ছেটাও তো আছে।'

—'তুমি থাক্‌তে আমার আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে। তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছে।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'রাখো না, ভালোই তো। দিনরাত একা একা ঘরে মুখ বুজে থাক্‌তে হয় তোমাকে, তবু কেউ কাছে থাক্‌লে দু'টো কথা ব'লে দিন কাটাতে পারবে। তা—যাকে রাখছো, ভদ্র ঘরের তো?'

—'ভদ্রঘরের ব'লেই তো ব'ল্‌ছি বাবা।'

এবারে খানিকটা ভাবতে হ'লো বিজনকে। যাকে এখনও অবধি চোখে দেখে উঠতে পারে নি সে, উপস্থিত-ক্ষেত্রে সম্বোধনের বালাই নিয়ে কি আচরণ গ'ড়ে উঠবে তার সঙ্গে, এইটেই সমস্যা। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে পরে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'নাম কি, কিছু জেনেছ?'

—'জেনেছি বৈ কি, নাম ছাড়া আলাপ হ'লো কি ক'রে।' স্মিতহাস্যে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'অতসী, বেশ নাম।'

—'তা তো যেন বেশ, আমাকে তো কিছু ব'লে ডাক্‌তে হবে, কি ব'লে ডাকবো বলো তো?' কিছুক্ষণের জন্য একবার অপলক দৃষ্টিতে তাকালো বিজন মায়ের মুখের দিকে।

হেসে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কেন, দিদি ব'লেই ডাক্‌বি, অতসীদি ব'লে।'

—'তা হ'লে তোমার মেহে এবার থেকে ভাগ ব'স্‌লো বলো ?' ঠোঁটের কোণে মৃদু একটুক্‌রো হাসি টেনে বিজন ব'ল্‌লো, 'আমার পক্ষে এত বড় ক্ষতি সহ্য করা শেষ পর্য্যন্ত কি সত্যিই সম্ভব হবে মা ?'

—'পাগ্‌লা ছেলে।' ব'লে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না নির্ম্মলা। হাস্‌তে হাস্‌তেই ফিরে গিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলেন তিনি।...

যথাসময়েই অতসী এসে আশ্রয় নিল। প্রথমটা সংশয় থাক্‌লেও দু' একটা দিন কেটে গেলে দেখা গেল—তার সঙ্গে কেমন ক'রেই যেন ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে বিজন। অতসীর কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার আপ্‌নি থেকেই আকৃষ্ট ক'রেছে তাকে। নির্ম্মলা আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন প্রথম দিনের আলাপেই, এবারে দেখে তিনি খুশী হ'লেন। তার খাবারের পাতে যদি দু'খণ্ড তরকারি বেশী প'ড়লো, অমনি হাত সরিয়ে নিয়ে ব'স্‌লো অতসী : 'এ কিন্তু ভারী অন্যায় মা, পথের মেয়েকে এমন ক'রে ঠেসে ঠেসে খাইয়ে নিজে কি উপোষ দিতে চান ?'

—'উপোষ কেন দেবো মা, কিচ্ছু বেশী দিইনি, খাও।' সস্নেহে জোর ক'রলেন নির্ম্মলা।

বাধ্য হ'য়ে মুখে তুল্‌তে হ'লো অতসীকে।

সুযোগ পেয়ে একসময় বিজন ব'ল্‌লো, 'অম্‌নি ক'রে ঐ কথাগুলো আর নাই বা উচ্চারণ ক'রলে অতসীদি! নিজেকে এমন ক'রে কেবল বাইরের ব'লে কেন ভাবো, বলো তো ? সংসারে রক্তের সম্বন্ধটাই কি বড়, জীবনের সম্পর্কটা কিছু নয় ?'

এবারে থাম্‌তে হ'লো অতসীকে। জীবন ব'লে আজ আর তার সাম্‌নে কিছু নেই। জীবনটা কবেই অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে তার তলিয়ে গেছে। আজ শুধু কাঙাল-চিত্তে দুয়োর থেকে দুয়োরে কেবল ঘুরে মরা। তবু নিজেকে অনেকখানি চেপে নিয়ে তাকে ব'ল্‌তে হ'লো : 'আচ্ছা, আর ব'ল্‌বো না। জীবনে যার ভাইয়ের স্নেহ এত বড়, সে নিঃস্ব কিসে ?'

উত্তরে কিছু একটাও আর না ব'লে নীরবে এসে আবার প্রশ্নসাগরে ডুবে গেল বিজন।

যথাসময়ে তার পরীক্ষার ফল জানিয়ে দৌলতপুর হোষ্টেল থেকে চিঠি এসে পৌঁছালো। ফার্ষ্ট ডিভিসনেই সে পাশ ক'রেছে বটে, কিন্তু একটা 'লেটার'ও অদৃষ্টে জোটেনি। বাংলা সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু আশা ছিল তার, কিন্তু সে আশা এবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। আত্মধিক্কারে মনটা বিষিয়ে উঠলো হঠাৎ। কবিতার খাতায় আর কলম চ'ল্‌তে চাইল না। বিষণ্ণ মনে এক-সময় খাতাখানি বুজিয়ে রাখলো বিজন।

কিন্তু নির্ম্মলার কাছে ছেলের পাশের সংবাদটাই যথেষ্ট হ'লো। তাই নিয়েই তিনি স্থানীয় স্কুলের হেড্‌মাষ্টার থেকে সুরু ক'রে কাছাকাছি অনেককেই নিমন্ত্রণ ক'রে জলখাবার খাওয়ালেন। সবাই এসে দীর্ঘায়ু আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা ক'রে গেল বিজনের। কিন্তু কোনো আশীর্ব্বাদই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ ক'রতে পারলো না বিজন। এমন কি, কথাপ্রসঙ্গে হেড্‌মাষ্টার মশাই যখন তাকে স্কুল-মাষ্টারী গ্রহণ ক'রবার জন্য নানারকম উৎসাহ-বাচক উক্তি ব্যবহার করলেন, তখনও সে নির্ব্বিকার ভাবেই নিজের অক্ষমতা জানিয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রলো বিষয়টাকে। মনে মনে সে স্থির ক'রলো—এবারে সে ক'ল্‌কাতা গিয়ে বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হবে। আজব নগর ক'ল্‌কাতা রাজধানী। বড় হবার এবং অধঃপাতে যাবার দু'টো পথই প্রশস্ত সেখানে। তার মধ্যে প্রথমটা সম্পর্কে একটা দুরন্ত আশায় মনে মনে ছুটে বেরিয়েছে সে এতদিন ক'ল্‌কাতার রাজপথে। বিশ্ববিদ্যালয়, লাট সাহেবের বাড়ী, মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ, মোহনবাগানের খেলা—সব কিছু মিলিয়ে ক'ল্‌কাতা একটা অদ্ভুত স্বপ্নের দেশ। সেখানে মনটা যে আপ্‌নি থেকেই বড় হ'য়ে ওঠে। মনের ইচ্ছেটাকে তাই একসময় মার কাছে ব্যক্ত ক'রে ব'স্‌লো সে।

শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল নির্ম্মলার। ব'ল্‌লেন, 'আমাকে তবে আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই ফেলে রেখে যাবি তো ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'অন্ধকারটাই শুধু দেখ্‌লে, সাম্‌নের আলোর পথটা তোমার চোখে প'ড়লো না? ত্রিশ টাকার আই-এ পাশ স্কুল-মাষ্টারীই ভালো, না বি-এ, এম্‌-এ পাশ ক'রে জীবিকার্জ্জনের সম্মানজনক উঁচু কোনো পথ বেছে নেওয়াই শ্রেয়, তুমিই বলো মা?'

কথা ব'ল্‌লেন না নির্ম্মলা।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ঘরে আজ অতসীদি র'য়েছে, তোমার ভাবনা কি?'

—'না, ভাবনা কি!' নীরবে বুকের মধ্যে দুঃখ চেপে নিয়ে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'তোর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো, আমি কি তোর তেমন মা বিজু? ক'ল্‌কাতা কেন, বড় হ'য়ে একদিন তুই বিলেত যা না, হাসিমুখেই আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো।'

—'এ কি তুমি সত্যিই স্বাভাবিক মনে ব'ল্‌ছো মা? এটা তোমার দুঃখের উক্তি।'

—'না রে না, দুঃখ ক'র্‌তে যাবো কিসের জন্তে! যার এমন বুক-জুড়োনো সোনার টুক্‌রো ছেলে, তার আবার দুঃখ কিসে!' কৃত্রিম একবার হাস্‌তে চেষ্টা ক'রলেন নির্ম্মলা।—'আমি ভাবচি অন্য কথা; ক'ল্‌কাতার মতো জায়গায় তোর খরচা পোষাবে কি করে?'

কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রেই বিজন ব'ল্‌লো, 'শুনতে পাই ক'ল্‌কাতার আকাশ দিয়ে টাকা উড়ে যায়। দৌলতপুরে ট্যুইশনি পেলাম, আর ক'ল্‌কাতায় পাবো না? চেষ্টা ক'র্‌লে দু'চার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ক'রে নিতে পারবো, এ তুমি দেখে নিও মা।'

আর কথা বাড়াতে গেলেন না নির্ম্মলা। অতসীকে সঙ্গে নিয়ে ভাঁড়ারের কাজে গিয়ে মন দিলেন তিনি।

দিন দেখে ক'ল্‌কাতার পথে একসময় রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন। অতসী ব'ল্‌লো, 'এমন অনাত্মীয় দিদিটাকে গিয়ে দু'দিনেই ভুলে যাবে তো বিজু ভাই?'

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'তুমি মনে রাখলেই দেখবে আমি ভুলিনি। কাছে থেকে যার স্নেহ তুমি শুষে নেবে, এ কি দূরে থেকে সত্যিই সহ্য ক'রতে পারবো? চিঠির আশ্রয় আমাকে বাধ্য হ'য়ে নিতেই হবে, তার জন্তে কিছু ভেবো না।'

অতসী না ভাবলেও মনে মনে দুর্ভাবনায় পুড়তে লাগ্‌লেন নির্ম্মলা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে আগে যত উৎসাহ বাক্যই উচ্চারণ করুন্ না কেন নির্ম্মলা, বিজনের যাত্রাপথে তিনি কিন্তু চোখের জল গোপন না করে পারলেন না। কাঞ্চনভূমি ক'ল্‌কাতা: বিজনকে একদিন সে সুস্থ ভাবে ফিরিয়ে দেবে তো আবার এই গ্রামে?

দশ

স্বপ্নের ক'ল্‌কাতা এতদিনে বাস্তবের রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো বিজনের চোখে। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একসময় উঠলো এসে সে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের এক মেসে। থ্রি-সিটেড রুম। অপর দু'জনের একজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, নাম অরুণ; অন্তজন শিক্ষিত বেকার, সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের মধ্যবয়স্ক যুবক, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে শেয়ার মার্কেটে গিয়ে ঢু মেরে আসে আর মেসের বোর্ডারদের কাছে আজগুবি সব কটকা বাজারের গল্প ব'লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রে তোলে, নাম মহেন্দ্র। তাই ব'লে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় সে গম্ভীর নয়, বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গেই সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। বোর্ডারদের সে মহিন্দা। মনটা উদার এবং পরোপকারী। কলেজে ভর্ত্তি হবার পর কিছুদিন কেটে গেলে একসময় এই মহেন্দ্রের সাহচর্য্যেই টাকা ত্রিশেকের একটা ট্যুইশনি সংগ্রহ ক'রে নিল বিজন। এই ত্রিশ টাকাই তার প্রতিমাসের মূলধন। এই দিয়েই কলেজের মাইনে, মেসের খরচা, টিফিন আর ধোপা-নাপিতের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌তে হবে। গোড়া থেকেই তাই হিসেবের একটা মোটামুটি ফিরিস্তি ক'রে নিল সে।

ঠাট্টা ক'রে একসময় মহেন্দ্র বল্‌লো, 'বি-এ পাশ ক'রে আজকাল চাকরীর জন্ত ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায় ছেলেরা। কোন্ বুদ্ধিতে যে আর্টস্ নিয়ে ভর্ত্তি হ'লে, তুমিই জানো। বিজ্ঞানের পথে আজ পৃথিবী কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না?'

বিজন বল্‌লো, 'পাচ্ছি বৈ কি! কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর্টস্ যে পৃথিবীর প্রয়োজনের জগতে একদিন সত্যিই বাতিল হ'য়ে যাবে, একথা গ্রহণ ক'রতে

পারছি না মহিন্‌দা। বাষ্পে ইঞ্জিন চলে জানি, কিন্তু মানুষ তো বাষ্প আর ইঞ্জিন নয়, তার যে প্রাণ ব'লে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছে, সেখানে আর্টসেরই একাধিপত্য।'

—'অস্বীকার করি না।' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কিন্তু তাতে আজকের দুনিয়ায় অর্থকরী সুখ নেই। দেশে তো এত গায়ক আর কবি আছে, সুখে দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলতে পারছে ক'জন? বরং তাকিয়ে দেখ একজন ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা একজন কার্পেন্টারের দিকে, দেহের সমস্ত স্বাস্থ্য জুড়ে তার কি সুখের চিহ্ন ফুটে উঠেছে!'

মনে মনে এবারে অনেকখানি আশাহত হয়ে পড়লো বিজন। হয়ত তার নির্ব্বাচিত পথ ঠিক পথ নয়, হয়ত পাশ ক'রে বেরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলের ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারীর মতও একটা চাকরী পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। তবু শিক্ষা সম্পর্কে তার দৃঢ় প্রত্যয় চিরকালের; শিক্ষা মানেই তো কিছু একটা অর্থকরী বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ নয়, শিক্ষা বস্তুটা যে আসলে তার চাইতেও উন্নত কিছু। থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'কিছু একটা কেন্দ্রধর্ম্মী শিক্ষাই গোটা একটা জাতির ঐতিহ্যের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় মহিন্‌দা। কোনো একটা দেশের গৌরব শুধু তার কতকগুলো লোহা-লক্করের কারখানা আর বাষ্পযান নিয়েই নয়, গৌরব তার শিল্পী, কবি আর শিক্ষাবিদকে নিয়ে। রাশিয়ার মতো, বৃটেনের মতো স্বাধীন দেশগুলোতে এটা একটা প্রশ্নই নয়।'

কথার সূত্রপাত ক'রেছিল মহেন্দ্র ঠাট্টাসূচক ভাবেই, কিন্তু মধ্যপথে এসে দেখলো—কথাটাকে কেন্দ্র ক'রে বিজন অনেক দূর অবধি এগিয়ে এসেছে। এতটা আশা করেনি মহেন্দ্র, শুধু তাই নয়, এমন সুন্দর ভাবে যে তর্ক ক'রতে পারে বিজন, এটাও কল্পনা করতে পারেনি মহেন্দ্র। স্বল্পক্ষণ থেমে হাতের ঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে সে ব'ল্‌লো, 'কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে এটাই আজ বড় প্রশ্ন। শুধু এক জীবিকার্জ্জনের সমস্যাতেই এ দেশের শিক্ষা মধ্যপথে এসে থেমে গেছে। দেশের অদৃষ্টে শনিগ্রহ আর কি, তুমি আমি কি ক'রতে পারি বলো?' তারপর থেমে অরুণের দিকে ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্‌লো, 'চালাক ছেলে অরুণ, কাজের পথ বেছে নিয়ে দিব্যি বহালতবিয়তে আছে।'

আলোচনায় এতক্ষণ অরুণের কান থাক্‌লেও চোখ দু'টো ছিল কি-একখানি বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ। এবারে মুখ তুলে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কি রকম?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'রকম আর কি! দু'দিন পরে পাশ ক'রে বেরিয়ে দেশের একটা 'এ্যাসেট্' হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ। কোথাও গিয়ে পুল ভাঙছো, কোথাও গিয়ে পুল কন্‌স্ট্রাক্ট্ ক'রছো। মা লক্ষ্মী এসে পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বেন।'

—'ফুল চন্দন পড়ুক মুখে আপনার মহিন্‌দা।' অরুণ ব'ল্‌লো, 'কিন্তু এই জোড়হাত ক'রছি, এবারে দয়া ক'রে বাইরে কোথাও থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে আসুন। চ্যাপ্টারটা ততক্ষণে শেষ ক'রে ফেলি।'

—'ডেঞ্জারাস্ ছেলে রে বাবা, ঘরে ব'সে দু'টো কথা ব'ল্‌তেও দেবে না দেখছি।' হেসে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'চলো, বাইরে যাবে নাকি বিজন, কিছুটা ঘুরে আসি। একদিনেই কিছু একটা ইঞ্জিনিয়ার না হ'য়ে ছাড়বে না দেখ্‌ছি ছেলেটা।'

আপত্তি ক'রলো না বিজন। ক'ল্‌কাতার পথঘাটগুলো ভালো ক'রে চিনে নেবার দরকার। পাকা লোক মহেন্দ্র, তার সঙ্গে বেরোলে কাজ হবে। তা ছাড়া যে উপকার ক'রেছে সে, সে জন্ত তার কাছে বিজন ঋণী। সার্টটা গায়ে দিয়ে একসময় তাই বেরিয়ে প'ড়লো সে মহেন্দ্রের সঙ্গে।

অরুণ ব'ল্‌লো, 'ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, কিছু মনে ক'রছেন না তো মহিন্‌দা?'

—'মনে ক'রলেই কি কথাটা তুমি ঘুরিয়ে নেবে? নাও, যত পারো ঠেসে পড়ো। আমরা চ'ল্‌লাম ফোর্টের প্যারাডাইসে। যা গরম প'ড়েছে, দু'গ্লাস সরবতের অর্ডার দিয়ে পাখার নীচে গিয়ে ব'সে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসি কিছুক্ষণ।'

ইচ্ছে ক'রেই কথাটার উল্লেখ ক'রলো মহেন্দ্র। সে জানে—পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র বস্তু সরবৎ যার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য অরুণের পক্ষে। এবারে সেও উঠে এলো ব'লে।

কিন্তু যায়গা ছেড়ে এতটুকুও ন'ড়লো না অরুণ, বরং মুখের এমন একটা অদ্ভুত ভাব ক'রলো যে, সরবৎ সম্পর্কে কোনোকালেই যেন তার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

পথে এসে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেমন লাগছে ট্যুইশনি ?'

বিজন ব'ললো, 'ও আর লাগালাগি কি। অভ্যাস আছে, প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আসলে টাকাটাই আমার দরকার।'

থেমে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'বড্ড সিরিয়াস তুমি যাই বলো।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ—ঠাট্টা ক'রলেও সেটুকু বোঝো না।'

—'মানে, আর্টস্ সম্পর্কে এতক্ষণ আপনি আমাকে ঠাট্টা ক'রছিলেন, এই তো ?'

—'বুঝেছ তবে ?'

দু'জনেই এবারে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি টেনে নিল' মুখে।

প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই বিজনকে কেন যেন ভালো লেগে গিয়েছিল মহেন্দ্রের। একথা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। সংসারে এমন এক একটি মানুষ আছে, যাকে দেখলেই চিত্তে প্রীতির ছায়া পড়ে। বিজনকে দেখেও এমনটাই হ'য়েছিল মহেন্দ্রের। কিন্তু সে-প্রীতি বেগবতী নদীর মতো খরস্রোতা নয়, শান্তপ্রবাহিত তটিনীর মতো মৃদু। অল্পদিনের মধ্যেই তাই ঘনিষ্ট হ'য়ে উঠতে বাধা থাকেনি। কিন্তু সঙ্কোচ ছিল এক যায়গায়। কেউ কারুর কাছে জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধ'রতে পারেনি। এবারে স্কোয়ার-প্যারাডাইসে এসে সরবতের টেব্‌লে ব'সে সে-সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে কারুরই বড় বেশী সময় লাগ্‌লো না।

সূচনাটা মহেন্দ্রই ক'রলো।—'জানো বিজন, আর্টস্ সম্পর্কে তোমাকে ওকথা ব'ল্‌বার মানে আছে। এককালে ভালো ছবি আঁক্‌তে পারতাম আমি, স্কুলে ড্রইং-মাষ্টারের কাছে সবার চাইতে বেশী নম্বর পেতাম। তাই ব'লে যে আর্টস্‌.স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে পার্‌লাম, তা নয়। স্কুল ছেড়ে অর্ডিনারী কোর্সেই কলেজে ঢুকলাম, তারপর গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরোলাম। কিন্তু ছবির নেশা যে ত্যাগ ক'রতে পারলাম, তা নয়। একদিন জীবিকার্জ্জনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখলাম, বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে আমার কাণাকড়িও মূল্য নেই, না আমার ছবির—না আমার ডিগ্রীর; সংসার আমার কাছে [illegible] কোনো দিন কিছু আশা করে না ব'লেই উদরপূর্ত্তির দিকটায় রক্ষা পেয়ে গেছি। আপাততঃ শেয়ার মার্কেটের দালালরাই আমার পক্ষে যথেষ্ঠ।'

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিজন এবারে তার পাল্টা জবাবে নিজের কাব্যসাধনা থেকে ভবিষ্যৎ-জীবনের আশা অবধি কোনো কিছুই না লুকিয়ে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'গ্রাজুয়েট হ'য়েও আপনি জীবনে সাচ্চা কিছু ক'রে নিতে পারলেন না মহিন্দা? শেষ পর্য্যন্ত শেয়ার মার্কেট ?'

—'কেন, খারাপ কি ?' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'মস্তিষ্কে কিছু যাদু বৈষয়িক বুদ্ধি থাকলে ওখান থেকে অবস্থা ফিরিয়ে নিতে বেশীক্ষণ নয়। মাছের তেলে মাছ ভাজা। বিনে মূলধনে এমন সসম্মানী রোজগার তুমি কল্পনাই ক'র্‌তে পারো [illegible]।'

হেসে বিজন [illegible] দিন না আমাকেও কিছু ব্যবস্থা ক'রে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের এক বি[illegible] ক'রে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'ও পথ তোমার পথ নয়। তুমি [illegible]তের মানুষ। একদিন নিজের পথ তুমি নিজেই [illegible] ক'রে নিতে পারবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে [illegible]কের জীবনটাকে মাটি করে দিও না। জীবনের এ দিনগুলো গেলে আর ফিরে আসে না।'

—'কিন্তু সব কিছুর চূড়ান্ত অধ্যায় যে অর্থনীতি, এ কথা ইকোনমিক্স্ প'ড়েই বুঝতে পারছি।' সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে খানিকটা কথালো হ'য়ে উঠলো বিজন: 'কাব্যসাধনা আর অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন, জীবনধর্ম্মের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ই বটে!'

সরবতের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বোঝা কেবল সুরু, আগে শেষ করো, পরে না হয় আর্থিক দুনিয়ায় প্রবেশের পথ খুঁজবে। ক'ল্‌কাতার

আকাশ দিয়ে টাকা উড়ে যায়, মগজে বুদ্ধি থাকলে ধ'রতে কতক্ষণ।'

বিষয়টা নিয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না বিজন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। আলোকোজ্জ্বল ক'ল্‌কাতার রাজপথ। আবার এসে পথে নেমে প'ড়লো দু'জনে। পরের দিন কলেজে পড়ার চাপ নেই বিশেষ। বেশ লাগ্‌ছে বাইরের আবহাওয়াটাকে। বিজন ব'ল্‌লো, 'কি হবে এক্ষুণি আবার ঘরে ফিরে, চলুন না খানিকক্ষণ বেড়াই মহিন্‌দা! রাস্তাঘাটগুলো তবু কিছু চিনে নিতে পারবো।'

আপত্তি ক'র্‌লো না মহেন্দ্র, জিজ্ঞেস্‌ ক'রলো, 'কোন্‌ দিকে যাবে বলো?'

—'দিক কি আমার কিছু জানা আছে!' থেমে কি একটা চিন্তা ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'রাসবিহারী এভেন্যুটা কোন্‌দিকে, চলুন না, চিনে আসা যাবে!'

কৌতুহলের দৃষ্টি তুলে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস ক'র্‌লো, 'কেন, আছে নাকি কেউ?'

—'না, কে আবার থাক্‌বে!' সত্যকে চাপা দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'বালিগঞ্জ অঞ্চলের নাকি সেরা রাস্তা, দেখতে কৌতূহল হয় বৈ কি!'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বালিগঞ্জে তো এমন একাধিক রাস্তাই নামকরা, তা ফেলে হঠাৎ রাসবিহারী এভেন্যুই বা কেন? কোকিল ডাকে নাকি সেখানে?'

—'ক'ল্‌কাতার অভ্যস্ত জীবনে সে তো আপনিই ভালো জানেন।' থেমে বিজন বল্‌লো, 'নিন্‌, ঠাট্টা রাখুন, যাবেন তো চলুন!'

—'চলো।'

সাম্‌নেই একখানি ডবল ডেকার পেয়ে দু'জনে এসে চেপে ব'সলো তাতে। এই প্রথম চাপলো বিজন ডবল ডেকারে। উপরতলার সীটে ব'সে বেশ লাগ্‌তে লাগ্‌লো দু'পাশের আলোময়তাকে। এ না হ'লে কলকাতা! কিন্তু তক্ষুণি একটা বিষয় অলক্ষ্যে হঠাৎ খচ্‌ ক'রে এসে মনে বিধলো। বাংলার শত শত গ্রামকে শুষে নিয়ে তবে গ'ড়ে উঠেছে এমন ঐশ্বর্য্যময়ী নগরী। অন্ধকারে পঙ্কিলতা নিয়ে ম'রছে গ্রামগুলো। গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কিছুমাত্র জড়িত নয় রাজধানীর নাগরিকেরা। কিন্তু এ চিন্তা বেশীক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখতে পারলো না তাকে।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে যেতেই টাল সাম্‌লাতে না পেরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল বিজন, দু'হাতে মহেন্দ্র তাকে তুলে ধ'রে ব'ললো 'একেই বলে বাঙাল! সবে বালিগঞ্জে যাত্রা কতবার যে বেসামাল হতে হয়, তার কি কিছু ঠিক আছে!'

লজ্জিত কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'হাত ফস্কে যাবার ব্যাপারে কি বাঙাল অবাঙালের কোনো প্রশ্ন আছে এমন বেসামাল কখনো আপনাকেও হ'তে হয়। হয় না কি বলুন?'

—'বলবার মতো মনে প'ড়ছে না কিছু।'

ড্রাইভারের হাতে মুহুর্মুহুঃ বেজে উঠচে ভ্যাঁপু। দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে বাস: ডবল ডেকার।

রসা রোড আর রাসবিহারী এভেন্যুর মোড়ে এসে বিজনকে নিয়ে পথে নেমে প'ড়লো মহেন্দ্র। আঙুলের নির্দ্দেশে বুঝিয়ে দিয়ে ব'ললো, 'এদিকটা সোজা গিয়ে মিশেছে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে। যেতে হ'লে আবার নতুন করে বাস ধরবার দরকার। তার চাইতে এস, ডাইনে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে কেওড়াতলায়; চলো, মহাপ্রলয়ের রূপ দেখিয়ে আনি তোমাকে।'

ক্রমে এসে দাঁড়ালো তারা কেওড়াতলা শ্মশান ভূমিতে।—দাউ দাউ ক'রে উঠেছে চিতাগ্নি। বিলাপের সুর ভেসে প'ড়ছে মানুষের কণ্ঠ থেকে। কেমন একটা শ্মশানবৈরাগ্যে ধীরে ধীরে যেন বিজনের মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো। চুল্লীর ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছিল। আর অপেক্ষা না ক'রে আবার পিছনের পথ ধ'রলো মহেন্দ্র। ব'ললো, 'জীবনের শেষ পরিণতির সঙ্গেই আজ প্রথম পরিচয় ঘটলো তোমার বিজু, কিন্তু জীবনের স্বপ্নময় প্রারম্ভ দেখবারও অবকাশ আছে এখানে। সেটা বালিগঞ্জ লেক। অন্য কোনোদিন সন্ধ্যাসখি এসে বসা যাবে সেখানে। আজকের মতো ফিরি চলো।'

—'চলুন'। কথাটা ব'লতে গিয়ে গলায় একবার বাধলো বিজনের। আসলে এমন আবহাওয়ায় এসে দাঁড়াবার জন্ত মনটা প্রস্তুত ছিল না তার। রাসবিহারী এভিন্যুটা চিন্‌বার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার রেবাদের বাড়ীটা খুঁজে বার করা। ঠিকানাটা ইতিপূর্ব্বেই মার কাছ থেকে পেয়েছে সে। পঁয়ষট্টির চারের তিনের এক। কিন্তু মনের কথাটা বাধ্য হয়েই মনের মধ্যে চেপে যেতে হ'লো তাকে। উপায় নেই। জানতে পারলে মহেন্দ্র তাকে বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত ক'রে মারবে! তার চাইতে পথের নিশানাটাই আজকের পক্ষে যথেষ্ট।...

আবার এসে চেপে বস্‌লো তারা গাড়ীতে। এবারে আর বাসে নয়, ট্রামে।

মেসে যখন এসে পৌছালো তারা, রাত তখন দশটা বেজে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল; শুনতে পেলো মহেন্দ্র—ভাত ঢেকে রাখা নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা বিরক্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে তুলেছে উড়ে ঠাকুর। অন্তদিন হ'লে তার সঙ্গে প্রাত্যহিক নিয়মে ঝগড়া করতো মহেন্দ্র, কিন্তু আজ কেন যেন কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে শুধু ঘরে এসে নিঃশব্দে জামা কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো সে।

[ক্রমশঃ

'জাগো স্বপ্নান্তা'

বুটকৃষ্ণ দে

মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গে: তারাদের নীল-চোখে ঘুম্,—
মাটির বিছানা পেতে ফুলেদের পাড়ায় নিঝুম
সুরভি স্বপ্নেরা ঝরে; আমার দু' চোখের চাওয়ায়
চৈত্রের চাঁদের চিন্তা; ঝরে যেনো তোমারই ছায়ায়।
(তবু তুমি নেই, তুমি নেই তবু রাত্রির সুদূরিকা কংকা।)

স্বপ্নের শিয়রে তুমি একদিন নূপুরের সুরে
বেজেছিলে তবু; তব নরম হাতের স্পর্শ লেগে
কতো রাতে, কতো বার ঘুম ফেলে উঠেছি তো জেগে!
তবু হে স্বপ্নান্তা, আজ স্মৃতি দিয়ে চলে গেছ দূরে!
(দূরের আকাশ—ঈথারে পাথর; যেতে সেথা লাগে মোর শঙ্কা।)

আমার মনের মেঘ চাঁদ ছুঁয়ে আনাগোনা করে;
তারাদের ঠোঁটে চুমো দেয়: শিশিরের নীল-সুরে,
বাতাসের ভাষা নিয়ে ভাসে; আর পথে-ঘাটে ঝরে
তোমাকে জাগাতে, বেজে চলে, হায়, হাওয়ার নূপুরে!
(ছাখো, চোখে তার, সারা-পৃথিবীর রাত-জাগা ক্লান্তি যে ঝর্‌চে।)

হাওয়ার নূপুর বাজে.—ঝুমঝুম্ জাগরীর গান,—
তবু তো তোমার চোখ ঘুম্ ঘুম্। ঘুমের শিয়রে
স্বপ্নের শিরীষ দোলে। দোলনায় জাগবে না প্রাণ?
তবে কি আমার গান যাবে ঝরে তাসের বাসরে!
(আমার আলোরা তাই-বুঝি আজ আঁধারের পা'য়ে ঝরে পড়্‌চে।)

নিরুক্ত

ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর

অণীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং
ব্যবহারার্থং লোকে ॥ ৫ ॥

চ (আর), লোকে (সংসারে) ব্যবহারার্থং (পরস্পর ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত) শব্দেন (শব্দের দ্বারা) সংজ্ঞাকরণং (অর্থ বোধের উৎপাদন) অণীয়স্ত্বাৎ (অপেক্ষাকৃত অল্পত্বনিবন্ধন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রযত্নাপেক্ষ বলিয়া)।

'ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে শব্দার্থবোধের প্রতি শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্ব কারণ। ব্যাপ্তিমত্ত্বরূপ কারণ কিন্তু অভিনয়েও আছে। অভিনয় শব্দের অর্থ ইঙ্গিত অর্থাৎ হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন, অক্ষির সঙ্কোচ বা বিকাশ ইত্যাদি। অভিনয়ের ব্যাপ্তিমত্ত্ব আছে, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে অভিনয় বুদ্ধিব্যাপ্ত। শব্দের ন্যায় অভিনয়ের দ্বারাও আমরা মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারি। হস্তাদি সঞ্চালন কিংবা অক্ষির সঙ্কোচ বিকাশাদির দ্বারা আমরা গমনাগমনের আদেশ প্রদান করিয়া থাকি, কোনও কিছু প্রদান করিবার বা গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিয়া থাকি, হর্ষ বিষাদ উৎসাহ বা দ্বেষ প্রকটিত করিয়া থাকি—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি তাহাই হয় তবে জনসমূহের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত শব্দাত্মক ভাষার প্রয়োজন কি? শব্দরাশির আয়ত্তীকরণ যে ক্লেশবহুল এবং ইঙ্গিত করণ যে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ইহা আমরা সকলেই অনুভব করি। ইদৃশ আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অভিনয়ের ব্যাপ্তিমত্ত্ব থাকিলেও যথার্থতঃ ইহা সহজ সাধ্য নহে, পরন্তু মনোগত ভাবরাশির বহুত্ব নিবন্ধন বহু ইঙ্গিতের অপেক্ষা থাকায় বহু প্রযত্নাপেক্ষ। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, অভিনয় পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয়েরই আবোধনে সমর্থ এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে অর্থ প্রতীতি করাইতেও পারে না। শব্দ কিন্তু তদ্বিপরীত—অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রযত্নাপেক্ষ, অপরিজ্ঞাত বিষয়েরও আবোধনে সমর্থ এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবেই অর্থপ্রতীতিকরণক্ষম।

অনুবাদ—সংসারে ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত শব্দের দ্বারা অর্থের বোধ জন্মান হয় শব্দ অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রযত্নাপেক্ষ বলিয়া।

১-৫ সূত্রের দুর্গাচার্য্য সম্মত ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'শব্দ অনিত্য' ঔদুম্বরায়ণের এই মত মূলতঃ স্বীকার করিয়াই তিনি সূত্র কয়টীর ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শব্দ নিত্য—শব্দ আবহমান কাল হইতে প্রবর্ত্তমান, শব্দ কেহ নির্ম্মাণ করে নাই, শব্দ সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, উচ্চারণে শব্দের অভিব্যক্তি হয় মাত্র, ঈদৃশ মতও কিন্তু প্রসিদ্ধ। স্কন্দস্বামী (দুর্গাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার) শব্দের নিত্যত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াই উল্লিখিত সূত্র কয়টীর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যামার্গ এবং কোন কোন সূত্রের পাঠ অন্য প্রকারের। অবশ্য 'শব্দ অনিত্য' ঔদুম্বরায়ণের এই মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে পদের চতুষ্টয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা ঠিক। দুর্গাচার্য্যের সহিত স্কন্দস্বামীর এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু স্কন্দস্বামী বলেন যে ঔদুম্বরায়ণের মতই সমীচীন নহে, কারণ শব্দ নিত্য, শব্দ সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র যুগপৎ সত্তাবিশিষ্ট বা অবস্থিত।[১] শব্দ যদি যুগপৎ বা সমকালে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ইতরেতরোপদেশ, শাস্ত্রকারের যোগ এবং চতুষ্টয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে। ইতরেতরোপদেশ—ইহার অর্থ, অর্থ বোধের উদ্দেশ্যে নামাদিপদসমূহের পরস্পরাপেক্ষায় উচ্চারণ। শাস্ত্রকারের যোগ—ইহার অর্থ—শাস্ত্রকার আপিশলি পাণিনি প্রভৃতির সূত্র অর্থাৎ তাহাদের কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। ব্যাকরণের একটী কার্য্য প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে পদসাধনপ্রণালী প্রদর্শন করা। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগ সম্ভবপর হয়, যদি শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়। তাহা না হইলে প্রত্যয় গ্রহণক্ষণে প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কোন প্রকার সম্বন্ধই সম্ভব হয় না। শব্দের চতুষ্টয়ত্ব—ইহার অর্থ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতভেদে শব্দের চারি-

---

১। যুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানামিতরেতরোপদেশঃ—স্কন্দস্বামী ২য় সূত্রটী এইরূপ পাঠ করেন, 'অযুগপৎ' পাঠ তাঁহার সম্মত নহে। যুগপদুৎপন্নানামিত্যুৎপত্তৌ যো. হ্যুৎপদ্যতে স ভবতীতি সত্তালক্ষণো ভবত্যর্থো লক্ষ্যতে।

প্রকার বিভাগ। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যদি শব্দের নিত্যত্ব বা যুগপৎ অবস্থিতি স্বীকার করা যায়।[২] এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে শব্দ যদি নিত্য এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র যুগপৎ অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকালেই আমরা তাহার উপলব্ধি করি না কেন? স্কন্দস্বামী বলেন, ইহার কারণ শব্দের অণীয়ত্ব। 'ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য' এবং 'অণীয়স্ত্বাচ্চ' এই সূত্র দুইটী দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। স্কন্দস্বামী পঞ্চম সূত্রটীকে 'অণীয়স্ত্বাচ্চ' এবং 'শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে'—এইরূপ বিভাগ করিয়া দুইটী সূত্ররূপে কল্পনা করেন। তিনি বলেন, ব্যাপ্তিমান্ বা সর্ব্বগত, অথবা যাহা অণীয়ান্ বা অতি সূক্ষ্ম তাহার উপলব্ধি অভিব্যঞ্জকরূপ কারণের অভাবে সম্ভব হয় না। শব্দ ব্যাপ্তিমান্—সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে অবস্থিত, যেমন আকৃতি। গো মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের আকৃতি[১] সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, আকৃতির অভিব্যক্তি হয় ব্যক্তির দ্বারা, ব্যক্তির অভাবে আকৃতির উপলব্ধি হয় না অভিব্যঞ্জক কারণ ব্যক্তির সদ্ভাব হইলেই আকৃতির উপলব্ধি হয়। এইরূপ শব্দ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছে, শব্দের অভিব্যক্তি হয় উচ্চারণের দ্বারা, উচ্চারণের অভাবে শব্দের উপলব্ধি হয় না, অভিব্যঞ্জক কারণ উচ্চারণের সদ্ভাব হইলেই শব্দের উপলব্ধি হয়[২]। শব্দ অণীয়ান্ বা অতি সূক্ষ্মও (subtle) বটে। কারণ, আকাশ অণু বা সূক্ষ্ম, আকাশের গুণ শব্দ, কাজেই শব্দ আরও সূক্ষ্ম। যেরূপ সূর্য্যকিরণরূপ অভিব্যঞ্জক কারণের অভাবে রূপের উপলব্ধি হয় না, সূর্য্যকিরণরূপ অভিব্যঞ্জক কারণের সদ্ভাব হইলেই রূপের উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম যে শব্দ তাহার উপলব্ধি হয় না তাল্বাদিব্যাপার অর্থাৎ উচ্চারণরূপ অভিব্যঞ্জক কারণের অভাবে, উচ্চারণরূপ অভিব্যঞ্জক কারণের সদ্ভাব হইলেই অতি সূক্ষ্ম শব্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে[৩]।

সংসারে ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞারকরণ বা নামের কল্পনা অথবা কোন বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদন উৎপন্ন হইতে পারে যদি শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়। যদি শব্দ অনিত্য হয় তাহা হইলে দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা কোনও ব্যক্তির অথবা কোনও বাক্যের দ্বারা কোনও অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। ইহাই হইল 'শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে'—এই সূত্রের তাৎপর্য্য।[১]

সূত্রকয়টী সম্বন্ধে দুর্গাচার্য্য ও স্কন্দস্বামীর মতের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইল। দুর্গাচার্য্য 'অণীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে' এই সূত্রে 'চ' শব্দের অর্থ করেন নাই। শব্দের অনুপলব্ধির প্রতি কারণ ব্যাপ্তিমত্ত্ব ও অণীয়স্ত্ব—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্কন্দস্বামী চকারের সমুচ্চয়ার্থ করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী 'শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে' এই সূত্রের দ্বারা—শব্দের অনিত্যত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গে যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সমাধান দেখিতে পাই দুর্গাচার্য্যের 'ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য এই সূত্রের ব্যাখ্যায়। অভিব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় অস্থায়ী হইলেও বুদ্ধি ব্যাপ্ত করিয়া শব্দ অবস্থান করে—এতাদৃশ যুক্তিই ঐ সমাধানের ভিত্তি। শব্দ বুদ্ধিব্যাপ্ত এই যুক্তি পরিজ্ঞাত শব্দ সম্বন্ধেই খাটে, অপরিজ্ঞাত শব্দ সম্বন্ধে নহে। কাজেই শব্দ বুদ্ধিব্যাপ্ত এই কথার দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যা যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার তাৎপর্য এই যে সমস্ত শব্দ—পরিজ্ঞাতই হউক, আর অপরিজ্ঞাতই হউক সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, উচ্চারণরূপ অভিব্যঞ্জক কারণ উপস্থিত হইলেই তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। শব্দের নিত্যত্ব অনিত্যত্ব সম্বন্ধে দুর্গাচার্য ও স্কন্দস্বামীর মতের পার্থক্য এই স্থানে।

২। যৌগপদ্যবত্তাং সতামেব চতুর্ণাং নামাদিপদজাতানামেতৎ পরস্পরার্থত্বেন বাক্যার্থপ্রতিপত্ত্যর্থমুচ্চারণম্। অতশ্চ যুগপদবস্থিতানেকনামাদিপদজাতবিষয়া চতুষ্ট্বসংখ্যোপপন্না। তদুপপত্তেশ্চোপপন্নম্—চত্বারি পদজাতানীতি, শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে, ন কেবলং চতুষ্ট্বম্, শাস্ত্রকৃতশ্চাপিশব্দে পাণনে র্বা যোগঃ সূত্রম্। সমুদায়াভিপ্রায়মেকবচনম্। যোগঃ সমুদায়োঃ হষ্টাধ্যায়ী শাস্ত্রমেবোপপদ্যতে যদি নিত্যাঃ শব্দাঃ। ইতরথা হি প্রকৃত্যবুৎপন্নায়াং যাবৎ প্রত্যয় উপাদাস্যতে তাবাদ্বিনষ্টা। প্রকৃতিরিতি কস্য কেন সম্বন্ধঃ।

১। আকৃতি ও জাতিতে পার্থক্য আছে (ন্যায় দঃ ২।২।৬৬)। অনেকের মতে আকৃতি ও জাতি একই পদার্থ।

স্কন্দস্বামী ও আকৃতি শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইলে দোষ হয় না।

২। শব্দস্য যা অনুপলব্ধি র্নাসাবসত্ত্বাৎ। কিন্তর্হি আকৃতিবদভিব্যঞ্জকাভাবাৎ অতো নানুপলব্ধেরনিত্যত্বমাশঙ্কিতব্যম্।

৩। আকাশমণু সূক্ষ্মম্, অতস্তদ্গুণত্বাচ্ছব্দস্যাতিশায়েন সৌক্ষ্ম্যাদিয়মনুপলব্ধিঃ সত এব। উপলব্ধিস্তু প্রকাশে সতি রূপস্যেব চাস্য তাল্বাদি ব্যাপারসহকারি সদ্ভাবে সতি শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিষয়াপত্তেঃ।

১। এবঞ্চ নিত্যত্বে সতি শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে। করণ সাধনঃ সংজ্ঞাশব্দঃ সংক্ষেপেন জ্ঞায়তে অনয়েতি সংজ্ঞা—দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি। তস্যাঃ করণং কল্পনং ব্যবহারার্থং ব্যবহার প্রয়োজনং লোকে উপপন্নমিতি বাক্যশেষঃ। যথা বাক্যমেব সংজ্ঞাশব্দেনোচ্যতে। তস্য করণং বিবক্ষিতস্য প্রত্যায়নম্। সমানমন্যৎ।

কপালকুণ্ডলা ও চৈত্রে কাঁথিতে বঙ্কিম মেলা

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি,এ পাশ করিয়াই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি যশোহর সহরে কার্য্যে যোগদান করেন। এখানেই কাজ করিবার সময় তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মোহিনী দেবী পরলোকগতা হন। আরও কয়েকমাস কাজ করিবার পরে নেগুঁয়া মহকুমায় বদলী হইবার প্রাক্কালে কিছুদিন বাড়ী থাকিয়া হালিসহর নিবাসী গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের ভাগিনেয়ী মোহিনী দেবীর একমাত্র কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত দ্বিতীয়বারে পরিণয়াবদ্ধ হন।

বঙ্কিম ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী নেগুঁয়ায় পৌছেন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। নেগুঁয়ায় তিনি মাত্র ৯মাস ছিলেন, উক্ত বৎসরেই ২৪ নভেম্বর কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া তিনি খুলনায় বদ্‌লী হইয়া যান। চাকুরী প্রাপ্তির অল্পদিন মধ্যেই একটী বিস্তীর্ণ মহকুমার কার্য্যভার লাভ করায় অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখানেও মণীষা ও বিচক্ষণতার জন্য পদোন্নতি লাভ ও সুনাম অর্জ্জন শীঘ্র শীঘ্রই হইয়া যায়।

আজকাল নেগুঁয়া যাইতে ট্রেনে যাইতে হয়, কিন্তু তখনও উহার এই রাস্তার প্রচলন হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী নদীর 'নরঘাট' পার হইয়া তমলুকে আসেন। ঐ মহকুমার হাকিম ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণ। সেখান হইতে রাজকুলের রাস্তায় নেগুঁয়ায় যান।

বহুদিন পূর্ব্বে (১৮৫৮) যাদবচন্দ্র প্রায় দশবৎসরের উর্দ্ধকাল হিজলী ও মাজন মুঠা প্রভৃতি স্থানের বিলি ব্যবস্থা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সকল প্রজাবর্গের তিনি এতই শ্রদ্ধার্জ্জন করেন যে তাহারা স্থানীয় প্রজাবৎসল জমিদার যাদব রায়ের নামোল্লেখ করিয়া তাহাকেও "যাদবরাম ডিপুটি" আখ্যা দিয়াছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন নেগুঁয়ায় পদার্পণ করেন, কাঁথির অধিবাসীরা তাঁহাকে বড় সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের যাদবরাম ডিপুটির ছেলে তাহাদেরই আপন জন—তাহাদের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও যতদিন ছিলেন তাহাদের সঙ্গে বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতেন। উত্তর কালে কাঁথি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও বলিতেন "লোকের প্রতি দয়াপ্রকাশের জন্যই তত্রস্থ সকলে পিতৃদেবকে ভাল বাসিতেন।"*

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকথা" পৃঃ ১০

মেদিনীপুরের কালেকটার ছিলেন ককরেল সাহেব (F. E. Cockerell) আর জজ ছিলেন জাঁদরেল সাহেব এলফিনষ্টোন জ্যাক্‌সন। উভয়েই নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন, "২৩ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ দক্ষতার সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাতে যাবতীয় দেশীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের তুলনায় তাঁহার কার্য্যক্ষমতা সমধিক ভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে।" স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ রায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, "ককরেল সাহেব দেখা হইলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করিতেন।" এখানে থাকিতেই ১৮৬০ মে মাসে তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে হইয়াছিলেন নভেম্বর ১৮৫৯ খৃঃ।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথা, Civil List, Lower Provinces of Bengal.

কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র : দরিয়াপুরের প্রাচীন মন্দির

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কাঁথি রোডষ্টেসনে (Contai Road) নামিয়া বাস অথবা মোটরে ২৬ মাইল পূর্ব্বে আসিলেই এগ্রায় পৌছান যায়। এই এগ্রারই তখন নেগুঁয়া মহকুমার কার্য্যস্থান ছিল। বঙ্কিমের বাঙ্গলো ছিল কৃষ্ণসাগর নামে একটি সুবৃহৎ সরোবরের তীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে।

এই নেগুঁয়া (এগ্রা) হইতে ১৬ মাইল পূর্ব্বে বর্ত্তমান কাঁথি মহকুমা অবস্থিত। তখন কাঁথিতে কোন আফিস ছিল না—সেখানে একটি বড় বাড়ী ছিল, পূর্ব্বে নিমকীর আফিস ছিল কিন্তু বঙ্কিমের সময়ে ছিল উহা পরিত্যক্ত। এখন উহাতে মহকুমার হাকিম বাস করেন।

কাঁথি হইতে সমুদ্র আবার ৫ মাইল পূর্ব্বে মোটরে তীর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। সুতরাং নেগুঁয়া হইতে সমুদ্রের দূরত্ব ২১ মাইল। নেগুঁয়াতে এখন মাত্র একটা থানা, একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আছে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে।

বঙ্কিম নেগুঁয়ায় অবস্থিতি কালে অনেকবার সমুদ্র দর্শন করিয়াছেন। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিভিন্ন ধারার (১০৭, ১০৯, ১১০) অথবা অন্যকোন মোকদ্দমা অথবা অনুসন্ধান (Enquiry) উপলক্ষে আসিবার প্রয়োজন হইত। মনে হয় নেগুঁয়ায় আসিবার পক্ষকাল মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলায় লিখিত আছে, "একদিন মাঘমাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল।"

বঙ্কিম ১২৬৬ সালের ২১ মাঘ কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী (১৮৬৭) অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে চলিয়া যান। মাঘমাসে দর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল বলিয়াই মাঘমাস অবলম্বনে গ্র সূচনা হইয়াছে।

সমুদ্র দেখিতে বঙ্কিমের ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁহার রচনার ভিতরেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নৌকার অন্যতম আরোহী প্রাচীন ব্যক্তির সহিত নবকুমারের কথা হইতেছিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "আমিত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আহা কি দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরে ভুলিব না!

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা।" *

অন্যত্র আছে—

"ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন—ফেনিল নীল, অনন্ত সমুদ্র…এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছে। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্ জাতির সমুদ্রপোতে শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি হৃদয়ে উড়িতেছিল।"

বঙ্কিম আসিয়া চাঁদপুরের বাঙ্গলোয় থাকিতেন, কিন্তু এখন সে বাঙ্গলোর অস্তিত্ব নাই, ১৮৬৪ সালের ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে দরিয়াপুরে একটি বাঙ্গলো হইয়াছিল, তাহাও ১৩৪৯-এর ঝড় ও বন্যায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন সেইখানে একটী পাঠশালা আছে।

"কপালকুণ্ডলা"র বর্ণিত রসুলপুরের নদী, এই নদীর মোহনা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত বালিয়াড়ী, বালুর স্তূপে একটী উচ্চস্থান, বাদাম* জাতীয় নানাবিধ বৃক্ষলতাদি, দূরস্থ (পূর্ব্বদিকস্থ হুগলীর মোহনার নিকটস্থ) তমালতালী বনরাজী, দরিয়াপুর, দৌলতপুর দরিয়াপুরস্থ প্রাচীন শিবমন্দির, শিব-সেবক অধিকারীর বাড়ী সবই পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও তৎকালীন প্রত্যক্ষমূলক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উক্ত উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। তাই এই সমস্ত স্থান কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র বলিয়া এখন বঙ্কিমের স্মৃতি বহন করিতেছে। কাঁথিবাসিগণের সাধুচেষ্টায় শিববাড়ীর সম্মুখে কপালকুণ্ডলার কল্পনা ক্ষেত্র বলিয়া শ্বেতপ্রস্তরের একটী স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান দিবসে একটী সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটী মেলাও হয়, এই মেলাই 'কপালকুণ্ডলা মেলা' নামে অভিহিত এবং ইহা সাতদিনব্যাপী চলে।

এখানকার অন্যতম প্রধান ঘটনা চাঁদপুর বাঙ্গলোতে বঙ্কিমের কাপালিক দর্শন। ভবভূতির 'মালতীমাধব নাটকের' অঘোর ঘন্টের চরিত্রে কাপালিক সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনে একটা ধারণা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ দর্শনে কপালকুণ্ডলার কাপালিক চরিত্র এত সরস ও জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাপালিক সম্বন্ধে বহুলোক বিবরণ দিয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্কিম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। জীবনচরিতকার শচীশবাবু

* রঘুবংশ ত্রয়োদশ সর্গ—

* যে ফলে নবকুমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

স্থানটিতে না যাইয়া লেখায় কয়েকটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নাগোয়াতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। কাপালিক ডাকিলেন, বলিলেন—আমার সঙ্গে এস।"

বঙ্কিম—কোথায় ?

কাপালিক—সমুদ্রতীরে বলিয়াড়িতে—

বঙ্কিম—আমি যাব না। কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। শচীশবাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"কাঁথির সন্নিকটেই নাগোয়ান। নাগোয়া হইতে সমুদ্র বেশী দূরে নয়, সময় পাইলে মধ্যে মধ্যে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। নাগোয়া হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনা যাইত।"

শচীশবাবুর ভ্রম স্থানটি দেখা নাই বলিয়া। স্থানটির নাম নেগুঁয়া, সমুদ্র হইতে উহা ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নেগুঁয়ায় সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হয় নাই। চাঁদপুরের বাঙ্গলোতে হইয়াছিল।

দিব্যেন্দুসুন্দরের উক্তিও মূলতঃ সত্য হইলেও প্রকৃত ঘটনার উপরে আরও রোমাঞ্চকর এবং স্বকপোল কল্পিত ঘটনার সংযোগ হওয়ায় অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট। তিনি একাধিক স্থানে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে করিয়াছিলেন কলেজের একখানি কাগজে "আলো ও ছায়ায়"। পরে ইহা 'মাসিক সমালোচনায়' বাহির হয়। সচিত্র শিশিরেও দুইবার (১৩৩১, ১০ই শ্রাবণ ও ২৫শে মাঘ) ঐ কাহিনী চিত্তাকর্ষক উপকথার ন্যায় স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাছে পাঠক ভ্রান্ত ধারণা না করেন, দুই একটা কথার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

উভয় তারিখেই "সচিত্র শিশিরে" তিনি লিখিয়াছেন—

"যাহাকে হিজলী কাঁথি বলে এবং যাহা উপস্থিত সদর বলিয়া খ্যাত, তৎকালে উহা নাগোয়ান মহকুমা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।"

এখানে বলা আবশ্যক নেগুঁয়া মহকুমার নাম কাঁথি হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থান এক নহে, কাঁথি নেগুয়ার ১৬ মাইল পূর্ব্বদিকে। আর উহা সহর অর্থাৎ জেলা কখনও হয় নাই, জেলার নাম মেদিনীপুর এবং উহার সহর মেদিনীপুর সহরে।

স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে নানারূপ অসঙ্গতি থাকায় এবং স্থানে স্থানে উপন্যাসের অনুরূপ কল্পিত আখ্যান এবং কপালকুণ্ডলার উপন্যাসের কিছু কিছু কথা সংযোজিত বলিয়া অন্য কোন সমর্থন-যোগ্য প্রমাণ অভাবে উক্ত দুইটী আখ্যান পরিবর্জ্জন করিয়া, বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র ও বঙ্কিম-দৌহিত্র ব্রজেন্দ্রসুন্দরের উক্তিই বলিয়া প্রদান করিতেছি। ব্রজেন্দ্রবাবু আখ্যানটি মা রাজলক্ষ্মী দেবীর নিকট শুনিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়া

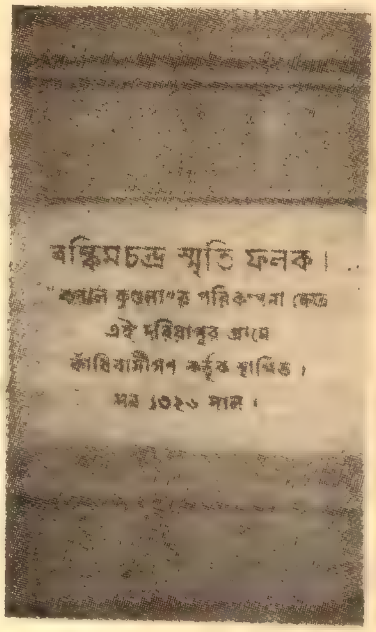

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি ফলক

ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের প্রদত্ত আখ্যান বড়ই স্পষ্ট ও সরল বর্ণিত। তিনি লিখিয়াছেন :

"যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে ছিলেন (এক্ষণে উ কাঁথি মহকুমা বলে) তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত স করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানারূপ ভয়প্রদর্শন করিতেন মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গ বাস করিতেন, তখন এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রি দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্র সেই বনে বাস করিত।"

বঙ্কিম-দৌহিত্র ব্রজেন্দ্রসুন্দর তাহার মাতামহীর নিক কাহিনীটি শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

"বালিয়াড়ির নিকটস্থ চাঁদপুর বাঙ্গলোতে বঙ্কিম যখন রাত্রে নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ জাগিয়া দেখিলেন দরজা রহিয়াছে, আর নিকটে এক দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আ বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে ?

উত্তর—সন্ন্যাসী।

প্রঃ—আপনি কি চান ?

উঃ—আমি তোমাকে একস্থানে লইয়া যাইতে চাই।

প্রঃ—কোন্ স্থানে ?

উঃ—একটু বাহিরে এসো, দেখাইতেছি।

বঙ্কিম সাহস করিয়া প্রাঙ্গনের একদিকে আসিলে সন্ন্যাসী একটা খুব উঁচু জায়গা দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ যে আলো জ্বলিতেছে, আমার পর্ণকুঠীর—।'

প্রঃ—আপনার কি দরকার ?

উঃ—বিশেষ দরকার আছে, তোমার ভাল হইবে, একা তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।

বঙ্কিম—আমি যাইতে পারি, কিন্তু আমার লোকজন সঙ্গে থাকিবে, একা আমি যাব না।

সন্ন্যাসী—না, একা তোমায় যাইতে হইবে।

বঙ্কিম—না, একা কিছুতেই যাইব না। বঙ্কিম রাজী না হওয়ায় সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া যায়—"তুমি গেলে না, যদি যাইতে তোমার পক্ষে ভাল হইত।"

সন্ন্যাসী সেই রাত্রে আরও দুইবার আসিয়াছিল। পরিশেষে বঙ্কিম সব লোকজন ডাকাইয়া পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখেন। সমস্ত ঘটনাই একরাত্রির, উপরোক্ত কথা ভিন্ন অন্য কোন কথাও হয় নাই।

এই সন্ন্যাসীর ছায়াবলম্বনেই কপালকুণ্ডলার কাপালিক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। মালতীমাধবের কাপালিক চরিত্রে ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু বঙ্কিম উপন্যাসে তাহাকে যে ভাবে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহাতে সেরূপ ভাব মনে আসে না। অধিকারী তাহার সম্বন্ধে বলিতেছে—

"মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন।"

অপরূপ সুন্দরী যুবতী কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার লালসা-হীন স্নেহে উন্নত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পূজার উদ্‌যাপন হয় কুমার-কুমারীর বলির নর মাংসে, এইখানেও তাহাকে সেইরূপ নিষ্ঠুর নরঘাতকই করা হইয়াছে। পূর্ব্বে একটী আলোর কথা বলিয়াছি। বঙ্কিমের নবকুমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইলে "অকস্মাৎ সম্মুখে বহুদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন, মনে হইল এ আলোক কি ভৌতিক ?" নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, "এক অত্যুচ্চ বালুকা-স্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে—সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূল চর্ম্মে আবৃত, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, আয়ত মুখমণ্ডল, শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত। তাহার স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর।"

বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিকের এইরূপ বেশই দেখিয়া থাকিবেন। উপন্যাসের কাপালিক অসাধারণ বলশালী। সাহসী নবকুমার বলিল—

"হস্ত ত্যাগ করুন, আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?"

"বধার্থ।"

অতি তীব্রবেগে বলশালী নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন, কিন্তু বুঝিলেন, "বল প্রকাশে কোন ফল হইবে না, এ বয়সেও কাপালিক মত্তহস্তীর বল ধারণ করে।"

কপালকুণ্ডলায় কুজ্ঝটিকার অন্ধকারের কথা বর্ণিত আছে, তাহাও এই সমুদ্র প্রত্যক্ষের ফল। উপন্যাসে আছে—

"একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিক নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এখন কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না।"

অন্যত্র আছে—"নবকুমার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোনদিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না পাছে বাহির সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিল।"

প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!" নব্য হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা ? তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন ?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের আরও কোলাহল বৃদ্ধি হইত। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে কদাচ নৌকা মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ। বায়ুমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলন কম্প কিছুই জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দ বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল।

সমুদ্রতীর হইতে—সমুদ্রের কুজ্ঝটিকা দর্শন ব্যতীত কুজ্ঝটিকার দিগবিভ্রমও বঙ্কিমের জীবনেই ইতিপূর্ব্বেই ছাত্রাবস্থায় হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"একদিবস এরূপ কুয়াসা চারিদিক ব্যাপিয়াছিল যে কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই; উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা কলেজে যাইবার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল দিক্ ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না। নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পোনের মিনিটে কলেজঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল নৌকা চলিতেছে কিন্তু কোথায় কলেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে?"

মাঝি বলিল, "আজ্ঞে তা জানিনা"—

"সে কিরে?"

মাঝি—আজ্ঞে, বোধ হয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।"

মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি একস্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ জায়গা?

মাঝি বলিল, "বুঝি মূলাযোড়"

কপাকুণ্ডলা গল্পটী যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

যাহাহউক, যে পাঠকের এই স্থানটি দেখিবার সৌভাগ্য হইবে,* তিনিই প্রত্যক্ষ করিবেন যে বঙ্কিম যেন সমুদ্রতীরে বসিয়াই লিখিতেছেন—

"যে স্থানে হুগলী নদী হইতে সাগরে পড়িয়া ক্রমে অজ্ঞাতসারে নবকুমারের নৌকা আসিয়া পড়িয়াছিল এবং যে স্থান হইতে কুজ্ঝটিকামুক্ত সূর্য্য দেখিয়া, মাঝিগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিয়াছিল, সে স্থান প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে—এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত; কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মি-মালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দ্দম নদীজল-বর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি—নীলপ্রভ।"

উপকূল পশ্চিম তীরে, তাই পূর্ব্বদিকে উদয়োন্মুখ সূর্য্য দেখিয়া দিক ঠিক করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দিক নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিমতট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

বঙ্কিম-স্মৃতি স্তম্ভ
(দরিয়াপুরে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র)

রসুলপুরের নদীর মোহানা হইতেই বালিয়াড়ীটি দরিয়াপুর দৌলতপুর হইয়া সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহার উত্তর সীমানা বাঙ্গলা দেশ,—দক্ষিণ উড়িষ্যা। উক্ত মোহানা হইতে দরিয়াপুর

* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় সঙ্গে করিয়া নিয়া সমস্ত স্থান আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।

যাইতে বালিয়াড়ির বামপার্শ্বে একটী উচ্চস্থান দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানেই নবকুমার শবাসনে উপবিষ্ট ভীমদর্শন কাপালিক দেখিতে পাইয়াছিল। পরে এই স্থান হইতে পড়িয়াই কাপালিক ভগ্নহস্ত হয়। 'কপালকুণ্ডলায়'আছে—নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যায়। নবকুমার তখন তীরে কাষ্ঠাহরণে গিয়াছিল। এই তীর সম্বন্ধে যে বর্ণনা বঙ্কিম দিয়াছেন, এখনও ঠিক সেইরূপই আছে। ঝাঁটি, বনঝাট, বনপুষ্প সবই ঠিকঠিক বর্ণিত হইয়াছে। বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালার বর্ণনাও চমৎকার এবং প্রকৃত। পথহীন বনমধ্যে যেমন স্বতঃই পথভ্রান্তি জন্মে, নবকুমারের তাহাই হইয়াছিল। সমুদ্রের বর্ণনাও অনুরূপই বিচিত্র।

উপন্যাসে নিকটবর্ত্তী স্থানের আর সবই ঠিক আছে, তবে নিকটে কোন কালীবাড়ী নাই। শিবমন্দিরের প্রায় দুই মাইল উত্তরে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত একটী কালীবাড়ীর কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু এখন উহার অস্তিত্ব নাই।

কাঁথিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বদিকে একটী কালীবাড়ী আছে। বঙ্কিমের সময় এই মন্দিরে মানবাকার কালী মূর্ত্তি ছিল। 'কপালকুণ্ডলায়' মানবাকার পরিমিতা কালীমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু কেবল 'মানবাকার' কথাটি ছাড়া এই বাড়ী বা মন্দিরের সহিত গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অধিকারীও এ স্থানের ছিলেন না। কপালকুণ্ডলার পাঁচ মাইল দূরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রে অত জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাওয়া আসা করা সর্ব্বদা সম্ভব ছিল না। এই কালীবাড়ী হইতে মেদিনীপুরের পথ পশ্চিম দিকে এক মাইলেরও কম। কিন্তু গ্রন্থে দেখিতে পাই প্রত্যুষে যখন অধিকারী নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাসহ মেদিনীপুরে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছে, তখন অনেক বেলা হইয়াছে! সুতরাং বুঝিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্র এই কালীবাড়ীর কথা ভাবেন নাই; সমুদ্রতীরের জঙ্গল মধ্যস্থ দেবমন্দিরের কথাই ভাবিয়াছেন। তবে মানবাকার কালীমূর্ত্তি—এই কথাটী মাত্র বোধহয় এইস্থান হইতে নিয়াছিলেন। এই বিষয় পণ্ডিতপ্রবর যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ও আমাদের সহিত একমত।

নেগুঁয়ার অবস্থান সময়ে আরও দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। বঙ্কিম যখন সমুদ্রতীরে যাইতেন কাঁথি হইয়া যাইতে হইত। সেখানে নিমকমহলের বাড়ী ব্যতীত আরও একটী বাড়ীর উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাঁথিতে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়া তিনি এই বাড়ী থাকিতেন। এই বাড়ীও ছিল কৃষ্ণকান্ত রায় নামক জনৈক বিদেশী ব্যক্তির, ইনি নিমক মহলের দেওয়ানী কার্য্যে বিস্তর অর্থলাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হয়। অদ্যাপি এই বাড়ী দেওয়ান খানা এবং দীর্ঘিকাটী কৃষ্ণকান্ত পুষ্করিণী নামে খ্যাত। "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের কৃষ্ণকান্ত যদিও নিমক মহলের দেওয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানের নাম অবলম্বনেই উক্ত উপন্যাস লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পূর্ণচন্দ্র বলেন, "বঙ্কিমের বাড়ীর অর্জ্জুনা পুষ্করিণী অবলম্বনে বারুণী পুকুর লিখিত হয় নাই। বারুণী পুকুর কবির কল্পনার সৃষ্টিমাত্র।" যোগেশ বাবু বলেন, এই পুকুরের স্মৃতিই বারুণী পুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি পুকুরটী এই লেখককে দেখাইয়াছেন এবং উহার বর্ণনা নিম্নলিখিত ভাবে "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নে" দিয়াছেন—

"'কৃষ্ণকান্ত' পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়া গিয়াছে। ঘাট জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাগানের পূর্ব্ব পরিচয় দিতে দু'একটা প্রাচীন বৃক্ষাদি দেখা যায়, আর দিন কতক পরে তাহাও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও উহাকে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন উহা কোনও সৌখীন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল। তখন উহার খণ্ডনীলিমাতুল্য জলরাশি দর্পণের মত অনাবিল ও স্বচ্ছ ছিল, চারিদিকে ফল ও ফুলের সুশোভিত উদ্যান বিরাজ করিত এবং সরসীর সোপান মালা লীলাললিত গামিনী কুলললনাগণের অলক্ত লাঞ্ছিত-চরণের মধুর মঞ্জীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। এখন আর উহার সে রম্যতা নাই! কিন্তু ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে হয়ত অনেকটা ছিল। কবি বারুণী পুষ্করিণীতে তাহারই ছবি দিয়াছেন এবং গ্রন্থের নামে ঐ দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।"

আর একটী ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। শচীশবাবু এবং দিব্যেন্দু সুন্দর উভয়েই গল্পটির উল্লেখ করিয়াছেন। গল্পটি এই—"ঐ বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্র রাত্রে পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন, অকস্মাৎ একটি স্ত্রীমূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করে। বঙ্কিমচন্দ্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হয়। তিনিও অনুসরণ করেন, কিন্তু অল্প দূরে রমণী মূর্ত্তি অকস্মাৎ বায়ুতে মিশিয়া যায়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে পান, উক্ত বাড়ীর পরমা সুন্দরী মধ্যম পুত্রবধূ কিছুদিন পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মীয় স্বজনকে বধূটির জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে উপদেশ দেন।* আমরা অন্যত্র শুনিয়াছি ঐ নারীমূর্ত্তি পুকুর পাড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিয়াছিল—

* নব্যপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' ১৩১৯ কার্ত্তিক, পৃঃ ৪২৫।

"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

কে জানে ইহাতে কপালকুণ্ডলার ছায়া পড়ে কিনা? পাঠকের নিকট একবার কপালকুণ্ডলার এই স্থানে বর্ণনা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দ শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল,—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের ন্যায় দৃষ্টি; রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

"অনন্তর সমুদ্রের জনহীনতীরে, এইরূপে বহুক্ষণে দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

"এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়-যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে একটি রমণীর কণ্ঠ সম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়; সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ"? এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর। হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল।

"রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস" এই বলিয়া তরুণী চলিল, পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল সঞ্চালিত শুভ্রমেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক-স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

নবকুমার কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার সংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"একি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়া মাত্র।"

নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।"

ঘটনাটি বিশ্বাস্য, কিন্তু পাঠক ইচ্ছা করিলে উক্ত বায়ুর্ভূত রমণীটির কাহিনী পরিবর্জ্জনও করিতে পারেন।

হিজলী কাঁথি কেবল কপালকুণ্ডলারই কল্পনাক্ষেত্র নহে, মেদিনীপুর জিলাস্থ মোগল পাঠানের গল্পকাহিনী অবলম্বনে দুর্গেশনন্দিনীরও গল্পাংশ রচিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, পাটনা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে এবং ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের সুবর্ণরেখা নদীর (কাঁথির দক্ষিণ সীমানা) তীরবর্ত্তী মোগলমারীর যুদ্ধ বিশেষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে দায়ুদখাঁ পরাজিত হয় বটে, কিন্তু

কাঁথির কালী মন্দির

বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য নিহত হইয়াছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দুর্গেশনন্দিনীর নিম্নোক্তি প্রকৃতই ইতিহাস সম্মত—

"সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও কতলুখাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্থ করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।"

অতঃপর ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ জলেশ্বরের (মেদিনীপুর-জিলাস্থ) যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত উড়িষ্যারাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওসমান খাঁর নেতৃত্বে আফগান-

গণ বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর সমেত সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লয়েন, পরে রাজা মানসিংহ এই বিদ্রোহ কতকটা দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। জলেশ্বর কাঁথিরই নিকটবর্ত্তী স্থান, আর অনেকে অনুমান করেন—ওসমানখাঁ বারভূঁইয়ার অন্যতম হিজলীর ঈশাখাঁর পুত্র। অনেকে মনে করেন ওসমান ছিল উড়িষ্যার ঈশাখাঁ লোহানীর পুত্র। লোহানী ছিলেন কতলু খাঁর মন্ত্রী ও জ্ঞাতি ভাই।

উক্ত আফগান বিদ্রোহাবলম্বনেই দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী রচিত। আর জলেশ্বর, হিজলী প্রভৃতি স্থান প্রত্যক্ষ করার অব্যবহিত পাঠানবিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনী" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য জাহানাবাদের গড়মন্দারণও উহার অন্যতম উপাদান।

কপালকুণ্ডলায়ও পাঠানদের কথা আছে—

"এই সময়ে পাঠানেরা আকবর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদের দমনের জন্য আকবর শাহ বিধিমতে যত্ন করিতে লাগিলেন।"

[কপালকুণ্ডলা ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ]

বালিয়াড়ির ধবলশিখর

অল্পদিন থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টির জন্য একটা প্রকাণ্ড জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নেগুঁয়ায় এই সময় আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, নাম জয়নারায়ণ দাস। ইনি জমি জরিপ, বিলি বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। আবদুল মমিন নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন মোহরার ছিলেন। তাহার বেতন ছিল মাসিক ১৫৲। কাগজপত্রে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি মাসে মেদিনীপুর জিলার কালেক্টার সাহেবের নিকট হইতে তাহার বেতন মঞ্জুর করাইয়া লইতেন। অদ্যাপি মেদিনীপুর কালেক্টরি অফিসে সেই সব কাগজপত্র বিদ্যমান আছে।

১৮৬০ সালের ২৪শে নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া রওনা হয়েন।* বাড়ীতে তিনি ৩।৪ দিন মাত্র থাকেন, এবং দীনবন্ধু মিত্রকেও পত্র লিখিয়া আনান। সঞ্জীবচন্দ্রও তখন বাড়ীতেই ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনজনের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্দ্য ছিল। কাপালিক ও কোন মায়াবিনী নারী বঙ্কিমের চিত্ত তখন এমনভাবে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল যে কথাপ্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোটিকে বিবাহ করিয়া কেহ যদি সমাজে লইয়া আসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?"

এই প্রশ্নের সময় পূর্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। কথাগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় বিধায়, উপরোক্ত কথাগুলির ন্যায় বাকীটাও পূর্ণচন্দ্রের ভাষায়ই ব্যক্ত করিব। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন যে সঞ্জীব চন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন —

"যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইতে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে। দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।"

পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি

---

* The 9th November 1860 Baboo Bunkim Chandra Chatterjee, B.A. Dy. Magistrate and Dy. Collector to take charge of the Sub-Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore. The Calcutta Gazettee 17th Nov. 1860. under 'Transfer'.

মেদিনীপুর কালেক্টারিতে গত ১৯৩৮ খৃঃ Sri D. M. Sen ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে কাগজপত্র দেখিয়াছি যে, ২৪শে নভেম্বর (১৮৬০) তিনি নেগুঁয়া মহকুমার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসেন।

হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে ; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।"

"ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

'ইহার পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতট বিহারিণী সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।"

[পূর্ণচন্দ্রের রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' প্রবন্ধ।]

যাহা হউক, ৩।৪ দিন বন্ধুদের ও আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখে বাস করিয়া বঙ্কিম খুলনা রওনা হইয়া গেলেন।

দীনবন্ধু ও সঞ্জীবের সহিত উপরোক্ত কথোপকথনের প্রায় ৬ বৎসর পরে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাস প্রকাশিত হয়। "কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী এবং কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাব সম্পন্না হইলেও শ্যামাসুন্দরীর ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিলে যখন তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়, ভীষণ নিবিড় বনমধ্যেও ভয়হীনা অথচ কৌতূহলময়ী থাকে," তখনই মনে হয় সঞ্জীবের সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই।

হরিয়াপুরে বঙ্কিম স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ২৬শে চৈত্র বঙ্কিম তিরোধান দিবসে একটী স্মৃতিসভা হইত। পরে এইস্থানে একটী মেলাও হয়। বঙ্কিম তিরোধান দিবসে তাঁহার ও তদরচিত কপালকুণ্ডলার এই প্রসঙ্গ পরিকল্পনা ক্ষেত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী কাঁথির অধিবাসিগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ভরসা করি প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এই মেলা বৃহৎ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় সমুদ্রতীরস্থ এইস্থানে সমবেত হইয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবেন। বন্দেমাতরম্

অস্বীকার

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

যখন চাঁদিমা লুকায় মেঘের ফাঁকে
পাখীরা যখন উড়ে যায় নদী বাঁকে
তখনো মনের পটেতে কে যেন
হিজিবিজি রেখা আঁকে।

আমাদের চারি পাশে
নিয়ত কে যেন ব্যঙ্গ ও পরিহাসে
বল্‌ছে "জীবন আজকে ললিত নয় ;
আকাশে তাকিও
জঠরের দাবী যদি বা শান্ত হয়।"

সারা জীবনেতে কিই বা পেয়েছি বলো ?
দেহে মনে কিছু দিইনি জোগান
ভিত্ তাই টলোমলো।
আকাশ এখন যত অপরূপই হোক্
জীবনটা যদি কুশ্রীই থাকে
মুগ্ধ হবে না চোখ।

হে পৃথিবী ! আজ তোমার আকাশ মাটি
ছড়াবে যে গান হাওয়ায় হাওয়ায় মধুময় পরিপাটি,
আমাদের প্রাণে কতখানি তার দাম—
এ জীবনে মোরা নাই বা তা জানালাম॥

ফাল্গুনায়ন

অরুণ চৌধুরী

পুষ্পিত বসন্তনামো
বিবর্ণ সহস্র পত্রে
অন্তহীন কুসুমে পল্লবে,
প্রদীপ্ত দক্ষিণ হাওয়া
অতুলন রঙের সম্ভারে,
অজস্র আলোর চাঁদ
মেঘমুক্ত ধরণী শীর্ষে।

[২]

প্রাণ দেও, সজীবতা,
গান দেও, রুদ্ধকণ্ঠের বলিষ্ঠতা,
সুর দেও, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের মুক্তি,
ভাষা দেও, ভয়োত্তীর্ণদেহের জাগরণ,
দেও অগ্রগতি, জীবনের সর্ব্বাংগীনতার
উদ্বোধন॥

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

আট

রাত্রিটা কোন রকমে নির্ব্বিঘ্নাটে কেটে গেল। পরের দিন ভোর হতে না-হতেই পাড়ায় সাড়া পড়ে গেল—আমার সন্ন্যাসী বাবা আবার গৃহী হয়েছেন। যাঁরা বিয়ের বাজারের সওদাগরীতে ছিলেন তাঁর দোসর, সহচর, সেই সমব্যবসায়ী সখারাই সকলের আগে ছুটে এলেন বাবাকে অভিনন্দন জানাতে। তাঁরা সম্ভাষণে, কর-মর্দ্দনে, হাসি-তামাসার অজস্র বিতরণে বাবার প্রাণে, গৃহ-প্রাঙ্গণে আনন্দের প্লাবন ডেকে আনলেন। আশ-পাশের বাড়ীর বউ-ঝিরাও বাদ গেল না। তারা ছাদে উঠে প্রাণপণে গাল ফুলিয়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে পাড়াময় সুখবরটা ছড়িয়ে দিল। প্রাচীনারা ত নবীনাদের ওপর টেক্কা মেরে বাড়ীই চড়াও করল। এদের মধ্যে যারা কিছু কাঁচা, তারা সোজা গিয়ে হাজির হল তাদের নতুন নাৎ-বউয়ের ঘরে। এরাই পাড়ার মেয়েদের বিয়ে-সাদীর সুযোগে কোমর বেঁধে গিয়ে আসর জমায় বাসর-ঘরে। বিয়ের যুগ্যি অ-যুগ্যি কুমারীদের ত কথাই ছিল না। তাদের গতি ছিল সর্ব্বত্র মুক্ত, অসঙ্কোচ। তারা উল্লাসে, আনন্দে, হাসিমুখে, জিজ্ঞাসু চোখে কখনও বা নতুন মা'র কাছে-কাছে কখনও বা ঘুরে-ঘুরে রং বে-রঙের প্রজাপতির মত স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের বিরাম ছিল না, ক্লান্তি ছিল না; ছিল শুধু একটা নতুন রকমের উত্তেজনা, উন্মাদনা।

আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই সঞ্চারী-রোগের মত একের অন্তর হতে অপরের অন্তরে ধাওয়া করে। বাবার বিয়ের ব্যাপারে এই সত্যটা বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল তাঁর খানসামা দশরথের কাছে। নতুন মা ঘরে আসায় শ্রীদশরথ একাই একশ' হয়ে ডাকে হাঁকে আর লোক-দেখান কর্ম্ম-ব্যস্ততায় সারা বাড়ীটা গুলজার করে তুলল। সে ছিল খাঁটি নিমকের চাকর—যখন যার খেত, তখন তার-ই গুণ গাইত। অনেকটা যেন উপকথার মায়িক আংটি। আংটি, তুমি কার?—যখন যার হাতে থাকি তার। এই দশরথই মা বেঁচে থাকতে তাঁর হুকুমে উঠত-বসত—শত প্রকারে তাঁর মন যুগিয়ে চলত!

ব্যথার ব্যাপারেও যে সমব্যথী পাওয়া যায় তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। বাবার মুহুরী বামাচরণ বাবু বাংগাল হলেও করুণায়-কাঙাল ছিলেন না। আমাদের এই নতুন নিরানন্দের ব্যাপারে তাঁর হৃদয়খানি কানায় কানায় ভরে উঠেছিল সমবেদনায়। মুখে কিছু না বললেও তাঁর চোখ-মুখের নীরব ভাষাই বলে দিচ্ছিল সহানুভূতির গভীরতা।

দিনটা সোমবার না হয়ে রবিবার হলে আনন্দ লুটেরাদের সুবর্ণ সুযোগ হত। ইস্কুল-কলেজ, আফিস আদালত না থাকলে তারা হয়ত সারা দিনই আনন্দের নেশায় ভরে থাকত। ছুটির দিন ছিল না বলে বেলা হতেই বার-আনা লোকই বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরে গেল। শুধু যে পুরুষদের মধ্যেই ভাববিহ্বলতা এসেছিল তা নয়। মেয়ে-মহলেও আনন্দ-আহ্লাদের তরঙ্গ উঠেছিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষেরা একাধিক বার বিয়ে করে, উৎসব-আনন্দ করে করুকগে; কিন্তু মেয়েদের তাতে এত আনন্দের কি আছে? কথায় বলে—ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে! এও কি ঠিক তাই নয়! এমন করে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতে বুঝি বাংলার মেয়েরাই শুধু পারে।

যারা স্বয়াহুত হয়ে আনন্দ লুটতে এসেছিল তারা লুট শেষ হতেই যে-যার ঘরে সরে পড়ল। তাদের মধ্যে একজনও বুঝল না কী তীব্র ব্যথা লেগেছিল ঠাকমা ও আমার অন্তরে। আমরা দু'টি প্রাণী আর আমাদের সুখ দুঃখের অংশীদার শিবুর মা, এই তিন জনই শুধু পড়ে রইলাম উৎসবান্তের আসরের মত বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় মনের অবস্থায়।

আগের দিন রাত্রিতে ঠাকমা এক পলক ঘুমুতে পারেন নি। বিছার কামড়ের জ্বালায় নয়, দুঃখে, লজ্জায়

অপমানে। বাবা যে কেমী পিসীর সঙ্গে সড করে গোপনে বিয়ে করে এলেন, এই অপমান যেন কাঁকড়া বিছের হুলের চাইতেও বেশী যাতনা দিচ্ছিল তাঁর বুকে। সে যে কী জ্বালা, কী কষ্ট, মুখে প্রকাশ না করলেও তার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং অন্তর্যামী, শিবুর মা আর আমি।

আমিও আগের রাতে ভাল ঘুমুতে পারি নি—দুঃখে দুঃস্বপ্নে, মনের বিক্ষোভে। ভোরের দিকে যদিও চোখে ঘুমের একটু আমেজ এসেছিল, বাবার বন্ধু-বান্ধবদের কলরবে আর পাড়ার বউ-ঝিদের শাঁখের শব্দে সেটুকু সভয়ে পালিয়ে গেল। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম ঠাকমা বলছিলেন—ভাখ শিবুর মা, আজ আর এদিককার কাজে লাগিসনে তুই। বউমার ঘরে যা, তার যা-কিছু করতে হয় কাজ তুই করিস। দেখিস তার যেন কোন কষ্ট না হয়, অসুবিধে না হয়। আর শোন, এক ফাঁকে গিয়ে তোর ভাজকে বলে আয়—যতটা পারে সে যেন আমাদের কাজ-কর্ম করে দিয়ে যায়, নগদা পয়সা দোব।

শিবুর মা কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে বিধাতাপুরুষের আক্কেলের উপর অনেক কিছু দোষ চাপিয়ে নতুন মার ঘরের দিকে চলে গেল। সেখানে তখন পাড়ার মেয়েদের হৈ-হুল্লোড় চলছিল।

আমি হাত মুখ ধুয়ে আসবার পর ঠাকমা আমাকে দু'বার পাঠিয়েছিলেন বাবাকে ডেকে আনতে। দু'বারই তাঁর ঘরে লোকজন দেখে ফিরে এসেছি। ঠাকমা আবার বললেন—যা ত খোকন, তোর বাবাকে শীগ্‌গির করে ডেকে আনগে লক্ষীটি। আমি গিয়ে দেখলাম ভিড় অনেক পাৎলা হয়ে গেছে। যা দু'চারজন তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছিল, আমি গিয়ে বাবাকে ডাকতেই অনিচ্ছায় উঠে পড়ল। এই শ্রেণীর গায়ে পড়া ভাবকদের যা স্বভাব—যেতে যেতে ও হাসতে হাসতে বলে গেল—বরযাত্রী নিলে না মধু, দেখো বউভাতে যেন বাদ না পড়ি।

বাবাও হাসতে হাসতেই বললেন—সে দেখা যাবে 'খন।' বাবা আসতেই ঠাকমা বললেন—মধু তোর কাকীমাকে একটা খবর দে; এক্ষুণি যেন চলে আসে। হ্যাঁ, আর বলে দিস—আজ এখানেই খাবে সে।

বাবা বললেন—বামাচরণকে বলে দিচ্ছি; বাজার যাবার পথে কাকীমাকে খবর দিয়ে যাবে।

ঠাকমা—আর এই নে বাজারের ফর্দ আর টাকা। শীগ্‌গির বেহারীকে বাজারে পাঠিয়ে দে। আজ ফুলশয্যা, বউভাত—ঢের কাজকর্ম আছে। একজন ঠিকা বামুন আর একটা চাকর যেন পাঠিয়ে দেয় বেহারী।

বাবা বললেন—ওসব আবার কি হাঙ্গামা করছ মা? কিচ্ছুর দরকার নেই ওসবের।

—তুই চুপ কর ত; দরকার আছে কি না সে আমি বুঝব'খন।

বাবা দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে চলে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ ছোট ঠাকমা এসে পড়লেন বাড়ীতে পা দিতেই শিবুর মার মুখে শুনলেন বাবা বিয়ে করে এসেছেন। তিনি অভিমানে মুখ ভার করে ঠাকমাকে গিয়ে বললেন—দিদি, না হয় ভিন্ন বাড়ীতেই থাকি, তা বলে কি এতই পর হলাম যে, মধুর বিয়ে দিয়ে সে খবরটা আমায় জানালে না? আমি কি বিয়ে দিতে বারণ করতাম?

—তুই যে বাড়ীতে পা না দিতেই নিজ মূর্তি ধরলি অমু। এখন চুপ কর, পরে শুনিস।

ছোট ঠাকমার নাম ছিল অমলা। ঠাকমা 'অমু' বলেই ডাকতেন। ঠাকমা যেমন নিরীহ, নিরহঙ্কার ছিলেন, অল্পভাষী ছিলেন, ছোট ঠাকমা ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। মান অপমানের জ্ঞান ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ টনটনে সামান্য কারণেই তিনি নিজেকে অবজ্ঞাত, অপমানিত বোধ করতেন। পান থেকে চুণটুকু খসলেই রেগে টং হতেন ঠাকমার সংক্ষেপ উক্তিতে তাঁর অভিমান দূর হল না। তিনি তিরিক্ষিভাবেই উত্তর দিলেন—কেন, চুপ করব কেন দিদি? এমন কি অপরাধ করলাম যে এত বড় খবরট চেপে গেলে আমাকে?

ঠাকমাও একটু অধৈর্য্যের সঙ্গেই বললেন—কি যে আজ বাজে বকছিস, ঠিক নেই। আমি কি আগে জানতাম যে তোকে বলব? মধু বউ নিয়ে বাড়ী এলে ত টের পেলাম।

—ওমা, বলো কি দিদি! যে মধু তোমার কথায় ওঠে-বসে...

ঠাকমা বাধা দিয়ে বললেন—ও-সব কথা এখন চাপা দে অমু। যে জন্যে তাড়াতাড়ি তোকে আনালাম তাই শোন। আজ ফুল-শয্যা ও বউ-ভাত। একা আমি ক'দিক সামলাই বল? লক্ষ্মীটি, অমু ভাই, তুই একটিবার খোকনকে নিয়ে পাড়ায় আর বউমার বাপের বাড়ী নেমন্তন্ন সেরে আয় গে।

— পাড়ায় বলতে কোন হাঙ্গামা নেই। সে আর ক'মিনিটের মামলা? বউর বাপের বাড়ী কোথায় কি বৃত্তান্ত তা ত জানি না দিদি।

ঠাকমা বললেন—শিবতলায় যাওয়ার পথে ক্ষেমীকে তুলে নিস। তারই ননদের মেয়ে বউমা।

ছোট ঠাকমা কপালে চোখ তুলে বললেন—ও দিদি এ কি করেছ? দেশে এত মেয়ে থাকতে শেষে কিনা রায়দের মেয়ে ঘরে আনলে! আমার মা বলেন—রায়ের গুষ্টি ভূতের দৃষ্টি। ঘর ভাঙ্গানিতে ওদের মেয়েদের জুড়িদার ভূভারতে আর নেই।

ঠাক্‌মা সভয়ে বললেন—আঃ চুপ করনা অমু। বউমা শুনলে কি মনে করবেন বল? তোর সঙ্গে ত মোটর আছে. যা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়। ক্ষেমী আর তার জামাই, মেয়েকেও বলিস। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা খোকন, বাঁ করে জামা কাপড় বদলে নে গে।

আমি যখন যাচ্ছিলাম, ছোট ঠাকমা বললেন—খোকন তোর বাবার কাছে এক গ্যালন তেলের দাম চেয়ে নিস। আমার গাড়ীতে যা তেল আছে তাতে অদ্দুর যাওয়া-আসা চলবে না।

একটু পরেই ছোট ঠাকমা আর আমি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে পড়লাম।

নয়

আমরা ক্ষেমী পিসীকে নিয়ে নতুন মার বাপের বাড়ী এলাম। সদর দুয়ার ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল। তিনচার বার হর্ণ দিলেও কেউ দরজা খুলে দিল না। ক্ষেমী পিসী নেমে গিয়ে জোরে জোরে কড়া নাড়ার খানিকক্ষণ পরে দশ এগারো বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে এসে দরজা খুলে মোটরের দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষেমী পিসী একটু রাগ করেই বললো—একি আক্কেল তোদের, মালী? কুটুম বাড়ীর লোক এসেছে, কোথায় ছুটে এসে দুয়ার খুলবি না গদাই লস্করী চালে এক ঘণ্টা দেরী।

পরে জেনেছিলাম 'মালী' নতুন মার ছোট বোন।

ক্ষেমী পিসীর কথা শুনে 'মালী' খেঁকিয়ে বললে—আমার কি দোষ বাপু? দিদি যে দেরী করে খুলতে বললে।

ক্ষেমী পিসী কসে এক ধমক দিয়ে বললেন—চুপ কর, যত সব বাজে কথা মেয়ের। যা, ছুটে গিয়ে তোর মাকে বল—সতুদির খুড়শাশুড়ী এসেছেন।

মালী মাসী ছোট ঠাকমার মুখপানে একটি বার তাকিয়েই দুমদাম করে ছুটে চলে গেল। আমরা ক্ষেমী পিসীর পেছন পেছন উঠান পার হয়ে চললাম। আমরা যখন সিঁড়ির মাথা বরাবর এসেছি, তখন সদ্য পাট ভাঙ্গা দামী রঙিন শাড়ী আর এক-গা গয়না পরা বছর পঁয়ত্রিশের একটি মোটা সোটা মহিলা এসে ক্ষেমী পিসীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার গা থেকে এসেন্সের গন্ধ ঠিকরে পড়ে সিঁড়ির ভাপসা ভাবটাকে সুবাসিত করে তুলল।

ছোট ঠাকমাকে দেখিয়ে ক্ষেমী পিসী বললে—খুকু এঁকে প্রণাম কর—সতুর খুড়শাশুড়ী।

ছোট ঠাকমার দিকে চেয়ে বললে—সতুর দিদি, সুকুমারী।

মাসীমা অনিচ্ছায় মাথাটা ঘুরিয়ে হাত দু'খানি কপালে ঠেকিয়ে একটি ছোট্ট নমস্কার জানালেন এবং আমাদের উপরে যেতে বলেই আগে আগে গজেন্দ্রগমনে চলতে লাগলেন।

তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করায় ছোট ঠাকমার মেজাজটা যেন বিগড়ে গেল মনে হল। মাসীমার রকম সকম দেখে ক্ষেমী পিসীও যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমরা দোতালার দরদালানে পা দিতেই দেখি চলন্ত মাংসপিণ্ড

বিশেষ একটি বর্ষিয়সী মহিলা শরীরের ভারে হেলে দুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। মেদাধিক্যে শরীরটা বে-ঢপ দেখালেও রূপের বেশ জলুস ছিল মুখে। এই বয়সেও অমন রূপ দেখে কেহ যদি মনে করেন রূপকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য যৌবনে ইনি কান্তিবর্দ্ধক বহু প্রচেষ্টা করেছেন সেটা হয়ত ভুল হবে না। যৌবন সাগরের তরঙ্গ দোলা থেমে গেলেও তার উচ্ছ্বাসের মৃদু আভাস তখনও সুস্পষ্ট ছিল।

মহিলাটি এগিয়ে আসতেই মাসী বললেন—মা সতুর শাশুড়ী। ছোট ঠাকমা হাত যোড় করে মাথায় ঠেকালেন; কিন্তু দিদিমা প্রতিনমস্কারের অভিনয়টুকুও না করে বললেন—এসো বোন এসো, কি ভাগ্যি আমার।

বড় মাসী হেসে বললেন—গরীবের বাড়ী পাট হাতী।

ছোট ঠাকমাও স্থূলাঙ্গীই ছিলেন, তবে দিদিমার মত নয়, দু'জনের মধ্যে তফাৎটা ছিল অনেকটা মুলতানী আর ভাগলপুরী পয়স্বিনীর মত।

ছোট ঠাকমা ভাবলেন তাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যেই বড় মাসীর এই বিনয়ের ভাণ। তিনি হয়ত ঠিকই অনুমান করেছিলেন। তিনিও কাউকে ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী ছিলেন না। তাই রুদ্ধ রাগে খন্‌খনে গলায় ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস খেলিয়ে বললেন—তোমাদের এই মান্ধাতার আমলের পড়-পড় বাড়ী যদি তোমার মায়ের ভার সইতে পারে তা হলে আমার ভারও সইতে পারবে।

বড় মাসীর মুখখানি রাগে কি লজ্জায় জানিনে জবা ফুলের মতই লাল টকটকে হয়ে উঠল।

ছোট ঠাকমা বললেন—বেয়ান, ফুলশয্যায় তোমাদের বলতে এলাম। সব্বাইকে যেতে হবে কিন্তু—কোন ওজর আপত্তি শোনব না আমরা।

দিদিমা কোন কথা বলবার আগেই বড়মাসী বললেন—সতুর বিয়েতে মধু যা কাণ্ডটা করলে তাতে কি আর আমাদের মন সরে যেতে!

কেন মধু আবার কি কাণ্ড করলে?—ছোট ঠাকমা জিজ্ঞেস করলেন।

এবার দিদিমা মেয়ের হয়ে ওকালতির মতভাবে বললেন—সত্যি বেয়ান, মধুমনি কাজটা ভাল করেনি, বড়ই কষ্ট দিয়েছে আমাদের মনে।

বড় মাসী বললেন—কাণ্ড নয় বলেন কি? বিয়ে করতে এলো, সঙ্গে না আনল একজন বরযাত্রী, আর না ছিল একজন চাকর কি বাজনাদার, দিন আনে দিন খায় এমন যে দীন দরিদ্দির তার বিয়েতেও দু' একজন লোক আসে। ছিঃ।

বড় মাসীর কথার জের টেনে দিদিমা বললেন—সত্যি বোন, আমাদের বড়ই লজ্জা দিয়েছে মধুমনি। পাড়ার লোক ছিঃ ছিঃ করছে। আমার খুকুর বর এসেছিল চৌঘুড়ি চড়ে—আগে পিছে তলোয়ারধারী তুরুক সওয়ার নিয়ে। সে কি রোসনাই আর গোরার বাদ্যি! সঙ্গে বরযাত্রী এসেছিল কম হলেও শ' তিনেক। সহরের লোক ভেঙ্গে পড়ল সমারোহ দেখতে।

বড় মাসী মুখভার করে বললেন—আর আমাদের সতুর বিয়েতে পাড়ার লোকও জান্তে পারল না।

ছোট ঠাকমা ভিতরে ভিতরে তেতে উঠেছিলেন। বাইরে সে ভাবটা চেপে রেখে শান্ত ভাবেই বললেন—আমাদের মধু দোজবর; তার ওপর বয়েসও পঞ্চাশ পারিয়েছে। সে কি বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে তুরুক সওয়ার নিয়ে, শয়ে শয়ে বরযাত্রী সঙ্গে করে আসতে পারে?

বড়মাসী বললেন—একি বলছেন? মধুই না হয় দোজবর, আমাদের সতুর ত এই প্রথম বিয়ে। তার মনে কি সুখ-সাধ বলে কিছু থাকতে নেই?

দিদিমা বললেন—কি যে বলছ বেয়ান! দোজ-বরের ঘটা করে আসতে দোষ কি? আমার বাবা তেজ-বরে ছিলেন। তিনি ত শানাই বাজিয়ে রোসনাই সাজিয়ে, চৌদোলে চড়ে চামরের হাওয়া খেতে খেতে বিয়ে করতে গেছলেন। মা সে কথা বলে কত গরব করতেন।

ছোট ঠাকমা বললেন—বেশ ত মধুই না হয় চোরের মত চুপি চুপি বিয়ে করতে এসেছিল; তোমরা কোন দু'দশজন জ্ঞাতি কুটুম, পাড়াপড়শীদের বলেছিলে? আমরা যে মধুর মা-খুড়ী আমাদেরই কোন বিয়ের

কথা জানিয়েছিলে তোমরা? থাকগে ওসব কথা। কার দোষ, কার গুণ তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই বেয়ান, এখন আমরা কুটুম হলাম, কুটুমের মতই আমরা সুখে-সম্ভাবে থাকতে চাই। আজ উঠি বেয়ান, অনেক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই যেও কিন্তু।

দিদিমাকে নমস্কার করে ছোট ঠাকমা উঠে পড়লেন। ক্ষেমী পিসিও আমাদের সঙ্গেই পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। বড় মাসী, মালীমাসী কি দিদিমা একজনও আমাদের তুলে নিতে নীচে নামলেন না। এতেও ছোট ঠাকমার মেজাজ আগুন হয়ে উঠল। ক্ষেমী পিসিও দিদিমাদের শিষ্টাচারের অভাবে বেশ বিরক্ত হয়েছিল মনে হল।

সন্ধ্যার পর ফুলশয্যা এল—এক থালা সন্দেশ, দু'টো ফুলের মালা আর কাপড়। ঠাকমার মনের ভাব বোঝা গেল না। যারা তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল তিনি তাদের পেট-ভরা মত খাইয়ে প্রত্যেকের হাতে দু'টি করে টাকা দিয়ে বিদেয় করলেন।

ছোট ঠাকমা ত রেগে টং। আহা কি ফুল-শয্যার ঘটা; লজ্জাও করল না পাঠাতে? নিশুরচায় মেয়ে পার করলি, না হয় ফুলশয্যাটাই একটু ভাল করে দে। দান-সামগ্রী কিছু দিয়েছে, দিদি?

—না; তুই বাপু এখন থাম। ও-সব নিয়ে আর কথা বাড়াসনে। এখন বউমার বাপের বাড়ীর লোকজনরা এসে ভালয় ভালয় খেয়ে যায়, তবেই আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

ছোট ঠাকমা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—যা অভদ্দর দেখলাম নাও আসতে পারে। তবে হ্যাঁ, বউর বড় বোনের গায় একগা গয়না আছে; সেগুলো দেখাবার জন্যে আসলেও আসতে পারে।

ছোট ঠাকমা কি বলতে কি বলবেন আর কোথা থেকে নতুন মা শুনে ফেলবেন এই ভয়ে ঠাকমা তাঁকে সরিয়ে দেবার মতলবে বললেন—তুই একবার রান্নাঘরে যা'ত অমু; ভাখ গিয়ে কি দিয়ে কি করছে ঠাকুর।

ছোট ঠাকমা রান্নাঘরের দিকে গেলেন। ঠাকমা ফুলশয্যা নিয়ে উপরে গেলেন। সে-সব রেখে যখন নেমে আসছিলেন, সে সময় সিঁড়িতে ক্ষেমীপিসী আর একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছিপছিপে ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ছেলেটিকে ঠাকমা চিনতে না পেরে ক্ষেমী পিসীর মুখপানে তাকাতেই সে বললে—সত্যেন, সতুর দাদা।

বড়মামা ঠাকমাকে আন্দাজেই চিনে নিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকমা চিবুক স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—আগেত দেখিনি কখনও, তাই প্রথমে চিনতে পারিনি। মনে কিছু ক'রো না বাবা সত্তু। চলো ওপরে, বউমার ঘরেই বসবে। বেয়ানরা কই? তাঁরা আসেননি?

—না মাওইমা, তাঁরা আজ আসতে পারলেন না। মা অনেক করে আপনাকে বলতে বলে দিয়েছেন—আপনি যেন কিছু মনে না করেন। এরপর একদিন এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবেন।

মনমরা হয়ে ঠাকমা বললেন—খুকু ও মালী ত আসতে পারত, তারা এলোনা কেন? তারা না আসায় বউমার মনে, মধুর মনে কত কষ্ট হবে বল ত।

বড়মামা অস্বস্তি বোধ করে বললেন—সবাই আসত মাওইমা, কি একটা অসুবিধার জন্যে তাদের আসা হল না। দু'চার দিনের মধ্যে সকলে আসবে একদিন।

ঠাকমা আর কথা বাড়ালেন না। যথা সম্ভব মুখের ভাব প্রসন্ন করে বললেন—তা আসবেন বই কি। না আসলে আমরাই কোন জোর-জুলুম করতে ছাড়ব। বড় মামার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—চল বাবা বউমার ঘরে। ক্ষেমীপিসীকে বললেন—যা ত ক্ষেমী সতুকে সঙ্গে করে বউমার ঘরে।

বড়মামা ক্ষেমীপিসীর সঙ্গে নতুনমার ঘরে গেলেন।

ঠাকমা নীচে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মুখুজ্জে দাদুকে বাড়ী ঢুকতে দেখে নীচে আর গেলেন না। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েই ডাকলেন—এসো মুখুজ্জে, আমার নতুন বউ-মাকে দেখবে এসো।

মুখুজ্জে দাদু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সহাস্যে বললেন—বউ দেখতেই ত এলাম। দেখলে ত বিধু, কাঙালের কথা বাসি হতে না হতেই সত্যি হল কিনা?

ঠাকমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নীচু গলায় বললেন—চুপ কর মুখুজ্জে, পাশের ঘরে বউ রয়েছে; শুনতে পাবে।

মুখুজ্জে দাদু গলার সুর কড়ি থেকে কোমলে নাবিয়ে বললেন—চলো বিধু, তোমার বউ দেখাবে। মাকে একবার আশীর্ব্বাদ করে যাই।

ঠাকমা মুখুজ্জে দাদুকে নতুন মার ঘরে নিয়ে গেলেন। বেশ হাসি হাসি মুখেই বললেন—ভাখো মুখুজ্জে, কেমন দিব্বি বউ পেয়েছি। আশীর্ব্বাদ কর বেঁচেবর্তে থাক, সুখে ঘর-সংসার করুক।

মুখুজ্জে দাদু দুটি টাকা দিয়ে নতুন মাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—সত্যি বিধু, খুব সুন্দর বউ পেয়েছ—যেন মূর্ত্তিমতী শ্রী।

ঠাকমা বললেন—ওকি! তুমি আবার টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে কেন? তোমার মুখের আশীর্ব্বাদই আমরা সবচেয়ে বড় মনে করি, মুখুজ্জে।

—তা কি আর আমি জানিনে বিধু, তোমরা যেমন আমাকে ঘরের লোক মনে কর, আমি নিজেও তাই মনে করি। তা হলেও নতুন বউকে কি খালি হাতে দেখতে আছে?

নতুন মা মুখুজ্জে দাদুকে প্রণাম করলেন। আমার পিঠে হাত রেখে মুখুজ্জে দাদু বললেন—ভাখো মা, এই বিমল আর তোমার বুড়ী শাশুড়ী এখন থেকে কিন্তু তোমারই পোষ্য হল। এদের তুমিই দেখবে শুনবে। আশীর্ব্বাদ করি নিজেও সুখী হও আর দশজনকেও সুখী কর। আমাদের অতি স্নেহের মধুর সংসারকে তুমি মা মধুর কর, আনন্দময় কর, এদের শ্রীবৃদ্ধি কর।

বড়মামাকে দেখিয়ে ঠাকমা বললেন—এটি বউমার দাদা—সতু।

বড়মামা নমস্কার করতেই মুখুজ্জে দাদু তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—কাজকর্ম্ম কি কর বাবাজি?

—আজ্ঞে কালনায় ওকালতি করি।

—ও! তুমি উকিল। বেশ বেশ; মধুর সঙ্গে বনবে ভাল।

তোমরা সম্পর্কেও 'ব্রাদার-ইন্-ল' আর ব্যবসায়ও।—বলে একটু হেসে নিলেন। বড়মামাও একটু হাসলেন।

মুখুজ্জে দাদু—বসো বাবা, বউমার কাছে বসো তুমি। আমি এবার যাই, বিধু। মধুর সঙ্গে একবার দেখা করিগে।

ক্ষেমীপিসী তখন নতুনমার ঘরেই ছিল। মুখুজ্জে দাদু তাকে কিছু বললেন না দেখে গায়-পড়া হয়েই বললে—আমায় একটু আশীর্ব্বাদ করলে না মুখুজ্জে মশায়?

মুখুজ্জে দাদু সহাস্যে বললেন—বিনা আশীর্ব্বাদেই ত তুই সর্ব্বমঙ্গলা। কোন ঘটে না আছিস তুই? এর উপর যদি আশীর্ব্বাদ করি তা'হলে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে হানা দিবি যে রে। বনে জনে সুখে থাক, আর ঘন ঘন আমাদের পাড়ায় এসে দেখা দিস। আশীর্ব্বাদ পেয়ে খুসি হলি ত?

ক্ষেমী পিসী সত্যই খুশি হয়েছিল।

চলো মুখুজ্জে, একটু কিছু মুখে দেবে—ঠাকমা বললেন।

মুখুজ্জে দাদু হাসতে হাসতে বললেন—একটু কিছুও নয়, আর এখনও নয়, বিধু; দশজনের সঙ্গে পাতা পেড়ে পেট ভরে খাবো আজ, একটু নীচু গলায়—লজ্জায় দু'চার দিন ত মুখ দেখাবে না মধু, যাই দু'চারটে হাসি-রসকরা করে' লজ্জাটা ভেঙ্গে দিইগে।

ক্রমশঃ

দুর্গতির এক দিন

শ্রীরমাপতি দাস

আছে মাত্র ছ 'আনা পয়সা। ছেঁড়া মাদুরটার উপর একটা হাত বালিশ করিয়া ও অন্য হাত কপালে দিয়া দুর্গাগতি চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া অনবরত পা নাড়িতেছে ও ভাবিতেছে, এর পর? ফুটপাথে ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "লেঙ্‌ড়া আম।" মেসের তেতলা হইতে ডাক পড়িল, "এই আম।" আম-ওয়ালা উঠিয়া সোজা তাহার ঘরেই হাজির। দুর্গাগতি তাহাকে উপরে যাইতে বলিল। আম-ওয়ালা কিন্তু মাথার বোঝা নামাইয়া ছুরি দিয়া একটু আম কাটিয়া সামনে ধরিয়া বলিল, "দেখুন না বাবু,—বড় মিঠা আম।"

দুর্গাগতি টপ্‌ করিয়া সেটি মুখে ফেলিয়া দিল। বেশ মিষ্টি ত! কিন্তু সম্বল ছ' আনা পয়সা। বলিল, "না, তেমন ভাল নয়।"

আম-ওয়ালা অন্য আম হইতে একটু কাটিয়া দিল "এইটা দেখুন।" —পূর্ব্বে সে যে তাহার কাছে অনেক আম খাইয়াছে। এটাও চমৎকার! কিন্তু···। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না, আজ পেটটা ভাল নাই। আর একদিন এসো।"

আম-ওয়ালা চলিয়া গেল। দুর্গাগতি অব্যাহতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা বাক্সটার উপর হইতে একটি আধ-খাওয়া বিড়ি কুড়াইয়া লইয়া ধরাইবার জন্য দেশলাই লইল। দেশলায়ে আছে ছয়টি কাঠি। ভারি মজা ত! পকেটে ছ' আনা পয়সা, দেশলায়ের বাক্সে ছ'টি কাঠি, আজ মাসের ছ'তারিখ, মেসে খাওয়া বন্ধ করেছে, চব্বিশ টাকা বাকি, সেটা ছয় এর চারগুণ; এখন বাজে প্রায় ছ'টা। একটি কাঠি জ্বালাইয়া বিড়িটা ধরাইল, দুই এক টান দিতেই মুখ পুড়িবার উপক্রম হওয়ায় সেটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।··· না, চাকরিটা ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই, অপমানটা সহ্য করাই ছিল ভাল। কিন্তু সাহেবটা যে একেবারে যা তা বলিয়া বসিল bloody fool, devil, আরও কত কি। না হয় মদের ঝোঁকে বলিয়াছে, কিন্তু বিনা দোষে ত। কোথায় কবে কাকে কি কাজ করিতে বলিয়াছিল,—হয় নাই। আক্রোশটা পড়িল তাহার উপর। সেও মুখের উপর জবাব দিয়াছে—কিন্তু চাকরিটা ছাড়িতে হইয়াছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে যাওয়ার ফল বেকার হওয়া, এর পর না খাইয়া থাকিতে হইবে।

এ বাজারে অনেকেই না খাইয়া আছে। দেহ-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গকে কোন প্রকারে আটকাইয়া রাখিতে হইলে যেটুকু না দিলে নয়, সেটুকুর সংস্থান-ও অনেকেরই হইতেছে না। এই বাধ্যতামূলক দাতব্যটুকুও বাদ পড়িয়া গেলে! দুর্গাগতির আর চিন্তা করিবার সাহস হইল না। কলিকাতার ফুটপাথে এক সময়ে বহু লোককে না খাইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য! বাড়ীতে তাহার অনেকগুলি পোষ্য—নিজের খরচ বাদে যা থাকিত তাহা প্রতিমাসে পাঠাইয়াছে বলিয়া তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। এর পর? জটিল পরিস্থিতি লইয়া মাথা ঘামানোর হাত হইতে জোর করিয়া অব্যাহতি পাইবার জন্য সে জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু উপর হইতে ডাক পড়ায় বাহিরে তার যাওয়া হইল না। প্রায় ছ'মাস হইল এম-এ পাশ করিয়া নরেন চাকরির খোঁজে মেসে বসিয়া আছে। বাড়ী হইতে টাকা আসে; অধিকন্তু দুইটী ছাত্র পড়ায়। তাই পকেট খরচাও বেশ চলে এবং সেই জন্য দুপুরে তার ঘরে আড্ডাটাও বেশ জমে। মাঝখানে একটা থালায় অনেক-গুলি কাটা আম। তার চারিদিকে পাঁচ ছয়জন বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে আম খাইতেছে। দুর্গাগতিকে দেখিয়া নরেন ভরা মুখে কোন প্রকারে বলিয়া উঠিল, "বাজে সময় নেই, শিগ্‌গির লেগে পড়ো।" আম-ওয়ালাটা যে

তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "পেটটা ভাল নাই।" তবু বসিল তাহাদের সঙ্গে এবং যেন বহু অনিচ্ছায় দুই এক কুচি মুখে দিল। খাওয়া শেষ হইলে আম-ওয়ালা দাম লইয়া চলিয়া গেল। তারপর আসিল পান ও সিগারেটের পালা। দু'জনের পকেটে কৌটায় পান ছিল; তাহা হইতে পান সকলে পাইল। কিন্তু সিগারেটের অভাব। একজন বলিয়া উঠিল, "দুর্গাগতি বাবুকে আজ সিগারেটটা দিতে হয়।" সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন এমনভাবে হৈ হৈ করিয়া উঠিল যে তারা যেন স্পষ্ট জানে দুর্গাগতি বাবু সিগারেট খাওয়াবেনই। দুর্গাগতির মুখটা মুহূর্ত্তের জন্ত পাংশু হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "বেশ ত, নিয়ে আসছি।" সোজা নামিয়া গেল নীচে এবং শেষ সম্বল সেই ছয় আনা পয়সা খরচ করিয়া একবাক্স সিগারেট ও একটি দেশলাই কিনিয়া আনিল। আসিবার সময় নরেন তাহাকে একটা দেশলাইও লইতে বলিয়াছিল। বীরের মত সকলকে একটি করিয়া সিগারেট দিল; নিজেও একটা টানিল। হায়রে সজ-দোষের দধীচি! বেচারি কাঁদিবে না হাসিবে তার ঠিক নাই।

একজন একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। একটা লেখার খানিকটা পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছে। যাকে বলি কপাল সেটাকে একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় কর্ম্মফল। Law of karma every where,—সর্ব্বত্র কর্ম্মফল।" কথাটা দুর্গাগতিকে বিঁধিল। তার চাকরি গিয়াছে। এটা কর্ম্মফল? প্রতিবাদ জানাইবার জন্ত সে বলিয়া উঠিল, Chance বা accident ব'লে কিছু নাই?" উত্তর হইল, "না। Charater is destiny—ভাগ্য গড়িয়া উঠে নিজের চরিত্রের উপর।" দুর্গাগতি ইহা কিছুতেই মানিয়া লইবে না। একটু গরম হইয়া বলিল, "কিছুতেই তা হতে পারে না। অপর পক্ষ অনুরূপ গরম ভাবে উত্তর দিল, "তাই বটে। হতে পারে না কি? নিজেদের অযোগ্যতা—inefficiency ঢাকবার জন্ত কপালের আশ্রয় নেয় লোকে।" তর্কটা ঘোরালো রকমের হইবার উপক্রম হইল, দুই পক্ষই বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। কোণ হইতে একজন সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—

এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥

সিগারেটের ফাঁক হইতে এমনভাবে সুর করিয়া বলিল যে সকলেই হাসিয়া উঠিল হো হো করিয়া। অন্ত একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে শোনো-শোনো।" খবরের কাগজটি সকলের সামনে ধরিয়া মুরব্বির সুরে বলিল, "পড়েছ? এই ভাখো। আজ টালা পার্কের নিকটে একটি যুবকের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার পকেটে একটি কাগজে লেখা ছিল, বহু চেষ্টা করিয়াও একটি চাকরি পাইলাম না। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায়।" দুর্গাগতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাউকে কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিল। একজন বলিল, "আহা, চটেন ক্যান? আসুন, একহাত তাস হয়ে যাক।" শুনিল না।

চাকরি না পাইয়া আত্মহত্যা! নিজের ঘরে আবার চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া দুর্গাগতি তুমুল বিক্রমে পা নাড়িতেছে। নিজেকে ক্লোরোফর্ম্মের রোগী মনে করিয়া মনে মনে গুনিতেছে এক, দুই, তিন, দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ভেঁড়ার পাল, বরফের পাহাড়, ইত্যাদি, যদি একটু ঘুম আসে। বৃথা চেষ্টা। বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সামনে একটা প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। দরজায় দুই সঙিনধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় আশি বছরের এক বুড়ী, কুঁজো হইয়া লাঠিতে ভর দিয়া কোন প্রকারে চলে,—মাথা অনবরত নড়িতেছে সেই সঙ্গে লাঠি ধরা হাতটিও কাঁপিতেছে;—সে আসিয়া হাত পাতিল ভিক্ষার জন্ত দরজায়। পাহারা-ওয়ালা রুদ্রকণ্ঠে হাঁকিল, "ভাগ হিঁয়াছে।" বুড়ী ভয় খাইয়া চলিয়া যাইতে গিয়া পড়িয়া গেল; ফুটপাথটি ওখানে বেশ চমৎকারভাবে বাঁধানো, কাজেই খুব মসৃণ। লাঠি ফসকাইয়া যাওয়ায় বুড়ীর এই দুর্দ্দশা। ইতঃবসরে একটি গরু কোথা হইতে আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে। পাহারা-ওয়ালা তাহাকে সঙিন তুলিয়া আক্রমন করিল। গরুটি পলাইতে গিয়া আসিয়া পড়িল

বুড়ীর উপর। চারিদিকে সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল, অনেকে বুড়ীর কাছে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। দুর্গাগতিও ছুটিল, —কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। বাড়ির গেট ধড়াস্ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল। অনেকে চিৎকার করিতেছে, "অ্যামবুলেন্স, অ্যামবুলেন্স।" অজ্ঞাতসারে দুর্গাগতির মুখ হইতে বাহির হইল, "বেশ।" একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার চলিল সামনের দিকে।

খেয়াল হইল বৌ-বাজারের মোড়ে ছানাপটির সামনে। ছানা সে প্রায়ই কিনিত, সেইজন্য অনেক ছানা-ওয়ালা তাহাকে চিনে। তাহাকে যাইতে দেখিয়া একজন বলিল, "আজকার ছানা খুব ভাল। নিয়ে যান।" ছুরিতে একটু তুলিয়া সামনে ধরিল। দুর্গাগতি থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সেটা হাতে লইয়া মুখে দিল। হাঁ, ভাল। কিন্তু......"আজ থাক্,—অন্য একদিন।" চলিল মোড়ের দিকে। একবার ভাবিল, প্রত্যেক দোকানে এইভাবে একটু করিয়া চাখিলে, খানিকটা খাওয়া হইয়া যায়। পরমুহূর্ত্তেই নিজের উপর রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই কুকুর না কি?" সামনের পানের দোকানটায় দুই জন যুবক পান খাইয়া সিগারেট ধরাইতেছে। একটা ভিখারী আসিয়া হাত পাতিতেই তাহারা চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল, "পয়সা সস্তা হয়েছে? যত সব—।" দুর্গাগতির শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল। যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝলে ভায়া, সিগারেট কিন্‌বার পয়সা সস্তা; কিন্তু ভিখারীকে দেওয়ার পয়সা মোটেই সস্তা নয়। তোমরা দেশের দায়িত্বপূর্ণ ছাত্র না?" অপর যুবক বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। Thank you; দয়া করে নিজেই পয়সাটা দিন না।" "আমি যদি সিগারেট্ টানতাম ওদের পয়সা না দিয়ে, তবে নিশ্চয় একথা বলতে পারতে। তোমরা ছাত্র, দেশের ভবিষ্যৎ। ভিখারীকে একটা পয়সা দেওয়ার প্রবৃত্তি নাই, অথচ এই বয়সে দিব্যি সিগারেট টান্‌তে পারো। কি অধিকার আছে তোমাদের অভিভাবকের পয়সা এভাবে নষ্ট করার।" যুবক ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "Thank you; পাগলের সঙ্গে তর্ক করার অবসর আমাদের নাই। সঙ্গীকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "চল্, চল্, ভালো পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। কামড়ে না দ্যায়।" ইত্যবসরে ভিড় জমিয়া গেল এবং ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। দুর্গাগতি তাহার মধ্যে পড়িয়া রহিল ঘূর্ণির মাঝখানে ডুবু ডুবু ছোট ডিঙ্গির মত। সকলেই জানিতে চায় ব্যাপারটা কি। একজন বলিয়া উঠিল, "পাগল, মশায়, পাগল,—শুনলেন না, ছেলেগুলো কি বলে গেল?" অন্য একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কামড়াতে গিয়েছিল বুঝি? বাড়ির লোকদের আক্কেলের বলিহারি! এ পাগলকে একা ছাড়ে?" একটি বিপুল আয়তনের বলিষ্ঠ যুবক আস্তিন গুটাইয়া সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় থাকা হয়?" পিছন হইতে অমনি কে বলিয়া উঠিল, "গাঁট্ কেটেছে বুঝি? লাগাও মার।" সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "মার,—মার।" একজন জোর গলায় বলিল, "পাগলস্য গাঁট্টকাটাস্য চ চাঁট্টৌষধি তথা লাঠৌষধি।" অনেকে হাসিয়া উঠিল। বলিষ্ঠ যুবকটি আরও আস্তিন গুটাইতেছে, এমন সময় ভিড় ঠেলিয়া একজন দুর্গাগতির সামনে আসিয়া বলিল, "দুর্গাগতি বাবু যে, বড় সাহেবের চাপড়াশি আপনাকে গরুখোঁজা করছে, এখানে কি করছেন? ঐ মোড়টায় মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, চলুন।" দুর্গাগতিকে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। জনতা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল, পরে কমিতে আরম্ভ করিল। মিনিট দুই পরে দেখা গেল ফুটপাথটি সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে।

ভদ্রলোক দুর্গাগতির অফিসে order supplying'-এর কাজ করে, কাজেই দুর্গাগতির বিশেষ পরিচিত। কিছু দূরে আসিয়া সে দুর্গাগতিকে লইয়া উঠিয়া পড়িল এক চায়ের দোকানে এবং চপ, কাট্‌লেট্ ও চা'র অর্ডার দিয়া দুর্গাগতির পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "ব্যাপারটা কি বলুন তো।" সব শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "বয়স হলে কি হবে? আপনি আস্ত ছেলে মানুষ। কোল্‌কাতা সহর, বুঝলেন, দাদা—বহিরঙ্গ নিয়ে থাকতে হ'বে। দেখা হলে শুক্‌নো নমস্কার, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা, চোখ মুখের ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, দরকার মত মুখ

ভ্যাঙচানো, নাক সিটকানো, ভ্রু কোঁচকানো, এ সব মুখস্থ করে রাখতে হবে। অন্তরটাকে চাপা রেখে যে যা চায় তাকে তাই দিতে হবে। তবেই স্থান পাবেন ভদ্রলোকের পংক্তিতে। তা না হলে এই রকম ঝঞ্ঝাট। ভিখারীগুলোর কথা যদি বলেন,—ওগুলো প্রকৃতই হতভাগা। দুর্বলকে কেউ ভিক্ষা দেয়? কেন ভিক্ষা দিয়ে তাদের আলস্যের প্রশ্রয় দিতে যাবে? ভিক্ষার Art ভাল করে শিখুক, ভিক্ষা করেই বড় লোক হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে, আমরাই কি ভিখারীগুলোর চেয়ে বেশী ভাল আছি? এধারে মাথায় টেরি, হাতে ঘড়ি আর ছড়ি, মুখে সিগারেট, বাড়িতে খোঁজ নিন, অনেক ক্ষেত্রেই শূন্য চালের হাড়িতে ইঁদুর বেচারী পেটের জ্বালায় লুটোপুটি খাচ্ছে। অথচ বহিরঙ্গটি ঠিক আছে, ভদ্র হতে হলে এ চাই।"—"খান।" সে খাইতে আরম্ভ করিল; দুর্গাগতিও খাইতে লাগিল।—"আপনার চাকরীর ব্যাপারটা শুনেছি। কেরাণিকুলের মান রেখেছেন। লেগে পড়ুন একটা কিছুতে। চাকরি না করাই ভাল।" "তা জানি, কিন্তু করি কি? বড় কষ্টে পড়েছি।"—"ঐত আপনাদের দোষ। Ordinary labourer—সাধারণ শ্রমিক হয়ে থাকলেই অসীম দুর্গতি। অপরের labour exploit করতে হবে। তা না হলে, তুমি যে কেরাণি—তুমি সেই কেরাণি মাছিমারা।" শেষ লাইনটি বেশ সুর করিয়া বলিল। "করছেন কিছু?" "না। দেখছি অনাহারে—" "দূর। অনাহারে কি? খেতে হ'বে এবং পুরোদস্তুর খেতে হ'বে, রেশন-ওয়ালারা যাই বলুক না কেন। বিস্কুট-খেকো চা-পায়ী ধুম-উদ্গারী অপভ্রংশ মানুষের অবতার সেজে থাকলে রোজগার সত্ত্বেও পরিণতি অনাহার, কেন না পেটে সয় না। অনশনব্রতী মাষ্টারগুলোকে B.T. পাশ করতে হয়, জানেন? অনেককে আজকাল পাশ করতে হয় উল্টো B.T. অর্থাৎ T.B.। বুঝেছেন? কিছুই করছেন না এখন?" দুর্গাগতি মুখ আমতা আমতা করিয়া জানাইল, না।—"এটা বড় খারাপ। কিছু করতে হবে। নইলে ঘাম হয়ে যাবেন, demoralised হয়ে যাবেন।" দুর্গাগতি হাসিয়া উঠিল। "হাসছেন যে? আগে আহার বিহার সব ব্যাপারে কৃচ্ছ্রসাধন ছিল morality; এখন রীতিমত আহার বিহার করে fit থাকাটাই morality। রেশনে চাল আটা কমিয়ে ঠিক করেছে। শুচ্ছেক ভুঁষিমাল খেয়ে কি হবে? বেশী ক'রে দুধ খাও, ঘি খাও, মাছ খাও, মাংস খাও, দৈ, ছানা, রাবড়ি, সন্দেশ, চপ, কাটলেট,—বুঝেছেন?" দুর্গাগতি আবার হাসিয়া উঠিল। মনে মনে বলছেন, "পয়সা কৈ? না, পয়সা আছে। আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু পয়সা আছে। এক কাজ করুন। পারবেন? Black Marketing-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করুন, বেশ গরম গরম বক্তৃতা, আর ভিতরে কালবাজারের কারবার চালান। বেশ দু'পয়সা রোজগার হবে। পারবেন না? তবে, সাহেবের Club-এর চাপড়াশিকে ধরুন, চাকরি হয়ে যাবে। দুনিয়ার Knack চাই, বাবা, Knack চাই।" হঠাৎ হাতঘড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। দেরী হয়ে গেল। B. K. Paul-এর বাড়ি যেতে হবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া দাম চুকাইয়া দিয়া দুর্গাগতিকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সামনের বাস্ ষ্ট্যাণ্ডটায় একটা ভিখারী যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। বাস ছাড়িয়া দিল; একটি পয়সাও মিলিল না। লোকটি দাঁড়াইয়া গিয়া ভিখারীকে বলিল, "এই ব্যাটা, ভিক্ষে করতে জানিস্ না ত, ভিক্ষে করিস কেন? চুপ করে দাঁড়া এক কোণে।" তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া হাতঘড়ি ও চাদর দুর্গাগতিকে দিয়া বলিল, এগুলো রাখুন। পালাবেন না যেন। বাস এলে বাসে উঠে খুব সমবেদনা জানিয়ে আমাকে এই পয়সা চারটা দেবেন। বুঝেছেন? চারটে পয়সা পকেট হইতে বাহির করিয়া দুর্গাগতিকে দিল ও মাথার চুলগুলি এলোমেলো করিয়া চোখেমুখে দুর্ভাগ্যের ভঙ্গি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাস আসিলে দুর্গাগতি চাপিয়া পড়িল। দুয়ারে শোনা গেল, "বড় দুঃখে হাত পাততে বাধ্য হয়েছি দাদা। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব ছিল, আজ পথের ভিখারী।" বাসের ভিতর হইতে দুর্গাগতি বলিয়া উঠিল, "Partitionটা হয়ে কি সর্বনাশটাই হলো আমাদের।" সঙ্গে সঙ্গে অতি সদয়ভাবে ভিখারীর হাতে

চারিটি পয়সা দিল। ছোঁয়াচে লাগিয়া গেল। অনেকেই দু'পয়সা, এক পয়সা করিয়া দিল। বাস ছাড়িবার পূর্ব্বে কত নম্বরের বাস জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ভুল বাসে চাপিয়াছে এইরূপ ভঙ্গি দেখাইয়া দুর্গাগতি নামিয়া পড়িল। দেখা গেল, মোট ছ'আনা উঠিয়াছে। আবার ছ'আনা। লোকটি নিজের চার পয়সা লইয়া তিন আনা ভিখারিকে দিয়া বাকী দু'আনা দুর্গাগতিকে দিয়া হাতঘড়ি ও চাদর ফেরৎ লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় দুর্গাগতিকে বলিয়া গেল, "আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে। এই পয়সায় ট্রামে যাবেন,—ফার্ষ্ট ক্লাশে কিন্তু। বুঝেছেন? দরকার হলে দেখা করবেন। আমার বাসা জানেন ত?"

দুর্গাগতিও চলিল। পথে ফেরি-ওয়ালা হাঁকিতেছে, "হরেক রকম মাল, ছ' আনা।" ছ'আনাটা কানে যাওয়ায় আরও জোর করিয়া চলিতে লাগিল। স্যাণ্ডাল পায়ে, খদ্দর পরা, ছোট করিয়া চুল কাটা এক যুবক হাতে একটি বাক্স লইয়া পথ রুখিল। বাক্সটার উপরে একটা ফুটো, গায়ে একটা প্রকাণ্ড তালা লাগানো রহিয়াছে, লেখা আছে, "অনাথ আশ্রম। কিছু দিয়ে যান, দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য।" বাক্সটা তাহার সামনে দুই চার বার নাড়িল, শব্দ হইতে বুঝা গেল ভিতরে বেশ কিছু আছে। দুর্গাগতি একবার ভাবিল তাহাকে ব'লে, "ভায়া, বাক্সটা আমাকে দাওনা, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। না হয়, আধা-আধি বখরা।" কিন্তু কিছু না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। পাশে একটি ছেলে সুর করিয়া হাঁকিতেছে, "আর, সি, দাসের ঘুগনিদানা—কোথায় লাগে মিহিদানা। চার পয়সাদিয়ে কিনে খান না। পয়সা না থাকে ধার করুন না। আমি কিন্তু ধার দেবো না।" বলার ভঙ্গিটি প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। না কিনিলেও অনেকে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে। পয়সা না থাকে ধার করুন না। ধার দেবে কেন? অমনি মনে হইল, "দুনিয়ায় knack চাই, দাদা!" সামনে আসিয়া দাঁড়াইল একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, ছোট্ট মা যেমনটি হইতে হয় তেমনি। হাতে একটা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। বলিল, "পান নেবেন? নিন না!" দুর্গাগতি পাশ কাটাইয়া যাইতে গিয়াও পারিল না। "নিন না একটা পান?" এই কৌশলীর হাটে একি সরলতার আব্দার। একে এড়াইয়া যাওয়া যায়! দুটি পান লইল ও পকেটের সেই দু'আনা পয়সা তাহাকে দিয়া বলিল, "খুকী, তোর বাড়ি কোথায়?" "বাগবাজারে।" "সেখান থেকে এতদূরে এসেছিস?" বালিকা উত্তর না দিয়া ছুটিয়া আর একজনের কাছে গিয়া তেমনি ভাবে বলিল, "পান নেবেন? নিন না একটা?" লোকটি পান লইল। তাহার পয়সা লইয়াই আর একজনের কাছে ছুটিল। সেও পান লইল। এবারে একজনের কাছে যাইতেই সে দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল। "এখন থেকে বাপ মায়ে বেশ তোয়ের করছে ত!" বালিকা একটু মুসরিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া আর একজনের কাছে ছুটিল। দুর্গাগতির মনে হইল লোকটার গালে এক চড় বসাইয়া দেয়। কি বর্ব্বর ওটা! একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মেয়েটি ছুটিয়া এর কাছে, ওর কাছে, তার কাছে যাইতেছে; কেহ পান লইতেছে, কেহ লইতেছে না। তার উদ্যমের বিরাম নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তার তৎপরতা ও ক্ষিপ্রকারিতা তন্ময় হইয়া দেখিল; শেষে মনে মনে তাহাকে শুভ ইচ্ছা জানাইয়া চলিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া মনে হইল, ঐ বাচ্চা মেয়েটি একা বাড়ি যাইতে পারিবে? যদি কোন অসুবিধা হয়? সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। আবার ফিরিল। বালিকার পান বিক্রয় শেষ হইয়া গিয়াছে; সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে পাত্রটি হাতে লইয়া। দুর্গাগতি ভাবিয়া লইল, খুকী এবারে নিশ্চয় মুস্কিলে পড়িয়াছে বাড়ি যাইবার জন্য; যেমন করিয়াই হউক ওকে বাড়ি পঁহুছিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা নাই, অতদূর হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বেকুবের মত দাঁড়াইয়াই রহিল। এমন সময়ে সামনের গলি হইতে বাহির হইয়া একটি লোক খুকীর কাছে দাঁড়াইল; খুকী তাহার হাত ধরিয়া চলিল সেই গলি বাহিয়া। দুর্গাগতি দ্রুত কাছে আসিয়া সস্নেহে বলিল, "কিরে খুকী, বাড়ি চললি?" খুকী যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিল; তাহাকে কোনকালে দেখিয়াছে মনে হইল না। চোখের সামনে একটি ছোট

তারা আকাশের দিকে উঠিতেছিল, সেটি যেন নীচে পড়িতে আরম্ভ করিল। দুর্গাগতি গা ঝাড়া দিয়া সেই পাথর বাঁধা ফুটপাথ হইতে একটু উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিল। তারপর অতি সংযত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কল্যাণ হোক, মা, তোমার।"

খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে ক্ষুধা আরও বেশী পায়। মেসে ফিরিয়া দুর্গাগতি বাক্স হাঁতড়াইতেছে; —অনেক সময় ভুলক্রমে কিছু পড়িয়া থাকে। ছ'আনা পয়সা মিলিল, সেই ছয়। বিরক্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ এধারে ওধারে পায়চারি করিয়া যেখানে দুপুরে সিগারেট কিনিয়াছিল, সেই পানওয়ালার কাছে গিয়া বলিল, "দুটো খুচরো পয়সা দিতে পারো?" মেসের চেনা বাবু, পান-ওয়ালা নিঃসঙ্কোচে দিল। দাঁড়াইল গিয়া একটা ছাতুর দোকানের সামনে। ছাতু-ওয়ালা বেচারির খুব সর্দ্দি হইয়াছে; নাক ঝাড়িতেছে, পাশের একটা ময়লা ভাকড়ায় হাত মুছিয়া সেই হাতে খোদ্দের বিদায় করিতেছে না, Aristocracyই ভাল। একটা বড় খাবারের দোকানে উঠিয়া পড়িল ও গম্ভীর ভাবে চেয়ারে বসিয়া একটা দু'আনার রসগোল্লা আনিতে বলিল। হঠাৎ নজর পড়িল সামনের টেবিলে; দেখিল বসিয়া আছে সেই যুবক দুইটি যাহাদের উপদেশ দিতে গিয়া সে পড়িয়াছিল গোলমালে। তাহারাও আড় চোখে চাহিতেছে, এবং একটু অস্বস্তি যে বোধ না করিতেছে তা নয়। রসগোল্লা আসিয়াছে,—সেটা হাতে লইয়াছে, কিন্তু মুখে দিতে পারিতেছে না। শেষে জোর করিয়া টপ করিয়া সেটা মুখে ফেলিয়া দিয়া চক্ চক্ করিয়া খানিকটা জল খাইয়া পয়সাটা ওখানেই রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিয়া চলিল মেসের দিকে।…"একটু শুনবেন?" পিছন হইতে কে ডাকিতেছে। ফিরিয়া চাহিল দুর্গাগতি। খাবারের দোকানে যে যুবক দু'টি সামনের টেবিলে ছিল তাহাদের একজন ছুটিয়া আসিতেছে। "কি?" একটা কথা আছে। "বলো।" দুর্গাগতি দাঁড়াইল। "আমাকে মাপ করবেন। ঐ ছেলেটার পাল্লায় পড়ে সিগেরেটও কিনতে হয়েছে, শেষ সম্বল খরচ করে দোকানে খেতেও হয়েছে। কাল কি খাবো তার ঠিক নাই।" ছেলেটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।…এও সঙ্গ-দোষের দধীচি। কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুর্গাগতি বলিয়া উঠিল, "ঠিক আছে। চলো ঐ পার্কটায় গিয়ে একটু বসি।"

উভয়েই উভয়ের কথা বলিল। ছেলেটি বি. এ. পাশ করিয়া দুটি ছাত্র পড়াইত। তাদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; কাজেই সে এখন সম্পূর্ণ বেকার। একটা কোন চাকরির তার অত্যন্ত প্রয়োজন। কানা ও খোঁড়া এক সঙ্গে জুটিলে একটু বুদ্ধি খাটাইয়া পথ চলা অসম্ভব নয়; কিন্তু দুই কানা দুই খোঁড়া একসঙ্গে জুটিলে অবস্থা উপভোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। দুর্গাগতি ছেলেটির কথা শুনিয়া হাসে; ছেলেটিও দুর্গাগতির কথা শুনিয়া হাসে। দুই জুটিয়াছে বেশ। যেন এক তাড়া-খাওয়া হরিণ প্রাণের দায়ে বনের অপর প্রান্তে দৌড়িয়া গিয়া দেখে সামনে দুর্ভেদ্য বেড়া এবং তারই মত আর একটি হরিণ আগে হইতেই সেই বেড়া ডিঙ্গাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। "আচ্ছা, কাল কি হয় দেখা যাক। সকালে তুমি আমার মেসে এসো।" দুর্গাগতি আবার ছেলেটির পিঠ চাপড়াইয়া মেসের দিকে রওয়ানা হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখে যে লোকটি তাহাকে ভিড়ের মধ্যে উদ্ধার করিয়াছিল সে বসিয়া আছে। দুর্গাগতিকে দেখিয়াই আরম্ভ করিল, "বলেছি না, কাজ না থাকলে মানুষ খারাপ হয়ে যায়, demoralised হয়ে যায়। এত রাত্রি কোথায় ছিলেন? বড় সাহেবের চাপড়াসিকে ধরে আপনার কাজের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করে বড় সাহেবটা বেজায় মদ খেতে আরম্ভ করে-ছিল। আজ ঝগড়া মিটেছে,—বস্, সব ঠিক। গিয়ে বল্লাম "Sir, I have an appeal from Philip. The drunk to Philip, The sober. হাসতে হাসতে বল্লে, কি? আপনার কথা বললাম। বললে, "That's all right. বড় বাবুকে লিখে দিয়েছে কাল থেকে আপনাকে কাজে বাহাল করবার জন্য। এই নিন চিঠিটা। বলেছিলাম না, চাপড়াসিকে ধরুন। ওর কাছে আগে সব খোঁজ নিয়ে, তবে গিয়েছি। ঠিক সময় ঘা দিতে হয়, দাদা,—বুঝলে? যাই, আবার একটা মাষ্টার খুঁজতে হ'বে, বড় বাবুর ছেলের জন্য। Order supply ক'রে,-মাষ্টার supply ও করতে হ'বে।" চিঠিটা দুর্গাগতিকে দিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। দুর্গাগতি খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মাষ্টারিটা আমার এক ভাইকে দিতে হবে।" আপনার আবার ভাই আছে না কি?" "হাঁ, আছে,—বি. এ, পাশ।" "বেশ, কাল সকালেই আমার বাসায় যেন যায়। আপনি এই চিঠি নিয়ে কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন, বুঝলেন!" দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দুর্গাগতি উত্তর দিল, "হাঁ, গোলামি করতেই হবে। এই ত জীবন!"

নীলের গান ও পূর্ব্ববঙ্গ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

"বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম শির উত্তোলন করে।" —দীনেশচন্দ্র সেন

মহানগরীর আলোকরশ্মির গণ্ডি ছাড়িয়ে নদী, নালা, খাল, বিল, ঝোপে ঝাড়ে ঘেরা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগেও এখানকার পল্লীবাসীদের সহ তাদের 'পল্লীগত প্রাণ' এখনও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় নি। তাই তারা একখনও সারা বছর ধরে তাদের নিজেদের রচনা গান বাঁধে এবং সেগুলি গায় তাদের নিজেদেরই গড়া আসরের মাঝে। এ গানের রচয়িতা এবং শ্রোতা তারা নিজেরাই। তাই সমালোচনার অপেক্ষা না রেখেই তারা গায়।

এ অঞ্চলের চলিত গানগুলির ভিতর নীলের গানই বোধ হয় সবচাইতে জনপ্রিয়, কারণ এই সব গানের রচয়িতা নিরক্ষর জনসাধারণকে তাদের যে কোন উৎসবেই এই গানের দু'একটা গাহিতে দেখা যায়।

নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মহাদেবের বিবাহ উপলক্ষ্যেই হয় এই পূজো, এই পূজোকে উপলক্ষ করেই রচিত হয় নীলের গান। চলিত কথায় এই সব গানগুলিকে বলে 'অষ্টক' গান।

নীল পূজো হয় চৈত্রমাসের ২৯শে, এর দু'এক দিন কখনও বা দু এক সপ্তাহ আগেই নীলকে নামান হয়। এই নীল সরল এক খণ্ড বেল অথবা নীম কাঠের তৈরী বস্তু, এর অগ্রভাগ থাকে খুব সূচাল এবং মসৃণ, সব সময়ই চকচক করতে থাকে তেল ও সিন্দুর লেপার জন্য। নীলের বুকের উপর থাকে চক্র ও ত্রিশূল, সূচাল অগ্রভাগ বাদে এর বাকী অংশটা ঢাকা থাকে লাল শালুদিয়ে।

নীল বাড়ী বাড়ী ফেরে, শেষটায় কোন এক উন্মুক্ত প্রান্তরে হয় এর পূজো।

এই নীল ঘুরবার সময় এর সঙ্গে যারা থাকে তাদের বলে নীলসন্ন্যাসী এবং এদের অধিনায়ককে বলে বালা গানগুলি সাধারণতঃ ইনিই প্রথমটায় গান, পরে তার তান ধরে তার সহকর্মীরা, এরা সাধারণতঃ নিরক্ষর চাষাভুষা। সারা বছর এদের কাজ মাঠে। শুধু এই সময়টাই থাকে ওদের ছুটি, আর সেই সময়েই এরা করে বালা তৈরী। অদ্ভুত এদের স্মরণশক্তি, কি ভাবে যে এরা বছরের পর বছর ধরে স্মৃতির সাহায্যে শয়ে শয়ে গান ধরে রাখে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হতে হয়। এদের গানে কোন কোন সময় ছন্দদোষ এবং ব্যাকরণ অশুদ্ধিদোষ থাকলেও লক্ষ্য করবার বিষয় এদের রসজ্ঞান।

হর-গৌরীর গার্হস্থ্য জীবন নিয়েই এদের এই উপলক্ষে রচিত যাবতীয় গীতি ও গাঁথার সৃষ্টি। এদের গানের হর গৌরী এদের নিজেদের ঘরের উপবাসী। এরা এদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যেই ধরে রাখতে চায় কৈলাসের হর-গৌরীকে। তাই এদের শিবায়নে মেঠো সুরটাই প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া দরকার এই নীলের গানের কোন পালা গান নেই বা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে একই গান প্রচলিত নয়, তবু আমরা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় অষ্টক গানগুলি একত্রে জড় করে মিছিল করে দেখাবার চেষ্টা করব।

আমরা যদি একটা কাল্পনিক পালা ধরে নেই তা হলে এই ভাবে চলা যায়, যেমন শিব সতীহারা হয়ে একাকী দিন কাটাচ্ছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে সুরু করলেন শিবের ঘটকালী দক্ষরাজ-কন্যা গৌরীর সঙ্গে পরে বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন যাপন, পরিশেষে বিনানিমন্ত্রণে বাপের বাড়ী এসে পতিনিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ।

সাধারণতঃ নীলকে যে বাড়ীতেই বসান হক না কেন, সেই বাড়ীর কুললক্ষ্মীরা আগে থাকতেই বেশ পরিষ্কার যায়গায় ধোয়া পিঁড়ি পেতে রেখে দেয় নীলকে বসাবার জন্যে।

বালাও তখন সুরু করে তার গীতি, এর পরই বাজনা। কখনও বা ঢাকের বাজনার তালে তালেও চলে সন্ন্যেসীদের নাচ ও বালার মেঠো সুরের গান :

বিপত্নীক শিব

শিব হয়েছে গৌরী হারা, দক্ষযজ্ঞে গেছে মারা
শিব ঠেকেছে গৃহ শূন্যের দায়।
এ ভবে যার গৃহ শূন্য তারে কেবা করে মান্য
গৃহ শূন্য সন্ধ্যাকাল উদয় ॥
যার গুণবতী নারী মরে কেমনে সে ধৈর্য্য ধরে
মনের দুঃখে কাঁদিয়া বেড়ায়।
ভাবে এই ছিল আমার কপালে ঘুম আসে না সয়নকালে
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায় ॥
চুল আমার সব পেকেছে দন্তগুলি নড়ে গেছে
বুড়া বরে কেউ কি দিবে মেয়ে ॥
তখন নারদ বলে হলেম ঘটক
মামা তোমার বিয়ের কিসের আটক
কৌশলে করিয়ে দিব কাম।
মামা তোমারে সাজায়ে নিয়া দিনের মধ্যে দিব বিয়া
তবে নারদমুনি আমার নাম ॥

এই ত গেল বিপত্নীক শিবের ছবি। চলুন দেখে আসি দেবর্ষি নারদ কেমন মর্ত্ত্যের পেশাদার ঘটকদের মত ঘটকালী করতে চলেছেন :

ঘটকালী

শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
নারদ করে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শুন শিবের বিয়ের ইতিহাস ॥
দক্ষযজ্ঞে মৈল সতী কেঁদে আকুল পশুপতি
নয়ন জলে বক্ষ ভেসে যায়।
সতী জন্মিল পুনরায় গিরি রাজার কন্যা হয়
ধ্যান যোগে তাই নারদ জানিতে পায় ॥
দেবগণ সব সঙ্গে নিয়া করিতে বিয়ার সম্বন্ধ
নারদকে পাঠাল গিরিপুরে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র করিবারে লগ্নপত্র
মগ্ন হয়ে হরিগুণ সুরে ॥

বিয়ে যখন ঠিক তখন মহাদেবের বিয়ে করতে যাবার কথা, তাই শ্মশানবাসী মহেশ্বরকেও বরবেশে দেখা যা ছাঁদনাতলায় :

শিবের বিবাহ আসর ও তার বরযাত্রিগণ

ভোলা সিঙা ডম্বুর লয়ে হাতে ভূতগণ সঙ্গে তাতে
বিয়া করতে চলে হিমালয়।
গেল গিরী রাজার অন্তঃপুরে গিরী রাণী চক্ষে হেরে
কেন্দে রাণী ধূলাতে লোটায় ॥
রাণী কেন্দে বলে উচ্চৈঃস্বরে শুন রাজা কই তোমারে
কি কার্য্য করিলে নৃপবর।
চারি চক্ষের মাথা খাইয়া বুড়ার কাছে দেব বিয়া
এও কি আমার প্রাণে সহ্য হয় ॥

* * *

হর পার্ব্বতীর মিলন হল আনন্দে পুরী ভরিল
মহানন্দে শালাশালীগণ।
করে কত স্ত্রী-আচার পাশাখেলা দেশাচার
আগামী দিন হইবে বরণ ॥

যাক বিয়ে যখন নিতান্তই হবে তখন ত আর উপা নেই। কাজেই গিরিরাণীকেই সর্ব্বাগ্রে বরণ করতে এগি আসতে হয় :

বরণ

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিছে ঢোল ডগর কাঁ
সাঁনাই শঙ্খ বাজে শত শত।
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প বাজে যা
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত ॥
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সে
ঢাল তলোয়ার আগে উল্টা পাকে।
করে চলে তরোয়ালে কাটাকাটি কেহ কারে মারে লা
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥
লাগল কত বিয়ার গণ্ডগোল মহাযুদ্ধে মহাড়া
ঘটক দৌড়ায় ছিড়ে মশারী।
বসল সব শান্ত হয়ে বিয়ার লগ্ন যায় ব
ঐ যে বরণডালা নিয়ে যায় রাণী ॥

সাধারণতঃ এই কয়েকখানা গানের পরই এক বাড়ীর বৈঠক শেষ হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিয়ের চাইতে বাসী বিয়ের ঘটাই বেশী; কারণ এখানে কুশণ্ডিকা হয় বিয়ের পরদিন। কুশণ্ডিকা না হওয়া পর্য্যন্ত যেহেতু শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সেই হেতু পল্লী-কবিদেরও আবার বাসী বিয়ের কাহিনী শোনাতে হয়:

বাসী বিয়ের বরণ

শুন সবে মন দিয়ে হয়ে গেল শিবের বিয়ে
বাসী বিয়ের করল আয়োজন।
তখন ধেয়ে যায় মেনকারাণী এয়োগণ ডাকিয়া আনি
বলে কর গৌরীর বিবাহের বরণ॥
তখন আসিয়া সকল রমণী করে সবে উলুধ্বনি
রাজার জামাই বরবে মনের সুখে।
নিয়ে ধান্য দূর্ব্বা বরণ ডালা, পুরবাসী কুলবালা
দাঁড়াইল শিবের সম্মুখে॥
তখন দেখিয়া শিবের মূর্ত্তি হাস্য করে সব যুবতী
বসন দিয়া ঢাকল সবাই মুখ।
বলে এই না কী মেনকার জামাই
এমন জামাই আর দেখি নাই
তোরা দেখল দিদি···জামাইর···পাঁচখানা মুখ॥
জামাইর মাথায় দেখি শাপের হেড়ে
জামাই বুঝি হয় সাপুড়ে
সাপ খেলায়ে বেড়ায় দেশে দেশে।
পরা দেখি বাঘাম্বরী পেটে হইয়াছে আম উদরী
বুকটা ধরুকর্ করে হাঁপী কাসে॥
ঐ দেখ ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে জামাই বুঝি রাত্রেই মড়ে
এই ছিল কি গৌরীর কপালে।
গৌরী এমন সোনার মেয়ে বুড়ার কাছে দিল বিয়ে
(রাজা) সোনার পুতুল ফেলাইল জলে॥

শিবের বিয়ে মিটে গেল। কিন্তু শিব যে ইতিমধ্যে গঙ্গা নামে আর এক পত্নীকে তাঁ'র ঘরে স্থান দিয়েছেন সে খবর কি কেউ জানত?

সতীনে সতীনে বিবাদ মর্ত্ত্যলোকে হামেসাই দেখি। কিন্তু স্বর্গলোকেও যে দুর্গা তার সতীনের সঙ্গে বিবাদ করতে বসেছেন, তা কে জানে:

গঙ্গা-দুর্গার বিবাদ

শুন সবে মন দিয়ে এ ভবে যার দুই বিয়ে
তার শান্তি হয় না কোন দিন।
আছে শিবের ঘরে দুই রমণী গঙ্গা আর সেই কাত্যায়নী
তারা ঝগড়া করে রাত্রদিন॥
একদিন হরের অগ্রে বিদায় হয়ে
কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে নিয়ে
নায়রে চলিল ভগবতী।
তখন শিবের জটায় থেকে গঙ্গা বলিছে ডেকে
এ কি কর্ম্ম কর পশুপতি॥
পুরুষ শূন্য এক নারী কেমনে যায় বাপের বাড়ী
তুমি শঙ্কর যাও পিছে পিছে।
এ নব যৌবন কালে একা যাবে দূর দেশে
পথে কত ভাল মন্দ আছে॥
শুনিয়া গঙ্গার বাণী ক্রোধান্বিতা ত্রিনয়নী
রক্ত চক্ষে কহে জাহ্নবীরে।
তুইলো সতীন কইস না কথা যথা ইচ্ছা যাব তথা
তুই কেন তায় মরিস জলে পুড়ে॥

যাক এক জায়গায় বাস করতে হলে সতীনে সতীনে বিবাদ শেষটায় মহাদেবের সঙ্গে এরকম ত হয়েই থাকে। আবার এ সব মিটে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও সুরু হতে খুব বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু এই সময়ই ঘটল এক বিষম ব্যাপার। দুর্গার বাবা রাজা দক্ষ, মেয়ের বিয়ের পর থেকেই জামাইর উপর ভীষণ চটা, তাই তিনি ঠিক করলেন এক শিবহীন যজ্ঞ করবেন। তাই তার বিরাট যজ্ঞে একমাত্র শিব ব্যতীত অপর সকলকেই করলেন নিমন্ত্রণ। পার্ব্বতীও খবরটা শুনে বিনানিমন্ত্রণেই শিবের অমতে বাপের বাড়ী এসে হাজির হলেন। কিন্তু এখানে পতিনিন্দা শুনে একেবারে মূর্চ্ছিত, শেষটায় দেহই ত্যাগ করলেন। শিব এই খবর পেয়ে দক্ষের যজ্ঞ ত' নষ্ট করলই উপরন্তু দক্ষকেও শমণ ভবনে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিরস্ত হলো:

শিববাক্য লঙ্ঘন করিয়া সতীর পিত্রালয় গমন এবং দেহত্যাগ

একদিন দক্ষনৃপমণী শুন শুন নারদ মুনী
(আমি) করেছি এক যজ্ঞের আয়োজন।
তুমি যাও চলি সত্বরে শিবহীন যজ্ঞ করব বলে
ত্বরায় সব দেবেরে নিমন্ত্রণ॥

তখন শুনিয়া দক্ষের বাণী দ্রুত চলে নারদ মুনি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যায়।
ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করে উদয় হয় কৈলাসপুরে
যথায় আছেন মাতুল মহাশয়॥
শুন মামা পঞ্চানন দক্ষরাজার করণ কারণ
করেছে এক যজ্ঞের আয়োজন।
মামা যজ্ঞ হবে মহা যজ্ঞ একটি কাজ বড় অযোগ্য
(এই যে) মামা নিমন্ত্রণভিন্ন ত্রিলোচন॥
নারদ তথা হতে চলে ধেয়ে পার্ব্বতীর কাছে গিয়ে
বলে শুন অপূর্ব্ব ঘটন।
মামী তোমার পিতা রাজা দক্ষ করিতেছে শিবহীন যজ্ঞ
তোমাকে করেছে নিমন্ত্রণ॥
এ কথা শুনিয়া সতী মনে ভাবে ইতি-উতি
উপনীত যথা মৃত্যুঞ্জয়।
বলে, শুন প্রভু শ্মশানবাসী
আমার পিতার যজ্ঞ দেখে আসি
প্রভু অনুমতি করহ আমায়॥
তখন শুনিয়া সতীর বচন ধীরে ধীরে কয় ত্রিলোচন
বারণ করি যেও না ত্বরা।
ও গো তুমি বাপের বাড়ী গেলে কেমন করে শূণ্য ঘরে
(বল) কে বাটিবে আমার ভাঙ ধুতুরা॥
তখন শিবের বাক্য লঙ্ঘন করে চলে সতী দক্ষপুরে
উপনীত দক্ষের ভবন।
দেখে দক্ষ বলে ও-পাগলী কার কথায় তুই হেথায় এলি
তোরে কে গিয়ে করিল নিমন্ত্রণ॥
জামাই পাগলা ভোলা শ্মশানবাসী
গায় মাখিয়া ভস্মরাশি
ভূতের সঙ্গে নাচে নিরন্তর।
ওলো তুই নাচিলি ভূতের সঙ্গে কৈলাসপুরে পরম রঙ্গে
তাইতে এলি বুঝি না পেয়ে খবর॥
ইত্যাদি নিন্দাবাদ শুনে দক্ষ প্রমুখাৎ
সতী বলে শুন পাপিষ্ঠ রাজন্।
তুমি নিন্দা করলে যে মুখে পাঠার মুণ্ড হবে তাতে
এই ত আমি ত্যাজিছি জীবন॥
এদিকে নারদ মুনি চেয়ে দেখে দাক্ষায়নি
শিব নিন্দাতে ত্যাজিল অঙ্গ।
তখন সভা হতে শীঘ্র উঠি বাজাইয়ে ছুটি কাঠি
কৈলাসেতে যায় বাধাতে রঙ্গ॥
বলে, শুন মামা শূলপাণী তোমার নিন্দা শুনে শিবানী
দক্ষপুরে ত্যাজিল জীবন।
তখন শুনিয়া নারদের কথা রাগে শিবের কাঁপে মাথা
গেল পাগোলের প্রায় সে দক্ষ ভবন॥
তখন উদয় হল দক্ষপুরে দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করে
যুদ্ধে হল দক্ষরাজ নিধন।
হয়ে দক্ষরাণী উন্মাদিনী পদে পড়ে শূলপাণী
কেঁদে বলে প্রভু দাও পতির জীবন॥
তখন সতীর বাক্য রাখতে বজায় পাঠার মাথা
এনে ত্বরায়
শিব দান করিল দক্ষের জীবন।
দেবের নিন্দা চর্চ্চা করে যেই সমুচিৎ ফল পায় সেই
মোদের বাঞ্ছা যেন না হেরি বদন॥

সব শেষ। শিবের বিয়ে হতে সুরু হয়েছিল আমাদের পালা, সতীর দেহত্যাগে শেষ হল তা।

কিন্তু আমাদের নীলের বালাদের কাজ এখনও বাকি আছে। নীলকে আসনে বসিয়ে রেখে এরপর তাদের ধুপ পোড়াতে হয়।

এই ধুপ পোড়াবার সময় বালাকে তাদের সৃষ্ট দশ অবতারের রূপ বর্ণনা করে বলে দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে চলে ঢাকের বাজনা, কাঁসীর তাল, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—এই দশ অবতার শ্লোক বা স্তোত্র মহাকবি জয়দেব বা রামপ্রসাদ বিরচিত না হলেও এরা নিজেদের ভাষায় কি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছে শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের রূপ।

নীলের আরেক নাম পাট গোঁষাঞী। এই নীল বা পাট গোঁষাঞী সাধারণতঃ চৈত্র মাসেই দেখা দেন; তখন একে সাধারনতঃ নীলই বলে থাকে, কিন্তু এই জিনিষই যখন বৈশাখ মাসে নামান হয়, তখন এর নাম 'কাল-বৈশাখী'।

'কালবৈশাখী' আর 'নীল' প্রকৃত পক্ষে এক এবং অভিন্ন—যেমন দুর্গা এবং বাসন্তী। সময় ভেদে দেবতাদেরও নাম পাল্টায়। এর গানগুলি প্রায় নীলেরই অনুরূপ, তাই আর বৃথা সেগুলির উল্লেখ করব না।

এই ভাবে চলে বালাদের গান বৎসরের পর বৎসর ধরে। এ গান যেন পুরোন হয় না, তাই এইসব গানগুলিকে বলা চলে বারমেসে গীত।

পরিব্রাজক কাম'নীত

কার্ল গিয়েলারুফ অনুবাদ—শুদ্ধোধন সেন

কৃষ্ণ-কুঞ্জে

প্রথম সন্ধ্যার পর হ'তে সুবিধা পেলেই কৃষ্ণ কুঞ্জে উপস্থিত হতাম; উদ্দেশ্য ছিল প্রভুর ধর্মশিক্ষায় স্বয়ং তাঁর কাছে বা তাঁর কোন প্রধান শিষ্যের কাছে গভীরভাবে দীক্ষিত হব।

কোশাম্বি হ'তে আমার স্বামী অনুপস্থিত: সুতরাং অঙ্গুলিমালকে বাধা দেবার আর কেউ নাই। নাগরিকদের দিন দিন বেড়েই চলল। কিন্তু নূতন কোন আক্রমণের সংবাদ না আসায় অকল্পনীয় জনরব রটতে লাগল। একদিন জোর জনরব রটল অঙ্গুলিমাল কৃষ্ণ কুঞ্জ আক্রমণ করে সম্মিলিত নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাবে; শুধু তাই নয়, স্বয়ং বুদ্ধকেও সে নাকি বাদ দেবে না। জনরব আতঙ্কে পরিণত হ'ল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, কোশাম্বির তোরণ সন্নিকটে প্রভুর কোন ক্ষতি হ'লে, সকল দেবতা-ই কোশাম্বির ওপর ক্রুদ্ধ হবেন।

শেষ পর্য্যন্ত জনতাই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। প্রতিটী পথ দিয়ে দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে লাগল। প্রায় সমস্ত নগরবাসী প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে নৃপতি উদেনকে ভীতি প্রদর্শন ক'রে দাবী করতে লাগল এই দুর্বিপাক দূরীভূত করা হক—অঙ্গুলিমাল আর যেন কোন দুষ্কার্য্য করতে না পারে।

এই ঘটনার পর দিন শতগির নগরে ফিরে এল।

নিরাপদ গমন ও প্রত্যাগমনে আমার সৎপরামর্শের ফলেই সম্ভব হ'ল তেবে প্রত্যাবর্তন করেই সে প্রশংসায় আমায় বিব্রত করে তুললে। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী বজিরা পুত্রকোলে স্বামীকে স্বাগত জানাতে এল; "বশিষ্ঠীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ আছে" বলে সংক্ষেপে তাকে স্বামী বিদায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল প্রেম আলাপন। আমি বিব্রত বোধ করি; কিন্তু কূজন বেড়েই চলে। পথে নাকি সে আমার কত অভাব বোধ করেছিল; যাতায়াতের সমস্ত সময়টাই নাকি এই মিলনক্ষণটীর জন্ম অপেক্ষা করে ছিল।

তার চিন্তাধারা পরিবর্তিত করবার জন্ম নগরের গোলযোগের বিষয়টা উত্থাপন করতে যাব এমন সময় রাজার ব্যক্তিগত দূত এসে ঘোষণা করল—রাজার আদেশ শতগিরকে তখনই রাজদর্শন করতে হবে।

ঘণ্টা খানেক পরে সে ফিরে এল—একেবারে অন্ত মানুষ। মুখ বিবর্ণ, সন্ত্রস্ত। কোন প্রকারে টলতে টলতে আমার কক্ষে প্রবেশ ক'রে এলিয়ে পড়ল একটা নীচু আসনে। তারপর আরম্ভ হ'ল আত্মবিলাপ—রাজ্যের মধ্যে সেই সব চেয়ে অভাগা, কত বড় ছিল, কী ভীষণ পতন হ'ল, কিছুক্ষণ পরেই ভিখারী হ'য়ে যাবে, হয়তো কারা-দণ্ড বা নির্বাসন হবে, তার এই সকল দুর্ভাগ্যের কারণ আমার প্রতি তার অন্তহীন প্রেম, যে অতল প্রেমের প্রতিদানও নাকি আমি কোনদিন দেই নি। বহু অনুরোধের পর রাজপ্রাসাদের ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ হ'ল, মাঝে মাঝে চলল হতাশার ব্যাকুল আত্মবিলাপ, কপাল হ'তে বড় বড় বিন্দুতে ঘাম ঝরছে; বলবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

রাজার সম্মুখে সে উপস্থিত হ'লে তিনি তার প্রাপ্য সম্মান দেননি; এমন কি গ্রাম্য কলহের সমাধান-বৃত্তান্তও শোনেননি। প্রথমেই অঙ্গুলিমাল সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাধ্য হ'য়ে শতগির সব কথাই স্বীকার করেছে। আমি ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক জানি তা জানত না, আমার নিকটও এখন ঘটনাটা প্রকাশ করল। উপসংহার হ'ল, এ সবই হ'ল আমার প্রতি তার অগাধ প্রেমের জন্ম। তোমার আমার

প্রেমকে সে বর্ণনা করলে, যৌবনের তুচ্ছ একটা ভাবাবেগ ব'লে। সে প্রেমের নাকি কোন মূল্য নাই, এবং সে দিয়ে কারও কোন মঙ্গল হয় না।

রাজার কানে কথাটা উঠেছিল এই ভাবে—

অঙ্গুলিমালর নগরস্থিত দূতকে নগররক্ষীরা বন্দী করে। কঠোর নির্য্যাতনের ফলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, বনে বনে দুষ্কৃতকারী দস্যুটা অঙ্গুলিমাল ব্যতীত আর কেউ নয়; পূর্ব্ববারে সে ধরা পড়েছিল সত্য, কিন্তু নিহত হয় নি; মন্ত্রী এতদিন ধরে যা ঘোষণা করে আসছেন তারও মূলে সত্য নাই। বর্ত্তমানে অঙ্গুলিমাল কুক্কুটকুণ্ডও আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেছে।

অঙ্গুলিমালকে পলায়ন করতে দিয়ে এবং তারপর সমগ্র কোশাম্বি ও কোশাম্বির রাজাকে প্রতারণা করবার জন্য, শতগিরির প্রতি কোশাম্বির নৃপ-মহিমা চরমতম ক্রুদ্ধ; আত্মসমর্থনে শতগির কিছু কিছু কারণ প্রদর্শন করতে চেয়েছিল। রাজা কিন্তু তাকে একটী কথাও বলতে দেননি। বলে' দিয়েছেন, জনগণের প্রার্থনামত সে তিন দিনের মধ্যে অঙ্গুলিমালকে নির্বীর্য্য বা নিহত করতে না পারলে প্রচণ্ডতমরূপে রাজরোষ তার উপর পতিত হবে।

কোন প্রকারে কথাগুলো শেষ করে সেই আসনেই সে নিজেকে একেবারে এলিয়ে দিলে; তারপর মস্তিষ্ক-বিকৃতের মত কখনও চুল ছেঁড়ে, কখনও কাঁদে।

বললাম, "শান্ত হও। আমার কথামত কাজ কর, তা হ'লে তিন দিনে কেন আজকের দিনটী গত হবার পূর্ব্বেই তুমি রাজ-অনুগ্রহ ফিরে পাবে; শুধু ফিরে পাবে নয়, অধিকতর রাজ-অনুগ্রহ তুমি পাবে।"

শতগির উঠে বসল। তার চোখে তখন নিসর্গ-শোভাদর্শনকারীর মুগ্ধতা।

"কী তোমার পরামর্শ?"

"রাজার কাছে ফিরে যাও। অনুরোধে উপরোধে তাঁকে নগরতোরণের বাহিরে শিংশপা বনে যেতে সম্মত করাও। সেখানে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করছেন। তাঁকে দর্শন ক'রে তাঁর উপদেশ চাইতে বল রাজাকে। আর কিছু তোমার ভাবতে বা করতে হবে না, অবশিষ্ট যা হবার, আপনা হ'তেই হবে।"

শতগির বললে, "তুমি বুদ্ধিমতী নারী। শুনেছি এই বুদ্ধ নাকি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তোমার কল্পনামত সুফল তাঁর কাছে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না, তবু চেষ্টা করে দেখব।"

বললাম, "ফলাফলের জন্য আমার আত্মসম্মান পণ রইল।"

লাফিয়ে উঠে, আমার হাত দুটী ধ'রে শতগির উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলতে লাগল, "তোমায় আমার বিশ্বাস আছে, বশিষ্ঠা। তোমায় বিশ্বাস না করা কী সম্ভব? সেদিন যৌবনের অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, শত শত সুন্দরীর আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে একমাত্র তোমায় মনোনীত করেছিলাম, হয়তো অন্ধ সংস্কার বশেই কাজটা করেছিলাম; আজ বুঝছি ভুল আমি করি নি।"

তারপর আরম্ভ হ'ল অজস্র প্রতিবাদ; ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম; ভাবলাম সদুপদেশটা না দিলেই ভাল হ'ত। তখনই তার পরবর্ত্তী কথাটা শুনে স্বস্তি পেলাম। বললে আমার প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল, যে ভাবেই আমি পরীক্ষা করি সে তার কৃতজ্ঞতা হ'তে কখনও চ্যুত হবে না।

"আমার একটী প্রার্থনা আছে; সেটী পূর্ণ করলে বুঝব সত্যই তুমি কৃতজ্ঞ।"

বলে উঠল, "বল, এখনই বল। বজিরাকে যদি ছেলের সঙ্গে তার বাপের বাড়ী পাঠাতে বল, তাতেও সম্মত। এখনি পাঠিয়ে দেব।"

"আমার প্রার্থনা সঙ্গত, অসঙ্গত নয়, তবে এটা আমি জানাব, আমার পরামর্শ মত সুফল ফললে। এখন সত্বর রাজদর্শনে যাও, তাঁকে শিংশপা বনে যেতে সম্মত করাও গে।"

শীঘ্রই ফিরে এল। মুখমণ্ডল আনন্দ-উজ্জ্বল। বুঝলাম, বুদ্ধদর্শনে যেতে রাজা সম্মত হয়েছেন।

"উদেন কি সম্মত হয়! শেষে, তোমার নাম আর এর সার্থকতার জন্য তুমি তোমার আত্মসম্মান পণ রেখেছ শুনে তবে সম্মত হ'লেন। তোমার সম্বন্ধে তাঁরও ধারণা দেখলাম উচ্চ। ওঃ, এমন স্ত্রীর স্বামী ভেবে সত্যই আমার গর্ব্ব হয়।"

এই ধরণের কথার বন্যা বইতে লাগল। আপন চিন্তায় আপনি মগ্ন না থাকলে হয়তো অস্থির হয়ে উঠতাম।

দু'জনে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হ'লাম। যাত্রার আয়োজন সেখানে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছিল। রৌদ্রের তীব্রতা কিঞ্চিৎ হ্রাস হ'তেই, রাজা উদেন তাঁর বিখ্যাত রাজকীয় হস্তিনী ভদ্দবটিকায় আরোহণ করলেন। ভদ্দবটিকা এখন বৃদ্ধা, এজন্য বিশেষ মহিমাব্যঞ্জক কোন যাত্রার ব্যবস্থা না হ'লে তাকে ব্যবহার করা হত না। আমরা, প্রধান মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা রথারোহণে রাজার অনুসরণ করে চললাম। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুইশত অশ্বারোহী এবং পশ্চাতে সমসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা চলল।

বনের প্রবেশ-প্রান্তে ভদ্দবটিকা নতজানু হ'ল; রাজা অবতরণ করলেন। আমরাও সকলে রথ ত্যাগ করে রাজার পশ্চাতে কুঞ্জকুঞ্জ অভিমুখে চললাম। সেখানে বহু শিষ্যসমভিব্যাহারে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছিল।

রাজা প্রভুকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে এক পার্শে উপবেশন করলেন। আমরাও তাঁর অনুকরণ করলাম।

প্রভু বললেন—"হে মহামন রাজন, কোন কারণে আপনি বিপন্ন? বারানসী-অধিপতি অথবা প্রতিবেশী অন্য কোন নৃপতি আপনার স্বাধিকার আক্রমণে উদ্যত কি?"

"হে শ্রদ্ধেয়, বারাণসী অধিপতি, অথবা প্রতিবেশী কোন নৃপতি আমার রাজ্য আক্রমণে উদ্যত বা ইচ্ছুক নন। মহাভাগ, আমার রাজ্যমধ্যে অঙ্গুলিমাল নামে অতি দুর্দ্দান্ত এক দস্যু আছে—নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু, নরঘাতক, কোন জীবের প্রতি তার দয়ামায়া নাই। গ্রামগুলিকে সে বাসের অযোগ্য ক'রে তুলেছে, নগরগুলি হ'য়েছে ধূমাচ্ছন্ন ধ্বংসস্তূপ, কৃষিক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হ'য়েছে। নরহত্যা করে সে তাঁদের অঙ্গুষ্ঠগুলি মালার মত গেঁথে গলায় পরে। তার দুর্ব্বৃত্ততা এতদূর বেড়েছে যে, সে স্থির করেছে এই কুঞ্জ আক্রমণ ক'রে সশিষ্য আপনাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবে। প্রভু, এই মহা বিপদের আশঙ্কা ক'রে আমার প্রকৃতিপুঞ্জ আকুল হ'য়ে উঠেছে; আমার প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আজ তারা অঙ্গুলিমালর দমন প্রকাশ্যে দাবী ক'রেছে। এই কারণেই, প্রভু, আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।

"কিন্তু, মহামন রাজন, সেই অঙ্গুলিমালকে আপনি এখন মুণ্ডিতমস্তক, কাষায় পরিহিত, অহিংস, চৌর্য্যত্যাগী, একাহারী, সৎ, ধার্ম্মিক বা তার একটা মহীয়ান রূপে পেলে, তার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন?"

"হে শ্রদ্ধেয়, আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাব; তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকব; পাদ্যার্ঘ্য দেব। বস্ত্র, অন্ন, শয্যা এবং সম্ভাব্য অসুস্থতার জন্য ঔষধ গ্রহণ করতে অনুরোধ করব। উপযুক্ত রক্ষণ ব্যবস্থা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু, প্রভু, সেই দুর্দ্দান্ত, হিংস্র প্রকৃতির দস্যু এমন পরিবর্ত্তন কেমন ক'রে সম্ভব হবে?"

সেই সর্ব্ব ভীতিস্থল অঙ্গুলিমাল এই সময় গুরুদেবের দক্ষিণে উপবিষ্ট ছিল। তার দিকে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রভু ব'ললেন—

"মহামন রাজন, এই ব্যক্তিই সেই অঙ্গুলিমাল।"

শুনেই রাজার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

কিন্তু শতগির ভীত বিবর্ণ মুখের অবস্থা যা হ'ল, তার বর্ণনা হয় না। কোটর ছেড়ে যেন চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে, চুলগুলো খাড়া হ'য়ে উঠেছে, কপাল হ'তে স্বেদবিন্দু ঝরছে। ব'লে উঠল—

"গেছি! হ্যাঁ, ওই অঙ্গুলিমাল। আর হতভাগ্য আমি আমার রাজাকে তারই কবলে এনে ফেললাম!"

কিন্তু মহাশত্রুর কবলে নিজে প'ড়েছে ভেবে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। মনে মুখে এক হ'য়ে বলতে লাগল—

"ভয়ঙ্কর এই দস্যু সকলকে, এমন কি স্বয়ং প্রভুকেও, প্রতারিত ক'রেছে। সকল স্ত্রীলোকের মত আমার সরল বিশ্বাসী স্ত্রী-ও তার দীক্ষা গ্রহণের গল্পে বিশ্বাস ক'রেছেন। সকলে শোভাযাত্রা ক'রে এসে তার ফাঁদে পড়লাম!"

চতুর্দ্দিকে তার চোখ ঘুরতে লাগল—যেন প্রতিটী বৃক্ষের অন্তরালে পাঁচ-ছয়জন ক'রে দস্যু লুক্কায়িত আছে, এখনই মিলিত ভাবে সকলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে। কম্পিত করদ্বয় যুক্ত ক'রে শতগির কম্পিত কণ্ঠে রাজাকে সত্বর পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করবার জন্ত অনুরোধ করে।

অবস্থা দেখে আমি উঠে বললাম—"শান্ত হও, স্বামিন! তুমি বা আমাদের মহিমান্বিত রাজন যে বিপদ জালে পড়েননি, সে বিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার আছে।"

তারপর, সভাক্ষেত্রে আমি নিবেদন করলাম, অঙ্গুলি-মালর কথামত আমি কীভাবে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলাম এবং অঙ্গুলিমাল সেইদিনই দীক্ষিত হওয়ায় সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'য়েছে।

কত সামান্তের জন্ত প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, শুনতে শুনতে শতগিরির মাটিতে পড়ে যাবার মত অবস্থা হ'ল। প্রধান মন্ত্রীকে ধ'রে কোনরূপে দাঁড়িয়ে রইল।

সাষ্টাঙ্গে রাজ-সম্মুখে পতিত হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। বললাম, আমার প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্ত আমি তাকে ক্ষমা করেছি; কারণ কামনাবশে পাপ করলেও সে চালিত হ'য়েছিল অজ্ঞাতে দুর্জ্ঞের শক্তির নির্দেশ অনুসারে, তারই ফলে যে ভীষণ দস্যুর আজ প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, সে আজ সাধু।

রাজা শতগিরির প্রতি তাঁর পূর্ব্বের অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখতে স্বীকৃত হ'লেন। তখন শতগিরকে বললাম—"আমার কথা আমি রেখেছি। এখন তোমার কথা তুমি রক্ষা কর। আমার প্রার্থনা, বুদ্ধের পবিত্র সঙ্ঘে প্রবেশ করবার অনুমতি আমায় দাও।"

নির্ব্বাক ইঙ্গিতে শতগির সম্মতি দিলে; সম্মতি না দিয়ে অবশ্য তার উপায় ছিল না।

রাজা এখন বেশ আশ্বস্ত হ'য়েছিলেন। অঙ্গুলিমালের দিকে অগ্রসর হ'য়ে সসম্মানে তার সঙ্গে কথা কইলেন; রাজকীয় রক্ষণ ব্যবস্থারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর ভগবান বুদ্ধের অভিমুখে অগ্রসর হ'য়ে আভূমিনত নমস্কার জানালেন—

"হে শ্রদ্ধেয়, আপনার কার্য্য অতীব বিস্ময়কর। অতি অবাধ্যকে আপনি বাধ্য করেছেন। যে অঙ্গুলি-মালকে আমরা শাস্তি বা অসি দিয়ে বশীভূত করতে পারিনি, তাঁকেই আপনি শান্তি বা অসি ব্যতিরেকেই বশীভূত করেছেন। এই মহাবিস্ময়কর ঘটনার সম্বর্টনা-স্থল এই পবিত্র কুঞ্জ কল্লান্তকাল সঙ্ঘের অধিকারে থাকবে। আমি আরও আশাকরি করুণাময় প্রভু, এখানে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আশ্রয়ের জন্ত আমায় দু'টী বিহার নির্ম্মাণ করবার অনুমতি দেবেন।"

মহিমাব্যঞ্জক একটা ভঙ্গীতে প্রভু ধন্তবাদ জানিয়ে রাজ-উপহার স্বীকার করলেন। তখন বিদায় গ্রহণ ক'রে রাজা ও তাঁর অনুচরবৃন্দ বন ত্যাগ করলেন। আমি অবশ্য উপস্থিত ভগিনিগণের রক্ষণে সেখানেই থেকে গেলাম; পরদিন দীক্ষা গ্রহণ করলাম।

বেলাভূমি

আবদুর রশীদ খাঁন

জীবনের বেলাভূমি 'পরে দাঁড়াইয়া দেখি আমি:
কালো এক যবনিকা ধীরে ধীরে আসিতেছে নামি,
প্রকটিত দেখি তাতে ওপারের ভয়ার্ত্ত সংকেত
কংকালের অট্টহাসি হেসে নাচে বিভীষিকা প্রেত।
অনিশ্চিত সংশয় জাগে মোর সংকুচিত মনে;
অজানা আতংকে আজ কাঁপে হিয়া এই সন্ধিক্ষণে।
সম্মুখেতে দেখি চেয়ে মৃত্যুহীন দুর্লঙ্ঘ্য সাগর—
ঢেউ তার আছাড়িয়া পড়িতেছে বেলাভূমি 'পর
মনে হয় পদতলে ভূমি যেন ফাঁক হয়ে যায়
পাতালের গর্ভে আমি সংজ্ঞাহীন পড়ে আছি হায়,
পৃথিবীর মায়া মোরে যেন পিছে টানি বার বার
হাতছানি দিয়া বলে: ওরে তুই যাস্‌নে ওপার।
তবু জানি যেতে হবে সকলের টুটিয়া বাঁধন
মরণের কাছে সব আকুতি মিনতি অকারণ।

পুস্তক ও আলোচনা

পাঞ্চালী ঃ কাব্যগ্রন্থ। সুশীল রায়। এম্, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

আজকাল সাধারণতঃ যিনি গল্প লেখেন, তিনি শুধু গল্পই লেখেন, যিনি কবিতা লেখেন—তিনি কবিতার মধ্যেই জীবনধর্ম্মকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী; সাহিত্যের সামগ্রীকতা বহু সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই অভাব। সুশীল বাবুর সাহিত্যিক জীবনে আমরা সেই সামগ্রীকতা বহুলাংশে লক্ষ্য করিয়াছি। নাটক এবং তত্ত্ববহুল প্রবন্ধের অভাব ঘটিলেও ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁহার সমান দখল রহিয়াছে। ভাবের রাজ্যে তিনি প্রথম জাতের সাঁতারু, এক নদীর তীর ছাড়িয়া ভিন্ন নদীগর্ভে পাড়ি জমাইতে তিনি জানেন।

'পাঞ্চালী' সুশীল বাবুর কবি-জীবনের প্রথম এবং সার্থক কাব্যগ্রন্থ। পঞ্চম রাত্রে পাঞ্চালীর কক্ষদ্বারে তৃতীয় পাণ্ডব উপস্থিত। এতদিন তাহাকে লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে আশা, যে কামনা, যে ঐশ্বর্য্যময়তা সমস্ত চেতনায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ পঞ্চম রাত্রে তৃতীয় পাণ্ডব তাহারই সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে উৎসুক পাঞ্চালীর সান্নিধ্যে।

আজিকে আমার নিশা,
তাই তব দ্বারে আসি' হানি করাঘাত—
খোলো দ্বার হে সতী পাঞ্চালি।

… … …

স্তিমিত প্রদীপখানি কেঁপে কেঁপে যাকনা মরিয়া
এ ঘর উজ্জ্বল হবে দু'জনার নয়ন-বিভায়।
পাণ্ডব এসেছে দ্বারে, খোলো দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি
দুয়ারে অতিথি তব তৃতীয় পাণ্ডব।

মহাভারতী-কথাকে কবি এখানে লোকধর্ম্মের চিরন্তনতার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন। দেহ দেহাতীত-রূপে সুষমাময় হইয়া উঠিয়াছে; আঙ্গীক, ছন্দ এবং ভাষার নূতনত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধরাবাধা নিয়মের ছকে কবি নিজেকে ধরা দেন নাই, বরং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কবির আত্মস্বকীয়তাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম কবিতার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে। 'পাঞ্চালী'তে যে সুরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, পরবর্ত্তী কবিতাগুলিতে সেই সুরের সূক্ষ্ম যোগ থাকিলেও পূর্ণ সঙ্গতি লাভ করে নাই। বরং বলিতে হয়, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কবিতাই উজ্জ্বল। প্রচ্ছদপটে শিল্পী ইন্দ্র দুগারের চিত্রনে সুরুচির পরিচয় সুস্পষ্ট।

আজিও যায় তারা ঃ উপন্যাস। শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সারস্বত মন্দির: ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রচলিত কথাসাহিত্যের ধারায় না চলিয়া লেখক তাঁহার আলোচ্য উপন্যাসে নতুন ছন্দে কথা গাঁথিয়াছেন। কাহিনী, সংলাপ, আঙ্গীক ও পটভূমি সব কিছু মিলাইয়া নতুন একটি প্রগতিবাদের সুর অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে 'আজিও যায় তারা'য়। লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত হইলেও তাঁহার আবির্ভাব প্রতিভাদীপ্ত শক্তিমান আবির্ভাব। গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া মানবের একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে লইয়া ইহার আঙ্গীক রচিত হইয়াছে—যে গোষ্ঠী সভ্য মানবের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া সীমান্ত জীবনে দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। সিংভূম, ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, পূজা পার্ব্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান, সমাজ, সংস্কার ও ধর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য সমাজের জীবনযাত্রার সমস্যা এবং দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন-সমূহ পাশাপাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিবেন্দ্রবাবুর লেখনী বহুপ্রসবিনী হইলে বাংলা সাহিত্যে একদিন তিনি স্থায়ী আসনের অধিকারী হইবেন, নিঃসন্দেহ।

সম্পাদকীয়

শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির উদ্বোধন

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর আবির্ভাব স্থান হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় তদীয় স্মৃতি রক্ষার্থ যে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেশবরেণ্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় গত ৬ই ফাল্গুন রবিবার তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিতমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীবিজয় বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য, মেজর পি, বর্দ্ধন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ডাক্তার ইন্দুভূষণ রায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই যাত্রী ছিলেন। কয়েকজন মহিলাও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়ায় পৌছিলে "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" স্বেচ্ছাসেবকগণ সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন জানান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। গুপ্তিপাড়ায় ৺শ্যাম সেনের প্রাসাদ-তুল্য ভবনে অতিথিবর্গের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথায় পৌছিবার অল্পক্ষণ পরেই সকলে ভারতীয় শিল্প-কলার অপূর্ব্ব নিদর্শন সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির দর্শন করিতে যান। দুঃখের বিষয়, প্রাঙ্গণে 'সংরক্ষিত মন্দির' বলিয়া সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞাপন সংযুক্ত থাকিলেও, বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য মন্দির এবং সুবৃহৎ রথখানি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মন্দিরের বৃদ্ধ মোহন্ত সজল নেত্রে

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ o শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ o ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সকল দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত এবং এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বেলা দুই ঘটিকার সময় উদ্বোধন সভার কার্য্যারম্ভ হয়। নবনির্ম্মিত হরিমন্দিরের সম্মুখে সভা মণ্ডপে বহু নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনকে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইতেছে

হইতে আগত এবং গুপ্তিপাড়া এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলস্থিত বহু উদ্বাস্তু পরিবারও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পর ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় স্বামীজী রচিত বিখ্যাত "দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর" সঙ্গীত গান করেন। স্মৃতি-রক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া সংক্ষেপে স্বামীজীর প্রতিভা-দীপ্ত জীবন-কথার আলোচনা করেন। তিনি বলেন,—এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ১১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং মন্দির সংশ্লিষ্ট সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরও ৫৷৬ হাজার টাকা আবশ্যক। এ যাবৎ দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, বাকী অর্থের জন্য তিনি ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। তৎপরে তিনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, সুপণ্ডিত শ্রীনলিনীমোহন লাহিড়ী, ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র প্রভৃতি যে বাণী পাঠাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি সাংবাদিকপ্রবর শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নানাদিক দিয়া স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের জীবনী আলোচনা করিয়া, তাঁহার মহান্ জীবনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীসুমতি দাস সময়োপযোগী বক্তৃতায়, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষাকল্পে স্বামীজীর আপ্রাণ চেষ্টা, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অতুলনীয় বাগ্মীতা শক্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যথারীতি মন্দিরের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহার ভাষণে বলেন—"হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সাম্যবাদ আছে। হিন্দুধর্ম্মই হইতেছে সাম্যবাদীর ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য চণ্ডালকেও কোল দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী কৃষ্ণানন্দের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও অনেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও অগৌরব বোধ করেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কিছুই নাই।"

"নানা সমস্যায় ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত। অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা সমস্যা রহিয়াছে; অর্থনৈতিক চাপে দেশবাসী ভারাক্রান্ত। এই সময়ে তাহাকে পথের সন্ধান করিয়া ভারতের মূলনীতি স্থির করিতে হইবে। এক সময় ভারতবর্ষ অনুকরণের নেশাতে ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই সময় স্বামী কৃষ্ণানন্দ ভারতবর্ষকে অন্তর্মুখী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং ভারতের নীতি কি হইবে

তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বলিয়াই দেশবাসীর দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ উপযুক্ত আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া দেশকে পরিচালিত করার সময় আসিয়াছে।"

ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় মন্দিরগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া তিনি উহার দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে যেন আর প্রাণ নাই। তিনি বলেন যে, ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের প্রতীক স্বরূপ এইসব মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় স্বামীজী রচিত "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী!" এবং অন্য কয়েকটী সঙ্গীত দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয় এবং কলিকাতা-গামী নিমন্ত্রিতেরা সকলে ষ্টেশনে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট রিজার্ভ গাড়ীতে আসন গ্রহণ করেন।

গুপ্তিপাড়ার নবনির্ম্মিত হরিমন্দির

মুক্তিলাভ

উনোর কূটনৈতিক পাকচক্রে পুরা তিনটি বছর পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার পর, কাশ্মীরের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যের বুঝি এতদিনে মুক্তিলাভ ঘটিল।

সম্প্রতি স্বস্তি-পরিষদে ইঙ্গমার্কিন প্রস্তাবটি ভারত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতহওয়ার পর হইতেই বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া যাইতেছে যে, ভারত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আর লোক হাসাইতে রাজী নয়; সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, স্বস্তিপরিষদে মামলা চালাইতে থাকিলে আর যাই-হোক্, সোয়াস্তি মিলে না। সুতরাং সোয়াস্তিকামী ভারত সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কাশ্মীরের মামলা সে উনোর আদালত হইতে উঠাইয়া নিবে। কাশ্মীরের খোদ তরফ হইতে শেখ আবদুল্লাও সেই একই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যাশনাল কনফারেন্স ঠিক করিয়াছেন যে, একটি নিখিল-কাশ্মীর গণপরিষদ গঠন করিয়া নিজেদের সকল মামলার মীমাংসা তাঁহারা নিজেরাই করিয়া নিবেন। ইঙ্গ-আমেরিকা যদি তাহাতে আঁৎকাইয়া ওঠে তো উঠুক। কাশ্মীর তাহাতে নাচার।

উনোর খপ্পরে পড়িলে যে কাশ্মীর সমস্যার এই গতিই হইবে, এ কথাটা মামলা রুজু হইবার উপক্রমেতেই এদেশের অনেক লোক বলিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গশ্রীও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পুরাতন কথার পুনরুত্থাপনে লাভ কম। সেইজন্য সে সব কথা আর আমরা তুলিলাম না। বরাতে যাহা আছে, তাহাকে খণ্ডাইবে কার সাধ্য। তবে ব্যর্থতাটা বুঝি সব সময়ই একা-একা আসে না। সময়-সময় ব্যর্থতার মধ্যেও আশীর্ব্বাদের আলোক-বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও আমাদের মনে হয়, ভারতের ভাগ্যে সেই বিরল বস্তুটি জুটিয়াছে। ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত শাসন পাইবার পর হইতেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাষ্ট্রচালকদের মুখে একটি কথা ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে আমাদের এদেশেও একটি খুব বড় জনমত প্রায় দৈববাক্যের মতই বিশ্বাস করিতেন যে, আন্তর্জ্জাতিক-রাজনীতিক, ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বক্ষেত্রেই ঐ বণিক রাষ্ট্র দুটির মতন অকৃত্রিম সুহৃদ বুঝি ভারতের এই দুনিয়ায় আর কেহ

নাই। কাশ্মীর সমস্যার শেষ পরিণতিটার পর সেই বিশ্বাসে চির ধরিয়া গিয়াছে।

এতদিনে যেন চোখ খুলিয়া গিয়াছে মার্কিন ও বৃটিশ-বন্ধুত্বে বিশ্বাসী এই জনমতটার। বিলম্ব হইলেও হাড়ে হাড়ে এই জনমতটি বুঝিতে পারিতেছে যে, কাশ্মীর সমস্যাকে এতদিন ধরিয়া স্বস্তি পরিষদে আটক করিয়া রখিবার মূলে ছিল এই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিচক্রেরই সামরিক স্বার্থ। শুধু তাই নয়, মুখে হাজারো আদর্শের দোহাই পাড়িলেও স্বার্থের বেলায় যে ইঙ্গ-মার্কিন তথাগতরা সকল আদর্শকেই অকাতরে জবাই করিয়া দিতে পারে, তারও জলজ্যান্ত প্রমাণ লাভ করিয়াছে। কারণ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া ইঙ্গমার্কিন সুবিচারকেরা যে কেবল ভারত ও কাশ্মীরের সব কটি দাবী উপেক্ষা করিয়াছে তা নয়। ইতিপূর্ব্বে স্বস্তি-পরিষদের নির্ব্বাচিত কাশ্মীর কমিশন গত প্রায় তিন বছরের টালবাহনার মধ্যে যে কটি সর্ব্বপক্ষসমর্থিত উপায়ের সালিশ করিয়া ছিলেন, সেগুলিকে পর্য্যন্ত আগাগোড়া নাকচ করিয়া দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার জন্ত সেখানে এক গণভোটের অনুষ্ঠান হইবে। গণভোটের তদারকি করিবেন এক আন্তর্জ্জাতিক সংসদ। কিন্তু নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে নির্ব্বাচনের উপযুক্ত পরিস্থিতি বহাল করার জন্ত কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকা হইতে সমগ্র বহিরাগত সৈন্তবাহিনী সরাইয়া নিতে হইবে এবং চলতি শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে। সর্ব্বোপরি পাকিস্থানকে ঘোষণা করিতে হইবে আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া। কিন্তু ইঙ্গমার্কিন সুবিচারকেরা এই সমস্ত পূর্ব্বগৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকেই বর্ণে বর্ণে নামঞ্জুর করিয়াছেন। বিশ্বশান্তিকে নিরাপদ রাখার জন্ত তাহাদের প্রয়োজন, সব সময় সোভিয়েট রাশিয়ার নাকের ডগায় একটি সশস্ত্র ঘাঁটি খাড়া করিয়া রাখা এবং সেই প্রয়োজনে কাশ্মীরকে ভাগ করিয়া তার একটি অংশ বশম্বদ পাকিস্থানের নিকট হইতে উপহাররূপে চাহিয়া নেওয়া। অতএব কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে তাহারা এই আয়োজন-প্রয়োজনের মুখ চাহিয়াই সবকিছুর সুরাহা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

স্বর্গত মার্ক টোয়েন সাহেব একদা বলিয়াছিলেন যে, মানুষের জীবনে অতি বিলম্ব বলিয়া কোনো কথা নাই। মার্ক টোয়েন আমেরিকারই লোক। সুতরাং আমেরিকার কাছ হইতেই আমেরিকাকে চিনিবার মতো শিক্ষা লাভ করিতে আমাদের কিছু বিলম্ব ঘটিলেও সেটাও সম্ভবত অতি বিলম্বের ব্যাপার হইবে না।

কেন্দ্রীয় বাজেট

বৃটীশ আমলের একটি বাজেট সেসনের কথা মনে পড়িতেছে।

তখন ভারতের ফিনান্স মেম্বার স্যার জেরেমি রাইসম্যান। বৃটীশ স্বার্থে সৃষ্ট ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ডতাকে অংশতঃ লাঘব করার জন্ত স্যার জেরেমি ভারতীয় জনগণের স্কন্ধে 'ট্যাক্স' নামধারী গুটিকয় 'কাঁটাল' ভাঙার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সমস্ত পরিষদগৃহ সেদিন প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের লীগের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্তবৃন্দই স্যার জেরিমির সেই বাজেটকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাজেট নয় এটা। এটা হইল শোষণের হিসাব। দরিদ্র জনগণের রক্তের বিনিময়ে বিদেশী পুঁজি-স্বার্থকে নিরাপদ রক্ষার দানবীয় পরিকল্পনা।

এক্ষণে এই চার-পাঁচ বছর অতিবাহিত হইবার পর, সেই রাবণও নাই, সেই লঙ্কাও নাই। এখন দেশে চলিয়াছে রামধুন-নিনাদিত রামরাজ্যের স্রোত। পূর্ব্বে সবখানি ভারত সাম্রাজ্য চালাইতে যত চেড়ীবৃন্দের প্রয়োজন হইত, এখন আধখানা রামরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দরকার হয় তিনগুণ হইতে চারগুণ রামসেবকের। খরচ লাগে রাবণ রাজ্যের চেয়ে দশগুণ। কিন্তু এত যে খরচ তা আসে কোথা হইতে? তবে কি ফাট্‌কা বাজারে স্পেকুলেশন করিয়া বেশ কিছু দাঁও মারিয়া বসিয়াছে রামরাজ্য? বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। দামোদর পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া সেইদিনকার সেই প্রিফ্যাব্রিকেটেড (Prefabricated)

গৃহ-পরিকল্পনা ও কুবিসার ক্রয়ের ব্যাপার পর্য্যন্ত রামরাজ্য শুধু দুই হাত দরাজ করিয়া গচ্চা দিয়া গিয়াছে! তবে কি প্রজাবৃন্দের অর্থসামর্থ্য কিছু বাড়িয়াছে? রামরাজ্যের এই বিরাট জঠরের ক্রমবর্দ্ধমান বুভুক্ষাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহারই খয়রাতি করিয়া পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে? তাও নয়। উল্টা ব্যাপার এদিক হইতেও। রামরাজ্যের চিত্রগুপ্তদেরই হিসাব যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারতবাসীর জীবনধারণের মূল্য বৃটিশ আমল হইতে বাড়িয়াছে শতকরা চারিশত ভাগ হইতে ছয়শত ভাগ। তাহা হইলে রামরাজ্যের এই ত্রিগুণ সেবকবাহিনী কিসের জন্য? কাহাদের স্বার্থকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে? আর এই ত্রিগুণ বাহিনীর দশগুণ রাজকীয় ভরণ-পোষণের জন্য যে খরচপাতি, তারই বা জোগান দিতেছে কাহাদের পকেট?

পাবলিক ফাইনান্সের আঙ্কিক মারপ্যাচের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করার মতো বায়বীয় বুদ্ধি আমাদের নাই। আমরা জনসাধারণের অঙ্গীভূত, তাদেরই মতো করিয়া কথাবার্তা কই। কাজেকাজেই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও জনসাধারণের মতো মোটাসোটা। শ্রীযুক্ত দেশমুখ সম্প্রতি পার্লামেন্টে যে বাজেট-প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, সেই বাজেটের মর্ম্মোদ্ধার ইহার চেয়ে গভীরতর ভাবে করা আমাদের সাধ্য নয়। প্রস্তাবে প্রকাশ,—রামরাজ্যের আদর্শ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবারকার হিসাবে নাকি মূলতঃ ৫ কোটির মতো টাকার টান পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেশমুখ সেই ঘাটতির পূরণ মানসে, জনসাধারণের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে ত্রিশকোটি টাকা আদায়ের হিসাব দিয়াছেন। পাঁচকোটি টাকার হিসাব মিলাইতে কেন ত্রিশকোটি টাকার দরকার হয়, আর কেনই বা সেই টাকাটা দোহন করিতে হয় নীরক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাকেই নিঙড়াইয়া-নিঙড়াইয়া—অর্থনীতির সেই ঐন্দ্রজালিক রহস্য আমাদের জ্ঞানগম্যির অতীত পদার্থ। অথচ লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই যে, রামরাজ্যের বড় বড় মোহান্ত যাহারা, তাহারা আয়করের খাতে এপর্য্যন্ত সরকারকে ফাঁকি দিয়া রাখিয়াছেন প্রায় ১৫০ কোটির মত টাকা। অর্থাৎ পুকুরকে পুকুর সুদ্ধ তাহারা গায়েব করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সরকার সেই টাকা তাদের পকেট হইতে আজও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বোধহয় পারিবেনও না কোনদিন। তাঁহাদের সূত্রযজ্ঞ করা পবিত্র হাত দিয়া এই পাপের টাকা তাঁহারা কেমন করিয়া ছুঁইবেন। জাতমারা যাইবে না?

বাণিজ্যচুক্তি ও পাকীস্থানী মুদ্রামূল্য স্বীকৃতি

গত মাসের কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারত ও পাকীস্থানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির মিলনসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট পাকীস্থানী মুদ্রামূল্য স্বীকার করিয়াছে। ইহার অর্থ সেখানকার একশত টাকার জিনিষের জন্য আমাদের লাগিবে ১৪৪৲ টাকা। আর এখান হইতে পাকিস্থানে একশত টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৭০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। পাকীস্থানের সঙ্গেই ভারতের পাট, কয়লা, তুলা, লোহ, মৎস্য, মুরগী প্রভৃতির কারবার করিতে হয়। কিন্তু ভারত সরকার ১৭ মাস পূর্ব্বে যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করে, তখন পাকীস্থান, সিংহল প্রভৃতি স্থানের সহিত পরামর্শ করে নাই। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী এট্‌লির চিঠির উপরেই করিয়াছিল। ফলে এক কথায় এক মুহূর্ত্তে ভারতের পাওনা টাকা হইতে ৩৭০ কোটি টাকা কমিয়া যায়। এই ক্ষতি ভারতকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এই সতের মাস ভারত পাকীস্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আসিয়াছিল এবং যে সমস্ত জিনিষের জন্য পাকিস্থানের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত—যেমন পাট, তুলা ধান ইত্যাদি তাহা ভারতেই উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছিল। আমরা কেবলই শুনিতেছিলাম এই কয়টি বিষয়ে ভারত অচিরেই স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। কিন্তু এখন শুনিতেছি এই সব দ্রব্যের সুবিধার জন্যই পাকিস্থানী মুদ্রামূল্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে কেন পূর্ব্বে মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইয়াছিল, কেন পূর্ব্বে পাকিস্থানের মূল্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই, এবং আজই বা হঠাৎ কেন স্বীকার করা হইল—ভারত সরকারের নিকট নিশ্চয়ই

কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। কোন ফল হইবে না বলিয়া আমরা অদৃষ্টের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছি। এ সম্বন্ধে বহু দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, যে-নীতিতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে, সেই নীতিতেই দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সেই নীতিতেই পাকিস্থানী মুদ্রা স্বীকৃত হইল এবং আবার আমরা বোধ হয় শীঘ্রই দেখিব কাশ্মীরও ভারতের প্রায় হাতছাড়া হইবেই। এই সম্বন্ধে আমরা বহুবার সমালোচনা করিয়াছি এবং আজও এক কথাই বলিতে হইবে বলিয়া নির্ব্বাক থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।

বাকমুখর পাকীস্থান কাশ্মীর সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় মত শেষ পর্য্যন্ত যে কার্য্যে পরিণত করিয়া নিবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং অতঃপরে ভারতের আরও অনেক স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হয় কিনা এবং তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে কি না, তাহাই দেখিব বলিয়া আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করিতেছি। আর কেবল ৩৩০ কোটি টাকার কথা উল্লেখেও ফল নাই। কত হাজার হাজার কোটি টাকা যাইবে তাহাও দেখিবার জিনিষ। এবং সে টাকা যাইবে ভারতের গৌরীসেন অধিবাসীদের পকেট হইতেই। পাকিস্থান হইতে কাঁচা পণ্য আমদানি করিতে ভারতীয় বণিকগোষ্ঠী মুনাফার যে ব্যবধানটি লোকসান করিবেন, সেটি যে তাঁহারা নিজেদের বঞ্চিত করিয়াই করিবেন, এমন বেল্লিক তাহাদের কেহ বলিতে পারিবে না।

অবশ্য সামগ্রিক অর্থকরী ক্ষেত্রের দিক হইতে এই চুক্তির ফলে ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ যে কিছু পরিমাণে লাভবান হইল, সেকথা অস্বীকার করিব না। করিবার উপায়ও নাই। কেননা উভয় রাষ্ট্রের বণিকগোষ্টির ঠাণ্ডি লড়াইয়ের ফলে এই দুই বছরে উভয় রাষ্ট্রেরই আর্থিক কাঠামো-দুইটা পঙ্গু হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। কাঁচাপাটের অভাবে প্রায় তালাচাবি পড়িয়া গিয়াছিল পশ্চিম বাংলার চটকলগুলাতে, তুলার অভাবে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলি যখন তখন বন্ধ রাখা হইতেছিল। ফলে এ রাষ্ট্রের শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে ছাঁটাইয়ের ধুম পড়ে। আবার ওদিকেও পাটের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার মুখ ফিরাইয়া বসাতে পাকিস্তানী পাটচাষীদেরও দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এবং শ্রমিক শ্রেণীরও কয়লা ইত্যাদি জ্বালানির অভাবে ওখানকার কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়াতে শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। চুক্তির ফলে এই উভয় রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিপদটা প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু কথা হইল যে, ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক অসমঞ্জস সম্পর্কের মধ্যে এই পরিস্থিতিটাই একমাত্র সম্পর্ক ছিল না। ভারতরাষ্ট্র, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ইঞ্চি জায়গা যে আজ পূর্ব্ববঙ্গের উচ্ছিন্ন বাস্তহারায় পরিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেও মুখ্যতঃ পাক-ভারত বণিক গোষ্ঠীদের ঘরোয়া বিবাদের ফলে। কিন্তু সদ্য-সম্পাদিত এই বাণিজ্য চুক্তি সেই হতভাগ্য সর্ব্বহারাদের সম্বন্ধে কী বিধান দিল? ইহার পর আছে কাশ্মীরের সমস্যা। পাকিস্তানের উচ্চতর মুদ্রামূল্য মানিয়া নেওয়ার মূলে অর্থনীতি বা পররাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের যত তত্ত্বই থাকুক না কেন,—একেবারে সাদা চোখে যে এই ব্যাপারটি প্রকারান্তরে পাকিস্তানের কাছে ভারতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এক শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিয়া নেওয়ারই নামান্তর, সে কথার সাক্ষ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভেই পাওয়া যাইবে। পাকিস্থানীরা প্রচার-পটু। তদুপরি তাহাদের ধর্ম্মান্ধ ও অক্ষমশিক্ষিত সহধর্ম্মীদের কাছে তাহাদের প্রচারের শরীয়তী বিষয়বস্তুগুলি খোলেও ভাল। সুতরাং নিঃসংশয়েই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তানীরা এই বাণিজ্য চুক্তিজনিত ভারতের পরাজয়ের বিষয়টা কাশ্মীরী জনগণের কাছে বেশ ফলাও করিয়াই প্রচার করিবে। কিন্তু একটা অমীমাংসিত সমস্যার ঠিক প্রাক্কালেই এই পরাজিত ভারতের কলঙ্কিত পরিচয়টা দোমনা কাশ্মীরীদের মনে কোন্ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিবে? খুব অনুকূল স্বরূপের কি?

অবশ্য একথা ঠিক যে, কাশ্মীর যদি একান্তই ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বা এই ভারতভূমিরই মতো বিখণ্ডিত হয়—তাহা হইলে সেটা আমাদের এই শিশুরাষ্ট্রের শিশুপুঁজিবাদের পুষ্টি ও নিরাপদের পক্ষে

কোনো গুরুতর বিঘ্ন বা বিপর্য্যয়ের কারণ হইবে না। উপরন্তু চাই কি, কাশ্মীরকে বিভক্ত করিয়া যদি ইঙ্গমার্কিন মহাজনদের খুসি করা যায় এবং শেখ আবদুল্লাকে সরাইয়া সেই জায়গায় আবার পরম মিত্র কাশ্মীরপতি হরিসিংকেই মোতায়েন করা যায়, তাহা হইলে হয়তো উল্টাইয়া তার ফলে কোনো বড় রকমের একটা বাণিজ্য আশীর্ব্বাদই কপালে জুটিয়া যাইবে।

শাহানশাহ্ লিয়াকৎ

খুব বিশ্বস্তসূত্র হইতে এই নাটকীয় খবরটি পাওয়া গেল।

সম্প্রতি লাহোরে অনুষ্ঠিত একটি ইলেকসানি জনসভায় দাঁড়াইয়া পশ্চিম পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব আবদুল বারি সাহেব বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতাচ্ছলে কথায় কথায় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ আসিয়া গেল। সহসা সভাস্থ সমস্ত জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনিল, আবদুলবারি সাহেব আল্লার নামে ঘোষণা করিতেছেন—

"খোদাতালার এই উপাসনা মঞ্চ হইতে এই আমি আল্লার নামে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আমাদের উজীরে আলম লিয়াকৎ সাহেব কাশ্মীরকে কাফেরের আবদুল্লার দখল হইতে ছিনাইয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন তবে তাহাকে আমরা এই পুণ্য কর্ম্মের জন্ত আমাদের এই সাধের পাকিস্তানের একচ্ছত্র শাহনসাহ পদে অধিষ্ঠিত করিব। আর যদি তাহা না হয়। যদি বেইমান লিয়াকৎ কাফের হিন্দুদের গুণাহ্ মৎলবে পা দিয়া কাশ্মীরকে তাদের হাতে তুলিয়া দেন তাহা হইলে এই আমি আল্লার কিরা দিয়া বলিতেছি, এই গুণাহ্র জন্ত আমরা পাকিস্তানের প্রজারা কাফের লিয়াকতের তাজা খুন দেখিয়া ছাড়িব।"

পরের দিন অবশ্য লাহোরের সংবাদপত্র মাত্রেই এই সব কথা খুব ঘটা করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল! কিন্তু ইসলামের দোহাই থাকিলেও পাকিস্থানের সংবাদপত্রের সম্পাদকরা সব সময় সব ইসলামী সংবাদ ছাপাইতে সাহস পান না। তাঁহারা তাই নিতান্ত বুদ্ধিমানেরই মতো আবদুল বারি সাহেবের বক্তৃতা হইতে সব শেষের অংশটি চাপিয়া যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাকি লিয়াকৎ আলি সাহেব আবদুল বারির এই চ্যালেঞ্জের বিবরণ যথাযথই জানিতে পারিয়াছেন। লাহোরের সি-আই-ডি বিভাগ তাহাকে জানাইয়াছেন একথা।

যে বিশ্বস্ত সূত্র বহিয়া খবরটি এদেশে আসিয়াছে, সেই সূত্রেই প্রকাশ যে লিয়াকৎ আলিও নাকি জনাব বারির চ্যালেঞ্জের উত্তরে আল্লার কিরা দিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করিলাম। আল্লার ইনসাহ্‌তে (কৃপায়) যদি আমার পাকিস্তানের শাহানসাহ হওয়াই নসিবে থাকে, তবে তাকে বরবাদ করে কোন্—"

এই মন্তব্যের উত্তরে বারিসাহেব যে আবার কি বলিয়াছেন, সে খবর আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

নতুন কিছু

হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল একদা 'নব' বায়ুগ্রস্ত বাংলা দেশকে নতুন কিছু করিতে মাথাটাকে মাটিতে রাখিয়া পা দু'টাকে আকাশের দিকে তুলিয়া হাঁটিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদের 'সেন্স্ অব হিউমার' বস্তুটা কিছু কম। তাহারা রসিক কবির উপদেশ মান্ত করে নাই। কিন্তু কবিদের কথা কি আর মাঠে মারা যাইবার? একদিন না একদিন কবিদের কথা মানুষকে শুনিতে হইবেই। অক্ষরে অক্ষরে না হইলেও পাকেপ্রকারে। তাই প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে আজ দেখিতেছি, বাঙ্গালী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই উপদেশ কাজে পরিণত করিবার সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্ট। মানে, গভর্ণমেণ্টের যাঁহারা কর্ণধার—তাঁহারা।

একটা-আধটা নয়, আমাদের রাষ্ট্রচালকদের আচরিত এই নতুন কিছু করার দৃষ্টান্ত হাজির করা যাইতে পারে ভুরি ভুরি। এই তো বেশ জলজলে রকমের ক'টি দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সভাটির কথাই প্রথমে ধরা যাক্। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের অভাব নাই। সে সমুদয় রাষ্ট্রই হয় প্রজাতান্ত্রিক নয় তো রাজতান্ত্রিক, অথবা ঔপনিবেশিক। কিন্তু ভারত?

কোনটাই নয়, অথবা সবকটিই। সে যেমন একদিকে রাষ্ট্রপতি আর মন্ত্রীসভায় খবরদারিতে পরিচালিত—তেমনই অপরদিকে আবার সে এক্তিয়ার মানিয়া চলে বৃটিশ রাজেরও। দুই নম্বর দৃষ্টান্ত হিসাবে জাতীয় দিবসের কথা তোলা যাইতে পারে। অন্য কোনো রাষ্ট্রের এই প্রকারের কোনো সবিশেষ রকমের পালনীয় দিন-টিন যদি থাকে তো, তার সংখ্যা হয় একটাই। কিন্তু আমাদের দুইটা। একটা পনেরোই আগষ্ট, আরেকটা ছাব্বিশে জানুয়ারী। তিন নম্বরের দৃষ্টান্ত জাতীয় পতাকা। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেরই একটা করিয়া, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রেও দ্বৈতবাদী। আমাদের জাতীয় পতাকা দুইটা—একটা হইল অশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা, দ্বিতীয়টি চরকা লাঞ্ছিত। জাতীয় সঙ্গীতের বেলায়ও ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটানো হয় নাই। একটি করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ। কিন্তু আমরা গাই তিনটি। 'জনগণমন', 'বন্দেমাতরম্' এবং 'রামধুন'।—দৃষ্টান্ত আরও আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসক-গোষ্ঠীরা কাজে নামে হাতে কলমে, শিল্প ও সরবরাহকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, এবং কৃষিযোগ্য সমস্ত জমিকে কৃষিজীবীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া সরাসরি তাহাদেরকে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে পরিচালিত করেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা সে জায়গায় করেন শুধু 'অধিক খাদ্য ফলাও'-র প্রচার-আস্ফালন; আর বন-মহোৎসব।

সুতরাং দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল্—তিনি আমাদের খনি, শক্তি (power) ও সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী। পথঘাট নির্ম্মাণের কার্য্যক্রম, দামোদর ইত্যাদি নদীবন্ধের কাজ তাঁহারই পরিচালিত বিভাগ হইতে নিয়ন্ত্রিত ও অনুষ্ঠিত হইতেছে। দেশে যদি কখনও কোনো রাষ্ট্রীয় ইমারৎ প্রভৃতি স্থাপন বা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তারও খুটিনাটি সবকিছু করিয়া থাকেন তিনি ও তাঁর বিভাগ। এতবড় প্রশস্ত বিভাগ তাঁর, তবু কিন্তু বেশ হৈ হৈ করিয়া বাহবা দিবার মতো নতুন একটা কিছুর উদ্ভাবনায়, নিদেন পক্ষে মুন্সিজীর বন-মহোৎসব বা কদলীতত্ত্বের মতো—একটা চমকপ্রদ কীর্ত্তির অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হইতে শ্রীযুক্ত গ্যাড্গিলকে আজও আমরা দেখিলাম না। সহজেই অনুমান করা যায় এই নিদারুণ অক্ষমতার জন্য গ্যাডগিল মহাশয়কে কী গভীর লজ্জার মধ্যে কাল কাটাইতে হইতেছিল। তিনি তাঁর এই দুর্ব্বল নবানুপ্রেরণার জন্য হয়তো অনুক্ষণই তাঁহার বহু নব কীর্ত্তির অনুষ্ঠাতা কৃতী সহকর্ম্মিদের কাছে ধিক্কৃত হইতেছিলেন। কিন্তু সৎসঙ্গে সহবাস করিলে নাকি অতি অধম মানুষও কালক্রমে উত্তম মানুষের গুণাবলীতে বিমণ্ডিত হন। সুতরাং মাননীয় গ্যাড্গিল-জীও যে তাঁহার সহামুধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণায় শেষ পর্য্যন্ত একদিন না একদিন অতি চমকপ্রদ রকমের নতুন একটা কিছু করিয়া বসিবেনই, সে বিশ্বাস আমাদের বরাবরই ছিল।—গ্যাড্গিল মহাশয় আমাদের হতাশ করেন নাই। অবশেষে তিনি সত্যসত্যই নতুন কিছুতে হাত দিয়াছেন। এবং এমন একটা কিছুতে হাত দিয়াছেন যাহা ভারতীয় মন্ত্রীসভার আর কেহ কেন, সারা দুনিয়ার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কেহ কোনোদিন তেমনতর কাজে হাত দিতে সাহস করেন নাই।

পুণ্যশ্লোক মহাত্মাজীর মহান্ স্মৃতি রক্ষার্থ একটি অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের জল্পনা-কল্পনা সরকার মহলে অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। শ্রীযুক্ত গ্যাড্গিল মহাশয়, শ্লথগতি হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তাই সুযোগ বুঝিয়া এই মহাত্মা-স্মৃতি-সৌধের ব্যাপারটি নিয়াই তাহার নতুন কিছুর সাধনায় 'বউনি' করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। মহাত্মার মন্দির নির্ম্মাণের দায়িত্বটি প্রধানতঃ তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি আবার সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহার মনোনীত এক বাস্তুশিল্পীর উপর। সে ভদ্রলোক বুঝি আবার নব্য-উন্মাদনায় গ্যাড্গিল মহাশয় অপেক্ষাও বেশী উৎসাহী। সেই উৎসাহে তিনি গান্ধী-মন্দিরের এক নক্সা তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছেন। এবং তৈয়ার করিয়াই আর কাল-বিলম্ব করেন নাই, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্যাড্গিলজীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং তদুত্তরে গ্যাড্গিলজীও

কালবিলম্ব না করিয়া স্বমনোনীত শিল্পীর কৃতিত্বে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের বিবৃতি মারফত দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন প্রচার করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার নিজেরই মতো আত্মহারা হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আত্মহারা হইবারই কথা। রাজধানী হইতে প্রকাশিত কোনো কোনো কাগজে এই অভিনব পরিকল্পনার প্রতিচিত্র দেখা গেল।—একটি অতিকায় ছ'তলা বাড়ী, উহার সম্মুখাংশের গঠনটি রচিত হইয়াছে এক বিকট-দর্শন আ-কটিদেশ দেহাবয়বের আদলে—দেহাবয়বটি মহাত্মাজীর প্রতিকৃতিকে ভেঙচি কাটিতেছে। এই বিকটকায় দেহাবয়বটির বিভিন্নাঙ্গে নাকি গান্ধীবাদের ক'টি প্রধান বিষয়ের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরিকল্পিত গৃহটির যেটি সর্ব্বোচ্চতলা— সেটি সেই মুখাবয়বের মস্তিষ্কের কোঠা—সেখানে নাকি বসানো হইবে গান্ধী সাহিত্যের এক পাঠাগার। বক্ষোদেশে কুটীর শিল্পের একটি প্রদর্শনাগার। উদরের অংশটা যে-তলায় পড়িতেছে, সেখানে একটি নিরামিশ ভোজনাগার খোলা হইবে। আর নাভিদেশে হইবে উক্ত অট্টালিকার প্রবেশদ্বার। ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে যে গ্যাড্‌গিজী নিয়োজিত বাস্তুশিল্পীটি এই পর্য্যন্ত আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, স্মৃতিসৌধ বা মন্দির-নির্ম্মাণের এমন বিস্তৃত প্রয়াস মানুষের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া কালজয়ী স্মৃতি-সৌধ তো আছে অনেকগুলিই। আছে উত্তর ভারতের তাজমহল, সাঁচির বৌদ্ধস্তূপ। দক্ষিণ ভারতের আছে অনবদ্য স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন দেবমন্দিরগুলি। সুদূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও অতুলনীয় বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একজন মহামানবের শাশ্বত-স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারপর ইয়োরোপেও কত গির্জ্জা ঘোষণা করিতেছে সেখানকার স্থপতি-শিল্পকে, ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের সুবিরাট ব্যক্তিত্বকেও। আজ মহাকালের গর্ভে অবশ্য এইসব শিল্পকীর্ত্তির শিল্পীদের নাম অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এগুলি সবই হইল অমৃত মানবাত্মার অতিমানবীয় রূপ-প্রয়াসে এক-একটি অবিনশ্বর সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্য যাহাদের স্মৃতিতে এগুলির সৃষ্টি, সেই ক'জন অবিস্মরণীয় মহামানবের। অথচ এইসব শিল্পীর কেহই কিন্তু কোনদিন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের এমন অরাজ প্রয়াসে সাহসী হন নাই। তাহারা কেন আজ পর্য্যন্ত সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো শিল্পীই নয়? তার কারণ মানুষের শিল্প এবং কলাও তার দেবার্চ্চনার মতোই নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধি সাপেক্ষ। উদোর পিণ্ডিকে সেখানে ইচ্ছা করিলেই বুদোর ঘাড়ে চাপানো চলে না। সেখানেও বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে বসিলে সেই অর্চ্চনাতেই পূজা শেষ করিতে হয়—বিষ্ণুর মন্দিরে আসিয়া কালীপূজার ছাগ বলির অপকাণ্ডের মতো সেখানেও মাধ্যমে-মাধ্যমে অসবর্ণ মিশ্রন অশুচি কার্য্য।

গ্যাডগিলজীর পরিকল্পনার প্রায় হুবহু এক দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে আছে বুঝি শুধু আরেকটি। তাহা হইল আফ্রিকার কোনো কোনো আদিম নর-গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-দেবতাদের মন্দিরগুলি। পাঠকদের জানা না থাকিলে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদিম জাতিগুলির গোষ্ঠী-দেবতার অর্থ হইল অপদেবতা। ইতিহাসের কোন এক স্মরনাতীত পর্ব্বে এইসব আদিম বন্য মানুষদের কোনো কোনো গোষ্ঠী তাহাদের পূজা-আয়তনগুলি নির্ম্মান করিত এক-একটা কল্পনাতীত বিরাট মুখাবয়বের অনুকরণে।—একেবারে হুবহু না হইলেও গাডগিলজীর অবলম্বিত অভিনব প্রয়াসের সঙ্গে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে এমন আরেকটি প্রচেষ্টার কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।—পণ্ডিতদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে নাকি একদা এমন একটা যুগ আসিয়াছিল, যখন সংস্কৃত কবিরা রসবস্তু হইতে আর কাব্যের প্রেরণা গ্রহণ না করিয়া কাব্য রচনা করিতেছেন ঘটি-বাটির স্থূল অবয়বের আঙ্গিকে।

কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পর হইতেই নাকি সংস্কৃত-সাহিত্যের আকাল আরম্ভ হইয়াছিল। এবং সেই আকালের জের আজও পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

বঙ্কিম-স্মৃতি

আগামী ২৬শে চৈত্র বঙ্কিম-তিরোধান দিবস। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দিবসের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিবার জন্য আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ জানাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়ায় 'কল্যাণী' সহর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজ্যপাল ডাঃ কাট্‌জু উক্ত নবনির্ম্মীয়মান সহরে একটি 'বঙ্কিম-নগর' প্রতিষ্ঠারও অনুরোধ জানান। তাঁহার এই চিন্তাধারা ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি প্রশংসার্হ। কিন্তু শুধু 'বঙ্কিম-নগর' প্রতিষ্ঠা করিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি জাতির কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইবে না। বঙ্কিম চন্দ্রকে আজ নতুন করিয়া মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আগামী ২৬শে চৈত্র যেন দেশব্যাপী সেই প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

★

ভারতবর্ষ জানিত—সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে, সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। —রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

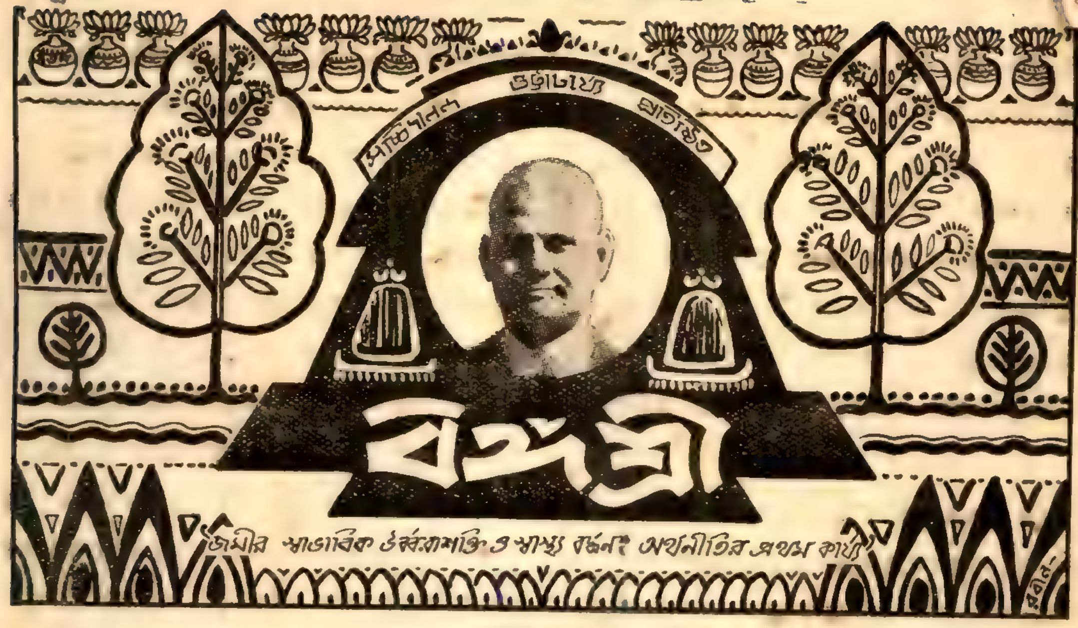

অষ্টাদশ বর্ষ বৈশাখ—১৩৫৮ ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

প্রতিধ্বনি

[গ্রীক পুরাণের 'ইকো'র কাহিনী অনুসরণে]

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

হ তুমি ভাষাহীন, অর্থহীন ওগো প্রতিধ্বনি,
ব কণ্ঠস্বরমাঝে অহরহ ওঠে অনুরণি'
ধনির ব্যাকুল সুর ; আছে আছে আছে ভাষা।
নিত্য তব হিয়াতলে সৃজনের দুরন্ত পিপাসা
াভাসে ইঙ্গিতে ঠারে দিকে দিকে রচি' তোলে গান
প্রমের শাশ্বতছন্দে লীলানন্দে চির কম্পমান।

হ অনঙ্গ মায়াবিনী, ছিলে নাকো তুমি চিরদিন
মনি অরূপ মায়া বাণীহীন, তনুমনহীন।
কদিন রূপে রসে ছিলে তুমি মর্ত্ত্যের মানবী,
াম শ্রী-মূর্চ্ছিত-তনু শরতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি,
ষার শিশির ভারে নীল আঁখি করুণ কোমল,
র্ম্মল কপোলখানি মিঠা লাজে রক্তিম উজল,

যৌবনের তরুশিরে ফুটমান নবীন বল্লরী,
লাবণ্য-সরসী নীরে ভাসমান সরোজসুন্দরী।
বনপরীদের সাথে মিলে মিশে বন পথে পথে
হেসে খেলে বেড়াইতে অতুলন আনন্দের রথে।
কণ্ঠস্বরে ছিলো ঢালা প্রেম-ভরা মাতোয়ারা সুর,
মুখের ভাষণভঙ্গী কতো মনোহর সুমধুর।
প্রিয়জন-বিরহিণী দেবরাজ-পত্নী জুনো রাণী
মর্ত্ত্যের প্রবাসকাল কাটাইত শুনি' তব বাণী।
শুনিতে শুনিতে তব কণ্ঠ-ঝরা মধুময় গীতি
অলক্ষ্যে অন্তরে তার ঘনাইত স্বর্গের বিস্মৃতি ;
সহসা হেরিত যবে—কোথা বা সে, কোথা দেবরাজ,
অমনি মনের কোণে ব্যথা দিতো ক্রোধ-ভরা লাজ।

ভাবিত সে—ছল করি' চতুরিকা তরুণী ললনা
তাদের মিলন ঘেরি' করিয়াছে বিরহ রচনা।
তব বাণীসঙ্গীতেরে ভুলে তাই ভাবি' প্রগল্‌ভতা
অভিশাপ হানি' তব কণ্ঠ হ'তে হ'রে নিলো কথা।
হৃদয়েরে বাণীচ্ছন্দে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেলো—হ'লে মূক মাটির প্রতিমা।
লোকালয় পরিহরি' বনমাঝে তরুশিরে তাই
অসহ প্রাণের গ্লানি লুকাইতে খুঁজে নিলে ঠাঁই।

একদা সে ছায়াঘন বনপথে ল'য়ে সঙ্গীদল
সুদর্শন যুবা এক যেতেছিলো চাহনি-চঞ্চল,
চেয়ে দেখিবার মতো রূপ তার, নাম—নারসিসাস্‌
অঙ্গ ভরি' যৌবনের লাবণ্যের ললিত উচ্ছ্বাস,
আঁখিকোণে ভাবা খোঁজে অন্তরের উল্লসিত আশা,
এমনি সে মুখ, যেন হেরিলেই জাগে ভালোবাসা।
তাহারে হেরিয়া তব অলক্ষ্যিতে মনে হোলো সাধ
দু'টি কথা ক'য়ে তারে মিটাইবে প্রাণের বিষাদ।
কিন্তু মূক মনোবীণা,—আছে সুর, নাহি আর বাণী,
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গিয়া এ কথাটি, শুধু পেলে গ্লানি।
তবু তারে ছেড়ে-থাকা সহিলো না হৃদয়ে তোমার
আড়ালে আড়ালে রহি' চুপি চুপি পিছু নিলে তার।
এই মতো যেতে যেতে নার্‌সিসাস্‌ সহসা কখন
হেরিয়া বিজনবনে পিছে তার নাহি সঙ্গীগণ,
'কে আছো, কে আছো' বলি' তারস্বরে যতোই শুধায়
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে তুমি 'আছো' বলি দাও তারে সায়।

একান্তে সে বনোমাঝে নাহি কেউ দৃষ্টির ভিতর
তবুও ব্যঙ্গের মতো তার-ই স্বরে কে দেয় উত্তর,
এই কথা ভাবি' মনে যতো জাগে পরম বিস্ময়,
'কাছে এসো, কে কোথায়' ফিরে ফিরে এই ততো কয়।
তুমি শুধু 'এসো' কহি ধীরে চলো, থমকি' দাঁড়াও,
শুনিয়া তাহার কথা চারিদিকে ফিরে ফিরে চাও;
রুধিতে বাসনা-ব্যথা না পারিয়া তুমি অবশেষে
পরিহরি' লাজভয় কাছে তার দাঁড়াইলে এসে।
আপন প্রেমের রূপে এ বিশ্বেরে হেরি' প্রেমময়
ভাবিলে না—যেথা রূপ, সেথা প্রেম সর্ব্বদা না রয়,
বুঝিলে না—যেথা আলো, সেথা সদা নাহি রহে আশা,
যেখানে হৃদয় আছে নাহি সেথা রহে সদা ভাষা।
সোহাগে প্রসারি' তব দু'টি কর তুহিন-ধবল
মাগিলে প্রেমের দান ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল।
দেখেনি যে কোনোদিন মুগ্ধ চোখে প্রভাতের আলো
কাহারেও কোনোদিন জীবনে যে বাসে নাই ভালো,
তার কাছে প্রেম নয় সুদুর্ল্লভ সাধনার ধন,
সে যে তার কাছে শুধু অর্থহীন প্রলাপ বচন।
তাই সে তোমার দেওয়া মানবের মহীয়ান দান
বিরাগে ফিরায়ে দিলো অট্টহাস্যে করি' প্রত্যাখ্যান।

সেই প্রত্যাখ্যান-গ্লানি, ওগো গরবিণী; বুকে ল'য়ে
সখিদের কাছে আর ফিরিলেনা লাঞ্ছিত হৃদয়ে।
বনের একান্ত কোণে অনাহারে যাপি' রাত্রিদিন
ধীরে ধীরে তনু হোলো অতি শুষ্ক, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ;
প্রাণের নিশ্বাস-বায়ু দুর্ব্বল দেহের কারা হ'তে
বাহিরিয়া মুক্ত হ'য়ে মিশে গেলো অনন্তের স্রোতে।
অনঙ্গ অস্তিত্ব ল'য়ে সেই হ'তে বনে বনান্তরে,
সাগর, নদীর তীরে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে
ছায়ার অতীতরূপে বাণীহীন সুরের মূর্ত্তিতে
বিচরিছ নিশিদিন আপনার খেয়াল-খুশীতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লরেন্স ফষ্টর' চরিত্র কাল্পনিক নয়—বাস্তব

কাঁথি হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে খুলনা মহকুমার ভার গ্রহণ করেন। এবং ১৮৬৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" খুলনায় লিখিতে আরম্ভ করেন। এইখানে মাত্র দুইটি অধ্যায় শেষ করেন। আর অগ্রসর হন না। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি—কাঁথির অন্তর্গত জলেশ্বর, মোগলমারি প্রভৃতি স্থানে মোগল পাঠানের মধ্যে বহুবার যুদ্ধ হয়। রাজা মানসিংহ অনেক সময়ে ওসমান খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আফগান বিদ্রোহ দমন করেন। জগৎসিংহ ছিল মানসিংহের পুত্র। পাঠান কতলু খাঁও একজন বিদ্রোহী ছিল, আকবরের সময়ে দায়ুদ খাঁর সে পার্শ্বচর ছিল। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা কাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ (৯৯৭ বঙ্গাব্দ); সমস্ত অবস্থা দেখিলে দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসই বলা চলে এবং স্যার যদুনাথ সরকারের মতে বঙ্গ সাহিত্যে ইহা প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক* উপন্যাস। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহার নাম করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র

গড় মান্দারণের কিম্বদন্তীও বঙ্কিমচন্দ্রকে কম উৎসাহিত করে নাই। তাঁহার এক খুল্ল পিতামহ ছিল। তাঁহার মাঝে মাঝে বিষ্ণুপুরেও যাতায়াত ছিল। তিনি বলিতেন—

"মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত, এই অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিয়াছিল। মান্দারণে জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছি। আমি শুনিয়াছি উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুঠপাট করিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুতকুল-গৌরব জগৎসিংহ তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হন।" †

বঙ্কিম-কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ বৎসর বয়সে এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। তাহার বৎসর তিনেক পরে দুর্গেশনন্দিনীর রচনা হয়।"

বস্তুতঃ দেখিয়াছি কাঁথির ওসমান খাঁ, কতলু খাঁ এবং মান্দারণের কাহিনী অবলম্বনেই "দুর্গেশনন্দিনী" রচিত হয়।

খুলনার সুপারী এবং নারিকেল বৃক্ষরাজি বঙ্কিমের মনে এমন রেখাপাত করিয়াছিল যে, তিনি সীতারামে উড়িষ্যার তালবৃক্ষের রূপান্তরালে সেই দৃশ্য বর্ণনা করেন—

"চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পিতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল সুপত্র শোভাময়!"

—সীতারাম, ১ম খণ্ড
১৭ পরিচ্ছেদ।

খুলনার স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত, (রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। ঈশানবাবু নদীয়া জিলার কুষ্টিয়ার

* যদুনাথ রচিত দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা।

† পূর্ণচন্দ্র প্রণীত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা।

নিকট দিয়া জলপথে আসিতে নৌকা ডুবিয়া মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডুবুরি পাঠাইয়া দেহ উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। এবং মৃত্যুর পরে রমেশবাবুকে একখানি সহানুভূতিসূচক পত্রও লেখেন। পত্রের কথাগুলি রমেশবাবুর কথায়ই ব্যক্ত করিতেছি—

"যখন আমার ১০।১২ বৎসর বয়স মাত্র ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন; উভয়েই ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভালবাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন। আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন—সেই আমি বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখিলাম। আমি তখন ১০।১২ বৎসরের বালক, বঙ্কিমবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিলেন, সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলিলেন না।

"১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, বঙ্কিম তখন খুলনায়, তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।"

বৈশাখ ১৩০১, নব্য ভারত।

এই সময় বাঙ্গলার শাসনকর্তা ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট। নীলকরের উপদ্রব দূর করিবার নিমিত্ত তিনি বাছিয়া বাছিয়া সুদক্ষ ও যোগ্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে সঙ্কটাপন্ন মহকুমাগুলির ভার প্রদান করেন। যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনা মহকুমা তখন মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নীলকরগণের অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল। দুর্দ্ধর্ষ নীলকর মোরেল সম্প্রতি আবার সুন্দরবন আবাদ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। তাহার অত্যাচারে সে অঞ্চল বড়ই বিব্রত, অন্যান্য নীলকরগণও সমানই অত্যাচারী। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এত শীঘ্র কাঁথি হইতে স্থানান্তরিত করিয়া খুলনার ভার প্রদান করা হয়।

মোরেল পরিবার আবার অসাধ্য সাধন করিয়া গভর্ণমেন্টের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি মোরেল পুত্রগণের সহায়তায় দশ বৎসর মধ্যে—এ পর্য্যন্ত যাহা কেহ পারে নাই—৬৫০০০ বিঘা অনাবাদ জমি চাষোপযোগী করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা নদীতীরে বাজার বসাইয়া "মোরেলগঞ্জ" নাম দিয়াছেন এবং অল্পদিন মধ্যে বিপুল বিত্তশালী হইয়া পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট মোরেল জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম দেখিত এবং কনিষ্ঠ হেনরী মোরেল তাহার সহায়তা করিত। আবাদে দুর্বৃত্ত প্রজা শাসন করিতে কতকগুলি বেতনভোগী লাঠিয়ালের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহারা আবশ্যক হইলেই লাঠি ধরিত, লুঠ করিত, বল পূর্ব্বক জমি দখল করিত। ইহাদের দলপতি ছিল একবিংশতি বয়স্ক ডেনিস হিলি নামক আইরিশ যুবক। পূর্ব্বে সে সৈন্য বিভাগে কাজ করিত, কিন্তু কি অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়া যায়। পরে আসিয়া মোরেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে বহাল হয়। হিলি লাঠিয়ালের সর্দ্দার হয় বটে, কিন্তু সে আর লাঠি ধরিত না, কথায় কথায় বন্দুক চালাইত। নিষ্ঠুরতায় হিলির তুলনা ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায়, মোরেলগঞ্জের সুকলিয়া গ্রামে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গা নীল সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া নহে—জমির সীমানা উপলক্ষ্যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্ত ব্যাপারেই বঙ্কিম রাজকার্য্যে অপর্য্যাপ্ত যশার্জ্জন করেন।

বরাখালি গ্রামে রহিমুল্লা নামক একজন সাহসী প্রজা ছিল। ইতিপূর্ব্বে মোরেলের লাঠিয়ালগণের সহিত তাহার দুই-একবার দাঙ্গাও হয় এবং তাহাতে মোরেলের পক্ষীয় ব্যক্তিগণের মেয়াদ হয়। মোরেল ও হিলি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন।

ইতিমধ্যে রহিমুল্লা আপনার গাতি জমা প্রভৃতি টাকীর মুন্সী জমিদারবাবুদিগকে বিক্রয় করিয়া ভাগচাষে কৃষিকার্য্য করিতে থাকে। ঘটনাচক্রে সুকলিয়ার গুলমামুদ তালুকদারের ও রহিমের বাড়ীর সীমানা লইয়া ভয়ানক বিবাদ বাধে, আর সেই গোলমালে মোরেলের দক্ষিণ হস্ত হিলি গুলমামুদের পক্ষ সমর্থন করে।

২৫শে নভেম্বর (১৮৬১) তারিখে উভয় পক্ষে দাঙ্গা হয়, এবং লাঠি চলিতে থাকে। ইহাতে সাহেবের পক্ষীয় রামধন মালো নামক একব্যক্তি খুন হয় ও হিলি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করিয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র হিলি নয়। 'Now or never' মনে মনে ভাবিয়া সেই দিনই শেষ রাত্রে (২৬শে নভেম্বর) হিলি আবার বহু লাঠিয়াল লইয়া রহিমের বাড়ী ঘেরাও করে। রহিমও ঢাল ও রামদাঁও হস্তে যখন শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই হিলির গুলীতে পায়ে ভয়ানক আহত হইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি রহিম বাড়ীতে চলিয়া গিয়া যখন ক্ষতস্থান ধুইতে থাকে, অকস্মাৎ পশ্চাৎভাগে বৃক্ষের অন্তরালে হিলির কালান্তক মূর্ত্তি দেখিয়া তখনই চীৎকার করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে তাহাকে সম্বোধন করে—

"আমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া চল, কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না। আমার অনেক পোষ্য পরিবার আছে। যদি আমাকে নষ্ট করাই তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে দোহাই ঈশ্বরের, আমার পরিবারের ও স্ত্রীলোকদের কোন প্রকার অপমান করিও না।"

কিন্তু হিলির কঠোর প্রাণ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহার নিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া রহিমের বক্ষঃস্থলে লাগিয়া তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। রহিমের একটী পুত্র এবং বাড়ীর কয়েকটী স্ত্রীলোকও আহত হইল। অতঃপরে রহিমকে মৃত দেখিয়া তাহার দলস্থ সকলে পলায়ন করে, এবং হিলিও কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং রহিমের মৃতদেহ নৌকায় করিয়া লইয়া বরাখালি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। পরবর্ত্তী ঘটনা আমরা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত "পরিদর্শক" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"হিলি একুশজন প্রজাকে সপরিবারে লইয়া গিয়া কুঠিতে আবদ্ধ করে। যখন শুনিতে পাইল হাকিম তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন, হিলি তাহাদিগকে সুন্দরবনে লইয়া যায়। গুলি করিয়া একটী গর্ভবতী রমণীর প্রাণ সংহার করে। তারপরে ঐসব প্রজাদের কতককে অন্তদিকে পাঠাইয়া কতক লইয়া সে মাতলার (পোর্ট ক্যানিংতে) রওনা হয়। প্রজাদের ভয়ানক উৎপীড়ন করে, ছুইটী স্ত্রীলোকের প্রতি বলাৎকার করে, একটীর কোলে একটী শিশুকন্যা ছিল, টানাটানির সময় শিশুটীর মৃত্যু হয়। অতঃপরে হিলি মোরেলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে এবং পরে বঙ্গোপসাগর দিয়া পূর্ব্ব দিকে রওনা হইয়া বাহির সুন্দরবনের একটী দ্বীপে সেই নিঃসহায় দলকে ছাড়িয়া দেয়। হিংস্রজন্তুর ভয়ে তাহারা জেলেদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিগের প্রজাও দৈববলে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। অতঃপরে বাখরগঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করে। অতঃপরে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে হিলি পলাতক হয়।"

এই খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটই আমাদের এই গ্রন্থের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। উপরে যে সকল কথা বলিলাম আজকাল হয়তো তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তৎকালীন মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা বর্ণনা করিলাম, সেসমস্ত কথার মধ্যে কোন অত্যুক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আর এই অত্যাচারের ফলেই মোরেল পরিবারের সর্ব্বনাশ হয়—তাহারা ঋণগ্রস্ত হয় এবং পরে দুর্গাচরণ লাহার নিকট সমগ্র জমিদারী বিক্রী করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যায়।

বঙ্কিম ১৮৬১ সালের পূজার ছুটির সঙ্গে পনের দিন অতিরিক্ত ছুটি লইয়া অক্টোবর মাসের শেষে বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। এবং যেদিন এই ভীষণ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ফকিরহাটা থানায় ছিলেন। ঘটনার ছুইদিন পরে ২৮শে নভেম্বর (১৮৬১) তাঁহার কাছে এজাহার হয়। বঙ্কিম কালবিলম্ব না করিয়া যশোহর হইতে পঞ্চাশজন সিপাহী সৈন্য প্রেরণের জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রার্থনা করিয়া স্বয়ং নৌকাযোগে মোরেলগঞ্জ রওনা হন। অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া এবং ঘটনাস্থল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হন, আর সকলে তাঁহার সেই সময়কার গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সবিশেষ পরিশ্রম, ক্ষিপ্রকারিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

সহকারে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। বেনব্রিজ সাহেব তখন (Mr. Antony John Richard Bainbridge) যশোহরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মে মাসে ১৮৬১ সেখানে আসিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করিতে এতটুকুও ত্রুটি করেন নাই।

তদন্তের সময় বঙ্কিম যখন অনৈক সাহেবকে হিলি অনুমান করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করেন, সেই সাহেব উত্তর করে—

"আমি নাম বলিব না, আর যে মোরেলগঞ্জের উপর পদার্পণ করিবে আমি তাহাকে গুলি করিব।"

হিলি সাহেব তখনও ধৃত হয় নাই, তারপরে কোথায় পলাইয়া যায়। অতঃপর সে কলিকাতার চীৎপুরে যায় এবং গুজব উঠিল যে সে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ মোরেল সাহেব (রবার্ট মোরেল) পূর্ব্বোক্ত দাঙ্গার রাত্রে বরিশাল ছিল, বোধহয় alibi (অনুপস্থিতি) প্রমাণ করিবার জন্য। হেনরী মোরেল এবং লাইটফুট নামক আর একজন সাহেব বিলাত পলাইয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেককে ধরিয়া আনিতে পারিলে ২০০০৲টাকা পুরস্কার পাইবার ঘোষণা হইল। হিলিও সত্যই বিলাত যায় নাই। ছদ্মবেশে সে আসামের জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আড়াইশত টাকার আফিম ছিল, ইচ্ছা ছিল আসাম হইতে বার্ম্মা হইয়া চীনদেশে চলিয়া যায়, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ বঙ্কিমের ওয়ারেণ্ট ও বুদ্ধিশক্তি তাহাকে তৎপূর্ব্বেই আসাম হইতে ধরিয়া আনে।

হিলি যখন পলাতক, মোরেল সাহেব (রবার্ট) একটি ফন্দী করিয়া তাহার নামে একটি তহবিল তছরুপের মোকদ্দমা আনয়ন করে, উদ্দেশ্য—হিলির কার্য্য তাহার অনুমোদিত নয়—তাহাই প্রমান করিবার জন্য।

সমস্ত ঘটনার জন্য বেনব্রিজ সাহেব মোরেলের নিকট হইতে একটী কৈফিয়ত তলব করেন। ইতিমধ্যে মোরেলও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিল। কিন্তু বেনব্রিজ সাহেব তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করিব না। তুমি আমার আবাসে আসিও না।"

এদিকে মোরেল সাহেবের লোক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতেও কম চেষ্টা করেন নাই। একজন সাহেব (মোরেল কি লাইট্‌ফুট ঠিক বলা সম্ভব নয়) বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলোতে উপস্থিত হয়, এক লক্ষ টাকার নোট ও স্বর্ণমুদ্রা উপস্থিত করিয়া বলে, 'হয় তুমি ইহা গ্রহণ কর, নচেৎ আমার এইগুলিই তোমার শেষ অস্ত্র হউক?' বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার অজুহাতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আর আসিলেন না। উক্ত শ্বেতাঙ্গ সাহেবও ভগ্নমনোরথ হইয়া পলাইয়া চলিয়া যায়*।

বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের পিস্তল গ্রাহ্য করেন নাই।" শচীশ বাবুও ঘটনাটি আংশিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি বলেন, "হিলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বোম্বাই হইতে পলাইতেছিল।" প্রকৃতপক্ষে হিলিকে আসামের জঙ্গল হইতে ধৃত করিয়া আনা হয়।

বস্তুতঃ বরাখালির এই বিখ্যাত ব্যাপার না জানিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সাহেবদের কথা পরে বলিব। ইতিমধ্যে দুর্গাচরণ সাহা নামক মোরেলের প্রধান কার্য্যকারক ওয়ারেন্টের ভয়ে বৃন্দাবনে পলাইয়া গিয়া রাধামাধব দাস নাম গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্কিমের ওয়ারেন্ট তাহাকেও সেখান হইতেই লইয়া আসে। যশোহরের দায়রার বিচারে হিলির পক্ষের দৌলত চৌকীদারের ফাঁসির হুকুম হয়, ৩৪জন আসামীর যাবজ্জীবন

---

* স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "Sayings of Bankim" পুস্তকে লিখিয়াছেন—

He conversed with Bankim Babu to the effect that his master was willing to pay him a lac of rupees which he had brought with him in gold on condition of his hushing up the celebrated Morelgunge case. If he was not willing to accept the offer, his alternative instruction was to shoot him on the spot ..After he had escaped out of the clutches of the dreadful man, he screamed aloud for his servants.... '

দ্বীপান্তর হয় এবং দুর্গাচরণ সাহার সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মোকদ্দমার পরে বেনব্রিজ সাহেব বঙ্কিমের বহু প্রশংসাবাদ করিয়া কার্লো লইয়া বিলাত চলিয়া যান।

আর হিলি? আসামের জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে মিচেল সাহেব (Henry Louis Mitchel) কর্তৃক আশ্চর্য্যভাবে ধৃত হইয়া পড়ে। ধরা পড়িয়া হিলি প্রথমে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল ও নাম ভাড়াইয়া অবশেষে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হয়।

হিলি ধৃত হয় জুলাই মাসে ১৮৬২, এবং সাত মাস হাজতে পচিবার পর ২৬শে জানুয়ারী ১৮৬৩এ হিলির বিচার হইল হাইকোর্টে এবং কসাইটোলার জুরীর সহায়তায়। প্রথম কথা হইয়াছিল হাইকোর্টের বিচারপতি মর্গ্যান সাহেব যশোহরে অথবা খুলনায় গিয়া স্থানীয় জুরীর সহায়তায় বিচার করিবেন, কিন্তু কেন যে তাহা হইল না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিচার হইল স্যার চার্লস্ জ্যাক্‌সনের আদালতে এবং সরকার পক্ষ সমর্থন করিলেন কাউইস্ সাহেব (Advocate General) ও মিঃ গ্রাহাম Standing Counsel আর আসামী পক্ষ সমর্থন করিলেন Messers, Doyne ও Paul সাহেব।

কাউইস্ সাহেব প্রথমেই জজ ও জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনাদের এই মোকদ্দমায় বিচারের বিষয় একটীমাত্র ব্যাপার সম্বন্ধে যে হিলির গুলিতেই রহিমের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কি না। দাঙ্গা অথবা ঘর জ্বালানি প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রমাণ নির্ণয় করিবার আপনাদের অধিকার নাই।" নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য প্রদান করেন।—

হিলির ভগ্নীপতি Francis Bear—

"হিলি এই দেশে জন্মিয়াছে, তাহার পিতামাতা উভয়ে আয়র্লণ্ডের লোক। হিলির বয়স পূর্ণ ২১ বৎসর।

সমিরুদ্দিন প্রভৃতি ১২।১২ জন সাক্ষী বলিয়াছিল যে, হিলির গুলিতেই রহিমের প্রাণ বিয়োগ হয়।"

ভগীবিবি বলে—"রহিমের বাড়ী থাকিতাম। সাহেবকে স্বহস্তে প্রাণনাশ করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর মৃতদেহ ও আমাকে নৌকায় করিয়া লইয়া যায়। হিলি প্রথমে সেই নৌকায় ছিল। হিলি যাবতীয় দস্যুকে লুঠ ও হত্যা করিতে উৎসাহ দেয়।"

বড় বিবি—ঐ—

রহিমের স্ত্রী কলুপা বিবি—রহিম যে মহারাণীর দোহাই দিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি অপমান করিতে নিষেধ করেন, তাহা বলেন। ভবী বিবি, কলুপা বিবিকে কিরূপে নৌকায় করিয়া হিলি লইয়া যায় তাহা বিবৃত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষী দিতে দাঁড়াইয়া বলেন—

"আমি গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে বরাখালীর দাঙ্গার কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গিয়াছিলাম। তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দী লই, তাহার মধ্যে একজন সমিরুদ্দিন (সরকতুল্লা) মৃতপ্রায় ছিল। ২রা ডিসেম্বর স্বরুলিয়ায় আমার সহিত হিলির সাক্ষাৎ হয়। মোরেলের কয়েকজন প্রজার উপর সন্দেহ হওয়ায় আমি হিলিকে তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বলি। হিলি বলিলেন, তাহারা নির্দোষ। হিলির নাম জিজ্ঞাসা করিলে হিলি তাহা বলেন না। মোরেলের বাটীর ভিতর হইতে দুই ব্যক্তিকে বাহির করা হয়। ৬ই ডিসেম্বর হিলিকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা নাজিরকে দিয়াছিলাম। হিলি ধৃত হইয়া আনীত হইলে তাহার একজন বন্ধু গত জুলাই মাসে (১৮৬২) বলেন, যাহাকে হিলি বলিয়া ধৃত করা হইয়াছে, সে বস্তুতঃ হিলি নহে। আর হিলিকে সে হিলি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, I do not say that I am and I do say that I am not, হিলিই যে হত্যাকারী এ কথা অনেক ব্যক্তি তাহার নিকট বলিয়াছে। আমি যখন হিলিকে চিনিতে পারিয়া গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা পাই, তখন সে বলিয়াছিল যে, মোরেলগঞ্জের উপর পদার্পণ করিবে, আমি তাহাকে গুলী করিব। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যে তিনি তাহা নিঃসন্দেহ না জানিয়া গ্রেপ্তার করি নাই।"

পুলিসের জমাদার দীনবন্ধু সিংহ "হিলিকে আমি নিজচক্ষে ঘটনাস্থলে দেখিয়াছি" বলিয়া সনাক্ত করে। হিলিকে সনাক্ত করিবার জন্যই সে গিয়াছিল।

সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে ২৮শে জানুয়ারী প্রধান জুরী (foreman) বলিয়া উঠিলেন—we wont

hear defence—prosecution failed to prove the case. We are unanimous: "আমরা আসামীর বক্তব্য শুনিতে চাই না। সরকার পক্ষ প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে।" জুরীরা সকলেই ছিল শ্বেতাঙ্গ সাহেব।

জজ সাহেব বাহাদুরও জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে মুক্তিপ্রদান করেন। এই বিচার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করে—

"জুরীরা যেরূপ মত প্রকাশ করুন না কেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, হিলি হইতে বরাখালির হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। সাক্ষীদিগের বাক্যে আমাদিগের অনুমাত্র সংশয় জন্মিতেছেনা। এপ্রকার অত্যাচার, এরূপ নৃশংস মানবস্বভাব এরূপ অনুষ্ঠিত ব্যবহার অন্যকোন দেশে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ফরাসী-বিদ্রোহে সহস্র সহস্র লোক এক এক স্থানে হত হইয়াছে. যথার্থ বটে, কিন্তু প্রগাঢ় শান্তির সময়ে কোন সভ্যদেশেও সভ্যতম গভর্ণমেণ্টের অধীনে দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে ইহা কখনও শ্রবণ করা যায় নাই। অত্যন্ত অসভ্য জনের বিচারও ইহার নিকটে লজ্জিত হইয়াছে। মনুষ্য ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা ও বৈরনির্য্যাতন নিষ্ঠুরতাদি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে সমস্ত কুক্রিয়া করিয়া থাকে সে সমস্ত এক হিলির দ্বারা একপদে সম্পাদিত হইয়াছে। হিলি গৃহদাহ, গৃহ বিলুণ্ঠন, হত্যা, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যাদি কোন পাপক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে বাকী রাখে নাই। ভয়ানক যুদ্ধের পরও জয়শীল সেনাগণ শত্রুদলের মৃতব্যক্তিদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে দেয়, নিতান্ত দুরাত্মা হিলি রহিমুল্লাকে এ সম্মানও প্রদান করে নাই।"

যে জন্য হিলির সনাক্ত সম্বন্ধে জুরীর মনে সন্দেহ জন্মে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অনেকেই হিলিকে সনাক্ত করিয়াছে তবে আবার কেহ কেহ বলিয়াছে একজন সাহেব ছিল, কেহ বলিলেন—যোরেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিল। তবে অন্ধকারে তাহার শ্বেতবস্ত্র ছিল কি লালবস্ত্র ছিল, তাহার হাতে বন্দুক ছিল কি পিস্তল ছিল, তাহা সঠিক বলিতে পারে নাই। তবে ১২।১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে কোন কথার কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাহাদের প্রদত্ত প্রমাণই হিলির অপরাধ সাব্যস্ত করিতে যথেষ্ট ছিল। তবে জুরীদের বিচার সম্বন্ধে নন্দকুমারের সময়ের ন্যায় একালেও সকলের আস্থা বড় কম ছিল। কসাইটোলার জুরীদের গুণ সম্বন্ধে বাঙ্গলার ছোটলাট ইডেন সাহেবও (Sir Ashley Eden) দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "অপরাধ করিয়া যদি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে Supreme Court-এর বিচারই মনোনীত করিও।"

হিন্দু পেট্রিয়ট খুব নির্ভীকভাবে লিখিয়াছিল—Dennis Hely the rioter, the arraigned murderer, the fugitive the prisoner is now again a gentleman.

যাহাহউক হিলি মুক্ত হইয়া বেঙ্গলী, হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ তখন বিদেশে ছিলেন। এই সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার পুত্র অতুল ঘোষ মহাশয়কে পত্রে লেখেন, "যদি মোকদ্দমা হয় তো খুব ভালই হইবে—"I would consider it good fortune for the "Bengalee" to be the means of confirming the guilt of a man who had providentially escaped Scot-free. Providence will not save him a second time.

যাহা হউক, Advocate General বাহাদুর দাঙ্গা ও ঘর জ্বালানির (Rioting and arson) এর চার্জ্জ গঠন না করাইয়া খুবই অন্যায় করিয়াছিলেন, কারণ হিলি যে সর্দ্দার ছিল, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল এবং স্ত্রীলোকদের নিয়া নৌকায় চলিয়া যায়, এই সম্বন্ধে সব সাক্ষীই প্রায় একরূপ বলিয়াছিল। জজসাহেবও বলিয়াছিলেন, "That there was a serious affray there can be no doubt."

হিলি মুক্তই হোক বা পালাইয়াই যাক, বঙ্কিমচন্দ্র দোষী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া যেরূপ বিচার বুদ্ধি, কৌশল ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, এ রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের অবতারণা সেই উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। আর এই মোকদ্দমার ঘটনা হইতেই (দাঙ্গা, গুলি নিক্ষেপ,

মশাল, নৌকায় পলায়ন) যে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর ডাকাতির সূত্র আর হিলিই যে দুর্বৃত্ত লরেন্স ফষ্টর, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই বিস্তৃত ঘটনায় পাঠককে পীড়িত করিতে সাহসী হইয়াছি।

হিলি যেমন ২৫শে নভেম্বর বিফল মনোরথ হইলেও "Now or Never" বলিয়া সেই রাত্রেই বহুসংখ্যক লাঠিয়াল লইয়া রহিমের বাড়ী সশস্ত্র হইয়া আক্রমণ করে, লরেন্স ফষ্টরও "Now or Never" সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্ব রাত্রেই সন্ধ্যার পরে শিবিকাবাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে।

চন্দ্রশেখরে ফষ্টরের আক্রমণের যে বিবরণ প্রকৃত পক্ষে হিলিরই তাহা পরিচয়—"গ্রামবাসীর চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনের ধ্বনি, মশালের আলো"—সবই হিলির আক্রমণেও ছিল।

চন্দ্রশেখরে যে বর্ণিত আছে—"ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন" ইত্যাদি ঘটনা "পরিদর্শকে" বিবৃত ঘটনারই অনুরূপ।

হিলির নিষ্ঠুরতার সহিত বলাৎকারেরও সংস্রব ছিল, কিন্তু ফষ্টর শৈবলিনীর কামরায় আসিতে অগ্রসর হইলে শৈবলিনী বলে, "যদি আমার ঘরে প্রবেশ কর, এ ছুরিতে হয় তুমি মরিবে, নয় আমি মরিব।" আর ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরাজ বশ হইয়াছিল।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে ফষ্টর সম্বন্ধে বঙ্কিমের বর্ণনা হিলিকে উপলক্ষ করিয়াই লিখিত—

"এ সময় যে সকল ইংরাজ বাঙ্গলায় ছিলেন, তাহারা দুইটি কার্য্যে মাত্র অক্ষম ছিলেন। তাহারা লোভ সম্বরণ করিতে অক্ষম আর পরাভব স্বীকার করিতে অক্ষম। তাহারা কখনও স্বীকার করিতেন না, একার্য্য পারিলাম না, নিরস্ত হওয়াই ভাল এবং তাহারা কখনও স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে অতএব অকর্ত্তব্য। যাহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা যায় নাই। লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক।"

যাহা হউক, হিলি যেমন নাম বদলাইয়া আসামের জঙ্গলে ঘুরিতেছিল, ফষ্টরও জন ষ্টালকার্ট নাম দিয়া "প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলাইতেছিল"।

চন্দ্রশেখরে আছে—আমীর হোসেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "লরেন্স ফষ্টর নামে একজন ইংরাজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টর উত্তর করে—"লরেন্স ফষ্টর? কৈ, না?"

আমীর হোসেন—কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন?

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—"নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ, কই? না।

হিলিও প্রথমে আপনার নাম ভাঁড়াইয়াছিল, পরে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দেয়। হিলিকে যেমন ওয়ারেণ্টে ধরা হয়, আমীর হোসেনও কুলসমের নিকটে লরেন্স ফষ্টরের পরিচয় পাইয়া সমরুকে বলে, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারের জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

ফষ্টরকে প্রহরীর সহায়তায় আমীর হোসেন বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। হিলিও প্রহরীর সহায়তায় আসাম হইতে খুলনা প্রেরিত হয়।

গ্রেপ্তার হইলে হিলি যখন বঙ্কিমের নিকট উপস্থিত হয়, সে বলে, "আমি নিজেকে হিলি বলিব না এবং নাও বলিব না।" এতদ্ভিন্ন আরও কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু ফষ্টরের শেষ কথায় কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে?

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিল যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিল, "এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব"—

"আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব—তুমি শত্রু হইয়া কেন আমার শিবিরে আসিয়াছিলে?

কষ্টর—আসিয়াছিলাম সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইবেন না।

নবাব—জানিলাম তুমি ভয়শূন্য—সত্য কথা বলিতে পারিবে?

ফ—ইংরেজ কখনও মিথ্যা বলে না।

ন—বটে? তবে দেখা যাউক।...

শৈবলিনী আনীতা হইল। কষ্টর প্রথমে শৈবলনীকে চিনিতে পারিলেন না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা মলিনা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাস পরিহিতা। রহিমের পরিবারস্থ রূপ যৌবন সম্পন্না ফলুগা বিবি এবং ভগী বিবিরও কম দুর্দ্দশা হয় নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাকে চেন?

ফ—চিনি।

ন—এ কে?

ফ—শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন—তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ—আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে, অনুমতি করুন, আমি উত্তর দিব না।

ন—আমার অভিপ্রায় কুক্কুর দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল, হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল, ভগবানকে এই প্রথম সে ডাকিল।

হিলিও এইরূপ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

পরে রামানন্দ স্বামী আশ্বাস প্রদান করিলে কষ্টর বলিতে লাগিল—

"আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে, সে আমার শত্রু। নৌকার প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতেই দুজনে মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য। আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শও করি নাই।"

শৈবলিনী ফষ্টরের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু রহিম-পত্নী নিরুপায়া ফলুগা বিবিকে নিঃসহায় অবস্থায়ই ধরিয়া লইয়া হিলি তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে দ্বিধা করে না। বঙ্কিম শাসিত হিলির নিষ্ঠুরতা কল্পনা করা যায় না, উহা বিবৃত করিবার ভাষাও অভিধানে নাই, তবে ফষ্টর হিলির ছায়াবলম্বনে চিত্রিত হইলেও বঙ্কিম-লেখনী তাহাকে খুব ভদ্রভাবে অঙ্কিত করিয়াছে।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপে মোরেল সাহেবদের বিস্তর ক্ষতি হইল। অত্যাচারী নীলকর মোরেলগণ মামলা মোকদ্দমা ও অপযশ দুর্নামে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইযা গেল। ঘোর পাপে মোরেলদের পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। তাঁহারা জমিদার দুর্গাচরণ লাহার নিকট সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

এই মোকদ্দমার ব্যাপারেই যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের যশ বৃদ্ধি হয় তা নয়, তিনি সুন্দরবন এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহেও জলদস্যুদের নিবারণ করিয়া অত্রাঞ্চলে বিশেষ শান্তিবিধান করেন। সুন্দরবন ও খুলনা অঞ্চল বরিশালের ন্যায় দস্যুপ্রধান স্থান ছিল এবং বঙ্কিম ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দৃঢ় পাহারা রাখিয়া কঠোর বিচারনীতি অবলম্বনে সমস্ত উপদ্রব দূর করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করেন। গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং এমন যে সিভিলিয়ান সাহেব সি, ই, বাকলাণ্ড, তিনিও তাঁহার "Bengal under Lieutanant Governors" নামক পুস্তিকায় বঙ্কিমের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

> While in charge of Khulna he helped very largely in suppressing river docoities and establishing peace and order in the eastern canals.
>
> [Bengal under Lieutanant Governors.
>
> —C. E. Buckland.

আরেকটি অত্যাচারী সাহেবের কথাও উল্লেখ করিব। খুলনার অপর দিকে ভৈরবনদের তীরে রেনি (Rainy) সাহেবের কুঠি বলিয়া এখনও একটী কুঠি আছে। ঐ স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে সাহেবের পুরাতন কুঠী অবস্থিত ছিল, কিন্তু তাহা এখন নদীগর্ভে। ঐ কুঠিতে Rainy সাহেবের নীলের কারবার ছিল আর সাহেব ভারী অত্যাচারী ছিল। ইহাকে দমন করাও বঙ্কিমের প্রধান কাজ হইয়াছিল।

এই সব প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য ১৮৬৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিম চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং তাহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি পায়।

ইহার পরেও এক বৎসরকাল বঙ্কিম খুলনায় ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে বারুইপুর মহকুমার সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তিনি বদলী হইয়া যান।

সাহিত্যিক

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক।

নামকরা সাহিত্যিক। প্রায় সব পত্রিকাতেই তার লেখা গল্প সমাদরে প্রকাশিত হয়। বাংলার পাঠক-পাঠিকারা তার গল্পের জন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তার লেখার আদর—খুবই। কিন্তু, লেখার জন্ত তার খ্যাতি যত বড়, তার সাংসারিক অস্বচ্ছলতাও ঠিক ততই বড়। একটা ছোট সদাগরী আফিসে ৬০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি চাকরী করে। লেখার খুব আদর ও চাহিদা থাকিলেও, তাহা হইতে তাহার মাসে ৩০।৪০৲ টাকার বেশী কখনই হয় না। সুতরাং সংসারে টানাটানি হওয়া ত স্বাভাবিক। কিন্তু রমেশ সাহিত্য রচনাতেই বিভোর, সংসারের অভাব-অনটন তাহাকে চঞ্চল বা চিন্তিত করিতে পারে না।

সংসারে পরিজন সংখ্যা মাত্র দুইজন; সে এবং তার স্ত্রী সবিতা। সুতরাং দুইটি প্রাণীর আহারের ব্যয় তেমন কিছু বেশী পড়ে না। ঘরের ভাড়া, জামা-কাপড়, চা-সিগারেট, ডাক্তার, ওষুধ, ট্রাম-বাসের ভাড়া, ধোবা-নাপিত, এখানে-সেখানে বেড়ানো, কিছু কিছু অনাবশ্যক সখের জিনিস কেনা প্রভৃতিতেই রমেশের স্বল্পার্জ্জিত অর্থ নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়া, প্রতিমাসেই কিছু কিছু দেনা হইয়া থাকে। মাহিনা পাইলেই, পূর্ব্বমাসের দেনা শোধ হইয়া যায়, কিন্তু আবার নূতন দেনা হিসাবের খাতায় নিয়মিত স্থানটা অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু রমেশের এজন্য কোন অস্থিরতা বা দুর্ভাবনা নাই। সে সাহিত্য-সাধনাতেই ডুবিয়া থাকে; সৃষ্টির আনন্দেই সে বিভোর। চিন্তা ও চাঞ্চল্য শুধু সবিতার। এই অবস্থায় একটি নূতন আগন্তুক, তাহার আগমন বার্ত্তা পাঠাইয়া তাহাকে অধিকতর চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সূত্রে তাহার অন্তরে আনন্দ ও নিরানন্দের দ্বন্দ্ব লাগে। শেষে নিরানন্দ ও দুশ্চিন্তাকেই সমস্ত স্থানটা ছাড়িয়া দিয়া পরাজিত আনন্দ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এই ভাবে দিন যায়।

সেদিন সকালে চা খাইয়া রমেশ লিখিতে বসিয়াছিল। স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইলেও রমেশ উঠিল না, এক মনে সে লিখিয়া যাইতেছিল, সবিতা কয়েকবার তাহাকে ডাকিতে আসিয়া বৃথাই ফিরিয়া গেল। অবশেষে, বেলা যখন প্রায় বারটা, তখন রমেশ তার গল্পটা শেষ করিয়া মহাতৃপ্তি এবং আনন্দের সঙ্গে সবিতার সামনে আসিয়া কহিল—"কালকের গল্পটা আজ শেষ কোরে ফেল্লুম। Grand, grand Sublime, grend গল্পটা যে কী সুন্দর হোল তা আর কি বোলবে তোমাকে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর finishing paraটা লিখলুম। কি Sublime, কী চমৎ...।"

কিন্তু যাহাকে বলা হইতেছিল, সে তখন ভাবিতেছিল —"কী দুর্ভাগ্যের ঘন মেঘ! কী অন্ধকার ভবিষ্যৎ।"

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রমেশ কহিল—"গল্পটা শুনবে একবার? পড়বো?"

"আজ তা হোলে তোমার আফিস…

"রেখে দাও তোমার আফিস। কী চমৎকার উৎরে গেল যে গল্পটা! দুপুর বেলা তোমায় পোড়ে শোনাব, সব।"

"কিন্তু ঘন-ঘন এই রকম আফিস-কামাই"…কথাটা রমেশের কানেই গেল না। লেখা খাতাখানা হাতে করিয়া সে শোবার ঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"এইবার নাইতে হবে, খেতে হবে, কি বল? বেলা কত হল?" বলিয়া আনন্দ-পদক্ষেপে পুনরায় ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

সবিতা আর কোন কথা বলিল না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

পরের দিন আফিসে গেলে, বড় বাবু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখুন রমেশবাবু, এত কামাই করলে চলবে না। আমি সাহেবের কাছে কি বলি বলুন ত?"

রমেশ আমৃতা-আমৃতা করিয়া কহিল—"কাল একটা গল্প শেষ করতে বেলা হোয়ে গেল। শেষটা যদি একটানা শেষ না করতুম, তা হোলে লেখাটা যেরকম সুন্দর উৎরে গেছে, ঠিক ও রকমটি হোত না। সেই জন্যে…

"কিন্তু, যে জন্যেই হোক, ওরা সাহেব-সুবো লোক, ওরা আপনার লেখা বুঝবেওনা, তার ধারও ধারে না। তা একটা কাজ করলেই ত পারেন। লেখায় যদি আপনার ভালো রকম আয় থাকে, ত চাকরি না-হয় না-ই করলেন। তাতে আপনি লেখার জন্যে প্রচুর সময় পেতে পারবেন।"

"কিন্তু জানেন ত, আমাদের দেশে লেখাতে কি রকম টাকা পাওয়া যায়। লেখাটা ঠিক টাকা পাবার জন্যে নয়। অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সাহিত্য রচনার কোন সংস্রবই নেই।"

"তাই যদি হয়, তা হোলে লেখা-টেখা ছেড়ে দিন; পেটটা চালাতে হবে ত?"

"পেটের জন্যে লেখা ছাড়ব!"

"না খেয়ে ত লেখা চলবে না। লিখতে হোলে বাঁচতে হবে; বাঁচতে হোলে দুটি খেতেও হবে। খেতে হোলে পয়সা উপার্জ্জন চাই।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বাবু কহিতে লাগিলেন—"যাই হোক, আপনার মন-খন কামাইয়ের জন্যে সাহেব আপনার ওপর খুবই বিরক্ত। আপনার ওপর সাহেবের অসন্তোষের মাত্রা যতদূর বাড়বার বেড়েচে। আপনার ভালোর জন্যেই বলচি, রমেশবাবু; খুব সতর্ক হোয়ে আপনি কাজ করবেন।"

গত কালের লেখা গল্পটা খুব ভালো হওয়াতে, যে পরিমাণ আনন্দে তাহার মন ভরা ছিল, আজ বড়বাবুর এই সব কথায়, সেই আনন্দের পনর আনা তিন পাই, তাহার অন্তর হইতে উধাও হইয়া নিরানন্দের বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া গেল। সে বিমর্ষচিত্তে তাহার চেয়ার খানাতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

ছুই

বেলা নয়টা বাজিয়া যায়; কয়েক মিনিট মাত্র বাকী। রমেশের স্নান করিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু উঠিতে পারিতেছে না। একটা কবিতা সে এইমাত্র শেষ করিয়াছে। তাহারই ভাব-মাধুর্য্যের মধ্যে সে নিমগ্ন। দুই চারিটা—'মিল' ঠিক তাহার মনোমত হয় নাই; সেই মিলের কথাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত ভাল মিলের জন্য সে একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিল, তাই উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছিল না। যদিও সবিতা দুইবার তাহাকে স্নানের জন্য তাগাদা দিয়া গিয়াছে।

অবশেষে কাঁদ, চাঁদ,' 'অবসাদ,' 'প্রতিবাদ,' 'একাকী,' 'ফাঁকি' প্রভৃতি কথাগুলো তাহার ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাঁধাইল, তখন রাত্রের জন্য ঐ মিল গুলিকে মুলতুবি রাখিয়া খাতাখানা বন্ধ করিতেই বাহির হইতে একটি ষোল-সতের বছরের কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"আপনাকে একটু জ্বালাতন করতে এলুম; আমি বালীগঞ্জ প্রেস থেকে আসচি।"

"বলুন। কি দরকার আপনার?"

মেয়েটির হাতে সুন্দর চাকচিক্যময় একখানা বাঁধানো খাতা ছিল, কহিল, "আমার autographয়ে বড্ড সখ। তাই আপনার কাছে এসেছি…

"অটোগ্রাফ নেবার জন্যে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। দয়া কোরে একটু 'বাণী' আর তার সঙ্গে আপনার নাম সইটা…" বলিয়া মেয়েটি তাহার অটোগ্রাফের খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

মেয়েটি কহিল—"এ মাসের 'বাঁশরী'তে আপনার গল্পটা পড়লুম। কি চমৎকার যে আমার লাগলো, তা আর বলবার নয়।" আনন্দ-বিস্ফারিত চোখে মেয়েটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া রমেশ কহিল—"খুব ভাল লেগেছে আপনার?"

"আপনার সব গল্পই আমার যে কি ভালো লাগে! আমার দাদা আপনার গল্প পড়বার জন্যে পাগল!"

এই সময়ে সবিতা আর একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া গেল। রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। মেয়েটির সঙ্গে

বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা কহিল। তারপর মেয়েটি যাইবার জন্ত যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন রমেশ তাহার হাত ঘড়িটার উপর চোখ দিতেই চোখ দুইটা তাহার কপালে উঠিয়া গেল। বেলা তখন সওয়া দশটা। স্নান না করিয়া, নাকে-মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া ছুটিলেও, আফিসে পৌঁছিতে তাহার সাড়ে এগারটা হইবে। অত বেলায় আফিসে যাওয়া-না যাওয়া সমান; সুতরাং......

সুতরাং তাহার আফিস যাওয়া হইল না...

পরের দিন আফিসে গেলে, কেহই তাহাকে কিছু বলিল না, শুধু বড় সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া এইটুকু মাত্র বলিলেন—This is the 2nd warning and be careful for the 3rd!"

কিন্তু তখনো রমেশের মাথার মধ্যে—'একাকী', 'ফাঁকি', 'অবসাদ' 'প্রতিবাদ' প্রভৃতি মিলগুলা তাল-গোল পাকাইতেছিল এবং কবিতার কাগজখানা তাহার পকেটের মধ্যে থাকিয়া হাঁকাইয়া উঠিতেছিল।

সেই সপ্তাহের একখানা কাগজেই রমেশের লেখা কোন-একটা গল্পের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লেখা হইয়াছে—'এ রকম সুন্দর গল্প, একমাত্র রমেশবাবুর দ্বারাই সম্ভব। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, জগতের সাহিত্যে রমেশবাবুর দান অতুলনীয়।... * *।' ইহা পাঠ করিয়া গর্ব্বে ও আনন্দে রমেশের মন ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার এই দেশ-জোড়া যশ, এই সর্ব্বজন প্রসারিত খ্যাতির কাছে, তাহার চাকরী, আফিস, অর্থোপার্জ্জন, বাড়ী, ঘর, সংসার সব-কিছুই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল। সেদিন আফিসের কাজে-কর্ম্মে তাহার অযথা বিলম্ব এবং ভুল হইতে লাগিল। কোন রকমে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া সে উৎসাহিত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিল ও সবিতাকে চায়ের জন্ত বলিয়া কবিতার কাগজখানা খুলিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর, চা খাইতে খাইতে, রমেশ যে-ভদ্রলোকটির কথা মনে মনে ভাবিতেছিল, এবং যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় মাঝে মাঝে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছু পরে তিনি খুব জোরে জুতার শব্দ করিয়া এবং ততোধিক জোর শব্দে দরজাটা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমেশকে চা খাইতে দেখিয়া কহিলেন—"দাদা, বউদিকে আর এক কাপের জন্তে বলে আসুন, সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্লান্ত হোয়ে পড়েছি।"

এই যুবকটি রমেশকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং কিসে রমেশের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হয়, সর্ব্বদাই সেজন্ত চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহার টানাটানির সংসারের প্রকৃত খবর, বাহিরের কেহ একটা বড় জানিত না, শুধু জানিত এই হরনাথ। হরনাথের উপর রমেশেরও খুব প্রীতি; সে জানিত যে, একমাত্র হরনাথই তাহার প্রকৃত বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সে তাহাকে আপন কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া মনে করিত এবং সেইরূপ ভালবাসিত। তাহার দুইখানি গল্পের বই হরনাথই ছাপাইয়াছে। সে দুইখানা বই বাজারে প্রায় সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আর একখানা নতুন বই হরনাথ ছাপাইতে চায়। আজ সেই বিষয়ে কথা কহিতেই হরনাথ আসিয়াছে। সবিতা কিন্তু হরনাথের উপর মোটেই সন্তুষ্ট নয়; কারণ—আগেকার বই দুইখানার জন্ত হরনাথ একটি পয়সাও রমেশকে দেয় নাই। অন্ত কোন প্রকাশককে দিলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাইত, এবং তাহাদের টানাটানির সংসারে তদ্বারা অনেক উপকার হইত। কিন্তু রমেশ সবিতাকে বুঝাইত যে, জগতে পয়সা অপেক্ষা প্রীতির মূল্যই বেশী। তাহার প্রতি হরনাথের প্রগাঢ় ভালবাসাটা সে ভালভাবেই বুঝিত। সে জানিত, অসময়ে হরনাথ নিশ্চয় তাহাকে দেখিবে। তাহার অদিনে হরনাথ তাহাকে না দেখিয়া পারিবে না। হয়ত সবিতা হরনাথকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। রমেশকে কিন্তু হরনাথ প্রায়ই বলিয়া থাকে—"দাদা, আপনার জন্তে আমি আছি এবং থাকবো। ভগবান না করুন, যদি কখনো আপনার খুব বেশী অসময় পড়ে, তখন আপনার পাশে থাকবো—শুধু আমি। এটা নিশ্চয় জানবেন যে, বউদির পর, আমিই আপনাকে ভাল-বাসি।" এত বড় কথা রমেশকে কেহ কখনো বলে নাই। কিন্তু সে এ কথাটাও বুঝিতে পারিল না যে, এর চেয়ে অসময় তাহার আর কি হইবে। যাহা হউক, এই নতুন গল্পের বইখানা অন্ত কোথাও দিলে হয়ত দুই-চারি 'শ টাকা এই দুর্দ্দিনে রমেশ পাইতে পারিত, কিন্তু

তাহা না দিয়া, সে তাহার এই প্রীতিভাজন, পরমাত্মীয়বৎ বন্ধুটিকেই দেওয়া স্থির করিল।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল নানা কথা ও আলোচনায় কাটাইয়া, হরনাথ যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বাহির হইতে তিনজন আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও নমস্কার জানাইয়া কহিল—"রমেশবাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। অনেক খুঁজে তবে বাসার সন্ধান কোরে এসেছি।"

হরনাথ রমেশকে দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ইনিই রমেশবাবু, বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং কবি। আপনারা আসছেন কোথা থেকে?"

"আমরা বর্দ্ধমান থেকে আসছি।"

অপর একজন কহিল—"আমরা একটা ভিক্ষাপ্রার্থী হোয়ে আপনার শরণাগত।"

রমেশ কহিল—"কি বলুন?"

"আসচে রবিবার আমাদের ওখানে একটা সাহিত্য সভা হবে। সেই সভায় আপনাকে আমরা সভাপতি নির্ব্বাচিত করেছি।...আপনি সম্মতি দিয়ে আমাদের... আপনি বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল। আপনার মত লোকের কাছে আসতে আমাদের সাহসে কুলোয় না, দুঃসাহসের সঙ্গেই আজ আমরা আপনার দ্বারস্থ হোয়েচি।"

হরনাথ মনে মনে ভাবিল, এঁরাও ত দেখচি, সাহিত্যের এক-একজন কম দিকপাল নয়। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসিল। রমেশকে কানে কানে কি বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দশ-বারোর মধ্যে, শালপাতার ঠোঙ্গা করিয়া কি আনিয়া, গোপনে রমেশের হাতে দিল; রমেশ তাহা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অতঃপর প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া সকলের মধ্যে অনেক কথা ও আলোচনা হইয়া ইহাই স্থির হইল যে, আগামী রবিবার বেলা একটার মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে কেহ আসিয়া রমেশকে লইয়া যাইবে। তাঁহার বিদায় লইবার আগে; রমেশ তাঁহাদের চা ও মিষ্টিমুখ করাইয়া আপ্যায়িত করিল। বলা বাহুল্য যে, হরনাথও তাহার কিছু অংশীদার হইল, এবং ইহাও বলা অ-বাহুল্য নয় যে, আপ্যায়নের পয়সাটা তাকেই পকেট হইতে বাহির করিতে হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের মত একটা বড় জায়গায় এবং বড় সভায় সভাপতিত্ব করিবার গর্ব্বে ও আনন্দে রমেশের বুকখানা নাচিয়া উঠিল। অত্যন্ত উৎসাহিত মনে গণিয়া দেখিল, রবিবারের আর মাত্র তিনটা দিন বাকী আছে। সে আনন্দ কল্পনায় মগ্ন হইয়া পড়িল—'বর্দ্ধমান সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সভা-মণ্ডপ; অসংখ্য জন-সমাবেশ; সমস্ত সভাস্থল দেবদারুপাতায় ও নানাবিধ পুষ্প-পতাকায় পরিপাটিরূপে সজ্জিত; মনোমুগ্ধকর তোরণ। সুসজ্জিত মঞ্চোপরি সভাপতির গৌরবাসনে সে উপবিষ্ট। সকলের আকাঙ্ক্ষিত প্রসন্ন দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত। তাহার সরল, সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা; চারিদিক হইতে প্রশংসাসূচক করতালি। বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিকে দেখিবার জন্ত সকলের ভীড় ঠেলাঠেলি......

"রাত দশটা বেজে গেল যে! খাবে কখন?"

রমেশের রঙীন স্বপ্ন সবিতার ডাকে ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভিতরে যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিন

"আমার ক্ষমতার বাইরে, রমেশবাবু। আপনি সাহেবের কাছে গিয়ে একবার বরং চেষ্টা কোরে দেখুন, যদি তাকে নরম করতে পারেন।"

"মনে করুন, যদি আমার কোন অসুখই করতো, তা হোলে ত আর আসতে পারতুম না।"

"সাহেবকে গিয়ে তাই বলুন। ...তবে, যা বুঝচি, সাহেব আপনাকে আর কিছুতেই রাখবে না।"

আফিসের বড়বাবু আর রমেশের মধ্যে কথা হইতেছিল। আজ মঙ্গলবার। রবিবার বর্দ্ধমানের সভা ভাঙ্গিতে রাত দশটা হয়। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে রাত প্রায় একটা হইয়া যায়। রমেশ ভাবিয়াছিল, সোমবার ফার্ষ্ট ট্রেণে আসিয়া সরাসরি আফিস করিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সকালের দিকের ট্রেণে সে আসিতে পারে নাই। তিনটার গাড়ীতে উঠিয়া রমেশ

সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আসে। আফিসের সাহেব পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপর খাপ্পা হইয়াছিল; সে অবস্থায় এত শীঘ্র আবার তাহার কামাই হওয়াতে, সাহেব তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছে এবং "ডিস্‌মিস্‌-অর্ডার" লিখিয়া বড়বাবুকে উহা পাঠাইয়া দিয়াছে।

বড়বাবু 'অর্ডার'খানার দিকে দেখাইয়া কহিলেন—"ওখানা তুলে নিন; একবার সাহেবের কাছে গিয়ে একটু ··"

"না—যাবো না। চাকরী আর না করাই ভাল।" বলিয়া রমেশ একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাগজখানা টেবিলের ওপর হইতে তুলিয়া লইল এবং মুঠার মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে ধীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ তাহার মনের একদিকটায়, গাঢ় জমাট-বাঁধা অন্ধকার স্তরের পর স্তর চাপিয়া বসিতে লাগিল, অপর দিকটায় তাহার চিরকালের মনের অস্বস্তি ও অসন্তোষ যেন হু হু করিয়া হাল্কা হইতে সুরু করিল। এই দুইয়ের মাঝখানে, হাজার রকমের চিন্তা তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া ঘা দিতে লাগিল। সেই সব ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, সন্ধ্যার পর সে যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—সবিতা ভাতের হাড়ী নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। উনানের আঁচ শুধু শুধুই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সামনে তরকারীর খালি চ্যাঙারিটা দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, অফিসের ফেরত তাহার বাজার করিয়া আনিবার কথা ছিল। কিন্তু সে কথা তাহার একেবারেই মনে ছিল না; সাহেবের ডিস্‌মিস্‌ অর্ডারের এক টুকরা কাগজ তাহাকে সব কথাই ভুলাইয়া দিয়াছিল।

বাজারের থলিটা হাতে লইয়া সে তখনই আবার বাহির হইয়া গেল।

চার

রমেশের চাকুরী যাইবার পর, পৃথিবী সূর্য্যকে পুরা এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে। সে তখন ভাবিয়াছিল, চাকুরী গিয়া তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে। এখন হইতে সে প্রচুর সময় পাইবে এবং পূর্ব্বের চেয়ে বেশী লিখিতে পারিবে। কিন্তু ফলে হইয়াছিল বিপরীত। সারা সকালটা এখানে-ওখানে গিয়া গল্পগুজব করিতেই কাটিয়া যায়; তারপর দুপুরে ভাত খাওয়ার পর বেশ একটু আলস্য আসে, সুতরাং শুইয়া পড়ে। বেশ একটা ঘুম দিয়া বৈকালে যখন সে ওঠে, তখন শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করে, কোন-কিছু লিখবার মত মন তখন তাহার থাকে না। তারপর সন্ধ্যা হইলে আবশ্যক বা অনাবশ্যক কাজে একবার তাহাকে বাহির হইতে হয়। যেদিন ঘরে থাকে, সেদিন কাগজ কলম লইয়া বসে এবং সেগুলি সামনে রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু এ চিন্তা গল্পের প্লটের জন্ত চিন্তা নয় বা চরিত্র চিত্রণের চিন্তা নয়, কিংবা কবিতার ছন্দ বা মিলের জন্তও চিন্তা নয়; এ চিন্তা—টাকার, ভাতের, কাপড়ের, স্ত্রীর অসুখের ডাক্তার ঔষধ পথ্যের, নবজাত শিশুটির দুধের এবং ইত্যাদি অনেক কিছুর চিন্তা।

মাস ছয় হইল রমেশের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। প্রসবের পর হইতে সবিতা অসুস্থ। যেরূপ পথ্য ও পরিচর্য্যা প্রসবের পর সাধারণতঃ আবশ্যক হয়, অর্থাভাবে তাহার কিছুই হয় নাই। সে জন্ত রোগ রুগীকে বেশ ভাল ভাবেই পাইয়া বসিয়াছে। সবিতা দিন-দিনই নীরবে একটির পর একটি করিয়া পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়া চলিয়াছে। রমেশও ইহা বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝিয়া কোন ফল নাই। প্রতিকার করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সে কখনো ভগবানকে ডাকে নাই; আজকাল সে তাহার কাতর নিবেদন ঐকান্তিক মনে ভগবানকে জানায়। এ ছাড়া তাহার আর উপায় নাই।

একদিন সে হরনাথকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে দিল। সে মনে জানে, এই অসময়ে হরনাথই তাহার একমাত্র বন্ধু; হরনাথ তাহার এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে সে নিশ্চয়ই তাহার সাহায্যের হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিবে। একদিন সে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, তাহার চেয়ে বড় কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বলে নাই। সে যে বলিয়াছিল—'দাদা, বউদির পরে আমিই আপনাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি'—এরকম কথা

রমেশ আর কাহারো মুখ হইতে শুনে নাই। সবিতা প্রায়ই বলে—'তুমি হরনাথকে সব অবস্থা খুলে জানাও; চুপ করে থাকলে ত কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।' এই সমস্ত কথা ভাবিয়া রমেশ হরনাথকে তাহার দুরবস্থার কথা জানাইয়া লিখিল—'আমি অর্থাভাবে চরম দুর্দ্দশায় পতিত, এমন কি কোন কোন দিন দুবেলা আহার জোটে না। তোমার বৌদি প্রসবের পর থেকেই অসুস্থ এবং শয্যাগত। বিনা চিকিৎসায় সে মরিতে বসিয়াছে। এ সব কথা ত বাইরে অন্য কাকেও বলা চলে না। তুমি অতি সত্বর আমায় কিছু সাহায্য করিবে। অন্ততঃপক্ষে এ সময় তুমি তোমার সাধ্যমত কিছু আমায় ঋণস্বরূপ দিলেও হয়ত তোমার বৌদিকে সারাইয়া তুলিতে পারিব। পরে ভগবান দয়া করিলে তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করিব।'

রমেশ প্রত্যহই হরনাথের আশায় থাকে; কিন্তু হরনাথ আসিল না। দিন আটেক পরে হরনাথের বদলে হরনাথের একখানা চিঠি আসিল। চিঠিতে লিখিয়াছে—'আপনার অবস্থার কথা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমি দু একদিনের মধ্যেই আপনার সহিত দেখা করিব।'

কিন্তু পনের দিন কাটিয়া গেল, তবুও হরনাথ আসিল না। রমেশ পুনরায় তাহাকে চিঠি দিল। এবার চিঠির আর জবাবই আসিল না। রমেশ দুঃখের সহিত বিস্মিত হইল। হরনাথের উপর তাহার কথার উপর রমেশের খুবই আশা ও নির্ভরতা ছিল; কিন্তু…কিন্তু… রমেশ আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কোন নিষ্পত্তিতে সে আসিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতরটায় কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। তাহার চিরকালের সুন্দর পৃথিবীটা যেন কুৎসিৎ এবং কঠিন আকারে তাহার চোখের সামনে আসিয়া তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

পাঁচ

"আজ তুমি কেমন আছ, সোনু?"

"ভাল আছি; আমার জন্যে ভাববার কোন দরকার নেই।"

"পেটের ব্যথাটা?"

ম্লান হাসিয়া সবিতা কহিল—"ওর সঙ্গে আমার ভালবাসার বাঁধনটা ত দিন দিন শক্ত হচ্চে। ওকে নিয়েই ত আমি যাব।"

রমেশের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সবিতা কহিল—"তুমি আজ একবার সত্যবাবুর কাছে যাও। হরনাথের আশা আর কোরো না। চিরকাল সত্যবাবুর কাগজে তুমি লিখে আসচ; তাঁকে আমাদের দুরবস্থার কথা জানালে, আমার বিশ্বাস—তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবেনই। দু'একশো টাকা ধার, আমার মনে হয় তিনি ঠিকই দেবেন।"

"তাই যাবো আজ।" রমেশের বিমর্ষ চিত্ত চিন্তা-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যেন কুল খুঁজিতে লাগিল।

সবিতা কহিল—"আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না; আমি শীগ্‌গীরই সেরে উঠবো। আজ তুমি সব কাজ ফেলে একবার সত্যবাবুর কাছে যাও।"

রমেশের বলিবার আর কিছুই ছিল না; একটা বিড়ি ধরাইয়া সে টানিতে লাগিল। এই সময়ে বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রমেশ আসিয়া দরজা খুলিতেই একটি অপরিচিত লোক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কহিল—"হরনাথবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রীর বড্ড অসুখ, সেই জন্যে তিনি আসতে পাচ্ছেন না; একটু সারলেই আপনার সঙ্গে এসে দেখা করবেন।"

রমেশের কিছু বলিবার নাই বুঝিতে পারিয়া, লোকটি চলিয়া গেল। রমেশ সারাদিন ধরিয়া হাজার রকমের চিন্তা করিবার পর, অপরাহ্ণের দিকে সত্যবাবুর কাছে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। সত্যবাবুর কাছে কি করিয়া, কোন্ সূত্রে সে তাহার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিবে, বাস্‌'য়ে বসিয়া সারা পথটা সে সেই চিন্তাই করিতে লাগিল:—'সংসারের হীনাবস্থার কথা সত্য-বাবুকে কখনো বলিনি; এখন না বোলে আর উপায় নেই। আমার লেখার শতকরা নিরানব্বই ভাগ অংশ ওর কাগজেই লিখেছি। ওঁর যদি মানুষের প্রাণ থাকে, এ সময় আমাকে দেখা ওঁর একটা প্রধান কর্ত্তব্য কিন্তু …বড়ই ব্যবসাদার লোক। আমার যদি কোন উপায়

থাকতো, তাহোলে ওঁর কাছে আমার সংসারের গোপনীয় অবস্থার কথা গোপনেই রাখতুম। ভগবান লেখার শক্তি দিলেন—যত বড়, ঠিক তত বড়ই দিলেন—দারিদ্র্য। এ রহস্য কিছুই বোঝা যায় না।...মুখ ফুটে হীনতা প্রকাশ করতে কিরকমটা যেন হয়। সোবুর অসুখটাতেই আমাকে—

'বাস'য়ের কনডক্টর কিড়িং করিয়া ঘণ্টা দিয়াই হাঁকিয়া উঠিল—"জেনানা হ্যায়, একদম ঠারিয়ে।"

"মশাই, বিঁড়ির আগুনটা একটু সাবধান।"

—সোবুর অসুখটাতেই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। অন্ততঃ শ'খানেক টাকা যদি সত্যবাবুর কাছ থেকে পাই, তাহোলে ভালো কোরে একবার চিকিৎসাটা—নাঃ, লজ্জা করলে চলবে না, যেমন কোরেই হোক মুখ ফুটে আজ টাকার কথাটা বলতেই হবে, নইলে—।' এই সময়ে তাহার বিধাতাপুরুষ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে, বাস্‌খানা চৌরাস্তার মোড়ে আসিয়া থামিলেই রমেশ নামিয়া পড়িল ও 'বাণী' পত্রিকার অফিসের দিকে অগ্রসর হইল।

সত্যবাবুকে রমেশ যাহা বলিবে এবং যে-পথে বলিবে, কোন্ কথাটা আগে ও কোন্ কথাটা পরে—সমস্তই মনের মধ্যে রমেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল। একদিকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে তাহার মান-মর্য্যাদা, অপরদিকে তাহার নিদারুণ দৈন্য, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি ভাবে তাহাকে কথা কহিতে হইবে, সে সম্বন্ধে রমেশ খুব সচেতন হইয়াই রহিয়াছিল।

সত্যবাবু তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষে একাকী বসিয়াছিলেন। রমেশ ঘরে ঢুকিতেই, অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সত্যবাবু তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন —"আপনি ভাগ্যবান লেখক রমেশবাবু।"

রমেশ তাহার বক্তব্য আর একবার মনে মনে 'রিহার্সাল' দিয়া লইয়া, মৃদু-মধুর হাসির সহিত কহিল—"আপনারেরই দয়া সেটা!"

"সত্যিই আপনি ভাগ্যবান। আপনাকে এক বিরাট অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব হোচ্ছে কোলকাতার অধিবাসীদের তরফ থেকে। আমি আজই জানতে পারলুম, ভেতরকার একজন বড় মাতব্বরের কাছ থেকে। অবশ্য, শীগ্‌গীরই তাঁরা আপনার কাছে যাবেন। সুখবর সর্ব্বপ্রথম বোবার লোভটা আমি সামলাতে পারলুম না।"

রমেশের সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল। গর্ব্ব, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, সব এক সঙ্গে তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইয়া উঠিল। বিভ্রান্তের মত সে কোনও মতে সামনের চেয়ারখানা টানিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। যাহা সে বলিবার জন্য গিয়াছিল, সে কথা আর তাহার বলা হইল না। সারা কলিকাতার অধিবাসীরা মিলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিবে। সত্যই ত সে ভাগ্যবান। তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; তাহার সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, দুশ্চিন্তা সেই আনন্দ-নৃত্যের তালে ডুবিয়া গেল। সত্যবাবুর সমাদরে প্রদত্ত জলখাবার, চা, পান, সিগারেট ইত্যাদি উপভোগ করিয়া রমেশ উৎফুল্ল অন্তরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

বিধাতাপুরুষ তাঁহার আগেকার হাসির সূত্র ধরিয়া এই সময় আর একবার হাসিলেন।

ছয়

"কেন তুমি অত ভাবচো, আমি সেরে উঠব।"

"ভগবানের কাছে আমি কত বড় অপরাধে অপরাধী হোয়ে থাকলুম, আমি তোমার উচিত মত চিকিৎসা করাতে পারলুম না, সোবু।

"আমি মরবো না গো, মরবো না। দেখো, আমি যা বলচি ঠিক তাই হবে; আমার খোকন-সোনাকে ফেলে রেখে আমি কি মরতে পারি কখন। না খোকন মণি?" —সবিতা একটু কাত্ হইয়া খোকার তুল-তুলে গালের উপর তাহার নিরক্ত ঠোঁট রাখিয়া চুমা খাইল। রমেশ কহিল—"রাত্রে তোমার শরীরটা হঠাৎ ও রকম হোল কেন? আমার বড্ড ভয় হচ্চে সোবু, তুমি কি আমায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে?"

"ওগো, না—না। সমস্ত কোলকাতার লোক মিলে ক'দিন পরে তোমায় অভিনন্দন দেবে, হাজার টাকার তোড়া তোমায় তাঁরা উপহার দেবে। আমার চিরকালের

দুঃখু এইবার ঘুচবে; এ সময় কি আমি মরতে পারি— ?”

একটানা এতগুলা কথা বলিয়াই সবিতা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া পাছে রমেশ ভাবিত হয়, সেজন্য খুব ধীরে ধীরে কহিল—“বড্ড ঘুম পাচ্ছে।”—বলিয়া তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া, এই ক্লান্তিটুকু দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কাল রাত্রে সবিতার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়ে। আজ সারা সকালটা রমেশ তাহার কাছ-ছাড়া হইতে পারে নাই। গতমাসে রমেশ তাহার বিয়ের আংটিটা বিক্রী করিয়া সবিতার ওষুধের দাম দিবার সঙ্গে, খুব আশা করিয়া খোকার নামে একখানা 'রেস্কোর্সের টিকিট' কিনিয়াছিল। আজ কালই ড্রয়িংয়ের ফলাফল বাহির হইবার কথা। রমেশ কয়দিনই দুইবেলা গিয়া খবর জানিয়া আসে; আজ আর যাইতে পারে নাই। কাশীর মা তোলা-ঝিয়ের কাজ করে। সে আসিলে, তাহাকে সবিতার কাছে রাখিয়া সে একবার খবর জানিয়া আসিবে। যদি একটা প্রাইজ সে পায়, তবে তাহার জীবনের ধারা নতুন পথে প্রবাহিত হয়। তার উপর, অভিনন্দনের সঙ্গে হাজার টাকার তোড়া পাওয়া যাইবে। এতদিনের পর ভগবান মুখ তুলিয়া যদি বা চাইলেন, কিন্তু…কিন্তু…। রমেশ আর ভাবিতে পারে না। ভাবনার চাপে তাহার সমস্ত আশা উৎসাহ ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহার চারিপাশের অন্ধকারকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া তুলিতে লাগিল। সকাল হইতে সে চা খাইতে পায় নাই। এখন একবার উঠিয়া চা খাইবার যোগাড় করিতে গেল। অনেক কষ্টে কাগজ জ্বালাইয়া জল গরম করিল। তারপর কোন রকমে এক কাপ চা তৈরী করিয়া খাইয়া, আবার সবিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সবিতা এতক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল; কহিল—“চা তৈরী কোরে খেলে ? বড্ড তোমার কষ্ট হচ্চে। আমি হতভাগী এমন পড়লুম যে আর ……হ্যাঁ গা, লটারীর কি হোল, আজ আর জানতে গেলে না ?”

“কাশীর মা এলেই, তাকে তোমার কাছে বসিয়ে আমি যাব।”

“যাও—যাও; দেখো—এবার ঠিক উঠবে। হ্যাঁ গা তোমার অভিনন্দন কবে হবে ?”

“আসচে রোববার। মাঝে আর চারটে দিন। কথা কইতে তুমি হাঁপিয়ে যাচ্চ,—সোবু; বেশী কথা তুমি কয়ো না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।”

এই সময় কাশীর মা আসিয়া পড়ায়, রমেশ তাহাকে সবিতার কাছে বসিতে বলিয়া, রেস্কোর্সের খবর জানিতে বাহির হইয়া গেল।

সাত

রবিবার।

রমেশের অভিনন্দনের দিন আজ।

বাংলার সমস্ত দৈনিক পত্রে আজ বড় বড় অক্ষরযুক্ত 'হেডিং'য়ে বাহির হইয়াছে—'বাংলার লোকপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমেশ রায়কে কলিকাতাবাসীর সাদর ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।'

'সুভাষ ইনষ্টিটিউটে'র বিস্তৃত হল নানাবিধ পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুন্দরভাবে সজ্জিত-করা হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তা-গণের কর্ম্ম-চঞ্চল চলা-ফেরা ও পরিদর্শন কোলাহলে সমস্ত স্থানটা মুখরিত। সকাল হইতেই পল্লীতে পল্লীতে এই বিষয়েই আজ আলোচনা চলিতেছে। সাহিত্যিক অ-সাহিত্যিক, সাহিত্য রসিক, সাহিত্যিক নামে পরিচিত সাহিত্য-ব্যবসায়ী, কবি, নাট্যকার, প্রকাশক প্রভৃতি সকলেরই মুখে আজিকার এই অভিনন্দন-উৎসবের কথা আলোচিত হইতেছে।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে যে ঠিক বেলা পাঁচটায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ঠিক বেলা তিনটায় রমেশকে লইয়া যাইবার জন্য ট্যাক্সি লইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের দুই একজন তাহার বাসায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

রমেশের ছোট ক্লক-ঘড়িটায় ঠং করিয়া আড়াইটার ঘণ্টা বাজিতে, কাশীর মা ঝি সদর দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে একবার দেখিয়া গেল। ইহারই মিনিট বিশ-পঁচিশ পরে, হর্ণ দিতে দিতে একখানা ট্যাক্সি রমেশের বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও সঙ্গে সঙ্গে দরজার কড়া-নাড়ার শব্দ হইতে লাগিল।

খিল খুলিয়া কাশীর মা আসিয়া দাড়াইতেই, একজন যুবক ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"রমেশবাবু?"

"তিনি নেই।"

"বাসায় নেই? কোথায়?"

"শ্মশানে।"

আগন্তুকদ্বয় হতভম্বের মত হইয়া গেলেন। কাশীর মা কহিল—"ভোরবেলায় তেনার 'ইস্তিরী' মারা গেছে; তাই..."

"তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন! ভোর বেলায়?"

আর কোন কথা কাহারো মুখ হইতে বাহির হইল না; নিস্পন্দের মত সকলে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে না লইয়াই তাহাদের ফিরিতে হইল। শূন্য ট্যাক্সি শূন্যতা লইয়াই চলিয়া গেল। বসন্তে বর্ষা দেখা দিল। মালার সূতা ছিঁড়িয়া গেল। পূর্ণিমাকে অমাবস্যা আসিয়া গ্রাস করিল। যে জনস্রোত 'সুভাষ ইনস্টিটিউটে' আসিতেছিল, মোড় ঘুরিয়া সেই স্রোত কেওড়াতলা'র দিকে প্রবাহিত হইল।

কেওড়াতলার শ্মশানে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া জমিতে লাগিল। 'বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের অভিনন্দন' আজ হইল ঠিকই, তবে অভিনন্দন-স্থানের কিছু বদল ঘটিল। সুভাষ ইনষ্টিটিউটের বদলে তাহা হইল—কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে।

সকলে দেখিল, অদূরের একটি বৃক্ষতলে রমেশ নিস্পন্দ দেহে, স্থির দৃষ্টিতে চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে; তাহার সেই প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি, চিতার শেষ অগ্নিধূমের সহিত মিলিয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গের পথে গমন করিতেছে।

●

আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের না, নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ।

—শরৎচন্দ্র

আঁদ্রে জিদ্

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ণার্ড শ', সিনক্লেয়ার লুইস ও বাঙলা দেশের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্প দিনের ব্যবধানে লোকান্তরিত হওয়ায় সাহিত্য জগতের বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে গেল এবং সাহিত্যরস-পিপাসু জনগণ ব্যথাহত অন্তরে এ সংবাদ গ্রহণ করলো। এ আঘাতের ক্ষত আরাম হ'তে না হ'তেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের মৃত্যু-সংবাদ তাদের বিহ্বল ক'রে দিল।

১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আঁদ্রে জিদের প্রায় সমগ্র জীবনকাল, ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এ সময়কার ফরাসী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। ভিক্টর হুগো, বালজাকের মত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে নি বটে, কিন্তু এ সময় ফরাসী জাতির সমগ্র সত্তা যেন শিল্প ও সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল এবং এরকম বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিও আর কোন সময় সম্ভব হয় নি। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রোলাঁ, জুলে রোমাঁ, আঁদ্রে জিদ্, প্রুস্ত, পল ভ্যালেরী এ যুগের ফরাসী সাহিত্যাকাশের এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আঁদ্রে জিদ্ গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮২ বছর বয়সে প্যারিসে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। জিদ্ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের একজন দিকপাল। ১৯৪৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, এইটাই বড় কথা নয়, বস্তুতঃ তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সুইডিস একাডেমী একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত ক'রেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় প্রকাশভঙ্গী, ঋজু ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ক'রেছিলেন—যেমন ক'রেছিলেন বার্ণার্ড শ' আর আমাদের শরৎচন্দ্র। তাই শ' আর শরৎচন্দ্রের মত তাঁকে নিয়েও সাহিত্য জগতে সোরগোল কম হয় নি।

১৮৬৯ সালের ২২শে নভেম্বর জিদ্ প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, দু'টি বিপরীত ধর্ম্মমতের মিলনক্ষেত্র সেটি। তাঁর পিতার পূর্ব্বপুরুষেরা দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, কিন্তু মাতার পূর্ব্বপুরুষেরা ক্যাথলিক। তবে জিদের মাতা ও মাতামহী উভয়েই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মমতের মধ্যে মানুষ হয়েও জিদ্ তাই ক্যাথলিক প্রভাবকেও অনেক সময় অস্বীকার করতে পারেন নি।

জিদের বয়স যখন মাত্র ১১, তাঁর পিতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। কাজেই পিতার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব জিদের ওপর খুব বেশী পড়া সম্ভব হয় নি। তবে তিনি আইনের অধ্যাপকের উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার রেখে গিয়েছিলেন পুত্রের জন্য। পিতার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য জিদের হয়নি, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থাগার উত্তরকালে জিদের পিতার অভাব মিটিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে আর একজন তাঁর পিতার অভাব পূরণ করেছিলেন; ইনি তাঁর কাকা খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ চার্লস জিদ্। কাকীমা ক্লেয়ারও বড় কম যেতেন না। সারা শৈশবটাই জিদকে মা আর কাকীমার চোখে চোখে থাকতে হয়েছে।

শৈশবকালে জিদের উপর মায়ের ছিল কড়া শাসন। পুত্রের লেখাপড়া, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুর ওপরই তাঁর বিশেষ নজর ছিল—পুত্রকে ধার্মিক ক'রে তোলার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। কোন স্বাধীনতাই ছিল না জিদের, নিজের ইচ্ছা ব'লে কোন বস্তুই ছিল না তাঁর, মায়ের ইচ্ছার দাসত্বই তাঁকে ক'রতে হয়েছে। সকল কাজে মায়ের এই গণ্ডিবাঁধা শাসন জিদ কিন্তু পছন্দ করতেন না, তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। জিদ নিজেই বলেছেন, 'মায়ের ভালবাসার পদ্ধতিটা আমার মনে তাঁর প্রতি একটা বিরূপতা জাগিয়ে তুলতো।' মায়ের এই শাসন কিন্তু জিদের জীবনে অন্যদিক দিয়ে ফলপ্রসূ হ'ল। মায়ের মৃত্যুর পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাঁর

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মায়ের শাসনে যা সুপ্ত ছিল এতদিন। কিন্তু শাসনের ফলে জাগ্রত ধর্মবুদ্ধিকেও তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। একদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অন্তদিকে ধর্মবুদ্ধি, এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব সমানে চলেছে জিদের জীবনে এবং এর সূত্রপাত হয়েছে এই শৈশবেই।

প্রথম যৌবনে তিনি এক চিত্রকর বন্ধু Paul Laurens-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন আলজিরিয়া ভ্রমণে। এখানেই তিনি মুক্তির আনন্দ সর্বপ্রথম অনুভব করলেন, পৃথিবী তাঁর কাছে নতুন রূপে দেখা দিল, পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে তিনি বিমুগ্ধ হ'লেন।

এ সময়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয় জিদের। তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তাঁর যক্ষ্মা হয় নি, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন, লিখলেন, 'আমি অনুভব করলাম আজ আমি প্রথম জীবন পেলাম। মৃত্যুর ছায়াঘন অন্ধকারের মধ্যে জন্ম নিয়ে আমি আজ প্রকৃত জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছি—আজ আমি নূতন অস্তিত্ব অনুভব করছি।'

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। নতুন যাত্রা শুরু হ'ল, জিদ্ মনোহারিণী বিশ্বের অন্তরতম লোকে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, তিনি কোনদিন ধর্মভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও বার বার পিছন পানে তাকিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পর যৌবনে ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে জীবনটাকেউ পভোগ ক'রতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মবুদ্ধি আবার তাঁকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এই দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বই অবিরাম চলেছে জিদের জীবনে, জিদের সাহিত্যে।

শ'য়ের মত প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হ'লেও কয়েকটি বিষয়ে মনীষী বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে জিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কালে জন্ম গ্রহণ ক'রে উভয়েই প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে সম্পদশালী ক'রে গেছেন। এ গেল বাইরের দিক। চরিত্রের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। শ'য়ের মত জিদের কাছেও স্থূল জীবন ছিল অসহনীয়। শ' যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, জিদও তেমনি পিয়ানো বাজনায় ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছিলেন। বস্তুতঃ সাহিত্যের মত সঙ্গীতও ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি বলেছেন, প্রথম জীবনে যদি তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হত, তা'হলে তিনি পিয়ানো শিক্ষকের কাজ নিতেন। নিজের সঙ্গীত শিক্ষকের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা।

আঁদ্রে জিদ

জীবনে দু'টি নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন জিদ—এ্যানা স্তাক্‌লুটন আর এমানুয়েল। স্কটল্যাণ্ডের এ্যানা স্তাকলুটন জিদের মায়ের সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছে। জিদের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘনিষ্ঠ। এ্যানা একদিকে যেমন অন্যান্য ভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করতো আর ছবি আঁকতো, অন্যদিকে তেমনি আবার উদ্ভিদবিদ্যার চর্চ্চা করতো। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল তার মধ্যে।

এমানুয়েলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ঈশ্বরের দিকে তার মতি ছিল। একজন জিদকে নিয়ে যেতে চেয়েছে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অপরজন তাঁকে আকর্ষণ করেছে ঈশ্বরের দিকে। একজন ধর্ম্ম ও অতীতের প্রতি আসক্তির প্রতীক, অন্যজন বিজ্ঞান ও ভবিষ্যতের আশার প্রতীক। ১৮৯৫ সালে জিদ এমানুয়েলের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। জিদের মায়ের ইচ্ছাও ছিল তাই। কারণ তাঁর সঙ্গে এমানুয়েলের প্রকৃতিগত মিল ছিল। মায়ের ইচ্ছা জয়ী হ'ল বটে, কিন্তু জিদের সাহিত্যে এ্যানার মৃত্যু হয়নি কোন দিন।

১৯০১ সালের ২৫শে অক্টোবর 'The Immoralist' লেখা শেষ হয় এবং ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

The Immoralist উপন্যাসটিতে জিদ দেখিয়েছেন সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের লৌহ বেড়াজাল মানুষের জীবনের বিকাশের পথে কি পরিমাণ বাধা সৃষ্টি ক'রে, মানুষের জীবনকে কি ভাবে পঙ্গু ও জড় ক'রে রাখে এবং এই বেড়াজালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে মানুষ কি ভাবে তার মহত্ত্ব আবিষ্কার করে সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। এ যেন তাঁর স্বীয় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। Art সম্পর্কে জিদের ধারনাও এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছিল।

'Immoralist' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজের পরম হিতৈষী হ'য়ে উঠে নীতিবাগীশের মত বললেন আইনের সাহায্যে উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করতে হ'বে। কিন্তু জিদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন বার্নার্ড শ'। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "There is much unpalatable in Gide. But who is there to deny his extraordinary greatness, his intellectual height?"

জিদ বলেন, প্রাচীন রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন ও শৃঙ্খলা-বোধই বিশুদ্ধ শিল্প নয়। বিদ্রোহের পথই শিল্পীর পথ। বদ্ধ জীবনে চিন্তার পঙ্গুতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করে মানুষ কিভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করে, তারই বাণী বহন ক'রে এনেছেন জিদ্।

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে আর্ট নিরর্থক। জীবনের মধ্যেই আর্টের জন্ম। জীবনের প্রতি সমবেদনা, জীবন সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই মহৎ আর্টের উদ্ভব হয়। জিদ বলেন স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া চাই তার সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ স্রষ্টা যেখানে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেখানেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক, সেখানেই তা আর্ট হয়ে উঠল—"a character doesn't interest me unless created complete from the flesh of the author." ডষ্টয়েভস্কীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। তাঁর চরিত্রগুলি "are projection of personal and private anguish." তাই জিদ ফ্লবেয়ার অপেক্ষা ডষ্টয়েভস্কীকে পছন্দ করেন বেশী।

ফ্লবেয়ারের সঙ্গে জিদের এক জায়গায় বিরোধ ছিল। ফ্লবেয়ার আর্টের জন্যই বেঁচে ছিলেন, কিন্তু জিদ জীবনকে বেশী ভালবেসেছিলেন। জীবনের প্রতি ফ্লবেয়ারের অবজ্ঞা জিদকে ব্যথিত করেছিল। জিদের মতে জীবনকে বাদ দিয়ে আর্ট অসম্পূর্ণ।

অচেনাকে অজানাকে ভালবেসে, বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে সেই অজানাকে আবিষ্কারের নেশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই যৌবনের ধর্ম্ম। জিদ এই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন Immoralist উপন্যাসে।

যৌবনের এই ধর্ম্ম আবার পরিবারের বন্ধন মেনে নিতে পারে না। জিদের জীবনে এটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি, সামনের একটা বাড়ীর দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম একটি ছোট ছেলে পড়াশুনা করছে।

তার বাবা পাশেই ব'সে আছেন, আর মা একপাশে ব'সে সেলাই করছেন। ইচ্ছে হ'ল ছেলেটিকে ঘর থেকে টেনে বা'র ক'রে আনি পথের মধ্যে।' অথচ আবার পারিবারিক স্নেহ-বন্ধনকেও জিদ অস্বীকার ক'রতে পারেন নি। এরই একটা রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বন্ধুবাৎসল্যের মধ্যে। এখানেও সেই শাশ্বত বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব।

জিদের বন্ধুবাৎসল্য অতুলনীয়। দিনের পর দিন, সপ্তা'র পর সপ্তা' বন্ধুরা তাঁর বাড়ীতে আস্তানা বাঁধতো। জিদ আর তাঁর পত্নী বন্ধুদের আদর-আপ্যায়নের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বন্ধু, ভ্রমণে বা মৎস্য শিকারে তাঁর মত সঙ্গী পেলে লোকে ধন্য হত, গল্প বা আলোচনা আসরে তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য্য। এমনিভাবে জিদকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছিল একটি গোষ্ঠী।

১৯০৯ সালে জিদের 'Strait is the Gate' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই বন্ধুদের সহায়তায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে N. R. F. নামে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।

জিদ প্রগতিবাদে বিশ্বাসী। এগিয়ে চলাই তাঁর জীবনাদর্শ। এগিয়ে চলার এই আদর্শ থেকে ক্রমে তাঁর সাম্যবাদের প্রতি প্রীতি দেখা দিতে লাগলো। পৃথিবীর সমস্ত কিছু ভালবেসে, সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশার ফলে জিদের নতুন চেতনা হ'ল। তিনি বললেন,—

"If with all we have, we are not able to be happy, it is because we have fashioned a false idea of happiness. When we shall have understood that the secret of happiness is not in possessing, but in giving, in making people happy around us, we shall be happier ourselves." সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ তাঁর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "I wish I could shout very loudly my sympathy for Russia. And it is important that my cry should be heard." তিনি বললেন, "What I admire in the U. S. S. R. is the abolition of that abominable formula : 'you shall earn MY bread in the sweat of YOUR brow'."

তিনি আহ্বান জানালেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে তার চারপাশে দুরতিক্রম্য প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে সকলকে দূরে থাকতে বলছে, ভেঙে ফেলো সে প্রাচীর সমস্ত শক্তি দিয়ে, ঘুচিয়ে ফেলো ব্যবধান, তোমার শ্রমের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে আদায় ক'রে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়।"

এইভাবে কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হয়ে পাঁচ বৎসরকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরাগী থাকার পর জিদ ১৯৩৬ সালে রুশিয়া গমন করলেন এবং 'Retour de l' U. R. S. S.' (Return from the U. S. S. R.) প্রকাশ করলেন। বইটিতে রুশ জনসাধারণ সম্পর্কে জিদ উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছেন। পর বৎসর তিনি 'After thoughts on the U. S. S. R.' নামে আর একখানি পুস্তক লেখেন। কিন্তু এই দুইখানি পুস্তকে কম্যুনিজম সম্পর্কে জিদের পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে যার প্রশংসা করেছেন, পরে বলেছেন সে নীতি কৃত্রিম।

প্রগতির পথে এগিয়ে চলার জন্য ক্রমে তিনি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন, বলেছেন,—

"Don't believe anything, don't accept anything without proof...Thirst for knowledge is born of doubt. Stop believing and begin to learn."

অদৃষ্টবাদ থেকে তিনি দূরে স'রে এসেছেন, সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে বলেছেন, "Do not accept life as men offer it to you. Do not stop believing that life might be more beautiful...The day when you begin to understand that men are responsible, and not Gods for almost all the evils of life, you will no longer be resigned to these evils."

পৃথিবীকে তিনি উন্নততর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্ত্তমান পৃথিবীর রূপে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। পৃথিবী যে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সেই আশাই তিনি প্রকাশ করেছেন বার বার। তাই তিনি বলেছিলেন, "Woe to him who is satisfied with this imperfect world which cound be so beautiful."

মানসিক গঠনের এই অবস্থায় জিদ ঝুঁকেছেন বিজ্ঞানের দিকে। অতীতের গ্লানির দিকে পিছন ফিরে না দেখে তিনি ভবিষ্যতের আশার আলোক লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গিয়েছিন। তাঁর মত আর কোন সাহিত্যিক বোধ হয় এভাবে বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর বিশ্বাস বিজ্ঞান মানুষকে সমস্ত কিছু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবন ও শিল্প অতি উচ্চ স্তরে উপনীত হ'বে। এ্যানা স্যাকল্টন আর এম্মানুয়েলের দ্বন্দ্বে এ্যানা জয়লাভ করলো।

জিদের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'Journals' ফরাসী সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে তিনি বিশ্বসাহিত্য ও শিল্পের যে আলোচনা করেছেন তা অমূল্য।

ফরাসী সাহিত্যে জিদের একটি অতুলনীয় দান তাঁর অনুবাদ কার্য্য। অনুবাদের মধ্য দিয়ে জিদ ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও ডাকঘরের অনুবাদ, সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুবাদ এবং পুশকিন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, জোসেফ কনরাড, উইলিয়ম ব্লেক প্রভৃতির লেখা অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি।

যৌবনের সেনা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

১

কিসের তরে অন্ধকারে তুলছে জয়ধ্বনি
জাগছে কারা ভাবনাহারা অমাপ্রহর গণি?
তাদের যেন রুদ্ধ ঘরের সুখ শয়ন নয়,
ভীরুর দেশে পণ করেছে জিনতে বিষম ভয়।
ঘুমের ঘোরে চমক লাগায় আধমরাদের দলে
যৌবনের সেনা তারা পাহাড় পথে চলে।

২

সে কি গহন রাত্রি কালো আকাশে নাই তারা,
মাঝে মাঝে শাসনবাণী বজ্রেতে দেয় সাড়া।
মৃত্যুহানে অগ্নিবাণে—চরণে নাগপাশ,
ভাষাহারা নিবিড় ব্যথায় শিউরে উঠে ঘাস।
ছিন্ন হিয়ার শোণিত ঝরে, ঝিষের ফাঁসী গলে,
যৌবনের সেনা তবু দৃপ্ত পদে চলে।

৩

পথের দুঃখ ঢেউয়ের মতন সারির পরে সারি,
স্বপ্ন আঁকা কেতন যেন অশ্রু ভেজা ভারী।
হয়তো হঠাৎ লুটালো কেউ ঝরা ফুলের প্রায়,
এগিয়ে এসে ধরল বুকে যাত্রী সাথী ভাই,
আশার বাণী বাজল তখন যে মুমূর্ষু গলে
তারই আলোয় অজেয় বীর দুঃসাহসী চলে।

৪

দেখরে চেয়ে আকাশ ছেয়ে কিসের পড়ে তাড়া,
উর্দ্ধশ্বাসে পালায় ত্রাসে মেঘেরা ছন্নছাড়া।
ভোরের আলোর পরশ লাগে গিরির শুভ্র ভালে
ফুল ফোটানোর দোলন সাড়া হাওয়ার ডালে ডালে।
দুয়ার খুলে মুক্তমানব এল কৌতূহলে,
শহীদ শবের পুষ্প লোটায় জীবন-বেদী তলে।

৫

নাই বা তাদের চিনলরে কেউ—জানল নারে নাম
তবু পুণ্যশ্লোক পাবে যে প্রভাতের প্রণাম।
সকল বর্ষা কাঁদবে তাদের বিচ্ছেদেরে স্মরি
গৌরবেতে উঠবে শরৎ সোনার আলোয় ভরি।
তাদের ব্যথায় হিম হবে শীত; বসন্ত ফুল দলে
অমর স্বপন ভাষা পাবে নীল আকাশের তলে।

পথের সন্ধান

শ্রীঊষা বিশ্বাস

দীপক বসু ষোল বছর পরে কাল জেল থেকে ছাড়া পাবে। ষোল বছর আগে রাজদ্রোহ-অপরাধে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'য়েছিল। কাল তার এতদিনকার বন্দীজীবনের অবসান হবে। ষোল বছর আগে ফেলে-আসা অতীত জীবনের অনেক কথাই আজ তার মনে প'ড়ছে। সে ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রবার পরে তার মা তাকে নিয়ে তাঁর ভাই-এর বাড়ীতে ক'লকাতায় চ'লে এলেন। দীপকের মামা রায় বাহাদুর অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলা সরকারী দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বোন ও ভাগ্নের তাঁর বাড়ীতে এসে থাকাটা রায় বাহাদুর মোটেই পছন্দ ক'রলেন না। সে-কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে না ব'ললেও প্রকারান্তরে তা'দের বুঝিয়ে দিলেন—ব'ললেন—"শিবানী, তোর ছেলে তো ম্যাট্রিক পাশ ক'রলো! এবার ওকে একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করি, কি বলিস্? ছেলেদের বি-এ, এম-এ, পাশ ক'রে আজকাল কি বা হ'চ্ছে? মিছিমিছি সময় ও পয়সা নষ্ট! ও সব, বাপু, বড়লোকদের ছেলেদেরই সাজে।" শিবানী ব'ললেন—"দাদা, দীপু তো আমার জলপানি পেয়েছে। পড়াশুনার দিকে ওর ছোটবেলা থেকেই বড্ডো ঝোঁক। ওর বাপেরও খুব ইচ্ছে ছিল ওকে এম-এ পাশ করানো—আমি তোমাদের সংসারে বোঝা হ'য়ে থাকতে চাই নে যতদূর পারি শরীর দিয়ে খেটে দেবো। তুমি আমার ছেলেটাকে মানুষ ক'রে দাও।" শিবানীর ভ্রাতৃ-জায়া—রায় বাহাদুরের স্ত্রী—শোভনা নিতান্ত চক্ষু লজ্জার খাতিরেই মুখ ফুটে কোনও আপত্তি জানাতে পারলেন না। কিন্তু বিধবা ননদের ছেলে নিয়ে তাঁর সংসারে এসে থাকাটা প্রথমে তাঁর একটুও মনঃপূত হয় নি। পরে বোধহয় তিনি ভেবে দেখ্‌লেন বাড়ীতে একটি বিধবা ননদ থাকলে সময়ে অসময়ে তার দ্বারা সংসারের অনেক কাজও হ'তে পারে। তিনি নিজে মানুষটি ছিলেন অলস-প্রকৃতির ও স্বার্থপর। সংসারে সব কিছুর লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর অভ্যেস। তাই শিবানী আসবার পরে ব্যয় সংক্ষেপ ক'রবার জন্যেই বোধহয় রাঁধুনী উঠিয়ে দিলেন। ননদকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাঝে মাঝে ব'লতেন—"ঠাকুরঝিকে তো তা'র নিজের নিরামিষ ঘরের রান্নাটা ক'রতেই হয়। মিছিমিছি একটুখানি আমিষ রান্নার জন্যে আর একটি ঠাকুর রেখে দরকার কি? যা খরচের ধাক্কায় পড়া গেছে! খরচ একটু না কমালে ঐ ক'টা টাকায় কুলোনোই দায়।" দীপকের আজ মনে প'ড়লো কত আশা ক'রে তার মা তা'কে ক'লকাতায় নিয়ে এসে কলেজে পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বড় আশা ছিল দীপক পাশ ক'রে একটা বড় চাকরী পেলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। তখন তিনি তাঁর মনের মতো একটি বউ নিয়ে এসে ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে একটি সুখের নীড় গ'ড়ে তুলবেন। গ্রামে তাঁর সই সুনন্দার একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে ছিল। তা'র নাম ছিল সুভদ্রা। দীপকের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেবেন শিবানী মনে মনে একরকম ঠিকই ক'রে রেখেছিলেন। দুই সইতে এ সম্বন্ধে কথাবার্তাও হ'য়ে গিয়েছিল। মায়ের কথা মনে হ'তেই দীপকের আজ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়লো। তা'র মা'ই ছিলেন তা'র সংসারে একমাত্র বন্ধন—আজ তিনিও নেই। দীপক বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে এ-কথা যখন জানাজানি হ'য়ে গেল তখন তা'র মা কত চোখের জলই না ফেলেছেন—সাশ্রু নয়নে কত কাতর কাকুতি মিনতি ক'রে তাকে সেই পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা'র মায়ের অশ্রুজলও সেদিন তাকে সংকল্প-চ্যুত ক'রতে পারে নি।' তা'র মনে হ'য়েছিল, সে কোনও অবস্থায় প'ড়েই তা'র দলের বিশ্বাসভঙ্গ ক'রতে পারে না—তা' হ'লে তাকে সংঘের কাছে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হবে। তার জন্যে শিবানীকে কত নিগ্রহ না ভোগ ক'রতে হ'য়েছে তাঁর ভাই ও ভাজের কাছ থেকে। সেদিন স্বদেশ-জননীর পরাধীনতার গ্লানি—তা'র দুঃখটাই—দীপকের অন্তরে বড্ডো বেশী ক'রে বেজেছিল; সে তাই তার নিজের জীবন পণ ক'রেও দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন ক'রতে চেয়েছিলেন। দেশসেবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ ক'রে সে যে কঠিন বিপদসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিয়েছিল সেটাই সেদিন তার কাছে একমাত্র পথ ব'লে মনে হ'য়েছিল। সেদিন তা'র মনে হ'য়েছিল তার দেশ-জননী যেন তাকে ব'লছেন—

"ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর ও রে,
নহে রে সন্ধ্যায় দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।"

জেলে যেদিন সে তা'র মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিল সেদিন এক নিদারুণ ব্যথায় তার বুকটা টন্ টন্ ক'রে উঠেছিল—তার চোখ দিয়ে অঝোরে বেদনাশ্রু ঝ'রেছিল। সেদিন তা'র মনে হ'য়েছিল সে এমনি হতভাগ্য যে সে তা'র দুঃখিনী মায়ের দিকে একবার ফিরেও তাকায় নি—তাঁর কোনও সাধ, কোন আশাই পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা করে নি। দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্ম বোঝে না। মাকে হারিয়েই সেদিন দীপক বুঝতে পারলো তা'র মা তা'র কতখানি ছিলেন। তার মনে হ'লো জননীর অতল গভীর স্নেহের মধ্যে নিরন্ত ডুবে থেকে তা'র মূল্য সে বুঝতেই পারে নি'—সেটাকে সে যেন তার অবশ্য প্রাপ্য ব'লেই ধ'রে নিয়েছিল। শিশুকাল থেকে মায়ের কাছ থেকে সে কেবল নিয়েই এসেছে তাঁকে দেবার কথা তার কখনও মনেই হয় নি'—তা'র মনেই হয় নি' তার মায়েরও তার উপর কোনও দাবী থাকতে পারে। আজ জেল থেকে আসন্ন বিদায়ের ক্ষণে তা'র এ সমস্ত কথাই মনে প'ড়ছে—তা'র মায়ের বিষন্ন করুণ মুখখানি যেন বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজ তা'র মনে কোথায় সেই মুক্তির আনন্দ? কিসের জন্যে এই মুক্তি? জেলের বন্দী জীবনেই সে বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সে তো এই মুক্তি চায় নি।' আজ তা'র মনে হচ্ছে তার মা যখন বেঁচে নেই সারা জীবন তার জেলে কাটলেই বা কি ক্ষতি ছিল? এই বিশাল বিশ্বে তার মতো হতভাগ্যের স্থান কোথায়? কাল সে জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে? তার মা বেঁচে থাকলে কাল সে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর কাছেই ছুটে যেতো। তাঁর কাছে গিয়েই বোধহয় সে তা'র সব দুঃখ-জ্বালা ভুলতে পারতো। জেল থেকে বেরিয়ে সে কি ক'রবে—সেও একটা মস্তো বড় সমস্যা। ষোল বছর আগে যখন সে প্রথম জেলে ঢুকেছিল, সে ছিল একজন তরুণ যুবক। তখন তার অন্তর ছিল আশা, আকাঙ্ক্ষা; উদ্দীপনায় ভরা। জীবনকে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা আর কি তার পক্ষে সম্ভব? আজ কোথায় তা'র সেই উদ্যম, উৎসাহ? দীপকের মনে হ'লো তার জীবনের এতগুলি বছর জেলে কাটিয়ে সে দেশকে স্বাধীনতার পথে কতটুকু এগিয়ে দিতে পেরেছে—সে নিজের জীবনকেই বা কতখানি সার্থক ক'রে তুলতে পেরেছে? কে তার এই আত্মত্যাগের মূল্য দিয়েছে বা বুঝেছে? তা'র মত অমন কত হাজার হাজার যুবক-যুবতী স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছে, কে তাদের খবর রাখে? দীপকের আজ আর একজনের কথা মনে প'ড়ল। সে তার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সহপাঠিনী উজ্জ্বলা মিত্র। একদিন সে উজ্জ্বলাকে তার জীবনসঙ্গিনী ক'রবার স্বপ্নও দেখেছিল। তাকে পেলে হয় ত বা তা'র জীবন অন্য রকম হ'তেও পারত। চপলা বিদ্যুৎশিখার মতই এই মেয়েটি একদিন তা'র জীবন-পথে ক্ষণিকের জন্যে "চকিত-চমকে" দেখা দিয়েই স'রে গিয়েছিল। চটুলা, লীলাচঞ্চলা, হাস্যমুখরা, বসনে, ভূষণে, প্রসাধনে অতি আধুনিকা এই মেয়েটি যেন প্রদীপ্ত আলোকশিখার মতই সে-দিন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। দীপক ছিল অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা—নিজের চেহারা এবং বেশভূষার প্রতি একান্ত উদাসীন। এর আগে সে কখনও এ রকম ধরণের মেয়ে দেখেই নি কিংবা কোনও অনাত্মীয়া মেয়ের সঙ্গ লাভেরও বিশেষ সুযোগ পায় নি। তাই তার উজ্জ্বলাকে বড় ভাল লেগেছিল। বিপরীতধর্মী গুণ পরস্পরকে আকর্ষণ করে—এটাই বোধ হয় স্বভাবের নিয়ম। প্রথম প্রথম দীপক উজ্জ্বলাকে এড়িয়ে চ'লতেই চেষ্টা ক'রত। তার প্রতি এই আত্মভোলা সৌম্য দর্শন যুবকটির ঔদাসীন্য যেন উজ্জ্বলার একেবারে অসহ্য ব'লে মনে হ'ল। সে নানা উপায়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে প্রায়ই উপযাচিকা হ'য়ে দীপককে পড়াশুনা সম্বন্ধে এটা ওটা জিজ্ঞেস্ ক'রতে আসত। একদিন দীপক ছুটীর পরে রাস্তায় ট্রামের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল, এমন সময় প্রকাণ্ড একখানা বুইক গাড়ী তার সামনে এসে থেমে গেল। সে চেয়ে দেখল উজ্জ্বলা ব'সে আছে গাড়ীখানাতে। সে তাকে দেখে মিষ্টি হাসি হেসে ব'লল—"চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই আপনি যেখানে যাবেন।" দীপক লজ্জিত হ'য়ে ব'লল—"না, না, আমায় পৌঁছাবার কোনও দরকার নেই। আমি ট্রামেই যাব রোজ যেমন যাই।"

"উঠুন, উঠুন, কোনও কথা শুনব না আমি। আর সীন করবেন না। রাস্তার সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সে-দিকে খেয়াল আছে?"

দীপক আর বাক্য ব্যয় না ক'রে গাড়ীতে উঠে বসল। এমনি ক'রে সে ক্রমে উজ্জ্বলার দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগল। তারপর একদিন তার ভুল ভাঙতেও দেরী হ'ল না। এক শনিবারে সে ম্যাটিনী শো'তে সিনেমায় গিয়েছিল। সেদিন খুব ভালো একখানা বই ছিল। বিরামের সময় দীপক উঠে যখন বাইরে যাচ্ছিল সে দেখল তাদের ক্লাসের সমরেশ চৌধুরী ও উজ্জ্বলা দু'জনে পাশাপাশি বসে খুব হেসে হেসে গল্প ক'রছে ও সিগারেট টানছে। এ দৃশ্য দেখে দীপকের মনে বেশ একটু ঈর্ষার উদ্রেক হ'য়েছিল। এসম্বন্ধে একদিন সে উজ্জ্বলাকে

বলেছিলও। উজ্জ্বলা তা'তে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—"আমি যা'র সঙ্গেই মিশিনা কেন আপনার তাতে কি আসে যায়? আপনি কি আমার গার্ডিয়ান?" তারপর থেকে সে লক্ষ্য ক'র্‌ল উজ্জ্বলা যেন তাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাইত। কলেজের বারান্দায় বা সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে নাম্‌তে কখনও দেখা হ'লে না দেখ্‌বার ভান ক'র্‌তেই চেষ্টা করত—নিতান্ত সাম্‌না সাম্‌নি প'ড়ে গেলে একটু হেসে চ'লে যেত—কোনও কথা ব'ল্‌ত না। ক্লাসের ছুটীর পরে সে প্রায়ই দেখতো উজ্জ্বলা ও সমরেশ একসঙ্গে গাড়ীতে চলেছে। একদিন দীপক একখানা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তাদের গাড়ীর পেছন পেছন গিয়েছিল—দেখ্‌ল তারা দু'জনে নেমে একটা সোডা ফাউণ্টেনে ঢুক্‌ল। ক্রমে দীপক বুঝল উজ্জ্বলাকে জীবনসঙ্গিনী ক'র্‌বার সে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা বামনের চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতই অসম্ভব। উজ্জ্বলা তাকে চায় না—সে চায় সমরেশকে, যেহেতু সে ধনীপুত্র। দীপক ভেবেছিল সে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে একটা ভাল চাক্‌রী পেলে উজ্জ্বলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'র্‌বে। কিন্তু সে এখন বুঝল, তার উজ্জ্বলাকে পাবার আশা দুরাশা মাত্র। প্রথমে উজ্জ্বলাকে না পাবার দুঃখটা তার বুকে বড়ই বেজেছিল। কতদিন সন্ধ্যা বেলায় সে কোনও পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চে চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাকৃত—কী যে সে ভাবত তা' সে নিজেই জানে না—পার্কে লোকজনের আনাগোনা, তাদের হাসি গল্প—কোন কিছুর দিকেই তার খেয়াল নেই। প্রায়দিনই অনেক রাতে বাড়ী ফিরে সে কিছু না খেয়েই চুপচাপ শুয়ে প'ড়ত। তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে তার মা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন—বারবার জিজ্ঞেস কর্‌তেন—তার কোনও অসুখ করেছে কিনা। দীপক চিরদিনই পড়াশুনা ভালবাসত—সে পড়াশুনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে উজ্জ্বলাকে ভুল্‌তে চাইল—নিজের দুঃখকেও ভুল্‌তে চাইল। দেখল তাও অসম্ভব। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই খুলে ব'সে থাকৃত—বই এর লেখা গুলো যেন তার কাছে অর্থহীন ব'লে মনে হ'ত। অনেক দিন থেকেই তার এক সহপাঠী বন্ধু শ্যামল রায় তাকে তাদের দলে টান্‌তে চাচ্ছিল। সে দীপককে পীড়াপীড়ি ক'র্‌ছিল তাদের একটা গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার জন্য। সংঘের আদর্শ ও কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পুস্তিকাও শ্যামল গোপনে তাকে প'ড়তে দিয়েছিল। দীপক ঠিক ক'র্‌ল সে শ্যামলদের দলেই ভিড়ে পড়বে—তার একটা কাজ চাই। কাজের মধ্যেই সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে যা'তে সে উজ্জ্বলার কথা ভাববার অবসর না পায়। একদিন শ্যামল তাকে নিয়ে গেল তাদের সংঘের সভাপতির কাছে—যথারীতি শপথ গ্রহণ ক'রে দীপক এই সংঘের সভ্য হ'ল। অনতিবিলম্বে সে সংঘের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সভ্য হ'য়ে উঠ্‌লো এবং অনেক কঠিন কঠিন কাজের ভার নিল। কাজের নেশায় সে মেতে উঠ্‌ল।—আজ এতকাল পরে দীপকের মনে পড়ল উজ্জ্বলার কথা। সে-ই ত তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভাবল সেদিন যদি উজ্জ্বলা তাকে গ্রহণ ক'রত তাহ'লে তার জীবন হয়ত এরকম হত না। একথা মনে হ'তেই তার নিজের অজ্ঞাতে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়ল—ভাবল উজ্জ্বলা হয়ত এতদিনে সমরেশকে বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্‌ছে—হয়ত বা তাদের দু'একটি ছেলে মেয়েও হ'য়েছে। দীপকের আজ সুভদ্রার কথাও মনে হ'ল—মনে হ'ল তার মায়ের কত ইচ্ছা ছিল তাকে বৌ ক'র্‌বার। দীপক বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছে ব'লে যখন তা'র মা কানাঘুষা শুন্‌ছিলেন তখন তিনি চেয়েছিলেন তার সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারের মায়াপাশে বাঁধতে। তার মা তাকে একদিন বলেছিলেন—"দীপু, এবার তোর সইমাকে বলি, আস্‌ছে মাসেই একটা ভাল দিন দেখে ভদ্রার সঙ্গে তোর বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌তে। ভারী লক্ষী মেয়েটি কিন্তু। গ্রামে থাকৃতে হয়। কতদিন আর সই মেয়েকে আইবুড়ো ক'রে রাখবে? গ্রামের লোকের কথার জ্বালায় সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে শুন্‌ছি।" শুনে দীপক হেসে বলেছিল—"এখন বিয়ে করবার কথা ত মা আমি ভাবতেই পার্‌ছি নে। চাক্‌রী বাক্‌রী একটা না পেলে পরের মেয়েকে এনে খাওয়াবোই বা কি? আমরা নিজেরাই ত এখন পরের উপর থাচ্ছি।—তুমি আমার বিয়ের জন্যে অত ভাবছ কেন? লোকের কন্যাদায় হয়, তোমার দেখছি পুত্রদায় হ'ল!" তার মা বলেছিলেন—"তোর চাক্‌রী ক'র্‌বার এমনই বা দরকার কি? তুই তো বি-এ পাশ করেছিস, চেষ্টা ক'র্‌লে গ্রামের স্কুলেও ত একটা মাষ্টারি পেতে পারিস। তা না হ'লেও যা খুদকুঁড়ো আমাদের আছে গ্রামে গিয়ে থাকৃলে তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে—গরীবানা চালে চ'ল্‌লে। কি জানি কবে ম'রে যাই! ম'র্‌বার আগে তোকে সংসারি দেখে যেতে চাই।" উত্তরে দীপক বলেছিল—"বিয়ের কথা এখন ভাবতেই পারিনে মা।—আর ভদ্রা কতটুকু মেয়ে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লেখাপড়া জানে না। আমাকে চাকরী নিয়ে হয় ত ক'লকাতাতেই থাকৃতে হবে। ভদ্রা এখানকার সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পার্‌বে কেন? তুমি সইমাকে বলে দাও আমার ভরসায় না থেকে অন্য ভাল

পাত্রের সন্ধান ক'রতে। . ভদ্রা ত দেখতে ভালই—ঘরকন্নার কাজও সে বেশ ভাল জানে। ওর পাত্রের অভাব হবে না।" দীপকের কথা শুনে শিবাণীর সেদিন বড়ো দুঃখ হ'য়েছিল—যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নি'। ছেলের উপর বোধহয় একটু অভিমানও হ'য়েছিল। কতদিন থেকে তিনি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন সুভদ্রাকেই তিনি পুত্রবধূ ক'রবেন। ছেলের কথায় বুঝতে পারলেন তার এবিয়েতে মত নেই। তার অমতে ওখানে তার বিয়ে হতেই পারে না একথাও বুঝলেন। শিবাণী তাঁর ছেলেকে চিনতেন—সে একবার 'না' ব'ললে তাকে "হ্যা" বলানো বড়োই কঠিন। তাছাড়া তিনি নিতান্ত জেদ ক'রলে দীপক যদি ভদ্রাকে বিয়ে করেও, তাহলে সে মোটেই সুখী হবে না। এ কথাও তিনি বুঝলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান অসুখী হবে তাঁর মায়ের প্রাণে তাও ত সইবে না। অথচ তিনি যে তাঁর সইকে একরকম কথাই দিয়েছিলেন সুভদ্রাকে বৌ করবেন ব'লে। দীপক আজ তার অতীত জীবনের এই সব ঘটনা গুলিরই রোমন্থন করছিল। সে চুপ ক'রে বসে যখন এই কথা ভাবছিল তখন তার এক সঙ্গী সুনীল কর এসে ব'লল—"কি এত ব'সে ব'সে ভাবছেন বলুন ত আপনি? কাল ত ছাড়া পাচ্ছেন। আমাদের যে আরও কতকাল এখানে পচতে হবে কে জানে?" দীপক চমকে উঠলো—ব'ললো—"হ্যাঁ, ভাবছিলাম কাল জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো? এত বড়ো দুনিয়ায় আমার মতো হতভাগ্যের স্থান ত দেখি নে'। সংসারে আমার আপনার ব'লতে ছিলেন একমাত্র মা। চার বছর হলো তিনিও ত আমার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর কত আশা ছিল আমি এম-এ পাশ ক'রে চাকরী বাকরী পেলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। তাঁর সে আশাও পূর্ণ হ'ল না। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে কত কষ্ট করেই তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে যে আর দেখতে পাবো না এইটেই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ। আজ আমার মনে হচ্ছে মা'র মৃত্যুটা আমিই এগিয়ে দিয়েছি। কতই বা তাঁর বয়স হ'য়েছিল। যাক্, সে সব কথা ভেবে আর এখন লাভ কি? আমি জেল থেকে বেরিয়ে কি করব সেও এক মস্ত ভাবনা। গত ষোল বছর ধ'রে আমার ত বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। বাইরে গিয়ে হয় তো দেখবো দেশের চেহারা কত ব'দলে গিয়েছে —আমাদের তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের হয় তো কোনও মিলই নেই। হয় ত একালের সঙ্গে এত বছর পরে আমার খাপ খাইয়ে চলাই কঠিন হবে। তারপরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে—জীবিকা সমস্যা। ষোল বছর আগে যখন প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম তখন আমি একুশ বছরের তরুণ যুবক আর আজ আমি সাঁইত্রিশ বছরের প্রৌঢ়। এখন কি আর আমার পক্ষে এক নতুন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব? যৌবনের সেই উৎসাহ, সেই মনের বল আজ কোথায়? কোথায় সেই তরুণ বয়সের আশাবাদ, আদর্শবাদ? সেদিন দেশের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আজ একেবারে অসার বলে মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে সেদিন যেন মরীচিকার পেছনেই ছুটেছিলাম—সার্থকতার প্রকৃত পথটির সন্ধান পাইনি। সেদিন স্বদেশের সেবাকেই জীবনের ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল খাঁটি। কিন্ত আজ মনে হচ্ছে সত্যিই কি আমি আমার দেশের সেবা করতে পেরেছি? কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী মেরে বিপ্লবাত্মক কাজের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতখানি এগিয়ে দিতে পেরেছি? বুঝতে পারছি না সেদিন যে পথ বেছে নিয়েছিলাম সেটাই সত্যি না মহাত্মাজীর অহিংসা পথই সত্যি। আজ এই সব প্রশ্নই এত বছর পরে মনে জাগছে।"

সুশীল বললো—"আপনি এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবেন ঠিক ক'রেছেন?"

"এখান থেকে কোথায় যাব, কি করব—তা' আমি এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি। মামার বাড়ীর দরজা ত চিরদিনের জন্তেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেখানে আমার মা'রও শেষে স্থান হয় নি সেখানে কি আর আমার স্থান হবে? যাকে দিয়েই তো মামার সঙ্গে সম্পর্ক। মামার বাড়ীতে একজনের কাছ থেকেই একটু স্নেহ মমতা পেয়েছিলাম—সে আমার মামাতো বোন মমতা। সে এখন কোথায় আছে কে জানে? মামার বাড়ীর কোনও খবরই তো আমি জানি না। মামা বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে? তাই ভাবছি এখান থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়েই উঠব। সেখানে আমার বিষয় সম্পত্তিও কিছু ছিল। জানি না কা'রা এখন সে সব ভোগ দখল করছে।"

পরদিন সকালে জেলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত সে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে ওঠাই স্থির করলো। ২৪ পরগণা জেলায় তাদের গ্রামটি। এককালে সেখানে বেশ কয়েক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস ছিল। ষ্টেশানে নেমেই দীপক হাঁটতে সুরু করল। ষ্টেশান থেকে তাঁদের গ্রাম মাইল দুই রাস্তা হবে। পথেই তার বাল্যবন্ধু সুবলের সঙ্গে দেখা হ'লো। সুবল প্রথমে তাকে

চিন্‌তে পারে নি। দীপকই প্রথম কথা বল্‌ল—"কে? সুবল না?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ত চিন্‌তে পার্‌লাম না।"

"আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি দীপক—দীপক বসু।"

"ওঃ। তুমি দীপক? কোথায় উঠেছ? তোমাদের বাড়ীতে ত তোমার প্রভাত দাদা সপরিবারে রয়েছেন। কাকীমা মারা যাবার পরে বাড়ীটা অনেকদিন খালিই পড়ে ছিল। তুমি আমার বাড়ীতেই চলো তা হ'লে, কেমন? আমি অবিশ্যি গরীব ইস্কুল মাষ্টার। যা পাই তাতে কোনও রকমে মোটা ভাত কাপড় জুটে যায়। জমিজমাও কিছু আছে তো। তোমায় পেলে সুধা—আমার স্ত্রী—খুব খুশী হবে। বেচারার সারাদিন একলা একলাই তো কাটে।"

"কেন? তোমাদের ছেলেপুলে নেই?"

"না।"

তার পরদিন রবিবার ছিল। দীপক সকালে সুবলের সঙ্গে বেড়িয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখে এল—কয়েকটা বাড়ীতে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎটাও সেরে নিল। গ্রামের বিশেষ কিছু উন্নতি বা পরিবর্তন তার চোখে পড়ল না—তার অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথা পরম্'। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলি কেমন যেন বদ্‌লিয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'লো। আগেকার সেই জমাট ভাবটি যেন আর নেই—সকলেই যেন নিজের নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ী ফিরে এসে দীপকরা দেখল, সুধার রান্না শেষ হ'তে তখনও দেরী আছে। কাল রাতে কোনও জোগাড় ছিল না ব'লে সুধা দীপককে ভাল ক'রে খাওয়াতে পারে নি—ঘরে যা ছিল তাই দিতে হ'য়েছিল। আজ রবিবার—কোনও তাড়া নেই। আজ তাই সে রান্নার একটু বিশেষ আয়োজন ক'রেছে। দীপক কতদিন পরে এসেছে—জেলে ত এত বছর ভালো মন্দ জিনিষ খেতে পায় নি। দুই বন্ধু ম্লান হেসে নিয়ে ব'সে ব'সে গল্প ক'রছিল। দীপক জিজ্ঞেস করল—"সইমা এখানে নেই? ভদ্রার খবর কি?"

"ভদ্রার মা গত বছর মারা গেছেন। তিনি মেয়ের কাছেই শেষে থাক্‌তেন—এখানে থাক্‌তেন না। ভদ্রার কথা তুমি শোন নি? তুমি কি করেই বা শুনবে? সে ত এখন সিনেমা করে। সে এখন বড়লোক—বেশ দু'পয়সা রোজগার কর্‌ছে।"

"ভদ্রা শেষে সিনেমায় নামলো, বল কি? সে ত অত্যন্ত ঘরোয়া মেয়ে ছিল। তার সাত চড়ে মুখে রা বেরুতো না। সে এখানে মাঝে মাঝে আসে নাকি?"

"না, গ্রামে আস্‌বার কি আর তার মুখ আছে? গ্রামের লোকদের তুমি জানই তো।—আহা! ভদ্রা মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল। বেচারার এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। অত বড় ধাই বুড়ো মেয়ে নিয়ে ওর মায়ের পক্ষে গ্রামে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। এ ধারে ওর কাকাও ওর বিয়ের জন্যে বড্ডো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ভদ্রার মা'র আর পাত্রই পছন্দ হয় না। পাত্র যদি বা পছন্দ হয় তো তা'র খাঁই মিটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মেয়ের রূপ কেউ চায় না—সবাই চায় টাকা। ভদ্রার মা নিঃসম্বল বিধবা। টাকা দেবেন কোথা থেকে? শেষে ভদ্রার কাকা এক রকম জোর ক'রেই ৪০৲ টাকা মাইনের এক কেরাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। পাত্রটি বয়সেও ভদ্রার চেয়ে অনেক বড়। তাঁর দুই ভাই টি, বি-তে মারা গিয়েছিল বলে ভদ্রলোক অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিয়েই করেন নি। যা হ'ক্, যার কপালে যা লেখা থাকে কেউ-তা খণ্ডন করতে পারে না।"

বিয়ের বছর চারেক পরেই ভদ্রার স্বামী রমেশবাবুর পক্ষাঘাত হ'ল। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে লোকের কতই বা সঞ্চয় থাকে—বিশেষ করে একটি কেরাণীর পক্ষে কতই বা সঞ্চয় করা সম্ভব? ক্রমে তাদের যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল। ভদ্রার যে দু' একখানা গয়না ছিল তাও গেল। সংসার একেবারে অচল। বাড়ীতে অসুস্থ স্বামী ও একটি শিশু পুত্র। ভদ্রা এমন কিছু লেখাপড়া শেখে নি যে সে চাকরী ক'রে সংসার চালাতে পারে। জানই ত সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল। আর কোনও উপায় না দেখে সে তার এক মামাতো ভাই-এর সাহায্যে কোনও রকমে একটা সিনেমায় ঢুকল। প্রথমটা ওর স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন খুবই আপত্তি ক'রেছিলেন। কিন্তু শেষে আর কোনও উপায় নেই দেখে রমেশবাবু মত দিয়েছিলেন। তা না হ'লে সমস্ত পরিবারকেই অনাহারে মরতে হত। তার বছর দুই পরে রমেশবাবু মারা গেলেন। শুনেছি ভদ্রা যেমন রোজগার ক'রে সংসার চালিয়েছে তেম্‌নি স্বামীরও সেবা করেছে। ওকে যখন স্টুডিও-এ বেরুতে হ'ত তখন ওর মা রমেশ বাবুকে ও ছেলেটিকে দেখাশুনা করতেন। ভদ্রার মা'ও গত বছর মারা গিয়েছেন। একটি ছেলে ছাড়া ওর আর সংসারে কেউ নেই এখন। ভদ্রা কাকীমারও সর্ব্বদা খুব খবরাখবর করত—তাঁকে ক'লকাতায় তার বাড়ীতে নিয়ে রাখতেও চেয়েছিল নাকি। কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজী হন্‌নি। শেষে তাঁকে দেখাশুনা করবার জন্যে একটি মাইনে করা মেয়ে মানুষও রেখে দিয়েছিল। কাকীমার বড়ো সাধ ছিল তোমার সঙ্গে ভদ্রার বিয়ে দেন।"

দীপক শুনে কিছু বলল না। নিজের অজ্ঞাতেই শুধু তার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। ক'দিন গ্রামে থেকে দীপক বল্‌ল—"সুবল, কাঁহাতক আর এখানে ব'সে ব'সে তোমার অন্ন ধ্বংস করা যায়? এ রকমভাবে ব'সে থাক্‌লে ত চল্‌বে না। একটা চাকুরী বাকুরীর চেষ্টাও ত করতে হবে। আমার জমিজায়গা যা ছিল তাও তো বে-দখল হতে বসেছে। তাই ভাবছি ক'লকাতার গিয়ে যা হক্‌ একটা চাকুরী যোগাড় করবার চেষ্টা করা যাক্‌। জানই ত—আমি দাগী আসামী। আমার পক্ষে কোনও কাজ জোটানও সহজ নয়। দেখলে ত! তোমাদের স্কুলে একটা কাজ খালি থাকা সত্ত্বেও আমায় নিতে সাহস পেলেন না, পাছে সরকারী সাহায্য পাওয়া নিয়ে কিছু গোলমাল হয়। টাকা থাকলে আমি নিজেই গ্রামে একটা স্কুল খুলতাম কিংবা একটা কিছু ব্যবসা করবার চেষ্টা করতাম। আমার অবিশ্যি ব্যবসাবুদ্ধি আছে কিনা ঘোর সন্দেহ। যাক্‌, আজ আমার বন্ধু ও সহপাঠী তপন মুখোপাধ্যায়ের চিঠি পেলাম। সে অনেক ক'রে লিখেছে ক'লকাতায় তার বাড়ীতে উঠতে এবং যতদিন ইচ্ছে থাক্‌তে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে দীপক আবার বল্‌ল—"তপন আমাদের সঙ্গে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়ত। সে ছিল বড় লোক—জমিদারের ছেলে। যদিও স্বদেশীর দিকে তার খুবই ঝোঁক ছিল—আমাদের কাজের প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতিও ছিল—তবু সে প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। মাঝে মাঝে দরকার হ'লে আমাদের টাকা-কড়ি দিয়ে সে সাহায্য করত।"

দিন দুই পরে দীপক কলকাতায় গেল। অনেকদিন পরে তপন তাকে পেয়ে খুবই খুশী হ'লো। বছর দুই হ'লো তার পত্নীবিয়োগ হ'য়েছে। তার শুধু বছর দশেকের একটি ছেলে আছে। তার বিধবা মা ই তার সংসার দেখাশুনা করেন। তপনের মা দীপককে ছেলের মতই আদর যত্ন করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে দীপকের নিজের মায়ের কথাই মনে হ'ত—মনে হ'ত তার মাও ছিলেন এমনি স্নেহময়ী। একদিন কথায় কথায় তপন বল্‌ল—"সমরেশ চৌধুরীকে তোমার মনে আছে? সেদিন তার সঙ্গে হঠাৎ সিনেমায় দেখা হ'ল। তার এই স্ত্রীকে আমার বেশ ভাল লাগল কিন্তু। ভদ্রমহিলা নাকি বিয়ের আগে কোনও স্কুলের মিষ্ট্রেস্‌ ছিলেন। সমরেশ তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে তিনি আমায় অনেক করে বল্‌লেন একদিন তাঁদের বাড়ীতে যেতে। আমার অবিশ্যি এখনও যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।"

দীপক চুপ করে শুনে গেল—কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। তপন বল্‌ল—"জানই ত সমরেশের সঙ্গে আমাদের ক্লাশের সেই উজ্জ্বলা মিত্রের ভাব ছিল। পরে ওদের বিয়েও হয়েছিল। সমরেশের বাবার এবিয়েতে খুবই আপত্তি ছিল। অসবর্ণ বিয়ে। তার জন্যে যত না হক্‌ উজ্জ্বলাকেই তাঁর পছন্দ ছিল না। বিয়ের পর সমরেশ ও উজ্জ্বলা দু'জনে একসঙ্গে বিলেত গিয়েছিল। তারপর বছর পাঁচেক আগে একদিন কাগজে পড়লাম ওদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলার কথা। উজ্জ্বলাই তার স্বামীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ এনে মামলা করেছিল। সমরেশ নিজেকে ডিফেণ্ড ক'রল না। বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেল। ওদের একটি ছেলেও আছে। কিছুদিন পরে শুন্‌লাম উজ্জ্বলা সমরেশের এক বাল্যবন্ধু এক মস্ত বড় কলিয়ারীর মালিক—সুধীর দত্তকে বিয়ে করেছে। তুমি ত উজ্জ্বলাকে জান্‌তে। সে যেন রবীন্দ্রনাথ কল্পিত উর্বশী—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। একেবারে ultra-modern যাকে বলে। সেদিন দেখলাম গ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবে একজন মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে বসে খুব ড্রিংক করছে।"

দীপক চুপ করে শুনে গেল—ভালমন্দ কোন কথাই বল্‌ল না। শুধু তার মনে হল একদিন সে এই উজ্জ্বলাকে নিয়ে একটি সুখের সংসার পাতবে বলে আকাশকুসুম রচনা করেছিল—তাকে তার জীবনসঙ্গিনী করবার স্বপ্ন দেখেছিল। তার সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল] তখনও সে সুভদ্রাকে বিয়ে করতে চায়নি। উজ্জ্বলার পাশে সুভদ্রাকে সেদিন তার বড়ই ম্লান বলে মনে হয়েছিল। উজ্জ্বলাই সেদিন তার কাছে নারী-চরিত্রের আদর্শ ছিল যেহেতু সে সুন্দরী, শিক্ষিতা ও আধুনিকা। আজ তার মনে হ'লো—"All that glitters is not gold"। তবে কি মানুষ তার আদর্শকেও তার নিজের মন দিয়েই গড়ে নেয়?

কয়েকদিন কলকাতায় থেকে দীপক কাজের জন্যে বড্ডো ব্যস্ত হয়ে উঠল। কতদিন আর এরকম ভাবে কাটান যায়? সে শুনেছিল তপনদের জমিদারীর অবস্থাও এখন তেমন ভাল নয়। সে কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। সে স্থির করল যেমন তেমন একটি চাকুরী পেলেই সে একটা মেসে উঠে যাবে। একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখল, সুমিত্রাদেবী বলে কে একজন তাঁর একটি দশ বছরের ছেলের জন্যে একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষক খুঁজছেন। দীপক ঐ কাজের জন্যে তাড়াতাড়ি একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দিল এবং সুমিত্রাদেবীর

সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনাও করল। যথাসময়ে তার দরখাস্তখানির উত্তরও এল। সুমিত্রাদেবী তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে তাকে দেখা করতে লিখেছেন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যেবেলায়। একদিন সন্ধ্যেবেলা কলকাতার একটি রাস্তায় দীপক স্বল্পালোকে একটি বাড়ীর নম্বর খুঁজছিল। রাস্তা দিয়ে একটি যুবককে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতে পারেন ৬৭-বি নম্বরের বাড়ীটা কোথায়?"

"এই গলির মধ্যে ডানহাতি তৃতীয় বাড়ীটা।"

"ধন্যবাদ" বলেই দীপক এগিয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির দরজার কড়া নাড়তেই একটি পশ্চিমা দরোয়ান গোছের লোক এসে দরজা খুলে দিল। লোকটি দীপকের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। দীপক জিজ্ঞেস করল—"এটা কি সুমিত্রাদেবীর বাড়ী?"

"হাঁ। আপনি কাকে মাঙ্গসেন?"

"সুমিত্রাদেবী বাড়ীতে আছেন?"

"হাঁ। আপনার কি নাম আছে? হামি কাগজ পেন্সিল লিয়ে আস্‌ছি। আপনি আপনার নামটা একটু লিখিয়ে দিবেন।" দীপক কাগজে তার নাম লিখে দিল। খানিক পরে লোকটি ফিরে এসে বলল—"আসুন। মাইজী উপরে বসতে বলিয়েছেন।" বলে তাকে দ্বিতলের একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বসতে বলে চলে গেল। একটু পরেই একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, "মা সন্ধ্যে দিয়ে আসছেন। আপনাকে একটু বসতে বললেন।"

দীপক বসে বসে ঘরটির চারদিক দেখতে লাগল। বেশ সুসজ্জিত ঘরটি—আধুনিক রুচিতে সাজান। দেখলেই গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলা এসে নমস্কার ক'রে বললেন—"আপনাকে একটু বসিয়ে রাখতে হল। কিছু মনে করবেন না।"

দীপক অনুমানে বুঝল ইনিই গৃহকর্ত্রী সুমিত্রা দেবী। ভদ্রমহিলা বিধবা—পরণে একখানি সাদা থান ও একটি সাদা ব্লাউজ। বয়স ত্রিশের কিছু কমই হবে ব'লে মনে হয়। বেশ সুশ্রী চেহারা—মুখের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যে, দেখলেই ভালো লাগে। দীপক প্রতিনমস্কারে কোনও ভূমিকা না ক'রেই ব'লল—"আমার নাম দীপক বসু। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে লিখেছিলেন। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আপনি আপনার ছেলের জন্যে একটি গৃহ-শিক্ষক চান ব'লে, আমি ঐ কাজের একজন প্রার্থী। আমাকে যদি এই কাজের যোগ্য ব'লে মনে করেন ত আমি এই কাজ ক'রতে পারি। সম্প্রতি আমার একটি কাজের বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমার আগেকার ইতিহাসটাও আপনাকে জানান উচিত। সব জেনেই যদি আমায় রাখা সমীচীন মনে করেন, তবেই রাখবেন। ১৬ বছর আগে রাজদ্রোহ অপরাধে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'য়েছিল আমরা একদল একটা বোমা তৈরীর মামলায় ধরা প'ড়েছিলাম। সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।" দীপক আপন মনেই ব'লে চ'লছিল—সুমিত্রা দেবীর মুখের দিকে চাইবার তার অবসর ছিল না। চাইলেই দেখতে পেত, তিনি যেন কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। দীপককে তার কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই তিনি ব'ললেন—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রছি। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আপনি কি ২৪ পরগণার বিলাসপুর গ্রামের ৺অলক বসুর ছেলে? রায় বাহাদুর অধরচন্দ্র ঘোষের ভাগ্নে?"

"হ্যাঁ। আপনি কি ক'রে জানলেন? আপনি আমার বাবাকে চিনতেন নাকি?"

মহিলাটি তখন হেসে ব'ললেন—"আমায় তুমি চিনতে পারছ না, দীপু দা? আমি ভদ্রা—তোমার সইমার মেয়ে।" বলেই সে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দীপককে প্রণাম ক'রতে গেল।

"আরে, আরে কর কি? তুমি ভদ্রা? তোমার চেহারা কত বদলে গিয়েছে। চিনবারই জো নেই।"

"চেহারা বদলাবে না? বুড়ো হ'তে চ'ললাম। তোমার সঙ্গে কত কাল পরে দেখা বল তো? এর মধ্যে কত ঝড়ঝাপ্‌টা মাথার উপর দিয়ে গেল" ব'লে সুভদ্রা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লবার পরে সুভদ্রা ব'লল—"দীপুদা, তুমি একটু বস। আমি একটু আস্‌ছি। আজ কিন্তু তোমায় না খাইয়ে ছাড়ছি নে। কতদিন পরে দেখা। আজ সইমা বেঁচে থাকলে তাঁর কত আনন্দ হ'ত, এতদিন পরে তোমায় পেয়ে। তোমায় দেখে অবধি আমার খালি সেই কথাই মনে হচ্ছে।" ব'লে সুভদ্রা চলে গেল। একটু পরেই সে নয় দশকের একটি প্রিয়দর্শন বালককে নিয়ে ঘরে ঢুকল—ছেলেকে ব'ললো—"আশীষ, এঁকে প্রণাম কর। ইনি তোমার মামা হন।"

ছেলেটি তার মা'র কথামত প্রণাম ক'রতেই দীপক তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'লল—"এইটিই বুঝি তোমার ছেলে, ভদ্রা?"

"বাঃ! খাসা ছেলেটি ত!—খোকা তোমার নাম কি? কি পড়?"

"আশীষকুমার বসু। আমি এখনও কোনও স্কুলে ভর্ত্তি হই নি—বাড়ীতেই মাষ্টারের কাছে পড়ি।"

সুভদ্রা ছেলেকে ব'ল্‌ল—"আশীষ তুমি এবার প'ড়তে যাও।" আশীষ চ'লে যাবার পরে ব'ল্‌ল—"তারপর, দীপুদা, তোমার সব খবর এখন বল।—আমার কি ভাগ্যি! এতকাল পরে এইরকম ভাবে দেখা পেলাম।"

দীপক ব'ল্‌ল—"আমার আর কি খবর থাকতে পারে বল? এতকাল ত আমার জেলেই কাট্‌ল। জেলের সেই ব্রকঘেঁয়ে বন্দী জীবনে একরকম অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম।—জেলে বসেই শুন্‌লাম মা'র মৃত্যু-সংবাদ। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তুমি ত জান আমায় ছোটটি নিয়েই তিনি বিধবা হ'য়েছিলেন। কত কষ্ট ক'রে ভাইয়ের বাড়ীতে থেকে আমায় কলেজে পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বড় আশা ছিল—আমি পাশ ক'রে চাক্‌রী বাক্‌রী ক'র্‌লে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু তাঁর দুঃখ ঘোচান ত দূরে থাক্ আমি তাঁকে আরও দুঃখ দিলাম। আমার গর্ভধারিণী মা—যিনি তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে আমায় বড় ক'রেছিলেন—তাঁর চেয়েও সেদিন বড়ো ব'লে মনে হ'য়েছিল দেশকে। তাই মা'র অশ্রুজল, তাঁর কাতর মিনতি—আমায় টলাতে পারে নি আমার কঠিন-সঙ্কল্প থেকে। মা'র ব্যথা আমি যে বুঝি নি তা নয়—কিন্তু তা'র চেয়েও ঢের বেশী বড় ব'লে মনে হ'য়েছিল দেশের দুঃখটাই।—মামা ছিলেন রায় বাহাদুর খেতাব-ধারী সরকারী বড় চাকুরে। পাছে তাঁর বিপ্লবী রাজদ্রোহী ভাগ্নের জন্যে গভর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়েন, এজন্যে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। শেষে তিনি স্পষ্টই মাকে ব'লে দিলেন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর বাড়ীতে তাঁর স্থান হবে না। শুনেছি আমি জেলে যাবার পর মা আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়েই ছিলেন। কত কষ্ট পেয়েই হয় ত তিনি মারা গিয়েছেন!"

"হ্যাঁ, তুমি জেলে যাবার পরে কাকীমা গ্রামের বাড়ীতে গিয়েই উঠেছিলেন।"

"শুনেছি, তুমি নাকি সর্ব্বদাই তাঁর খবরাখবর নিতে। তোমার ঋণ আমি কোনদিন শুধ্‌তে পার্‌ব না, ভদ্রা।"

"ছি! ও কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দিও না, দীপুদা! আমি আর কাকীমাকে কি এমন দেখাশুনা ক'র্‌তে পেরেছি? আমার নিজের মাথার উপর দিয়েও অনেক ঝড় ব'য়ে গিয়েছে।" ব'লে সুভদ্রা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"জানই ত আমার মায়ের অবস্থাও কতকটা সইমার মতই ছিল। মাকে তার দেওরের বাড়ীতে একটি আইবুড় মেয়ে নিয়ে থাক্‌তে হ'ত। এ ধারে কাকা তাঁর গলা কাঁটা নামাতে পার্‌লেই বাঁচেন! তিনি একরকম জোর ক'রেই আমার বিয়ে দিলেন একজনের সঙ্গে। আমার স্বামী মানুষটি যে নেহাৎ মন্দ ছিলেন তা নয়—যদিও তাঁর একটু সন্দেহবাই ছিল। তাঁর বড় দুই ভাই টি-বিতে মারা যান ব'লে অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি বিয়েই করেন নি। বিয়ের পরে বছর চারেক আমাদের এক-রকম কেটেছিল—সুখেদুঃখে। একটি মেয়ে ও একটি ছেলেও হল। মেয়েটি বছর খানেকের হ'য়ে মারা গেল। তারপর ছেলেটি যখন মাস ছয়েকের তখন আমার স্বামীর পক্ষাঘাত হ'ল। আমার মাথায় উপর যেন আকাশ ভেঙে প'ড়্‌ল। ঘরে অসুস্থ স্বামী ও একটি শিশু। রোজগার ক'রবার কেউ নেই। যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল তা দু'দিনেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল। কেরাণীর আর কতই সঞ্চয় থাক্‌তে পারে বল? লেখাপড়াও এমন শিখি নে যে চাকরী ক'রে সংসার চালাতে পারি। দাসীবৃত্তি করা ছাড়া আর উপায় দেখ্‌লাম না। কিন্তু তাতে ত সংসার চলে না। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসাই বা করাই কি ক'রে? টাকার ভাবনায় আমি যেন পাগল হ'য়ে গেলাম। শেষে অন্ধকারে হঠাৎ যেন একটা পথ দেখ্‌তে পেলাম। তুমি ত জান গান বাজনার দিকে আমার ছোটবেলা থেকেই একটু ঝোঁক ছিল। যদিও কেউ কোনদিন শেখায়নি তবু একটু আধটু আবৃত্তি ও অভিনয়ও করতে পারতাম। শুনেছিলাম আমার এক মামাতো ভাই, সৌরীনদা সিনেমায় নেমে বেশ কিছু পয়সা করেছেন। নিরুপায় হয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। দু'একজন ফিল্ম ডিরেক্টারের সঙ্গে সৌরীনদার বিশেষ পরিচয় ছিল। একটা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রও সই করলাম, অবশ্য কাউকে না জানিয়েই। প্রথমে আমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন। আমি কারুর কথা শুনলাম না। স্বামী ও ছেলে না খেয়ে মরে যাবে এত আর চোখে দেখা যায় না। আমার মতে মেয়েমানুষ তার নিজের মান রাখতে জানলে জগতে কোনও পুরুষেরই সাধ্য নেই তাকে অসম্মান করতে পারে। দেশের বাড়ী থেকে মাকে আনিয়ে নিলাম। আমি বাইরে বেরুলে বাড়ীতে অসুস্থ স্বামী ও ছেলেটিকে দেখে কে? বছর দুই পরে আমার স্বামী মারা গেলেন। আমি সেই থেকে এই কাজই করছি। ভগবানের কৃপায় আজ আমার অর্থের কোনও অভাব নেই। যাক্! এতক্ষণ নিজের কথাই ব'লে গেলাম। তোমার কথা ত কিছু শোনা হ'ল না। তুমি কবে ছাড়া পেলে? এখন কি করছ?"

"কিছুই করছি নে। সম্প্রতি একেবারেই বেকার। দেখছ

ত চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার কাছে কাজের প্রার্থী হয়েই আজ এসেছিলাম। জেল থেকে বেড়িয়ে দেশের বাড়ীতে ওঠাই ঠিক করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার সামান্য যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তাও বেদখল হ'তে বসেছে। আমাদের বাড়ীতে আমার জ্ঞাতি ভাই প্রভাত দাদা সপরিবারে বাস করছেন। আমি গ্রামে আমার বাল্যবন্ধু সুবল চাটুয্যের বাড়ীতেই ক'দিন থাকলাম। তারা অবিশ্যি আমার খুবই আদর যত্ন করেছিল। তারপর ক'লকাতায় আমার একজন বন্ধু ও সহপাঠীকে আমার একটি কাজ খুঁজে দেবার জন্যে লিখলাম। তিনি আমায় ক'লকাতায় চলে আসতে লিখলেন। আমি সম্প্রতি তাঁর বাড়ীতেই আছি। ইচ্ছে—আমি একটা চাকরী বাকরী পেলে একটা মেস্-টেস্ ঠিক ক'রে নিয়ে সেখানে উঠে যাব। কতদিন আর পরের বোঝা হয়ে থাকা যায়?

ভদ্রা চুপ করে সব শুনল—পরে বলল—"সত্যি, দীপুদা, তুমি আমার ছেলের ভার নেবে? তা' হলে ত আমি বাঁচি। তোমার মত মাষ্টার আমি কোথায় পাব? কতদিন তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছি তুমি ফিরে এলে একদিন আমার আশীষকে তোমার হাতেই সপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত হ'ব। আমি শুধু ওকে লেখাপড়া শেখাতে চাই নে—সত্যিকারের মানুষ ক'রতে চাই। তুমিই তাকে সত্যিকারের মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারবে। অনেক দিন ত টাকা রোজগার করলাম। ভোগে আমার স্পৃহা নেই। সংসারে আমার একটিমাত্র বন্ধন—আমার ছেলে। তাকে ও আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার হাতে দিয়ে আমি কোনও আশ্রমে গিয়ে থাকব। আমি জানি, তুমি আমার আশীষকে আমার চেয়েও ভাল ক'রে তুলতে পারবে। তোমার সঙ্গে আমার আবার যে এইরকম ক'রে দেখা হ'ল এর মধ্যেও ভগবানের কোনও শুভ ইচ্ছা আছে—আজ আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।—তুমি কি করবে কিছু ঠিক ক'রেছ কি?"

"না, কিছুই ত ঠিক করিনি এখনও। যা করতে যাবো তাতেই ত টাকার দরকার। জেল থেকে ত কপর্দকশূন্য হ'য়ে বেরিয়েছি। ষোল বছর আগে যখন জেলে ঢুকেছিলাম তখন আমি ২১ বছরের তরুণ যুবক, আর আজ আমি ৩৭ বছরের প্রৌঢ়। তখনকার সেই আশা, উৎসাহ ও উদ্যমের এখন আর কিছুই অবশিষ্ট আছে বলে ত মনে হয় না। এখন নতুন করে জীবনকে গ'ড়ে তোলাও কঠিন। যা হক্, কিছু টাকা থাকলে আমি গ্রামে গিয়েই থাকতাম। এখন আমার মনে হয় গ্রামে আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি তারা সকলেই যদি গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হই তা হলে আমাদের দেশের গ্রামগুলির অবস্থা কোনদিনই ভাল হবে না। তাই ভাবছি হাতে কিছু টাকা পেলে আমি আমাদের গ্রামে গিয়ে একটা স্কুল খুলব। দেশে সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলা নিতান্তই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। জেলে থাকতে এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছিও। এখন মনে হচ্ছে বিপ্লবী দীপকের সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। আমার মনে হয় সেদিন আমি যদি বিপ্লবের পথ বেছে না নিয়ে দেশের ছেলেদের মানুষ ক'রবার ভার নিতাম তাহলে হয় ত প্রকৃত দেশের কাজই ক'রতাম; দেশের স্বাধীনতার পথটিও তা'তে ক'রে উন্মুক্ত হত। আমার মাও ত শেষে তাই চেয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি মহাত্মাজী কেন ব'লেছেন—চরকাই আমাদের স্বরাজ আনবে।" ব'লে দীপক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল। সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর দীপক যখন যাবার উদ্যোগ ক'রছে, সুভদ্রা ব'ল্‌ল—"টাকার জন্যে তুমি একটুও ভেবো না, দীপুদা। তোমার পথ তুমি বেছে নাও। তোমার যা টাকার দরকার আমি দেব। তুমি আমার টাকা নিতে কিছুমাত্র সংকোচ ক'রো না। একজন হিন্দু বিধবার টাকার এমনই বা কি দরকার? আমার মনে হয় যে টাকা দেশের ও দশের কাজে লাগল না তার কোনও সার্থকতা নেই। ছোট বেলা থেকে আমি ত তোমার কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। আমি তো তোমারই হাতে গড়া, দীপুদা। তুমি গ্রহণ ক'রলেই আমার টাকা সার্থক হবে। লোকে পাঁচ কথা বলবে জানি। কিন্তু সংসারে সব সময় লোকের কথা শুনলে চলে না।"

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে দীপক যখন বাড়ী ফিরছিল তখন তার কেবইল মনে হতে লাগল এতদিনে সে যেন তার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতার পথটি খুঁজে পেয়েছে—এতদিনে জীবনের লক্ষ্য সে স্থির ক'রতে পেরেছে। জীবনের এতগুলি বছর সে যেন শুধু অন্ধকারেই পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে—কায়া ছেড়ে শুধু ছায়ার পেছনেই ছুটে এতদিন সে যা-কিছু আদর্শ বলে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সবই আজ মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে। একদিন যাকে সে অশিক্ষিতা গ্রামের মেয়ে ব'লে উপেক্ষা করেছিল সেই সুভদ্রাই আজ তাকে ধ্রুব তারার মত জীবনের ঠিক পথটি দেখিয়ে দিল। সংযম ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি এই মেয়েটি আজ হয় ত সমাজের দশজনের চক্ষে হেয়। তবু সে সত্য স্থির দৃষ্টিতে তার জীবনের প্রকৃত পথটি বেছে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। সত্যের এই সহজ রূপটি দেখেছে বলেই আজ সুভদ্রার কাছে মানুষের চেয়ে সমাজ বড় হ'য়ে ওঠে নি। অথচ তার দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক নিয়মগুলি সে কী অচল নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চ'লছে।

অনলাভিসার

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দীর্ঘ দিবস ধরে
গভীর মমতা ভরে হায়
বুকে করে যা' রেখেছি, যাক্,
যা কভু চেয়েছি নাকো
পেয়েও রেখেছি নাকো তায়
পরিশেষে পেয়েছি তো থাক্।
হেলায় শ্রদ্ধার ধন
করিয়াছি অযতন কত
আজ তাই তাহারেই চাই,
যাহারে চেয়েছি আগে
সুগভীর অনুরাগে যত
আজ তত সমাদর নাই।
শেষ যবনিকাখানি
মৃত্যু যবে দিবে টানি তায়
নয়নের শেষ দৃষ্টি মুছি,—
নীরব নিথর বক্ষে
নিমীলিত চক্ষে আপনায়
নিবেদিয়া করি লব শুচি।
আকাশের গ্রহ তারা
সাক্ষী সবে রবে তারা মোর
তারা মোর জন্ম-মৃত্যু সাথী—
অতন্দ্র জাগিয়া থাকি
মোর সাথে ঢালি আঁখি লোর
সাজাইবে শিশিরের পাঁতি।
সমুদ্র তুলিয়া ঢেউ
তাহাদেরো কেউ কেউ মোরে
পিছু ডাকি দিবে হাতছানি
এ মাটির দেহ গেহ
বাঁধিয়া ছন্দেছন্দ স্নেহ ডোরে
কাটিতে ছিঁড়িবে মর্ম্ম জানি।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে
তোমার আহ্বান রাজে গুণী
কানে যেন বাঁশীখানি বাজে,
আমি করি অভিসার
সর্ব্বনাশা ধ্বনি তার শুনি
পতঙ্গের মত বহ্নি মাঝে।

প্রদীপ

শ্রীমমতা ঘোষ

বিদ্যুতেরে মুঠোর ভেতর পায়নি কেহ যবে
ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালাত সবে।
স্নিগ্ধ নরম আলোখানি
শান্তি দিত চক্ষে আনি,—
সাথী ছিল নিরালাতে মিলন মহোৎসবে।
কল টিপিলে অমনি আজ বিজলিবাতি পাই,
দিনের আলোর মত উজল হয় যে সকল ঠাঁই।
কে গো এসে এমন কালে
আস্তে প্রদীপখানি জ্বালে?
মানায় নাকো হেথায় ওরে বুঝিস্ না কি ভাই।
সহরে ও সঙ্কুচিত—নেহাত বেমানান্,
ভীরু ও-যে, নয়কো প্রখর, নয় রে দীপ্যমান।
লাজুক বড়—তাইতো জোরে
ফোটে না ও তেমন ক'রে;
জোরালো এই আলোর মাঝে তাই মেলে না স্থান।
মনে পড়ে সেদিনগুলি—সেই যে আঁধার হ'লে
খাওয়া সেরে শুতাম যখন ঠাকুরমায়ের কোলে,—
একটি প্রদীপ ঘরের কোণে
কিরণ দিত আপন মনে,
আধেক আলো অন্ধকারে যেতেম কোথায় চ'লে।
চ'লে যেতাম কল্পলোকে রূপকথারি দেশে
পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে তেপান্তরের শেষে।
দিনের বেলায় এমন ক'রে
যায় না দেখা নয়ন ভ'রে—
প্রদীপখানির স্নিগ্ধ আলোয় দাঁড়াত সব এসে।
আলো আঁধার এক হয়েছে—তফাত আজি কই?
রাতের বেলার দীপ্তি দেখে অবাক চেয়ে রই।
তাইতো বলি প্রদীপ ওরে
এখান থেকে চল্ রে স'রে—
নিলাজ সহর দিন কাটাবে শান্ত প্রদীপ বই।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অমৃতলালের কথা থিয়েটারের প্রসঙ্গ হইলেই শুনিতাম। এ প্রসঙ্গ ভালও লাগিত, আর আমাদের ছাত্রাবস্থায় প্রায় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ছেলেরাই সখের থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এ বিষয়ে আলাপও করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ষ্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' খুব সাফল্য গৌরবে অভিনীত হইতেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল তখন ষ্টারের ম্যানেজার ও অন্যতম সত্ত্বাধিকারী। ষ্টার সে সময়ে হাতীবাগানে ৯১।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে।* আজও অবশ্য ষ্টার সেই স্থানেই রহিয়াছে। অমৃতলালের সে সময়ে চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস, আমি তখন জুবিলি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Calss IX)এ পড়িতাম। গ্রীষ্মের ছুটির তখনও বিলম্ব ছিল। এমন সময় ঢাকায় ষ্টার থিয়েটার সম্পর্কে নানারূপ আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল। নবাব বাহাদুর স্যার আবদুল গণি সাহেবের বাড়ীর কোন একটি ছেলের অন্নপ্রাসন কি অন্য কি ব্যাপার উপলক্ষ্যে ষ্টার থিয়েটার নবাব বাড়ীতে ছয় রাত্রি অভিনয় করিতে আসিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আমাদের জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয় প্রসন্ন সেন নবাব বাড়ীতে কাজ করিতেন। ২।৩ দিন পরে তাহার মারফত একখানি টিকিট যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার সময় নবাব বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কি নূতন জিনিষ দেখিলাম তাহার বর্ণনা এখানে আর করিব না, তবে 'একাকার' প্রহসনটির অভিনয় শেষ হওয়ার পরেই অমৃতবাবু মঞ্চের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্পষ্ট এবং গম্ভীর স্বরে নবাব সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রায় দশ পনেরো মিনিট বক্তৃতা করেন। তিনি তখন কোট প্যাণ্ট পরিহিত ছিলেন, আর অভিভাষণ দেন ইংরাজীতে। তাঁহার কণ্ঠে

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

ইংরাজী বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে এই প্রথম অমৃতলালকে দেখিলাম। 'একাকারের' পরে সে রাত্রে 'রামাশ্বমেধ'ও হইয়াছিল।

নবাব বাড়ীতে ছয় রাত্রি অভিনয়ের পরে ষ্টার কোম্পানী টিকেট বিক্রয় করিয়া আবার স্থানীয় ক্রাউন থিয়েটারে ছয় রাত্রি অভিনয়ের বন্দোবস্ত করে, সেখানেও বাসার কয়েকজনের সঙ্গে 'নরমেধ যজ্ঞ' ও 'কালাপাণি' দেখিলাম। উভয় স্থানেই 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হইয়াছিল, আর উহার প্রশংসায় ঢাকা সহর সর্ব্বত্র মুখরিত হয়।

ক্রাউন থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে কৌতূহলবশতঃ আমি একদিন বৈকালে থিয়েটারের বহিঃপ্রাঙ্গনে গিয়াছিলাম। ক্রাউন থিয়েটার তখন ঢাকা কলেজের পশ্চিম দিকে ব্রাহ্মসমাজের উত্তরে অবস্থিত ছিল। সেখানে দেখিলাম বাহিরে তিনি আলাপ করিতেছেন, আর সকলে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাহা শুনিতেছে।

---

* ১৮৮৩—১৮৮৭ পর্য্যন্ত ষ্টার ছিল বিডন ষ্টিটে, ১৮৮৮ হইতে বর্ত্তমান বাড়ীতে আছে।

একজন ভদ্রলোকের রংটা বড় কালো ছিল। অমৃত বাবু কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বেশ রসিকতার সহিতই বলেন, "মশায়ের নামটি কি?"

—"আজ্ঞে দুর্গাচরণ মজুমদার।"

"সে কি, দুর্গাচরণ? দুর্গাচরণ না হ'য়ে কালীচরণ হ'লেই বোধ হয় মানাত।" কথাটায় যেন একটু অশিষ্টাচার ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বলিবার ভঙ্গিমাতে সকলেই সেই রসামোদ উপভোগ করিয়াছিল।

ইহার পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সময় একদিন ষ্টার থিয়াটারে দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি সেদিন উপরেই বসি, দেখিলাম অমৃতলাল আসিয়া কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করেন। আমি বলিলাম, "চন্দ্রশেখর শীঘ্র দেখান না কেন?"

চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে আমার একটি বন্ধু কলিকাতায় দেখিয়া আমাকে এতদ্ সম্বন্ধে লিখিয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে চন্দ্ররশ্মি ও শৈবলিনী এবং প্রতাপের সাঁতার নাকি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর দেখিতে আমার বরাবর আগ্রহ ছিল। অমৃত বসু উত্তর করেন, "আমাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ হবে। তারপরে ঠিক করব।" সামান্য আলাপেও অহঙ্কার দেখিলাম না, তবে গাম্ভীর্য্য ছিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই "চন্দ্রশেখর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ইহার পর ছয়বৎসর পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পরে অমৃত বসুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। অতঃপরে যখন আমি গিরিশচন্দ্রের জীবন চরিত লিখিতে উদ্যত হইলাম, তখন ঘনঘন যাইতাম। প্রতি বৈকালেই তিনি শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলে আসিয়া বসিতেন। সেখানে নানা রকমের লোক আসিতেন। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যাহা জানিবার তাহা আমি জানিয়া নিতাম। তাহার সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা এত ভাল লাগিত যে কাছারীর পর ৩।৪ ঘণ্টা কিরূপে অতিবাহিত হইত টেরই পাইতাম না। অনেকদিনই ট্রাম পাই নাই, সেয়ারে ঘোড়ার গাড়ীতে বাসায় ফিরিতে হইয়াছে। এরূপ কথোপকথনের অনন্যসাধারণ শক্তি আমি জীবনে আর একজনের মাত্র দেখিয়াছি, তিনি আমাদের শিক্ষক পরেশনাথ ঘোষ—ডনপীড়। কিন্তু তিনিও বেশীক্ষণ চালাইতে পারিতেন না। অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্তিবোধ করিতেন। আর অমৃলালের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিত বিনা আয়াসে—অবিরামে।

অমৃতলালের অসংখ্য বক্তৃতাও শুনিয়াছি। তিনি কথা কহিতেন, আর সমস্ত দর্শকমণ্ডলী হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইত। একদিনের কথা বলিতেছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সভা হইতেছিল। বক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি অনেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। অমৃতলাল প্রায় পোনর মিনিট বলিয়াছিলেন, এবং এই সময় মধ্যে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক আমি দেশবন্ধুর এত সরস ও হৃদয় ভরা উচ্চ হাসি কখনও দেখি নাই। তিনি তখন নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবিশ্রান্ত ভাবে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেদিন হাসিটি তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনুকূল ও হিতকর হইয়াছিল তাহা পার্শ্বে থাকিয়া আমিই জানিতাম।

কথাবার্ত্তায়ও তাঁহার সরসতার একটু পরিচয় দিই। একবার একটি ভদ্রলোক অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হন্। অমৃতবাবু তখন শ্যামবাজারে ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্র লেনে থাকিতেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি অনবরত ৯ মৈত্রের লেনই খুঁজিতে ছিলেন। দেখা হইবামাত্র ভদ্রলোকটি বলিলেন—"মশায় অনেক খুঁজেছি—কিন্তু ভুল ঠিকানা ব'লে বড় ঘুরতে হয়েছে।"

অমৃতবাবু—"কে আপনাকে ঐরূপ ভুল ঠিকানা দিলে?"

"আজ্ঞে আপনাদের একজন অভিনেতা।"

ওঃ অভিনেতা কিনা, তাই ঘুরেছেন! ওরা অর্দ্ধেক মুখস্থ করে, অর্দ্ধেক প্রম্‌টে বলে—তাই প্রম্‌টের টুকু আর আপনাকে বল্‌তে পারে নাই। সেই সহাস্য সরসোক্তিতে ভদ্র লোকের শ্রম অপনোদিত হইল।

অমৃতলালের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। বেশ খাইতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সে গল্প করিতে করিতে অনেকগুলি

মাছ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই পেটের পীড়া জন্মে, সম্ভবতঃ কিছু অনিয়ম হইয়া থাকিবে, তাই বোধ হয় ঐ অসুখই কাল-অসুখে পরিণত হয়।

অমৃতলালের অভিনয় নিজে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তরুবালার বেহারী খুড়ো, কালাপানির তিনকড়ি মামা, বিবাহ বিভ্রাটে মিঃ সিং, আর খাসদখলে নিতাই খুবই ভাল হইত। দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ নাটকে শক্তসিংহ এবং মৃতা গোপাল কবিরাজের হরিশ্চন্দ্র নাটকে বিশ্বামিত্রও বেশ ভাল হইত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিকবাজারে' ছুকড়ি সেন ও 'প্রফুল্ল নাটকে' রমেশ চরিত্রাভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটারে যে অন্যান্য থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীগণের সঙ্গে মিলিয়া 'বলিদান' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে করুণাময়ও নিন্দনীয় হয় নাই। সিরিয়াস্ অপেক্ষা সিরিও কমিক্ নেভ্ জাতীয় (রমেশ, রূপচাঁদ) ভুমিকায় বেশী ভাল হইত। মিনার্ভার "সধবার একাদশী"র নিমচাঁদও বেশ সরস মনে হইয়াছিল। তাহার ব্যঙ্গ ও হাস্যরস পূর্ণ অভিনয়ের গিরিশচন্দ্র খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন—

"হাস্যরসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু, বেলবাবু এবং ভুনিবাবু তিনজনই ছিলেন অদ্বিতীয়।"

তিনজনই সমসাময়িক ছিলেন এবং একসঙ্গে অভিনয় করিতেন। বস্তুতঃ শ্লেষ প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে অমৃতলালের তুলনা ছিলনা।

গিরিশচন্দ্রকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন—গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কোহিনুর থিয়েটারে তাহার রচিত যে কবিতাটি পঠিত হয়, তাহার মর্ম্ম ছিল—

"হে সুখী, গুরু, মিত্র, তুমি ত চলিয়া গিয়াছ, তোমার এই প্রিয় শিষ্যের একটু স্থান তোমার চরণে রাখিও—

"প্রিয় শিষ্য তরে স্থান রাখিও চরণে।"

উক্ত প্রশস্তিতে গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা এবং রঙ্গালয়ে তাঁহার অবদান সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে এবং নাট্যশালার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে—

"লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা

নাট্যশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার

বাজে সিঙ্গা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল

বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়

ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হলেন ধন্যা

গণিকা গুণীর গণ্য কেঁদে লুটে কৃষ্ণপায়।

গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা

দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে

শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে

সেই ইষ্টে দৃষ্টি-করে কবি ব্যাকুলিত চক্ষে।

অভিনয় সম্বন্ধেও অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের খুব প্রশংসা করিতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করি—"গিরিশ চন্দ্র আর অমৃত বাবুতে (মিত্র) অভিনয়ের কি তফাৎ ছিল?"

তিনি বলেন, "ওঃ খুব তফাৎ, গুরুশিষ্যে যে তফাৎ সেই তফাৎ।"

এই অভিনেতা অমৃত মিত্রও খুবই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জলদগম্ভীর মধুকণ্ঠে তাহার আবৃত্তি হইত অনন্য সাধারণ।

আমায় একদিন বলেন, "হেমবাবু, গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু নন, মনুষ্যত্বেরও গুরু ছিলেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও যে আমি তার কাছে কত ঋণী তা আমি তোমাকে কি বল্‌বো? পরমহংসদেব আমাদের থিয়েটারে আসবার পর থেকে ১৮৮৪-৮৫ তিনি অনবরত 'মা' 'মা' করতেন, আমরাও সবাই 'মা' 'মা' করতাম। একদিন আমি বলি 'মশায় ডাকিতো, কিন্তু শান্তি পাই না, এর চেয়ে না ডাকাই বরং ছিল ভাল। খানিকক্ষণ তিনি চুপ ক'রে রইলেন, তার কিছুক্ষণ পরে ষ্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, সেখানকার জায়গাটা ছিল অন্ধকার, সেইখানে আমায় ডাকলেন এবং তিনি আসনপিঁড়ি হয়ে বস্‌লেন। আমাকেও সেইরূপ সম্মুখে বসতে বললেন, পরে আমার উরুতে তাঁর দুইখানি হাত রেখে শ্যামা নামের স্তোত্র ঘন ঘন পাঠ (আবৃত্তি) করতে লাগলেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে কি মধুর ও গম্ভীর শোনাচ্ছিল। তাঁর

উপদেশমত আমিও তাঁর দুই উরুতে দুই হাত দিয়ে তাঁর সঙ্গে স্তব পাঠ কর্ত্তে লাগলাম, একটু পরে দেখলাম আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে, শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলতে লাগল, একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল, আনন্দে আমি তাঁর পা আঁকড়িয়ে ধরে বললাম—"গুরো, আজ আমায় মাকে ডাকিয়েছ, খুব ভক্তিভরে মাকে ডেকেছি, এরূপ আনন্দ, শান্তি ও উল্লাস ইতিপূর্ব্বে কখনও অনুভব করিনি। আপনিই আমার খাঁটি গুরু।"

আর একটি ঘটনা বলি—১৯০৫, দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণাপ্রতাপ" ষ্টারে অভিনীত হয়, অমৃত মিত্র হন রাণা প্রতাপ, অমৃত বসু শক্ত সিংহ, নরীসুন্দরী মেহের, বসন্তকুমারী দৌলত। অভিনয় খুব চমৎকার হয়। অমৃতলাল গিরিশ ঘোষের রচিত 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি চারিজন দূতের মুখ দিয়া বলাইয়া দেন। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে পরবর্ত্তী সপ্তাহ হইতে রাণাপ্রতাপ অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। অমৃত বাবু শুনিয়া নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দেন, "গিরিশবাবুর এই কবিতাটি দ্বিজুবাবুর এই নাটকে সংযোজিত করায় তার নাটকের মর্য্যাদা বরং বেড়েছে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে কাঁটালপাড়ায় একটি বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনী হয়। তাহাতে দেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যরথী উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তখনও আমার কোন প্রবন্ধ বাহির হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অগাধ শ্রদ্ধা বশতঃ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অমৃতলাল ও বিশিষ্ট আরও কয়েকজন সাহিত্যিক পূর্ব্বাহ্নে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। সম্মিলনীতে অমৃতলাল সরস ভাবে সেই কাহিনী বিবৃত করিয়া বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে থিয়েটারের যে বরাবর সহযোগিতা ছিল তাহাই প্রমাণ করেন, এবং বলেন "গিরিশবাবুই সর্ব্বপ্রথমে কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং মৃণালিনীর অভিনয়ে গিরিশবাবু যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতে অন্য দেশ হইলে এক পশুপতির ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যই তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখিয়া অমৃতলালকে আমি আরও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম। তিনিও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কয়েকদিন না গেলেই বলিতেন, "হেমবাবু, এতদিন আসো নাই কেন?"

আমাকে প্রায়ই বলিতেন, মহান্ ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করিতে আমি এ পর্য্যন্ত দুইজনকে দেখিয়াছি—এক নগেন্দ্রনাথ সোমকে, আর তোমাকে।

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু "মধু-স্মৃতি" লিখিয়াছিলেন।

অমৃতলালকে দেখিতাম অন্যের আত্মপ্রশংসা সহ্য করিতে পারিতেন না। খুব সরস ভাষায় ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর দিতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে 'গিরিশ স্মৃতিসভায়' অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, অমৃতলাল প্রমুখ কয়েকজন নাট্যকারও উপস্থিত ছিলেন।

একজন বক্তা বলেন, "গিরিশবাবু নাট্যকার ছিলেন, আমিও নাট্যকার, আমার বেশী বলা শোভা পায় না।"

শেষদিকে অমৃতলাল বক্তৃতার সময় বলেন, "গিরিশবাবুও নাট্যকার, আমিও নাট্যকার—যেমন হাতীরও পাঁচ পা, ব্যাঙেরও পাঁচ পা।" সকলেই ইঙ্গিতটি বুঝিলেন। উপরোক্ত নাট্যকারটিও বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

১৯২৬ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেও গিরিশ স্মৃতিসভায় প্রথমটি মিনার্ভা থিয়েটারে, দ্বিতীয়টি শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কাঁটালপাড়ায় একটা বঙ্কিম স্মৃতিসভায় তিনি মূল সভাপতি হন, রায় সাহেব অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত হন সাহিত্য শাখার সভাপতি। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্থাপিত গোলমালে তিনি সভাপতি হিসাবে যে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আজিও মনে আছে। এই রকম শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলে—এইরূপ করিতেন থিয়েটারে। ষ্টার থিয়েটারে এমনই কড়া শাসন ছিল, রিহার্সেলে ঠিক সময়ে সকলকে আসিতে হইত। বাহিরেও কেহ অভদ্রাচরণ করিতে পারিত না। একবার জনৈক দর্শক একটা অভিনেত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কি একটা কথা অসংলগ্ন ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুক্ষণ

পরে বাহিরে দর্শকটিকে ডাকাইয়া পয়সা ফেরত দিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নিয়মানুগমতা ষ্টার থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এইভাবেই গুরুদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অমৃতলাল থিয়েটারকে একটা প্রধান শিক্ষার মন্দিরে পরিণত করেন। বরং এই বিষয়ে তিনি গুরুর অপেক্ষাও অধিকতর কঠোরতা অবলম্বনে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন।

প্রায় ২২ বৎসর হইল অমৃতলালের তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার জীবনী লিখিতে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রবাবু আমাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কনিষ্ঠ পুত্র অমিবাবুও জ্যেষ্ঠের সম্মান দিতেন। দ্বিতীয় পুত্র কেতন বাবুকেও আমি পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি। শশীভূষণ বাবুর সহিত আলাপ ছিল না, তবে 'খাসদখলে' তাঁহাকে সারদার ভূমিকায় দেখিয়াছি। আজ ইঁহারা কেহই ইহলোকে নাই। কিন্তু আমি তাহাদের অনুরোধ কখনও ভুলি নাই। ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছাড়াও অমৃত বাবুকে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বাঙ্গালী বলিয়া আমি খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্বকাজে এতই সময়াভাব, আর আমারও বয়স কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাই পূর্ণ জীবনী লিখিবার আর ভরসা পাইতেছি না, বোধ হয় এ জীবনে তাহা সম্ভবও হইবে না। তাই তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে যে কথা শুনিয়াছি অথবা অন্যের নিকটে শুনিয়া তাহার নিকট হইতে যাচাই করিয়া নিয়াছি, সেইরূপ কয়েকটি স্মৃতি কথায় এই প্রবন্ধে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

ষোলের বৎসর বয়সে (১৮৬৮ খৃঃ)* তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়েন। তাহার পিতা কৈলাশচন্দ্র বসু একজন বিশেষ নামকরা শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষাদান বিষয়ে পিতার দক্ষতা, জ্ঞানস্পৃহা এবং শৃঙ্খলানুরাগ অমৃতলাল পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন মাত্র পড়িয়া কাশীতে ডাক্তারী করিতেন, তবে মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। অমৃতলাল নট জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিতেন, "১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র একটা নাটকের দল গঠন ক'রে "সধবার একাদশী" অভিনয় করেন। পূর্ব্বে আমি এই বইখানা পড়েছিলাম। কয়দিনই অভিনয় হয়। একদিন অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়, পূর্ব্বে আমি তার সঙ্গে পড়তাম। সে অভিনয়ের কথা তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—"হাঁ হে ভূনি, তুমি আমাদের সধবার একাদশী দেখতে গেলে না?"

আমি বললাম, "কি ক'রে যাই? সময় কৈ?" তার পরই জিজ্ঞেস কললাম—"হাঁ হে, তোমাদের নিমে দত্ত সাজে কে?"

অর্দ্ধেন্দু—কেন, গিরিশ ঘোষ।

আমি—কোন্ গিরিশ ঘোষ?

"বোসপাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে।"

আমি—ও সে তো বুক-কিপার হে, শুনেছি বকুনো বকুনো পান ওজার করে, সে আবার সেক্সপিয়র কি আবৃত্তি করবে? আরে ছ্যাঃ, আমি ছাড়া নিমে দত্ত কেউ পার্ব্বেই না।

অর্দ্ধেন্দু হেসে বললে—না হে, সে নিমে দত্তের পার্ট খুব ভাল করে।

আমি দেখতে গেলাম না—বোধ হয় ঈর্ষা বশেই হবে, কিন্তু পরে অনুতাপ হয়েছিল যে একদিন যার কাছে অবনত মস্তকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, তার সুখ্যাতি শুনে মনে এত রীষ হ'ল কেন?

যাক্, অর্দ্ধেন্দু শেখরের সঙ্গে খাতির থাকায় তার সঙ্গে একটু একটু ফার্স-এর মত নক্সা করতুম। ক্রমে ইচ্ছে হ'ল একটা ফার্স লিখে নিলে হয় না। গিরিশ ঘোষ নাকি এরূপ লিখে দিতেন। একদিন রবিবার একেবারে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে গা, তোমার নাম কি?

আমি—আমার নাম অমৃতলাল বসু—কৈলাশ বসুর ছেলে।

ওঃ, বুঝেছি বোসো, তুমি কি করছ?

---

* ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাবুর জন্ম হয়।

আমি এন্‌ট্রেন্স পাশ করেছি, তবে আমরা একটা ফার্স করব, আপনি লিখে দিন।

'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার, তাতো জানি না, ফার্স যদি তোমরা ক'রে থাক, একদিন সেইখানা নিয়ে আসবে।'

কিছুদিন পরে একখানা বই নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি পড়ে বল্লেন, বইখানা কে লিখেছে?

আমি বল্লাম—আজ্ঞে আমি।

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন—"তুমি তো মন্দ লেখনি, আচ্ছা তুমিই লেখ, আমি দেখে দেব।"

এইদিন থেকেই আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল, তাঁর কাছে যেতে লাগলুম—তার মুখে সেক্সপিয়র মিলটন আবৃত্তি শুনতুম। কি চমৎকার আবৃত্তি করতেন, আর কণ্ঠস্বরও ছিল কিরূপ গম্ভীর অথচ শ্রুতিমধুর। সব দিক দিয়েই আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল—তাঁর কাছে মাথা নত ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম।

অমৃতলাল বলেন, "সধবার একাদশীই বাঙ্গলার পাব্‌লিক থিয়েটারের মূল। এ থেকেই সাধারণ থিয়েটারের সূত্রপাত হয়।"

সধবার একাদশীর অভিনয় করিয়া গিরিশবাবু দীনবন্ধুর লীলাবতীর অভিনয় করেন। শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাড়ী বাঁধা ষ্টেজে অভিনয় হয়। যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, সিন আঁকা প্রভৃতি বিষয়ে যাহাতে পীঠশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর সম্পূর্ণ মন দিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার ক্লাশ ইনি নিতেন। ধর্ম্মদাস বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার চুণীলাল বসু প্রভৃতি সেইখানেই উহাদের কাছে পড়েন। যাহা হউক, লীলাবতীর অভিনয়ের সময়ে অমৃতবাবু কলিকাতা ছিলেন না, কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন। লীলাবতীর সময়েই থিয়েটারের নাম দেওয়া হয় "ন্যাশনাল থিয়েটার।"

ইহার পর নীলদর্পণের রিহার্সেল আরম্ভ হয়। গিরিশবাবুই সব ভূমিকা স্থির করিয়া দেন। নিজে তিনি উড্‌ সাহেবের রিহার্সেল দেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দলের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল। অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন টিকেট বেচিয়া থিয়েটার করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু গিরিশ বাবু বলেন—"অর্দ্ধেন্দু, তোমরা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম রেখে ঐ নামে টিকেট বেচে থিয়েটার করতে যেও না।"

অর্দ্ধেন্দু—কেন?

গিরিশ—"আমাদের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নাই, এই সিন ড্রেসে লোককে এমনি দেখাতে পারি আমাদের ইচ্ছে, কিন্তু টিকেট বেচে থিয়েটার কল্লে ভয়ঙ্কর সমালোচনার মধ্যে পড়ব। একেই তো ভিন্ন জাতি বাঙ্গালীর নাম শুনলেই মুখ বাঁকায়। তার উপরে আমাদের দৈন্য অবস্থা দেখলে কি না বলবে। টিট্‌কিরি দিয়ে বলবে এই এদের জাতীয় থিয়েটার। কয়জন গৃহস্থ যুবা একত্র ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার কল্লে তাতো বুঝবে না।"

কিন্তু অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি আপত্তি শুনিলেন'। অমৃতবাবু এই সময় কাশী হইতে আসিয়া অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে যোগ দেন ও সৈরিন্ধ্রির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ের তারিখ ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর। অভিনয় ভাল হয়—আর অমৃতবাবুর পার্টেরও প্রশংসা হইয়াছিল। তবে দীনবন্ধু গিরিশের অভাব খুব বুঝিতে পারেন। বলেন—"একজন গম্ভীর অংশের অভিনেতা না থাকায় অঙ্গহানি হয়েছে।"

অভিনয় হয় জোড়াসাঁকো—মধুসূদন সন্ন্যালের ঘড়িওয়ালার বাড়ীতে। বসিবার স্থান ছিল চেয়ার বেঞ্চ ও বারান্দার রক। ষ্টেজে ও দর্শকের উপরে চটের সামিয়ানা থাকিত। সুতরাং প্রথম পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশবাবু ছিলেন না। অমৃতবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন। তবে মতভেদ বেশী দিন ছিল না। দুই মাস মধ্যেই কৃষ্ণকুমারীতে ভীম সিংহ করাইতে সকলে আসিয়া গিরিশবাবুকে লইয়া যান। 'নয় শো রুপেয়া'তে অমৃতলালের রঞ্জনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

এ সময় হইতেই অর্দ্ধেন্দু বাবু এবং গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইত। এবিষয়ে 'অর্দ্ধেন্দু জীবনীতে' গিরিশ বাবুও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। তবে আমি একদিন অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলেন—

"দেখুন নাট্যকলা শিক্ষাদান করে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন স্কুলের শিক্ষক—গিরিশবাবু ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। অর্দ্ধেন্দু খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দিতে ছিলেন সিদ্ধ হস্ত আর গিরিশচন্দ্র fine psychological touches দিতে ছিলেন একেবারে বিশেষজ্ঞ। "নীলদর্পণে" আমাকে অর্দ্ধেন্দু সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় কান্না শিখিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই আমার প্রথম শিক্ষা।"

যাহা হউক, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর সত্বাধিকারিত্বে বিডন ষ্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। এটি স্থায়ী থিয়েটার। স্থানটি বর্ত্তমানে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, সেইখানে। ইহার ছয়মাস পূর্ব্বে ১৮৭৩, ১৬ই আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটার খোলা হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়ী ছিল খোলার চাল সংযুক্ত আর গ্রেটন্যাশনাল একেবারে পাকাবাড়ী।

'কাম্যকানন' লইয়া গ্রেট ন্যাশনাল আরম্ভ হয় এবং অমৃতলালই হিরো সাজেন। কিন্তু প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটারের সম্মুখভাগে হঠাৎ সামান্য আগুন ধরে, তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে বেঙ্গল থিয়েটারের ন্যায় গ্রেট ন্যাশনালও স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য অভিনেত্রী নিয়োগ করে। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম অভিনয় রাত্রি হইতেই স্ত্রীলোক অভিনেত্রী লইয়াছিল।

গ্রেট ন্যাশনালে অমৃতলাল প্রথমে হীরক চুর্ণ নাটক রচনা করেন। বরদার গায়কোয়ার সেখানকার পলিটিকাল এজেন্ট কর্ণেল ফায়ারকে হীরক চুর্ণ দিয়া তাহার প্রাণ বিনাশের ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে গদিচ্যুত হন। তাহার বিচারের জন্য একটি কমিশন বসে, তাহাতে দেশীয় মেম্বররা তাহাকে নির্দ্দোষ মনে করে, কিন্তু ব্রিটিশ সভ্যরা দোষী বলে। সমস্ত দেশে একটি আন্দোলন হয়। কারণ তাহারা অভিযোগ কাল্পনিক বলিয়া মনে করে। অমৃতবাজার প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় কাগজ গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হইয়া মন্তব্য করে। এমন কি বিলাতের টাইমস পেলমেল বজেট, বোম্বাইর হিন্দুপ্রকাশ, টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কাগজও মহারাজের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় অন্য সুর ধরেন; তিনি বলেন—

"বরং বহু গায়কোয়ারকে আমরা ছাড়িতে পারি, কিন্তু একজন লর্ড নর্থব্রুককে ছাড়িতে পারি না।" এইরূপ উক্তির জন্য হীরক চুর্ণ নাটকে তাহাকে বিদ্রূপ করা হয়। অভিনয় বেশ ভাল হয়—গায়কোয়ার হন অর্দ্ধেন্দুবাবু, আর অমৃতবাবু হন এডভোকেট জেনারেল মিঃ স্কোবল। কিন্তু নাটকখানির প্রশংসা হইলেও ইহার মধ্যে কৃষ্ণদাস পালের উদ্দেশ্যে রচিত অশিষ্টোক্তিতে তাহাকে ব্যঙ্গ করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন—

"এক কলস দুগ্ধে একটু গোমূত্র পড়িলে যেমন সমস্ত দুধটাই নষ্ট হইয়া যায়, এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে।"

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মদন বলিতেছে—

"তাইতো, হিন্দু পেট্রিয়ট এমন হলেন কেন কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা। সম্পাদক জাত্যাংশে তেলি, ইনি অনারেবল হয়েছেন।"

আয়ান—ওঃ, তাই বলি তেলি, হাত পিচলে গেলি, অনারেবল হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি তেমন প্রকৃতি মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখনো শুকপক্ষী বাস করে?

যাহাহউক, পরে শুনিয়াছিলাম কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে অমৃতবাবুর সম্প্রীতি হইয়াছিল।

"হীরকচুর্ণ নাটক" প্রথম বয়সে রচিত হইলেও অমৃত বাবু নিজে আমাকে বলিয়াছেন—অনেক কাগজপত্র ঘাঁটিয়া এই নাটকখানি খাড়া করেন। আমি নিজেও সেইরূপ দেখিয়াছি। কমিশনে সাক্ষীদের বর্ণনা ও জেরা সম্বন্ধে তিনি যে প্রশ্ন ও উত্তর তৈরী করেন, তাহাতে বেশ গবেষণা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার স্থানে স্থানে বেশ রসেরও সঞ্চার হইয়াছে। দুই একটি পরিচয় দিতেছি।

ডাক্তার সিউয়ার্ড সাক্ষ্যে বলে, "কর্ণেল ফেয়ারের সরবতের গ্লাস পরীক্ষা করিয়া আর্সেনিক আর ডায়মণ্ড ডাষ্ট পাইয়াছিল।" সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন গাইকোয়ারের পক্ষে তাহাকে জেরা করে—

আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ—জল আর কয়লা।

ব্যালে—যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ—না।

ব্যালে—এই সব দ্রব্য বিষসংযুক্ত থাকতে পারে।

সিউ—মিথ্যা নয়, আমি অতোটা ভাবিনি।

ব্যালে—আচ্ছা বলুনতো আরসেনিকের স্পেসিফিক গ্রাভিটি কত?

সিউ—ভুলে গেয়েছি।

ব্যালে—৩ গুণ, কেমন ঠিক কি না।

সিউ—আমার মনে হচ্ছে না—ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যালে—আচ্ছা আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ—মহাশয়, আমায় আর পেড়াপীড়ি কেন, ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যালে—বিলক্ষণ। সকলই দাদার উপরে বরাত? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ—আজ্ঞে তা হ'লে বড় বাধিত হই, আমায় আর কেন?

পরে মাষ্টার ফিলিপ যখন জিজ্ঞাসা করে—

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আপনি সকল কথাতে ডাক্তার গ্রেকে রেফার কল্লেন কেন?

সি—এতো আর সাক্ষ্য দেওয়া নয় যেন ডব্‌লিন ইউনিভার্সিটির ভাইভা ভোস্‌ একজামিনেশন, আর আমি কি অতো জানি—সার্জেন্ট ব্যালেণ্টাইন 'ল' ছেড়ে মেডিসিন আরম্ভ করেছে।

সিউ—তা বটে, আমার ক্ষমতা থাক্‌লে তোমায় আমি প্রমোসন দিতাম।

সিউ—আমি হকারের কাছ থেকে একখানি রেথার্স কেমিষ্ট্রী কিনেছি—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্কে না।

ইহার কিছুদিন পরে অমৃতবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে যান এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হন, উপেন্দ্রনাথ দাস হন ডিরেকটার। থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় করে, ইহাতে রুচিবাদীদের দল বড় রুষ্ট হয়। বিশেষতঃ গোলাপ সুন্দরী, সুকুমারী দত্ত নামে যখন তিন আইনে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামীয় একজন অভিনেতার সহিত পরিণয়াবদ্ধা হয়, (১৮৭৫) তখন সেই রোষ আক্রোশে পরিণত হয়। থিয়েটারে এসময় মদকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইত। আর নানা কাগজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের পরিচালিত কাগজে থিয়েটার সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা বাহির হইতে লাগিল।

আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজ চার্লস্ (পরে সম্রাট সপ্তম চার্লস) কলিকাতায় পদার্পণ করেন। উকীল জগদানন্দ মুখার্জ্জি তাহার বকুল বাগানের বাড়ীতে মেয়েদের দিয়া উলুধ্বনি ও বরণ প্রভৃতির সহায়তায় তাহাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই লইয়া সমাজে বড় নিন্দা হয়, আর থিয়েটার হইতে 'গজদানন্দ' প্রহসনে তাহাকে বিদ্রূপ করা হয়। গভর্ণমেণ্টের কাছে জানাইতেই উহা অর্ডিনান্স দিয়া প্রহসনটি বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু থিয়েটার কোম্পানী পশ্চাদ্‌পদ হইল না। নাম বদলাইয়া সেই বিষয়টিই "হনুমান চরিত্র" নামে অভিনয় করিল। গভর্ণমেণ্ট এটিও বন্ধ করিয়া দেয়। থিয়েটার কোম্পানী নাছোড়বান্দা—সেই জিনিষই 'পুলিস অব পীগ্ এবং সিপ' নামে অভিনয় করে। Police of pig and sheep অর্থাৎ এ সময়ে পুলিস কমিশনার ছিল স্যার হুয়ার্ট হগ্ আর আসিষ্টাণ্ট ছিল Mr. Lamb, এটিও বন্ধ করা হয়। অমৃতবাবু বলেন, এসবই অভিনয় গিরিশবাবুর পরামর্শে হয়। তিনি তখন আসিতেন, যাইতেন এবং সকলেই তাঁহাকে মুরুব্বি বলিয়া মানিতেন। প্রহসন ও গানগুলি তিনিই রচনা করিয়া দেন।

গানগুলির একটু নমুনা দিতেছি—

'ওরে গজ হ'তে চাও গজ গিরিধন'

'ওগো ঘুরতে পারি না একটু ধীরে চল।'—সবই তাঁর রচনা।

তিনি বলেন, অমৃতলাল আপনাকে আরও বলি—এই অভিনয়ের অনেক পরে কবি হেমচন্দ্র "বাজীমাৎ" পদ্যটি রচনা করেন।

এবার গভর্ণমেণ্ট অন্যভাবে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় হয়। পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও এদিন আর প্রহসন অভিনীত হয় না। উক্ত নাটকে অমৃতবাবু হন অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট Mc Crimbe—কতকটা 'নীল দর্পণের' রোগ সাহেবের মত। নাটকখানি উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত।

বিরাজ মোহিনীর ভূমিকায় নামেন সুকুমারী দত্ত। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বলে—

"তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমায় কিছু বলিব না—ভয় কি আছে, I am not a tiger or a bear," আমি তো বাঘ বা ভল্লুক নই।

দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিতে অমৃতবাবু বলিয়া ফেলিলেন, "I am not a tiger or a bear or a pig or a sheep."

কথা বলিয়া সাহেব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে বিরাজমোহিনী বারান্দা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। ম্যাজিষ্ট্রেটরূপী অমৃতবাবু By Joe Ah the sweet lady! actually jumped from the balcony. এই বলিয়া নীচে চলিয়া গিয়া বিরাজ মোহিনীরূপী সুকুমারীকে হাতের পাঁজার উপরে করিয়া লইয়া আসে। বিরাজের পরিহিত কাপড়ের সমুখের অংশ রক্তাক্ত দেখিয়া দর্শক চঞ্চল হইয়া উঠে। এই অভিনয়ের রিপোর্ট পুলিসের ল্যাম্বার্ট ও রবার্টসন দেয় যে, ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার দেখান হইয়াছে। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে উপেন্দ্রবাবু ও অমৃত বাবু উভয়ে গ্রেপ্তার হন। ৮ জনের বিচার হয়, আর সবকে ছাড়িয়া দিয়া উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতবাবুকে একমাস করিয়া বিনাশ্রমে সাজা দেওয়া হয়। পরদিনই স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Mr. (W. C. Bonerjee) উকীল গণেশচন্দ্র মহাশয় সহ জামিন মঞ্জুর করিয়া আনেন।

আপিলের শুনানী হয় বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর আদালতে। সওয়াল জবাব করেন ব্রানসন, টি, পালিত এবং মনোমোহন ঘোষ মহাশয়। বিচারে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" অশ্লীলতা-দোষ মুক্ত হয়। শুনানির তারিখ ১৮৭৬, ২০মার্চ্চ।

উপেন্দ্রবাবু এবং অমৃতবাবু উভয়েই খালাস পান। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহাতে ভারী চটিয়া যায়। বিচারপতি ফিয়ারের অবসর গ্রহণের কোন কথাই ছিল না, কিন্তু রাতারাতি তাহাকে পদত্যাগ করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। সকলের বিশ্বাস হইল, এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারের জন্তই তাহায় এরূপভাবে চলিয়া যাইতে হয়।

কিন্তু দেশীয় লোক বিচারপতি ফিয়ারের স্তায় নিষ্ঠার জন্ত প্রশংসা মুখর হইয়া উঠেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাস সে সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার বাড়ীতে লেডী ফিয়ারকে একটা অভিনন্দন দেওয়া হয়। এবং দুর্গামোহনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া সরলা রায়ই অনুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহী ছিলেন। এই সরলা রায়ই পরে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়।

এই বিচার এবং জেল সম্বন্ধে অমৃতলালের সঙ্গে আমার অনেক দিন কথা হয়। তিনি বলেন—

"এক রাত্রি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলাম, কোট পেণ্টলুন পরা ছিলাম, সেখানে গিয়ে তা ছাড়তে হয়েছিল, জেলের জমাদার আমাদের জন্ত একেবারে কেঁদে ফেলেছিল—অন্তান্ত লোকও খারাপ ব্যবহার করে নি।"

আমি—এরূপ ফৌজদারী অপরাধে আপনারাই বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে প্রথম জেলে গিয়েছেন।

তিনি—মহারাজা নন্দকুমারের কথা ছেড়ে দিলে লং সাহেবের পরেই আমাদের প্রথম জেল দর্শন। তবে লং সাহেবের নামে মোকদ্দমা করে ইংলিসম্যানের সম্পাদক। আমাদের বিরুদ্ধে করে গভর্ণমেণ্ট। ধর পাকড়, পুলিসের থিয়েটার বেষ্টন, পুলিস কোর্টের বিচার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী জিনিসটি বড়ই ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। লং সাহেবের বিচারে এসব অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না।

আমি—আপনাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল?

তিনি—অশ্লীলতা প্রচার—দণ্ডবিধি আইনের ২৯২, ২৯৪, ধারানুযায়ী অভিযোগ—

গভর্ণমেণ্ট শুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। অডিনান্স, গ্রেপ্তার, জেল, নুতন আইন—আমরা যেন কতই রাজদ্রোহী। হাইকোর্টের বিচারের পূর্ব্বে সরোজিনী অভিনয় হয়, তাতে আমরা সাধারণের সহানুভূতি চাহিয়া আপিল বার করি। সে রাত্রে রঙ্গমঞ্চে তিলধারণের স্থান ছিলনা। বেশ টাকাও উঠেছিল।

কিন্তু ইহার পরেই অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয় এবং থিয়েটার এক রকম উঠিয়া যায়।

অমৃতলাল কোন একটী চাকুরী লইয়া আন্দামানে চলিয়া যান। সেখানে তিনি প্রায় দুই বৎসর থাকেন।

[ক্রমশঃ

* স্বদেশী নেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও বিচারপতি কমলচন্দ্রের পিতামহ।

কন্যা কুমারী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

কুমারী পূজা আমাদের দেশে বহুদিন হতে প্রচলিত। কুমারীর পবিত্রতা আমাদের দেশে কত উচ্চে স্থান পেয়েছে, তারই নিদর্শন দেখে এলাম কুমারিকা অন্তরীপে —ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরে যেখানে মাতা পার্ব্বতীর কুমারী মূর্ত্তি মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিন দিকে সাগর ঘেরা কুমারিকা অন্তরীপ; বঙ্গোপ-সাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এই তিনটী সাগর চির মুখর কলতান বন্দনা গানে দেবীর চরণমূল ধৌত করছে। যুগ যুগ ধরে তারা দেবীর স্তুতি গান গাইছে। তাদের বিরাম-হীন, ক্লান্তিহীন ডাকে তারা জাগিয়ে রেখেছে তাদের দেবীকে।

অনেক দিনের আশা ছিল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের। প্রত্যেক বৎসরই যাবো যাবো করে আর সময় হয়ে ওঠে না। এবার ঠিক করলাম কোন বাধাই মানবো না; জোড় করে বেড়িয়ে পড়বো। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। আমি, আমার স্বামী পুত্র ও আমার শাশুড়ী দ্বয়। প্রথমে আমরা মাদ্রাজে সাতদিন থাকলাম, সেখান থেকে মোটরে পক্ষীতীর্থ। মহাবলীপুরম্ ও কাঞ্জিভরম্ দেখলাম। তার পর মাদ্রাজ হতে রামেশ্বরধাম ও ধনুষ্কোটী গেলাম। রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটী

বরমাল্যহস্তে কন্যা কুমারী

এই দুই স্থান দর্শন করে আমরা মাদুরা দেখে তিভেন্দরম্ গেলাম। তিভেন্দরম্ থেকে কন্যাকুমারী ৫৩ মাইল। আমরা একটী taxi ঠিক করে সকাল ৮টার সময় রওনা হলুম কন্যা কুমারীর উদ্দেশ্যে। বহুদিনের আশার স্বপ্ন ভারতবর্ষের শেষ প্রান্ত কুমারিকা অন্তরীপ। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম পৌঁছবার জন্যে। মোটর ছুটে চললো। আমরা কখনো ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আবার কখনও বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সব গ্রামেই একটী গীর্জ্জার উচ্চ চূড়া আমাদের চোখে পড়লো। আমি মনে মনে ভাবলাম এখানকার অনেক অধি-বাসীই নিশ্চয়ই ক্রিশ্চান এবং পরে জানতে পারলাম যে আমার অনুমান মিথ্যা নয়। কন্যাকুমারীতে একটী আশ্রম আছে, সেখানে যে সব ক্রীশ্চান হিন্দু হতে চায়, তাদের শুদ্ধি করে হিন্দু করা হয়। আমাদের কাছ থেকে সেই আশ্রমের একটী কর্ম্মী চাঁদা নিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করে হিন্দুরা যদি বহু আগে থেকে এ কাজ করতো তবে বোধ হয় অভাগিনী ভারতমাতাকে আজ রক্তাপ্লুতা বিখণ্ডিতা ভাবে দেখতে হতোনা। গাড়ী কিছুক্ষণ চলবার পর একধারে উচ্চ পাহাড় শ্রেণী দেখা

যেতে লাগ্‌লো, মাঝে মাঝে বনের গাছপালা পাহাড়কে ঢেকে দিতে লাগলো—নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে অনেক তালগাছের সাড়ি; একটা মিষ্টি গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসতে লাগলো। ক্রমশঃ আমরা যত এগোতে লাগলাম, বন সরে গিয়ে কেবল দূরে পাহাড় শ্রেণী দেখতে লাগলাম। ক্রমশঃ বড় পাহাড়গুলি একটার পর একটা ছোট হতে হতে শেষে যেন একেবারে প্রান্তে মিলিয়ে

কেপ্‌টাউন হোটেল। স্বামীপুত্রসহ লেখিকা

গেল। তার পর দেখা দিল লাল মাটি—খুব লাল। বাতাসের খুব জোর অনুভব করলাম, বুঝতে পারলাম সমুদ্রের খুব সামনে এসে গেছি। সমুদ্রের এত কাছে এরকম লাল মাটি দেখে অবাক হলাম। একটু পরেই সমুদ্রের নীল জল দেখতে পেয়ে আমরা সকলেই সমস্বরে 'এইযে সমুদ্র' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। যত এগিয়ে যেতে লাগলাম ততো সমুদ্র নিকটে এগোতে লাগলো। পরে আমাদের গাড়ী Hotel-এর দিকে বাঁক ঘুরতেই দেখি আমরা উপরে এবং আমাদের ঠিক একটু দূরে নীচেই সমুদ্র। আমাদের সামনে দিগন্তব্যাপী নীল সমুদ্রের জলরাশির সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মন একটা অপূর্ব্ব বিরাট আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল চোখ দিয়ে সৌন্দর্য্য সুধা পান করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটে চললো সেই চির সুন্দরের পায়ে—যিনি এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন। কেবলই মনে হতে লাগলো—যিনি এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি না জানি আরো কত বেশী সুন্দর!

আমরা Hotel-এ আগেই ফোন করে দু' খানা ঘর ঠিক করে রেখেছিলাম। হোটেলটী ঠিক সমুদ্রের উপর। ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের মাতাল হাওয়াতে ঘরের জিনিস পত্র মাতামাতি করে কেবল পরে যেতে লাগলো। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ৫টা।

শচীন্দ্রম মন্দির

ওখানে জলের খুব কষ্ট। হোটেলের Bath-room এ একটা টবের কোণে সামান্য একটু জল দেওয়া ছিল, তাতে চান তো দূরের কথা, মুখ ধোয়াও ভাল ভাবে হয় না। হোটেলের নিজস্ব Swimming pool আছে সমুদ্রের ধারে; সেখানে কাপড় ছাড়বার ঘর আছে এবং ঘরের চাবি আছে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের চাবি দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন। আমরা কাপড় জামা নিয়ে নেমে গেলাম সেখানে স্নানের জন্য। অনেক খানি পথ নেমে যেতে হলো, কিন্তু স্নান খুব ভাল হলো। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা বেশ বড় জলাশয়। একদিকে খানিকটা উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সমুদ্রের জল আসছে; জল খুব গভীর নয়, গলা পর্য্যন্ত আমরা খুব মনের আনন্দে অনেকক্ষণ স্নান করলাম। স্নান সেরে হোটেলে এসে খেলাম। খুব ভাল খাবার দিয়েছিল, আমার স্বামী ও ছেলে Camera নিয়ে তক্ষুণি বেড়িয়ে পড়লেন; এদের ভীষণ ফোটো তোলার সখ। আমিও শুয়ে পড়লুম বিশ্রাম করতে।

বিকালে চা খেয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম মন্দির দর্শন করবার জন্য। রাস্তা দিয়ে হেটে চলেছি, নীচে সমুদ্র; এই সমুদ্র ভারত মহাসাগর; উঁচু ঢেউ নেই; সামান্য কেঁপে কেঁপে সমুদ্র দোল খাচ্ছে। এক এক জায়গাতে এক এক রকম রং; কোথাও ফিকে নীল, মেঘের ছায়া পরে কোথায়ও গাঢ় নীল, কোথাও ফিকে সবুজ এবং কোথাও গাঢ় সবুজ। এখানকার রং মিলিয়ে ওখানে যাচ্ছে—ওখানকার রং এখানে আসছে; যেন রংএর লুকোচুরি খেলা চলেছে সমুদ্রের বুকে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট সাদা পাল তোলা নৌকো। সমুদ্রের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলে স্তব্ধ হয়ে কেবল সেই দৃশ্যই দেখতে ইচ্ছে করে। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর রাস্তা নেমে গেল সমুদ্রের দিকে। সূর্য্যাস্ত দেখবো বলে আমরা তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলাম। রাস্তা নেমে গেছে সমুদ্রের গায়ে ঘাটের দিকে। ঘাটে নামতে হয় কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে। যেখানে ধাপ আরম্ভ হয়েছে ঠিক তার উপরে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা, তার মাঝ খানে একটা পাথরের ঘর, মাথায় পাথরের ছাদ। ঠিক ঘর নয়, চারটা pillar-এর উপর পাথরের আচ্ছাদন। এই ঘাট থেকে সূর্য্যাস্ত দেখলাম। শুনলাম এই একই ঘাট থেকে আবার সূর্য্যো-

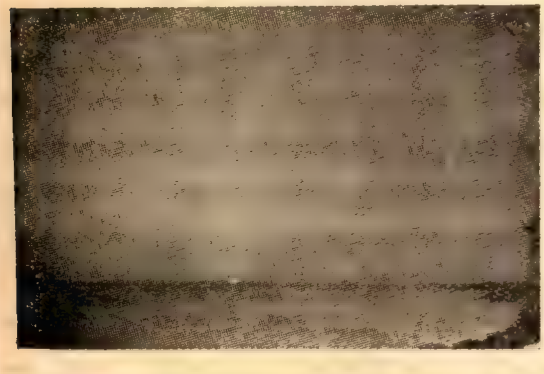

আরবসাগরে সূর্য্যাস্ত

দয়ও দেখা যায়। একজন পাণ্ডা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে বল্লেন—কাল সকালে ভোর ৫ টার সময় এই ঘাটে আসবেন, এখান থেকে সূর্য্যোদয় দেখতে পাবেন। প্রকৃতির এমনি খেলা। একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই—প্রভাত-সূর্য্যোদয়ের অত্যাশ্চর্য্য রূপ, আবার দেখতে পাই দিবাবসানের ক্লান্ত রবির এক অপরূপ ছবি: যখন সূর্য্যদেব তার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে নেমে পড়েন সমুদ্র বক্ষে। আমরা ধাপে ধাপে ঘাটে নেমে গিয়ে সমুদ্র স্পর্শ করলাম। এখানে ঘাট চারদিকে প্রায় বাধানো। সমুদ্রে নেমে গেছে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বাঁধিয়ে দিয়েছেন এ ঘাট জন-সাধারণের জন্য। এখানে সমুদ্রের জল আটকানো হয়েছে। এ ঘাটে মিশেছে তিনটী সাগরের জল। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর—ইহা তিনটী সাগরের মিলন স্থলের পূণ্য তীর্থ। এ ঘাটের থেকেই একটু উপরে দেখা যাচ্ছে কন্যা কুমারীর মন্দিরের চূড়া। এখানকার দৃশ্য অপরূপ। ভারত সাগরের জল শান্ত একটু কাঁপানো যেন ঈষৎ দোল দিয়ে যাচ্ছে ধরিত্রীকে। আর তারই পাশে বঙ্গোপসাগরের ফেনিল উচ্ছসিত অসংখ্য তরঙ্গ সগর্জ্জনে আছড়ে পড়ছে তট-ভূমিতে। ঠিক মনে হচ্ছে অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পিনী রুষ্ট হয়ে আক্রোসে ফণা বিস্তার করে ছুটে এসে পৃথিবীকে দংশন করছে। পাশাপাশি এই রুদ্র ও শান্ত রূপ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ইহাই কি সৃষ্টির রূপ—একদিকে ভাঙ্গন, একদিকে গড়ন? ভারত সাগরের তটভূমিতে লাল রংএর বালিকণা শোভা পাচ্ছে। খানিকটা লাল রংএর বালির পরে সাদা বালি, আবার বঙ্গোপসাগরের দেখা যাচ্ছে কালো বালুকারাশি। আমার ছেলে নেমে গিয়ে দুদিক থেকে দু'রকমের বালি তুলে আনলো বাড়ী নিয়ে যাবে বলে।

আমরা সূর্য্যাস্ত দেখে উঠে এলাম মন্দির দেখতে। সমুদ্রের প্রায় গা থেকে উঠেছে মন্দিরের ভিত্তি। অনেকটা উঁচুতে চতুষ্কোণ চত্বর; তার মধ্যে মস্ত উঁচু প্রাচীর ঘেরা মন্দির। এখানে দেখলাম দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরের মত প্রায় একই গড়নের মস্ত বড় গগনস্পর্শী গধুরম্ নেই। আমরা তোরণের সামনে জুতো রেখে সামনেই দোকান থেকে পূজার উপকরণ কিনে নিলাম। ফুলের মালা, নারিকেল, কলা ও ফুল। দাক্ষিণাত্যের সব জায়গাতেই দেখলাম নারিকেল, কলা ও ফুল এই

দিয়েই পূজা হয়। এখানে মন্দিরে ঢুকতে গেলে পুরুষরা বিজাতীয় পরিচ্ছদে ঢুকতে পারে না। নগ্ন গাত্রে প্রবেশ করতে হয়। পাণ্ডাজী আমাদের মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেলেন। মন্দিরের ছাদটী বেশ নিচু, ভিতরে খুব অন্ধকার। প্রদীপের আলোতে পথ দেখে আমরা দেবী মূর্ত্তির নিকটে গেলাম। কন্যাকুমারীর সুন্দর মূর্ত্তি—মাথায় মুকুট, হাতে মালা, কুমারী স্নিগ্ধ নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আরতি আরম্ভ হবে,দেখলাম—দেবীর সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে ঢাকা, গলায় ফুলের মালা। দ্বার প্রান্ত এবং চতুর্দ্দিক প্রদীপের আলোকে আলোকিত। দাক্ষিণাত্যের সব জায়গাতেই পূজারী ছাড়া কারুর ভিতরে প্রবেশের অধিকার নেই। কন্যাকুমারী দেবীর মূর্ত্তি দরজার বেশ নিকটেই আমরা খুব ভালভাবে দেখতে পেলাম।

পরদিন আমরা সমুদ্রের ঘাটে গিয়ে সকল্প করে সমুদ্র স্নান করলাম। স্নান করতে এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। ঘাটের অনতিদূরে সমুদ্র বক্ষে বঙ্গোপসাগরে দুটী খণ্ডগিরি আছে, জানলাম ইহার একটীর নাম বিবেকানন্দ রক্। স্বামী বিবেকানন্দ এই

স্বামী বিবেকানন্দ রক্

শান্ত ভারত মহাসাগর

প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে অনেকদিন ভগবানের সাধনা করে-ছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি আমেরিকা যাবার প্রেরণা পেয়েছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ হতেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা আপনি নত হয়ে এলো। স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয় পর্ব্বত হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতের সব তীর্থ পায়ে হেটে দর্শন করেছিলেন। তিনি আমাদের দেশ ও হিন্দু ধর্ম্মকে জগতের সামনে বহু উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। পরাধীন ভারতবাসী জগতের কাছে তাঁর জন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল। এখানেও দেখলাম সকলেই শ্রদ্ধাভরে আজও স্বামী বিবেকানন্দের নাম করেন এবং বাঙ্গালীদের খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। আমরা সমুদ্র স্নান করে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গেলাম পূজা দিতে। দেখলাম দেবী এখন আর চন্দনচর্চ্চিত নেই। পাথরে খোদিত বেশ সুন্দর মূর্ত্তি। এ মন্দির বহু প্রাচীন। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে ভব ও মুখ নামে দু'জন অসুর দেবতাদের খুব উপদ্রব করেছিল। দেবতারা অনেকের কাছে সাহায্য চাইলেন অসুরদের দমন করতে; কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন দেবতারা কাশীর বিশ্বনাথের কাছে সাহায্য চাইলেন। বিশ্বনাথ তখন শক্তিদেবীকে আহ্বান করে তাঁকে কুমারীরূপে পাঠিয়ে দিলেন কুমারিকা অন্তরীপে। এই কুমারী শক্তি অসুরদের দমন করলেন এবং সেখানেই থাকলেন ও পূজিত হলেন।

কুমারিকা অন্তরীপের ১০ মাইল পূর্ব্বে সুচিন্দ্রম্ মন্দির নামে একটী মন্দির আছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি। আমরা কুমারিকা অন্তরীপে আসবার পথে এই মন্দিরটী দেখে এসেছিলাম। খুব সুন্দর মন্দির। এ মন্দির সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে, তার

মধ্যে একটী হলো এইরূপ : দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দিরে নিজেকে ব্রহ্মার সম্মুখে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে গৌতমের অভিশাপ হতে মুক্তি পেয়ে শুচি হয়ে এখানে শিবের আরাধনা করেছিলেন ; তাই এখানকার শিবের নাম

অশান্ত বঙ্গোপসাগর ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে পর্য্যবেক্ষণ গৃহ

শুচিন্দ্রেশ্বর মহাদেব। এই শুচিন্দ্রেশ্বর মহাদেব কন্যা কুমারীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে কন্যা কুমারীকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেবতারা মহা বিপদে পড়লেন। দেবতারা দেখলেন যদি মহাদেব ও কন্যা কুমারীর মিলন হয়, তবে কুমারীর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র এই পবিত্রতার শক্তিতেই তিনি অসুরদের দমন করে রাখতে সমর্থন হয়েছিলেন। কুমারীর এই পবিত্রতা রক্ষা করতে না পারলে তিনি অসুর দমন করবার শক্তি হারাবেন। তাহলে আবার দেবতাদের অসুরের কবলে পড়তে হবে। মহাদেবকে নিষেধ করবার সাহস তাদের নেই ; সুতরাং তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তারা নারদমুনির নিকট এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নারদদেব তাদের উদ্ধার করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে বিবাহের দিন ও লগ্ন সব ঠিক হয়ে গেল। মহাদেব নির্দ্দিষ্ট সময় রওনা হলেন ঠিক লগ্নে বিবাহ সভায় পৌছবার জন্য। এমন সময় পথের মধ্যে নারদ মুনি কাকের বেশ ধারণ করে উচ্চস্বরে কা কা রবে ডেকে উঠলেন। মহাদেব কাকের ডাকে ভোর হয়েছে ভেবে ভুল করলেন। ভোর হয়ে আসছে, তবে তো বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেছে, এই ভেবে তিনি বিবাহ-বাসরে না গিয়ে পথ হতে বাড়ী ফিরে এলেন। এদিকে কুমারীদেবী বিবাহ সাজে সজ্জিত হয়ে মালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবের প্রতীক্ষায়। যত সময় চলে যেতে লাগলো, তিনি

কন্যা কুমারিকার সাগর স্নানের ঘাট

ততো উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ভোরের আলো দেখা দিলো, তবুও তার আরাধ্য দেবতা- যখন এলেন না তখন নিরাশ হলেন। দেবীর আজ্ঞায় বিবাহের ভোজের খাদ্য-দ্রব্য সব পবিত্র ঘাটে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া হলো। সেগুলি সমুদ্রের বালি ও শুক্তি প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হলো।

কুমারিকা অন্তরীপের সাদা বালিগুলি দেখতে অনেকটা ঠিক ছোট ছোট, মোটা মোটা গোটা আতপ চালের মতন। সেই যে কন্যাকুমারী বরমাল্য হাতে তাঁর চির আরাধ্য দেবতার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেবীর সেই কুমারী মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুগ যুগ ধরে পূজিত হচ্ছে। শরণার্থীদের রক্ষার জন্য দেবী নিজ সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে আজও তাঁর ভক্তদের অভয় দান করছেন। তাই আজও মহাসিন্ধুর কলতানে আমাদের কাণে ভেসে আসে তাঁরই বন্দনাগীতি। মন আপনি নত হয়ে পড়ে ভক্তিভরে কন্যাকুমারীর পবিত্র পদতলে।

এখানে তীরে বসে দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের অপরূপ লীলা-প্রকৃতির এই বিরাট প্রকাশ দেখলে এই হিংসা-দ্বেষ পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীর কথা ভুলে মন চলে যায় অনেক অনেক দূরের এক মনোহর চির সুন্দর ও চির শান্তির রাজ্যে— যেখানে এই বারিরাশির কলতান গানের ন্যায় ভেসে বেড়ায় এক শান্তির ও মধুর সঙ্গীতের সুরে।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

এগার

সামনেই একটা ছুটির দিন পেয়ে বিজন এবারে একাই রওনা হ'য়ে প'ড়লো রাসবিহারী এভিন্যুতে। ক'ল্‌কাতার বড় রাস্তাগুলো চিনে উঠ্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। একদিকে মহেন্দ্র, অন্তদিকে অরুণ—মহানগরীর সঙ্গে বিস্ময়কর পরিচয়ের ব্যাপারে দু'জনের সাহচর্য্য এসে যুক্ত হ'য়েছে দু'দিক থেকে। রাস্তাগুলো তাই অল্প দিনের মধ্যেই সহজ হ'য়ে উঠ্‌লো তার কাছে।

রাসবিহারী এভিন্যুতে এসে বাড়ীটা খুঁজে পেতে বিলম্ব হ'লো না তার। পঁয়ষট্টির চারের তিনের এক। ক'লাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট্‌ওয়ালা ত্রিতল বাড়ী। সাম্‌নে লনের মতো খানিকটা ফাঁকা যায়গা। গেট্‌ পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল মিঃ মল্লিকের সঙ্গে। বিজন ভূমিষ্ট হ'য়ে তাঁকে প্রণাম ক'রতে যেতেই বাধা দিয়ে সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'হ'য়েছে, হ'য়েছে, পায়ে হাত ছোঁয়ালেই কি বেশী কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো হয় নাকি! তারপর—ক'ল্‌কাতায় এলে কবে?'

—'এই কিছুদিন।' সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'দৌলতপুর থেকে আই, এ পাশ ক'রে এখানেই এখন বি, এ প'ড়ছি।'

—'বাঃ, চমৎকার, ইট্‌ ইজ্‌ এ ভেরি গুড্‌ নিউজ।' খুসীর হাসি হেসে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চলো, ভিতরে চলো, তোমার মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রবে; কত খুসী হবেন তিনি!' এবং ভিতর মহলে প্রবেশ ক'রতেই স্ত্রীর উদ্দেশে গলা তুল্‌লেন তিনি: 'ওগো শুন্‌ছো, দেখ কে এসেছে! সেদিনের বিজু আজ বি. এ. প'ড়ছে, হাউ স্‌প্লেন্‌ডিড্‌!'

মিঃ মল্লিকের অনুগমন ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'কেন, চিরকালই ছোট থাক্‌বো, তাই কি ব'ল্‌তে চান মেসো-মশাই? তা ছাড়া আই, এ, প'ড়তে তো দেখেই এসে-ছিলেন আমাকে। আই, এ'র পরে বি,এ ছাড়া স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে আর কিই বা হ'তে পারতো?'

—'না, না, বেশ ক'রেছ, ভালো ক'রেছ তুমি। আফ্‌টার অল্‌ ইউ আর এ্যান্‌ আইডিয়াল।'

সাম্‌নে এসে মিসেস্‌ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'উঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম বিজু! তুমি যে ক'ল্‌কাতায় আস্‌বে, ভাবতেই পারি নি।'

—'নিজে উদ্যোগ না ক'রলে অবিশ্যি আসা হ'তো না, মার মত ছিল না।' ব'লে মিসেস্‌ মল্লিককে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো বিজন।

—'ষাট; দীর্ঘজীবী হও।' বিজনের মাথার উপর দিয়ে হাত স্পর্শ ক'রে নিয়ে মিসেস্‌ মল্লিক জিজ্ঞেস্‌ ক'রলেন, 'দিদির শরীর ভালো আছে তো?'

—'খুব ভালো বলা চলে না, আছেন কোনোরকম।'

—'বড় দেখতে ইচ্ছে হয় দিদিকে, কতদিন দেখি না।' থেমে মিসেস্‌ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'তোমাকে ছেড়ে দিদির খুব কষ্ট হবে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'জানি। এবারে তাই বাড়ীতে একজন প্রতিভূ রেখে তবে ঘর থেকে বেরিয়েছি।'

—'তবু ভালো।'

দ্বিতলের সিঁড়ি ভেঙে রেবাকে নেমে আসতে দেখা গেল এই সময়ে। কাছে এসে কিছু ব'লবার আগেই বিজন ব'ললো, 'খবর কি, ভালো আছো?' সঙ্গে সঙ্গে রেবার বেশ-বাসের পরিবর্তনটাও লক্ষ্যে প'ড়লো বিজনের। নাগরিক আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে। মনে হ'চ্ছে—লম্বায় চওড়ায় আরও অনেকখানি বেড়েছে সে ইতিমধ্যে। আজ আর যাওয়ার সেই রেবা নেই, তার উজ্জ্বল মুখখানিতে ক'লকাতার রাজকীয় ছাপ ঝ'লসে যাচ্ছে। আগের চাইতে আরও যেন সুন্দর হ'য়েছে রেবা।

কাছে এসে মিষ্টি হেসে রেবা ব'ললো, 'আমাদের খবর তো ভালোই, তা—তুমি হঠাৎ ক'লকাতায় উড়ে এলে কেমন ক'রে?'

—'যদি বলি এরোপ্লেনে, সেটা বিশ্বাস্য হবে না, অতএব ট্রেনে। এবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারো।'

—'আছো তো কিছুদিন, না হঠাৎই আবার চ'লে যাবে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো রেবা।

এবারে বিজনের কথাটা মিঃ মল্লিকই ব'লে দিলেন: 'চ'লে যাবে কি রে, বিজু যে এখানে বি, এ প'ড়ছে।' তারপর থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তোমার নতুন কবিতা কবে শোনাচ্ছ বিজু, বলো? বহুকাল তোমার কবিতা শুনি না।'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে প্রথমটা থামতে হ'লো বিজনকে। পরে ব'ললো, 'কবিতা লেখা প্রায় ভুলেই গেছি মেসোমশাই। অনেকদিন আর ওকাজে কলম ধরিনি।'

মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'সে কি, ফ্যাকাল্টি থেকে বিরত থাকা, সে তো সহজ কথা নয়। একদিন আমি যে যশোহরে নতুন মাইকেলের সম্ভাবনা বোধ ক'রেছিলাম। সে কি আমার তবে সেদিনের একটা দুরাশা মাত্র ছিল?'

—'হয়ত ছিল না।' বিজন ব'ললো, 'কিন্তু ভেবে দেখলাম মেসোমশাই, বাংলা সাহিত্যে বীরবলের কথাটাই হয়ত খাঁটি সত্য: দেশ যতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথে অগ্রসর হবে, দেশের কাব্যপ্রতিভা ততই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে আসবে।'

—'রেখে দাও তোমার বীরবল।' মিঃ মল্লিকের কণ্ঠে এবারে কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল: 'এই যে রেবা এত চমৎকার চমৎকার সব গান শিখচে, এর কি তবে কোনই মানে হয় না? পৃথিবীর কোনো অসম্ভব বিষয়কেই আমি কখনও বিশ্বাস করি না। ইচ্ছে ক'রে তুমি তোমার কবি-প্রাণকে হত্যা ক'রবে, এ অসহ্য।'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থামলো বিজন। আসলে জবাব খুঁজে পেলো না সে। মিঃ মল্লিকের কথাটা তার ভালো লাগলো। প্রথম জীবনের সার্থক প্রশংসা একদিন তাঁর মুখ থেকেই পেয়েছিল বিজন। দেখলো—ক'লকাতার চিমনির কালিতে আজও তাঁর মন ঢাকা প'ড়ে যায়নি।

রেবা ব'ললো, 'মিথ্যে কথা দিয়ে বাবাকে শুধু ভোলাতে চেষ্টা ক'রছো বিজুদা। এরপর যেদিন আসবে, কবিতার খাতা সঙ্গে নিয়ে আসবে, ভুললে চ'লবে না।'

—'তা না হয় হ'লো, কিন্তু এই মাত্র মেসোমশাই'র মুখে যে কথা শুনলাম, তার পরিচয় পাচ্ছি কবে?'

মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'রেবার গান তুমি যেদিন আসবে, সেদিনই শুনতে পাবে বাবা। দক্ষিণ ক'লকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে দু'টা মেডেল পেয়েছে রেবা।' থেমে মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন, 'যা না, মেডেলগুলো এনে একবার তোর বিজুদাকে দেখা না, মা?'

—'ও আবার দেখাবার মতো কিছু নাকি?' ব'লে অপাঙ্গে একবার বিজনের দিকে তাকালো রেবা। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'আজকাল হকি খেল না বিজুদা?'

—'কেন, সেদিনের কথা বুঝি ভুলতে পারো নি?' ব'লে মুখ টিপে একবার হাসলো বিজন।

স্মিতহাস্যে রেবা ব'ললো, 'তোমার মেডেল জেতার সেই ইতিহাস কখনও ভুলতে পারি?'

বিজন ব'ললো, 'আজ তোমার মেডেল পাওয়ার যে কৃতিত্ব, তার কাছে আমার সেদিনের মেডেল পাওয়া

কবেই ম্লান হ'য়ে গেছে। মিথ্যে আর সেদিনের কথা ব'লে লজ্জা দিচ্ছ কেন ?'

—'লজ্জা দিচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'পুরনো কথা ভাবতে কী যে ভালো লাগে, ব'লে বুঝোতে পারবো না।'

বিজন এবারে কিছু-একটা বলার আগে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'নিশি কোথায় গেল দেখ্‌তো মা, বিজুকে চা ক'রে দিতে বল।'

কথা না বাড়িয়ে রেবা এবারে নিশির খোঁজেই উঠে প'ড়লো। নিশি অর্থাৎ নিশিকান্ত : মিঃ মল্লিকের সংসারে বেয়ারা, বাবুর্চি, ঠাকুর, চাকর ব'ল্‌তে একাধারে সব।

নিশিকান্ত ভিতরেই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে চায়ের সঙ্গে কিছু ক্রিম-ক্রেকার এনে বিজনের সাম্‌নে টিপয়ে সাজিয়ে দিল।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চা খাও বিজু।'

—'চা কি শেষ পর্য্যন্ত শুধু আমার জন্তেই হ'লো ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চোখ দুটো তুলে ব'ল্‌লো—বিজন। সঙ্গে সঙ্গে সে খাবারের তারতম্যটাও লক্ষ্য করলো। মফঃস্বল-জীবন আর সহর-জীবনের মধ্যে কত পার্থক্য। রেবার পুতুল-বিয়েতে খাবারের অনুষ্ঠানে চায়ের যোগ ছিল না, সে খাবারের মধ্যে ছিল একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি ; আজকের চায়ের আয়োজনটা নিতান্তই ভদ্রতা-সূচক, খানিকটা যেন বাহ্যিক আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। তাতে মন ভরে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না। কত পার্থক্য ক'ল্‌কাতায় আর মফঃস্বলে।

চায়ের ব্যবস্থা ক'রে রেবা আবার যথাস্থানে এসে ব'সে ছিল। এবারে বিজনের কথার জবাবে ব'ল্‌লো, 'ভেবেছ আমরা এতক্ষণ চা না খেয়ে ব'সে আছি। কখন্ ও পাট শেষ হ'য়ে গেছে আমাদের। নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এবারে সলজ্জে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল বিজন।

মিঃ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন, 'কি কম্বিনেশন নিলে

—'হিষ্ট্রি আর ইকোনমিক্স্। ইকোনমিক্সে অনার্স'।

—'ছাট্‌স্ গুড্। ইট্ ইজ্ এ্যান্ ইজি এ্যাণ্ড নাইস্ কম্বিনেশন। আমিও একদিন নিয়েছিলাম। ভেরি ইন্‌টারেষ্টিং সাব্‌জেক্ট।'—স্বভাবসুলভ কণ্ঠেই কথাগুলো উচ্চারণ ক'রলেন মিঃ মল্লিক। ক'লকাতায় এসে তাঁর ইংরেজি কথালাপ খানিকটা বেড়েছে। প্রায় প্রতি-কথাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সামনের শুক্রবার তো রেবার জন্মদিন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বিজুকে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে রাখি, কি বলো ?'

—'এর মধ্যে আর ব'ল্‌বার কি আছে। নেমন্তন্ন না ক'রলেই বা কি ? রেবার জন্মদিনে বিজু এসে খাবে-দাবে আনন্দ-ফুর্তি ক'রবে, এইটেই তো স্বাভাবিক।' থেমে এবারে নিজের মুখেই নিমন্ত্রণের পাঠটা সেরে রাখলেন মিঃ মল্লিক।

বিজন ব'ললো, 'বাঃ, এ তো আনন্দের বিষয়। এসে আজ যা-হোক কিছু মিষ্টি খাবার যোগ ঘটানো গেল। সেদিন তুমি নিশ্চয়ই গান শোনাচ্ছ, না কি বলো রেবা ?'

হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'জন্মদিনে কেউ বুঝি আবার নিজে গায়, সে তো শুধু শোনে। তুমিই বরং সেদিন তোমার কবিতা শোনাবে।'

সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ভেরি নাইস্ প্রোপোজাল।' তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ দু'টো একবার তুলে ব'ললেন : 'রেবা হ্যাজ্ এ সার্প্ ব্রেইন্, যাই বলো।'

কথায় কথায় চায়ের কাপ অনেকক্ষণই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে ক্রিম-ক্রেকারও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এবারে সম্ভবতঃ একবার ঘড়ির সন্ধান ক'রলো বিজন। কারণ, সে যখন প্রথম এসে ঘরে ঢুকেছিল, ক্লকের আওয়াজ শুন্‌তে পেয়েছিল সে। আসলে ক্লকটা এ ঘরে নয়, পাশের ঘরে। সময় একেবারে কম অতি-বাহিত হয় নি অনুমান ক'রে এবারে বিজন ব'ল্‌লো,

—'এস বাবা। তা—শুক্কুরবার কিন্তু সন্ধ্যায় এখানেই খাবে। রেবার জন্মদিন, আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের বিষয়।'

—'আস্‌বো বৈ কি, নিশ্চয়ই আস্‌বো। একদিন রেবার পুতুল বিয়ের খাওয়াই শুধু খেয়েছি, এবারে জন্মদিনের খেয়ে তার সুদ তুল্‌বো বৈ কি।'

স্মিতহাস্তে উঠে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো বিজন। সাম্‌নের গেট পর্য্যন্ত এসে তাকে পৌঁছে দিল রেবা। ফুটপাথে পা বাড়াবার আগে একবার ফিরে তাকালো বিজন রেবার দিকে। কিছু ব'ল্‌বার জন্ত নয়, যাবার আগে তার কমনীয় অনিন্দ্যকান্তি মুখখানিই শুধু আর-একবার দেখ্‌বার জন্ত।

উজ্জল মুখের হাসি দিয়ে তাকে বিদায় দিল রেবা।

বার

এতদিনে যেন একটা শান্ত তৃপ্তিকর সরোবরে অবগাহন ক'রে উঠ্‌লো বিজন। সামান্ত একটা খণ্ডকালের স্মৃতি, তার মূল্যই বা কম কি! রেবার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে অন্ততঃ সেই স্মৃতিসুখেই খানিকক্ষণ ম'জে রইল বিজন। আগামী শুক্রবারের কথাটা মনে এসে সমস্ত চেতনা যেন তার সহসা একবার অনুরণিত হ'য়ে উঠলো। রেবার জন্মদিন। মাশুরায় থাকৃতে কখনও রেবার জন্মদিনের উৎসব হ'য়েছে ব'লে মনে পড়ে না। এটা ক'লকাতার জীবনের আকস্মিক ঘটনা। তা' হোক্‌। তবু একটা বিশেষ দিনকে স্মরণ ক'রে আত্মস্থ হওয়া চলে, দশের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলার উন্মাদনা জাগে সাম্‌নের পথে। কিন্তু শূন্তহাতে এ'দিনে কি রেবাকে শুভেচ্ছা জানাতে যাওয়া চলে? কি আছে তার, কি দিতে পারে সে, কি দেওয়া উচিৎ তার পক্ষে? ভাবতে গিয়ে একবার বাগেরহাটের কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়লো বিজনের। পূজোর প্রীতিউপহার দিতে ছন্দা আর রেবার জন্ত ব'য়ে এনেছিল দু'খণ্ড কলেজ-ম্যাগাজিন—যার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার কবিতা। জন্মদিনেও অবিশ্যি রেবা তাকে গিয়ে কবিতা শোনাতেই অনুরোধ ক'রেছে। কিন্তু কবিতা শোনানোই কি প্রীতিউপহারের সব কিছু?

সমস্তটা পথ, সমস্তটা রাত্রি এই চিন্তাই তাকে বিশেষ ভাবে উতলা ক'রে তুল্‌লো। ট্যুইশনি ক'রে যে অর্থ তার হাতে আসে, তাতে সারা মাসের খরচ বাঁচিয়ে অন্ততঃ উপহার যে দেওয়া চলে না, এ কথা নিশ্চিত। প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজের দারিদ্র্য তার বিভৎস রূপ নিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, গুঁড়িয়ে দেয় তার সমস্ত চেতনাকে।...

সকালের ডাকে অকস্মাৎ মাগুরার চিঠি এসে উপস্থিত। বিজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উতলা হ'য়ে নির্ম্মলা লিখেছেন:

'...কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠি। তুমি সুস্থ আছ কি না, আমাকে পত্রপাঠ লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে। একটা মুহূর্ত্তও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

এদিকে আজ সকালেই আবার খবর পাইলাম, রাজসাহীতে ছন্দার বরের বড় অসুখ, কাঁদিয়া কাটিয়া ছন্দা তাহার কাকাকে চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া অবধি এতটুকুও শান্তি পাইতেছি না। তোমার কুশল জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে এতটুকুও যেন বিলম্ব করিও না বাবা।...'

স্বতন্ত্র একটুকরো কাগজে অনুযোগ তুলে অতসী লিখেছে:

'...এই বুঝি মনে রাখিবার নমুনা, বিজু ভাই? মা'র স্নেহ যে আমি পুরাপুরি কাড়িয়া লইতে পারি নাই, মা'র চিঠিতেই তাহার পরিচয় পাইবে। অভাগিনী দিদিটাকে যে ইতিমধ্যেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তবু অনুরোধ, ভাই, ভুলিবার আগে একবারটি শেষ চিঠি দিও।...'

অতসীর চিঠিটা প'ড়তে গিয়ে একবার হাসি পেলো বিজনের। কিন্তু সহজ ভাবে মন খুলে হাস্‌তে পারলো না; মা'র চিঠির অক্ষরগুলো খচ্‌ ক'রে এসে বুকে

বিঁধ্‌লো। মা অবিশ্যি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিথ্যাই উতলা হ'য়েছেন; মায়ের প্রাণ তো। কিন্তু ছন্দার স্বামী শ্যামলকান্তির অসুখের কথা জানিয়ে মা সে তাকেও বড় কম চিন্তায় ফেল্‌লেন না। দুঃখের জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুখের নীড় রচনা ক'রে সংসার-জীবনে কেবল প্রথম পা বাড়িয়েছে ছন্দা, তার মধ্যে এ আবার কী দুঃখের অভিঘাত। শ্যামলকান্তির অসুখ কিছু-একটা বাড়াবাড়ির দিকে না গেলে ছন্দাই বা অমন কেঁদেকেটে চিঠি লেখে কেন রসিকলালকে। ইচ্ছে হ'লো—এক্ষুণি সে একটা টেলিগ্রাম করে ছন্দাকে। কিন্তু সম্ভব হ'লো না, সঙ্কোচ এলো, ঠিকানা সম্পর্কে সন্দেহ হ'লো। বাধ্য হ'য়ে মাকেই সে নিজের কুশল জানিয়ে অবিলম্বে ছন্দার কাছে চিঠি দিয়ে খবর জান্‌তে লিখলো। সেই সঙ্গে অতসীর চিঠির জবাবেও দু'কলম লিখে দিল বিজন :

'অতসীদি, মিথ্যা অনুযোগ তুলিয়া তুমি নিজের মনে আঘাত পাইয়াছ। কলিকাতার মত কর্ম্মব্যস্ত সহরে ছাত্র পড়াইয়া আমাকে লেখাপড়া করিতে হয়। এখানে না থাকিলে কেউ বুঝিতে পারে না—মানুষের সময় কত অল্প। তাই বলিয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, একথা তুমি কেমন করিয়া মনে করিলে? মা'র স্নেহ তুমি সমস্তটুকুই কাড়িয়া নাও, তাহাতে আমি সুখীই হইব। তুমি ভিন্ন মাকে দেখিবার আর কে আছে বলো?...'

লেখা শেষ ক'রে নিজের হাতে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দিয়ে এলো বিজন। এসে খানিকটা আশ্বস্ত হ'য়ে ব'স্‌তে চেষ্টা ক'রলো সে। চিন্তাসূত্র নানা গ্রন্থীতে গাঁথা, উর্ণনাভের মতো সে আপনার জাল আপনি বিস্তার ক'রে চলে; সময় বা কালের প্রতীক্ষা সে রাখে না। সেই গ্রন্থীবদ্ধ জালের গিঠে গিঠে মানুষ হাঁমা দিয়ে চলে রাত্রি-দিন। বিজনও তা-ই চ'লেছে। রেবার জন্মদিনের উপহারের কথাটা নিয়ে সারাদিনের মধ্যে একবারও কিছু-একটা ভাব্‌তে পারেনি সে। মাঝখানে একটা দিন শুধু বাকী, অথচ কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারেনি বিজন। মিঃ মল্লিকের সম্ভ্রান্ততার দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রতে গিয়ে নিজের ত্রুটিতে পাছে রেবার ঐতিহ্যে কোথাও আঘাত লাগে, এ সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনত আবশ্যক বৈ কি। নিমন্ত্রিতের মধ্যে সে-ই কিছু একজ অদ্বিতীয় হবে না নিশ্চয়ই; মিঃ মল্লিকের আত্মীয়-স্বজ বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই ক'ল্‌কাতায়, তারাও কিছু বা প'ড়বার মানুষ নয়। তাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সত্যি কি সুন্দর কিছু উপহার দেওয়া যায় না রেবাকে?

ইতিমধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ মহেন্দ্র এসে ঘ দাঁড়াল। ঘরে ব'সে থাক্‌বার লোক নয় সে, ব' থাক্‌লেই জড়তায় সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, যতক্ষ সেয়ার মার্কেটের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে তার পেশীতে আসে রক্তের জোয়ার, মনে আসে দুর্ব্বার গতি। ঘোড়া মতো ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত পরিশ্রম ক'রতে পারে মহেন্দ্র তাতে তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। এসে ঘরে ঢুকে গা থেকে জামা খুলে ব্র্যাকেটে টাঙিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে ব'ল্‌লো, 'ব্রাদারকে যেন কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক চেতনা মানুষ ব'লে মনে হ'চ্ছে? ব্যাপার কি, কোনো মেয়ে বাপের কাছ থেকে কিছু অফার পেলে না কি হঠাৎ?'

অফারই বটে। সঙ্কোচের কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লে, 'মুখে ত ট্যাক্স্‌ নেই, বলুন—শুনে যাই। মাঝে মাঝে বড়-বে রসিকতা ক'রে বসেন আপনি মহিন্‌দা'।'

—'রসিকতা? ভালো কথা ব'ল্‌লেও যদি রসিকত মনে করো, তবে আর কি ব'ল্‌তে পারি, বলো?' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বয়সের ঔদাস্য দেখ্‌লেই বোঝা যায়।'

—'হ'য়েছে, থামুন।'

—'বেশ, থাম্‌লাম।'

টান্‌ টান্‌ হ'য়ে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়লে মহেন্দ্র।

অরুণ আজ ঘরে নেই। দু'দিনের জন্য বা কাজে গেছে চন্দননগরে। নইলে এতক্ষণে সেও কিছু-একট কথায় যোগ দিত।

থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'সেয়ারের বাজারে আজ য ভীড় গেল, গত দু'মাসে এমন ভীড় চোখে পড়ে নি নতুন এক অসমীয়া পার্টি আজ দু'লাখ টাকা হেরে সে-কি হাউ হাউ ক'রে কান্না! তার পাতিপুকুরের প্যালেসখানি এবারে হাত-ছাড়া হ'লো।'

—'মানে?' খানিকটা উৎসুক্ হ'য়ে উঠ্লো বিজন।

—'মানে আর কি! সেয়ার বাজারের হাল্‌ফিলই এই। হু'লাখ টাকা হেরে গিয়ে লোকটির বাড়ী বাঁধা প'ড়লো, তা আর উদ্ধার হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।' মুখ টিপে একবার হাস্‌লো মহেন্দ্র।

বিজন ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রেই আপনাদের ফট্‌কার বাজার তবে মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করে? লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষ তবে যায় ওখানে নিজেকে বলি ক'রতে? নমস্কার আপনাদের সেয়ার মার্কেটকে মহিন্‌দা।'

—'একেবারেই ছেলেমানুষ তুমি।' ব'লে হাস্‌লো মহেন্দ্র, তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে ব'ল্‌লো, 'তোমার অত্যুগ্র ইচ্ছে সত্ত্বেও এই জন্যেই বাধা দিয়েছিলাম সেদিন বিজন। সংসারে সব পথ সব মানুষের জন্যে নয়, জানো তো?'

—'জানি।' ব'লে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রলো বিজন।

মহেন্দ্রও আর কিছু-একটা উক্তি ক'রলো না। উঠে নিজের জামার পকেট থেকে সেয়ার সংক্রান্ত কি একখানি কাগজ বার ক'রে একাগ্র চোখে সেখানি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো।

আকস্মিক নিস্তব্ধতায় ঘরখানি মনে হ'লো গুমোট হ'য়ে উঠেছে। কেমন বিশ্রী লাগতে লাগলো বিজনের। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে আর-একবার গলা তুল্‌লো সে: 'বলি মহিন্‌দাও কি শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনোয় মন বসালেন নাকি?'

—'কি আর করি বলো, ফিল্ড-ওয়ার্কে নামতে গিয়ে আগে থাকতে কিছু প্রিপারেশন দরকার বৈ কি!' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'গোটা জীবনটাই একটা প্রিপারেশনের বস্তু।'

অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ললো, 'আপনি কেন ফিলজফার হ'লেন না মহিনদা?'

—'এবারেই হাসালে তুমি। একদিন তুলি ছেড়ে ছবি আঁকা বন্ধ ক'রলাম; ফিলজফার হবার সুযোগ ছিল কোথায় জীবনে?' ব'লে চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রলো মহেন্দ্র।

কথাটাকে অধিকদূর না বাড়িয়ে স্বল্পক্ষণ থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি যে একটা মুস্কিলে প'ড়ে গেছি মহিন্‌দা, কি করি বলুন তো? জন্মদিনের একটা উপহার মনে মনে কিছুতেই সাব্যস্ত ক'রে উঠতে পারছি না।'

—'কার? ছেলের, না মেয়ের?' বিজ্ঞের মতই প্রশ্ন ক'রলো মহেন্দ্র।

—'আবার তো বাজে ব'কতে সুরু ক'রলেন!' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো বিজন।

—'এতেও বাজে বকা হ'লো? উপহারের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের তারতম্য আছে বৈকি!'

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ধরুন, মেয়েদের উপযোগিই কোনো উপহার।'

না হেসে পারলো না এবারে মহেন্দ্র, ব'ল্‌লো, 'এই নিয়েই সমস্যায় প'ড়েছ? বলি, পথে কি চোখ বুজে হাঁটো, না চোখ হু'টো খোলা রাখো! সারা বাজারটাই তো মেয়েদের জন্যে, ডিজাইন আর রঙের ছড়াছড়ি পথে।'

—'তা দেখেছি, ওসবে চ'লবে না।' বিজন ব'ল্‌লো, 'দামে সস্তা অথচ খুব লাভ্‌লি হয়, এরকম কিছু চাই।'

—'একটু বাজে বকি তবে এবারে।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'প্রণয়ের ব্যাপারে কিন্তু ওটা নিরাপদ নয়। সামান্য জিনিষকেও মহার্ঘ্য ব'লে না চালাতে পারলে প্রণয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জানি না, কোন্ সম্পর্কের জগতে তোমার উপহার গিয়ে পৌঁছাবে!'

এবারে নিজের মধ্যে কিছুটা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো বিজন। ব'ল্‌লো, 'নিন্, হ'য়েছে, কাজ নেই আমার উপহার দিয়ে, এবারে দয়া ক'রে থামুন দিকিনি মহিনদা।'

—'মহেন্দ্র থাম্‌লেই কি আর মন থামে! যাকেই হোক্, যেখানেই হোক্, উপহার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তুমি দেবেই।' খানিকটা সহানুভূতির কণ্ঠে এবারে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'ঝামেলা না বাড়িয়ে হু'পাঁচ টাকার একটা ফুলের তোড়াই না হয় দাও না—যার স্থায়িত্ব কম, অথচ পূর্ণতার দিক দিয়ে যার তুলনা নেই!'

কথাটা মন্দ নয়। ফুলের সত্যিই তুলনা নেই। কিশোর-জীবনে একদিন মাষ্টারের গলায় মালা দেবার জন্য রেবাকে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে দিতে

বলেছিল বিজন। রেবা সেদিন সে-অনুরোধ রাখেনি, রেখেছিল ছন্দা। রেবার জন্মদিনে তাকে এবারে ফুলের উপহার দিয়ে জব্দ করা যাবে। মনে মনে উপহার নির্ব্বাচন ঠিক হ'য়ে গেল বিজনের। ব'ল্‌লো, 'দি আইডিয়া, ভালো সাজেস্‌সান দিয়েছেন এতক্ষণে মহিনদা।'

মহেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বিজনের চোখের উপ'র দিয়ে একবার নরম দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন-সংযোগ ক'রলো।...

শুক্রবার যথাসময়ে মিঃ মল্লিকের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো বিজন। যাবার আগে নিউ মার্কেট থেকে ভালো দেখে বিলেতি ফুলের একটা তোড়া নিয়ে গেল অয়েল-পেপারে মুড়ে, তার সাথে স্বরচিত আট লাইনের একটা কবিতা: জন্মদিনের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা দিয়ে গাঁথা তার অক্ষরগুলো।—

পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন
হও প্রেমময়ী;
জীবনে লঙ্ঘিতে হবে দুস্তর বন্ধুর পথ,
হ'তে হবে জয়ী।
তোমার কল্যাণী-মূর্ত্তি ঢেলে দিক্ সর্ব্বলোকে
পারিজাত সুধা,
শুভক্ষণে আমি আজ সাজালাম পুষ্পরাগে
তোমার বসুধা।

উপহার পেয়ে রেবা খুসীতে উপ্‌চে প'ড়লো। নানা ডিজাইনের শাড়ী, কাস্কেট আর সোনার জিনিষ সে কম পায়নি। তাদের স্থায়িত্ব শুধু একটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতের অনেকগুলো স্মৃতিমুখর দিনের নানা প্রহরে প্রহরে তারা ব'য়ে নিয়ে আসবে অপরূপ আনন্দের ধারা। তবু এই ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ ফুলের মধ্যে যেন নবজীবনের একটা সন্ধান পেলো রেবা। অন্য কারুর উপহারের সঙ্গেই এমন একটি উদ্দীপনাময়ী কাব্য কিছু নেই। কতবার যে মনে মনে আবৃত্তির সুরে কবিতাটি প'ড়লো রেবা, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কবিতার এই ছোটখাটো স্পর্শই কি আজকের দিনে যথেষ্ট বিজু? কথা ছিল, আজ তুমি নিজের খাতা থেকে কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাবে।'

লজ্জিতকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'নতুন কিছু সে আর লিখিনি, তা তো সেদিনই ব'লেছি মেসোমশাই। পুরোনো লেখাগুলো আজ নিজের কাছেই ভালো লাগে না। দেখলাম—সেগুলো লোকসমাজে বার ক'রবার মতো নয়।'

মিঃ মল্লিকের পাশে থেকে একটি যুবক প্রশ্ন ক'রলো, 'উনি তবে সত্যিকারের জাত-কবি?'

—'এ বাডিং পোয়েট অব বেঙ্গল। একদিন মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথও ওর মতই ছিলেন। সবে সুরু; অতুল সম্ভাবনা র'য়েছে বিজুর জীবনে। কে ব'ল্‌তে পারে, এই বেড়ালই বনে গেলে বন-বেড়াল হবে কিনা।' ব'লে যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্‌লেন মিঃ মল্লিক।

বিজন ব'ল্‌লো, 'জীবন-তপস্যার শেষ পর্য্যন্ত যে বিড়ালত্ব প্রাপ্তি, সে সম্বন্ধে সত্যিই ভুল নেই মেসোমশাই।'

আসলে মিঃ মল্লিক উপমা টানতে গিয়ে কিছু বাক্য-বিভ্রাট ক'রে ব'সেছিলেন; তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—এই কবিই যে একদিন বিলেত গেলে পোয়েট-লরিয়েট হবে না, কে ব'ল্‌তে পারে।

সেদিকে ইঙ্গিত ক'রে এবারে যুবকটি ব'ল্‌লো, 'নট্ টু বি ক্যাট্, বাট্ টু বি লরিয়েট, সম্ভবতঃ এ কথাই উনি ব'ল্‌তে চেয়েছেন।' ব'লে মিঃ মল্লিকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ব'ল্‌লেন, 'এক্‌জাক্ট্‌লি সো। বেড়াল মানে কি, বিজু হবে একদিন বিপুল বিশ্বের বিরাট বাণী-সাধক। তোমার সঙ্গে তো আলাপ নেই দিলীপ; এস আলাপ করিয়ে দিই।'

ততক্ষণে বিজন এবং দিলীপ দু'জনেই নমস্কার ও প্রতি নমস্কারের ভঙ্গীতে যুক্ত হাত সাম্‌নে প্রসারিত ক'রে ধ'রেছে।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'আমরা এতকাল মাণ্ডরাই এক পাড়াতেই বাস ক'রেছি। বিজনের বাবা কুঞ্জবিহারী বাবু ছিলেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। বিজু তার বাবার গুণ পেয়েই বড় হ'য়েছে। বিজুর মাও বড় নিষ্ঠাবতী

মহিলা। রেবার মার মুখে তাঁর কথা শুনতে পাবে। বিজু আমাদের ঘরের ছেলের মতো।'

স্মিতহাস্যে দিলীপ ব'ল্লো, 'বড্ড খুসী হ'লাম পরিচয় জেনে। এখানেই কোথাও সার্ভিসে আছেন নিশ্চয়ই ?'

—'এই বয়সেই সার্ভিস্, বলো কি তুমি ?' মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'বিজু এখনও কলেজ-ষ্টুডেণ্ট্, ক'লকাতায় বি-এ প'ড়ছে।'

বিজন ব'ল্লো, 'পরিচয়টা শেষ পর্য্যন্ত এক-তর্‌ফাই থেকে গেল না কি মেসোমশাই ?'

—'শুড্ গড্। তাও তো বটে। দিলীপের পরিচয়টা যে দেওয়াই হয় নি তোমাকে।' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'সম্প্রতি বিলেত থেকে নতুন ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে দিলীপ। এ পাড়ায় দত্ত-বাড়ী ব'ল্তে ওদের বাড়ীকেই বোঝায়। বাড়ীটা পাশেই, লক্ষ্য ক'রলে এখান থেকেই দেখ্‌তে পাবে।' পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে সাম্‌নেই একটা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রলেন মিঃ মল্লিক।

পাশাপাশি ছ'খানি বাড়ীর পরে তৃতীয় বাড়ী। তিন তলার উপরেও ছোট একটি চিলে কোঠা। এখান থেকে বাড়ীটা সম্পূর্ণ চোখে না প'ড়লেও ত্রিতল থেকে চিলে কোঠা অবধি স্পষ্টই চোখে ভেসে ওঠে। নতুন হাল-ফ্যাসানের কার্নিসে বাড়ীটা বিলেতি রুচিরই পরিচয় দেয়। সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বিজন ব'ল্লো, 'আপনারা তবে একেবারেই নেক্‌ষ্ট্-ডোর-নেইবার ?'

মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'যেমন তোমরা আর আমরা ছিলাম মাণ্ডরায়। এখানে এসে প্রথম কথা ব'ল্‌বার লোক পাই দিলীপদের। ওর বাবা দাশরথী বাবু যেমন মিশুক্ লোক, তেম্‌নি একেবারে মাটির মানুষ।'

উত্তরে বিজন কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে নিশিকান্ত এসে খবর দিল—'খাবার প্রস্তুত।'

পাশের ঘরে ডাইং টেব্‌লে খাবার ব্যবস্থা। জীবনে চেয়ার-টেব্‌লে ব'সে খাওয়া বিজনের এই প্রথম। পিঁড়িতে ব'সে গ্রাসের পর গ্রাস তুলে খাবার অভ্যাস চিরকাল, আজকের এই ব্যবস্থায় তাই কিছুটা অসুবিধেই বোধ ক'রলো সে।

পাশে ব'সে মিসেস মল্লিক ব'ল্লেন, 'লজ্জা ক'রে খেয়ো না যেন বিজু!'

লজ্জা যে-না ক'রছিল, তা নয়। তবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ললো, 'রেবার জন্মদিনের খাওয়া, এখানে লজ্জার অবকাশ কোথায়।'

খাবার পরিবেশন ক'রছিল রেবা নিজের হাতে, ব'ললো, 'কবি মানুষদের কথাই সব, পাকস্থলী ঠন্‌ঠনে। লজ্জাই যদি না ক'রবে তো পাতের খাবার মুখে উঠ্‌ছে না কেন ?'

—'কেন, না-ই বা উঠ্‌চে কি।' মুখ তুলে বিজন ব'ললো, 'বলি, হঠাৎ এমন আতিথেয়তা দেখাবার আর কি লোক পেলে না ? পাশে তো আরও কেউ র'য়েছেন।'

দিলীপ ব'ললো, 'আমাকে যে কোনো জিনিষ সাধ্‌তে হয় না, তা ওঁরা জানেন ; আর জানেন ব'লেই এতক্ষণে সমস্ত আতিথেয়তাটা গিয়ে চেপেছে আপনার ঘাড়ে। আপনি বরং হাত-চালনাকে কিছু দ্রুত ক'রতে চেষ্টা করুন বিজনবাবু।'

বিজন ব'ললো, 'খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তবে যে বক্সিং ল'ড়্‌তে হয়।'

কথা শুনে এবারে না হেসে পারলো না কেউ।

মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'না, না, তোমাকে তাড়াতাড়ি ক'রতে হবে না বিজু, ধীরে সুস্থেই তুমি পেট পুরে খাও।'

পেট পুরেই খেয়ে উঠলো বিজন। তার সকল লজ্জার মধ্যেও খাদ্যসূচীর দীর্ঘতা পীড়া দিতে পারে নি তার পাকস্থলীকে, বরং কিছুটা পীড়নই ক'রছে এখন। অনেক-দিন এমন সুললিত খাদ্যে এত অত্যধিক আহার ঘ'টে ওঠে নি তার। ওয়েলিংটনের মেসে উড়ে ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে খাবারের পরিমাণ তার ইদানীং একে-বারেই ক'মে এসেছিল। অকস্মাৎ খাদ্যের পরিমাণ কিছু বেশী হ'লে পাকিস্থলীকে এখন পীড়নই করে।

দিলীপ বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা ক'রলো না। এক-সময় বিদায় নিয়ে সে উঠে গেল। হাঁটা-চলার মধ্যে তার বিশেষ একটা সাহেবি ভঙ্গী জড়িত। সেটুকু লক্ষ্য এড়ালো না বিজনের। বিলেত গেলে মানুষের রুচি যে কী অদ্ভুত ভাবে বদ্‌লায়, শুধু সেই কথাটাই ভাবতে লাগলো সে।

শুধু বিলেত কেন, ক'লকাতাই কি কম। দি সেকেণ্ড সিটি অব দি বৃটিশ এম্পায়ার।...

নিমন্ত্রিতের সংখ্যাটা শুধু দিলীপ আর বিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিকটতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও বাদ যান নি অনেকেই, যথাসময়ে এসেই তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন। ব্যাচের শেষে প'ড়েছিল দিলীপ আর বিজন।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদ নেই তো কিছু বাবা, দু'দণ্ড ব'সে বরং রেবার সঙ্গে গল্প ক'রে যাও। সেই ভোর থেকে এ অবধি একটু ক্ষণের জন্যও ব'সতে পারেনি মেয়েটা। এতক্ষণে তবু যা-হোক্ কাজ চুক্‌লো।'

উঠবার সত্যিই তাগিদ ছিল না বিজনের। আবার গিয়ে তো সেই একঘেয়ে মেসের জীবনযাত্রা, তার চাইতে এখানে বরং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ঘিরে মনটা কিছুক্ষণের জন্যও স্বপ্ন-সায়রে অবগাহন ক'রে উঠতে পারছে।

একটু বাদেই রেবা এসে পাশে ব'স্‌লো। এতক্ষণে দু'টো ভালো ক'রে কথা বলার অবকাশ হ'লো তার।

বিজন লক্ষ্য ক'রে দেখলো—কপাল থেকে এখনও তার চন্দন-সজ্জা মুছে যায়নি। কাজল-পরা চোখের দু'পাশ দিয়ে এসে মিশেছে সেই চন্দন-সজ্জা। উপহার এনে হাতে তুলে দেবার সময় এমন সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য ক'রতে পারে নি বিজন। লোকজনের সামনে সে-দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল। পাশে মিসেস্ মল্লিকের চেয়ারের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো—কখন্ তিনি নিঃশব্দে উঠে চ'লে গেছেন। খেয়ে উঠে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম না নিয়ে পারেন না মিঃ মল্লিক। মিসেস্ মল্লিক উঠে একসময় স্বামীর পাশে গিয়েই ব'সেছেন।

রেবা ব'ল্‌লো, 'এমন সুন্দর ফুলের তোড়া তুমি কোথায় পেলে বিজুদা?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতার বাজারে শুনি সমস্ত পৃথিবীটাকেই খুঁজে পাওয়া যায়, ফুল তো সামান্য জিনিষ। এমন আর কি সুন্দর!'

—'বাঃ, সুন্দর নয়? আমার সমস্ত উপহারকে আলো ক'রে দিয়েছে তোমার ফুলের তোড়া আর কবিতা।'

—'আয়নায় হয়ত তা হ'লে আজ নিজেকে একটি বারও ভালো ক'রে দেখবার অবকাশ পাওনি তুমি।' বিজন ব'ল্‌লো, 'ফুল সুন্দর হ'য়েও যে কত কুৎসিৎ হ'তে পারে, তোমার মুখের দিকে না তাকালে তা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো উপহারই তোমার সৌন্দর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।'

অকস্মাৎ এতখানি আত্মপ্রশংসা রেবা কল্পনা ক'রতে পারে নি। কিছুক্ষণের জন্য এবারে থাম্‌তে হ'লো তাকে। পরে ব'ল্‌লো, 'এমন ক'রেও তুমি বাড়িয়ে ব'ল্‌তে পারো বিজুদা। তোমার এমন সুন্দর উপহারের সঙ্গে তুমি তুলনা ক'রছো আমাকে। তোমার কবিতা প'ড়ে মা আর বাবা যে কতখানি মুগ্ধ হ'য়েছেন, তা তুমি জানো না। ওটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমি আমার ছবির পাশে রেখে দেবো।'

—'রেখে দিলে তুমি ভুল ক'রবে, মানাবে না। এত তুচ্ছ জিনিষও নাকি আবার বাঁধিয়ে রাখে মানুষ!'

—'তুচ্ছ?' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'আমার জন্মদিনটাও তবে মিথ্যে বলো?'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে এবারে কথা হারিয়ে ফেল্‌লো বিজন। পরে ব'ল্‌লো, 'আজ সমস্ত আনন্দের মধ্যেও একটা অভাব থেকে গেল, রেবা।'

—'কিসের অভাব?'

—'তোমার গান।'

ম্লান হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'তোমার কাছে সত্যিই আমি অপরাধী বিজুদা। ভোর থেকে সব কিছু নিজের হাতে ক'রে-ক'র্মে শেষ পর্য্যন্ত আর গান গাইবার মতো সুযোগ পেয়ে উঠ্‌লাম না। অনেকেই ব'লেছিল, কাউকেই খুশী ক'রতে পারিনি। এরপর যেদিন আস্‌বে, কোনো ওজর তুল্‌বো না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে এনে শোনাবে?'

এবারে ইচ্ছে ক'রেও বিজন না ব'ল্‌তে পারলো না, বরং স্বাভাবিক কণ্ঠেই ব'ল্‌লো —'শোনাবো।'

ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো নিশিকান্ত।

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি খবর নিশি?'

নিশিকান্ত ব'ল্‌লো; 'আমি কিছুক্ষণের জন্ত একবার বাইরে যাবো দিদিমণি। আপনাকে একবার ভাড়ার ঘরে আসার দরকার।'

—'যাচ্ছি, যাও।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি আজ তবে উঠি রেবা। তোমার এখন রেষ্ট্ নেওয়া দরকার।'

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আবার কবে আস্‌চো এদিকে? মাসিমার চিঠি পত্র পাও তো?'

—'পাই। ভালোই আছেন। আস্‌বো কবে ঠিক ব'ল্‌তে পারি না। শনি রবিবার ছাড়া সময়ও পাই না বড়-একটা। ট্যুইশনি ক'রতে হয়, তাতেই সময় চ'লে যায়। এর মধ্যে যদি এসে পড়ি, তবে জানবে—তা তোমার গানের আকর্ষণেই।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। পথে এসে সাম্‌নেই বাস পেয়ে সে উঠে প'ড়লো।

রেবা তৎক্ষণে তাদের ভাড়ার ঘরে ঢুকে নিশিকান্তের সঙ্গে কথালো হ'য়ে উঠেছে। একটা একটা ক'রে তাকে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে নিশিকান্ত।

[ক্রমশঃ

চিহ্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

মুখর সে মুখ ভাষাহারা আজি নাহিক গানের মায়া,
আসমানে গড়া স্বপ্ন সৌধে কালের কুয়াসা ছায়া,
বিদ্যুৎ জ্বালা লয়ে,
দুঃখবেদনা লুকানো বক্ষে জাগি সাথীহারা হয়ে।

কানে বেজে ওঠে শুধু হাহাকার সমীরণে ভেসে আসা,
যাযাবরী মন চলে গেছে দূরে ভাঙিয়া ক্ষণিক বাসা,
ধূলিমাঝে আছে জানি,
চরণচিহ্নে ফেলে রেখে যাওয়া স্মরণচিহ্নখানি।

কাজল তোমার ভুরুতে দেখেছি রাত্রির ঘন কালো,
রহস্যভরা আঁখিতারা মাঝে বিস্ময় ঘেরা আলো,
মহা জিজ্ঞাসা তুমি,
নীল সাগরের অতলে কোথায় তোমার চলার ভূমি।

বেদনা জড়ানো নিঝুম রজনী তাকাতে পারি না দূরে,
অসীম শূন্য বারে বারে যেন বুকখানি থাকে জুড়ে,
হেথায় তারার দল,
কম্পিত আলো পাঠাইয়া করে ধরণীরে ঝলমল।

পৃথিবীর মাটী আকাশ বাতাস গাছপালা ছায়া আলো
দিক্‌হারা মরুপথিকের মত আর ত লাগে না ভালো,
সব পুরাতন মানি,
নীড়ভাঙা মনে জেগে ওঠে শুধু অতীতের হাতছানি।

কি শিখিলাম

শ্রীহরিহর শেঠ

(আমার কর্ম্ম জীবনের শিক্ষা)

বিনয়ের দ্বারা লুকাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না, আমাকে অনেকে অনেক প্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি যে আখ্যায়ই আখ্যায়িত করুন, আমার প্রকৃত পরিচয় এক কথায় ব্যবসাদার। আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই ব্যবসায়ী ছিলেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশও ব্যবসায় কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। আমার কর্ম্ম-জীবন বলিতে ইহাকেই প্রধান বলিতে হয়। জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যবসায় কার্য্যে কাটাইতে হইয়াছে বলিয়াই শুধু নহে, এই কার্য্যকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান প্রদত্ত কিছু অর্থ সামর্থ্য হইতেই কর্ম্মের অন্ত পথে অগ্রসরের সুযোগ হইয়াছে। তাহা আবার তথাকথিত দেশ সেবার অন্যতম।

লেখক

আমার ব্যবসায় জীবনের শিক্ষার কথায় বলিবার মত কিছু আছে মনে করি বলিয়াই একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহা বিষদ ভাবে লিখিয়াছি। ব্যবসায় ক্ষেত্রে থাকিয়া তখন না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি, সে জীবনটা আমার কাছে সুখেরই ছিল। তখন আমার সাহিত্য-সাধনা বা সাহিত্যিক সাজার সখ মিটান বন্ধ করিতে হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হইলেও, অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে ক্ষেত্রে অনেককে স্খলিত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ বিপথে আবর্ত্তন করে, ভগবানের কৃপায় আমার সে অবস্থা একবারও হয় নাই। অথচ আমাদের পৈত্রিক যৌথ কারবারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমার নিজস্ব কারবারে আমার আকাঙ্খার মাত্রা বা কোন সীমা, এমন কি ঠিক কিছু আকাঙ্খা না থাকিলেও তিনি আমার পক্ষে অনেক দিয়াছিলেন। আর হয়ত অধ্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, সে জন্য আমার কোন পরিশ্রম বা মূলধনের বা বিন্দুমাত্র অন্যায় অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় লইতে হয় নাই। অবশ্য সে সময়টা স্বাভাবিক অবস্থা নহে, প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষ সময়। তখন চোরা বাজার বলিয়াও কিছু ছিল না।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে উৎসাহ বলিয়া কোন কিছু আমি আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে কোন দিনই পাই নাই, তিনি এ বিষয় আমার যোগ্যতায় সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু আমার ভিতর হইতে একটা প্রেরণা বা উৎসাহ আমি অনেক সময়ই লাভ করিয়াছিলাম। এবং মনে করি তাহাতেই যথেষ্ট শক্তিবান হইয়া তখনকার দিনগুলি বেশ সোজা ও সচ্ছন্দ ভাবে কাটাইতে পারিয়াছিলাম। তাহা হইতেই আমার শিক্ষা যাহা সৎ তাহা সকল ক্ষেত্রেই সৎ। শঠতা, প্রবঞ্চনা, ঠকাইবার প্রবৃত্তি অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন ভাল নহে, ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহাই।

আপাততঃ সময় বিশেষে হয়ত ইহার দ্বারা কিছু অর্থাগম হইতে পারে, কিন্তু পরকালের কথা জানি না, ইহকালে পরিণামে ইহাই পতনের মূল হইয়া থাকে।

আমার কর্ম্ম জীবনের অপর দিক দেশের কাজ বা দেশ সেবা। কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুমহাসভা, সমাজতন্ত্রীদল এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি এই সবের মধ্য দিয়া যে কাজ, এখন তাহাই সাধারনতঃ দেশের কাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া বা কোন দল বিশেষের মধ্যমে না হইলে যদি দেশের কাজ না হয়, তাহা হইলে আমার কাজকেও সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। আমার দেশ সেবা যাহা তাহা আর কিছু নহে, কেবল দেশের কতকগুলি জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহার সেবা, আর মাতৃ-অঙ্গের যে যে অঙ্গ আভরণহীন মাত্র, সেই সেই অঙ্গে দুই চারিখানা অলঙ্কার বিন্যাসের উপলক্ষ্য হইবার চেষ্টা মাত্র। এই মা আমার দেশ মা—চন্দননগর। ভারত জানিনা, বংলা জানিনা, আমি যেমন ক্ষুদ্র আমার মাও তেমনই ক্ষুদ্র। এই আমার ভারত, এই আমার বাংলা। জানিনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামানব মহাত্মাগান্ধী ভারত-মাতার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র সহরের সেবার আনন্দের অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়াছিলেন কি না।

সংসারে মানুষ মাত্রেই কাজ করিয়া যাইতেছে। শুনা আছে গীতার মূল সূত্র নিরন্তর কর্ম্মেরত থাকা এবং আসক্তিহীন কর্ম্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। ইহাই কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বিনা অভি-সন্ধিতে সাধারনতঃ বড় একটা কাজ হয় না; ধর্ম্ম, অর্থ, যশ, মানের জন্যই অনেকে অনেক কর্ম্ম করেন। ইহা ভিন্ন স্বার্থশূন্য বা বাধ্য না হইয়া দেশের জন্য যশের জন্য যিনি কাজ করিয়া যান তিনি মহাপুরুষ। আমার কাজের মধ্যে আসক্তি কি ছিল না ছিল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অভিসন্ধি ছিল, তাহা দেশের বা জনসাধারণের উপকার ভিন্ন অন্য কিছু না হইলেও, কর্ত্তব্য পালনের জন্য কাজ করিয়াছি। তাহাদের স্বার্থের চিন্তার সঙ্গে যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-লেশ শূন্য ছিল তাহা নহে, প্রকারান্তরে তাহা নাম যশের আকাঙ্খা। বলা বাহুল্য, তবে সে শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে সব কর্ম্ম তাহার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অপরের পরিশ্রমলব্ধ ফলের জন্য হয়ত কখন কখন আমি প্রশংসা পাইয়াছি, কিন্তু আমি কখন সে প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার দেশ বলিতে আমি খুব বড় করিয়া ভাবিতে কখনও পারি নাই। যদিও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্রের অভাব, আবশ্যকতা ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে কখন কিছু চিন্তা আপন হইতে মনে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমাধানের সক্রিয় উপলক্ষ্য হইবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা কখন করি নাই। যদিও জগৎসমীপে ভারত ও ভারতবাসীর সম্পদ ও গৌরব গরিমার কথা শুনিলে প্রাণের মধ্যে প্রভূত আনন্দ হয়, তাহা হইলেও সে বিষয় বিশেষ কোন চেষ্টা কখন করিতে পারি নাই। ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাবে নয়, শক্তির অভাবে, সাহসের অভাবে। আমাদের পরিশ্রম বিমুখতা, ব্যবসা বিমুখতা, শিক্ষার ত্রুটি, সর্ব্বোপরি নারীজাতির অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব ও তাহার পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথা মনে হইয়াছে। সে সম্বন্ধে চিন্তায় ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। বড় জোর যাহা ভাবিয়াছি নিবন্ধের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ঠিক বলিতে গেলে, যেদিন হইতে দেশের কথা ভাবিতে শিখিয়াছি, শত ত্রুটির আধার আমার এই চন্দননগরের বহু অভাবের কথা ভাবিয়াই সর্ব্বদা মনটা ম্রিয়মান থাকিত। সে জন্য ক্ষুদ্র সামর্থে যেটুকু সম্ভব তাহা মোচনের উপলক্ষ হইবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

সহরে নারীজাতির আবশ্যক শিক্ষার অভাব আংশিক মোচন ও জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় উন্নতি সম্বন্ধে যদি আমি কিছুমাত্র উপলক্ষ্য হইতে পারি, সেজন্যই প্রথম আমার মনে একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল; কিন্তু নিজের কর্ম্মশক্তির দৈন্যতা, উপযুক্ত অর্থের অভাব, তদোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। তৎপরে ১৩২২ সালে যখন বন্ধুদের আহ্বানে প্রথম চন্দননগর

পুস্তকাগারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট হই, প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতেই আমার তথাকথিত দেশ-সেবা বা পাবলিক লাইফের আরম্ভ। সেই সময়ই শ্রীভগবানের কৃপায় আমার নিজস্ব ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া কিছু আর্থিক সুযোগও আসিয়া পড়ে। আমার পিতৃদেবের কোন কোন সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বিষয় অপূরিত বাসনা ও আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের উক্ত অর্থে অনাশক্তিই আমার কর্ম্মজীবনের নূতন পথের দ্বার মুক্তির প্রথম সহায় হয়।

আমি পারিপার্শ্বিক অনুকূলতার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পুস্তকাগারে প্রবেশের পর কোন কোন সুহৃদের সহায়তা যে পাই নাই তাহা নহে। নিতান্ত দুঃখের কথা, যদিও শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে'র সহিত নীতিগত কতকগুলি গুরুতর অমিল বা চরিত্রগত পার্থক্য থাকা সত্বেও অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি বরাবরই আমার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি বয়সে কিছু ছোট হইলেও প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহাকে সহায়রূপে না পাইলে হয়ত আমার সামান্য কর্ম্মজীবনটা ভিন্ন পথও গ্রহণ করিতে পারিত। এই যে অমিল বা পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহা যে আমার স্বভাবের ত্রুটি হইতেই উদ্ভূত নহে এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না, কারণ সে বিচারের জন্য কখনও কোন প্রাজ্ঞ বিচারকের দ্বারস্থ হই নাই।

পুস্তকাগারের সহিত সম্পর্কিত হইয়াই আমার আকৈশোর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠার যে সখ তাহা চরিতার্থ হইবার সুযোগ আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিল। যখন হইতে আমার এই সখের উৎপত্তি তখন আমার বয়স অতি অল্প। তখন Sett's Family Library নামে অল্প সংখ্যক পুস্তক লইয়া বাটীতে একটি সখের লাইব্রেরি করি। শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য এরূপ কোন কথা তখন যে মনে হইত তাহা নহে। পুস্তকাগারের ভার হাতে আসার পর হইতে এ কথা মনে হইতে লাগিল এবং সহরবাসীর নাগরিক জীবনের মান উন্নত করিতে সভাসমিতির জন্য একটি উপযুক্ত হলের আবশ্যকতাও সেই সময়ই অনুভূত হয়। তাহারই ফলে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার ভবনের উদ্ভব। সে ১৩২৭ সালের কথা। এই পুস্তকাগারের প্রভাবই আমার জীবনে নূতন পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ যদিও বারে বারে নিতান্ত দুঃখের সহিত ইহার আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছে, তথাপি আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে ত সে দিয়াছে এই চন্দননগর পুস্তকাগার। ইহা আমার কাছে দেব মন্দির। ছেলে ও মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার, দরিদ্র ও গৃহস্থ সাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসার, দুর্ম্মূল্যের সময় চাউলের মূল্য হ্রাসের, পানীয় জলের অভাব মোচন প্রভৃতির সুযোগ—সংঘটন করিয়া দিতে যেটুকু উপলক্ষ হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সেজন্য আমার মত লোকের যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও আশা এবং প্রাণবন্ত উৎসাহের আবশ্যক, তাহা যোগাইয়াছিল এই পুস্তকাগার।

এই প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থার কথা বুঝাইবার জন্য বলা আবশ্যক, উক্ত সকল কার্য্য পরিণত করিতে অনেক-গুলির জন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষদের মুখাপেক্ষার কোন প্রয়োজন না থাকায় বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু দুঃখের কথা হইলেও তাহা না বলিয়া পারি না, স্ত্রী-জাতির শিক্ষাকল্পে অতি আবশ্যকীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতে এবং কলেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য আমাকে অশেষ বাধা পাইতে হইয়াছিল। প্রথমটি ১৯১৮ হইতে প্রত্যক্ষ চেষ্টা করিয়া প্রায় সাত বৎসরের পর প্রতিষ্ঠার অনুমতিলাভ ঘটে এবং ১৯২৬ সালের জুন মাসে ইহাই 'কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয় বহু চেষ্টার পর ১৯১৮সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী সরকারী গেজেটে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ফরাসী ভারতের গভর্ণর মসিয়ে মার্ত্তিনোর আরেতের (আদেশনামা) দ্বারা ঘোষিত হওয়া সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণর পরিবর্ত্তনের সহিত মতের পরিবর্ত্তন ঘটায় উহা আর আমাকে উপলক্ষ করিয়া কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। শেষোক্ত

ভর্ণর ম'সিয়ে জারবিনিতের সময় স্থানীয় ময়র্গ্যা হাস-পাতালের উন্নতিকল্পে আমার অর্থসামর্থের তুলনায় অনেকগুলি টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব দই। তাহার পরিবর্ত্তে ধন্যবাদ লাভ ছাড়া বহুদিন বিষয়টি ঝুলাইয়া রাখার পর বিফল মনোরথ হইতে হয়। টেকনিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠা বিষয়েও প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্বেও কার্য্যে কিছু হয় নাই।

নারী শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় স্বর্গতঃ শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহায়তা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার এবং চন্দননগরের তদানিন্তন কোন কোন নেতার মুখে শুনিতাম, এই সকল আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে না পারার মূল কারণ দলগত পলিটিক্স। তাহা আর কিছু নহে, পাছে ঐ সকল কার্য্যের উপলক্ষ্য হওয়ায় আমি এখানে কিছু জনপ্রিয় হইয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। একথা মনে হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ ফরাসী ভারতে সামান্য রাজ-কর্ম্মচারী হইতে গভর্ণর পর্য্যন্ত সব কেহই একটি দলের পৃষ্ঠপোষকরূপে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরে থাকুক, দলগত রাজনীতির আমি বিরোধী এবং উহা ঘৃণা করি, তাহা সত্বেও সফল না হইলেও আমার কর্ম্ম জীবনের এ দিকের যেটুকু সংস্পর্শ এবং শিক্ষা তাহা পরে সংক্ষেপে বলিব।

আমি প্রসঙ্গত আমার কর্ম্ম জীবনের প্রচেষ্টার পরিচয় দিতে আমার দুইজন খুড়িমার দানের কথা যাহা উল্লেখ করা উচিৎ তাহা করি নাই। আমার সেজ খুড়ি-মা স্বর্গীয়া হরিমতি দাসীর দানেই 'অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়' এবং ছোট খুড়ি-মা স্বর্গীয়া তারক দাসীর অর্থানুকুল্যে 'তারক দাসী নারী কল্যাণ সদন' ও 'সন্তুচন্দ্র সেবাশ্রম' নামক অতিথি ভবনের প্রতিষ্ঠা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে 'সন্তুচন্দ্র সেবাশ্রম' নামে যে তিনটি অবৈতনিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার উপলক্ষ্য হইবার আমার সৌভাগ্য হইলেও, উক্ত মহিয়সী মহিলার দানই এ কার্য্যকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

পুস্তকাগারের সংশ্রবে আসিয়া আমার এই দেশ-জননীর শ্রীঅঙ্গে দুই এক খানি অলঙ্কারের উপলক্ষ্য হইবার সৌভাগ্য লাভ হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক ক্রমে এখানকার কোন কোন বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ের প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার যোগ সাধিত হয়। আমি জোরের সহিতই বলিতে পারি, স্বেচ্ছায় তথাকার উদ্যোগী কর্ম্মিবৃন্দ তথায় আমায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ দিলেও এবং তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিলেও, আমি কোন ক্ষেত্রেই ঠিক মত আমার কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হই নাই। ফলে পরে তথা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা আমার সম্পর্ক ছেদ চান না, তাঁহারা আমার অক্ষমতা জানান সত্বেও আজিও আমার নামটি রাখিয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, কি আর্থিক,কি কায়িক আমি প্রায় কোন সাহায্যই করিতে পারি না, তথাপি আমায় চাহিবার কারণ কি, সেখানে নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচনে কেন আমাকে মনোনীত করেন! আমি নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও পাই নাই। পাইয়াছি এই, কার্য্যে কিছু করিতে না পারিলেও প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতি বিধানের আকাঙ্খামুক্ত একদিনের জন্যও ছিলাম না; সর্ব্বদাই তাহাদের উন্নতি ও সাফল্য আন্তরিক ভাবেই কামনা করিতাম এবং এখনও করিয়া থাকি। শুধু এই টুকুতেই এত বিশ্বাসের অধিকারী হইতে পারা যায় তাহা পূর্ব্বে বুঝি নাই। ইহা হইতে আন্তরিকতা যে সুলভ বস্তু নয় ইহাই বুঝা যায়।

এইভাবে চলিতে চলিতে আমার কর্ম্মজীবনের একটা অপ্রত্যাশিত অভিনব পথে আসিয়া পড়িতে হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে যখন নয় বৎসরের পর ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাচনের সংবাদ আসিল, তখন এখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা নবচেতনার ভাব দেখা দিল। দেশের কর্ম্মি-যুবকবৃন্দ, প্রবীন জননেতা—যাঁহাদের রাজনীতিই পেশা, সেই সকল রাষ্ট্রধুরন্ধরদের আর চাহিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে চাহিলেন আমাকে ও আমারই মত রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আকাঙ্খাশূন্য দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত*

* তৎকালে চন্দননগরে নির্ব্বাচকদিগের দুইটি তালিকা ছিল, প্রথমটি শ্বেতাঙ্গ ও পণ্ডিচারীর অধিবাসী রাজকর্ম্মচারীদের এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য হইতে।

ছয়জনকে চন্দননগর মিউনিসিপ্যালেটির সদস্যরূপে। এবং একথা খুব দৃঢ়তার সহিতই বলা যায়, সে বারের এই নির্ব্বাচনের ইতিহাসও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভোট সংগ্রহের জন্ত তাঁহাদের কোনরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা, উপরোধ অনুরোধ বা অর্থব্যয় ছিল না। মোটকথা এরূপ সম্মানের সহিত নির্ব্বাচিত হওয়ার কথা এখানে ইহার পূর্ব্বে বা পরে এখন পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের কথা, এখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহাদের নেতৃত্ব একাধিপত্য ছিল, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দাঁড়াইয়া আমার অক্ষমতার কথা জানিয়াও সেবারের হাওয়া বুঝিয়া যদি আমাদের নাম থাকিলে সাফল্য লাভ হয়, এই আশায় তাহাদের বুলত্যাঁয় * আমার ও স্বনামখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভামানী মহাশয়ের নাম উপরেই দিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহাদের নেতার ভোট আমাদের এক এক জনের অপেক্ষা এক পঞ্চমাংশেরও কম হইয়াছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সব পদের মধ্যে যে এত মাদকতা আছে, তাহা লাভের জন্ত যে মানুষ কতটা নামিতে পারে তাহা তখনই প্রথম জানিলাম। যাহাকে প্রধানতঃ লোকে দেশের কাজ বলিয়া থাকেন, এইরূপে তাহাতেও প্রবিষ্ট হইলাম। ঘটনাচক্রে ম্যারের কার্য্যভারও আমার উপর ন্যস্ত হইল। রাজনীতি জানি না, ফরাসী ভাষা জানি না, আইন কানুন জানি না, উপযুক্ত সময় দিবারও সুযোগ নাই; সাধারণের প্রদত্ত এই গুরুভার পালনের অক্ষমতার কথা মনে করিয়া বিশেষ বিচলিত হইলাম। চলতি কাজ কোন প্রকারে করিয়া যাইতে লাগিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্যের ক্রটি হইতেছে উপলব্ধি করিয়া অল্পদিনের মধ্যে পর পর দুই বার পদত্যাগ পত্র দিলাম, কিন্তু ফরাসী ভারতের গভর্ণরের অনুরোধ ছাড়িতে পারিলাম না, আরও কিছুদিন রহিলাম। কিন্তু এই বিবেক বিরোধী কাজ করিয়া প্রকারান্তরে নিরীহ দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা করা অধিক দিন সম্ভব হইল না, তখন পদত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিয়া তাহাতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তখন বেশ বুঝিলাম, আমার এ সঙ্কল্পে আমার দেশবাসীর সমর্থন আদৌ নাই। স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যেও তাঁহাদের অভিপ্রায় আমার এ কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইবার অনুরোধের আকারে প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি গভর্ণরকে এবার স্পষ্টই লিখিলাম, নববর্ষের প্রথম হইতেই আর আমি মেরীতে * যাইব না। দেশবাসীর দেওয়া একটি মাত্র কার্য্যে অক্ষমতা এবং উচ্চরাজপুরুষদিগের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থতা হেতু মনটা একদিকে যেমন ক্ষুণ্ণ হইল, তেমনিই প্রিয় দেশবাসীর আমার প্রতি এই অহেতুকী স্নেহের প্রথম পরিচয় লাভে মনের মধ্যে যুগপৎ এক অনুপম বিষাদ ও হর্ষে ভরিয়া উঠিল।

আমার পদত্যাগের পর কয়েকদিন না যাইতেই মিউনিসিপাল সভা ভঙ্গ করিয়া মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত এক কমিশনের উপর উহার ভার অর্পিত হইল। এদিক দিয়া আমার দেশের কাজ আপাততঃ স্থগিদ রহিল। আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ব্যবসায় কার্য্য দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ কোন কোন শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিলাম, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়াও একেবারে অব্যাহতি পাইলাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে সময় সময় বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতে হইত। প্রচলিত আইন অনুসারে কমিশনের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকিতে পারে না, সুতরাং পুনরায় নির্ব্বাচনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পুরাতন নেতারা তাঁহাদের মরিচা ধরা অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিয়া শান দিতে লাগিলেন এবং একটি নূতন দল আসরে নামিবার মানসে আমাদের সময়ের নির্ব্বাচনের ব্যর্থ অনুকরণে লোকচক্ষে ধূলি দিয়া স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সব বুঝিয়াও আমি নির্ব্বাকই ছিলাম, কিন্তু কোন কোন বন্ধুর কথায় আমার কর্ত্তব্যের ক্রটী হইতেছে ভাবিয়া রাষ্ট্রীয় গগনে অতি কাম্য আবহাওয়া যাহা আমাদের সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা লোপ পাইতে চলিয়াছে দেখিয়া, দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট তৎকালে যে সকল

* ফরাসীতে ব্যালট পেপারকে বুলত্যাঁ বলে।

* মিউনিসিপ্যাল অফিসকে চন্দননগরে মেরী বলে।

ব্যক্তির নির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিলাম। তাহার মধ্যে আমার অনুরোধ কিছুমাত্র ছিল না, শুধু দলগত রাজনীতির প্রশ্রয়ে যে অনিষ্টের আশঙ্কা তাহাই নিবেদন করিয়াছিলাম। আমার কথা সহরবাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল লোককেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। আমার দেশবাসী ইহা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও মনে পড়ে, পুরাতন দলের নেতা "Harihar Babu posses to be the dictator of the town" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

হয়ত একটু আত্মপ্রশংসা হইতেছে, তাহা হইলেও বিনয়ের আবরণে গোপন করার প্রয়োজন দেখি না। সত্যই আমার সে কার্য্যে শুভ অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য কিছু না থাকিলেও ডিক্টেটরের মত কাজ করাই হইয়াছিল, রাষ্ট্রনীতিতে অনভিজ্ঞ যে আমি মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে অক্ষমতা হেতু সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ম্যারের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছিলাম, সহরের বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাহার কথা সকলের কাছে সমর্থিত হইল কেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমার মনে হয় সহরের কল্যাণার্থ ভিন্ন ইহার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বা আন্তরিকতার অভাব আছে, এরূপ সন্দেহ কেহ করেন নাই। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, ইহা হইতে এই বুঝা যায়, লোকে আন্তরিকতার মূল্য দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং ইহার স্থান রাজনীতির উর্দ্ধে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার লোভে লোকের স্বার্থগত প্রচেষ্টা সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের নিজ নিজ বিবেক বিবেচনা মত কার্য্য করিবার সুযোগ ও শক্তিকে নষ্ট করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।

ইহার পর আরও দুইবার আমাকে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকিতে হইয়াছিল। প্রথমবার নির্ব্বাচনে—পূর্ব্বে না বুঝিলেও পরে বুঝিয়াছিলাম বন্ধুদের সুযোগ লইয়া কোন বন্ধুবিশেষের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনার্থ সুযোগ হিসাবে আমার নাম লওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। শেষ বার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে মনোনয়নের দ্বারা। এই দুইবার শেষ পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে পারিয়াছিলাম, কারণ বড় দায়িত্ব তখন আর আমার উপর ছিল না। এই সময় হইতে আমার একটি বিষয় নূতন উপলব্ধি হইয়াছিল, তাহা আর কিছু নহে। যে সকল বন্ধু আমার সুখ শান্তি সম্পদ খ্যাতিতে বা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তিতে বরাবর আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তন্মধ্যে অল্প কয়েকজনের যাঁহারা রাজনৈতিক প্রভুত্ব পাইবার জন্য লালায়িত, তাঁহাদের এই ক্ষেত্রে আমার খ্যাতি প্রতিপত্তি যেন ক্রমেই অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিতেছিল। এই শূন্যগর্ভ সম্মান যে এত লোভের তাহা তখন হইতেই ভাল করিয়া বুঝিলাম। যাহা হউক, আমার নিবৃত্তির সহিত তাঁহাদের মধ্যে সে ভাব অনেকাংশে প্রশমিত হইলেও, পুনরায় আবার একদল যুবকের মধ্যে বিশেষ তীব্র ভাবে তাহা দেখা দেয়—যখন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সহিত অকস্মাৎ দেশ-জননীর অলক্ষ্য আহ্বানে চন্দননগরে নবগঠিত শাসন পরিষদের প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেকার দিনের কথা জানি না; এখন রাজনীতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমি বুঝি না। সে বিষয় যে আমার দক্ষতার অভাব এ প্রমাণ আমার দেশবাসী ও সরকারও পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, তথাপি সহরে বহু জ্ঞানী গুণী রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন আগ্রহশীল কর্ম্মী থাকিতে তথায় নূতন ক্ষমতাদানের কালে প্রতিনিধি পরিষদের ও মিউনিসিপ্যাল সদস্যদিগের সহিত আমাকে পুরোভাগে রাখিয়া শাসন পরিষদ গঠনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আজিও ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গভর্ণর বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষায় আমার বারংবার অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও শেষে বিবেচনা ও বন্ধুদের নিকট হইতে কতটা সাহচার্য্য পাইতে পারি পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবার সময় দিয়া তিনি বিনা অপেক্ষায় অনতিপরেই স্বেচ্ছায় আরেতে* করিয়া অন্যথাচরণ করিলেন কেন, ইহার মূলে কোন রহস্য বা ষড়যন্ত্র আছে, মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

আমার এই পদ গ্রহণ করায় আমাদের ভারতভুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইল এই অজুহাতে কতিপয় যুবকের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে

* গভর্ণরের আদেশনামা।

বিক্ষোভের সৃষ্টি ও সত্যাগ্রহ, রেসিডেন্সিতে পিকেটিং প্রভৃতি উদ্ভব হইয়াছিল, যদিও শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের উপলক্ষ্য করিয়া বাঞ্ছিত মুক্তির পথ সুগম ও শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভই হইয়াছে, তাহা হইলেও সত্যই যে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আমাদের দিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার আশা ছিলই না, তাহা বলা যায় না। কারণ পরে যতদিন যাইতে লাগিল তাঁহাদের কার্য্যাবলী হইতে আমাদের স্বাধীকার দানের পশ্চাতে তাঁহাদের নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার সহকারী বন্ধুদের কথা ছাড়িয়া দি, আমাকে কেন্দ্র করিয়া এত যে কাণ্ড চলিতে লাগিল, এমন কি আমার বাস-গৃহের সম্মুখে মেয়েদের সত্যাগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও হইল, তাহা সত্ত্বেও আমি যে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, যখন মাত্র সামান্য প্রচেষ্টাতেই এই শাসন সংস্কার পাওয়া গিয়াছে, তখন এই পথ ধরিয়াই কাম্য ফললাভ সহজ হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন এইরূপ একটা স্বাধীকার লাভ হইতে পারে কিছুদিন পূর্ব্বে যখন এই আশ্বাস পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে স্থানীয় নেতৃবর্গ মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির অভিমত লইয়া জানিয়াছিলেন যে, উহা গ্রহণ করিয়া কাম্যমুক্তির জন্য বৈধ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করিয়া যাওয়াই উচিত। এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এবং মাত্র একটা বৎসর, যদি পারি কোন প্রকারে কাটাইয়া দিব—এই ভাবিয়াও পদত্যাগ করিতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

এই নূতন পরিষদের উপর পূর্ণ অর্থনৈতিক ও আংশিক রাষ্ট্রিক অধিকার অর্পণের পর তৃতীয় দিবসে পণ্ডিতজীর অভিপ্রায়ে বাঙ্গলার তদানিন্তন প্রদেশপাল রাজাজীর দ্বারা সত্যাগ্রহীদের নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার সদ্য নিয়োজিত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি চন্দননগরে প্রেরিত হন। তাঁহারা হুগলীর কমিশনার সহ প্রথম আমাদের বাটীতে আমাদের ও পরে এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর ও ম্যারের সহিত আলোচনা করিয়া মেরীর মাঠে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করার পর আমি ধন্যবাদ দিতে উঠিলে এক যুবক শেম্ শেম্ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠেন। রাজনৈতিক জীবনের ইহাই আমার প্রথম পুরস্কার। যদিও আমার রাজনৈতিক জীবনে কেন কোনদিন কোথাও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন স্থানেই এবম্‌প্রকার মন্তব্য শুনিতে হয় নাই। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আমার ষষ্টিতম জন্মোৎসবে ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সভায় দেশবাসীর স্নেহের দান 'শিক্ষাবন্ধু' ও 'দেশশ্রী' উপাধিতেও যেমন ইহার সামঞ্জস্য আমার মধ্যে পাই নাই, প্রকাশ্য মহতী সভায় এই ধিক্কারসূচক বাক্যেরও সার্থকতা চিন্তা করিয়া আমার মধ্যে পাই নাই বা বিচলিতও হই নাই। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব, বংশগত শেঠ উপাধি ভিন্ন রাজদত্ত বিদেশী বা দেশবাসীর অথবা পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত উপাধি ব্যবহারের অভ্যাস আমার না থাকিলেও, উপাধির দ্বারা লোকচক্ষে একটা অলঙ্কারভূষিতরূপে প্রতীয়মান হওয়া ভিন্ন ইহার অন্য সার্থকতা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ফ্রান্সের প্রদত্ত উচ্চ সম্মান 'লেজিয় দনার' 'অফিসিয়ে জেলা এ্যাঁসট্রাকসিও পাবলিক' প্রভৃতি এমন কি বিভিন্ন সভা হইতে 'বিদ্যাবিনোদ' 'সাহিত্যভূষণ' প্রভৃতি প্রাপ্ত উপাধির অপেক্ষাও ইহা আমার কাছে অধিকতর আদরের মনে করি। চন্দননগরকে ভালবাসার কোন শ্রদ্ধাস্পদ নাগরীক প্রদত্ত আমার 'কূপমণ্ডূক' উপাধির ন্যায় এই 'শেম্'ও আমার কাছে গরীয়ান। আর সত্য বলিতে কি, পরিষদ হইতে বিদায়ের দিনে পরিষদ প্রদত্ত অভিনন্দনের সহিত সভাপতির বিশিষ্ট আসনখানি এবং তথাকার কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রদত্ত স্নেহোপহার স্বর্ণ-মণ্ডিত লেখনীও যেন এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যোপহারের সহিত সংযুক্ত হইয়া অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

এই পরিষদে প্রবেশের তিনমাস পরে চন্দননগর মুক্ত-নগরী বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত এসেম্বলি হইতে পুনর্ব্বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যখন দুই-একটি বিষয় ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব বিষয়ের অধিকার হাতে আইসে, তখন সত্যকার কাজ করিবার অনেক কিছু পাওয়া যাইল। পূর্ণ স্বরাজ বা মুক্তিলাভ না হইলেও, চন্দননগরের যথার্থ কল্যাণসাধনের অনেক সুযোগ সম্মুখে দেখিয়া মনে বহু আশা হইল। সহকর্ম্মী বন্ধুদের বিশেষ

করিয়া প্রথম সহকারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহায়তায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি বহু বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইল। আমি নামে মাত্র, সত্যকার যাহা কিছু করিতে লাগিলেন আমার সহকর্ম্মীগণই। নবীন উৎসাহে কতকটা অজ্ঞতা, কতকটা উদাসীনতার জন্য দেক্রের* সর্ত্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই কোন কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াও চন্দননগরের কল্যাণার্থে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ফ্রান্স শুধু নীরবে নয়, বোধহয় চন্দননগর হস্তচ্যুত হইবে না এই ভরসায় তাহা সানন্দেই সব কিছু সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও অন্যদিকে তাহার পূর্ণতাসাধন বিষয় প্রতিবন্ধক দেখিয়া উপযুক্ত শক্তির অভাব ও নিজ দুর্ব্বলতা হেতু দুর্নীতি ও অনাচার সকল রোধের অক্ষমতা ও সেই সঙ্গে আমাদের ভারত-ভুক্তির সাধনা সিদ্ধিলাভের পথ ক্রমশই জটিলতর করিয়া তোলায়, আর আমাদের মধ্যেও ক্রমে কার্য্যের অপেক্ষা আড়ম্বরের আধিক্য দেখিয়া নৈরাশ্যে শিহরিয়া উঠিলাম। পদত্যাগের জন্য ক্রমেই মন ব্যাকুল হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোন সুরাহার সম্ভাবনা মনে হইল না। কারণ আমি পদত্যাগ করিলে প্রথম সহকারীকে সেই পদগ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বা অপর প্রায় সকলেই ত হৃষ্টমনে আমাকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপর ভারার্পিত বিভাগগুলিতে তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। আমি ক্ষত বিক্ষত হৃদয় লইয়া আমার কার্য্যকালের পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমার এই দেশ সেবার কার্য্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা হইয়াছে, অল্পলোক ভিন্ন অবশিষ্ট প্রায় সকলেই দেশ সেবার নামে কোন না কোন প্রকারে আত্মসেবায় রত থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে প্রত্যক্ষ অর্থলোভই করিয়া থাকেন তাহা নহে। প্রকারান্তরে বিবিধ প্রকারে স্বার্থ সাধন হইয়া থাকে। এমন কি সেজন্য প্রার্থী হইবার বা কোনরূপ চেষ্টা করিবারও অনেক সময় আবশ্যক করে না। দেখা যায়, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ বা অন্যরূপে উপঢৌকনাদি দিয়া থাকেন। এই যে বড় দিন, নববর্ষে বা সদস্যদিগের বাটিতে বিবাহাদি কার্য্যে ভেট বা উপহারাদি দেওয়া হইয়া থাকে, ইহার পনের আনা স্থলে ঘুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার সৌভাগ্য, এরূপ কেহই আমাকে কিছু দিতে আইসেন নাই। কাজ করিবার কালে বরং তৎপরিবর্ত্তে আমি ও আমার প্রধান সহকর্ম্মী তদানিন্তন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে ব্যাজার নিকট হইতে উভয়ের পদোপযোগী ব্যবহারের জন্য সুন্দর রজত নির্ম্মিত নটরাজ ও শ্রীরাম চন্দ্র মূর্ত্তি সম্বলিত শীলমোহর একটি করিয়া উপহার পাইয়াছিলাম। আর কার্য্যকালের শেষে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিদায়ের কালে সভাপতির ব্যবহারের কাষ্ঠাসন খানি পরিষদ হইতে এবং আমার প্রিয় পরিষদের কর্ম্মচারী বন্ধুদের স্নেহের উপহার একটি সুবর্ণ মণ্ডিত ফাউণ্টেন পেন পাইয়াছিলাম। এমনও দেখা যায় শুধু পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে জয়লাভের প্রত্যাশায় ব্যক্তি বিশেষের সন্তোষ সাধন জন্য, কেহ কেহ অবিচার পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে যত কিছু অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দুর্নীতি, বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, তাহার মূল কারণ অন্ততঃ বার আনা স্থলে স্বার্থ প্রণোদিত, আর চারি আনা স্থলে দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা আমার ছিল। আমার সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, যে, আমাকে সম্মুখে রাখিয়া অনেক অন্যায় হইত। ঠিক এ কথা আমি মনে করি না। আমার দুর্ব্বলতা ও আমাদের উপযুক্ত শক্তির অভাব জনিত আমার জ্ঞাতসারেই অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। শুধু দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এ কার্য্যে রত হন তাহার সংখ্যা নিতান্তই বিরল। কাজ করার সঙ্গে নাম যশের আকাঙ্খা লইয়াও কতক লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। সে সংখ্যা একেবারে বিরল না হইলেও অধিক নহে। আর পূর্ব্বের বর্ণিত শ্রেণীর দেশ-সেবক সুপ্রচুর। আর শিখিলাম, প্রভুত্বের লোভও কম নয়। ইহাতে অনেক মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। তাঁহাদের কাজে বা

* ফ্রান্সের মন্ত্রীদের প্রবর্ত্তিত সনদ, আদেশনামা বা উপবিধিকে ফরাসী ভাষায় 'দেক্রে' বলে।

কথায় যে কোন ভুল ত্রুটি হইতে পারে ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। গদিলাভ করিয়া তাঁহারা নিজেকে সর্ব্ব বিষয়ে বিশারদ মনে করেন। কেহ কেহ ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এমনও দেখা যায়, শুভ ইচ্ছা লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাপে লিপ্ত হন, এবং পতনশীল পদার্থের ক্রম বর্দ্ধমান গতির ন্যায় যত দিন যায় ততই তাঁহারা নামিতেই থাকেন। এই সবই বিশ্বাসঘাতকতা ও চৌর্য্যের পর্য্যায়ে পড়ে। অনেকেই জানেন বহু ক্ষেত্রেই সরবরাহ কারক বা কন্ট্রাক্টারের মধ্যমেই সেই কার্য্য হইয়া থাকে।

এ সবের প্রতিকার সহজ নহে। খুব প্রখর বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন যদি নাও হয়, নির্লোভ দেশপ্রেমিক লোক ভিন্ন কাহারও উহার মধ্যে যাওয়া উচিৎ নহে। অবশ্য চোরকে চুরি করিতে নিষেধ করা যেমন নিরর্থক, ইহাও তদ্রূপ। গৃহস্থের সাবধানতাই যেমন সমধিক ফলপ্রসূ, তেমনই অজ্ঞ নির্ব্বাচকদিগকে তাঁহাদের স্বার্থ ও অধিকার বিষয় শিক্ষিত করিয়া তোলাই কতকটা উপায়। এই চেষ্টা যাঁহারা করেন, নির্ব্বাচকদিগকে স্বার্থান্বেষীদের প্রভাব হইতে যাঁহারা রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারাই প্রকৃত রাষ্ট্রের বন্ধু। মোট কথা যে কোন উপায়েই হোক যাঁহারা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আদাজল খাইয়া লাগিয়া যান, তাঁহাদের বিশ্বাস করা কঠিন।

পরিশেষে আমার নিবেদন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিক ক্ষমতাভিলাষ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাধারণ ভাবে ত্রুটি ও নিন্দার কথা বলিলাম। আমার রাজনীতিক জীবনের শিক্ষা প্রবন্ধেও যথেষ্ট বলিয়াছি। ইহা হইতে আমি অপরের চরিত্রে যাহা দোষাবহ মনে করি, আমি যে ঐ সকল দোষে দুষ্ট নহি ইহাই আমি বলিতে চাহিয়াছি, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তাহাতে আশ্চার্য্য হইবার নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার জ্ঞান কতটা ও স্থান কোথায় তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। অনেক ক্ষেত্রেই অধুনা যেমন যেকিই চলিতেছে, আমার সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রেও তাহাই। আমার যোগ্যতা থাক আর নাই থাক, আমার সাধুতা সম্বন্ধে আমার কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকা কালীন আমি এই সব অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলাম কি না, তাহার বিচারক আমার সহরবাসী এবং তদপেক্ষা আমার সহকর্ম্মীগণ।

আমি তার ধরি হাত

শ্রীলক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

নীরব পল্লীপথে গোধূলির বনছায়
কে এক অচিন মেয়ে ভিন্ গাঁয়ে চলে যায়,
কালো তার কেশদাম চঞ্চল সমীরণ
কুঞ্চিত দোলা লাগে, অঞ্চল উনমন,
কুমকুম আভরণ, আবরণ অহেতুক
বনফুল পরশন মন মোর উৎসুক।
জীবনের সজ্জায় আছে তার প্রয়োজন
মিশে যাক্ এ হিয়ায় ও হিয়ার তনুমন;
গ্রামিক মেয়ের রূপ, আনুক আমার সুখ
শিহরণ লাগি তার স্বাভাবিক আয়োজন।
বিহগের কাকলীতে মুখরিত বনতল
নদীজল ছলছল—মম মন সমতল;
বিরহ দিনের ব্যথা দূরে গেছে নাই আর,
আমার পরাণ মন ও মেয়ের চারিধার
দেখিলাম ফিরে চায় ও মেয়ে এ পৃথিবীর,
আমি তার ধরি হাত—নির্জ্জন নদীতীর।

'নবজাতকের' কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি বা কবিমানসকে আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর সৃষ্টিঅংশ যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয়ে নব নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাঁর কাব্যনির্ঝরের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন কালে পরিবর্ত্তিত হয়ে বিভিন্ন খাদে প্রবাহিত হয়েছে। জগৎ ও জীবনের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সত্তা তাঁর মননশীল কবিকল্পনাকে শুধু ধরা দেয় নাই, তাহা বাস্তবরূপে মূর্ত্ত হয়ে অমৃতের রসায়নে তাকে অভিসিক্ত করেছে এবং অভিনব ছন্দমাধুর্য্যে আপ্লুত করেছে। 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে 'চিত্রা'র সৃষ্টিকাল পার হয়ে 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্য্যন্ত এবং পরে 'বলাকা' থেকে 'বীথিকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের সুদূর প্রসারিত অখণ্ড প্রবাহ নব নব ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে খরস্রোতে এবং তরঙ্গের অশান্ত আলোড়নে রসপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে জাতির চিত্তভূমিকে প্লাবিত করেছে। অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যের নিরঙ্কুশ গতি সাময়িক ভাবে সম্মুখ হতে রুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর কবিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী একটি ধারার অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যের যে-নির্ঝর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের অদৃশ্য গুহা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে অনেক গহন অরণ্য অতিক্রম করে প্রান্তরের সমতল ভূমিতে উচ্ছ্বসিত স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয়ে দুরন্তগতিতে মহাসাগরের দিকে ছুটছিল, তা হঠাৎ এখানে এসে মন্থর হয়ে গেছে। মহাসাগরের দূরত্বের স্বল্পতা যেমন একদিকে একে তটসীমার কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অপর দিকে এর শান্ত ও নির্ম্মল রসধারার দর্পণে জাতি আপনার মুখবিম্ব প্রতিবিম্বিত দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বস্তুতঃ 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপের পরিবর্ত্তনের যে সূচনা দেখা দিয়েছিল, তা 'প্রান্তিকে' রূপান্তরিত হয়ে 'নবজাতকে' নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রেরণা সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু না বললে আলোচ্য বিষয়টি সুবোধ্য হবে না। 'নবজাতক' রবীন্দ্রনাথের ঋতু পরিবর্ত্তনের কাব্য। এখানেই তাঁর কবি-প্রতিভার সৃষ্টি বদলের শেষ পালা। গতানুগতিকতা রবীন্দ্রকাব্যের মনন-কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কবি তাঁর সৃষ্টির আদি যুগ থেকে কাব্যের যে-পরীক্ষণরীতি অনুসরন করে চলেছিলেন, 'নবজাতকে' তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। এযাবৎ কবির আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পনা কেবল মাত্র ব্যক্তি-জীবন এবং বিশ্বজীবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। 'নবজাতকে' সেই জীবন দর্শনের অবসান হয়েছে। কবি স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তি-চেতনা থেকে সমাজ চেতনায় ও রাষ্ট্র চেতনায় মনোযোগী হয়েছেন। এই হিসেবে কাব্যের 'নবজাতক' নামকরণও সার্থক হয়েছে।

'নবজাতকের' কবিতাগুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক—কবির ঐতিহাসিক চেতনা-সঞ্জাত কবিতা যাহাতে বৃহত্তর পৃথিবী এবং তাহার জন-মানস সম্বন্ধে বাস্তব-বোধের নিদর্শন বর্ত্তমান। দুই—কবির ব্যক্তিগত জীবনের ভাবব্যঞ্জনা পূর্ণ ছন্দোবদ্ধ বাণী। অর্থাৎ কবির সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি একদিকে যেমন সভ্য জগতের বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করতে পারেনি তেমনি অপরদিকে তার নগ্নতা এবং কুশ্রীতাকেও সমর্থন করতে পারে নি। ফলে তাঁর মননকল্পনার এক দ্বন্দ্ব সংঘাতের আবর্ত্ত রসচেতনাকে মথিত করে বিষের মধ্যে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে হতাশা ও ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত হলেও পরাজয়ের স্বীকৃতি নেই। কবি বিশ্বাস করেন যে, মানব ইতিহাসের অভিব্যক্তির চরম বাধা তার সাময়িক পতন বা স্খলনে নয়—তার শাশ্বত জয়যাত্রার অভিযানে, যেখানে সে সকল বাধাকে অতিক্রম করেছে—সত্য-শিব ও-সুন্দরের আরাধনায় এবং আপনার অন্তরের কল্যাণ বুদ্ধির সাধনায়।

'নবজাতকের' কবিতাগুলির বিষয় বস্তু সম্বন্ধে প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, কবি এখানে অলঙ্কার বর্জ্জিত

শব্দের ও সহজ বোধ্য ভাষা এবং ভাবের আশ্রয়ে তাঁর কাব্যকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে একদল সমালোচক মহলে প্রায়শঃ যে সকল অভিযোগ শোনা যায়, এখানে কবি তা কৃতিত্বের সঙ্গে নিরসন করেছেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে 'পরিশেষ' কাব্যে যে নিরলঙ্কার বিরল-সৌষ্ঠব স্বল্প ভাষিতার সূচনা দেখা দিয়েছিল, তাহাই সুপরিণত এবং স্বার্থকভাবে এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একদা কবিতার ভাব ও ভাষাকে প্রচলিত আলঙ্কারিক রীতি থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজস্ব কাব্যরীতি (diction) প্রবর্ত্তন করে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি কবিতাকে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে সাহস করেন নি। পরে একজন মার্কিনদেশীয় কবি (Whitman) এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করেন এবং আধুনিক যুগের একজন প্রতিভাশালী কবি (টি, এস্ এলিয়ট) এ বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং কাব্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুকে অনাড়ম্বর স্বল্পভাষিতায় পরিপূর্ণ করে সমগ্র জন-মানসের উপযোগী সহজবোধ্য রস পরিবেশন করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের রূপ বিবর্ত্তন অনুধাবন কালেও দেখি যে 'বলাকা'য় তিনি এক ধরনের ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সমন্বয় যুক্ত মুক্তক ছন্দের নিয়মিত বৃত্ত প্রবাহ ও অন্তঃমিলের সেই পরীক্ষণ প্রচেষ্টা পুনরায় 'নবজাতকে' আবির্ভূত হয়েছে। কাব্যের ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে চিরাচরিত সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন মোচন করা বা পদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তাকে বিচরণ করতে দেবার দুঃসাহসিক কাজ কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দান। এবার 'নবজাতকের' কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একবার বলেছিলেন—"Better a living in the Pantheistic paganism of ancient Greece than adherence to the materialistic formalism of modern humanity." রবীন্দ্রনাথের নবজাতকেও এই ভাব প্রতিধ্বনিত হতে

সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ

দেখা যায়। আধুনিক জগৎ, বিশেষ করে জড়বাদে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য জগৎ ব্যবহারিক জীবন ক্ষেত্রে যেমন উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছে তেমনি তার আত্মিক শক্তির উৎসমুখ বন্ধ হওয়ায় তার আধ্যাত্মিক জীবন পঙ্গু ও বিকল হয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনাধীনে থাকার ফলে ভরতবর্ষও ইউরোপের অনুকরনে বিজ্ঞান সভ্যতায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজের যুগ যুগান্তরের বৈদিক সভ্যতা এবং তপোবন সাধনার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। কবির মরমী মন এতে গভীর বেদনায় ভরে উঠেছে এবং এই যুনেধরা পাপ-দীনতাপূর্ণ সভ্যতার অনিবার্য্য ধ্বংসের কথা তিনি সাবধান বাণীর মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে শুনিয়ে গেছেন 'নবজাতক' কাব্যের একাধিক কবিতায়। নিদারুণ ব্যথায় কবিচিত্ত বলে উঠেছে—

> ক্ষুধাতুর আর ভুরি ভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দ্দহন,
> সভ্য নামিক পাতালে যেথায়
> জমেছে লুটের ধন।

* * *

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর—
একদিন হবে ঢিলা॥

(প্রায়শ্চিত্ত)

ধর্ম্মের নামে, সভ্যতার নামে, মানুষের এই পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়লে হবে না—সত্যিকার কল্যাণশক্তি দিয়ে সেই কাজ করতে হবে। তবেই—

"নূতন জীবন, নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে॥" (প্রায়শ্চিত্ত)

কবি কখনও মনে প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, যে-বিশ্ব সৃষ্টির লীলা আদিকাল থেকে মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী ঘোষণা করে এসেছে তা আজ মুষ্টিমেয় একদল মানুষের ভুলের জন্তে বা তাদের পাপ ও বিকৃতির ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হলে বিধাতার সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানব জীবনের উর্দ্ধলোক-যাত্রার ও তার আত্মার শাশ্বত উর্দ্ধমার্গগামীতার সুদীর্ঘ সাধনা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে—তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই কবির মনে এই প্রশ্ন জাগে—

* * *

"বহু যুগযুগান্তরের কোন্ এক বাণী ধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূণ্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজ শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?" (কেন)

সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক সভ্যতা যে মনুষ্যত্বের মহিমার পূর্ণ বিকাশের সহায়ক নয়—এ যে তার অপমৃত্যুর কারণ এ কথাও কবি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা এত দূর বেড়ে গেছে যে সে স্বচ্ছন্দবিহারী পাখীদের মত আকাশে বিচরণ করে শুধু তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গানই বন্ধ করেনি, মাটির পৃথিবীর মানুষকে অবহেলা করেছে, তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং সবচেয়ে স্পর্দ্ধার বিষয় এই যে, বিধাতার মহান শক্তিকে পর্য্যন্ত তারা আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। তাই কবি তাঁর পরুষ কণ্ঠে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদে বলছেন—

"দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে॥
আর্ত্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন॥ (পক্ষী মানব)

নব জাতকের কবি বাস্তব জগত সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন। এই বাস্তবনিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে কবি যে-সকল বিষয়বস্তু বা উপমা কাব্যের উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন তা আধুনিক যুগের সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত সামগ্রী—যেমন, এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, রেডিও ইত্যাদি। বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে ইষ্টেশনের মত স্থান যেখানে মানুষের প্রাণযাত্রার বাহন রেলগাড়ী। কবি দেখছেন—

"দিনরাত গড়্ গড়্ ঘড়্ ঘড়্
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়॥

* * *

নিত্য মেলার নিত্য ভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা। (ইস্টেশন)

সকাল সাড়ে নটায় কবি বৈঠকখানার ঘরে বসে রেডিয়োতে বিবেশিনীর কণ্ঠ সঙ্গীত শুনছেন এবং মনে মনে বলেছেন এ যেন—

—"বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সঙ্গীতের ধারা। (সাড়ে নটা)

এ ছাড়া কবির যে দু'টি কবিতা তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে নবতনরূপে উদ্‌ঘাটিত করেছে, তা' হল 'রাজপুতানা' এবং 'হিন্দুস্থান'। রাজপুতানার বীরগণের অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের সঙ্গে বর্ত্তমান অবনতির তুলনা করে তার পর প্রসাদভোগী রাজন্যবর্গের দাস-মনোবৃত্তি এবং কৃত্রিম আড়ম্বর দেখে কবির মনে স্থির ধারণা হয়েছে যে এত হীনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকার চেয়ে তার ধ্বংসকে বরণ করাই উচিত ছিল। কেননা কোনো এক রকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল। তাই কবি বলেছেন—

"প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্ম্মার গল্প উত্তেজনা
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা
লভিলে না বিনষ্টের শেষ স্বর্গলোক,

* * *

শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান পেলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।"

(রাজপুতানা)

হিন্দুস্থান কবিতায় কবি শত শতাব্দীর সেই ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন যার বিস্মৃত অধ্যায়ে—

"নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিক বাহিনী
এক কাহিনীর সূত্রে ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।" (হিন্দুস্থান)

এবং অবশেষে ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়ার সেই ইঙ্গিত শুনেছেন যা বিদায়ের আগে—

"বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।" (ঐ)

কিন্তু এই বাস্তব চেতনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাকে উদ্‌বুদ্ধ করলেও তাঁর কবি-প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে নাড়া দিয়ে তার অন্তর্মুখী প্রবৃত্তিকে বহির্মুখী করতে পারেনি। ফলে কবির অন্তর ও বাহিরের মননক্ষেত্রে নিরন্তর এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। 'নবজাতকে'র অনেকগুলি কবিতায় এই ভাবজগতের সঙ্গে বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'এপারে ওপারে' কবিতায় কবি যেমন চিত্রময়ী বর্ণনার সাহায্যে সহরবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা অপূর্ব্বভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তেমনি সেই প্রাণপ্রবাহে একাত্ম অনুভূতি দেখাতে না পেরে অন্তরে খেদ অনুভব করেছেন। কেননা যেখানে—

"—ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনে রাতে

* * *

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে ক্ষণে
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্ব্বব্যাপী সাফল্যের সচল স্পর্শের লাগি।"

(এপারে-ওপারে)

কিন্তু এ ব্যগ্রতা কবির বস্তু জগতের ব্যগ্রতা, ভাব-জগতের ব্যগ্রতা নয়। তাঁর ভাব-জগৎ অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত যেখানে মন সংসারের সকল কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে নিস্তব্ধ ও ধীর অবস্থায় আপনার কাজ করে চলেছে। তাই কবি বলছেন, বাস্তবের ধাক্কা যত প্রবলই হোক তাঁর মন অবিচলিত ভাবে বিরাজ করে স্বরচিত এক স্বপ্নলোকে এবং তা কখনও—

"আপনার উচ্চ তট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা স্রোতে।"

(এপারে ওপারে)

নিভৃত লোকবাসী কবি-প্রকৃতির এই আভিজাত্য-বোধকে অনেকে রোমান্টিক বলে অভিযোগ করেছেন। কবি তাঁদের সেই অভিযোগের সত্যতা সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক মেনে নিয়েছেন, কেননা তিনি রসতীর্থ পথের পথিক। কিন্তু রোমান্টিক বলেও একেবারে জগতের দৈন্য, দুঃখ, ব্যথা, কুশ্রীতাকে ভুলে আকাশচারী কল্পনার পক্ষে ভর দিয়ে তিনি বাস্তব জগতের রূঢ়তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। বরং যেখানে এ সকলের লেশমাত্র চিহ্ন দেখেছেন সেখানে নির্ম্মমভাবে তার প্রতিরোধ

করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং নিজেকে জাগ্রত করে—কম্বুকণ্ঠে বলেছেন :

"দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্ম্মম কর্ম্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
সৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে॥ (রোমান্টিক)

তবুও কাব্য সৃষ্টির বাস্তব অপূর্ণতা শেষ জীবনে তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে। কবির স্বভাব সৌকুমার্য্য কাব্যকে কেবলমাত্র রূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র রূপের ভেতরই হয় না, রূপ-বিরূপের দ্বন্দ্ব সংঘাতে যে শক্তির স্ফুরণ হয় তারই আলোকে সৌন্দর্য্য আপনার অবিনশ্বর মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। কবি তাই সখেদে সুকুমার রূপের সঙ্গে রৌদ্র বিরূপকে আহ্বান জানাচ্ছেন :

"তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্র, তোমার করি স্তব—
তব মন্দ্ররব
করুক ঐশ্বর্য্য দান,
রৌদ্রী রাগিনীর দিক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী বিলাসীর কানে ব্যপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার॥
(রূপ-বিরূপ)

এ ছাড়া নবজাতকের আর সকল কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনা মানবাত্মার সেই জয়যাত্রার গান গেয়েছে যা প্রতিনিয়ত মর্ত্ত্য জগতের স্থূল আবরণ ভেদ করে সূক্ষ্ম অসীম অধ্যাত্মলোকের দিকে অবিরাম ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও কবির সেই-জীবন-দেবতার আহ্বান বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা তাঁকে শৈশব থেকে কৈশোরে এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে চালিত করার পরও বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের সমাপ্তির কথা বলেনি বরং আরও দূরে নব নব লোকের সন্ধানে টেনে নিয়ে চলেছে ; কবির সকল সত্তা নিবিড় ভাবে এই অনুভব করে যে—

* * *

"এ অজ্ঞের সৃষ্টি আমি অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্ত্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্ব প্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা। (প্রশ্ন)

জীবন ও মৃত্যুর পরম শুভ লগ্নে দাঁড়িয়ে 'নবজাতকে'র কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে ভক্তিনম্র অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

"ক্ষণিক মুহূর্ত্ত তরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্ন ভাঙ্গে চোখে
চিনে নিই, এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়।"
(শেষ কথা)

কিন্তু কাছে থেকে মিলনের মাঝে কবি যাকে পরিপূর্ণ ভাবে চিনতে পারেননি, আজ দূর থেকে বিচ্ছেদের মাঝে তিনি তাকে চিনতে পারবেন বলে মনে করলেও এই কথা ভেবে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে—

"জানি না, বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানিনা, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পী কবি॥
(শেষ কথা)

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করতে নিজের মনকে সকল নৈরাশ্য ত্যাগ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। কারণ চারিদিকের ঘন অন্ধকারের মাঝেও তিনি বিধাতার সান্ত্বনাবাণী শুনেছেন এবং আশার আলোকের ইঙ্গিত পেয়েছেন, যার বলে তাঁর মনের জড়তা-তামস দূরীভূত হয়ে গেছে এবং তিনি নিঃসংশয়ে এই কথাই বলছেন—

"নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্দ্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্ত্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা।" (রাত্রি)

বিশ্বসৃষ্টির এই গূঢ়গভীর রহস্যই রবীন্দ্রনাথের 'নব জাতক' কাব্যে অপূর্ব্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে কাব্য পিপাসু পাঠককে স্থায়ী রস পরিবেশন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ভাষ্য বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা

'ঈশ্বর যে অহঙ্কার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহঙ্কার না হ'লে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হ'লে মিলন হয় না, মিলন না হ'লে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদ পারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্ম্মতন্ত্রই বলো।'

'আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না; দুই যখন একসঙ্গে থাকে অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।'

'আমাদের যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই জন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাচ্ছি, নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবো, এই ইচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি, তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধ'রে রেখেছেন।'

'ব্রহ্মকে সহজ ক'রে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে

ধ্যানমগ্ন কবি

পারছি নে ব'লে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার ক'রবো না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে—বার বার তাঁকে

বলতে হবে, 'এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সমুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতিমুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্তকালে।'

'পিতা নোঽসি—পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র; তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই ব'লে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে: পিতা নোঽসি। পিতা তুমি আছ। যা সত্য, তা শুধু মাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।' **শান্তিনিকেতন**—১ম, ২য় খণ্ড।

'যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্ব্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা; পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরম আদর্শ।'

'যাহা পাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে, তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়; যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত, তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।' **ধর্ম্ম**।

'স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হ'লে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে সর্ব্বজনীনতার আবির্ভাব।'—**মানুষের ধর্ম্ম**।

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত।'

'ধর্ম্ম সেই সঙ্গীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মায় সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সঙ্গীতশালায় যে সর্ব্বত্রই সঙ্গীত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের একরকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় সাধনা নহে, কাহারও বা সুরে দোষ আছে, কাহারও বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এই জন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।—**সঞ্চয়**।

এই যোগসাধনা হইতে বিযুক্তি মানে—মানুষের 'ছোট আমি'র কাছে 'বড় আমি'র পরাভব। বিষয়বুদ্ধির গর্ত্তে পড়িয়া মানুষ সেখানে আত্মার অমরতাকে হারায়। আত্মকল্যাণের পথ সেখানে রুদ্ধ। জীবপ্রকৃতিকে মায়াময় এই পৃথিবীর কোলাহল যখন আবিষ্ট করিয়া তোলে, তখন বুদ্ধিভ্রমে মানুষ আপনার মধ্যেই পাঁকের সৃষ্টি করিয়া আপনাতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, মরীচিকার মায়াবী ধাঁধায় সত্যকে সে তখন দেখিতে পায় না। কিন্তু সাধনলব্ধ চিত্তে যখন সে এই জড়প্রকৃতির কোলাহলের বাহিরে আসিয়া সত্যের মুখামুখি হইয়া দাঁড়ায়, তখন এই মায়াময় বিশ্বও তাহার নিকট আনন্দস্বরূপ হইয়া দেখা দেয়, তখন প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে সে তাহার পরম প্রাণপুরুষের সঙ্গে লীলাবিহার করে। সেই পরমপুরুষই তাহার পরমাত্মা, পরম সত্য, পরম জ্ঞান ও পরম লক্ষ্য। তখন সে গায়ত্রী পাঠ করিয়া এই সত্যই উপলব্ধি

করে : 'বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক।' তখন তাহার হৃদয়ে মহাবিশ্বের মহাসম্মেলনের হাট বসিয়া যায়, আপন আনন্দে তখন সে গাহিয়া ওঠে :

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।'...

ভূমার মধ্যেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সমষ্টির সঙ্গে যুক্তিতেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে সমস্ত বিশ্বলোকে উপলব্ধি করিব, এই আকাঙ্ক্ষাই আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়, সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন, আর আত্মার ধর্ম মুক্তি।' মুক্তির পথে এই আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হয়। এই প্রেমের মধ্যেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি : 'সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে; সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে; সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।' এই আনন্দের রসসাগরে একবার যে যোগ দিতে পারিয়াছে, সে মুক্তিস্নান করিয়া উঠিয়াছে। এই পথই মানুষের মুক্তির পথ। উপনিষদ এই পথের সন্ধানই মানুষকে দিয়াছে।

আধুনিক বিশ্বে উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শান্তিনিকেতন', ১ম ও ২য় খণ্ড, 'ধর্ম্ম', 'সঞ্চয়' ও 'মানুষের ধর্ম্ম'—এই পাঁচখানি গ্রন্থে নানাভাবে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার মূল সূত্রে সেই উপনিষদকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোথাও তাহা প্রার্থনার মন্ত্ররূপে, কোথাও প্রকৃতির ষড়ঋতুর মাধুর্য্যে, কোথাও বা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে অভিব্যক্তি পাইয়াছে। পরম পুরুষ ব্রহ্মকে কখনও তিনি 'জীবনদেবতা' বলিয়া আরতি করিয়াছেন, কখনও বা 'মনের মানুষ' বলিয়া সেই মনের মানুষকে লইয়া খেলাঘর রচনা করিয়াছেন। উপনিষদের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র যোগ আছে, তাঁহারাই এই গ্রন্থগুলির মধ্যে আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবেন। আনন্দস্বরূপ হইতেছেন 'সেই দেবতা স একঃ, যিনি এক', একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম-উপলব্ধিই এই পাঁচখানি গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। ধর্ম্মব্যাখ্যা বলিয়া ধর্ম্মানুশীলনের স্বতন্ত্র পাঠ হিসাবেই ইহা মাত্র বিবেচ্য নয়, কবির লেখনীস্পর্শে ইহা সাহিত্যেরও উচ্চ শীর্ষে স্থানলাভ করিয়াছে। আজিকার বিভ্রান্ত যুগের মানুষ ধর্মসাধনা হইতে বিযুক্ত হইয়া বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদকে ভুলিয়া গিয়াছে। আত্মস্থ হইয়া আত্মানুশীলনের আজ অভাব। উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : 'অন্তরাত্মাকে জানো (আত্মানং বিদ্ধি), তা হলেই অমৃতকে জানবে, তা হলেই পরমকে জানবে।' সেই জানাকে সার্থক করিয়া তুলিতেই এই পাঁচখানি গ্রন্থের অবতারণা। যাঁহারা মূল উপনিষদ না পড়িয়াছেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থগুলির দ্বারা উপনিষদের মূল রসই উপলব্ধি করিবার অবকাশ পাইবেন। উপরে তাহারই মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

দশ

রাতের বেলা ঘুম হো'ক আর নাই হো'ক রোজই ঠাকমা ভরতপাখীর মত ভোর বেলাই উঠে পড়তেন। তাঁর কাছেই ঘুমুতাম বলে আমারও সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যেত। ফুলশয্যার পরের দিন কিন্তু ছ'টার আগে ঘুম ভাঙল না আমার। নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে, বাড়ীর লোকজনদের হাঙ্গামা মিটিয়ে, ঘুমুতে আসতে ঠাকমার হয়ত রাত বারোটা একটা হয়েছিল। তা' হলে কি হয়, ঘুম ভেঙেছিল হয়ত নিত্যকার সময়ই। আমার ঘুম ভাঙতেই দেখলাম ঠাকমা বিছানায় নেই। ছোট ঠাকমা জানালার কাছটিতে একটা সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্বি আরামে ঘুমুচ্ছিলেন তখনও। হাড়-ভাঙা খাটুনির পর ঝি-চাকররাও হয়ত তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। নীচে-উপরে কারুরই সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি ছোট ঠাকমা জেগেছেন; কিন্তু তখনও বিছানা ছাড়েননি। আমি ঘরে ঢুকতেই জিগ্‌গেস করলেন—দিদি কোথায়রে খোকন?

নীচে পূজার আয়োজন করছেন। শুনছ না ঐ চন্দন ঘষার শব্দ? আমি বললাম।

—বাপরে বাপ। এখনও স্যিয্যি ওঠেনি, এরি মধ্যে তোরা উঠে পড়েছিস! নাঃ, তোদের রাত-দিন জ্ঞান নেই—বলে ছোট ঠাকমা গায়ের চাদরটা বিছানার ওপর রেখে উঠে বসলেন।

আমি হেসে বললাম—স্যিয্যি ওঠেনি কি ছোট ঠাকমা! ঐ ছাখো রায় বাবুদের তিনে কোটার দেয়ালটা কেমন ঝিক্‌মিক করছে রোদে।

ও রোদ নয়—অরুণের আলো—ছোট ঠাকমা বল্লেন।

অরুণের আলোয় আর রোদে যে কি তফাৎ সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি। আমি বললাম—ঠাকমা হয়ত অরুণের আলো ফুটবার আগেই উঠে পড়েছেন। অন্য দিন আমরা এক সঙ্গেই উঠি। আজই আমার দেরী হ'য়েছে।

দিদির কথা ছেড়ে দে—ছোট ঠাকমা বললেন। বউ বেলা থেকে দেখে আসছি ত। ভোরের পাখীর ডাক শুনলে আর বিছানায় থাকতে পারেন না। আমার কিন্তু বাপু রোদ না উঠলে ঘুম ভাঙে না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—তুমি ত বলছ এখনও রোদ ওঠেনি। তবে যে তোমার ঘুম ভাঙলো?

সে তোদের বাড়ীর গুণে—বলেই ছোট ঠাকমা নীচে নেমে গেলেন। টেবিলের ওপরকার 'টাইমপিস' ঘড়িটায় টং টং করে সাতটা বাজলো।

আমি বই-টই গুছিয়ে পড়তে বসবো, তখন বাবা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। চোখো-চোখি হ'তেই দেখলাম মুখখানি খুবই ভার ভার। আমাকে জিগ্‌গেস করলেন—তোর ঠাকমারা উঠেছেন, খোকন?

হ্যাঁ বাবা, তাঁরা নীচে গেছেন।

আমি পড়তে বসলাম। বাবা হাত মুখ ধুয়ে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। একটু বাদেই শিবুর মা বাসন মেজে ঠাকমার কথা মত নতুন-মার ঘরে কাজ করতে এল। নতুন মা'র তখনও ঘুম ভাঙেনি দেখে সে নীচে নেমে যাচ্ছিল।

বাবা জিগ্‌গেস করলেন—চা হয়েছে, শিবুর মা?

—না বাবা জল ফুটছে—এখুনি হয়ে যাবে যেন।

চা হলেই আগে তোমার মাকে এক কাপ দিয়ে যেয়ো—বাবা বললেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই শিবুর মা চা-জলখাবার নতুন মার ঘরে রেখে এলো। সকলেই জানত দিনের প্রথম বারের চা খাওয়াটা নতুন মা বিছানা ছাড়বার আগেই খাবেন।

একটু পরেই বাবা ও আমার চা-জলখাবার নিয়ে ঠাকমা উপরে আসলেন। বাবা চা খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলেন—কাকীমা কখন যাচ্ছেন মা?

ঠাকমা বললেন—এ-বেলাই ত যেতে চাইছিল। আমি খেয়ে-দেয়ে ও-বেলায় যেতে বলেছি।

বাবা বিরক্তির সহিত বললেন—কি দরকার ছিল থাকবার কথা বলবার? যেতে চাচ্ছিলেন যেতে দিলেই পারতে। অমন ঝগড়াটে লোককে বাড়ীতে ঠাঁই দেয়া ঝকমারি কাজ।

বাবার কথা শুনে ঠাকমা ত অবাক! তিনি আর একটি কথাও না বলে নীচে নেমে গেলেন।

নতুন মা চা খেয়ে বেরুলেন যখন, দেয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজল। শিবুর মা নিকটেই হাজির ছিল; নতুন মাকে বেরুতে দেখে তাঁর শাড়ী, সায়া, সেমিজ গামছা চানের ঘরে রেখে এল। নতুন মা একটি ছোট হাত-বাক্স হাতে করে স্নানাগারে গিয়ে ঢুকলেন। পরে জেনেছিলাম ঐটিতে দাঁত-মাজন, দাঁতের বুরুশ, চিরুণী আয়না, মাখবার সাবান, পাউডার ইত্যাদি থাকত।

নতুন মা হাত মুখ ধুয়ে চান-টান করে সেরে যখন বেরুলেন তখন দেয়াল ঘড়িটায় ন'টা। এই সময়ের মধ্যে শিবুর মা নতুন মার শোয়ার-ঘর ঝাড়-মোছ করে নীচে নেমে গেছে। তার ভাজ কাজে এলেও শিবুর মা'র মনে সোয়াস্তি ছিল না। বাড়ীর পুরনো লোক সে; সে মনে করত অন্ত লোক যতই যত্ন করে করুক তার মত গুছিয়ে করতে আর কেউ পারবে না। তাই যখন নতুন মা'র কাজ করে একটু ফাঁক পেত, ছুটে এসে সংসারের কাজে ভিড়ে পড়ত। ঠাকমার নিষেধ কানেও তুলত না।

বেলা পাঁচটা নাগাদ বাবা ও আমি চা খাচ্ছি। নতুন মা'র চা-জলখাবার এ-বেলাও তাঁর ঘরে দিয়ে এসেছে শিবুর মা। আমাদের খাবার ঠাকমাই নিয়ে এলেন। তাঁর পিছু-পিছু ছোট ঠাকমাও এলেন বাড়ী যাওয়ার আগে দেখা করতে। তাঁর মোটর অনেক আগে থেকে এসেই দাঁড়িয়েছিল।

ঠাকমা ও ছোট ঠাকমা দু'জনই আমাদের খাওয়া দেখছিলেন বসে। সে সময় ঠাকমা বাবাকে বললেন—ফুলশয্যায় বেয়ানরা না আসায় মনটা বড়ই খারাপ লাগছে মধু! সতু এসেও না খেয়ে, না বলে-কয়ে চলে গেল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—বোঝা-বুঝির আর কি আছে। সতু যে এসেছিল সে-ইত আমাদের ভাগ্যি। সেও না এলেই ভাল করত।

ছোট ঠাকমা—এ আবার কি রকম কথারে মধু? এত করে বলে করে এলাম, না আসাটা উচিত হল বেয়ানদের?

ছোট ঠাকমার দিকে চেয়ে বাবা বললেন—কি রকম আবার কি? নিজেই ভেবে ছাখো না কী অভদ্রতা করে এসেছ।

ছোট ঠাকমা ফোঁস করে উঠলেন—ও বাবা! এরি মধ্যে একখানাকে সাতখানা করে লাগানো হয়েছে কানে।

তাতে এমন কি দোষের হয়েছে? মিথ্যে ত আর বলেনি?—বাবা বললেন। বাবার জবাবের মধ্যে কিছুটা গরমের লক্ষণ দেখা গেল।

—নিশ্চই মিথ্যে। সত্যি হলে তোর শালা সতুই বড়-গলায় বলে যেতো; শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ টেনে তোকে আর ওকালতি করতে হত না।

ঠাকমা ছোট ঠাকমাকে বললেন—অমু, তোর মোটর সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকমা একটা আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা করে, ছোট ঠাকমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাতে চাচ্ছিলেন। ছোট ঠাকমা তা বুঝতে পেরেও কথাটা কানে তুললেন না।

ছোট ঠাকমা বাবাকে বললেন—শুনেছিসই যদি তবে সবটাই শোন। এক পক্ষের কথা শুনে দোষ-গুণ বিচার করিসনে। কাল কুটুমদের দর্শন করতে গিয়ে প্রথমেই ত সদরে দাঁড়িয়ে পা ঠাণ্ডা করতে হল বেশ কিছুক্ষণ। সদর দুয়ার বন্ধ ছিল, বার বার হর্ণ দিয়ে মোটর ছাত্র মানল। কেউ দরজা খুলতে এলো না। পরে ড্রাইভার-এর ডাকাডাকি আর কেমীর কড়া নাড়ার শব্দে হয়ত অতিষ্ঠ হয়েই দরজা খুলে দিল। সিঁড়িতে তোর বড় শালীর সঙ্গে দেখা। সে নবাবের বেটী নবাব্ প্রণামটাও

করলে না। তুরুক সওয়ারের কায়দায় একটা নমস্কার ছুঁড়ে দিয়েই ভদ্রতার দায় থেকে খালাস। দোতলায় পা দিতেই বেয়ানের সঙ্গে দেখা; নমস্কার করলাম। ইনি আবার মেয়ের চেয়েও এক কাঠি সরেস। আমার নমস্কারটা মাঠেই মারা গেল। একবার মাথাটাও নোয়ালেন না।

ঠাকমা বা-হাত খানা গালে ঠেকিয়ে বললেন—ও মা, এ আবার কি রকম ভদ্রতা।

ভদ্র তারা মোটেই নয় দিদি—ছোট ঠাকমা বললেন।

বাবা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—না। তারা ভদ্র হবেন কেন, যত ভদ্র আমরা।

ছোট ঠাকমা—ও বটে। আমার কথা না হয় নাই ধরলাম; কিন্তু খোকনকেই কোন একটু আদর যত্ন করলে। বসতে-খেতে না হয় নাই বলেছে, একবার কোন জিগ্‌গেস করলে কে সে?

বাবা সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলেন—পরিচয়টা ত তোমারই দেওয়া উচিত ছিল।

ছোট ঠাকমাও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—আমার কি উচিত ছিল না-ছিল সে আর তোকে শিখুতে হবে না। তুই চুপিচুপি চোরের মত গিয়ে বিয়ে করে এলি—না দিলি বাজনা, না নিলি বরযাত্রী সে জন্ত কিনা মায়ে-ঝিয়ে মিলে ঝাল ঝাড়ল আমার ওপর।

—নেইনি যে সে কথা কোন্ আর মিথ্যে। রাগ ত তাঁদের হবারই কথা।

তুই চুপ কর মধু—ঠাকমা বললেন।

ছোট ঠাকমা বললেন—তোর শাশুড়ী নাক-মুখ টানা দিয়ে শোনালেন তার বড় জামাই এসেছিল চৌঘুড়ি চড়ে, গোরার বাদ্যি বাজিয়ে, তুরুক সওয়ার নিয়ে। তুই একা একা হেংলার মত বিয়ে করতে গিয়ে তাদের নাক কাটিয়েছিস, লজ্জা দিয়েছিস।

বাবা বললেন—তা তাঁরা একশ' বার এ-কথা বলতে পারে।

ছোট ঠাকমা বাবার কথায় কান দিলেন না। আপন মনেই বলে চললেন—তাঁদের বে-আক্কেলে কথা শুনে আমারও বড্ড রাগ হলো। আমিও বললাম—বেশ ত, মধুই না হয় চুপিচুপি এসেছিল, তোমরা ত দু'দশ জনকে বলতে পারতে। তোমাদের কন্যা পক্ষের ক'জন এসেছিল শুনি? আমরা যে বরের মা-খুড়ী আমাদেরই কোন জানিয়েছিলে বিয়ের খবর?

ছোট ঠাকমা থামছিলেন না দেখে বাবা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন—মিছিমিছি ওঁদের দোষ দিয়ো না খুড়ী। আমিই বারণ করেছিলাম তোমাদের জানাতে।

ছোট ঠাকমা ঠেস দিয়ে বাবাকে শুনালেন—আহা কী আমার মায়ের সুপুত্তুর রে! শ্বশুর বাড়ীর লোক দিয়ে মা খুরীর মান খোয়ালি।

ক্রমেই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠছিল দেখে ঠাকমা বললেন—অমু, তুই থাম বাপু। ও-সব নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করিসনে। চ', তোকে মোটরে তুলে দিয়ে আসি।

ছোট ঠাকমা—যাচ্ছি দিদি, এক্ষুনি যাচ্ছি—আমি থাকতে আসিনি। মধু কেমীর ননদের মেয়েকে বিয়ে করেছে জানলে আমি আসতামই না। ওরা যে কি দরের লোক তা সহর, সহরতলীর সকলেই জানে। যে ঘরেই ওদের মেয়ে গেছে সে ঘরেই আগুন জ্বলিয়েছে। শ্বশুর বেঁচে থাকতেই সুকুমারী শ্বশুর ঘরে লাথি মেরে বাপের ঘর করেছে। আমাদের বউর গুণ-গরিমা ত নিজের চোখেই দেখলাম। বাড়ীতে পা দিয়েই কী লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। সতু খেয়েই যেতো; বউ-মাই জোর-জুলুম করে না খাইয়ে পাঠিয়ে দিলে।

বাবা রেগে বললেন—হ্যাঁ, তোমার কানে কানে বলে গেছে।

—না, কানে কানে বলেনি। নিজের কানেই শুনেছি। ডাকবো সতুকে সাক্ষী?

বাবার সর্ব্বশরীর রাগে থর থর করে কাঁপছিল। তিনি সঙ্কোচ শূন্য হয়ে উত্তেজনার মুখে বলে বসলেন—হাঁ হাঁ ঢের হয়েছে; আর জ্বালিয়ো না। এখন বাড়ী গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। তুমি নিজে যেমন অন্তকেও তাই মনে করো। কে না জানে তোমার পরামর্শেই কাকাবাবু বাবার সঙ্গে পৃথকান্ন হয়েছিলেন।

মহা বিস্ময়ে ঠাকমা বললেন—ছিঃ ছিঃ, খুড়ীমাকে ও-সব কি বলছিস মধু?

—কেন বলব না? মিছে কথা ত আর বলছিনে?

—মিছে নয়ত কি? যা জানিসনে তা নিয়ে কথা কোস নে।

ছোট ঠাকমা বললেন—তাঁরা ভিন্ন হয়েছিলেন কারবারে বনিবনাও না হওয়ায়। আমার পরামর্শে নয়। আমাদের দুই জায়ে বরাবরই ভাব-ভালবাসা ছিল, এখনও আছে।

বাবা ছোট ঠাকমার কথায় কান না দিয়ে বললেন—হয়েছে, হয়েছে, আর গলাবাজি করতে হবে না। তোমার কত দরদ আমাদের ওপর, তা আমার খুব জানা আছে। পাছে আমি কোন দিন কাকাবাবুর সম্পত্তি দাবী করি, সে ভয়ে আগে থেকেই আমাকে ঠকাবার মতলবে বাড়ী-ঘর, কোম্পানীর কাগজ তোমার দাদাকে লিখে পড়ে দিয়েছ।

ঠাকমা বিরক্ত হয়ে বললেন—চুপ কর মধু, চুপ কর, আজ এ কি শুনছি তোর মুখে? ঠাকুর-পো অমুকে, তার বিষয় সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন। অমুর যাকে ইচ্ছে হয় দিয়েছে বা দেবে তাতে তোর রাগ করবার কি আছে?

বাবা বললেন—আমার দায় পড়েছে রাগ করবার জন্যে। অমু বলতেই তুমি অজ্ঞান হও, তাই উনি কি দরের লোক চিনিয়ে দিলাম তোমায়। এখন থেকে একটু সাবধান হয়ো।

ছোট ঠাকমা ছিলেন অসম্ভব রকম অভিমানী। বাবার শক্ত শক্ত কথাগুলি তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধল। তাঁর চোখে অপমানের ঘায়ে জল ও আগুণ দুইই এসে হাজির হল। তিনি অভিমানরুষ্ট কণ্ঠে বললেন—চিনিয়ে দিয়ে ভালই করলি মধু। তবে আমি জানি, দিদি কোনদিনই আমাকে ভুল বোঝেন নি। আজ যা তোর নতুন রূপ দেখলাম তাতে আমিও তোকে চিনে নিলাম। তোকে যদি কিছু না দিয়ে থাকি বা না দি, অন্যায় করা হবে না। নিজের মা'র সঙ্গে তোর যা ব্যবহার দেখে গেলাম তাতে খুশি হয়ে কি আর বেশী আশা করতে পারি।

ঠাকমা বললেন—ছেলের কথায় কি দোষ ধরতে আছে ভাই অমু? কথায় বলে, রাগ চণ্ডাল। রাগ হলে কি ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে লোকের?

ছোট ঠাকমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন—এ রাগের কথা নয় দিদি। মধু যদি রাগ করে কি ভুল করে আমায় কিছু বলত, তা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম! ও আমাকে অপমান করছে শুধু ওর বউকে খুশি করবার জন্যে, শ্বশুর বাড়ীর লোকদের মান বাঁচাবার জন্যে। এই অকারণ অপমান আমি সইব না, ভুলব না। আজ যাই দিদি, যা নমুনা দেখে গেলাম, তুমি যে ক'দিন বাড়ীতে তিষ্ঠুতে পারবে তা জানিনে দিদি।

ঠাকমাকে প্রণাম করে, আমায় আদর জানিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ছোট ঠাকমা গিয়ে মোটরে উঠলেন।

ঠাকমা সজল চোখে বললেন—কিছু মনে করিস নে ভাই অমু। মধু আমার পেটের ছেলে, সে যে এ-সব কথা মুখেও আনতে পারে তা কোন দিনই জানতাম না। তুই আর আসিসনে এ বাড়ী, সময় পেলে আমিই গিয়ে দেখা করবো।

একটা মর্মভেদী বেদনার মধ্যে মোটর ছেড়ে দিল

[ক্রমশঃ

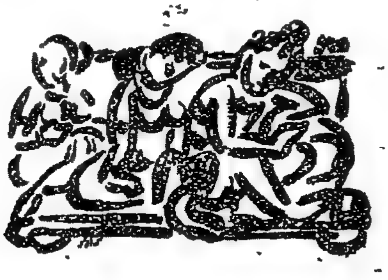

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

চরিত্র পরিচয়

আকবর শাহ	ভারত সম্রাট
মহারাজা মানসিংহ	জয়পুরাধিপতি
তোডর মল্ল বীর বল	মন্ত্রী
রাম সিংহ	রাজপুত সামন্ত রাজা
রাজা রুদ্রনারায়ণ	ভুরস্থট রাজ
হরিদেব ভট্টাচার্য্য	ঐ গুরুদেব
দীননাথ চৌধুরী	সর্দ্দার ও রুদ্রনারায়ণের শ্বশুর
দুর্ল্লভ দত্ত	ঐ মন্ত্রী
চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তী	ঐ সেনাপতি
চরণ দাস	রাজভৃত্য
সূর্য্য দেব	ছাতনাপুর দুর্গাধিপতি
কানু চাঁড়াল	বুনো সর্দ্দার
চন্দন	কাটশাকড়া মন্দিরের পূজারী
ওসমান খাঁ	পাঠান সর্দ্দার
হুসেন	ঐ অনুচর
অনন্ত	ওসমান খাঁর চর
রামজীবন	দীননাথের প্রতিবেশী
বসন্ত	চতুর্ভুজের অনুচর
কুনাল	পাহাড়ী ছেলে
বিশ্বনাথ বিশ্বাস	ধনী তালুকদার
জগাই মধাই গজপতি	কানু সর্দ্দারের বুনো যোদ্ধা

পাঠান সৈন্য, বুনো যোদ্ধাগণ, হিন্দু সৈন্য, ভুরস্থটের নাগরিকগণ, পাগলা বাউল, দূত, চর, আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রিগণ, পাহাড়ীয়াগণ, ভট্ট কবি।

ভবশঙ্করী	রাণী
সুমিত্রা	ঐ সহচরী ও সেনাপতির ভগ্নী
জবা	রামজীবনের পৌত্রী এবং রাণীর প্রধানা দেহরক্ষিণী

পরিচারিকা, নারী সৈন্যগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দামোদর নদের তীরবর্ত্তী আচার্য্য হরিদেব ভট্টাচার্য্যের বিদ্যাশ্রম, দূরে দূরে এক একখানি পর্ণকুটীর—হরিতকী, বেল, আমলকী ইত্যাদি বৃক্ষাদি স্থানটীকে আলোছায়ায় ভরিয়া রাখিয়াছে। দামোদর নদে নামিবার একটি ঘাট, তাহারই অনতিদূরে ছাত্রছাত্রীগণের পাঠাভ্যাসের জন্য বসিবার ব্যবস্থা, তাহার সম্মুখে আচার্য্যের বসিবার আসন—দামোদর নদের পরপারে উষার আলোয় পূবের আকাশ উদ্ভাসিত হইয়াছে। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা বেদের স্তোত্র পাঠ শেষ করিলে আচার্য্য হরিদেবের তন্ময়তা ভঙ্গ হইল]

হরিদেব। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি॥ (স্বস্তি বচন উচ্চারণ করিলেন) (অপর দিকে দূরে ঘন জঙ্গল মধ্যে দেখা গেল ভবশঙ্করী একটি বন্য শূকরকে অনায়াসে অস্ত্রাঘাতে বধ করিলেন। পশুরক্তে তাহার পরিধেয় সিক্ত হইল। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা কোলাহল করিয়া উঠিল।)

ছাত্র। আচার্য্য! চেয়ে দেখুন, দেবী শঙ্করী ঐ বন্য শূকরটাকে কেমন অনায়াসে মেরে ফেল্লে!

(আচার্য্য স্থির দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন)

ছাত্রী। পশুরক্তে ওর পরিচ্ছদ একেবারে রঞ্জিত হোল। ঐ যে শঙ্করী আসছে। (ধীরে ধীরে কোটিদেশে তীক্ষ্ণ ছোরাখানি রাখিতে রাখিতে ভবশঙ্করীর প্রবেশ—চারিদিকে চাহিয়া আচার্য্যকে প্রণাম—শঙ্করী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সৌন্দর্য্যময়ী বীর্য্যবতী ব্রাহ্মণ কুমারী)

হরিদেব। শঙ্করী! মা! আবার! আবার তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা! প্রভাতের পবিত্র দেহ জীবরক্তে রাঙিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণ কুমারী তুমি—তোমার এই নির্ম্মম বৃত্তি।

শঙ্করী। আচার্য্য! আমি নির্দ্দোষ। আক্রান্ত হয়েই আমি আত্মরক্ষা ক'রেছি।

হরিদেব। মা। তুমি নারী—তোমার কাজ তো হত্যা নয়—পালন। মা। জীবরক্ষায় আত্মত্যাগই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ নিষ্ঠুর হত্যা তো মা তোমার নয়। শক্তির আকর্ষণে চিত্তবৃত্তির অপব্যয় ক'রো না। মা। মানুষকে রক্ষা ক'রে জীব পালন ক'রে মায়ের কর্তব্য ক'রো। হত্যার লিপ্সা, তোমরা মা, মনের মধ্যে পোষণ ক'রো না। সোনার বাংলাকে ভারতের বুকে উজ্জ্বল ক'রে তোল—তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ দয়ায়। এ নিষ্ঠুর বৃত্তি মা—তোমার নয়।

(এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ—পরিধানে কৌপীন—দেহ কৃশ—মস্তকে জটা—মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—জ্যোতির্ময়—হাতে শঙ্খ ও ত্রিশূল)।

সন্ন্যাসী। না—মা—হরিদেব। তা নয়। শান্তির যারা শত্রু তাদের মারতে হবে। তার আক্রমণ থেকে সৃষ্টি রক্ষায় পাপ কই?

(হরিদেব ত্রস্তে উঠিয়া নীচে আসিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে প্রণিপাত—ছাত্র-ছাত্রী সকলে প্রণাম করিল—শঙ্করী নিশ্চল)

হরিদেব। একি। দেব। কত বর্ষপরে বাংলার মাটী পবিত্র ক'রে—আমার গৃহে আজ কোন সৌভাগ্য আপনাকে এনে দিলে। আমার বাক্যের চিন্তার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করুন। (পদতলে বসিল)

সন্ন্যাসী। (হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া) হরিদেব। ওঠ। (আলিঙ্গন দিল) মা। শঙ্করী। বীর্য্যশালিনী বাংলার মেয়ে। এস মা আশীর্ব্বাদ করি। হরিদেব। এ মেয়ে যে অসাধারণ লক্ষণ সম্পন্না। বাংলার সৌভাগ্য আনবে এই আমার মা। এস, এস মা আমার।

(ভবশঙ্করী সম্বিত ফিরিয়া পাইল—বীর্য্যবতী কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল—সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া) মা। দুর্ব্বলের রক্ষায়, দুষ্টের শাস্তি দিতে তোমার হাতের অস্ত্র সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকুক। এই নে মা। পবিত্র শঙ্খ তোকেই দিলাম। বুঝি তোরই জন্য মা এতকাল নিয়ে বেড়াচ্ছি। বাজিয়ে দে মা পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাজিয়ে দে। পীড়নকারী শান্তিনাশীদের শাস্তি দিয়ে রক্ষা কর মা, সৃষ্টি রক্ষা কর। হরিদেব। ভারতের শাশ্বতকালের সাধনা ধ্বংস হবে না। তাকে রক্ষা কর। বাংলার সন্তানদের শাস্ত্র-শাস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত করে তাদের বলীয়ান করে তোল।

হরিদেব। দেব। আমি বুঝিনি। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

সন্ন্যাসী। শঙ্করী। মা। আমি আবার আসবো। (সকলকে) তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—বাংলার মুখ উজ্জ্বল করো।

(হরিদেব ও সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হরিদেব। আদেশ করুন দেব।

সন্ন্যাসী। তোমায় আর কি বলবো—এই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রেখো। এর গতি ভঙ্গিমায় অসাধারণ শক্তির বিকাশ পায়। এর সঙ্কল্প দৃঢ়। হরিদেব। সমস্ত ভারতে পাঠানের অত্যাচার ছেয়ে গেছে। তাদের লক্ষ্য সমস্ত সাম্যের উচ্ছেদ। আর্য্যের যে মহান সাধনা সমস্ত পৃথিবীর লক্ষ্য বস্তু, তার ধ্বংস হতে পারে না। দুষ্ট লুণ্ঠনকারীর দল এতবড় সভ্যতাকে চূর্ণ করে দিতে যেন বদ্ধপরিকর।

হরিদেব। আপনি মহাজ্ঞানী। এর উপায় বলে দিন।

সন্ন্যাসী। রাজশক্তির সহায়তা কর। সম্রাট আকবর দূরদর্শী—ভারতের জাতি গঠনে তার ঐকান্তিক চেষ্টা। বাধা অনেক। তার সহায়তা কর। সবদিক রক্ষা পাবে। আমি যাই হরিদেব, আবার আসবো।

(হরিদেবের প্রণাম) তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (প্রস্থান)

(হরিদেব সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার মুখমণ্ডল প্রভাত সূর্য্যরশ্মি সম্পাতে উদ্ভাসিত)

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণদাস। (প্রণামান্তে) ঠাকুর। রাজা প্রণাম জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে একবার গুপ্তমন্ত্রণাগারে যেতে বলেছেন।

হরিদেব। কেন চরণ? এমন সময়ে গুপ্ত মন্ত্রণা। (চিন্তিত)

চরণ। পাঠান লুণ্ঠনকারীর অত্যাচার—ঠাকুর। এর উপায় হবে না। নিরীহ লোকগুলো কি রাজ্য ছেড়ে পালাবে?

হরিদেব। আচ্ছা চরণ, চল যাচ্ছি—নারায়ণের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। চল চরণ—। (উভয়ের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

চিঠি

শ্রীচাঁদ মোহন চক্রবর্তী

গ্রীষ্মকাল। দশটা'র ভিতরে বাড়ীর কর্তা প্রেমানন্দ বাবু অফিসে বেরিয়েছেন—ছেলে মেয়েরা গেছে স্কুল কলেজে। বাড়ী নিস্তব্ধ। বেলা বারোটা বাজল। বাড়ীতে দু'টি প্রাণী—বাড়ীর কর্ত্রী বিনতা দেবী আর চাকর রঘুয়া। উপরে অত্যধিক গরম লাগায় বিনতা দেবী নেমে এলেন নীচে বৈঠকখানায়—পাখা খুলে দিয়ে বেশ আরাম অনুভব করলেন। হৃষ্টমনে আরাম কেদারায় দেহলতা এলিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলেন "বঙ্গশ্রী"। বিনতা তন্ময়চিত্তে পড়ছিল একটি গল্প—একটি দীন দরিদ্রের কন্যা পিতৃবন্ধুর সৌজন্যে বধূবেশে আশ্রয় পেল এক ধনীর গৃহে, শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনেই তাকে স্নেহ করতে লাগল অত্যধিক, দরিদ্র কন্যার মনে সুখ হল অপার, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তার সেই সুখ তাসের-ঘরের ন্যায় অচিরে গেল ভেঙ্গে। গরীব কন্যার স্বামী দেবতা একজন নর পিশাচ—মায়ের প্ররোচনায় অপেয়া স্ত্রীকে বিতাড়িত করল অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার বস্ত্রখণ্ড সহ। তারপর! সেই দরিদ্র কন্যা—ধনীর পুত্র বধূর মৃত দেহ দেখা গেল একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর। সেই মৃতা তরুণীর বুকের উপর জীবন্ত শিশুপুত্র মায়ের দুগ্ধহীন স্তন পান করতে চেষ্টা করছিল। এই বিয়োগান্ত গল্প পড়ে বিনতা দেবীর মাতৃ হৃদয় হাহাকার করে উঠল। উদ্ভ্রান্তভাবে ভাবছিলেন এই গল্পের ইতিকথা। দোল খাচ্ছিল তার হৃদয়ে স্বামী কি এমনি নিষ্ঠুর হতে পারে স্ত্রীর প্রতি!

সেইক্ষণে ঘরের মেঝেতে একখানি চিঠির পতন শব্দে বিহ্বল ভাব কেটে গেল বিনতা দেবীর—তিনি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিয়ে পড়লেন। নিমেষে তার মুখচ্ছবি রূপান্তরিত হল ভিন্ন মূর্ত্তিতে—স্নেহশীলা মাতৃমূর্ত্তিতে ফুটে উঠল ঘৃণা—বিতৃষ্ণার লক্ষণ। মুখে শোনা গেল অস্ফুট গুঞ্জন—"পুরুষগুলি কপট—নির্মম!" ঘৃণাভরে চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে বিবর্ণ মুখে বিনতা দেবী ধীর মন্থর গতিতে চলে গেলেন শয়ন ঘরে। বিছানায় শুয়ে শান্তিবোধ হল না—সর্ব্বাঙ্গে যেন হচ্ছিল বৃশ্চিক দংশন। ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজ থেকে ফিরল বাড়ীতে। অন্য দিন বিনতা দেবী ছেলেমেয়েদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন বাড়ীর বারান্দায়—তাদের কলরব, আবদার বায়নাক্কা বরণ করেন হাসিমুখে। আজ তাদের কলরব, কোলাহল তার অন্তরে আনল বিরক্তি—নিরানন্দ ছেলেমেয়েরা মায়ের দেখা না পেয়ে বিস্মিত হল—তাদের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে মা'কে বিছানায় শায়িত দেখে—সকলে নিঃশব্দে মায়ের ঘরে ঢুকে শংকিত কণ্ঠে ডাকল, মা মণি তোমার কি অসুখ করেছে? বিনতা দেবী পুত্রকন্যাদের স্নেহের দাবী উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাদের বিষাদপূর্ণ মুখচ্ছবি। তিনি ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন—রঘুয়াকে ডেকে তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। মায়ের সদা হাস্যময় মুখ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে পুত্র কন্যারা গেল ভড়কে, ভয়ে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। বাড়ী আজ নিঃস্তব্ধ—নিরানন্দ। সায়াহ্নে বৃন্দাবন চাপরাশী এসে জানাল—বাবুর ফিরতে একটু দেরী হবে, এক বন্ধুর বাড়ী গেছেন। বৃন্দাবন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রেমানন্দ বাবুর বাড়ীর পাচক ও মধ্যাহ্নে তার অফিসের চাপরাশী। প্রেমানন্দ বাবু হাওড়ায় সব-জজ। বিনতা দেবী বৃন্দাবনের বার্তায় কোন জবাব দিলেন না—অন্য দিন গন্তব্য-স্থানের বিশদ বিবরণ জেনে নেন বৃন্দাবনের কাছ থেকে। বৃন্দাবন লক্ষ্য করল বিনতা দেবীর চোখ-মুখের অস্বাভাবিক মূর্ত্তি—সে নিঃশব্দে চলে গেল নিজের কাজে।

রাত্রি সমাগমে। বিনতা দেবী একবার মাত্র বিছানা ছেড়ে নীচে বৈঠকখানা থেকে চিঠিখানি নিয়ে এলেন। কয়েকবারপড়লেন চিঠিখানি—উত্তেজনার ভাব

স্পষ্ট ভেসে উঠল তার চোখে মুখে।—চোখে দেখা দিল অশ্রু বিন্দু।

সেইক্ষণে গৃহে প্রবেশ করল বান্ধবী শেফালী দেবী। বিনতার মলিন মুখ ও চোখে অশ্রুর রেখা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলল—কি ব্যাপার বিণী? তোর বাড়ী দেখছি কেন নিস্তব্ধ—বিবাদপুরী?

বিনতা আত্মসংবরণ করে মুখে ফোটাতে চেষ্টা করল হাসির রেখা। শেফালী বুঝল বান্ধবীর হৃদয়ে কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা হয়েছে—দাম্পত্য জীবনের মান অভিমান, ঝড়ের পূর্বলক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে বান্ধবীর মুখে চোখে। শেফালীর অন্তর কেঁদে উঠল বান্ধবীর জন্ত—সে বিনতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সহানুভূতি সূচক কণ্ঠে বলল: বল ভাই বিনু, তোর দুঃখের কাহিনী, আমার কাছে কিছু লুকাসনি। বিনতা তার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সহচরী ও বান্ধবী শেফালীর আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করল শিরায় শিরায় —সে পারল না আত্মসংবরণ করতে। তার চোখে ছুটল অশ্রুবন্যা—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: শেফালী, আমার কপাল ভেঙেছে।—এই চিঠি পড়লে সব বুঝবি।

সাগ্রহে শেফালী চিঠিখানি নিল বিনতার হাত থেকে, রুদ্ধশ্বাসে পড়ল চিঠি। শেফালী সহাস্যে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল: এই চিঠি পড়ে তোর এতটা বিহ্বল হওয়া নিছক ছেলেমানুষী ভাই। বিনতা চোখের জল কাপড় দিয়ে মুছে বলল: দেখছিস না, অনেক দিনের আলাপ প্রণয়—। শেফালী ঝঙ্কার দিয়ে বলল: সেখানে প্রণয় বাঁধলে এতদিন ধরা পড়ত। প্রেমানন্দ বাবুকে দেখে বা তার সঙ্গে আলাপ করে আমি বলব তোর অনুমান নিছক কল্পনা। তবে চিঠিখানি একটু রহস্যময়। তুই এই ব্যাপার নিয়ে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করিস না প্রেমানন্দ বাবুর সঙ্গে। আমি চিঠিখানি নিয়ে যাচ্ছি —ওঁদেরপাঠাব আজ রাত্রে এই ঠিকানায় তোর সতীন মানদাকে ধরতে। আমি এখন আসি। ওদিকে আমার তিনি তোর মত সন্দেহ করতে পারেন আমার অনুপস্থিতি এই অসময়ে। আমাদের জীবনই কল্পনাময়। পুরুষরা ব্যঙ্গ করে বলে নারী রহস্যময়ী।—আর তাঁরা? কপট। রহস্যপ্রিয়া শেফালী প্রিয় বান্ধবীর হৃদয়ের ক্ষতস্থানে শীতল প্রলেপ দিয়ে প্রস্থান করল। বিনতার অসুস্থ মন শান্ত ভাব ধারণ করল। রাত ৮টায় সময় প্রেমানন্দ বাবু যখন বাড়ী ফিরলেন, বিনতা অভ্যর্থনা করল তাকে স্বাভাবিক ভাবে। আধ ঘণ্টা পূর্বে আসলে হয়তো একটা অশোভনীয় ঘটনা ঘটত।

শেফালী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বামী অনুপমকে জানাল বিনতার মনোদুঃখের বার্তা—পাঠাল স্বামীকে 'মানদা'র সন্ধানে। অনুপম সহাস্যে বিদ্রূপ কণ্ঠে বলল: এক নারী স্বামীকে যেখানে পাঠাতে নারাজ আর তুমি কি নারী হয়ে আমাকে পাঠাচ্ছ সেই কুস্থানে? তোমরা সত্যিই রহস্যময়ী।

অনুপম যখন চিঠির লিখিত ঠিকানা ৯১৯ নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হল, তখন ৮টা বেজে গেছে। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়লে বেড়িয়ে এলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অনুপমের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু বিরক্তিভরা কণ্ঠে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন: কি চাই আপনার?

স্ত্রীর কথার ধরণে অনুপম আশা করেছিল এক নারীর দর্শন, কিন্তু তার পরিবর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন মিলল এক ভদ্রবেশী পুরুষের। তার পর ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব কি দেবে তাই নিয়ে হয়ে পড়ল এক সমস্যা। চিঠিতে আছে এক নারীর নাম। অনুপমের জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল অনুপমের দিকে। তারপর কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল স্বরে বললেন: মশাই নির্বাক কেন? বলুন কি দরকার? নয় ত দরজা বন্ধ করে আমি চললুম।

অনুপম আমতা আমতা করে সঙ্কোচভাবে বলল: আমি একবার মানদা দেবীর সংগে দেখা করতে চাই।

কথাটি শুনে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখ চোখের হল অপূর্ব পরিবর্তন—কে যেন সেই সৌম্য মুখে কালী ছড়িয়ে দিল। তিনি কঠোর কণ্ঠে "আচ্ছা দাড়ান" বলে সজোরে দরজা বন্ধ করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলেন উপরে। অনুপম কিছুই অনুধাবন করতে না পেরে বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে। কিছুক্ষণ পরে অনুপম শুনল নর ও নারীর কণ্ঠের কথার কাটাকাটি

—দাম্পত্য কলহের জিগীর। এক সময়ে শুনল পুরুষের কণ্ঠস্বরে—"যাও নাগর এসেছে। আমি আজ বাইরে যাব মনে করে বোধ হয় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলে?"

বামা কণ্ঠে উত্তর শুনল: ছি! ছি! এত ছোট মন তোমার? শিক্ষিত হাকিম হয়ে এই সব জঘন্য উক্তি করছ আমাকে? এত সন্দেহবাই তোমার? চলো না সংগে, দেখি কে এসেছে?

দ্রুত পদক্ষেপ শোনা গেল সিঁড়ীতে—সংগে অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি। দরজা উন্মুক্ত করে এক সুন্দরী যুবতী উপস্থিত হল অনুপমের সামনে—মুখে চোখে অশ্রুরেখা—বিষাদের ছায়া। বিনা ভূমিকায় সংযত কণ্ঠে অনুপমকে প্রশ্ন করল: আমার নিকট আপনার কি দরকার? অনুপম নিঃশব্দে পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে যুবতীর হাতে দিল। মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় যুবতীর মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। ভদ্রলোক দরজার আড়াল থেকে আত্মদর্শন দিলেন যুবতীর পশ্চাতে—ঝুঁকে চিঠিখানি পড়ে তাঁর মুখেও ফুটে উঠল হাসির রেখা। তিনি এবারে যুবতীকে হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে অনুপমের কাছে এসে হাসিমুখে বললেন: আপনি এই চিঠি কোথায় পেলেন? যুবতী ভদ্রলোককে ভর্ৎসনা সূচক কণ্ঠে বলল: এঁকে অনেকক্ষণ অকারণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ—এখন ভিতরে নিয়ে গিয়ে কথা বল। ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে অনুপমকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

রবিবার। প্রেমানন্দ গভীর মনোনিবেশ সহকারে রায় লিখছিলেন—অনতিদূরে স্ত্রী বিনতা দেবী আমার উপর একটি ফুল তুলছিলেন ছুঁচ দিয়ে। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সূচীকর্ম্ম ত্যাগ করে অনিচ্ছার সহিত দরজা খুললেন। গৃহে প্রবেশ করল সস্ত্রীক বিমান বাড়ুয্যা। বিনতা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন দম্পতী-যুগলকে। বিমান বিদ্রূপকণ্ঠে প্রেমানন্দকে সম্বোধন করে বলল: আচ্ছা লোক দেখছি। আমাদের নিমন্ত্রণ করে দরজা বন্ধ করে বসে আছ ছুটিতে। প্রেমানন্দ অপ্রস্তুত ভাবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আনন্দিত কণ্ঠে বলল: কি খবর মানদা—একেবারে যুগলরূপ দর্শন পেলুম, কি সৌভাগ্য আমার?

বিমান আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলল: মানে?—তুমি আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করে পাঠালে—আর কিনা জিজ্ঞেস করছ, "খবর কি?—আচ্ছা ভদ্রলোক দেখছি! প্রেমানন্দের চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন—সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল বিনতার দিকে। বিনতার মুখেও ভেসে উঠছিল সেই ছবি। আগন্তুক দম্পতিযুগল লক্ষ্য করল বিনতা ও প্রেমানন্দের দৃষ্টি বিনিময় ও মুখচ্ছবি। প্রেমানন্দ সলজ্জ ভাবে বলল: আচ্ছা, মান্ দা—বিমান তাকে বাধা দিয়ে বিরক্তপূর্ণ কণ্ঠে বলল: মান্ দা—মান্ দা—দেখ প্রেমানন্দ, তুমি আর কখনও ডাকবে না আমাকে "মান্ দা" বলে। বাবা কি সর্বনেশে সম্বোধন! আমি এই নামের প্রলোভনে পড়ে এক চিঠি লিখে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছি—ঘরে ও বাইরে। প্রেমানন্দ বিস্মিত কণ্ঠে বলল: "মানে?"—সেইক্ষণে গৃহে প্রবেশ করল আর এক দম্পতীযুগল—অনুপম ও শেফালী। শেফালী চটুল হাসি হেসে বলল: মানে—আমি বলছি—এক রহস্যপূর্ণ চিঠি পড়ে আমার বান্ধবী বিনতা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন—আর চিঠির লেখকের বাড়ী থেকে তাঁর স্ত্রী গৃহ হতে বহিষ্কৃতা হয়েছিলেন আর কি?—চিঠি নয়ত—শাঁকের করাত।

বিমান কতুহলাবিষ্টভাবে শেফালীর সুন্দর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালে অনুপমের দিকে। অনুপম স্মিত মুখে বলল: ইনি আমার স্ত্রী—শেফালী দেবী। নমস্কার বিনিময় হল। শেফালী দুষ্টুমী ভরা হাসিমুখে বিমান বাবুর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে বলল: আপনিই বুঝি "মানদা" দেবী। মানদা দেবী এক ঝলক হাসি হেসে বলল: আপনার অনুমান সত্য। বড় ভাল লাগছে আপনাকে। বিনতা বলল: শেফালী আমার বাল্য বন্ধু—একবার আলাপ করলে বুঝবেন—হীরার টুকরা। এ-ই সেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে।

প্রেমানন্দ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল শেফালীর দিকে। শেফালী সহাস্যে বলল: আপনাকে 'মানে' বলব বলেছি—এই নিন—এই চিঠিখানি পড়ে 'মানে' বুঝতে চেষ্টা

করুন। শেফালীর হাত থেকে সাগ্রহে চিঠিখানি নিয়ে প্রেমানন্দ পড়ল রুদ্ধশ্বাসে—

১৯৯, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,
৩০শে মার্চ, ১৯৫১।

হে মোর প্রেমানন্দ,

তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম এতদিন—নিরাশ হয়ে আজ লিখছি এই চিঠি। একবার দর্শন দাও। এতদিনের প্রেম,—ভালবাসায় অবমাননা কোরো না। এই শনিবার, তোমার জন্যই শুধু দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। নিরাশ ক'রো না, লক্ষ্মীটি।

তোমারই—মা—ন—দা

পুঃ—দু'দিন হ'ল নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছি।

সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রেমানন্দের দিকে—তাদের মুখে চোখে দুষ্টামীর চাপা হাসি। প্রেমানন্দকে নির্বাক রেখে শেফালী বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল: হে বিচারপতি,—এবারে বিচার করুন যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নামীয় 'এমনি ধরনের চিঠি পড়েন' তবে তার মনের অবস্থা কি হ'তে পারে? মানদা কৃত্রিম ক্রোধের ভাব দেখিয়ে বলল: আসামীকে শাস্তি দিন—তিনি আমাকেও লাঞ্ছিত করেছেন গত রাত্রে—সাক্ষী আছেন অনুপমবাবু।

প্রেমানন্দ নির্মল হাসি হেসে বলল: আমার এই বন্ধুটি চিরকালই ভাব-প্রবণ ও রসিকস্বভাব সম্পন্ন—কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা উত্যক্ত হয়েছে এর দুষ্টামীতে, আবার সৎ কাজেও ছিল অগ্রণী—তাই আমরা সকলেই ডাকতাম "মান্ দা" বলে। উত্তর কালে হলেন কবি ও সুলেখক কিন্তু অস্থির চিত্ত। যৌবনে হারায়ে প্রথমা পত্নী লিখলেন দ্বিতীয় "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" খণ্ডকাব্যে, নানা দেশ ঘুরে একদা ফিরে এলেন সংগে ক'রে এই বিদুষী ভার্য্যা মন্দ্রা দেবী। তাঁহার সেই বালকসুলভ চপলতা এখনও আছে অটুট এই প্রৌঢ় বয়সে। বিচার যখন চেয়েছেন দোষীর দণ্ডাবধান আমি করব। মানদা দেবী বিমানের দিকে কটাক্ষ হানল।

বিমান অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল: আমি আমার হঠকারিতার জন্য বাস্তবিক দুঃখিত বিনতা দেবী। আজকে এখন উঠি—রাত্রি সমাগত। উদরে জঠরানল প্রজ্বলিত—চায়ের নিমন্ত্রণ দেখছি ভূয়ো—দেওয়াল পঞ্জীতে দেখছি ১লা এপ্রিল।

প্রেমানন্দের কাছে গিয়ে অনুপম কি চুপি চুপি বলল। প্রেমানন্দ মৃদুহাস্যে বিমানকে সম্বোধন ক'রে বলল: তুমি আসামী আমার আদেশ না নিয়ে কোথায় যাবে? দোষ স্বীকার ক'রেছ ব'লে দিচ্ছি লঘুদণ্ড। এই দণ্ডে চলো আমাদের সংগে অনুপমের বাড়ী—সেখান হ'তে যাবে নিজ গৃহে একাকী। মানদা দেবী আজ থাকবেন বন্দিনী এই গৃহে।

অনুপমের বাড়ীতে ভূরি ভোজন ক'রে বিমান এলিয়ে দিল তার দেহভার একখানি গদিআঁটা আরাম কেদারায়। প্রেমানন্দ আশ্চর্য্যভরা কণ্ঠে বলল: এ কি হে, মান্-দা, তোমার মতলব কি বলো ত? বিমান তার পা দু'খানি ছড়িয়ে দিয়ে সহজ কণ্ঠে বলল: দাদা 'বোট' যেমনি দাঁড় ছাড়া চলতে পারে না, তোমার মান্-দা তেমনি 'মানদা' ছাড়া এক পা অগ্রসর হ'তে পারে না।

পুস্তক ও আলোচনা

হে মোর অতীতঃ শ্রীবিনয় চৌধুরী। টারগেট বুক্‌স্‌-এর পক্ষ হইতে শ্রীটমাস বিশ্বদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা মাত্র।

গল্প ও প্রবন্ধ এই উভয় মাধ্যমেই বিনয়বাবু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের একজন সুপরিচিত লেখক। 'অভিনয় বিজ্ঞান' ও 'ছায়াচিত্রকলা'—ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁহার এই পুস্তক দুইখানি বাংলার অপুষ্ট আলোচনা-সাহিত্যের দুইখানি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লেখাগুলি রসজ্ঞ পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ইংরেজি memoirs জাতীয় রচনা।—লেখক কলিকাতাতে আছেন বহুদিন হইতেই, কিন্তু তাহা শুধুই জীবিকার্জ্জনের তাগিদে। নহিলে তিনি 'গ্রাম-হৃদয়া' পূর্ববঙ্গেরই সন্তান। সেই পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ গ্রাম আনন্দপুর, সেই আনন্দপুরের মাটি, তার বাতাস, তার নানান জীবন পর্য্যায়ের মানুষজন, তার সংস্কৃতি—ইহাই হইল লেখকের পারিবারিক জীবনের আপন পৃথিবী, তাঁহার বাপ-পিতামহের ভিটা। উপস্থিত গ্রন্থটি লেখকের সেই আপন পৃথিবীর একটি স্মৃতি-আলেখ্য। উদ্বাস্তু হৃদয়ের বেদনা মন্থনে এ আলেখ্য প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মানুষ ও কয়েকটি 'এপিসোড্' তো রীতিমত মনে করিয়া রাখার মতো। ধর্ম্মীয় সংকীর্ণতার গোড়ামির বিরুদ্ধে লেখকের উদারচিত্ত পিতৃদেবের নিঃশঙ্ক অভিযান, সদানন্দ বাবাজীর আখড়া, ব্রজরাজ মাষ্টারের 'তরুণ অপেরা পার্টি', রূপসী বেদেনী মেহারির প্রেমে পড়া বাবী চোর হমিদা, আর সুহাস বাবাজীর কণ্ঠের শাখাগোমতীর নরম পলিমাটির মতো নরম সুরের গান—এই সব কয়টি মানুষেরই মধ্যে এক-একটি প্রথম শ্রেণীর কাহিনীর উপাদান আত্মগোপন করিয়া আছে।

আশাকরি বিনয়বাবুর 'হে মোর অতীত' বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করিবে।

শকুন্তলাঃ সতীন্দ্রনাথ লাহা। ৩৩-বি, মদন মিত্র লেন হইতে সুহৃদ রুদ্র কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। দাম, আড়াই টাকা মাত্র।

এদেশের না ওদেশের নাম-ধামটা ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু বেশ মাননীয় গোছেরই কে যেন একজন একদা শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে একটি ভারী খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন যে, এই জাতের সাহিত্য যদি রচনা করিতেই হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মনটিকে ঠিক শিশুর মনের ছাঁচে গড়িয়া তোলা চাই; ভাবনা-ধারণাটি হওয়া চাই ঠিক শিশুমনের মতো; রূপকথাময় আর ছন্দস্পর্শাতুর, আর কল্পনাতে থাকা চাই শিশুর স্বপ্ন-বিস্ময়ের বর্ণচ্ছটা। তার মানে, শিশুসাহিত্য লিখিতে হইলে কলম ও কল্পনা—সাহিত্য রচনার এই দুটি সরঞ্জামই রীতিমত পটু ও পাকা গোছের হওয়া চাই। নচেৎ শিশুসাহিত্য রচনা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা মাত্র।

সতীন্দ্রবাবু প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। সুতরাং তাঁহার রূপকল্পনায় ও তুলির টানে তিনি যে শিশুমনের রূপকথা-ময় ও ছন্দস্পর্শাতুর স্বপ্নবিস্ময়ের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত করিতে পারিবেন সেক্ষেত্রে শিল্পী হিসাবে সেটা তাঁহার পক্ষে তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার হইবে না। কিন্তু তিনি যদি এই ছন্দিত ও স্বপ্নেলা বর্ণ-আবেশ সঞ্চারিত করিতে পারেন তাঁহার লেখনীমুখেও, তাহা হইলে সেটাকে আমরা একটা সাহিত্যিক বিস্ময়ই বলিব। আয়তনে ছোট হইলেও সতীন্দ্রবাবুর বইখানিতে সেই প্রীতিপদ বিস্ময় প্রায় প্রতি ছত্রেই বিদ্যমান। মহাকবির বয়স্ক কল্পনা সুষমাকে তিনি কোনোখানে এতটুকুও ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। অথচ সেই সুষমাকে খাঁটি শিশুরুচির সামগ্রী করিয়া তুলিতে খাঁটি শিশুসাহিত্যের রূপ-সুষমাও তিনি সর্ব্বত্র পুরাপুরি অব্যাহত রাখিয়াছেন। লেখার গুণে এমন পরিচিত কাহিনীটাও মনে হয় যেন একটি মৌলিক রচনার পর্য্যায়ে গিয়া উঠিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে পড়িতে গিয়া অনুভূতি উপলব্ধিতে শিশুমনো-চিত অর্দ্ধচেতনার মতো কেমন একটা ঘোর লাগিয়া যায়।

মোট কথা সতীন্দ্রবাবুর 'শকুন্তলা' বইখানি অনেকদিক দিয়াই বাংলা সাহিত্যের মান বাড়াইবার মতো একখানি বই,—তা যেমন লিপি-সৌকার্য্য, তেমন চিত্রসম্ভারে, তেমন প্রচ্ছদ ও গঠন পরিসজ্জায়। শেষোক্ত ব্যাপারে প্রকাশক সুহৃদ রুদ্রের সৎসাহসও প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নির্ব্বাচন

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের তিনজন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনীকুমার ঘোষ দস্তিদার, দুইজন শিক্ষক বামনদাস মণ্ডল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা ডক্টর ফুলরেণু গুহ, একজন শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অনিলা রায় এবং তিনজন কার্য্যনির্ব্বাহক সভাসমূহ হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল। ইহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যোগ্যলোক বলিয়া জানি এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচনে আমরা আনন্দিত।

কিন্তু এই নির্ব্বাচনে ম্যানেজিং কমিটির উপরে যে বিশেষ অবিচার হইয়াছে, তাহা আমাদের সাধারণের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য। ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের আপ্রাণ চেষ্টায়ই বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যখন শিক্ষকগণ নিয়োগবলে কমিটির সভ্য থাকিতে পারেন, ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁহাদের নির্ব্বাচনেরই বেশী সম্ভাবনা—বিশেষতঃ যখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং কলিকাতা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের দ্বারা মফঃস্বল হইতে শিক্ষক সভ্যদের নিকট হইতে বিস্তর নির্ব্বাচন পত্র যোগাড় করা সম্ভব। এইবারে কেবল একজন প্রধান শিক্ষক-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর দুইজন নির্ব্বাচিত হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ ছিল না। এইরূপ হইলে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিদ্যালয় গঠন করিয়াছেন, শিক্ষাবোর্ডে তাঁহাদের প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। এমতাবস্থায় তাহারা যদি বুঝিতে পারে, তাহাদের সব চেষ্টা তাহাদের অধীনস্থ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পণ্ড হইবার সম্ভাবনা, তবে শিক্ষার মূলেও যে বিশেষ কুঠারাঘাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমাদের অভিমত যে, শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকগণের যখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকেন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকেন্দ্র হইতে কোন শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক দাঁড়াইতে পারিবেন না এইরূপ নিয়ম থাকিলেই ন্যায়সঙ্গত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পদপ্রার্থীদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যালয়ের ফেলো বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা প্রিন্সিপ্যাল থাকেন, তাহারা সাক্ষীস্বরূপ attest করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম না থাকিলে বহু অন্যায় সম্ভব। অন্ততঃ অপরের মনে আশঙ্কা থাকিতে পারে যে ঐরূপ ক্ষমতা থাকায় উক্ত ব্যক্তিদের সুবিধা হইয়াছে। অত আমরা বিস্তারিত লিখিলাম না, সংক্ষেপে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে চাই যে, সব পদপ্রার্থীদের সমান সুবিধা থাকে—এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচন হইলেই তাহা নিরপেক্ষ হইবে। এবার সেরূপ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নির্ব্বাচন নিরপেক্ষ হয় নাই। সুতরাং ম্যানেজিং কমিটির সভ্যগণের পুনরায় নির্ব্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়

উত্তপ্ত পরিষদ

কথা নাই বার্ত্তা নাই, কিছুকাল হইতে ভারতের ব্যবস্থাপরিষদগুলি সহসা যেন বড় বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে। কবিজনোচিত উপমা দিয়া বলিতে পারিলে বলা যায় যে, পেপসু হইতে পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত একটি তপ্ত পরিষদীয় ঝটিকা যেন সারা ভারতময় নাচিয়া-কুঁদিয়া ফিরিতেছে। প্রাকৃতিক ব্যাপারে যেমন ঝড়-ঝটিকার ঝাপটাটা প্রথমে বড়দের গায়েই লাগে, তারপর ব্যাপার তেমন সঙ্গীন হইয়া পড়িলে সেই ঝাপটা হইতে ক্ষুদ্রকেরাও বাদ পড়ে না, এ ক্ষেত্রেও, তেমনই এই পরিষদীয় ঝড় প্রথমে সুরু হইয়াছিল দেখিয়াছিলাম ভারত পার্লামেণ্টে,—বর্ত্তমানে সেই ঝাপটা আসিয়া লাগিতেছে আমাদের পশ্চিম বঙ্গেও।

অবশ্য উত্তপ্ত হওয়াটাই হইল পরিষদীয় কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এই এক বড় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। রাজনীতি-অর্থনীতির ভিন্ন-ভিন্ন প্রোগ্রামের ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েক জন মানুষ একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার পর বিতর্ক মজলিসের মতন দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া যাইবেন। দলে ভারি যাঁহারা, অর্থাৎ একই ধরণের ইউনিফর্ম যাহাদের গায়ে গরিষ্ঠ সংখ্যায় থাকিবে, তাঁহারা রাজকন্যা ব্যতীত একটি পুরা রাজ্যেরও অধিকার লাভ করিবেন। অন্য পক্ষে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা শতচেষ্টা করিয়াও আয়ত্ত করিতে পারিবেন না, তাহাদের কপালে রাজকন্যা বা রাজত্ব কোনটাই জুটিবে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাহাদের অবাধ অধিকার থাকিবে। রাজত্বভোগী যাঁহারা তাঁহাদের প্রতি এই সংখ্যালঘু রাজ্যবঞ্চিতদের দল যত ইচ্ছা ঈর্ষান্বিত হইতে পারিবেন এবং যুক্তি-সন্ধি ও নজিরপ্রমাণ হস্তগত করিতে পারিলে উপরিউক্ত প্রশস্ত কক্ষে দাঁড়াইয়া রাজত্বভোগীদের বিরুদ্ধে যত খুসি নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন। মোটামুটি ইহাই হইল পরিষদীয় উত্তাপ। অবশ্য এমন একটি উত্তাপের ব্যাপার উৎসাহী তরুণদের ডিবেটিং ক্লাবগুলিতেও থাকে, সার্ব্বজনিন দুর্গাপূজা কমিটি-গুলিতেও থাকে। তবু পরিষদীয় উত্তাপটি এতদুভয় হইতে সতন্ত্র এই কারণে যে, পরিষদীয় তর্কবিতর্কের মূলে থাকে একটা বৃহৎ রাজ্যপাটের ব্যাপার; সুবৃহৎ এক জন-সংখ্যার ভাগ্য নিয়া লেনদেনের কাজকর্ম—সেই জন্যই ডিবেটিং ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলি হইতে উহা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশী নীরস অর্থাৎ বস্তুধর্ম্মী। অন্ততঃ কাগজে কলমে অথবা আপাত দৃষ্টে।

আবার এতখানি বস্তুধর্ম্মী ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই, পরিষদীয় তর্কবিতর্কের উত্তাপ লইয়া পরিষদের বাহিরেও উত্তাপের ঝড় বহিতে থাকে। হাটে মাঠে ঘাটে, চায়ের দোকানে, রোয়াকে ও বৈঠকখানায় জনসাধারণের জীবন-ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র আর একটি করিয়া অস্থায়ী পরিষদ জন্ম লাভ করিয়া বসে। তর্কবিতর্ক করিতে করিতে স্কুল কলেজ ও আপিস কামাই হইয়া যায়। রেশন আনিতে পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না।

এও আরেক আকর্ষণীয় ব্যাপার পার্লামেন্টারি গণ-তন্ত্রের। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসাদে যাহারা রাজ্যচালনার অধিকারী, রাজত্ব তাঁহারা যেমনভাবে খুসী তেমনভাবে চালাইতে পারেন, এমন কি যদি অরাজকভাবে চালাইতে সুবিধার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সেই ভাবেও। কিন্তু সে জন্য তাহাদের কোনোরূপ সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন করে না। সহিবার মধ্যে তাহাদের কিছু সহিতে হয় বিপক্ষদলের উৎক্ষিপ্ত রাশি-খানেক কুৎসা ও অপবাদ, আর দু'দশখানা নিরপেক্ষ সংবাদপত্র থাকিলে তাহাদের প্রচারিত খানিকটা অপযশ। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। সংখ্যায় নিজের দলের ইউনিফর্ম-পরা লোক বেশী থাকিলে বিপক্ষদলের সকল কুৎসা ও অপযশ পুষ্পচন্দনের মতো সমাদৃত হইতে পারে।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এই শেষোক্ত নিরঙ্কুশ ছটা এবারে ভারতীয় পরিষদ-গৃহসমূহের সাম্প্রতিক অধিবেশন গুলিতে যেমন প্রকটভাবে দেখা গেল, তাহা সম্ভবতঃ গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসেই অভূতপূর্ব্ব। পর পর কত-গুলি কেলেঙ্কারির গুপ্তকথা ফাঁস হইয়া গেল ভারত পার্লামেন্টে।—মুদ্রিতীয় সার ক্রয়ের কেলেঙ্কারি, রাজ-কুমারী কউরের প্রিফ্যাবগৃহনির্ম্মাণ কারখানার কেলেঙ্কারি, শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের পাট ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কেলেঙ্কারি, তারপর সবশেষে জানা দেখা দেশরক্ষা দপ্তরের বিবিধ সমবেসাকরণ ক্রয়ের কেলেঙ্কারি। এসবের যে কোনো একটি কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করিয়া অন্য যে-কোনো দেশ হইলে সেখানে হয়তো একটা শাসনতান্ত্রিক বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত হইত, নতুবা জনবিক্ষোভের আশঙ্কায় মন্ত্রীরা নিজেরাই গদি ত্যাগ করিতেন। পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদেও নবগঠিত বিরোধীদল শাসকপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব কেলেঙ্কারির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, টাকা পয়সার হিসাবে তাহা কেন্দ্রীয় কেলেঙ্কারির মতো ওজনদার না হইলেও, গুরুত্বে সেগুলিও বড় কম নয়।

কিন্তু শেষপর্য্যন্ত ফল কী দাঁড়াইল এই সব রোমহর্ষক উদ্ঘাটনের? পরিষদগৃহে উভয় পক্ষের মধ্যে গাছকোমর বাঁধিয়া বেশ কিছুক্ষণ বাচনিক ধস্তাধস্তি চলিল; উভয়পক্ষ

পরস্পরের প্রতি বেশ কিছুটা কটূক্তি ও টিটকারি বর্ষণ করিলেন; মাঝে মাঝে সততা, জনকল্যাণ এবং নীতি ও আদর্শের ভালো ভালো আপ্তবাক্যও উচ্চারিত হইল, সদস্যরা এক-আধবার গান্ধীজীর মৃত আত্মাকেও পর্য্যন্ত টানিয়া আনিলেন। তারপর পরিষদের বাহিরে সংবাদ-পত্রগুলিতে এই সব সংবাদ প্রকাশিত হইল; সম্পাদকেরা উভয়পক্ষের পক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ তীব্র মন্তব্য লিখিলেন; আমরা জনসাধারণ সেই সব সংবাদ ও মন্তব্য পাঠ করিয়া যুগপৎ উল্লসিত ও উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু তারপর? বিরোধীপক্ষরা এই সব কেলেঙ্কারির বিহিতার্থে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, ভোটের জোরে তাহা নাকচ হইয়া গেল, সরকার পক্ষ জয়লাভ করিলেন। জানা গেল যে তুচ্ছ দুই-একটা কেলেঙ্কারি হইলেও তাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে কোনো রকমে বিপন্ন করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি নির্ব্বিঘ্ন অবস্থাতেই আছে।

হাওড়া নির্ব্বাচন

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালক পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা মিলিত বামপন্থী দলের মনোনীত প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হইয়াছেন, শোচনীয় রূপেই পরাজিত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। কারণ ইতিপূর্ব্বে যেকোন পরিষদের সদস্য তালিকার ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জনই ছিল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী, সেই জায়গায় এবারে কংগ্রেস ৩০টি আসনের মধ্যে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র ১৪টি আসন। তার মানে হাওড়া নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে শতকরা প্রায় ৫৪ জন মানুষই বেমালুম কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি যে কত বেশী উদ্বেগজনক তার প্রমাণ, কোথায় সাতসমুদ্রপারের সেই আমেরিকা, সেই সেখানকার উচ্চতম আইন পরিষদেও পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ার এই নির্ব্বাচনের সংবাদ গিয়া সেখানকার গণতন্ত্রী সদস্যদের বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পরিষদ গৃহগুলিতে সরকার পক্ষদের ভোটাধিক্য জয়লাভে যে এদেশের বহু সংবাদপত্র খুসি হইতে পারেন নাই, তাহারও কারণ বোধ হয় এই হাওড়া। হাওড়ার কের যুক্তি আছে বলিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটা গুজব উঠিয়াছে শুনিতে পাই যে, শীঘ্রই, মানে এই বছর-টাও পার হইতে পারিবে না—আমাদের এই স্বাধীন স্ব-রাষ্ট্রের সর্ব্বাংশে জুড়িয়া নাকি এক বিরাট অভূতপূর্ব্ব ঘটনার অনুষ্ঠান হইবে। সেটি হল আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন। গুজবটির সত্য বা মিথ্যা আমরা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, হাওড়ার এই নির্ব্বাচন পালাটির মধ্য দিয়া সেই সম্ভাবিত মহানাটকের একটি সম্পূর্ণাবয়ব 'রিহার্সাল' অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কংগ্রেসের উপরে নানা অকাট্য কারণে যাহারা ইতিমধ্যেই সবিশেষ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন, তাহারা হয়তো ভাবিতেছেন যে, উক্ত আগামী নির্ব্বাচনে ভারতের অভুক্ত বিবস্ত্র ও বস্ত্র পীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেসের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে রায় দিবে, হাওড়ার এই নির্ব্বাচনে সেই অমোঘ ভবিষ্যতেরই ভূমিকা সূচিত হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষের দুর্দশায় মনটা সকলের খিঁচড়াইয়া আছে, তাই আপাত-দৃষ্টির বেশী দৃষ্টি চলে না বলিয়া এই একটা বিষয়ই সবচেয়ে প্রকট বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু আরও একটা বিষয় আছে। হাওড়ার নির্ব্বাচনে আজ যাহারা কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইলেন, মাঝখানে কোনো একটা বিপর্য্যয় না ঘটিয়া গেলে মনে হয় আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইঁহারাই আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন। ইতিমধ্যে প্রায় আটমাস সময় থাকিবে। এই আটমাসের মধ্যে হাওড়ার বামপন্থী নির্ব্বাচিত সদস্যদের সক্রিয় প্রমাণ দিতে হইবে যে, তাহারা জনসাধারণের কতখানি আস্থাভাজন হয় উপযুক্ত। শুধু যে কংগ্রেস বিরোধিতার ধ্বাজা উড়াইয়া তাহারা তাহাদের দায়িত্ব শেষ করিতে চান না, এ-কথা তাহাদের কাজেকর্ম্মে সত্যসিদ্ধ করিয়া দেশবাসীকে দেখাইতে হইবে।

সুতরাং হাওড়ার নির্ব্বাচন শুধু যে খলিত-অঙ্গ কংগ্রেসের বহু-আশঙ্কিত ব্যর্থতারই বিহার্স্যাল, তাহা নয়,

উহা সম্মিলিত বামপন্থীদলের বহু বিজ্ঞাপিত যোগ্যতা ও আদর্শ প্রাণতা প্রদর্শনেরও রিহার্স্যাল।

সংস্কৃতির স্বরূপ

'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে যতখানি অর্থ ও অনর্থ ভিড় করিয়া আছে, ততখানি বোধ হয় শব্দব্রহ্মের আর কোনো শব্দেই নাই।

আমাদের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজী—ইঁহাদের মুখেও আমরা সংস্কৃতির কথা শুনিয়াছি, ইয়োরোপের যে শ', রোলাঁ আর গোর্কি, তাঁহাদের মুখেও শুনিয়াছি। ওদিকে গান্ধীঘাতক গড্‌সেও মৃত্যুর আগে বুক বাজাইয়া বলিয়া গেল যে, মহাত্মাজীকে সে হত্যা করিয়াছে একটি বিশেষ সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই। হিটলারও শ্বেতবর্ণ 'কুলটুর'-এর জিগীর তুলিয়াছিলেন। মারিয়া খোঁচাইয়া ইহুদি জাতটাকে যে তিনি ইয়োরোপের বক্ষপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, বেলসেন-এ যে তাঁহার অনুচরবর্গেরা একটি আস্ত নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল—হিটলারি দৃষ্টিতে ইহাও ছিল সংস্কৃতির স্বরূপ। আবার হিটলারের মত মুসোলিনিও নিরস্ত্র আবিসিনিয়াবাসীদের উপরে ইটালিয় বোমারুদের বোমা-বর্ষণের সংবাদ শুনিতেন, আর সংস্কৃতির মাহাত্ম্যে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যেকোনো অর্থেই সংস্কৃতি বা কালচার শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। বুকভরা দম লইয়া শুধু গাল ভরিয়া উচ্চারণ করিতে পারিলেই হইল।

এই যে যেকোনো অর্থেই 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার, উহার একটি বড় নিদর্শনের সংবাদ বোম্বাই হইতে পাওয়া গেল,—সম্প্রতি বনমহোৎসব-খ্যাত শ্রীযুক্ত মুন্সী ও শ্রীযুক্ত মাসানির উদ্যোগে যে সেখানে 'ভারতীয় সংস্কৃতি স্বাধীনতা কংগ্রেস' নামে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে। প্রকাশ, উৎসবটি নাকি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল খোদ দিল্লীতেই। কিন্তু শ্রীযুক্ত নেহরুর হস্তক্ষেপের ফলে উহা সম্ভব হয় নাই, তাই বোম্বাইতে হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত নেহরু কেবল এই অধিবেশনের দিল্লী-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নাকি ভারত সরকারের সমুদয় কর্মচারীকেই এই অধিবেশনের সঙ্গে কোনোরকমে সহযোগিতা করিতেও প্রত্যক্ষ ভাবে এবং সরকারী নির্দেশ জারি করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পণ্ডিত নেহরু এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো অধিবেশন হইতে পারে, অধিবেশনের কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষ আসরে নামিবার পূর্ব্বেই সে কথা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

কিন্তু আসরে নামিয়া মাত্র একটিই নয়, উক্ত সংস্কৃতি-স্বাধীনতার কংগ্রেস এমন ধরণের অ-ভারতীয় ও ভারত-বিরোধী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন একাধিক। দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

সর্ব্বপ্রথমেই যেমন ধরা যাক্, আমাদের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির কথা। বার বার শ্রীযুক্ত নেহরু দেশের লোককে এবং বিদেশের লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের এই নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অহিংসা আদর্শেরই বিবর্ত্তন সৃষ্ট আদর্শ। বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ কখনও অস্ত্র ধারণ করিবে না। কিন্তু এই নিরপেক্ষনীতিকে উক্ত স্বাধীন সংস্কৃতি কংগ্রেস কী বলিয়াছে? বলিয়াছে নপুংসক নীতি। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে শ্রীযুক্ত নেহরুকেই উহা নপুংসক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোনো কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—তাহা যে প্রসঙ্গেই হোক্—রাজনীতির কথাটা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যে সম্পর্কই থাক,—রাজনীতির কোনো একটা বিষয় যদি কোনো এক বিশিষ্ট রাষ্ট্রেরই একক স্বার্থের বিষয়ীভূত হয়, তা হইলে সেটাকে আর যাহা কিছুই বলা যাক না কেন, সংস্কৃতি পদবাচ্য বলা অবশ্যই যায় না। আধুনিক বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এমন একটি বিষয় হইল চীনের সম্প্রতিকার

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির রূপ পরিবর্তন। চীনের এই রূপ-পরিবর্তন যেকোনো কারণেই হোক আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের মনঃপূত নয়, উহাকে তাঁহারা তাঁহাদের ডলারি গণতন্ত্রের বিরোধী নীতি বলিয়া মনে করেন। তা মনে করুন, ইহা তাহাদের নিজেদের স্বার্থের বিষয়ীভূত ব্যাপার। কিন্তু ইহার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধ কী? তা ছাড়া উক্ত কংগ্রেস সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাধীনতার কথাটাও উচ্চারণ করিয়া লইয়াছে, তখন চীনের সাম্প্রতিক রূপ বদল ও চীনবাসীদের এক স্বাধীন ইচ্ছার অভিব্যক্তি, একথা মানিয়া লইতে বাধা হইবে কেন?—কিন্তু উক্ত সংস্কৃতি কংগ্রেসের কাছে তাহা বাধার ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছে। এ বাধা শুধু একা আমেরিকারই কোটিপতিদের নিজস্ব ব্যাপার বলিয়াই হইয়াছে। এবং চীনের প্রতি ভারতের মৈত্রীনীতি বিঘোষিত থাকা সত্ত্বেও হইয়াছে।

এইবারেতে দেখা যাক্ এই অধিবেশনের প্রধানাংশ গ্রহণকারীদের কথা। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে সমাদৃত এমন কয়জন মানুষ আজও আমাদের এই দেশেতে আছেন? আছেন শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু স্বয়ং, আছেন আইনষ্টাইনের সহযোগী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, আছেন শ্রীমেঘনাদ সাহা, আছেন নৃত্যভাস্কর উদয়শঙ্কর, ঔপন্যাসিক মুল্‌করাজ আনন্দ, ও আইনবিত্তাবিদ রাধাবিনোদ পাল এবং চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। ইহারা ব্যতীত আরও এমন কয়েকজন আছেন যাহারা বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন না হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির এক একটি প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে নাম করা যাইতে পারে শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, শ্রীকিরণ চন্দ্রের এবং শ্রীপ্রেমচাঁদ-এর।—এক আধজন হইলে তবু কথা ছিল, কিন্তু সব ক'জনকেই বাদ দিয়া এই ভারতবর্ষেরই বুকের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো অধিবেশন করার অর্থ যে শিবহীন শিবযজ্ঞেরই সামিল, একথা বোধ হয় নিতান্ত সংস্কৃতিঅজ্ঞ মানুষটিও জানে। কিন্তু জানিতে পারেন নাই, অথবা জানিবার অবসর পান নাই এই সংস্কৃতি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহারা। পরিবর্তে তাঁহারা আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন আমেরিকার জেমস্ বার্ণহামকে, যিনি এই কিছুদিন পূর্ব্বেই কোরিয়ার যুদ্ধের অবসানার্থে চীনের উপরে মানব সংস্কৃতির সবচেয়ে ভয়াল ভয়ঙ্করতম যে অভিশাপ সেই আনবিক বোমা নিক্ষেপের উপদেশ জারি করিয়াছিলেন; ফ্রাঙ্কো-স্পেনের সঙ্গী কবি মাদারিয়াগাকে, যিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে কখনও সাংস্কৃতিক সঙ্গতি রচিত হইতে পারে না; ইংল্যাণ্ডের স্পেণ্ডার ও অডেনকে—যাহারা একদা গণতন্ত্রী স্পেনের হইয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখনী হইতে স-বেয়নেট বন্দুক ধারণ করিতেও পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই এবং আজ যারা নিরবিচ্ছিন্ন আত্মপরতাকেই কলাদর্শের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদটি বোধ হয় এইটাই যে, উক্ত সংস্কৃতি কংগ্রেসে ভারতের সাধারণ জনগণেরও কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না।

বিস্ময়ের কিছুই নাই। ১৯৪৬-এর আগষ্টে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় একদল অন্ধ-মানব নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়াছিল, সেও তো ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দোহাই পাড়িয়াই।

কোরিয়া

আবার এক নূতন গুরুত্বপূর্ণ ও বিপর্যয়গর্ভ পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে কোরিয়া। চীনা স্বেচ্ছা-সৈন্যদের সহযোগে উত্তর কোরীয়রা দ্বিতীয়বারের জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রায় দখল করিতে বসিয়াছিল, সেটা প্রায় একমাস-দেড়মাস আগেকার ব্যাপার। বর্ত্তমানে যে কারণেই হোক তাহারা পিছাইয়া আসিয়া নিজেদের রাষ্ট্র সীমার মধ্যে থাপ পাতিয়া বসিয়াছে। বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহারা নড়িবে বা সরিবে। এদিকে ৩৮ অক্ষাংশ রেখার এপারে দক্ষিণ কোরিয়ার বুকের উপরে জেনারেল ম্যাক আর্থারের সৈন্যরাও থাপ পাতিয়া বসিয়াছে। এইদলও যে ঠিক কী করিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, এমন কি নিজেরাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিপর্য্যয়গর্ভ পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হইয়াছে এই শেষোক্ত ব্যাপারটারই জন্য। ম্যাক্‌আর্থার সাহেব অবশ্য এইসব বিপর্য্যয়-টিপর্য্যয়ের ধার ধারেন না। তিনি ষোল আনা মিলিটারী মানুষ—তাঁহার মেজাজও যেমন মিলিটারী ধরণের, বুদ্ধিটাও তাই। তাঁহার ধারণা যে, তাঁহাকে যদি ঠিক মন খুলিয়া কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন তুড়িতে তিনি কোরিয়া যুদ্ধের সমাধান করিয়া দিতে পারেন। অবশ্য দিন কতক আগেও কোরিয়া-সমস্যাটিকে এমন তিন তুড়ি দিয়া মীমাংসা করিয়া ফেলার মতো বুদ্ধি ও বিবেচনা ম্যাক্‌আর্থার সাহেবের স্বদেশীয় রাষ্ট্রনায়কদেরও সকলেরই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, তাঁহারা সকলে ম্যাক্‌আর্থার সাহেবের মতো মিলিটারী মানুষ নন; মাঝে মাঝে ঠেকিয়া শিখিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিটা কখনও কখনও বেশ গেরস্থ মানুষের বুদ্ধির মতো হইয়া যায়। এই ঠেকিয়া-শেখা বুদ্ধিতে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করা দেখিতেছেন যে, কোরিয়া ব্যাপারটা ঠিক তিন তুড়িতে মেটাইয়া দেওয়ার মতন ব্যাপার নয়। অবশ্য তিন তুড়িতে একটা ব্যাপার মেটানো যে যায় না তা নয়। কিন্তু সেটা কোরিয়া বিপর্য্যয়ের মীমাংসা নয়, সেটা হইল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা দেখিতেছেন যদি এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা একটা বিরাট শক্তি জোটের বিরুদ্ধে একেবারে নির্বান্ধব হইয়া পড়েন। কারণ আমেরিকার যে ঘনিষ্ঠতম ও বিশ্বস্ততম বন্ধু বৃটেন সেই বৃটেন ম্যাক্‌আর্থারের মিলিটারী বুদ্ধিতে বিশ্বাসী নয়, তারা এত সহসা একটা বড় রকমের হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়িতেও রাজী নয়। বৃটেন কোরিয়া যুদ্ধের একটা আশু মিটমাটের প্রত্যাশা করে, রীতিমত তাল ঠুকিয়াই করে। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা মতলব ঠিক করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা অতঃপর কী করিবেন।

কিন্তু এদিকে মিলিটারী বুদ্ধি ও মেজাজের মানুষ ম্যাক্‌আর্থারকে আর বিশ্বাসও নাই। তাই নিত্য নতুন সংবাদ আসিতেছে যে, কোরিয়ার আশে পাশে, চীনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটিগুলির নিকট দেশে এমন সব সৈন্য সামন্ত আসিয়া ধীরে ধীরে জমায়েত হইতেছে, তারা সকলেই ঠিক চীনের লোক, কোরিয়ার নয়। ইউরোপের বক্ষস্থলও বিক্ষুব্ধ—সেখানে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বারুদপূর্ণ বিস্ফোরকের মত, ইটালীতে শ্রমিক বাহিনী বিক্ষুব্ধ, আর সোভিয়েট সুহৃদ অঞ্চলগুলিতেও যেন-কিসের একটা থমথমে ভাব।

এখন একমাত্র ভোলা মহেশ্বর আর ম্যাক্‌আর্থারই বলিতে পারেন, এই পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয়।—এই প্রবন্ধ লিখিবার পর অকস্মাৎ খবর পাওয়া গেল, ম্যাক্‌আর্থারকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

মীমাংসার প্রয়াস

পূর্ব্ববঙ্গের মৃত্তিকা হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া একদল মানুষ সামান্য লোটাকম্বলও সম্বল করিতে না পারিয়া এই পশ্চিমবঙ্গের দ্বারে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ আজ যে স্বায়ত্ত শাসনের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেটা কতকটা এই হতভাগ্যদের মূল্যে। কারণ এই হতভাগ্যদের সম্মতি না থাকিলে আজ হয়তো সমস্ত বাংলা দেশটাই পাকিস্থানের কবলভুক্ত হইত। সুতরাং ইহাদের ঘরছাড়া করিবার মূলেও যেমন আজিকার পশ্চিমবঙ্গই কতকাংশে দায়ী, তেমনই এই ঘরছাড়াদের আশ্রয় দেওয়ার প্রধান দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গের। কিন্তু এতাবৎকাল অন্ততঃ সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সে দায়িত্ব পালন করিতে অপারগ হইয়াছে। ফলে পূর্ব্ববঙ্গের উৎপাটিতবাস্তু এই হতভাগ্যের দল নিজেরাই নিজেদের আশ্রয়স্থল সন্ধানে উদ্যোগী হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই যে সব জমি অব্যবহৃত পড়িয়া থাকিতে দেখে, সে সবের কিছুটা অংশ অধিকার করিয়া সে সবের উপর আশ্রয়-উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। কিন্তু ব্যাপারটায় ন্যায়ের যুক্তি যতখানি ছিল, আইনের সমর্থন ততখানি ছিল না। ভারতীয় শাসন বিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূল প্রাণীসত্ত্বেরও বিষয়ীভূত। উপনিবেশ গঠনকারী উদ্‌বাস্তুরা অধিকাংশ স্থানেই জমি-মালিকদের এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এই সব বঞ্চিত এবং অধিকারক্ষুণ্ণ পরিচালকদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চিমবঙ্গের জমি-মালিকদের এই অধিকার

যাহাতে অব্যাহত থাকে সেজন্ত এক আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

গতমাসে 'উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল' এই নামে আনীত একটি সরকারী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পরিষদ ও কলিকাতার জনমত যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সে ব্যাপারের মোটামুটি ঘটনাগত ভূমিকাটি হইল এই। আরও একটি ব্যাপার ছিল, সেটি হইল সরকার পক্ষের দুর্মতিজনিত দুর্বুদ্ধি। উদ্বাস্তু সর্ব্বহারাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মতলববাজ মানুষও যে বিনাশ্রমে একটি সম্পত্তি বাগাইবার আশায় কিছু কিছু জমি দখল করিয়া রহিয়াছে, এটা কিছু অনাবিষ্কৃত গোপন তথ্য নয়। এলোমেলো অবস্থার সুযোগে লুটিয়া-পুটিয়া খাইবার মতো একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই থাকে। সেই সুযোগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া অধিকারচ্যুত জমি-মালিকদের যদি সেই অধিকার বা সেই অধিকারের বিনিময়মূল্য প্রত্যর্পণ করা হয়,তাহা হইলে তাতে আইনও যেমন অব্যাহত থাকে, তেমন থাকে ন্যায় ও নীতির বিধানও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অদ্ভুত মতলববাজদের উচ্ছন্ন করিতে গিয়া তাহাদের প্রস্তাবিত বিলের এমন একটা নাম করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হইয়াছিল পুনর্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে বুঝি পাকিস্থানীদের মতো উদ্বাস্তুদের আসা সমূলে উৎপাটিত করিয়াই তাহারা উদ্বাস্তু সমস্যার মীমাংসা করিতে চান। জনমত এই কারণেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সুখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের এই দুর্মতিজনিত অপচেষ্টাটিকে আর শেষ পর্য্যন্ত অটুট রাখিবার জন্ত পণ করিয়া বসেন নাই। জনমতের বিরুদ্ধ অভিমত দেখিয়া তাঁহারা সম্ভবতঃ তাহাদের এই ত্রুটির বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং বিলটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি ও অন্যান্ত বে-আইনী দখলকারী উচ্ছেদ বিল' এই নামকরণ হইয়াছে। ১৯৪৬-এর অক্টোবর হইতে ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত যাহারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাহাদিগকেই আইনসিদ্ধ উদ্বাস্তু বলিয়া ধার্য্য করা হইবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাও স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। আর স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, কোনো অবস্থাতেই পৃথক জমির ব্যবস্থা না করিয়া এবং বর্ত্তমান কাজকর্ম্ম ও চাকুরীর ব্যাঘাত জন্মে এমনভাবে কোনো উপনিবেশবাসী উদ্বাস্তুকে সরানো হইবে না।

উদ্বাস্তুরা সহায়হীন ও নিরাশ্রয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তারা ভারত রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সম্পদ ও একটি শক্তিশালী সমাজ গঠনের পক্ষে একটি প্রাণবন্ত উপকরণ। একটুখানি আন্তরিকতা আর একটুখানি সহযোগিতা দিয়া তাহাদের পরিচালিত করিতে পারিলে তাহারা পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ফিরাইয়া দিতে পারিবে।

দি মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ চৌরঙ্গীর হোয়াইটওয়ে লেইড ল'র বাড়ীটি কিনিয়াছেন। বাঙালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা যে কত বড় গৌরবের বিষয়, তাহা প্রকাশের অতীত। গত ১৯৩০ সাল হইতে ধাপে ধাপে মেট্রোপলিটান উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান চলতি বীমা ১৭কোটির ঊর্দ্ধে। আগামী কিছু কালের মধ্যেই যে এই কোম্পানী বীমা জগতের রেকর্ড ব্রেক করিতে পারিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। পুণ্যাত্মা ঋষিকল্প সচ্চিদানন্দের স্মৃতির সহিত এই প্রতিষ্ঠান যুক্ত। মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের এই শুভ জয়যাত্রার পথে আজ এই নববর্ষে ইহার কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

'ঋতু পরিক্রমা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'

সম্প্রতি বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নিবাসে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু পরিক্রমা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে এই অভিনয় যাত্রা এমন একটি মনোরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—যাহা বাংলার সর্ব্বত্র সচরাচর দেখা যায় না। স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের পরিবারস্থ ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন দ্বারা এই পারিবারিক নাট্যাভিনয় হয়। 'ঋতু

পরিক্রমা'র অংশ গ্রহণ করে—পুলিন, মুকুল, ইতু, খুকু ও পূর্ণা। সঙ্গীতাংশে শ্রীপুলিন চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় করেন অনাথ চৌধুরী, বীরু ভট্টাচার্য্য, শচীন ভট্টাচার্য্য, পুলিন চৌধুরী, শৈলেন ভট্টাচার্য্য ও সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য। বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অনাথ, অবিনাশের ভূমিকায় বীরু, ঈশানের ভূমিকায় শচীন, তিনকড়ির ভূমিকায় সত্যব্রত যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকাও উল্লেখ-যোগ্য। ঈশানের মেক্-আপ খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পারিবারিক পরিবেশে এই ধরণের অভিনয় দ্বারা শুধু আনন্দ পরিবেশনই নয়, তাহার সঙ্গে শিক্ষারও একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। আমরা ইহার প্রয়োগ কর্ত্তা ও উদ্যোক্তাগণ এবং সর্ব্বোপরি প্রধান উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া মাঝে মাঝে এইরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। অভিনয়ান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন

সম্প্রতি মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন বক্তৃতায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে,বিগত সাত বছর ধরিয়া প্রাচ্যবাণী মন্দির সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর বহু সভাসমিতি, সংস্কৃত নাটক অভিনয়, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃত প্রচারে প্রাচ্যবাণীর বিপুল প্রয়াস সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচ্য-বাণীর প্রকাশিত গবেষণা ও সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালা বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলীর আদরের সামগ্রী। প্রাচ্যবাণী পরিচালিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিও অত্যন্ত সন্তোষজনক। পরিশেষে ডক্টর চৌধুরী ভারত সরকারকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ডক্টর কাটজু বলেন যে, স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই ভারতের উন্নতির মূল অন্ত-র্নিহিত এবং প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, দেশ যদি একান্তভাবে সংস্কৃত শিক্ষার কামনা করে, নিশ্চয় সরকার তদ্বিষয়ে তৎপর হইবেন।

প্রাচ্যবাণীর পক্ষ থেকে ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে নিখিলবিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টায় এবং বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রাচ্যবাণীর পূর্ণ সহযোগিতা জ্ঞাপন করেন।

শুভ নববর্ষের ফলাফল

রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী

১৩৫৭ সালের ৩০শে চৈত্র শুক্রবার দিবা ২ ঘ. ৪০, মি. ২৫ সেকেণ্ডের সময় শুক্লসপ্তমী তিথিতে মিথুন রাশিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র থাকা কালে মহাবিষুব সংক্রান্তি। ৮০ পলে সংক্রমণ হেতু "মহোদরী সংক্রান্তি" নামে অভিহিত। সূর্য্যদেব অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ রাশিতে, মঙ্গল ও বুধ মেষ রাশিতে। ভারতবর্ষ মকর রাশির অন্তর্গত দেশ এবং এই রাশির অধিপতি শনি; ভারতের অষ্টমে কেতু। বর্ষগণনায় শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী পরস্পর বৈরভাবাপন্ন। শস্যাধিপতি চন্দ্র, বাণিজ্যাধিপতি শুক্র, সেনাপতি শুক্র। ফলে প্রজাক্ষয়, রাজক্ষয়, রাষ্ট্রনায়কগণের কার্য্যপদ্ধতি নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও বিড়ম্বিত হইবে ও নায়কগণ বিব্রত বোধ করিবেন; রাষ্ট্রনায়কগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি সংস্কার ব্যবস্থা প্রণয়নে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু প্রবল বাধা পাইবেন ও ক্ষয়-ক্ষতির যোগ সৃষ্টি হইবে। এই বর্ষে ৪টি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (১) গ্রহসংস্থান ও মন্ত্রিসভা; (২) বর্ষচক্রের গ্রহসমাবেশের ফলাফল; (৩) গোচর ফল ও প্রদেশ ও প্রদেশপালের উপর তাহার প্রভাব এবং (৪) বাস্তহারা ও খাদ্যসমস্যা।

এই বর্ষে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রী হইলেও স্থানভেদে আধিপত্যহীন; রবির আধিপত্যও কম, শুক্র বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ২।৩টি পদের অধিকর্ত্তা এবং অশুভ গ্রহ শনি রাজপদে আসীন ও রাজ্যপালগণের পরিচালক এবং শুক্র ও মঙ্গল মন্ত্রীদিগের নিয়ন্তা। রাজা বা প্রেসিডেণ্ট শনি শ্রমিক, মিলমালিক, শ্রমবিভাগ ও গণতন্ত্রের কারক। সুতরাং গণতন্ত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিকের আধিপত্য আরও বিস্তৃত হইবে ও সুমীমাংসা-ব্যাপারে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে লইয়া জনমত গঠিত হইবে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হইবে; বাণিজ্যের উন্নতি; পাট, তুলা ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি; রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি; মশলা, ইমারত নির্ম্মাণের দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ও সময় সময় দুষ্প্রাপ্য হইবে। দেশে অশান্তি, অন্তর্বিদ্রোহ; তীব্র খাদ্যসমস্যা; নূতন দলগঠন ও মতবাদ; মহিলাদের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রবল হইয়া উঠিবে। কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রধানা মহিলার অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্তি ও গুপ্ত শত্রুর হাতে ক্ষতি; রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে কুৎসা ও অখ্যাতি বৃদ্ধি পাইবে; শ্রাবণ ১০ তারিখ হইতে ২৪শে আশ্বিন মধ্যে দুর্ভিক্ষ, বিমান দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটিবে। ১৩১ দিনে শনি বক্রভাবে থাকিবে। ফলে ভারতে বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি যোগ সূচিত হয়; শাসন ব্যাপারে সঙ্কট দেখা দিবে; আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে শ্রমিক সমস্যার বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হইবে; আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের ১০ তারিখের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কোন খ্যাতনামা নায়কের রিষ্টকাল দেখা যায়। এই বর্ষে ভারতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ষে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়াজী ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদের রিষ্টকাল। শ্রাবণ হইতে ২ মাস মধ্যে নূতন মন্ত্রী-মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে এবং তাহাতে বিশিষ্ট মুসলমান প্রভৃতি থাকিবেন; ভারতের বৈদেশিকনীতি বহুক্ষেত্রে সুফল লাভ করিতে পারিবে না। বর্ষের মধ্যভাগে বিহারে বিশিষ্ট আইনজ্ঞের জীবন নাশ সম্ভব; জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পতন ও আশ্বিন হইতে ১৪ই পৌষ মধ্যে বিশেষ অশুভযোগ দেখা যায়।

ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে ৫টী গ্রহের সমাবেশ। ফলে ঐ সময় ভারতের কোন কোন প্রদেশে যথা উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে অন্তর্বিদ্রোহ, রক্তপাত, অরাজকতা ইত্যাদি ঘটিবে এবং কোন হিন্দু নেতার জীবনাবসান ঘটিবে। বর্ষের শেষভাগে নির্ব্বাচনী গণভোট আন্দোলন ও ২।১টী প্রদেশে নির্ব্বাচন হইবে। সম্পূর্ণ ও সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচন ১৯৫১ সনে হইবে না; বহু কংগ্রেস কর্ম্মী নির্ব্বাচনে পরাজিত হইবে, এমন কি কোন কোন মন্ত্রীপদে আসীন কংগ্রেস প্রার্থীও মনোনীত হইবে না; কংগ্রেস দেশবাসীর ভালবাসা ও বিশ্বাস বহুলাংশে হারাইবে এবং আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বিব্রত হইয়া পড়িবে। দিল্লীনগরীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলেও তথায় চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইবে। তুলা রাশিতে মঙ্গল ৬ মাস থাকিবে। ফলে "যুদ্ধং দেহি" ভাব ও কাশ্মীরে বিশেষ

কানাইলাল সিংহের
সোমরাজ
কবিরাজী কেশতৈল
মাথার রোগের মহৌষধ
সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ফরমুলা :-
*তিল তৈল *ক্যাষ্টর অয়েল
*ক্যান্থারাইডিন
*সোমরাজ বীজ
*মহাভৃঙ্গরাজ
*রক্ত ও শ্বেত চন্দন
*ব্রাহ্মী *আমলা
*মাস্ক (কস্তুরী) *চন্দন তৈল
*বেলা তৈল *চামেলী তৈল
*বার গুমেট *ল্যাভেণ্ডার
*ইত্যাদি বিখ্যাত সেন্ট
উপকারীতা :-
*মাথার রোগে
*চুল ওঠা বন্ধ করিতে
*চুল বাড়াইতে
*অনিদ্রায়, নিত্যস্নানে
'সোমরাজ কেশতৈল'
* সর্ব্বোৎকৃষ্ট *

গোলযোগ ও সঙ্কট দেখা দিবে। বাংলা অশান্তির লীলা-ভূমি হইবে। একজন কংগ্রেস মন্ত্রীর মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন দল সমবেত ভাবে শাসন সঙ্কট ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। খাদ্য সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না; বহু বিষয়ে বাংলা পিছাইয়া পড়িবে।

বহু নেতা থাকিলে একজন সাধারণ জনসেবক ব্যক্তি যিনি ১৩৫৭ সালের অখ্যাতনামা ছিলেন, নিজের কর্ম্ম ও প্রতিভাবলে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন ও দেশের আস্থা অর্জ্জন করিয়া নেতৃত্ব করিবেন। চালের মূল্য হ্রাস; নেপালে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন; উত্তর ভারতে রাজনৈতিক গোলযোগ; যুদ্ধের রব উঠিলেও যুদ্ধ হইবে না। জওহরলালজীর স্বাস্থ্যক্ষতি ও ভ্রমণে বিপদ; শ্রাবণ মাসে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর বিশেষ শরীর ক্লেশ ও ক্ষতি; আশ্বিনের মধ্যভাগে ঝড় জলের বিশেষ আধিক্য হইবে; ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইবে। বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে প্রদেশপাল বা প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। সংবাদপত্রের কিছু না কিছু অসুবিধা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের দুই জন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সম্পাদকের জীবনাবসান যোগ, বাংলার কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদকের কর্ম্মত্যাগযোগ আছে। আইন, আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি স্থানে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। বাস্তুহারাদের সংগঠন ও সংহতি বিশেষ বলবান্ হইবে, কিন্তু তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে। সরকার সমস্যা সমাধানে বিফল হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন। মহিলাদের সংহতি বৃদ্ধি; কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা প্রদর্শন। বিচার ও শিল্প বিভাগে অধিক মহিলা নিযুক্ত হইবে। জন্মহার বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কার ও উন্নতি সাধনে চেষ্টিত হইলেও ব্যর্থকাম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে এবং তাহা প্রধান কর্ম্মকর্তার স্বাস্থ্যের হানির জন্যই প্রধানতঃ হইবে। বাংলায় সেকেণ্ডারি এডুকেশন প্রবর্ত্তিত হইবে এবং পরিচালকগণ জনপ্রিয়তা হারাইবেন। উত্তর প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে। মাদ্রাজে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালী হইবে এবং খাদ্য সমস্যা ও আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হইবে।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
২৫ লোয়ার সারকুলার রোড্, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিনান্তে [শিল্পী—রামকিঙ্কর সিংহ

CALC[illegible] UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অষ্টাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮ | ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীগীতগোবিন্দ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগে যদি কোন বাঙালীর রচিত কাব্য সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তাহা জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ। ইহার টীকা ও ব্যাখ্যাকার সম্প্রদায় ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই আবির্ভূত। ইহার অনুকরণে সমস্ত প্রদেশেই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সমুদয় প্রদেশে অনুসৃত হইয়া ক্ষীয়মান সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে নূতন স্রোতোবেগ ও নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছে। সর্ব্বভারত-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া ইহা দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মভাবমূলক সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধকে দৃঢ়তর করিয়াছে ও সমস্ত ভারতব্যাপী এক নূতন কাব্যরীতির উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু 'গীতগোবিন্দের' আসল বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুগসন্ধিক্ষণে রচিত ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের গতিপথের নির্দ্দেশক ও নিয়ামক। গীতগোবিন্দ রচনার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণা নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে ও নবজাত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সাহিত্যিক আত্ম-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া উন্মুখভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের চিত্ততলে নূতন রস ও ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়া অভিনব বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিতেছে। পুরাতন সংস্কৃত ছন্দবিন্যাস মহাদেব-জটার মধ্যে ক্রম-উপচীয়মান ভাগীরথিতরঙ্গধারার ন্যায় এই নবীন প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য ও গতিবেগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নবজাত বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি, বহু পরীক্ষিত অনুশীলনের আত্মপ্রত্যয় ও অতীত কীর্ত্তিসঞ্জাত আভিজাত্যবোধ এখনও আহরণ করিতে পারে নাই। কাজেই দেশের কবিপ্রতিভা সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেও ভিন্ন

নবোন্মেষিত সৌন্দর্য্যবোধ ও উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের অন্ত পুরাতন, পরিমিত কাব্যরীতির অপ্রাচুর্য্য তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। দেশের প্রবহমান ভাবধারা সংস্কৃত ছন্দের চিত্রিত ঘটকে ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। মিলনের নিবিড় আনন্দ, বিরহের অন্তরদীর্ণ ব্যাকুলতা, প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবোধের উদাত্ত উন্মাদনা, প্রতিবেশ সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ আবেদন, গীতিকবিতার আকাশ-ছোঁয়া সুর, সর্ব্বোপরি মন-ময়ূরীর পেখম ধরা, ঐশ্বর্য্যরথি প্রতিঘাতী উল্লাসনৃত্য—এত সঙ্গীতমূর্চ্ছনা, এত হিল্লোলিত প্রাণধারা, কল্পনার এরূপ অপরিমিত প্রসার, কি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন, জীর্ণ, প্রথাবিড়ম্বিত ছন্দোরীতির বন্ধনসীমায় ধরা দিতে পারে? তাই মন্থিত সমুদ্রের গভীরতা হইতে সুধাভাণ্ডহস্তে ধন্বন্তরির ন্যায় এই নব-আশা-আকাংক্ষায় বিক্ষুব্ধ হৃদয়সিন্ধুর অন্তস্তল হইতে বৈষ্ণব দর্শনের অমৃত-কলা পূর্ণ করিয়া উদিত হইলেন শ্রীজয়দেব কবি। তিনি বাংলা ভাষাকে হাতের কাছে পান নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, তাহার সৌন্দর্য্যপ্রবণ, ভাববিভোর, অধ্যাত্মরসপিপাসু মনটি তাঁহার মধ্যে স্বপ্রকাশ। বাঙ্গালী কবি-কল্পনা, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবপ্রবণতা জয়দেবে প্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের নেতৃত্ব সবলে অস্বীকার করিয়া এক স্বাধীন, দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেঘ-মেদুর আকাশ তলে, তমালশ্যাম বনভূমিতে, বর্ষাসন্ধ্যার স্নিগ্ধ গন্ধবিধুর অন্ধকারে, এক অদৃশ্য প্রেরণার সংকেত তাহাকে পরিচিতের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের প্রতি রহস্য-মধুর অভিসার-যাত্রার আহ্বান জানাইয়াছে। এইখান হইতেই রবীন্দ্রনাথে যাহার শেষ বাঙ্গালী কবি প্রতিভার সেই জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। বাঙ্গালী আপনার মনকে পাইয়াছে, ভাষাকে পায় নাই—পুরাতন নৌকায় নূতন পাল খাটাইয়া নববায়ুপ্রবাহে হেলিতে দুলিতে সে অসীম সম্ভাবনার পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। বাংলা ভাষার সূর্য্যোদয় এখনও হয় নাই, কিন্তু এই আসন্নপ্রায় আবির্ভাবের অরুণচ্ছটায় দিংমণ্ডল উদ্ভাসিত। জয়দেব কবির প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখ, তাহার স্বপ্নবিভোর চক্ষুদুটি এই অনাগত আলোক-ধারার উৎসে স্নাত হইয়া অর্থগূঢ়, লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই জয়দেবের সত্য ঐতিহাসিক পরিচয়—তিনি বাংলা ভাষার জন্মের পূর্ব্বেই প্রথম বাঙ্গালী কবি। রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই রামায়ণ রচনার যেমন প্রসিদ্ধি আছে, তেমনি জয়দেবও বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচনা। তিনি যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভবিষ্যতের নিগূঢ় ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য বীজাকারে বিধৃত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে ভাব-প্রবাহ উদ্দাম হইয়া কখনও শ্লোকের সুষমা বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া যায় না, স্তরে স্তরে শ্লোক হইতে শ্লোকান্তরে সংক্রামিত হইয়া সৌন্দর্য্যের পূর্ণ, শোভন পরিণতি লাভ করে। প্রতি শ্লোকের মণিকুট্টিমরচিত তটরেখা এই কূলে কূলে পূর্ণ অথচ মন্থরগামী ভাবধারার গতিবেগে ক্ষুণ্ণ বা বিপর্য্যস্ত হয় না—তরুণীর উচ্ছ্বসিত দেহলাবণ্যের মত ইহা শরীরের প্রতি রেখায় প্রকটিত হইয়া নিজ আধারের মধ্যে আপনাকে সংহৃত করিয়া রাখে। জয়দেবের প্রতি সর্গের সমাপ্তি শ্লোকসমূহে সংস্কৃত শ্লোকের এই সীমায়িত গাঢ়বদ্ধ সুষমা যথাযথরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবাবেগের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় দ্রুতগামী শ্লোকপরম্পরার সীমারেখা যেন আর সুস্পষ্ট নাই, ভাবপ্রাবল্যে সব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা যেন বাংলা পয়ারের পূর্ব্বসূচনা অনুভব করি। শ্লোকের আত্মসমাহিত গাঢ়তা যেন পয়ারের সমষ্টিগত বৃহত্তর ভাবায়তনের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। হ্রদের ক্ষুদ্র লহরীসকল বারিরাশির মধ্যে দ্রুত প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীনিচয়ের সম্মিলিত তরঙ্গধারার নৃত্যলীলা জাগিয়া উঠিয়াছে। আর যেখানে এই হৃদয়াবেগ গীতিকবিতার সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সংস্কৃত ছন্দের রীতিবন্ধন সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা মাঝে মধ্যে গানের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু এগুলি অগ্র ও পশ্চাৎবর্ত্তী শ্লোকের সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে প্রায় অভিন্ন। অন্তরাল হইতে শ্রুত হংসপদিকার গান শকুন্তলার সর্ব্বব্যাপী রমণীয়তার মধ্যে ইহার বিশিষ্ট আবেদন হারাইয়াছে; ইহা তাহার

হৃদয়ের সমাচার বহন করে সত্য, কিন্তু তাহার রিক্ত জীবনের করুণ নিঃসঙ্গতার সুরটি ইহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না। রঘুবংশে তপোবন-পরিত্যক্তা সীতার শোকোচ্ছ্বাস 'যথা ইহা তৎ জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ'—শ্লোকের গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে, গানের সুদুঃসহ, মর্ম্মান্তিক তীব্রতা লাভ করে নাই। 'গাথাসপ্তশতী', 'আর্য্যসপ্তশতী' প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলি হয়ত সংগ্রাহকের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সঙ্গীতধর্ম্মী ছিল, কিন্তু রচনা-ভঙ্গীর দিক দিয়া তাহারা শ্লোক সমষ্টি মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও এক আধ বিন্দু অশ্রু চক্‌মক্ করিয়া উঠে, কিন্তু উহা মুক্তার ন্যায় নিটোল ও উজ্জ্বল; সত্যিকার অশ্রুর পর্য্যাকুলতা ও লবণাস্বাদ উহার মধ্যে অনুভব করা যায় না। মাঝে মধ্যে অন্তর্বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে ভাসিয়া আসে, কিন্তু মধ্য পথেই শব্দালঙ্কারের শিঞ্জিত সমারোহে উহা চাপা পড়িয়া যায়। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি শোক হইতে শ্লোকের উদ্ভব সাধন করিয়া সমস্ত পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেই হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির মাত্রা-ছন্দটি চিরতরে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—শোক আর কোন দিনই শ্লোককে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

শ্লোক বন্ধন হইতে হৃদয়াবেগের মুক্তি ও শ্লোকের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর সাধন—ইহাই জয়দেবের কবি-কৃতির প্রধান উপাদান। সংস্কৃত ছন্দকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার চরণের মধ্যে অন্ত্য ও মধ্যস্থানীয় মিল প্রবর্ত্তন করিয়া উহার মন্থর-গম্ভীর গতির মধ্যে নূপুর নিক্বণের দ্রুতাবর্ত্তিত ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। পয়ার ত্রিপদী ও আধুনিক বাংলা কবিতায় পরীক্ষিত নানা বিচিত্র ছন্দের সূচনা তাঁহার কাব্যে মিলে। গীতি-কবিতার উচ্ছ্বসিত সুর-প্লাবনকে তিনিই প্রথম নূতন ছন্দোবন্ধনে স্থিররূপ দিয়াছেন। এই বহিরঙ্গের পরিবর্ত্তন গভীরতর অন্তরানুভূতির পরিবর্ত্তনেরই প্রতীক ও প্রতিরূপ। অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিকল্পনা তখনই কবির মনে জাগে, যখন অজাতপূর্ব্ব নব রহস্যের বিস্ময়মণ্ডিত ভাবা-কুতি তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া বহির্নিষ্ক্রমণের পথ খোঁজে—রসের নূতন আবেদন, অন্তর মধ্যে ভাবের বিচিত্র সঞ্চরণ লীলাই নব ছন্দোময়ী বাণীরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এই দিক দিয়া জয়দেব কেবল যে নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক তাহা নহে, বাঙ্গালীর নূতন মনোজগৎ, অনুভূতি ও রূপানুরাগের বৈশিষ্ট্যেরও সূচনা করিয়াছেন তিনি।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ এই যে, ইহা আদৌ বাংলা বা প্রাকৃতে রচিত হইয়া পরে সংস্কৃতে অনুবাদিত হইয়াছিল। এই মত আক্ষরিকভাবে সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে নিগূঢ়তম ভাব-সত্য নিহিত আছে। এই কল্পনা অন্ততঃ প্রাদেশিক ভাষার সহিত ইহার আত্মীয়তার ইঙ্গিত বহন করে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা জয়দেবের কাব্যে আধ্যাত্ম সত্যের মহিমা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া বিগলিত ভাব-মাধুর্য্যের রূপসম্ভার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বৈষ্ণবের দেবতা ঐশ্বর্য্য পরিহার পূর্ব্বক পারিবারিক জীবনের স্নেহপাশে, দাম্পত্য প্রেমের মধুর আত্মবিস্মৃত একাত্মায় বন্দী হইয়াছেন, তাঁহারই প্রথম সূচনা পাই জয়দেবের কাব্যে। সংস্কৃতের অটল, দৃঢ়বদ্ধ গাম্ভীর্য্য হইতে দ্রবীভূত মাধুর্য-রঙ্গিমায় রূপান্তরিত ভাষাই এই ভাবগত পরিবর্ত্তনের সার্থক প্রতিবিম্ব। যে দেবতা ভাগবত ও পুরাণের তত্ত্বপ্রধান ভক্তিকুণ্ঠিত আলোচনার মধ্যে সুদূর, অনধিগম্য সম্ভ্রমে বিবিক্ত ছিলেন, যাঁহার প্রতি মানবিক স্নেহ প্রেমের স্ফুরণ ও যেন তাহার নির্লিপ্ত শীতলতার স্পর্শে জমিয়া তুষারের মত স্বচ্ছ কঠিন হইয়াছে, জয়দেবের কাব্যে তিনিই সোহাগে গলিয়া, মান-বিরহ-আকুতির তরঙ্গলীলায় আন্দোলিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন; জয়দেবের ভাষার ইন্দ্রজালই এই দূরত্বের নৈকট্য বিধানে সহায়তা করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কবিতায় ঐশী প্রেমলীলার এই অভিনব মাধুর্য্যের রসাস্বাদন করিয়াছেন ও ইহাকে নব ধর্ম্ম সংহিতার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গৌররূপ দ্বৈতমূর্ত্তির ন্যায় গীতগোবিন্দেরও দ্বৈতমূর্ত্তি তাহার বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক; বাহিরে সংস্কৃতের কাঠিন্য, অন্তরে বাঙ্গালীর সুকুমার কোমলতা ইহার মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয়ে সংগত হইয়াছে।

দুই

এই যুগ সৃষ্টিকারী কাব্যের আদর যে কোন কালেই কমে নাই তাহা ইহার টীকাকারদের প্রাচুর্য্য, ইহার পরম্পরাগত ব্যাখ্যার অবিচ্ছিন্ন ধারার দ্বারাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত। সম্প্রতি বাংলার প্রথিতনামা বৈষ্ণব-সাহিত্যবিদ পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যে ইহার একটি উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্করণের সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবিধ মহামূল্য তথ্যের খনিস্বরূপ। সুদূর বৈদিক ও উপনিষদ যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্বাভাস, ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি ও গ্রন্থাদিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ,ভাগবতে অনুল্লিখিত নাম্নী রাধার সাহিত্যে আবির্ভাব, ক্রমিক প্রসার ও তাহার প্রতি গভীর ভাবমন অধ্যাত্ম তাৎপর্য্যের আরোপ, কবি-সাময়িকী, জনশ্রুতি-তথ্যে মেশান, ভক্ত-কল্পনা রচিত কবি জীবনী—এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ তথ্যালোচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া জয়দেবের কাব্য পরিবেশের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে ও কাব্যরসাস্বাদনের নূতন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পাঠককে পরিচিত করিয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের সহিত গীতগোবিন্দের সম্পর্ক, একদিকে ভাগবত, অন্যদিকে পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার ইতিহাসে গীতগোবিন্দের স্থান নির্ণয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় ভূমিকাতে পূজারী গোস্বামীর যে টীকা উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে জয়দেবের প্রাচীন প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গীতগোবিন্দের সর্গবন্ধ, রাগ-তাল প্রকরণ ও পাঠভেদ সম্বন্ধে নানা মৌলিক, কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়া ভূমিকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে উদ্ধৃত জয়দেবের শ্লোকাবলী ও পুরীধামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় জয়দেব কবির বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষলহরীর সন্নিবেশ জয়দেবের কবি-প্রতিভার স্বরূপ নির্দ্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে ও তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সংস্কারের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় একাধারে বৈষ্ণবদর্শনে সুপণ্ডিত ও কাব্যরসগ্রাহিতায় তীক্ষ্ণ রসবোধ ও বিচারবুদ্ধির অধিকারী; এবং এই উভয় গুণের সংমিশ্রণ তাঁহার ভূমিকার জন্য আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানজনক আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত আলোকে গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া পাঠক ইহার মধ্যে নূতন অর্থ-দ্যোতনা, ভক্তি ও প্রেমরসের সার্থক স্ফুরণের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। আমি তাঁহার ভূমিকানিহিত সূত্র অনুসরণ করিয়াই জয়দেবের কাব্যের কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে ঐতিহ্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে উহাকে একটি পারম্পর্য্যসূত্রে গ্রথিত পুষ্পমাল্যের সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন কবি হয়ত নূতন ফুল আহরণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু নব-আহরিত ফুলগুলি প্রাচীন সূত্রেই গ্রথিত হইয়াছে—এবং কবি ও পাঠক সম্প্রদায়ের বিচারে ফুল হইতে সূত্রের মূল্যই অধিক। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ফুরণের পূর্ব্বে কাব্য রচনা গোষ্ঠীমনোভাব-শাসিত ছিল। যে কোন নূতন কবি আবির্ভূত হইতেন, তাঁহার মৌলিকতা অপেক্ষা তাঁহার প্রথানুবর্ত্তন কুশলতা, অলঙ্কার নির্দ্দিষ্ট রীতির সার্থক অনুসৃতিই অধিক আদরণীয় হইত। কাজেই এই পূর্ব্ব ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া শুধু স্বাধীন রসবোধের আদর্শে কোন প্রাচীন কবির বিচার তাঁহার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করেন নাই বলিয়াই জয়দেবের কাব্যকে মদন-মহোৎসব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ অনুযায়ী এইরূপ সংজ্ঞাই যথার্থ বিবেচিত হইবে। কিন্তু কবি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা এইরূপ ব্যাখ্যায় রক্ষিত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে জয়দেব সম্বন্ধে আরও সার্থকভাবে প্রযোজ্য তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ভাগবতকার রাসলীলার মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনার উন্নততম উৎকর্ষ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই শৃঙ্গার

রসের সহিত ভক্তিরসের অবিচ্ছেদ্য, চিরন্তন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কামকলাকুতূহল ভগবল্লীলায় রসাবিষ্ট অনুধ্যানের শ্রেষ্ঠ উপায়ের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সেইদিন হইতেই দেহসম্ভোগের অনাবৃত বর্ণনা, কেলি বিলাসের অসংবৃত উচ্ছ্বাস কলঙ্কমুক্ত হইয়া ভক্ত ও রসিক হৃদয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। উহার ভাবের বিশুদ্ধি উহার বস্তুগত অসংযমের উপর জয়ী হইয়াছে; রতি প্রসাধনের ভিতর দিয়া আরতির ধূপ-সৌরভ উত্থিত হইয়া আকাশকে সুরভি-সমাকুল করিয়াছে। সুতরাং জয়দেবের কাব্যে ও উহার অনুসরণে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রূপমুগ্ধতার আতিশয্য দেখিয়া কাহারও কোন সঙ্কোচ অনুভবের প্রয়োজন নাই—রূপের ভিতর দিয়াই অরূপের স্পর্শ বৈষ্ণব সাধনার সর্ব্বজন স্বীকৃত, ভক্ত-দৃষ্টান্ত-সমর্থিত পন্থারূপে গৃহীত হইয়াছে। জয়দেব যখন তাঁহার কাব্য-প্রারম্ভে হরি স্মরণে চিত্ত-সরসতা ও বিলাসকলাকুতূহলকে সমপর্য্যায়ভুক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তখন টীকাকারের পক্ষে বিলাসকলাকে কেবল হরিলীলা বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া উহার ভাব-বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টাকৃত প্রয়াস অপ্রয়োজনীয় ত বটেই, সমগ্র বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। চিত্তের সৌন্দর্য্য-প্রবণতা যখন মধুর রস ভজনার অপরিহার্য্য প্রস্তুতি, তখন ইহাকে জোর করিয়া ধর্মতত্ত্বমাত্রাত্মক না করিলেও ক্ষতি নাই।

এ বিষয়ে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অধ্যাত্ম সাধনায় রূপমুগ্ধতা ভারতীয় জীবনে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল কেন? দ্বিতীয়তঃ এই রূপানুরাগ কি সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়বিলাসমুক্ত ভাবতন্ময়তা, উপায় কি কখনই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই? যাত্রা-পথের রমণীয়তা, দেহ-সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ কি কবি-সাধককে তাঁহার চরম লক্ষ্য হইতে, রূপাতীতকে লাভ করিবার একান্ত আগ্রহ হইতে কখনও কখনও ভ্রষ্ট করে নাই? মদন মহোৎসব বর্ণনার উচ্ছ্বসিত আতিশয্যের মধ্যে এই শাশ্বত দিব্য অনুভূতি, পারমার্থিক তত্ত্বচেতনা কি মাঝে মধ্যে ক্ষণিক বিস্মৃতির যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হয় নাই? ভোগের মাঝে বৈরাগ্যের, রতির মাঝে আরতির সুর কি সর্ব্বদা অবিসংবাদিতভাবে ধ্বনিত হইয়াছে? পার্থিব সৌন্দর্য্যের নিবিড় মায়া, দৈহিক প্রেমের অসংবরণীয় রসবিহ্বলতা কি ইহাদের সূক্ষ্মতর শ্রেণী অনুরণনকে ছাপাইয়া উঠিয়া আত্ম-ঘোষণা করে নাই! জয়দেবের কাব্য, তথা সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে এবংবিধ জিজ্ঞাসার অবসর আছে।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া চলে যে, প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম সাধনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ইহার জাতীয় জীবনের বিশেষ প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যপিপাসা ও পরমার্থতত্ত্ব জিজ্ঞাসা সমভাবে প্রবল, তাহার চিত্তাভিব্যক্তির মধ্যে এই দুই বৃত্তির নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ নিতান্ত স্বাভাবিক। জীবনে অধ্যাত্ম আকুতি যত তীব্র, যত সর্ব্বাতিশায়ী হইবে ততই ইহা মানবের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি, তাহার প্রেমের মুগ্ধ ভাবাতিশয্যের সমীপবর্ত্তী হইবে; উহারই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবরুদ্ধ বাণী, উহারই অশ্রান্তের অতৃপ্তি, উহারই কামনার রক্তিম বর্ণাঢ্যতা অনিবার্য্য ভাবে এই শ্রেয়ো-সন্ধানের অঙ্গীভূত হইবে। বাইবেলের কোন কোন প্রাচীন অংশে নর-নারীর প্রেমের আবেগবিহ্বলতা ভগবানের প্রতি নিবেদিত হইয়াছে। ভারতে যতদিন ভগবদারাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ইহার মধ্যে মধুর রসের খুব বেশী প্রভাব ছিল না। কিন্তু যখন হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মানবিক সুকুমার বৃত্তিসমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তিপ্রেম বাৎসল্যমনন প্রধান ব্রহ্মানুভূতির শৈল-দেহে ভাব-মন্দাকিনীর প্রস্রবণ ছুটাইল, ধ্যানের আত্ম-সমাহিত নির্জ্জনতার মধ্যে ব্যাকুল হৃদয়াবেগের বিচিত্র গীতিমূর্চ্ছনা এক অপরূপ সুরলোকের সৃষ্টি করিল তখন হইতে আমাদের সাধনা পদ্ধতিতে এক সুদূরপ্রসারী, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভাবোন্মত্ত কল্পনা, হৃদয়ের গহন গভীরতা হইতে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, দেহের প্রতি রক্তবিন্দু, মনের প্রতি অনুভূতি-কণিকার মধ্যে পরিব্যাপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শত ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া অপ্রাপনীয়ের দিকে ধাবিত হইল। মানবাত্মার এই অভিযানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কবি-জয়দেব ইহার মধ্যে প্রথম গতিবেগ সঞ্চারিত করিলেন। ভাগবতে যে

অভীপ্সা আভাসে-ইঙ্গিতে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ছিল, জয়দেবে তাহাই পূর্ণ, অনাবৃত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই কামনার রূপকে অর্দ্ধাবৃত অধ্যাত্ম অভীপ্সার প্রকৃত উৎস শ্রীকৃষ্ণ পরিকল্পনার লোকোত্তর চরিত্র মহিমা ও মাধুর্য্য। জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে, এমন কি হিন্দু ধর্ম্মের অন্যান্য অবতারের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মত এরূপ অপরূপ আকর্ষণ শক্তি-মণ্ডিত, বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অনুরূপ কিছু মিলে না। অবশ্য অবতারবাদের মধ্যে ভগবানে মানবিক গুণের আরোপ ও মানবিক বৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার সাধনা রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার রামচন্দ্র পিতৃভক্ত পুত্র ও আদর্শ স্বামী, ভ্রাতা ও প্রজারঞ্জক শাসকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, কিন্তু মোটামুটি এই শ্রেণীগত পরিচয়ই তাঁহার ব্যক্তিসত্বাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পারিবারিক ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপারের বাহিরে তিনি যে সমস্ত মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও আশ্রিত বাৎসল্যের নিদর্শন মিলে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়াবেগের স্ফুরণ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তিনি গুহক চণ্ডাল,বানর সুগ্রীব ও রাক্ষস বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন,কিন্তু এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে সখ্যরসের বিশেষ কোন উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই সৌহার্দ্দ বন্ধন মুখ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক উদারতা প্রসূত, কিন্তু ইহা যে হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে উদ্ভূত বা সহজ প্রীতির মাধুর্য্যে অভিষিক্ত এরূপ ধারনা আমাদের হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলা দেবের মধ্যে মানবিকতার এক সম্পূর্ণ অভিনব বিকাশ ঘটিয়াছে। দশরথ রামচন্দ্রের শোকে প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছেন, কৌশল্যা তাঁহার নির্ব্বাসনে যথেষ্ট খেদ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া নন্দ-যশোদার যে অজস্র বাৎসল্যরস শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যে অন্ধ স্নেহাতিশয্য অতি তুচ্ছ আশংকায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে অপত্য স্নেহের সেই অহেতুক ব্যাকুলতা, সেই আত্মভোলা মোহ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এ যেন ভালবাসার বাধাধরা বরাদ্দ, ঔচিত্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত অভিব্যক্তি। রামচন্দ্র তাঁহার বিনয়-নম্রতা, তাঁহার আত্মবিস্মৃত দীনতা, আদর্শনিষ্ঠা ও উদাত্ত চরিত্র-গৌরবের জন্য আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার আভিজাত্য কোন দিনই সাধারণ মানবের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে নাই। কৃষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের ছেলে; তাঁহার দুরন্তপনা, শৈশবচাপল্য তাঁহাকে আমাদের অন্তরের স্নেহ-প্রেমের রাজ্যে অসপত্ন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার বাঁশীর সুরে বৃন্দাবনের তরু-লতা, পশুপক্ষী, গোপবধূর চিত্ত ও রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়াবেগের সহিত আমরাও একাত্মভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি নিজে মধুর রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া ভক্তের চিত্তে মধুর রসেরই উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর মুরলী-ধ্বনিতে যেমন শীলা দ্রবীভূত হইয়াছে, যমুনা উজান বহিয়াছে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সংস্কৃত কাব্যের চিরাচরিত রীতির বৈপরিত্য সাধিত হইয়াছে, তাহার শ্বেতমর্ম্মর রচিত মসৃণতার বক্ষ ভেদ করিয়া দুরন্ত ভাব-নির্ঝরিনী চটুল নৃত্যচ্ছন্দে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়াছে। ভগবানকে মধুর রসে উপাসনা করিতে হইলে যে সৌন্দর্য্যময় প্রতিবেশ, যে ভাবাকুলতা, হৃদয়ের মধ্যে যে বিপুল উদ্বেলিত আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রয়োজন, গীতগোবিন্দ সেই প্রয়োজনেরই প্রথম সার্থক বাণীরূপ।

শৃঙ্গাররসের সহিত ভক্তিরসের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কাব্য সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের বান ডাকিয়া গেল। সংস্কৃত কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্য্যপ্রবণতা অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সমর্থন পাইয়া ভক্তিরসে শোধিত হইয়া আরও নিঃসংকোচে নিজ মায়াজাল বিস্তার করিল। এই সঙ্গম-তীর্থে ভোগরসিক ও ভক্তিরসিক উভয়েই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। কামকলার মাধ্যমে ভগবৎ-ভজনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কাম মানবের আদিমতম ও প্রবলতম রিপু, এই প্রবৃত্তির দুর্নিবার রমনীয়তাকে যদি ভগবদমুখী করা যায়, তবে সাধনা-পথের প্রধান বিঘ্নকে সিদ্ধির প্রধান সহায়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মানবচিত্তের প্রবলতম প্রেরণা, তাহার জীবনীশক্তির কেন্দ্রীয় উৎস যদি উর্দ্ধায়িত হয়, তবে তাহার যোগ পথে অগ্রগতি যে বেগবান ও অপ্রতিরুদ্ধ হইবে, তাহা সহজেই

বোঝা যায়। বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলী সাহিত্যে সাধনার এই রূপটিই অনুপম মাধুর্য ও গভীরতম অনুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষধর কালীয়নাগের সহস্র ফণার উপর দাঁড়াইয়া নিজ নৃত্যচপল চরণপাতে এই ফণাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব কবি কামনানাগিনীর বিষদন্ত উৎপাটন করিয়া ইহাকে সাধনার কিঙ্করীতে পরিণত করিয়াছেন। বিষ যদি অমৃত হয়, বাধা যদি সহায়ক হয়, তবে চরম সিদ্ধি সাধকের করতলগত হইতে বিলম্ব হয় না। জয়দেবের কাব্যে বৈষ্ণব সাধনার এই প্রথম সূচনা তাঁহার অতি-পল্লবিত সৌন্দর্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তিন

জয়দেব বৈষ্ণব সাধনার উৎস, ইহা সর্বস্বীকৃত। তথাপি তাঁহার কাব্যে যে ইহার চরমোৎকর্ষ, ইহার অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এরূপ দাবী ভক্তজন সমর্থিত হইলেও সমালোচকের সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিবে না। গীতগোবিন্দে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—তাঁহার মাধুর্য যেন এই চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অন্তরাল হইতে ঈষৎ উঁকি দিতেছে। ঐশ্বর্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত ভাবমণ্ডলে মাধুর্যের স্নিগ্ধ কমনীয়তা যেন কতকটা সসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল অবস্থার বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদ্যোতক অলৌকিক শক্তির বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে—তাঁহার 'কংসারি', 'কেশীমথন' প্রভৃতি আখ্যার মধ্যেই তাঁহার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়দেব যখন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আধ্যাত্মিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দ্রবীভূত মাধুর্য-ধারায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, উহার মাধুর্যে রূপান্তর সাধন কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সম্পাদক [illegible] যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, জয়দেবের 'দেহিপদপল্লবমুদারং' এই অর্দ্ধপংক্তি সংযোজনার সঙ্কোচ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য-মাধুর্যের মধ্যে দোলায়িত, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তবৃত্তির নিদর্শন ও প্রতীক। শেষে ভগবান স্বয়ং আসিয়া ভক্তের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাঁহার দ্বন্দ্ব সঙ্কোচের অবসান ঘটাইলেন, নিজ কিরীটরশ্মিমণ্ডিত মস্তক শ্রীরাধার পদারবিন্দে লুটাইয়া আপনার রাজ সম্মান চিরতরে বিসর্জন দিলেন। সমস্ত পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা এই 'দেহি পদপল্লবং'-এর সুরে বাঁধা। শুধু জয়দেব নয়, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের চরমোৎকর্ষ স্ফুরিত হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে রাধার বিরহব্যাকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেমের সর্বত্যাগী মহিমার সুরটি প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতিতে নানা নিম্ন পর্যায়ের ভাবের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব সাধনার অপ্রাকৃত ভাব-মাধুর্য আমাদের মনে অসীম ব্যঞ্জনার রেশটি জাগাইয়া তোলে। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব সাধনার পূর্ণ আদর্শটি যে কবি-চিত্তকে অধিকার করে নাই, ইহা ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাঁহারা চৈতন্য-চন্দ্রের অপরূপ স্নিগ্ধ প্রেম কৌমুদী প্লাবিত, দিব্যোন্মাদে আত্মহারা জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মর্মগত তাৎপর্য্য, ইহার মাধুরীর পূর্ণ অনুভূতি উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যে ভোগলালসা, সৌন্দর্যমোহ এই প্রেমের স্থূল দেহের বহিরাবরণ রচনা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ দৃষ্টি, তাঁহার ভাবস্বচ্ছ অনুভূতি সেই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্মকোষলগ্ন বিশুদ্ধ রূপটি তাহার অন্তরশায়ী অপ্রাকৃত সৌরভটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, দেহের অন্তর্লীন আত্মাকে রূপ-রসের বন্ধনে বন্দী করিয়া ভক্তের গোচরীভূত করিয়াছিল। জয়দেব ও চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে এই দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ নিরসন হয় নাই।

জয়দেবের প্রাচীন টীকাকার গোষ্ঠী ও তাঁহাদের অনুসরণে সাহিত্যরত্ন মহাশয় জয়দেবকে পদাবলী সাহিত্যের উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার স্বভাব-বিচারে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবভাবাদর্শের পূর্ণ পরিণত রূপটিকেই মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রতিটি উক্তির প্রতি ভাবোচ্ছ্বাসকে তাঁহারা বৈষ্ণবদার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। এই মনোভাব ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইতিহাসের ক্রমপর্য্যায়রীতির বিরোধী। শ্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠত্বের যে প্রমাণ ভাগবতে অনুল্লিখিত আছে, তাহা গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে গীতগোবিন্দকে শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্য্যাদা দিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব প্রতিপাদনে গীতগোবিন্দের যে অবদান তাহাই উহাকে চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত ভক্তিশাস্ত্রসমূহের পুরোভাগে স্থান দিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাম্যসত্বেও ভক্ত-সাধকের দিব্যানুভূতির নিকট যে ভবিষ্যৎ তত্ত্বরহস্য সহজ সংস্কার রূপে প্রতিভাত হয়, ইহা মানিয়া লইলেও, জয়দেব যে যুগপ্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া প্রায় চারি শতাব্দী পরবর্ত্তী লেখকগোষ্ঠীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা অনৈতিহাসিক। অবশ্য স্থানে স্থানে কেলিবিলাস বর্ণনার আতিশয্যের মধ্যে গভীর ভাবদ্যোতনা, অসীমের স্পর্শাভিলাষী চিত্তের একাগ্র আকুতি অনুভব করা যায়। চরিতামৃতকার যে শ্লোকের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন—

> কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্
> রাধা মাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।
>
> গীতগোবিন্দ ৩।২

তাহার মধ্যে শঙ্খমধ্যে সমুদ্র স্বননের ক্ষীণ আভাষের মত একটা অনন্তাভিমুখী সংকল্পের দৃঢ়তা, একটা গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনুরণন বাজিয়া উঠে। "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা" প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের তন্ময়তা, ধ্যানসমাহিত চিত্তের মধুর আত্মবিস্মৃতি আমাদের চিত্তে আকস্মিক দোলা দিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম। কবিরাজ গোস্বামী রাধার রূপমাধুরী, দেহ প্রসাধন, এমন কি খট্টা পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি গৃহসজ্জার উপকরণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জয়দেব তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতেন কি না সন্দেহ। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'নন্দনিদেশতঃ' শব্দটার অর্থকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুমোদিত ও সমাজ প্রচলিত ঔচিত্যবোধের অনুসারী করিতে টীকাকারগণ কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে উদ্ধৃত সমসাময়িক কবিরচিত অনুরূপ শ্লোকের প্রমাণ হইতে ব্যর্থপ্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজসভায় চটুল আমোদপূর্ণ প্রতিবেশে যুগের বিকৃত সৌন্দর্য্যরুচির তৃপ্তির প্রয়োজনে ও সুপ্রাচীন আদিরসপ্রধান কাব্যধারার ঐতিহ্যানুবর্ত্তনে রচিত কাব্যের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের সদ্যোজাগ্রত আকুতি, নবধর্ম্ম সাধনার প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ ইঙ্গিত যতটুকু অনুপ্রবিষ্ট করা যায়, জয়দেব তাহাই করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ রচনার সময় তিনি যে উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিষিদ্ধ নির্দ্দেশের কথা চিন্তা করেন নাই তাহা নিরাপদে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জয়দেবের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সাধনাবলে সুদূর ভাগীরথির পুণ্যপ্রবাহ উজান বহিয়া কেন্দুবিল্ব প্রান্তবাহী অজয়ের জলস্রোতে মিশিয়া যাইত ও সাধক প্রবর সেই পবিত্র সঙ্গমতীর্থে স্নান তর্পণ ইষ্টপূজা সমাপ্ত করিতেন। এই কিংবদন্তী তাঁহার সাধক জীবন হইতে কাব্যজীবনেও সংক্রামিত হইয়াছে। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম যে কালের স্বাভাবিক গতির বিপরীত-মুখে প্রবাহিত হইয়া দ্বাদশ শতকের কাব্যধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তীযুগের ভাবস্রোত যে উজান বহিয়া অতীতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এই অলৌকিক প্রক্রিয়া ভক্তের দ্বিধাহীন বিশ্বাসের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির মানদণ্ডে ইহা ঠিক বিচারসহ নহে। জয়দেবের বৈষ্ণব কাব্যরীতির আদিম উৎস ইহা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু এই ক্রমবিস্তারশীল স্রোতোধারায় সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিবার আশাকে ঠিক সঙ্গত বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠতা ছাড়াও কেবল কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অনবদ্য ও ইহার রস-আবেদন চিরন্তন। ইহা বাঙ্গালী প্রতিভার মৌলিকতার বিশিষ্ট নিদর্শন। সংস্কৃত কাব্যের মত প্রথাবদ্ধ, ঐতিহ্যশাসিত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করা অল্প কৃতিত্বের ব্যাপার নহে। সেই অনন্যসাধারণ

কৃতিত্বই জয়দেবের প্রাপ্য। সংস্কৃতের সুসংযত, সুগম্ভীর, মহিমান্বিত পদক্ষেপের মধ্যে তিনি অনাগত বাংলা সাহিত্যের নৃত্যছন্দ, ইহার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির বিপুল আত্মহারা ব্যাকুলতা, ইহার ভক্তিরসের আভাস ব্যঞ্জনাজড়িত উর্দ্ধায়ন প্রবর্ত্তন করিয়া কাব্যের ভাবপরিধি বর্দ্ধিত ও ইহার ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবের মধ্যে বীজাকারে যাহা নিহিত, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিতে তাহাই অঙ্কুরিত ও প্রেমধর্ম্মের অবতার শ্রীচৈতন্যে তাহা জীবন-ছন্দে হিল্লোলিত। জয়দেব-বৃক্ষের অন্তর্গূঢ় রসপান করিয়া তাহার ভাব বর্ষণের অবিরল ধারায় অভিস্নাত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের দেহে মনে পুলক-কদম্ব শিহরিয়া উঠিয়াছিল। পদাবলী সাহিত্যে এই পুলক-শিহরণই পুষ্পকোরক মধ্যে সৌরভের ন্যায় কোমলকান্ত ভাষার আলিঙ্গন পাশে চিরকালের জন্য ধরা দিয়াছে। বাঙালীর সমস্ত সংস্কৃতি ও সাধনা তাহার সাহিত্যে ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয়দেবের আদিম অনুপ্রেরণার নিকট ঋণী। তাঁহারই মাধ্যমে বাঙালী তাহার হৃদয়াবেগের মাধুর্য্য, তাহার কল্পনার রমণীয়তা সমস্ত ভারতে প্রসারিত করিয়াছে। গীতগোবিন্দের আবেদন শাশ্বত, চিরন্তন, সাময়িক রুচি পরিবর্ত্তনের অতীত। এহেন যুগসৃষ্টিকারী গ্রন্থের উপাদেয় সম্পাদনার জন্য পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সমস্ত রসপিপাসু বাঙালীর অভিনন্দনযোগ্য। জয়দেব হইতে যে বাঙালীর মানস জন্মের আরম্ভ, ইহা উপলব্ধি করিলে আমাদের অতীত সংস্কৃতির উদ্ভব রহস্য আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে ও আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথও সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তির কুহেলিকাজাল হইতে মুক্ত হইয়া দিগন্ত প্রসারিতরূপে দেখা দিবে।

মিলনের শেষ—মিলনে

মন্মথনাথ কাব্যভারতী

পথহীন পথে পথ ক'রে ক'রে চলিতে দু'জনে গহনে—
নিদাঘের সাঁঝ আলুথালু ঝড়ে ভেঙে এল সারা গগনে।
দুর্য্যোগ ঢেউ ওঠে মেতে মেতে,
এস তা দু'জনে নিই বুক পেতে,
কেন মোরে ঘিরে সব একা সহে ডাকিছ মরণে যতনে?
নিজেরে কি আজ মোর তরে প্রিয়
বলি দিতে চেয়ে হায়—
বিরহের বলি করিবে কি মোরে
চিরকাল বেদনায়?
হেন বলিদান কে বলে মহান্
কাঁদাতে তা মোরে নয় কি পাষাণ?
মরিব বাঁচিব দু'জনে মিলিয়া যা কিছু আঘাত বরণে।
মিলনের যদি থাকে অবসান
বিরহ তা কেন পাবে রূপ প্রাণ,
মিলনের মাঝে মিলনের শেষ হোক্ না দোঁহার মরণে।

নূতন দিন

শক্তিপদ রাজগুরু

বাউরী পাড়ার মধ্যে একা সে রাত্রে জেগেছিল অমূল্যই, আর পুরুষ মানুষ বড় একটা কেউ ছিল না, যারাও বা ছিল, তারাও নেশায় বেহুঁস হয়ে।

ময়লা একটা শতচ্ছিন্ন কাঁথায় পড়ে কাতরাচ্ছে কিশোরী। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে আগত মৃত্যুর ছায়া, মায়ের পাশে বসে ব্যাকুল ভাবে ডেকে চলেছে অমূল্য—মা—মাগো—মা।

কিশোরীর সাড়া দেবার মত সামর্থ্য নাই, ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে একবার যেন চাইবার চেষ্টা করে, অবশ হাত দুটো তোলবার বৃথা চেষ্টা করেও পারে না…লম্পটার আলো কমতে কমতে একেবারে নিভেই গেল। বাউরীর কেরাসিন তেলের কার্ড নাই, টাকু না দিলে কার্ডে তেল পাওয়া যায় না—সামান্য যেটুকু মুনিব বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে এনেছিল, সেটুকুও শেষ হয়ে গেল। অস্পষ্ট অন্ধকারে মায়ের গোঙানির শব্দ শোনা যায়, শেষবারের মত মাকে দেখতেও পাবে না।

পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজার আগুড়টা ফেলে দিল অমূল্য...ডুবন্ত চাঁদের এককালি আলো এসে পড়েছে মৃত্যুকাতর ওই বৃদ্ধার মুখের উপর…শেষবারের মত মাকে দেখে নেয় অমূল্য।

ছোট ভাই কালোকে ধাক্কা মেরে তোলে, সারাদিন খেটে খুটে ঘুমে অবশ দেহটা যার কতক অস্ফুট শব্দ করে আবার পাশ ফিরে নীরব হয়ে গেল।

একা অমূল্যই দেখল…মা তার মারা গেল। মাটির কলসী হতে কলাই করা গেলাসে শেষ বারের মত এক চোক জল মুমূর্ষু মায়ের মুখে ঢেলে দেবার চেষ্টা ক'রলো…অন্ধকারে জলটা গড়িয়ে পড়ে গেল।

চাঁদ তখন ডুবে গেছে।

সে বিগত এক সবহারানো রাতের কথা আজও ভোলেনি অমূল্য, কখনই সে ভুলবে না।

আজ তার সেই ভাঙা ঘরের রূপ বদলাতে সুরু হয়েছে, সে জানে রূপ বদলানোর দিন আসছে একা তাদের গ্রাম নয়, সারা চাকলা—সারা দেশ জুড়ে।

…মা মারা যাবার পরই বার হয়ে গিয়েছিল অমূল্য গ্রাম ছেড়ে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে—অন্নের সংস্থানে—পানাগড়ের মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে।

কয়েক বৎসর আগে ত্রিপানী গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে মায়ের সঙ্গে, রেলে যেতে যেতে দেখেছিল পানাগড়ের মাঠ, লকলকে ধানের শিষে দিক হতে দিগন্ত, একেবারে হাসুয়ার শালবন হতে সুরু করে দামোদরের ধার পর্য্যন্ত কেবল বুকভোর ধান, কয়েক বৎসর পরই সেখানে গিয়ে চিনতে পারে না, রাতারাতি যেন বদলে গেছে দুনিয়াটা। সারি সারি আধপাকা বাড়ী, ইলেক্‌ট্রিকের আলো, বড় বড় যন্ত্রপাতি, হাজার হাজার গাড়ী আর কত শত শত সাহেব। মাথার উপর নীল আকাশে চক্কর দিচ্ছে এরোপ্লেন, দিন রাত কামাই নাই, দু'জনে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে : অমূল্য আর কালো।

দিনে আট ঘণ্টা ঘড়ি ধরে খাটুনি, নোতুন রাস্তার উপর মাটি ফেলা।

খেতে পায় সত্যি, তবু মনের মাঝে কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে অমূল্যর। এই অচেনা শত শত মুখ, যন্ত্রের শব্দ, মটরের আওয়াজ, সব কিছু তার গ্রামের কল্পনাকে তার মন হতে একেবারে যেন মুছে ফেলেছে। তারাকিনী রাত্রির অতলে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে কার একখানা মুখ, মা—তার মায়ের সেই হাসিমাখা মুখখানা। গ্রামের বুকে জেগে রয়েছে তার মনে, গ্রাম হতে মাকে সে আলাদা করে ভাবতে পারে না।

আজ বোধ হয় গ্রামে আবার ধানপাকার দিন এসেছে। মাদনাতলার কাচিতে এবার লকলকে ধান দেখে এসেছে, এতদিনে মঞ্জরীতে ছেয়ে গেছে মাঠের বুক, কাইবোড়ের

বিস্তীর্ণ জলধারার আশেপাশে বেগুন গাছ এবার নিশ্চয় লাগিয়েছে নিমাই ঘোষ। কুলগাছটা ফলের ভারে নুইয়ে পড়েছে। বাগানের ঝরাপাতার বুকে এবারও বড় শিমুল গাছটা এতদিনে লাল হয়ে গেছে ফুলের রংএ।

কি যেন দুর্ব্বার আকর্ষণ, এখানের এই কোলাহল, যন্ত্রের বিজাতীয় শব্দ, বিলাসের প্রাচুর্য্য—এসব কিছু তার মনে কোনই দাগ কাটতে পারেনি। চলেই যাবে সে তার ফেলে আসা গ্রামে।

কালো একটু বিস্মিত হয়ে যায় দাদার কথায়, কি বলছে দাদা। মুখ গোল করে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রামের কেলো আজ বদলে গেছে এখানে এসে। একটা দু' সাইজ বড় পুরোনো মিলিটারী প্যান্ট পরে কোমরের কাছে বেশ খানিকটা গুঁজে সেটাকে সামলাবার চেষ্টা করেছে, একটা মিলিটারী জাকেট—মাঝে মাঝে আধ-পোড়া সিগারেটও জোটে, তা ছাড়া কোন এক মিলিটারী সাহেবকে একটা বাঁদরের বাচ্চা ধরে দিয়ে নাকি বেশ খাতির জমিয়েছে। চাকরীও হয়ত পেয়ে যাবে, এমন সময় দাদা বলে কিনা বাড়ী চল। তাকে ধমক দিয়ে ওঠে অমূল্য। ছোঁড়াটা গজ গজ করতে থাকে।

—"চল বিথানকে যারা, কিন্তুক সিথানে কি মৌজাটা আছে?"

—"খাবাই বা কি—ছটুভুষা!" হাতের বুড়ো আঙুল দুটো বার করে মুখ বিকৃত করে কালো।

...আজ অমূল্যর হাসি আসে। সেই কালো আজ দেহে মনে বদলে গেছে কয়েক বৎসরের মধ্যে। লম্বা চওড়া যোয়ান হয়ে উঠেছে। তার কোদালের ঘায়ে আলের মাটি কেঁপে ওঠে, হাতের মুঠির চাপে লাঙলের ফলা শক্ত মাটির বুক হতে দু'পাশে ঠেলে তোলে সোঁদা গন্ধভরা সতেজ ভিজে মাটির রাশ। ভোর বেলাতেই কালো বার হয়ে গেছে মাঠে—আঁখ ক্ষেতের সিয়েত করতে। ঝিকলকে আঁখ গাছের পাতায় একটু হলদে আভা এসেছে কি ওর হুঁস হয় জল টান পড়েছে। অমূল্যর সত্যিই আনন্দ হয়—ভাই তার হুঁসিয়ার কৃষাণ।

প্রথম যখন তারা ফিরে এলো পানাগর হতে সেদিনকার কথা মনে পড়ে। সারা বাউরী পাড়ায় একটা ঘরও আস্ত নাই। মাঠে মাঠে ধানের রাশি কাটবার লোক পাওয়া যায় না—সবাই অন্নের সন্ধানে গ্রাম হতে চলে গেছে দূরে দূরান্তরে। কেউ ফিরে আসেনি তখনও।

অমূল্য এসে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে ধ্বংসপ্রায় চালা-খানার পাশে। একটা বর্ষার বর্ষণেই গলে গলে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তাদের ঘরখানা। মাটির বুকে জন্মেছে অযত্নবর্দ্ধিত ঘাসের বন। ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে পারে অমূল্য—এই মাটিটুকু—এইখানে মা তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চারিদিক নীরব। তারার আলোয় অন্ধকার আকাশের নীচে মাটির বুকে মুখ রেখে অমূল্য যেন পরশ পায় তারই মায়ের পাণ্ডুর ওষ্ঠের। চুপে চুপে শোনায়—

"মা—মা শোন, আমি আবার ফিরে এসেছি মা।"

তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। মনটা যেন কেমন হালকা হয়ে আসে।...

রতন মুখুয্যে তার পুরোনো মুনিবের ঘরেই আবার কাজ নিল অমূল্য আর তার ভাইকে নিয়ে। কিন্তু বুঝতে পারে—এই যুদ্ধ-মন্বন্তর তাদিকে গ্রামছাড়া করেছিল, কিন্তু এদিকে জমির ধান ফসল হতে যাদের দিনগুজরান করতে হয়, তাদিকে একেবারে ফোপরা করে দিয়ে গেছে।

রতন মুখুয্যের বড় ছেলে ভুবন সেদিন বাবার বকুনি খেয়ে মাঠে গেছে, আলের মাথায় একটা অর্জ্জুন গাছের ছায়ায় নীচে দাঁড়িয়ে দোনী ধরা দেখছে। কালো একাই বোত ধরেছে। পুরুষ্ট হাতের পেশীগুলো দোনীর ভারে চক্ চক্ করে ফুলে উঠছে, কপাল দিয়ে ঝরছে স্বেদরেখা, একদমে দোনী টেনে চলেছে সে। ওপাশে ভুবন দাঁড়িয়ে দেখছে।

চীৎকার করে ওঠে কালো—"ঠাকুর,—ও ঠাকুর, কোদালটো নিয়ে আড়বাঁধাটায় দু'চাপ মাটি ফেলাই দাও, জলটো বেরিয়ে যাবেক ওই—হাঁ করে দেখছ কি?"

ভুবন বাপের আদরের বকাটে ছেলে, পলাশডাঙার স্কুলে এক ক্লাসে বৎসর কয়েক করে ডিগবাজী খেয়ে এই-বার বাড়ী ফিরে এসেছে, নেহাৎ রতন মুখুয্যের পয়সায় টান ধরেছে বলেই পড়াশোনার ইতি করে গাঁয়ে এসে বসেছে। এমন ছেলে বস্তু রতন যে কোদাল ধরবে তা

কল্পনাই করতে পারা যায় না, কালোর কথায় চটে ওঠে, ভুবন চীৎকার করে জবাব দেয়—"দিন গেলে চার সের ধান খেছিস, তোর জল বাগাতে যাব আমি? ব্যাটা বাউরী কোথাকার!"

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে এমনি মেজাজটা রুক্ষ হয়েছিল—তার পরেই এই গালাগাল শুনে তেজী রক্ত কেমন যেন বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে হোনী হতে লাফ মেরে নেমে এসে রতনের সামনে দাঁড়িয়ে শাসাতে থাকে—

"মুখ সামলে কথা বলো ঠাকুর, মুটুনি তুমার হবুতে রাখো!"

ভুবনও রুখে আসে—"দেখবি ব্যাটা বাউরী!"

আগেই ভুবন বসিয়ে দেয় কালোকে কয়েকটা চড়। প্রথমটা কালো নিজের অজ্ঞাতেই সরে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভুবন ছাড়বার পাত্র নয়, ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় অর্জ্জুনগাছের নীচে ঘোড়ের জলের ধারে কালো রাগে ফুলছে আর ভুবনকে চেনাই যায় না, এক বুক জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—দাঁত দিয়ে পড়ছে রক্ত। জামাখানা পিঠের দিকে অনেকখানি ছিঁড়ে গায়ে বসে গেছে।

গ্রামের ইতিহাসে বাউরীর হাতে বামুনের মার খাওয়া এই প্রথম। একটা বিরাট ইজ্জতের প্রশ্ন। সুতরাং বৈকাল বেলাতেই ষোল আনির ভদ্রলোকদের ডাক হল, আসামী কালো বাউরী ওপাশে আরও কয়েকজন বাউরীর সঙ্গে বসে রয়েছে, রতন মুখুয্যের পায়ের কাছে বসে অমূল্য। ছোট ভাই, যোয়ান বয়স, কি একটা হট ক'রে ক'রে ফেলেছে—এবারের মত মাপ করতেই হবে। রতন মুখুয্যে আরও সবাই একযোগে লেগেছে—বাউড়ীর বিত্তাপ ভাঙতে হবে!

বিচারে দণ্ড হল দশ টাকা।

পাড়ার অদূরে বাঁশঝাড়ের পাশে একপাল শূয়োর চরছিল, ছুটে গিয়ে তার মধ্যে থেকে মাঝামাঝি একটা বড় শূয়োর ধরে এনে টানতে টানতে হাজির করে বৈঠকের মধ্যে।

—"এই লাও ঠাকুর, আজকের বাজারে নাহোক এক কুড়ি টাকা ইটোর দাম হবেক। দশ টাকার মার মেরেছি, বেশী করে আরও যা কতক মেরে বাকী টাকাটাও জরিমানায় পুষিয়ে লুব!"

ভুবণ মুখোটি হাতের হুঁকোটা নামিয়ে সজোরে কালোর গালে এক চর কসে দেন, গর্জাতে থাকেন তিনি—

"হারামজাদা কোথাকার, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে অন্যরকম দাঁড়িয়ে যায়। বাউরীরা সবাই উঠে চলে এল, দেয়ে বাউরী বলে—"ই কিরকম বিচার তুমাদের! খামোকাই দণ্ড করলে, আবার মারছ কেনে?"

অর্দ্ধসমাপ্ত বিচারের আসরে একা বামুন সজ্জনের দলই পড়ে রইল; যাদিকে নিয়ে বিচার হবে তারা কেউ নাই।

গ্রামের বুকে এককালে পুরুষানুক্রমে যারা চালিয়ে এসেছিল নিজেদের অখণ্ড প্রতাপ—অন্যায় অবিচার, বসে বসে যারা অন্যের পরিশ্রমের মুনাফা খেয়ে এসেছিল, আজ যেন তাদের কঠিন ভিত্তিমূলে কোথায় ফাটল ধরেছে; মাত্র কিছু জমি আছে—আর জমি আছে বলেই যেন অপরকে—যে পরিশ্রম করে তাতে ফসল ফলাল—তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার জন্মগত হয়ে গেছে, এই হিসাবে কোথায় একটা মস্ত গলদ ধরা পড়ে গেছে। তখন পড়েনি, যখন গ্রামে গ্রামে ছিল প্রাচুর্য্য, বাইরের পৃথিবীর ঝড় যতদিন পর্য্যন্ত তার বুকে বিক্ষোভ তোলেনি, ততদিন পর্য্যন্ত এই গোজামিল হিসাবের গলদ ধার হয়ে পড়েনি; যেদিন সেই শ্যামচ্ছায়াঘন দিন বিলুপ্ত হয়ে গেল গ্রামের বুক হতে, তারও মাঝে এল হাহাকারের ছায়া, সেদিন মানুষ নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়েই প্রথমে আবিষ্কার করল এই গলদ।

শতমনে যেন এই বঞ্চনার প্রতিবাদই ফুটে ওঠে বিভিন্নরূপে। কালোর প্রতিবাদ করেছিল হয়ত তার অবচেতন মনের এই বিক্ষুব্ধতার প্ররোচনাতেই। সেদিন ভুবণ মুখোটীর চড় খেয়ে চলে এসেছে, আর সে কায করতে যায় নি, অমূল্যও তাকে মাঠে নিয়ে যেতে পারেনি; বলে অমূল্য—

"কাজে যাবি নাই, চলবেক কি করে ?"

—"ঘরে ত খেছি নাই, তুর কি ?"

সারাদিন কোথায় যে থাকে সে, জানে না অমূল্য। সেও মাঠে কাষ নিয়ে ব্যস্ত, কালোর কোন খবরই রাখতে পারে না।

মাঝে মাঝে কালো অনুভব করে তার গায়ে যেন এখনও কার হাতের চড়, বিনা অপরাধে ওরা মারবে, দিনান্ত পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে মাত্র তিন সের ধান দেবে কেন ? হালের গরুও খেতে পায় থাকতে পায় তাদের চেয়ে ভালোভাবে; গাছের পাখীগুলো খাবার পায়, বনের আনন্দে থাকে। তারাও মানুষ, তবে কেন তারা খেটে পরিশ্রম করেও এই ভাবে থাকবে।

রতন মুখুয্যে ভেবেছিল—হয়ত একটা গোলমাল বাধবে, কিন্তু কালোই এলোনা, অমূল্য যথারীতি কাজ করতে আসে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ, পাতাঝড়া গাছে আবার এসেছে কচি পাতার সমারোহ, দিগন্তপ্রসারী মাঠের বুকে খররৌদ্রের পাণ্ডুনীল আভা দূরদিগলয় রেখার প্রান্তে বিকম্পিত হতে থাকে।

এল বৈশাখ। কথায় বলে—

"বোল চাষে মূলো
তার অর্দ্ধেক তুলো,
চার চাষে ধান।
বিনি চাষে পান।"

চার বার চাষ দিতেই হবে ধানের জমিকে। নাহলে মাটি তৈরী হবেনা, ধানের গোছ বাঁধবে কি করে।

গরু দুটো চলতেই পারে না, শক্ত মাটি জমে পাথর হয়ে আছে স্তূপীকৃত সার, গোবর ছড়িয়ে ভালো করে লাঙল দিয়ে মাটির সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিতে হবে, শক্ত করে লাঙলের মুঠিটা টিপে ধরে গরু দুটোকে চালাবার চেষ্টা করে। কঙ্কালসার গরু দুটো শক্ত মাটি ভেদ করে ধারাল ফলাটাকে টানতে গিয়ে যেন ঘুরপাক খেয়ে মরে। চীৎকার করে ওঠে অমূল্য, "শালা বিজাত কুথাকার, ফালিয়ে যাবেক বি।"

গরুর খুরেই ফলাটা বিঁধে যেতে পারে। লাঙলের জোত একটা আলগা দিয়ে ল্যাজ দুটো মলতে থাকে সে—"তা—তা—!"

সপাসপ ঘা মারতে থাকে, লম্বা গরু দুটো ধনুকের মত বেঁকে যায়, পাঁজরের হাড়গুলো জিল জিল করছে, কালো পাণ্ডুর চোখ দুটো মেলে অসহায় মিনতি জানায়। অমূল্যরও কেমন যেন মায়া হয় ওদের উপর। জিব দুটো বার হয়ে পড়েছে, গ্যাঁজলা ভাঙছে। জোতটা খুলে কাঁধ হতে ওদের জোয়ালটা নামিয়ে নিয়ে নিজেই গ্রামের দিকে বয়ে আনে, গরু দুটো কোন রকমে নড়ে চড়ে গিয়ে পাশেই শিববাঁধের ঘোটালে সামান্য জলে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে চুমুক দিতে থাকে। অমূল্য দেখে—সাদা ছেলেটা, দুধের মত রংএ এসেছে দুর্ব্বলতার ছায়া, কালসিটে মেরে গেছে, ভাগাড়ে ফেলে দিলেই হয়। ওর জীবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ক্লান্তভাবে কোন রকমে ওরাএগিয়ে চলে ছায়াঘন বটগাছটার দিকে।

এ আছাড় বৃষ্টি হয়ে গেছে।

শক্ত মাটি দিন কয়েক নরম ভুর-ভুরে হয়ে থাকবে। এই সময় যে ক'খানা জমিতে চাষ দিয়ে নিতে পারতো, লাভ ছিল; জমির মাটিতে বর্ষার জলে সোনা ফলত। কিন্তু মুখুয্যের গরু দুটো সেই যে পড়েছে, আর ওঠবার নাম করে নি।

বৃষ্টি ধোয়া আকাশের বুকে প্রভাতের প্রথম আলো, কচি অশ্বত্থপাতার বুকে রংএর ঝিলিমিলি। আমের গুটিগুলো ঝরা পাতার বুকে কুঁকরে খসে পড়েছে। মধুলোভী পোকার দল আমমুকুলের মধুনেশা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পাশের মহুয়া বনের মিষ্টি গন্ধব্যাকুল পথে সুরু হয়েছে তাদের প্রথম আনাগোনা—

অমূল্যর সারা মনে অশান্তি। বছরটা মাটি হয়ে গেল; রতন মুখুয্যে কদিন থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে গরু বদলাবার, কিন্তু টাকা কোথায় পাবে, বাইরের পয়সা নাই, এতদিন চাষ হতেই চলেছিল, কিন্তু আর যেন পেরে ওঠে না।

সেদিন অমূল্যর সামনেই ভুবনকে একটা চড় কসে দেয় মুখুয্যে, "ধাড়ি মদ্দ কোথাকার, ঘরে বসে কি করছিস, হাত পা গজিয়েছে, দুপয়সা আনতে পারিস না ? অন্য কাষ না পারিস, বামুনের ছেলে ভাত রাঁধগে কলকাতায়, দশ বিশ টাকাও আসবে।"

অমূল্যও শুনিয়ে দিয়েছিল : "গিন্নি যদি গরু না কেন ঠাকুর, আমি লাগব তুমার ঘরে খাটতে, অন্ত কুথাও মুনিষ গতে যাব কিন্তক। প্যাটের জালাত তুমার কথা জানবেক নাই। আমার দেনা পাওনা ফেলে দিবা, আমি চলে যাবো।"

রতন মুখুয্যে জানে জমিতে ধান না হলে তার অবস্থাটা কি হবে; সারা বৎসর তাকে উপোসই দিতে হবে। সুতরাং গরু কিনতেই হবে। সে যেমন কোরেই হোক।

মুখুয্যেগিন্নী কর্তার কথায় পানদোক্তার ছোপ লাগান দাঁতগুলো বিস্তার করে খিঁচিয়ে ওঠে। গহনা পাব কোথায়! কত সোনাদানা আমায় দিয়েছ, মাত্র এক গাছি গোট হার আর বাকি আছে, ও আমি ভুবনের বউকে দোব, আর আছে কি, সব ত গেছে গেল বছর, বিক্রী করে ধান কিনতে!

চিন্তিত হয়ে পড়ে মুখুয্যে, তাও বটে, সেবার গোঁসাই-এর দোকানে সব বিক্রী করে পঁচিশ মণ ধান কিনেছিল, না হলে সারা গেরস্তই উপোষ দিত। টাকা কেইই বা দেবে, প্রায় তিনশ টাকার এখনও দরকার। অমূল্যর চার মাসের মাইনে বাকী, সেও কাম করবে না টাকা বা ধান না পেলে। ধীরপদে গোঁসাইএর দোকানের দিকেই রওনা হয়, যদি জমি বন্ধক রেখে শ'চারেক টাকা পাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেখতে হবে।

প্রায় চার মাস হয়ে গেল কালো সেই যে বেড়িয়েছে আর ফেরেনি। মাঝে মাঝে অমূল্যর মনটা কেমন হয়ে উঠে, মা মারা যাবার পর হতে মানুষ করছিল ভাইটাকে, কত দুঃখ কষ্টের সাথী, মনে পড়ে পানাগরে গিয়ে কাঁদত কালো—মায়ের কথা মনে এলেই ছেলেটার দুচোখে জল নেমে আসত, তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা ছিল না তার, ব্যথায় অমূল্যর দুচোখও অশ্রুসজল হয়ে আসত। আজ সে কোথায় জানে না।

সামনে বর্ষা আসছে, রতন মুখুয্যে গরু কিনতে পারে নি, টাকা বেশী যোগার হয়নি, এই সময় যদি কিছু টাকা তার থাকতো সেও একটা গরু কিনে চাষ ভাগে নিয়ে নিতে পারতো। এতদিন পরের গোলামী করে এসেছে আজ তা হলে গ্রামের মধ্যে সেও চাষী বলেই গণ্য হতো। ব্যাটা বাউড়ী বলে গালাগাল হজম করতে তাকে হতো না।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, চারিদিক নীরব। ঝাকড়া বটগাছটার মাথায় 'ভুলকী' তারার তীব্রজ্যোতি পাণ্ডুর আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, আগলের ফাঁক দিয়ে শির-শিরে বাতাস নিয়ে আসে ঘুমের পরশ, দূরে একটা কুকুর একবার ডেকে উঠে আবার চুপ করে যায়। রাত্রি কত জানে না।

আষাঢ়ের প্রারম্ভ, নব মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশতল। কালো পুঞ্জীভূত জলভরা মেঘ নীচু হ'য়ে গ্রাস করেছে সারা আকাশ, মিলিয়ে গেছে দূরে ওই শালবনের সীমানায়। বৃষ্টি-ধারা-স্নাত বটগাছটার পাতাগুলো নরম হয়ে গেছে, আধোভিজে গুড়ি বয়ে গায় ধরে নেমে আসছে টাইপিঁপড়ের দল

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে অমূল্য আর দেখে চলেছে। পটু হুঁকো টানতে টানতে খাটতে যাচ্ছে, বলে ওঠে, "ওরে অমো, তাহলে আবার মুনিবকেই বলি তুই খাটতে চল, ভাবগতিক দেখে লাগছে ইবার ভালো বর্ষাই হবেক। বর্ষাভোর উঁথানেই গতবি!"

কি যেন ভাবছে অমূল্য। মাত্র কয়েক কুড়ি টাকা পেলে ছুটো যেমন তেমন গরু নিয়ে সে রতন মুখুয্যের চাষ নিজেই ধরে আনতে পারত। মনের মাঝে সেই দুর্বার আগ্রহই যেন চেপে বসেছে।

বৃষ্টিতে ভিজে কাকে আসতে দেখে একবার মুখ তুলে চায় অমূল্য, আমবাগানের মধ্য হতে একটা লোক এই দিকেই হন হন করে এগিয়ে আসছে! অমূল্যর বুকটা কেমন যেন মোচর দিয়ে ওঠে। হ্যাঁ, সত্যিই ছাতা মাথায় দিয়ে এগিয়ে আসছে লোকটা বাউরি পাড়ার দিকেই। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে যায় অমূল্য, জড়িয়ে ধরে তাকে, "কালো! কালো এসেছিস তুই!"

অমূল্যর শূন্য বুকটা যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে। তার শূন্য কুঁড়ে ঘর কি যেন অজানা সম্পদে পূর্ণ হয়ে গেল। কালো অনেক বদলে গেছে, স্বরূপ শালগাছের মত সজীবতা ছেয়ে রয়েছে তার সারা দেহে মনে।

কোচড়ের গ্যাঁজলা হাতে করে দাদার হাতে তুলে দেয় কতকগুলো নোট, বিশ্বাসই করতে পারেনা অমূল্য—"কোথা পেলি ?"

ঠিকাদারের ওখানে কাম পেয়েছিলাম, নিজেও ছোট ছোট কাম করেছি। লাও—ও টাকা তোমাকেই দিলাম। বর্ষা কাটলেই আবার কাজে লাগব গিয়ে।"

হাতে তার কতকগুলো কড়কড়ে নোট, বিশ্বাসই করতে পারে না অমূল্য। বৃষ্টির মধ্যেই বার হয়ে গেল বেগে, ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কালো, দাদার গতিপথের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রতন মুখুয্যের সামনে আজ দুটো পথ, হয় অনাহারে দিন কাটান, নয় জমি জায়গা বিক্রী করে দিয়ে যে কদিন চলে চালান—তারপর অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর হাতে আত্মসমর্পণ করা। সেদিন ভুবনকে জোর করেই বাড়ী হতে বার করে দিয়েছেন—বসে বসে খেতে লজ্জা হওয়া উচিত সোমথ ছেলের। যেখান থেকে পারুক যে ভাবে পারুক তার নিজের সংস্থান সে করবে, করতে হবে।

বৃষ্টির ধারাপাতে পাংশু আকাশ যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, খড়ের চালের ধার বেয়ে পড়ছে খড়ভেজা জলধারা। মাটিতে কেমন যেন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ, বুড়োর বুক ভরে আসে মিষ্টি আবেশে। এমনি অমৃত ধারার কোন সদ্ব্যবহার এবার সে করতে পারবে না। তাই সময় থাকতেই এই পথ বেছে নিয়েছে।

সনাতন গোঁসাইকে যা হয় কিছু জমি বিক্রী করে দেবে! এই সময় তবুও কিছু দাম পাবে, অন্যসময় যখন লোকে বুঝবে তারই দায়, তখন ন'কড়ায় ছ'কড়ায় তাকে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করাবে; গোমস্তা হরিহর পত্র বায়না তৈরী করে ফেলেছে।

"কইগো মুখুয্যে—সই সাবুদ একটা নাহয় করেই ফেলাও।" মুখুয্যে কি যেন ভাবছে, হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে অমূল্যকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে যায় রতন, বিরক্ত হয়ে ওঠে: "বলেছি ত বাপু, দিনকয়েক পরে আসবি, তোর দেনা পাওনা মিটিয়ে দোব।"

অমূল্য আজ ধানের তাগাদা দিতে আসেনি; ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে—"ঠাকুর, ও জমি আমিই ভাগে করব, দেবা আমাকে ?"

বিস্মিত হয়ে ওঠে মুখুয্যে—সনাতন দুজনেই।

বর্ষার ঘনঘটা আজ মিলিয়ে গেছে। অমূল্যর সেদিনের স্মৃতিগুলো কিন্তু একটুও মলিন হয়ে যায় নি। যেদিন জমির ভাগচাষী হয়ে এল, সে রাত্রের কথা আজও মনে আছে অমূল্যর।

ভোর হতে মাঠে বার হয়ে গিয়েছিল দু'ভাই। প্রথমেই সমস্ত জমির ভাঙা আল তোলার পাট। মাদনাতলার বড় জমিখানার দক্ষিণের আলে কোপ মারতেই একটা চাপা গর্জন...গরম একঝলক নিশ্বাস যেন তার হাতে এসে লাগে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায় অমূল্য—একটা কালো মিশমিশে সাপ ফণা তুলে মাটির উপরে উঠে দোল খাচ্ছে। ছুটে আসে কালো, অমূল্য তাকে বাধা দেয়—

"মাদনা ঠাকুর, খপরদার মারিস না।"

সেই দিনই দুপুরে মাঠের মাথায় ঝাকড়া ভাওড়া গাছটার নীচে চিঁড়ে কাঁচা দুধ এনে ওরা পুজো দেয় মাদনায়; কালো বলিদান করে একটা মস্ত মুরগী, নোতুন জমি নিয়েছে—মাদনা পুজো দিয়ে তবে লাঙল ঠেকাবে।

সাদাসাদা দুটো বাছুর গরু কিনে এনেছে অমূল্য কাটাবাধের পাইকেরদের ঘর হতে। বলে কালো, 'সাদা গরুই আনলা ?'

অমূল্যও জানে শোনে: "শতেক কুঁইলে হাজার ইঁ'লা।" কালো গরু একশটার মধ্যে একটা কুঁড়ে হয় আর সাদা গরু হাজারটার মধ্যে একটা, বুঝলি ?'

গোলমাল বাঁধে গরু গোয়ালে তুলবার সময়। মেয়েদের দিয়ে ধুয়ে জল দিয়ে শিংএ তেল মাখিয়ে তুলতে হয় প্রথম দিন। ওদের বাউরীর মেয়ে রাজিই আসে জল দিতে: দাদার অসাক্ষাতে কালো রসিকতা ছাড়ে না। "বুঝলি, ঘরের বড় বৌকে ইসব করতে হয়। তু তাহলে কি হলি বল দেখি ?"

—"ধ্যাৎ" কালোর রসিকতায় রাজি লজ্জায় আনন্দে রাঙা হয়ে ওঠে, ঘটির বাকি জলটুকু কালোর মাথাতেই ঢেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

ব্যাপারটা দূর হতে অমূল্যর নজর এড়ায় না। রাজির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা জানে সবাই।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, চারিদিক নীরব নিস্পন্দ। চালার পাশেই ছোট্ট গোয়াল ঘরে নোতুন হেলে হু'টোর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, তাতে গোবরের গন্ধ বাতাসে মিশে বেশ একটা সতেজ ঝাঁঝালো পরিবেশ রচনা করেছে। কালো ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

অদূরে ছোট পুকুরটার ধারে বহড়া গাছের নীচে এক-ফালি চাঁদের আলোয় দেখা যায় দুটো ছায়ামূর্তি। অমূল্য আর রাজি। ওদের চোখের তারায় কোন নীড়রচনার স্বপ্ন, তাদের সাধনা দিয়ে তাকে সার্থক মধুময় করে তোলার শপথ।

এমন সুবর্ষা অনেক বৎসরই হয়নি। কানায় কানায় জল টইটই করছে, কালো কালো ধানের গাছে ভরে গেছে জমির বুক, মোটা মোটা গোছ হু'হাতের আঙুল দিয়ে ধরা যায় না। কোদাল হাতে কালো—অমূল্য ওদিকে বার হয়ে যায়। সেদিনকার কথাটা ভুলতে পারে না অমূল্য।

ধানে থোড় এসেছে, কার্ত্তিকের প্রারম্ভ, সোনা রং এবং রোদ সাদা সাদা টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে আলতো ভাবে এসে পড়েছে মাঠে—সারা সবুজের রাজত্বে। আউস ধান পেকে উঠেছে; আনমনে যাচ্ছে অমূল্য। সারা মাঠে একটা প্রাণের সাড়া, জলের বুকে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে ব্যাঙ পড়ার শব্দ, কোন আল থেকে একটানা জল নীচে পড়ে চলেছে ঝর ঝর শব্দে, ঝিঁঝিঁ পোকা কোথায় যেন ডেকে চলেছে।

হঠাৎ পা পিছলে একটা পাশ-আলে কে যেন ঘাস কাঠছিল, তারই ঘাড়ে পড়ে যায়, সেখান থেকে গড়িয়ে একেবারে ধানমাঠে কাদার মধ্যে দুজনেই মাখামাখি হয়ে যায়। উঠতেই দেখতে পায় রাজি।

রাজিও আশা করেনি তাকেই দেখবে এইভাবে, সেও হেসে ফেলে, "হা করে পথ চলো নাকি? কি দেখছিলে?"

"—তুকে"

—"চেক্ হয়েছে। থামো এইবার।" হেসে ফেলে দুজনেই। সেদিন অমূল্যর আর মাঠে ফেরা হল না, হেলের জন্য সেও ঘাস কাটতে বসে যায়। বলে অমূল্য—"কেউ যদি দেখে ফেলাই?"

রাজি হাসতে থাকে, কাস্তের ডগা দিয়ে নিটোল পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "দেখুক গো, ঘরে গিয়ে চাট্টি বেশী করে ভাত খাবেক।"

আজ অমূল্যর ঘরে এসেছে পূর্ণতার দিন, বাউরী পাড়ার অনেকেরই ঘরে। পৌষমাস—গাড়ী গাড়ী ধান এনে খামারে তুলছে কালো, রাজি আজ তাদের ঘরেই এসেছে। সেও কাস্তে নিয়ে সমানে ধান কেটে চলেছে, অমূল্য আর সে কাটছে, কালো গাড়ী চালাচ্ছে ধানের।

বামুনপাড়ার রূপ একেবারে বদলে গেছে। অনেকেরই খামারের পাঁচীল বৃষ্টির জলে গলে ধুয়ে পড়েছে। ধানও এবার সেখানে ওঠেনি। উঠেছে তাদের চাষীদের ঘরে। গোয়ালের গরু হেলেও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাদের।

ভুবন সেই যে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। রতন মুখুয্যে বলে, "সে নাকি পাটকলে কোথায় চাকরী করছে।" কালো গজরায়—"চাকরী। গেছে মজুরী করতে, আবার চাকরী।"

থামিয়ে দেয় তাকে অমূল্য।

কঙ্কালসার রতন মুখুজ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে বামুন পাড়া ছেড়ে এগিয়ে যায় বাউরী পাড়ার দিকে, সেখানেই এবার হতে আসবে ফসলের মধুমাস, তারাই অঞ্জলি ভরে মাটীর বুক হতে নিয়ে আসবে মায়ের আশীর্ব্বাদ। ওদের-আগামী বংশধর ভুবন, ভুবনের সন্তান মাটিছাড়া সর্ব্বহারা হয়ে তাদের পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

গাড়ীখানা হতে বড় বড় ধানের মঞ্জরীসমেত ধানগুলো বলিষ্ঠ দুটো হাতে ছুঁড়ে ফেলছে খামারের মধ্যে কালো, রাজি অভ্যস্ত হাতে সেগুলোকে লুফে নিয়ে গাদায় তুলছে।

বুড়ো হাত বোলাতে থাকে ধানের পুরুষ্ট শিষে। চোখ বুজে আসে, নীলচোখের সামনে ফুটে ওঠে তার জীবনে এমনি সোনা ফসলের দিন। আজ সে এর স্পর্শ হতে বঞ্চিত।

...একি। কনকচূড় ধানের ধারাল শিষে লাল হাতটা খানিকটা চিরে গেছে, তার থেকে গড়িয়ে পড়ছে দু'এক বিন্দু রক্ত, সোনা ধানের শিষে লালরক্ত মিশে গিয়ে কেমন যেন এক নোতুন রং ধরেছে।

...অমূল্য, কালো, রাজি সবাই ধানের গাদা করে চলেছে। রতন ঠাকুর ধীরে ধীরে ওদের খামার হতে বার হয়ে বামুনপাড়ার পথ ধরে; বুড়োর কোটরাগত চোখ হতে গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা অশ্রু। খড়ের গাদার উপর অমূল্য আর কালোর চোখে আজ পূর্ণতার আভা, আনন্দের হাসি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"

(পূর্ব্বাভাস)

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর যান এবং ১৮৬৯-এর ডিসেম্বর মাসে সেখান হইতে বদলী হইয়া বহরমপুরে যান। এই পাঁচ-ছয় বৎসরকাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দফায় দুই তিনবার আলিপুরে কাজ করা ভিন্ন, অবশিষ্ট সময় বারুইপুরেই থাকিতেন। এই বারুইপুরে থাকিতেই দুর্গেশনন্দিনী সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়; কপালকুণ্ডলা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তিনি বি-এল্ পরীক্ষার পাশ করেন এবং মৃণালিনীও এখানে থাকিতেই সমাপ্ত ও মুদ্রিত হয়। বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী মজিলপুরেই বিষবৃক্ষের পরিকল্পনা, এখানেই জগদীশনাথ রায়ের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন, এখানেই দুই-একটি কন্যারত্ন তাঁহার গৃহ আলোকিত করে। বঙ্কিম নিজেও স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"যেদিন বারুইপুর হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করি, আমার জীবনের প্রথম অঙ্কের এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অঙ্কের যবনিকা পতিত হয়। আমার জীবনে এমন দিন আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

এই ঘটনাবহুল বৎসর কয়টির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এইখানে দেওয়া সমীচীন মনে করি। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপূর্ব্বে পূজ্যপাদ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠকবর্গকে কোন কোন স্থলে বিভ্রান্ত করিয়াছন। বঙ্কিম যে কয়বার ছুটি লয়েন, উহার সহিত তাঁহার রচিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ছুটির সময়টি বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় কেবল 'ক্যালকাটা গেজেটে'র উপর নির্ভর করিয়াছেন। গেজেটে প্রকাশিত ছুটি সব সময় লওয়া হয় না, মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়। "History of Gazetted Officers"-এও সব কথা ঠিক উঠে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে Quarterly Civil List প্রকাশ করিত, তাহাতেই কেবল সঠিক খবর পাওয়া যায়। প্রকৃত তথ্য নির্ণয় উক্ত তিনটি বিষয় মিলাইয়া না করিলেই ভুল হইবে, যেমন এক্ষেত্রে হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি, শচীশ বাবু লিখিয়াছেন, বঙ্কিম ১৮৬৮, ৫ই জুন হইতে ৫ই ডিসেম্বর ছুটি নিয়াছিলেন। একথা ঠিক নয়। তিনি ছুটি নিয়াছিলেন ১৮৬৯-এর ৫ই জুন হইতে। আবার ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে দুই মাস সময় ছুটি নেওয়ার কথা উভয়ের কেহই উল্লেখ করেন নাই। অথচ সম্পাদকদ্বয় শচীশবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ছুটি সম্বন্ধে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন।*

নিম্নলিখিত তারিখগুলি বঙ্কিম সম্পর্কে
বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

১৮৬৪—৫ই মার্চ্চ, বারুইপুরে আগমন।

১৮৬৪—২৪শে অক্টোবর, ডায়মণ্ডহারবার গমন।

১৮৬৫—ফেব্রুয়ারী ডায়মণ্ডহারবার হইতে বারুইপুরে প্রত্যাবর্ত্তন।

১৮৬৫—মে মাসে গেজেটে পদোন্নতি না দেখিয়া বঙ্কিমের মনোভঙ্গ।

১৮৬৫—দুর্গেশনন্দিনী পরিসমাপ্ত ও প্রকাশিত।

১৮৬৬—৫ই মার্চ্চ, তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত। বেতন মাসিক ৫০০ শত টাকা।

১৮৬৬—২২শে জুন হইতে আগষ্ট ১ মাস ১৬ দিন অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটি।

১৮৬৬—নভেম্বর, কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত।

১৮৬৭—১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় স্পেশাল কাজ করেন।

১৮৬৭—১লা অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আলিপুরে বদলী হন। জুলাই হইতে ডিসেম্বর কোন কোন সময়ে আইন ক্লাসে যান।

* মৃণালিনীতে সম্পাদকদ্বয়ের উক্তি।

১৮৬৮—জানুয়ারী হইতে পুনরায় বারুইপুর গমন।

১৮৬৮—২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে নভেম্বর প্রিভিলেজ লিভ গ্রহণ ও আইন পুস্তক পাঠ করেন। নভেম্বরে বি, এল পরীক্ষা দেন।

১৮৬৯—জানুয়ারী হইতে আলিপুরে। "Origin of Hindu Festivals" বাহির হয়।

১৮৬৯—৮ই ফেব্রুয়ারী, গেজেটে পরীক্ষার (বি. এল্) ফল বাহির হয়।

১৮৬৯—* ৫ই জুন হইতে ৫ই ডিসেম্বর ব্যক্তিগত কারণে ছুটি, এই সময়ে কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যান।

১৮৬৯—মৃণালিনী প্রকাশিত হয়।

১৮৭০—জানুয়ারী হইতে বহরমপুর থাকেন।

সম্পাদকদ্বয়ের উক্তি-স্পেশাল কাজে আলিপুরে ১৮৬৭, ১৪ই আগষ্ট হইতে যান, কথা ঠিক নহে; তিনি আলিপুরে ১লা অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরে থাকেন।- Vide—Quarterly Civil list—1867

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা হইতে বারুইপুর মহকুমায় † বদলী হন। এই মহকুমাটি তিনি স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস মধ্যেই ৪ঠা অক্টোবর বারুইপুর, ডায়মণ্ড-হারবার, কাঁথি প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের স্থানসমূহের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। যেমন ঝড়, তেমনি জলপ্লাবন। সমস্ত গ্রাম, বাড়ী-ঘর, মাঠ-ঘাট জলে ভাসিয়া যায়। ঝড়ে বাড়ী-ঘর পড়িয়া যায়, আবার প্লাবনে তাহা ভাসাইয়া নিয়া যায়। লোকের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, খাদ্যাভাব ঘটে এবং ব্যারাম পীড়ার আধিক্য হয়। এই দুরবস্থার সময়ে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি কার্য্যের ভারপ্রদান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মজিলপুরে পৌঁছিলেন এবং তত্রস্থ স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় সাইক্লোন রিলিফের কাজ বিশেষ প্রশংসার সহিত সমাধা করেন। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়াছিল। সেখানে তখন স্বর্গীয় হেমচন্দ্র কর মহাশয় উক্ত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে বারুইপুরে দিয়া রিলিফের কার্য্যের সুবিধার জন্য ২৪শে অক্টোবর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে উক্ত মহকুমার ভারার্পণ করা হয়। ডায়মণ্ডহারবার সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া যাবতীয় স্থান একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং অবস্থা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিহরিয়া উঠেন। তিনি পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, জল সরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জলমগ্ন বালকবালিকাদের, স্থবির বৃদ্ধের এবং গো-মহিষাদির শবে সমগ্র স্থানটি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—মাঠে-ঘাটে সর্ব্বত্রই শব, আর বাঁধের উপরে আরও শবাধিক্য। শকুনি গৃধিনী-অধ্যুসিত গলিত শবের দুর্গন্ধে পথে চলাই অসম্ভব হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ পানীয় জলের অভাব, পুকুরে গলিত শব, নদীর জল লবণাক্ত।

খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অভাব হইয়াছে, সঞ্চিত যাহা ছিল সবই ভাসাইয়া নিয়াছে, মাঠের শস্য নষ্ট হইয়াছে, রাস্তাঘাট রুদ্ধ, কোন জিনিষ আমদানি করাও সম্ভব নয়। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের জীবন রক্ষাই কঠিন হইয়া উঠিল।

পচা জলে, দূষিত বায়ুতে, খাদ্যাভাবে ব্যারাম পীড়া বৃদ্ধি পাইল। অচিকিৎসায় লোক মরিতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই

* শচীশবাবু যে বলেন—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন হইতে ৬ মাস ছুটি লন, তাহা ঠিক নয়। History of Gazetted Officer-এ এক বৎসর এরূপ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পরে সংশোধিত হয়। Quarterly Civil Lists ও Gazette-তে সঠিক খবর আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে ২ মাসের প্রিভিলেজ ছুটি লওয়া হয় তাহা শচীশবাবু এবং সম্পাদকদ্বয় উল্লেখ করেন নাই। অথচ উঁহারা শচীশবাবুর কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভুলেরই সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। উভয়েই ভুল করায় পাঠক মাত্রেই বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অথচ এই ছুটিটা না লইলে বি, এল পরীক্ষাই দেওয়া হইত না।

† ১৮৫৮ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত বারুইপুর ২৪ পরগণার অন্যতম সাবডিভিসন ছিল।

অবস্থার কতক পরিচয় পরবর্তীকালে রচিত "আনন্দমঠে" পরিস্ফুট হইয়াছে—

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্ত রোগে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না; অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

"মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান কিন্তু আজ ধনি নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পালাইয়াছে।"

শ্রাবনে ডায়মণ্ড হারবারেরও এই দশাই হইয়াছিল।

আবার এই গোলমালে চুরি, ডাকাতি, খুন (নরহত্যা) প্রভৃতি অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল, বঙ্কিমচন্দ্র মহাসঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম হইলেন না, পূর্ণোদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যাহা হউক বঙ্কিমের ন্যায় কার্য্যকুশল, হৃদয়বান ও সাহসী পুরুষসিংহের নিকটে সমস্ত অসুবিধাই অচিরে দূরীভূত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপায় ও বঙ্কিমের ক্ষিপ্রকারিতায় অচিরে বিপন্নের প্রাণরক্ষা পাইল। অন্যান্য স্থান হইতে বহু সংখ্যক ডোম ও ধাঙ্গড় আমদানী করা হইল। শবরাশি ভূমধ্যে প্রোথিত হইল বা সৎকার করা হইল, প্রায় বিসহস্র পুষ্করিণী হইতে গলিত আবর্জ্জনা ও পচা মৎস্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং অব্যবহার্য্য জল বাহির করিয়া মাঠে ছড়াইয়া দেওয়া হইল, সেই জলে মাঠের উর্ব্বরতা সাধিত হইল। কোন কোন পুকুরের সংস্কার সাধন হইল, আবার পরিষ্কার জল সরোবর পূর্ণ করিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সহৃদয় ব্যক্তিগণ নানারূপ সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া বিপন্নের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, অনতিবিলম্বে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য (চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, সর্ষপতৈল ও পরিধেয় বস্ত্র, আসিতে লাগিল। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপকরণও পাঠাইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আহার নিদ্রার সময় রহিল না।

কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য কম কষ্টসাধ্য নয়। বণ্টন আরম্ভ হইলেই অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নৈরাশ্যে লুট ও আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাই সময় সময় বিশেষ কঠোরতারও আবশ্যক হয়। সকলেই প্রার্থী, সকলেরই অভাব, আবার অধিকাংশ সময়ে জিনিষপত্রাদিও সেই প্রচুর অভাব দূরীকরণে প্রচুর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া বিতরণ সমিতি গঠিত করিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কার্য্য করিয়া আবার তাঁহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইল। গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া তিনি প্রচুর ঔষধ ও পথ্যাদির সামগ্রী আনাইয়াছিলেন এবং নিজেও উপযুক্ত লোক দ্বারা সে সমস্ত বিতরণ করিতে লাগিলেন। এবং ছদ্মবেশে পর্য্যন্ত চোর ডাকাতদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের চুরি ধরিতে লাগিলেন। এই স্থানে একবার ডাকাত তাহার বাঙ্গলোয়ও আসিয়াছিল, কিন্তু ধমক দিয়া এমন এক ডাক হাঁকিয়াছিলেন যে, ডাকাতরা ভয়ে পলাইয়া যায়। কাছারী ও বাহিরে পরিশ্রম করিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের চুরি ডাকাতি দমন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কষ্টসাধ্য কাজ করিয়াও তাঁহাকে আবার খাজানার মোকদ্দমার বিচার করিতে হইল। ঐ সময়ে ডেপুটীদেরই খাজনার মোকদ্দমা করিতে হইত।

ব্রজনাথ সেন নামক জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য এই সময়ে ডায়মণ্ড হারবারে প্রেরিত হইলেন। তিনি বঙ্কিমকে বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরে বঙ্কিম ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার পূর্ব্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন। ডায়মণ্ডহারবার আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। তবে জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু সে অভাব অনিবার্য্য। বঙ্কিম সেখানে প্রায় তিনমাস ছিলেন। এই সময় মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বঙ্কিমের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তিনি

পুনরায় বারুইপুর ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে পোনেরদিন বাড়ীতে বিশ্রাম লাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় তিনি বারুইপুর ফিরিয়া আসেন।* বারুই-পুরে অবস্থান করিবার সময়ে কালীনাথ বাবুর একটী স্মৃতি কাহিনী † এখানে উল্লেখযোগ্য—

"এই সময় হইতে আমি বঙ্কিম বাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্র-চিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার লিখিত রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম এবং সমস্ত গুলিই পড়িতাম।"

কিন্তু ১৮৬৫ মে মাসে বঙ্কিম সরকারী ক্যালকাটা গেজেটে দেখিলেন Subordinate Executive Service-এর কতকগুলি ডেপুটীর পদোন্নতি ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সেই তালিকায় তাঁহার নিজের নামের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে তিনি নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ডায়মণ্ডহারবারে তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাজ করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যে এত সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গেজেটে নাম না দেখিয়া বঙ্কিম অত্যন্ত বিস্মিত ও হতাশ হইয়া পড়েন। এই অবহেলা তিনি নীরবে সহ্য করিলেন না। এই অবিচার তিনি ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের গোচর করিলেন। উত্তরে তাঁহারা বলিলেন—"যাঁহাদের পদোন্নতি হইয়াছে তাঁহারা উক্ত বিভাগে অধিকদিন কার্য্য করিয়াছেন, তোমার সময় আসুক, তোমারও পদোন্নতি হইবে।"

চাকুরীর প্রতি বঙ্কিমের এই প্রথম বিরাগ জন্মিল। চাকুরীর জন্য সমগ্র সাধনা, সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেও এই প্রতিদান! তবে আর কেন! যে চাকুরীর জন্য সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়াও তৃপ্তি মিটে নাই, যে চাকুরীর জন্য এ পর্য্যন্ত সাহিত্য সাধনায় কোনরূপ মনঃসংযোগই করা হয় নাই, যে চাকুরীর জন্য এ পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্ত দর্শন হয় নাই; যাহার জন্য স্বাস্থ্য গিয়াছে, যাহার জন্য অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, প্রাণভয় করেন নাই তাহার এই পুরস্কার, আর যাহারা অলস, কর্ম্মে অপটু অথচ তোষামোদে অভ্যস্ত—তাহাদের কারণে অকারণে পদোন্নতি! অন্যদিকে আবার কত লোক তাহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ না হইয়াও কত উপার্জ্জন করিতেছে। আর তাহাকে এইরূপ নিম্নপদে কার্য্য করিয়াই জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। ইহার পর হইতেই চাকুরীকে তিনি জীবনের অভিশাপ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে দেশের অশেষ হিত সাধিত হইল। চাকুরীতে বঙ্কিমের বৈরাগ্য জন্মিল বটে, কিন্তু আমরা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে লাভ করিলাম।

জগদীশনাথ রায়ও ছিলেন বঙ্কিমের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু, তিনি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতেন। তাঁহার উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনিও তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর কিরূপ মর্য্যাদা কম, তাহা বুঝাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চাকুরীতে চাটুকারিতা ও তোষামোদ উন্নতির অন্যতম উপায় ছিল। সাহেব রাজপুরুষগণকে অনেকে মধুর সম্বোধনে তুষ্ট করিতেন। বঙ্কিমের আবার একদল শত্রুও ছিল, তাহারা বঙ্কিমের এতাবৎ ক্রমোন্নতিতে খুব ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাহারা কারণে অকারণে বঙ্কিমের নিন্দা করিয়া সাহেবদের কাণ ভারী করিতে লাগিল। ফলে যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার কার্য্যে ভুয়সী প্রসংসা করিতেন, এখন তাহারাই বিরূপ হইলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) বাঙলা দপ্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র বড়ই অসন্তোষচিত্ত (discontented) হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না।" শত্রুপক্ষও বঙ্কিমকে ঐ সমস্ত

* History of Gazetted Officers-এ সম্পূর্ণ কথা দেওয়া নাই। Quarterly Civil List-এ আছে।

† প্রদীপ ১৩০৩

রাজপুরুষগণের বিষ নয়নে পড়িতে দেখিতে চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। বঙ্কিমের একদল নিন্দুকও জুটিয়া গেল। এই সকল নিন্দুককে লক্ষ্য করিয়া "দীনবন্ধুর জীবন সমালোচনায়" ভুক্তভোগী বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—(১৮৭৭)

"যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে, প্রথম দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না। যিনি বহুগুণ বিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি গুণসান্নিধ্যহেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে—তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেকে শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতাসাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দুকই অনেক—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে।"

কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চাকুরীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই চাকুরী বিতৃষ্ণার প্রথম উপাদেয় ফলই প্রসূত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনীতে।"

ইতি-পূর্ব্বে বঙ্কিম খুলনায় দুইটী পরিচ্ছদ মাত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কয়মাস এ সম্বন্ধে একবারও ভাবিতে পারেন নাই। না ভাবিবার আর একটী কারণও ছিল। ইতিমধ্যে জনৈক বন্ধুকে তিনি পাণ্ডুলিপি দেখাই য়াছিলেন তাঁহার সমালোচনা-শক্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম অধ্যায় দুইটি পড়িয়া বিশেষ উৎসাহ দেন নাই। তাই এ-সম্বন্ধে বঙ্কিমও আর ভাবেন নাই—।

এবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মানসিক অবস্থায় তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবার তাঁহার লেখনী আবার সচল হইয়া উঠিল এবং অল্পদিন মধ্যেই দশবারটি পরিচ্ছদ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও পরিচ্ছদগুলি শুনিয়া খুবই প্রশংসা করিলেন।

এই সময়ে উপন্যাসখানি লিখিতে তিনি কিরূপ তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতেছিলেন। এই সময়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সান্ধ্য আহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টী লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।" —প্রদীপ ১৩০৬

ইতিমধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিয়া এতই পরিতৃপ্ত ও আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন যে, তিনি উপন্যাসের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লইয়া কলিকাতায় একটী ছাপাখানায় ছুটিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের খাতা ছাপা-খানায় দিতে ঘোর আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের জেদে কোন আপত্তিই টিকিল না। বঙ্কিমের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি বলিলেন, "অবশিষ্ট অংশ যে ভাল হইবে তাহা বেশ বুঝিতেছি," সুতরাং প্রথম খণ্ড শেষ হইবার পূর্ব্বেই ছাপা আরম্ভ হয়।"

বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা

এই সময়কার বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা সঙ্গত, তাই পাঠককে অন্যদিকে একটু লইয়া যাইব।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গলাভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, আজও তাহাই পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে—গুরু-গম্ভীর বা চটুলভাষা উভয়ই বর্জ্জিত হইয়াছে। সাহিত্য যেমন সকলের বোধগম্য হওয়া দরকার, তেমনি বিশুদ্ধ এবং শিষ্টতাসম্পন্ন হওয়াও একান্ত আবশ্যকীয়। দুই ভাষার সৃষ্টির জন্যই বঙ্কিমের আসন এখনও অটল

অচল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই ভাষা এক দিনেই সৃষ্টি হয় নাই। এই ভাষার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ বড়ই অদ্ভুত এবং বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যের অবস্থা সকলের অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলাভাষা প্রথম পদ্যেই পরিস্ফুট হয় এবং পদ্য সাহিত্যে বঙ্গদেশ চরমোন্নতি সাধন করে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম প্রভৃতি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি। কবিতা-প্রিয়তা বাঙ্গলার ধর্ম্ম, বাঙ্গলার নিজস্ব বলিয়া ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজজীবনে বাঙ্গলার কবিতা বাঙ্গালী হৃদয় আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমেই ধরা যায় বাঙ্গলার আদি কবি জয়দেব। তাঁহার—

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী
পীনপয়োধর পরিসমর্দ্দন চঞ্চলকর যুগলশালী।"

বাঙ্গলা কবিতারই অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে তিনি এই জয়দেবের গানই গাহিয়াছেন—

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বন অতি বিধুরা সুকুমারী।"

এই পদটি বাঙ্গলা নয়—কেহ বলিতে পারে না। গীত-গোবিন্দের গানে বাঙ্গলা গানের সৃষ্টি হইল, ইহার ধারায় বাঙ্গলার গীতিকবিতা রচিত হইতে লাগিল। জয়দেবেরই অনুরূপ চণ্ডীদাসের অমরগীতি—

বঁধু কি বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

প্রভৃতি সঙ্গীত—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

বাঙ্গলাকে একেবারে আকুল করিয়াই ফেলিয়াছিল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাকৃষ্ণ প্রেম অবলম্বনে মধুর রস আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেবের পর শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা, গোষ্ঠলীলা এবং অন্যান্য রস-লীলাও পদাবলী সাহিত্যের প্রধান বিষয় হইল। শান্ত, দাস্ত, বাৎসল্য, ও সখ্য প্রভৃতি রসের প্রসার বৃদ্ধি হয়।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকেও খাঁটি বাঙ্গলার কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাষা বাঙ্গালীরই মত, ভাবও বাঙ্গালীর অনুরূপ। বিদ্যাপতির পরে বাঙ্গলার খাঁটি কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে (১৪১৭-৭৭)। কৃত্তিবাসও আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় সমসময়ে। একসময়ে কৃত্তিবাসও সমস্ত বাঙ্গালী-হৃদয় আবিষ্ট করেন। শাক্ত বৈষ্ণব এমন বাড়ী খুব কম ছিল যেখানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও রামায়ণ পঠিত হইত না। কৃত্তিবাসের প্রভাবে ঘরে ঘরে সকলে রাম সীতার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে। এই দুইজনই (চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস) বাঙ্গলার আদি কবি।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে (১৪৮৫-১৫৩৩) বাঙ্গলা সাহিত্য—বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকৃতভাবে গড়িয়া উঠিল। শ্রীজীবগোস্বামীর করচা, গোবিন্দ দাসের পদাবলী, জ্ঞান দাসের মুরলী শিক্ষা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (১৬১৫), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবৎ (১৫৭৩) প্রভৃতি এই যুগের প্রধান গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ (চণ্ডী প্রণেতা), রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (শিবায়ন প্রণেতা), ঘনরাম (ধর্ম্ম মঙ্গল), ক্ষেমানন্দ (মনসার ভাসান রচয়িতা) কবি রঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এবং অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের কবি।

টপ্পা রচয়িতা নিধুবাবু, রামবসু, হরুঠাকুর, এণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। দাশরথি রায় পাঁচালী প্রবর্ত্তক তাঁহাদের পরবর্ত্তী।

তারপরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইংরাজ কবি কাউপারের ন্যায় ইনিও ছিলেন নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র। Critical কবি ড্রাইডেন, পোপ, বাট্লার এবং Romantic কবি Wordsworth, Shelly, Coleridge Southey, Keats, Byron এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেমন ছিলেন কাউপার, সেইরূপ একদিকে পূর্ব্ব কবিগণ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এবং অন্যদিকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র,

নবীনচন্দ্র প্রভৃতির যোগসূত্রকারীও ছিলেন কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র।

ভারতচন্দ্র ছিলেন আদিরসে প্রধান, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র হাস্যরসে অদ্বিতীয়। তবে সেই হাসিই কশাঘাতের ন্যায় বাঙালী সমাজের অনেক জঞ্জাল দূর করিয়া সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে।

গুপ্ত কবির প্রভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

"তখন বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র। তখন কবিতা চর্চ্চার নামই ছিল সাহিত্য চর্চ্চা। পূর্ব্ব হইতেই কাব্য প্রবন্ধ পাঠ আমাদের সাহিত্য চর্চ্চার সীমা ছিল। কেবল পাঠশালা বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদী মুদীখানার পাটে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত, চণ্ডী, শিবায়ন, ধর্ম্মমঙ্গল, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী (দুর্গাপ্রসাদ) প্রভৃতিও পঠিত হইত। এইরূপ বহুকাল চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্য সাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

"তাহার কর্তৃক বঙ্গ সাহিত্যে ঢল নামিল, স্রোত চলিতে লাগিল এবং জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিধানের আন্দোলন হয়, গুপ্ত কবি সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন, সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহারই প্রমাণ দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহার সাপ্তাহিক "সংবাদ প্রভাকর" বাহির হয়, এবং নানারূপ উত্থানপতনের পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহা দৈনিক কাগজে পরিণত হয়।

"প্রভাকরের পরে বাহির হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'ভাস্কর'; উভয় কাগজের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ খুব চলিত। কিন্তু গুপ্ত কবির ব্যঙ্গে বিদ্বেষ থাকিত না। গুপ্ত কবির আরও দুইখানি কাগজ ছিল, একখানি 'পাষণ্ড পীড়ন' আর একখানি 'সাধুরঞ্জন'। প্রথমখানি যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিত, দ্বিতীয়খানি যাহারা দ্বন্দ্ব বিতণ্ডার কথা পড়িতে চাহিত না। এতদ্ব্যতীত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বাঙলা মাসের প্রথম তারিখে একখানি দীর্ঘাকার মাসিক প্রভাকরের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইত। ইহাতে গুপ্ত কবির স্বরচিত অনেক কবিতা থাকিত। এই কাগজের এত বেশী আদর ও প্রতিপত্তি ছিল যে নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঠক মণ্ডলী কাগজ পাওয়ার অপেক্ষা না থাকিয়া দলে দলে প্রভাকরের আফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত।"

তারপরে আসিলেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র।

এইরূপে কবিতার উন্নতি হইলেও বাঙলার গদ্য সাহিত্য প্রথম হইতেই নিতান্ত উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই গদ্য সাহিত্যের প্রথম উন্নতি আরম্ভ হয়। তবে তখন গদ্যেও পদ্যের ছাপ থাকিত। পদ্যের ছন্দোবদ্ধ থাকিত, গদ্যে তাহা থাকিত না। কিন্তু বাক্যবিন্যাস প্রায় একরকমেরই থাকিত। নরোত্তমদাস গদ্যে লিখিয়াছিলেন, "অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়।" ইহা পদ্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে। "তাহাকে আনিব কেমনে"—ইহা গদ্য ও পদ্যে উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়। তবে একথা ঠিক যে বাঙলাগদ্যের প্রথম পরিচয় হয় 'বৈষ্ণব-কবিদের' সহজিয়া সাহিত্যে।

তখন সামান্য চিঠিপত্র, খত, কবালা, পাট্টা কবুলিয়ত আদালতের বা চাকুরীর জন্য দরখাস্ত, আর্জ্জি, অথবা ব্যবসায়ের রোকা ভিন্ন অন্য কিছু বড় গদ্যে লিখিত হইত না। আর তাহাতে উর্দু, ফারসী মিশ্রিত কথা থাকিত।* যেমন "আপন আপন রাজি রকবুতে খুইচ্ছাপূর্ব্বক ন-বুদ আকলে বহাল তবিয়তে বিক্রয় করিলাম।"

এদিকে সমাজ শিরোভূষণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও বাঙলা ভাষাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাহারা চিঠিপত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃতে ভিন্ন লিখিতে চাহিতেন না, আর তাহাও হইত দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা গদ্য সাহিত্যের এই অবস্থা ছিল।

* এইসব দলিলের ভাষার নমুনার জন্য স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকবর্গকে পড়িতে অনুরোধ করি।

তখন মিসনরীরা নানাভাবে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছে, স্থানে স্থানে ব্যাপটিষ্ট মিশন স্থাপিত হইয়াছে। প্রচারকগণ গ্রাম পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই, বক্তৃতা আলোচনার অভাব নাই, কিন্তু বুঝান যাইবে কিরূপে? কয়জন ইংরাজ জানে? তাহারা বাঙ্গলাভাষার প্রচলনে ব্রতী হইল। ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা উদ্দেশ্য হইলেও তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলাভাষার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার যেমন ইংরাজীতে সম্ভব নয়, এদিকে কোম্পানীর এবং আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহও সংস্কৃত বা ইংরাজীতে সম্ভব নয়। ১৭৭৩ খৃঃ রেগুলেটিং য়্যাক্ট পাশ হয়। তারপরেই এই চেষ্টা বিশেষ বলবতী হয়। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ (Writers of the Company) নানাভাবে বাঙ্গলা প্রচারে সচেষ্ট হইলেন।

প্রথমযুগে ইংরাজদের মধ্যে বাঙ্গলা প্রচারের জন্য তিনজন বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। হেলহেড, উইলকিন্স এবং ফোরষ্টার। তখন বাঙ্গলা অক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাঠের অক্ষর হইতে ছাপা হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে উইলকিন্স* বহু অধ্যবসায়ে এবং বড়ানিবাসী পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহায়তায় এই কার্য্য সমাধা করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রেই N. B. Halhed†-এর বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ব্যাকরণখানির ভিতরের কথা সবই বাঙ্গলায়, তবে সাহেবদিগকে বুঝান হইয়াছে ইংরাজীতে। তবে অক্ষর দৃষ্টে মনে হয় তখন পর্য্যন্ত সংযুক্ত অক্ষর ছেনিকাটা অক্ষরে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। কাঠের অক্ষর হইতেই ছাপা হইয়াছে*।

পুস্তকে অনেকগুলি উদাহরণ বাঙ্গলা ভাষায় দেওয়া আছে।

"তার পুত্রে মোর পুত্রে জিমুক সমরে
রাজাগণ মধ্যে যেন অপমান করে।"

"মেঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী" ইত্যাদি

সাহেবদের বুঝাইবার জন্যই যে হেলহেড "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" (A Grammar of the Bengal Language) রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিত কথায় প্রকাশ পায়—

"বোধপ্রকাশং সর্ব্বশাস্ত্র
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদাদণ্ডেঞ্জী।"

হেলহেডের ব্যাকরণই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম পুস্তক।* ইহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গলা অক্ষরে দ্বিতীয় পুস্তক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফোরষ্টার কর্ত্তৃক—আইনের বঙ্গানুবাদ উক্ত অক্ষরেই মুদ্রিত হয়। তৃতীয় পুস্তকও ফোরষ্টারের অভিধান ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড বাহির হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। ফোরষ্টার খুব ভাল বাঙ্গলা জানিতেন এবং ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সরকারী ও শিক্ষিতের ভাষা বলিয়া বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেন। আর তাহার কৃত অভিধানই সর্ব্বপ্রথম 'বাঙ্গলা অভিধান।'

---

* তাহাকে বাঙ্গলার Caxton বলা যাইতে পারে। Cal. Review 1850 p. 134.

† হেলহেড (১৭৫১-১৮৩০) বক্তা সেরিডেন ও পণ্ডিতপ্রবর স্যার উইলিয়াম জোন্সের বন্ধু ও সহাধ্যায়ী। ১৭৭৪ খৃঃ হিন্দু আইন অনুবাদ করেন। বাঙ্গলায় আসিবার পরে ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং স্যার ইলাইজা ইম্পের সহিতও বন্ধুত্ব হয়। ইংলণ্ডে পৌছিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বপক্ষে সেরিডেনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, সেরিডেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করেন। এদিকে আবার Richard Brothers নামক এক ব্যক্তি ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে "গণতন্ত্র শাসন ভিন্ন কোন রাজ্যেই কিছু থাকিবে না"। ব্রাদার্স রাজদ্রোহের জন্য দণ্ডিত হন, কিন্তু হেলহেড ইম্পের অমতেও তাহার পক্ষে সভ্য হিসাবে পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, ঐরূপ বক্তৃতা পার্লামেণ্টে কদাচিৎ হইত। হিন্দু সংস্কৃতির উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। চুঁচুড়ার গভর্ণরের কন্যা হেলেনাকে বিবাহ করেন। Vide Calcutta Review 1856 "Warren Hastings Unpublished."

* পৃঃ ১৩৫ রুক্ষ্ণ, ১৬৮ অক্ষৌহিনী, ১৯৮নিবেদনঞ্চ ইত্যাদি।

† ১৭৪৩ খৃঃ রোমান অক্ষরে পাদ্রী মানুয়েল দা—আস্‌সুম্পসাঁও রচিত বাঙ্গলা অভিধান লিস্‌বনে পাওয়া যায়, Vide—Sir George Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V, Part I page 23.

১৮১০ খৃষ্টাব্দে জনৈক বাঙ্গালী মোহন প্রসাদ ঠাকুরও একখানা অভিধান বাহির করেন। *

শ্রীসজনীকান্ত দাস যে বলেন, আফজনের অভিধান প্রথম (১৭৯৩) ইহা অনুমান মাত্র। যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া ফোরষ্টারের প্রাপ্য সম্মানের হানি করা অসঙ্গত। যে অভিধানখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আফজনের নাম নাই, বৎসর নাই। কেবল ক্রনিক্যাল প্রেস থাকারই তারিখ ধরিয়া তিনি বলেন, ইহা আফজনের এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত, কিন্তু আফজনের ছাপাখানার নাম ছিল The Calcutta Chronicle Press, শুধু ক্রনিক্যাল নয়; আর ফোরষ্টার (১৭৯৯), কেরী ১৮৩৫, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ১৮২৮, রামকমল সেন, ১৮৩৪ নিজ নিজ অভিধানে আফজনের নাম করেন নাই। Longman বা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসেও আফজনের নাম নাই। সুতরাং সজনীবাবুর অনুমান স্বকপোলকল্পিত, পুষ্ট যুক্তির উপর উহার ভিত্তি নাই। পূর্ব্বে আরও কিছু কিছু গ্রন্থ ব্যাকরণ বা অভিধান মুদ্রিত হইবার কথা অবাস্তর না হইতেও পারে, কিন্তু কথিত পুস্তকখানিতে interpolations (বাহিরের কথা সন্নিবিষ্ট) থাকাতে উহা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। পুস্তকখানির নাম Extensive Vocabulary of Bengali ard English. কিন্তু ইহার পরে কয়েকটি শব্দ পুস্তকের মালিকের হাতের লেখা। ১৭৯৩ অঙ্কটিও তাহারই হাতের লেখা কিন্তু লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসের ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ক্যাটালগে এই হাতের লেখা কথাগুলিও উঠিয়াছে, তাই গবেষক মহাশয় ১৭৯৩ দেখিয়া একটা অদ্ভুত গবেষণা করিয়া ফেলিয়াছেন। †

উপরোক্ত তিনজন সিভিলিয়ান পত্তন করিলেন, তৎপরে কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্স, ইয়েট্স প্রভৃতিও সহায়তা করেন এবং সময় সময়ে পাদ্রি কেরী মার্সম্যান ও ওয়ার্ড বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দেশীয় পণ্ডিতগণ উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হন এবং বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল।

খাঁটি বাঙ্গলার প্রথম পুস্তক মিশনরীদের। ইতিপূর্ব্বে আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাহিত্যের কথা নামক পুস্তকে দেখাইয়াছি যে শ্রীরামপুরের একটা ছাপাখানায় ৮০০পৃষ্ঠার একখানি বহি "ধর্ম্মপুস্তক" ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা দেখিয়াছি এবং ইহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও উক্ত পুস্তক 'সাহিত্যের কথা'য় বাহির হয়। ৮০ পৃষ্ঠার পুস্তকখানি প্রায় ২।৩ বৎসর সময় মুদ্রাঙ্কনের জন্য লাগিবার কথা। * এদিকে কেরী সাহেব পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহায়তায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীরামপুরে Beptist Mission Press স্থাপন করেন, কেরী সাহেব সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করেন, তাঁহারা পুস্তকখানি সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। অথচ পুস্তকখানি ঠিকই আছে এবং ইহার পূর্ব্বে আর কোন খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত পুস্তক নাই। আমরা অন্যান্য গবেষকদিগকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা নীরব। এখানিকে প্রথম খাঁটি বাঙ্গলা পুস্তক বলা যায়। তবে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

ব্যাপটিষ্ট মিসন প্রেসে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষক রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ভাষা—

"নওবৎখানার উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পূর্ণ হইবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

---

* Calcutta Review 1852. Vol. XVIII Miscellaneous Notes V.

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৪৩ "বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা অভিধান" শীর্ষক প্রবন্ধে সজনীবাবু আলোচনা করিয়াছেন।

* দিনেমারদিগের কয়েকটি ছাপাখানা ছিল। পঞ্চানন কর্ম্মকার উহাদের দ্বারাই রায় রায়ান উপাধিতে ভূষিত হয়।

† শ্রীরামপুরের, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উকীল এবং হুগলী জিলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিক আমাদিগকে সমর্থন করেন। ফণীন্দ্রবাবুর কাছে পুস্তকখানি আছে।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র" প্রথমে ১৮০১ প্রকাশিত হয়।* ইহার পরে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের সর্ব্ব প্রধান বাঙ্গলার অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কারের রাজাবলী (১৮০৮) এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮১৩, পুস্তক—মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার নমুনা—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানীল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কর্ণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

পাদরী সাহেবেরা কথোপকথনেও অনুবাদের ভাষা ব্যবহার করিত—যেমন

"একটা সুমানুষের দুহিতা স্থির করিয়া তিনি লিখিবেন।"

"সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায়"ও এরূপ বাঙ্গলা অনেক বাহির হইত।

ইহাই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম স্তরের ইতিহাস।† তারপর রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তিনি ইংরেজী Brahminical Magazine (১৮২১) ও বাঙ্গলা 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে হিন্দু ধর্ম্মের পোষকতা করেন এবং বহুগ্রন্থ (বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫, বেদান্তসার ১৮১৭, কেনোপনিষৎ ঈশোপনিষদ্, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ক সংবাদ রচনা) এবং "সংবাদ-কৌমুদী" (১৮২১) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রামমোহনের প্রচেষ্টা খুবই মহৎ, কিন্তু তথাপি বলিতেই হইবে যে বাঙ্গলা এবং গদ্য সাহিত্য অনেকটা নিয়মবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য হয় বটে, তবে আশানুরূপ সারল্য ও মাধুর্য্য লাভ করিতে পারিলনা।

ইতিমধ্যে আদালত হইতে ১৮৩৯ খৃঃ হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া যায়। আর ইহার চারি বৎসর মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হয়। রামমোহনকে উত্তর দেওয়ার জন্য মিসনরীরা তাঁহার ব্রাহ্মোনিক্যাল ম্যাগাজিনের অনুকরণে বাহির করে "Gospel Magazine" (গস্‌পেল ম্যাগাজিন)।

তারপরে সাগরী যুগ। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যুগের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংস্করণে বিলক্ষণ শব্দাড়ম্বর থাকিলেও উহা সহনীয়। বাংলা ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বিশেষরূপে মার্জ্জিত হইয়া উঠে। মদনমোহন তর্কলঙ্কার, কাদম্বরী প্রণেতা তারাশঙ্কর, অক্ষয় কুমার দত্ত, সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিও—গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ, অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১৮৫১—৫২ খুবই সুন্দর, ভাবগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রভৃতির ভাষা আরও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। আর সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থে* একভাবের শব্দ শৃঙ্খলা থাকায় পড়িতে ভাল লাগে। জীবন চরিত, বোধোদয় ও প্রবন্ধাদিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও ভাষা সুসংযত করিতেছিলেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে—সাগরী ভাষা বাঙ্গলার প্রাণের ভাষা নহে। বিশেষতঃ গল্পের আখ্যান পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। গুপ্তকবি এ সম্বন্ধে একটু আক্রমণ করিয়াছেন—

"তোমার আছে কি পুঁজি সকলের ধারো
ধার করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো
যেয়ো হয়ে হেরো হ'লে মুখে বল জিত
জানিতে না পারো কিছু কারে বলে হিত।"

সাগরী ভাষার বিদ্রূপ "প্রভাকরে"ও বাহির হইত। কবিগুরু যে কেবল কবিতাই লিখিতেন তাহা নয়, প্রভাকর পত্রিকা গদ্য সাহিত্যেও বাঙ্গলার প্রধান সম্পদ হইয়া উঠিল। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মনোমোহন বসু ভিন্ন ভিন্ন দিকে গুরুদেব ঈশ্বর গুপ্তের সারল্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

* লং সাহেবের তালিকায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত।

† হ্যালহেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ, ফোর্ষ্টারের অভিধান, প্রতাপাদিত্য কৃষ্ণচন্দ্র চরিত ও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা—

* বেতাল পঞ্চবিংশতি রচিত ১৮৪৬, মুদ্রিত ১৮৪৭, বাংলার ইতিহাস ১৮৪৮। জীবন চরিত ১৮৪৯, শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ ও বোধোদয় ১৮৫১, শকুন্তলা ১৮৫৪, কথামালা ১৮৫৬, চরিতাবলী ১৮৫৬, মহাভারতের উপক্রমণিকাদি ১৮৬০, সীতার বনবাস ১৮৬০, আখ্যানমঞ্জরী ১৮৬৩ ভ্রান্তি বিলাস ১৮৬৯।

একদিকে সাগরী ভাষা ও গুপ্ত কবির মৌলিকত্বের আহ্বান! অন্যদিকে সকলকে বুঝাইবার জন্য ভাষার প্রবল চাহিদা। ঠিক এই সময়ে "মাসিক পত্রিকা" বাহির হয়, (১৮৫৭) সম্পাদনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। ইহা সহজ ও প্রচলিত বাঙলায় লিখিত হইল। এই পত্রিকায়ই প্যারীচাঁদ "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস বাহির করেন। ইহা এবং হরিনাথ মজুমদারের বিজয় বসন্তই বাঙলার প্রথম উপন্যাস। ইহার অনুকরণেই কালীপ্রসন্ন সিংহে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" বাহির হয়।

বঙ্কিম আলালের ভাষার খুব প্রশংসা করেন—ইহাকে সকলের বোধগম্য মনে করেন, ভাষায় প্রাণের কথা ব্যক্ত করা যায় বলিয়া ইহাকে অভিনন্দন করেন এবং বাঙলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক হিসাবেও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ইহাতে অমার্জ্জনীয় গ্রাম্যদোষ এবং ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য্য (বেতমিজ, মদৎ, বাকুলা, তজবিজ, ফয়সালা) ইত্যাদি থাকায় তিনি এই ভাষাও আদর্শ হিসাবে বর্জ্জনীয় মনে করেন।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহাই বাঙলা গদ্য ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত কবি পরলোকগমন করেন এবং সেই বৎসরেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় "সোমপ্রকাশ" সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন। যাহা হউক, এই যুগ সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে সাগরী ভাষায় সংস্কৃত বহুল শব্দ এবং আলালী ভাষায় দোষাবলী বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সাহিত্যরাজ্যে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় অপূর্ব্ব ভাষার প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমে আমরা ইহার পরিচয় দিব।

কবিতায় বঙ্কিম

প্রথমে বঙ্কিম কবিতা লিখিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচিত একটী কবিতা কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

স্ত্রী—কহনা কি হেতু কান্ত শশী অস্তাচলে
পতি—তব মুখ দুখ হ'য়ে চলে অস্তাচলে
স্ত্রী—দশদিক কেন প্রাণ প্রকাশিত হয়
পতি—তোমার মধুর স্বর পাইবার ভয়ে ইত্যাদি

শ্রী ব, চ, চ

ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় কবিতাটি ছাপাইয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রাচীন কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে। এইজন্য সকলেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।"

পরের মাসে বসন্ত নামে একটী কবিতা অষ্টমাবস্থায় চট্টোপাধ্যায় নামে বাহির হয় (১৪ই মার্চ্চ, ১৮৫২), ইহার পরে বঙ্কিমের, দীনবন্ধুর ও কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতা নিয়মিত ভাবে প্রভাকরে বাহির হইত এবং গুপ্ত কবি তিনজনকেই বিশেষ উৎসাহিত করেন। বঙ্কিমের "বসন্তের নিকট বিদায়" কবিতাটিও প্রভাকরে বাহির হয় (১৬ই বৈশাখ, ১২৬০)। এইসব কবিতার জন্য ঐ তিনজন যুব-কবিই বিভিন্ন স্থান হইতে পারিতোষিক লাভ করিতেন। আরেকটি পুরস্কারের* টাকা কবিগুরু বঙ্কিমকে দেওয়ার জন্য হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জে, কার (J. Kerr)-কে পাঠাইয়াছিলেন। কার সাহেবও এই শুভ সংবাদটি ফোর্ট উইলিয়মের এডুকেশন কাউন্সিলকে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের একখানি চিঠিতে রিপোর্ট করিয়াছিলেন।†

* ৪২৫৯ সংখ্যা বুধবার, ১৪ ফাল্গুন, ১২৫৮, ফেব্রুয়ারী ১৮৫২।

* To the Secretary to the Council of Education, Fort William, Hooghly the 20th February, 185..

I have the honour to report for the information of Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bankim Chandra Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School for some good poetical compositions in Bengalee that appeared in Prabhakar News Paper. The prize of twenty rupees was awarded by Babu Ramanimohan Roy and Kallycharan Roy Choudhury, Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Iswar Chandra Gupta the editor of the above mentioned journal J. Kerr, Principal.

যাহা হউক, বঙ্কিম কেবল কবিতাই রচনা করেন নাই। তৎকালীন প্রথানুসারে কবির লড়াইতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক হইলেও সেই লড়াই হইত অতি সংযত এবং সুসঙ্গতভাবে। প্রভাকরে দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র পরস্পরকে গালাগালি দিতেন। তখনও দেখাশুনা নাই, পত্রের দ্বারা বন্ধুত্ব জন্মিল। এই গালাগালি "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে অভিহিত হইত। পূর্ণচন্দ্র বলেন:

"একবার একখানি পত্র পড়িতে পড়িতে বঙ্কিম বড়ই হাসিতেছিলেন। আমি তখন দেখি, দেখি, বলিয়া তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম। আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন, তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। একটু পরেই নরমস্বরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন"। তিনি উত্তরে বলিলেন, "লিখিব বই কি।"

এইবার কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের একটু পরিচয় দিব—

দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে বলিতেন সহুরে কবি ও বঙ্কিমকে বলিতেন—"চট্টো কবি", আর দীনবন্ধু পাল্টা উত্তর দিয়া দ্বারকানাথকে বলিতেন "বুনোকবি।" একবার দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে গালাগালি দিয়া লিখিলেন "শাখার কুরঙ্গ"। অমনি চট্টোকবি লিখিলেন—(১৮৫৩)

কৃপা করি কহ স্বীয় সরল স্বভাবে
"শাখার কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে।

অমনি সহুরে কবি গাহিলেন—

"হা হা ভাই বুঝতে পারি নি এই গাল
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল।
শাখায়-কুরঙ্গ আমি এভাবে লিখেছি
কৌশল করিয়া মিত্র বানর বলেছি
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান
কহিয়াছি তারে আমি বীর হনুমান।
বুক চিরে রাম লিখে কে বেঁধেছে বাণে
রামচন্দ্র দীনবন্ধু হনুমান বিনে॥

চট্টো কবি বুনো কবির বরাবর লিখিলেন—

জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে
মোরে আদি কবি বলে দ্বিতীয় তোমারে।
ইত্যাদি

অন্যত্র সহুরে কবি লেখেন—

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবেনা কখন
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের "তিন মিত্রের কথোপকথন" কবিতা (প্রভাকর ১৮৫৩, ২০ মে) এবং পরের মাসে লিখিত "দম্পতির রসালাপ"ও সরস কবিতা।

দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বরগুপ্তের মত ছিল সরল স্বচ্ছ, দেশী কথায় দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন তাঁদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ললিতা ও মানস" কবিতাদ্বয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। "মানসে" পরিণত মস্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

ভাবিবা বটিকা মত ছিল মম মর্ম
এ গভীর সিন্ধুর মত হয়েছে এখন
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
অনন্ত মহিমা অগ্নি ছাড়িব এ দেহ,
জানিবে শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল
আছে কি পৃথিবী হেন বিমোহন স্থল?॰

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরে এই দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন নাই এবং অতঃপর প্রতিভামণ্ডিত বালক-হৃদয়ে পাশ্চাত্য কবির প্রভাব পড়ায় প্রভাকর তাহার কাব্য-পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইল না। তাহার ভাবধারা আরও উর্দ্ধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন

পর্য্যন্ত গুণমুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করিতে বিস্মৃত হন নাই।

ইহার পরে প্রাপ্ত বয়সে রাজার উপরে রাজা, বিরহিণীর দশদশা ও আরও কয়েকটি (বেশী সংখ্যক নহে) কবিতা ছাড়া অতঃপরে বঙ্কিম আর কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

বঙ্কিমের প্রথম গদ্য রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র পদ্যের সঙ্গে গদ্যও যে লিখিতেন না, তা নয়, কিন্তু তাহা হইত দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গলা। চতুর্দ্দশ বয়সের সময় তাহার নিম্নবর্ণিত গদ্য বাহির হয়—

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশত প্রিয় হওত মূঢ় মানব মণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদাপ্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বপম জীবনে চন্দ্রার্কসদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে" শুক্রবার, ১২ই বৈশাখ, ১২৫৯। সংবাদ প্রভাকর

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত—

হুগলী কলেজ—শ্রী ব চ চ

সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেন—

"ইঁহার লিপি নৈপুণ্যের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

ইহার পরেও প্রভাকরে গদ্য রচনা 'বর্ষাঋতু' বাহির হয়। স্বাক্ষর থাকে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী কলেজ। সিনিয়ার বৃত্তিলাভ করিয়া (১৮৫৬) বঙ্কিম "ললিতা ও মানস" মুদ্রাঙ্কিত করেন, কিন্তু পুস্তক বিক্রয় হয় নাই। বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন। "প্রকাশিত হইয়া পুস্তক বিক্রেতার আলমারীতে পচে, ছয়খানি পুস্তক মাত্র বিক্রয় হয়।" প্রভাকর বিদ্রূপ করিয়া উহাকে ক্ষুদ্রার প্রলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। কবিতা দুইটি বঙ্কিম পরিণত বয়সে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের পাঠ্যকালে অণুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি ছিল—কথায় অণুপ্রাস, কবিতায় অণুপ্রাস—আর সর্ব্বত্র কবির লড়াই। যাহাহউক ক্রমে হাওয়া ফিরিল।

অতঃপরে তিনবৎসর বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তবে কাপ্তেন ডি, এল্ রিচার্ডসন সম্পাদিত Literary Gazetteএ কয়েকটি ইংরাজী কবিতা ও রজিনী নামে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটা গল্প বাহির করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বঙ্কিম একটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত জীবনীকায় লিখিয়াছেন—"গল্পের নামটি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং পাণ্ডুলিপিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" তবে "ললিতা ও মানসের" বিজ্ঞাপনটিতে বুঝা যাইবে তিনি তখনও (১৮৫৬) কিরূপ দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গলা লিখিতেন—

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়, তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচন কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষ জনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না, কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপি দোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।"

সুকাব্যালোচক, সুতীর্ণ, সুরসজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে পণ্ডিতি ঢং আছে। আদালতি ঢংও জাজ্জ্বল্যমান যেমন দণ্ড লইতে প্রস্তুত। সুতরাং রচনা কেবল কঠিন নয়, ভাষা না নাগরী, না মৃত্যুঞ্জয়ী, আদালত ও চতুষ্পাটির উহা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।*

এই সময় (১৮৫৭-৫৮) কলিকাতায় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ (মিশনরী ও সিভিলিয়ান) এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র-

* স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয়ও এরূপই বলিয়াছিলেন

লাল মিত্র প্রমুখ ২।১জন বাঙ্গালী লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং এই সূত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে বাঙ্গলা মৌলিক পুস্তক লিখিতে পারিলে লেখক পুরস্কৃত হইবেন। বঙ্কিম একখানি নভেল লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকখানি নামঞ্জুর হয়, তবে উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয় লেখাটি অনেকটা আশাপ্রদ বলিয়া আরেকখানি গ্রন্থ লিখিয়া পাঠাইতে বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরেকখানি পাঠান, সেখানিও নামঞ্জুর হয়। ইহাতে ডাকাতি প্রভৃতি ভীষণ ব্যাপার বর্ণিত আছে বলিয়া নাকি পাঠের অযোগ্য বিবেচিত হয়। আরেক জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা লেখকেরও 'পিটার দি গ্রেটে'র বঙ্গানুবাদ অগ্রাহ্য হয়। এদিকে সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি ইংরাজী আষাঢ়ে গল্পের অপদার্থ অপাঠ্য অনুবাদ করিয়া পুরস্কার লইতেন। সভ্যগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রচার না হইয়া বরং উহার সংহার হইতেছে, সুতরাং বুদ্ধির কাজ করিয়া সভাটি তুলিয়া দিলেন।

বঙ্কিমের এই দুইখানি অগ্রাহ্য উপন্যাস বলিয়া উহার দোষগুণ জানাইবার ক্ষমতা নাই, কারণ উহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই।

১৮৫৭ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের রচনার কোন পরিচয় নাই। ইতিমধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু নাটক ও কাব্য রচনায় প্রত্যেকে এক একজন দিক্‌পাল হইয়াছেন।

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে ১৮৬৪ খৃঃ অঃ বঙ্কিমের ইংরাজী উপন্যাস Rajmohon's Wife বাহির হয়। ইহা কোন্ সময়ের রচনা তাহা নির্ণয় হয় নাই, তবে ইহাই বোধ হয় ইংরাজী উপন্যাস লিখিতে প্রথম ও শেষ চেষ্টা। ইহাতে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম ইংরাজী রচনা ছাড়িয়া দেন এবং কয়েক বৎসর পরে এই কাহিনীটিই একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস আকারে লিখিতে প্রয়াস পান। মাত্র তিনটি অধ্যায় শেষ করেন, পরে বাকী অধ্যায় ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র সমাপ্ত করিয়া 'বারিবাহিনী' নামক পুস্তকে বাহির করেন।

খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুই সর্গের অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজীর মত বঙ্কিমচন্দ্র পদ্য লেখার প্রচেষ্টাও ছাড়িয়া দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়ই বলিতেছি—"পদ্যরচনায় সিদ্ধহস্ততা লাভ করিলেও, মধুসূদনের দীপ্ত প্রতিভায় আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অতঃপরে শুভক্ষণে গদ্য রচনায় লেখনী নিয়োগ করিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাত্র দুইটি অধ্যায় খুলনায় শেষ করেন। তারপরে নিরুৎসাহ পাইয়া তাহা ফেলিয়া রাখেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে আর সাহিত্য রচনার অবকাশ পান নাই, এইবার আরম্ভ করিলেন।

দুর্গেশ নন্দিনীর পূর্ব্বকার সময়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং বঙ্কিমের সাহিত্য সেবার ইহাই আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চিঠি

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যা। মোক্ষদার ঘরে তখনও আলো জ্বলে নি। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে মোক্ষদা ও হরিশ। কম্বল ছেড়ে উঠে আলোর সুইচটা টিপে দিতেও গড়িমসি। বিশেষ মোক্ষদার হাত তখন উল বোনায় ব্যস্ত।

'একটু চা খেলে হত না মা!' বলে ওঠে হরিশ।

একতলা ঘরের ঠাণ্ডা পরিবেশে কম্বলটাকে আরও একটু মুড়ি দিয়ে বসে।

হরিশ মোক্ষদাকে মা বলে সম্বোধন করলেও আসলে সে তার মা নয়। কিছুদিন আগে হরিশের বাপ-মা যখন এক দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে মারা যান, তখন হরিশ কাছাকাছি এই পিসিমার বাড়ীই এসে ওঠে। হরিশের আর কেউ ছিল না। পিসিরও এই হরিশই নিকটতম আত্মীয়। সারাটা জীবন সামান্য জমানো পুঁজি ভেঙে দিন চালাতে মোক্ষদা ভরসা পেত না। একটা কর্মক্ষম ভাই-পো তার কাছে এসে আশ্রয় নিলে অবিলম্বেই তার রোজগারটা সে হাতে পাবে—এই ভরসায় মোক্ষদা হরিশকে বোঝা মনে করল না।

বোনা থামিয়ে মোক্ষদা বলে, 'পুরুষ মানুষ, কোথায় কখন কি অবস্থায় থাকতে হবে, এটুকু শীতেই কাবু হয়ে পড়লি যে!'

'শীতে আমি কাবু হইনি মা।' বলে হরিশ। 'সন্ধ্যার সময় চা একটু খাওয়ার ইচ্ছে তোমারও ত থাকতে পারে! বল ত আমিই না হয় ষ্টোভ ধরিয়ে চা করে দিই।'

'তা ত দিবি, কিন্তু চিনি?'

'দেখছিলাম যে কৌটোয় রয়েছে।'

'ওইটুকুনই ত জমিয়ে রেখেছি। চিনির যে অসুবিধে, তাতে যখন তখন চা খাওয়া কি চলে! তার পর কেরোসিন, তাও ত অপচয় করা সম্ভব নয়!'

পিসিমাকে হরিশ জানে। পিসির রোজগার নেই, কিন্তু কোম্পানীর কাগজের সুদটা বড় কম আসে না। তবুও বুড়ী হাড়-কৃপণ। হরিশকে আর স্কুলে পাঠালে না। সোজা এক ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ভর্ত্তি করে দিল। কিন্তু মাইনের টাকাটা হরিশ ধরতে পারত না কোন দিন।

হরিশ কিন্তু দমবার ছেলে নয়। কোথেকে কি ভাবে নিজের চেষ্টায় সে ইলেক্‌টিকের কাজে হাত পাকিয়েছে। যুদ্ধের কাজে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে। খবরটা পিসির কাছে গোপন নেই। পিসি অবশ্য তাতে খুব খুশি নয়। সে দাবি করছে—'আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব তোর। আমাকে দেখবার ত আর কেউ নেই, তা তুই যুদ্ধে গেলে আমার চলবে কেমন করে, কে আর দেখবে?'

হরিশ গেলে বুড়ীর খরচা কমে ঠিকই, কিন্তু হরিশের মাইনের টাকাটা যে তার কাছে এসে পৌঁছোবে এ ভরসা তার নেই। হরিশ কিন্তু ঠিক করে আছে যে, সে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে যাবেই।

কিন্তু তার চেয়েও মুস্কিল হয়েছে—হরিশ বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করলে যে সে আলাদা ঘর বাঁধবে এ বিষয়ে মোক্ষদা সুনিশ্চিত। আর একটি পয়সাও হরিশ তাকে দেবে না এর পরে।

হরিশের সঙ্গে আরতির মেলামেশা তাই মোক্ষদা দুচক্ষে দেখতে পারে না। আরতি কোথায় বাইরে একটা নার্সের কাজ নিয়ে চলে গেছে। আপাতত মোক্ষদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে; হরিশের মন থেকে কিন্তু আরতি সরে যায় নি। তার মানস চক্ষে ভাসতে থাকে—কেমন ধবধপে পোষাক পরে আরতি ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত মুমূর্ষু বেদনায় ম্রিয়মাণ বিপন্ন নরনারী তার স্নেহ-যত্নে জীবন ফিরে পাচ্ছে। হরিশের ইচ্ছে বিয়ে করে বাসা বেঁধে তবে ও যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাবে। দশটা দিনও যদি এক

সঙ্গে থেকে যেতে পারে, সেই আনন্দের স্মৃতি নিয়েই ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশেও স্বপ্নের জাল বুনবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে হরিশের, ও যে প্রস্তাব করে আরতিকে চিঠি লিখেছে, তার জবাব আসছে না কেন? খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে হরিশ প্রশ্ন করে, 'দু সপ্তাহের মধ্যে আমার একখানি চিঠিও আসে নি মা?'

'আমি ত কিছু জানি নে বাবা।' হরিশের দিকে চোখ-টেরে মোক্ষদা জবাব করে, 'তোর যত আদেখ্‌লে-পানা, ওই সব উড়ুক্কো মেয়ে, তা আবার হাসপাতালের নার্স হয়েছেন, কত দিন তোকে নাচিয়েছে, এখন আবার কার সঙ্গে নাচছে, কে জানে!'

এত বড় মিথ্যে কথাটা বলতে মোক্ষদার মুখের চেহারা এতটুকুও পরিবর্ত্তন হল না। কথাগুলো বেশ স্নেহের হাসি মিশিয়েই বললে সে। কি নিষ্ঠুর, অভিসন্ধিমূলক তার এই মিথ্যা ভাষণ।

চিঠি কিন্তু আরতির সময় মতই এসছে। আরতি লিখেছে:

'তুমি যেদিন বলবে, সেইদিনই তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধব। তোমার বলার অপেক্ষায় আমি ত মিনিট ঘণ্টা গুণছি।'

চিঠিখানা যখন এসে পৌঁছায়, কালবিলম্ব না করে মোক্ষদা তখনই তা খুলে পড়ে। একবার নয়, অনেক বার। শুধু তাই নয়, মোক্ষদা নিজেই সে চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছে। সে লিখেছে:

'দুঃখের কথা তোমাকে কি বলব মা আরতি, ও কোন কথা শুনলে না, যুদ্ধে চলে গেল। বুড়ী পিসির কথা ত ভাবলেই না, তোমাকেও যে একটা কথা জানাল না, এই আশ্চর্য্য লাগছে। যুদ্ধে গিয়ে কি আর সে তোমার কথা মনে রাখবে? সেখানেও ত শুনি কত কেলেঙ্কারী, ছেলে-ধরা মেয়েদের রাজত্ব।'

পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দিয়ে বুড়ী চিঠিটা যেদিন ডাক বাক্সে ফেলিয়েছিল, সে দিন কি তার আনন্দ! 'কেমন জব্দ হয়েছে ছোকরা এবার? যুদ্ধের কাজের মাইনে থেকে নির্ভরশীল কারো কিছু পাওনা যদি হয় তা আমারই হবে।'

হরিশের সামনে বসে বসে মোক্ষদা বোনার কাঠি নেড়ে চলে, আর ভাবতে থাকে সমস্ত ব্যাপারটা। চোখের কোণ থেকে সসংকোচে দৃষ্টি দিচ্ছিল হরিশের দিকে। এই সবল রুক্ষ স্বভাব তরুণের প্রেমের বেদনা সে যে বুঝতে পারছে না, তা নয়—তবু বয়স আছে, সবই সয়ে যাবে।

হরিশ উঠে ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করে। "কিছু খেতে দিতে পার মা? এক্ষুণি বেরোব।"

'শুকনো রুটি আর আলুর ছেঁচকি আছে।' জবাব করে পিসি।

"ঠিক আছে, ওই ত রাজভোগ।' বলে হরিশ আলনা থেকে একটা হাফ শার্ট গায়ে চড়ায়। মোক্ষদা রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে ওঠে। হরিশ দরজা খুলতেই ঘরে এসে ঢোকে উপরতলার দু'বছরের ফুটফুটে মেয়েটা। 'মাসিমা কোথায়? মা বললেন, দিদিমার খুব অসুখ। এক্ষুণি তাঁকে সেখানে যেতে হবে। আমার রাত্রের খাবারের জন্যে দুধ আছে, আপনি যদি দুখানা রুটি করে দেন, নইলে মার আবার রেঁধে দেরী হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই', জবাব করে হরিশ। 'তুমি আজ আমাদের প্রধান অতিথি।'

রান্নাঘর থেকে মোক্ষদা আসে হরিশের খাবার নিয়ে। মেয়েটিকে বলে, 'তুমি খাবে তাতে আর কথা কি? একটা কাজ কিন্তু করতে হবে তোমাকে লক্ষ্মীমেয়ে।'

'গান গাইতে হবে বুঝি?'

'না না, গান তোমার গাইতে ইচ্ছে করে—গাইবে। ওই ভাঁড়ারের কুঠুরিটার মধ্যে অনেক বাজে কাগজ জড় হয়ে আছে, সেগুলি একটু গুছিয়ে দেবে।... মাকে বলে এসো আগে।'

'না না, আমি এক্ষুণি গুছিয়ে দিচ্ছি' বলেই মেয়েটি কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই খুকির মা উপর থেকে ডাকলেন। 'যাই মা' বলে বেরিয়ে এল খুকি। মোক্ষদাকে বললে, এগুলো গুছিয়েছি, আমি একটু পরে এসে সবটা গুছিয়ে দেবো।'

রুটি আর আলুর ছেঁচকি মুখে তুলতে তুলতে হরিশ বললে, 'দেখি, হাত দুটো। নোংরা হাত না ধুয়ে মা'র কাছে যেয়ো না, ছিঃ!'

কিন্তু খুকির হাতের কাগজগুলোতে দৃষ্টি পড়তেই হরিশ থমকে গেল, হাতের রুটি ছেঁচকি হাতেই রয়ে গেল। খুকির হাতে একটা খাম, শক্ত মুঠিতে ধরে আছে। তার উপর হরিশের নাম লেখা। সে হাতের লেখা ও চেনে।

'কোথায় পেলে তুমি এটা?'

'কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেলাম। দাদার জন্তে নিয়ে যাচ্ছি। দাদা চিঠি থেকে টিকেট ছিঁড়ে নিয়ে জমায় কি না।'

হরিশের স্বর কঠিন হয়ে পড়েছে। চিঠিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিসির দিকে সে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানে। 'এ চিঠির জন্ত আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি, এ কেমন করে জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে পড়ল?'

'তা—তা—তা—আমি ত জানিনে বা-বা।' এইটুকু বলতেই বুড়ী দুবার ঢোক গিলল। তার মুখের চেহারাটা এক মুহূর্তে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'এই সব দুষ্টু ছেলেরা কেউ পিয়নের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে।'

'তোমার মাথা আর আমার পিণ্ডি!' গর্জ্জে ওঠে হরিশ। আলনা থেকে কোটটা টেনে কাবলী জুতোটায় পা ঢুকিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে এক মুহূর্তের জন্তে ফিরে দাঁড়ায়। 'চলি মা, সম্ভব হলে যুদ্ধের পর এসে সস্ত্রীক তোমাকে প্রণাম করে যাব।'

খুকি এতক্ষণে ছুটে উপরে চলে গেছে।

ঝড় এলো

শ্রীঅসীমকুমার সোম

ঝড় এলো।
আমার মনের শান্তশীল আকাশ নীল—
মুছে গিয়ে দেখা দিল
কালো কালো মেঘে-ঢাকা কুৎসিত জিজ্ঞাসা।
পলাতক মন আমার
ভুলে গেল—
ভুলে গেল ভূগোলের সীমা-পরিসীমা,
আর সবুজাভ কচি ঘাসের মত নির্ম্মল দৃষ্টি
বদলে গেল।
আঁচড়হীন জীবনে আকস্মিক ঝড়
ঢেলে দিল কলঙ্কময় কালির আখর
ক্রুর্ত লয়ে।
পরম সুন্দর সৃষ্টিতে
যে আসর জমে উঠেছিলো—
তার শেষ হ'য়ে গেল, ফেণায়িত উর্ম্মির স্বাক্ষরে।
গতিময় শব্দময় তরঙ্গাভিঘাত
আমার জীবনে পঙ্ক-ক্লেদ ঠেলে দিল।
উন্মত্ত আবেষ্টনীর ক্রমায়িত ঝড়
করেছে আমাকে আজ পুঁজিহীন ফেরার—
যার ইতিহাস জানি শুধু হ'বে
কালিমাখা ধোঁয়াভরা নিপট আঁধার।
স্পষ্ট আজ বুঝি—
আমার জীবনে আসা
বৈশাখের কালো ঝড়ের আবেশ কাটিয়ে,—
দেখা দেবে না কখনও দীপ্তি ঢেলে-দেওয়া
সার্থক সবিতা ঃ
মিছে করি আমি
পূর্ব্বাশার প্রান্ত থেকে প্রশান্তির প্রত্যাশা।

ভারতীয় জাহাজ শিল্প

শ্রীহিমাংশু রায়

জাহাজ শিল্পে ভারত একদা সমগ্র পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু ছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ কোন এক সময় লণ্ডন এবং লিভারপুলের পরিবর্ত্তে কলিকাতা এবং মালাবার উপকূলে নির্ম্মিত হইত। ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কোম্পানীকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ভারতে নির্ম্মিত জাহাজ অনেক উন্নত শ্রেণীর। তদুপরি কম ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করা চলে। বৃটিশ স্বার্থের ক্রমাগত বিরোধিতার ফলে কোম্পানীকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে হয় এবং ভারতীয় জাহাজ শিল্পের এক গৌরবপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। জাহাজের জন্য ভারত বৃটিশ তথা বিদেশীদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে আধুনিক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য ভারতের ছিল না। যুদ্ধকালীন বৃটিশ এডমিরাল্টি ভারতে ১,০০,০০০ স্থূল টন জাহাজ এবং পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ভাসমান ডক নির্ম্মাণ করে। পৃথিবীর মোট ৮১ মিলিয়ন স্থূল টনেজের মধ্যে ভারতের দান ৩,৬১,০০০ টনেরও কম, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট টনেজের শতকরা ৫ ভাগেরও কম। অথচ সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের দান শতকরা ৪ ভাগ।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী সরকার জাহাজ শিল্প সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ১৯৪৭ সালে রেকনষ্ট্রাকসন পলিসি সাব-কমিটি অন সিপিং ১৯৫৪ সালের মধ্যে ২ মিলিয়ন স্থূল টন জাহাজ নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করেন। ইহার উদ্দেশ্য বছরে ১০ মিলিয়ন টন মাল এবং ৩ মিলিয়ন যাত্রী বহন করা। এবং সমগ্র উপকূল বাণিজ্য, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ, সুদূর বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ এবং প্রাচ্যে অক্ষ শক্তির হৃত বাণিজ্যের শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজের সাহায্যে সম্পাদন করা।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার সর্ব্বপ্রথম জাহাজ শিল্প সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা করেন। ইহাতে সরকার তিনটি কর্পোরেশন স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা মূলধন থাকিবে। সরকারের মালিকানার অংশ হইবে শতকরা অন্ততঃ ৫১ ভাগ, অবশিষ্টাংশ কোন অনুমোদিত জাহাজ কোম্পানীকে অথবা আংশিক অনুরূপ কোম্পানীকে এবং আংশিক জনসাধারণকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রত্যেক কর্পোরেশনকে ১,০০,০০০ টন জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে, অবশ্য পরীক্ষামূলক ভাবে। ইহাতে কর্পোরেশনকে যদি কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা প্রথম ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, প্রস্তাবিত ৩টি কর্পোরেশনের একটি বহির্ব্বাণিজ্যে যোগদান করিবার জন্য স্থাপিত হইবে। উপকূল বাণিজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় জাহাজ দ্বারা সম্পন্ন করিবার নীতিও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ফ্রেঞ্চ সিপিং মিশন ১৯৫০ সালে ইহার যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান অভিমত প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ভিজাগাপট্টম সিপ ইয়ার্ডের উপযোগিতা সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করে। ইহার প্রসার সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে।

জাহাজ শিল্প যাহাতে কুশলী শিল্পীর অভাবে ব্যাহত না হয় সেজন্য বোম্বাইতে জাহাজ সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য কলিকাতা এবং বোম্বাইতে ম্যারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও রহিয়াছে। কোচিন এবং ভিজাগাপট্টমে জাহাজ সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় এবং ম্যারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইতেছে। জাহাজ শিল্পের সমস্যা বিবেচনা ও ইহার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি ডিপার্টমেণ্ট অব সিপিং সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ভারতের নিজস্ব জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার প্রচেষ্টা মাত্র তিরিশ বৎসরের কথা। সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ইতিহাসের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালে ইহা প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ করে। দ্বিতীয় জাহাজটি নির্ম্মিত হয় ১৯২৯ সালে। কিন্তু জাহাজ দুইটি নির্ম্মিত হয় গ্ল্যাসগোতে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ ভারতীয় জাহাজ শিল্পের এক স্মরণীয়

দিবস। সেই দিন ভারতের সিপ ইয়ার্ড ভিজাগাপট্টমে নির্ম্মিত ভারতের প্রথম জাহাজ 'জলউষা' সমুদ্র যাত্রা করে। জলউষার পরিবহন ক্ষমতা ৮,০০০ টন। বর্ত্তমানে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীর ৬টি সমুদ্রগামী জাহাজ বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কমপক্ষে ৩০।৩৫টি সমুদ্রগামী জাহাজ ভারতের প্রয়োজন। উপকূল বাণিজ্যে ভারতের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইহা পরিচালনা করিবার জন্য মোটামুটি ৬০টি আধুনিক মালবাহী জাহাজ আবশ্যক।

ভারতীয় জাহাজ (১)

অধিকতর ও উন্নততর জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারতীয় বন্দর এবং পোতাশ্রয়সমূহের উন্নয়ন প্রয়োজন। ভারত সরকার এজন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং কোচিন বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রসার এবং উন্নতি সাধনের জন্য যথাক্রমে ৮,৫০,০০,০০০, ১০,০০,০০,০০০, ৪,৫০,০০,০০০ এবং ৮০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। মারমাগাও—কোচিন উপকূলে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করা সম্বন্ধে অভিমত প্রদানের জন্য ভারত সরকার ওয়েষ্ট কোষ্ট মেজর পোর্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

জাতীয় অর্থনীতিতে জাহাজ শিল্পের স্থান অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ। বহির্বাণিজ্য এবং উপকূল বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক জাহাজের মুখাপেক্ষী হওয়া অশেষ বিপদজনক ও ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে জাহাজের মাশুল বাবদ বহু অর্থ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, মাশুলের হার হয় অত্যধিক এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন জাহাজের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখাই সম্ভব তাহা নহে, ডলার সঙ্কটের যুগে ইহা ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারিবে। বৃটিশের সুস্থ সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের মূলে রহিয়াছে ইহার অদৃশ্য উপকরণ। ভারতের পক্ষেও এইরূপ অদৃশ্য উপকরণ গড়িয়া তোলা সম্ভব। ইহাতে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির আশঙ্কা হ্রাস পাইবে। দেশরক্ষা ব্যাপারেও রণতরী তথা জাহাজ শিল্পের স্থান অসামান্য।

ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত অতিশয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। নিম্নে ইহার

ভারতীয় জাহাজ (২)

অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা গেল।

(ক) বৃটিশের আমলে ভারতীয়দের ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত না।

(খ) ভারতীয়রা বৃটিশ সিপ ইয়ার্ডে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে চাহিলে ইহাকে তাহা গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত না। যুদ্ধে ভারতের যত টন জাহাজের ক্ষতি হইয়াছিল তাহাই শুধু নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ছিল।

(গ) ইণ্ডিয়া—ইউ কে—কনটিনেন্টাল কন্‌ফারেন্স-এ সম্প্রতি দুইটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া জাহাজ থাকিবে। কিন্তু কন্‌ফারেন্সের অন্যান্য সদস্যদের সমান মর্য্যাদা ইহাদের দেওয়া হয় নাই। ভারত সরকারের সমর্থন ও সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কথাবার্ত্তা চালান সত্ত্বেও এই কন্‌ফারেন্সে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী ভারত সরকারের অদৃঢ় মনোভাব এবং জাহাজ কোম্পানীদের জাহাজ নির্ম্মাণ করার মত অর্থ সামর্থ্যের অভাব। বৃটিশ কোম্পানীগুলি এই সুযোগে নিজেদের স্বার্থ কায়েম

করিতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত এম, এ, মাষ্টার আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, ইটালী, জাপান, জার্ম্মানী—যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃটিশ তথা মিত্র শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ; আর যে ভারত যুদ্ধে বৃটিশ তথা মিত্র শক্তিকে রক্ত দিয়া সাহায্য করিয়াছে, যে ভারত স্বাধীন হইবার পরও কমন্‌ওয়েলথ-এ থাকিতে সম্মত হইয়াছে, তাহার দাবীকে বৃটিশ উপেক্ষা করিয়াছে।

(ঘ) বৃটেনের জাহাজ শিল্পের মালিকগণ কর্ত্তৃক কন্‌ফারেন্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের জাহাজ কোম্পানীর দাবী যত সত্বর গ্রহণ করা হয়, ভারতের অতি সঙ্গত দাবী সম্পর্কেও তাহা করা হয় না।

(ঙ) সরকারী অর্থ সাহায্য ব্যতীত কোন দেশের পক্ষেই জাহাজ শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা সম্ভবপর নহে।

(চ) বৈদেশিক তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে সসম্মানে বাণিজ্য করিতে হইলে জাহাজ শিল্পকে কতিপয় বিশেষ সরকারী সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে এইরূপ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব কিনা তাহা সন্দেহজনক। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টার ন্যাশনাল সিপিং কন্‌ফারেন্সে অনুন্নত দেশের এই মনোভাবকে ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন বলিয়া কুখ্যাত করা হইয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে উন্নত দেশসমূহ জনমত সৃষ্টি করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতাও ভারত সরকারকে জাহাজ শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা হইতে বিরত করিতে পারে। হাভানা চার্টার ইহার পরিচয়। বলা প্রয়োজন, ফিসক্যাল কমিশন প্রকারান্তরে ভারত সরকারকে হাভানা চার্টার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এম, এ, মাষ্টার বলেন যে, জাতীয় সরকার যখন জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের জন্ত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন তখন উহা ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন আখ্যা পায়। কিন্তু সিপিং কনফারেন্সের যখন অসঙ্গত উপায়ে জাতি বিশেষের জাহাজকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে, এমন কি নিজের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করে তখন ইহা ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন আখ্যা পায় না।

(ছ) ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সংগঠন ব্যবস্থা দোষযুক্ত।

(জ) আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কে সরকারী নীতির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন। ইহা মাল বহনের পরিমানকে অনিশ্চিত করিয়া তোলে।

(ঝ) কর বাহুল্য।

(ঞ) মাশুলের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

(ট) নূতন মূলধনের অভাব।

ভারতীয় জাহাজ শিল্প প্রতি পদে পদে বিদেশী স্বার্থ দ্বারা আহত হইতেছে। ইহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভারত সরকারের এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শুধু ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়িগণ নহে, বিদেশীয় জাহাজ ব্যবসায়িগণও সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সঙ্গতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পশ্চাতে ভারত সরকারের পূর্ণ সমর্থন, সহানুভূতি এবং সাহায্য রহিয়াছে। জেনেভা কনফারেন্সে যে চার্টার তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার মূল কথা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে জাহাজ পরিচালনায় কোন সরকারী বা বেসরকারী স্বার্থের কোন প্রকার প্রভেদাত্মক নীতি চলিবে না। ভারত সরকারের কর্ত্তব্য—যাহাতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ এই চার্টার গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করা। ভারতের যে প্রাচুর্য্য ও সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য দেশ প্রভেদাত্মক নীতি পরিহার করিলে কোন প্রকার প্রভেদাত্মক নীতি গ্রহণ না করিয়াও সুপরিকল্পিত সরকারী সাহায্য এবং শিল্প বাণিজ্যের সহযোগিতায় ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য হইবে না।

F. N. ফোটো : অনিল বিশ্বাস।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

তের

দিন দু'য়েক কেটে গেলে অরুণ একদিন কী খেয়ালে বিজনের পড়ার টেব্‌লে এসে ঝুঁকে দাঁড়াতেই আবিষ্কার হয়ে গেল বিজনের কবিতার খাতা, শুধুই খাতা নয়, তার উপর বিজনের দৃঢ় অঙ্গুলিবদ্ধ ব্ল্যাকবার্ড কলমটি পর্য্যন্ত। মেসে এসে অবধি এমন ক'রে কোনোদিন খাতার পৃষ্ঠা খুলে কবিতা লিখ্‌তে বসেনি বিজন। তার জীবন থেকে কবিতা একরকম অন্তর্হিতই হ'য়েছিল; আবার যেন খানিকটা নব জোয়ারের স্পর্শ এসেছে এতদিনে। অরুণের এই আকস্মিক দর্শনে প্রথমটা তাই সলজ্জে খাতাখানি বুজিয়ে রাখ্‌তে গেল সে। কিন্তু অরুণ ছাড়বার পাত্র নয়। স্বভাবতঃই কথা সে কম বলে, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ বড় মুখর হ'য়ে উঠেছে অরুণ। ব'ল্‌লো, 'ঘরে কবি থাকতে প্রতিদিনের এই দুর্ব্বিসহ জ্বালা তবে ভুগ্‌চি কেন আমরা? নিরানন্দ এই মেস-জীবনে এবার থেকে কিছু সুরের স্পর্শ পাওয়া তবে অসম্ভব কিছু নয়। খাতা বোজালে চ'ল্‌বে না ভাই। কি লিখেছ, প'ড়ে শোনাও।'

কিছুদিন থেকে অরুণ আর বিজন উভয়ে উভয়কে নাম ধ'রে ডেকে 'তুমি' ব'লেই সম্বোধন ক'রছিল।

সসঙ্কোচে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ এমন কিছু প'ড়ে শোনাবার মতো নয়। সময় কাটাবার মতো এটা আমার একটা বাজে খেয়াল ব'লতে পারো। তোমাদের মতো তাস-পাশা পেটাতে জান্‌লে এমন ক'রে ব'সে ব'সে আত্মপ্রবঞ্চনায় সময় ব্যয় ক'রতে হ'তো না।

—'আত্মপ্রবঞ্চনা না ব'লে বলো আত্মপ্রসাদ।' অরুণ ব'ল্‌লো, 'কবিতা বনিতাশ্চৈব—কাব্য হ'চ্চে নারীর মতই কমনীয়, রস আর রহস্যময়তা তার প্রতি ছত্রে। এই রস আর রহস্যের যে সন্ধান পেয়েছে, তার কাছে দাঁড়ায় নাকি আবার তাস-পাশা! কি যে বলো! আজ আমি কলেজ যাওয়া ড্রপ ক'রলাম, সারাদিন ব'সে ব'সে তোমার কবিতা শুন্‌বো।'

—'আচ্ছা পাগল তুমি যাহোক্‌।' মৃদু হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'সারাদিন কবিতা শুনে শেষ পর্য্যন্ত আর রও পার্সেন্টেজগুলো নষ্ট করাবে?'

—'তাও তো বটে, তোমারও যে কলেজ আছে!' গলার স্বর খানিকটা বিমর্ষ শোনালো এবারে অরুণের।

বিজন ব'ল্‌লো, 'খালি কলেজই নয়, সামনে পরীক্ষা। লেকচারগুলো এ্যাটেণ্ড্‌ করে যদি নোট না নিই, তবে পস্তাতে হবে শেষে। কবিতা তখন নাগ-কন্যা হ'য়ে দংশন ক'রবে। তুমি বরং অবকাশ মতো কখনও খাতা থেকেই প'ড়ে নিও।'

—'বেশ, খাতাখানি তবে রেখে যেয়ো। দুপুরের একটা রিক্রিয়েশন হবে।'—এসে আবার নিজের পড়ার টেব্‌লে আশ্রয় নিল অরুণ।

কলেজ বন্ধ করা বিজনের পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল না। তার উপর র'য়েছে ঘড়ি-ধরা ট্যুইশনি। খেয়ে দেয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখে খাতাখানি তুলে দিয়ে গেল সে অরুণের হাতে, সাবধান ক'রে দিয়ে গেল—পড়া শেষ

করে খাতাখানিকে যেন বাক্সে তুলে রেখে তবে কোথাও বেরোয় অরুণ।

—'তথাস্তু' ব'লে সানন্দে সম্মতিসূচক ঘাড় বেঁকিয়ে নিল একবার অরুণ, নতুন কিছু-একটা ব'লে আর কথা বাড়াতে গেল না সে। ...

সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দিল সে বিজনের 'কাব্য মালিকা'কে নিয়ে। খাতাখানির শিরোনামায় এই নামই রয়েছে, বিজনের অনেক সাধ ক'রে রাখা নাম। ছোট বড় মিত্রাক্ষর, পয়ার আর সনেট মিলিয়ে প্রায় একশোর কাছাকাছি কবিতা। আনন্দের সঙ্গেই বেশ আবৃত্তি ক'রে ক'রে প'ড়লো অরুণ। প'ড়ে মুগ্ধ হ'লো, বিস্মিত হ'লো, অভিভূত হলো। বয়সটা তাদের প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু শক্তির কি অদ্ভুত পার্থক্য! বিজনকে আজ একবার মনে মনে নতুন করে চিনতে চেষ্টা ক'রলো অরুণ। খাতার শেষের দিকের একটা কবিতার উপর হঠাৎ তার দৃষ্টি হোঁচট খেয়ে দাঁড়ালো।—'দুটি তারা':

জীবনের দু'টি তারা তুমি আর তুমি,
আমার হৃদয়াকাশে উঠেছ কুসুমি'।
কমলের মুখ চেয়ে বিজনে কখন্
নীরব সায়াহ্নে এসে দিয়ে গেছ মন,
আবার রাত্রিশেষে প্রভাতের দ্বারে
কখন্ গিয়েছ মিশে এই সংসারে।
আর তুমি, গেছ চুমি' কমলের আঁখি,
ভাবি তবু জীবনের কতদিন বাকী!

দু'টি চঞ্চল সুচারু জীবনকে নিয়ে একটি মুগ্ধ হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস; শেষের দিকে খানিকটা অতৃপ্তিকর কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা। ভাবলো কিছুক্ষণ অরুণ, প্রথমটা ঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারলো না সে, আবার প'ড়লো, তারপর উপরোক্ত ধরনের একটা অর্থ ক'রে নিল মনে মনে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মিনিট দু'য়েকের জন্য একবার মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ব্যাপার কি, কলেজে যাওনি আজ?'

—'না, কাব্য-মালিকার প্রেমে প'ড়ে আজ আর কলেজে যাওয়া হ'য়ে উঠলো না।' স্বাভাবিক কণ্ঠে খানিকটা কৌতুকের সুর মিশিয়ে জবাব দিল অরুণ।

ট্রাঙ্ক থেকে কি একখানি হুণ্ডির কাগজ বার ক'রতে ক'রতে পুনরায় খানিকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধ'রলো মহেন্দ্র: 'কাব্য-মালিকাকে আবার জোটালে কোত্থেকে?'

—'এক ঘরে কবিকে নিয়ে বাস ক'রেও তার কাব্য-মালিকার সন্ধান পেলেন না আজ পর্যন্ত, মহিনদা! ইউ আর সো রেচেড্, আই সি। এই দেখুন।' ব'লে মহেন্দ্রের চোখের উপর খাতার প্রচ্ছদপৃষ্ঠাখানি মেলে ধ'রলো অরুণ।

মহেন্দ্র প'ড়লো: 'কাব্য-মালিকা'—শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায়। থেমে বললো, 'বিজু তবে রবি ঠাকুরের জাতের লোক?'

অরুণ ব'ললো, 'তা তো যেন হ'লো, কিন্তু জাত বাছতে গিয়ে আমরা একেবারেই বজ্জাত না হ'য়ে দাঁড়াই!'

—'জ্ঞানরাজ্যে আমি তো চিরকালের হরিজন, তোমার তবু পেটে কিল মারলে দু' পাতা পণ্ডিতি বেরোয়। বজ্জাত হ'লে তুমি হ'তে যাবে কেন, সে আমি!' ব'লে ঠোঁট বাঁকিয়ে একবার হাসলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ললো, 'আফ্টার অল বিজন ইজ্ এ জিনিয়াস্। ওর ভিতরের মানুষটির সন্ধান অন্ততঃ আমি পেয়েছি।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণ ব'ললো, 'আপনার মতো লোক-নির্ব্বিশেষে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে ক'জন?'

—'পারি নাকি!' ব'লে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না মহেন্দ্র। ট্রাঙ্ক থেকে হুণ্ডির প্রয়োজনীয় কাগজ গুছিয়ে নিয়ে ব'ললো, 'আচ্ছা, চলি আবার। বাজার আজ কিছু ভালো ব'লেই মনে হ'চ্ছে। বিজুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।'

সোজা আবার পথে নেমে প'ড়লো মহেন্দ্র। তখনও অরুণের কানে তার কথাটা বাজছে: 'আফ্টার অল বিজন ইজ এ জিনিয়াস।' তার জিনিয়াসের কাছে

নিজেকে আজ একেবারেই হেয় ব'লে মনে হ'লো অরুণের।

সন্ধ্যার দিকে একসময় বিজনকে চেপে ধ'রলো সে: 'তোমার কাব্য-মালিকা প'ড়ে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়েছি, দুপুরটা বাস্তবিকই ব্যর্থ যায় নি। কিন্তু তোমার দু'টি তারা কারা?'

কিছুক্ষণের জন্ত অরুণের মুখের দিকে একবার বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধ'রলো বিজন: 'বুঝতে পারলুম না তোমার কথা।'

অরুণ ব'ললো, 'তোমার হৃদয়াকাশে কুসুমের মতো যারা ফুটে উঠেছে, এমন দু'টি উজ্জ্বলন্ত তারার কথাই ব'লছি। কারা তারা?'

সত্যকে চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে বিজন ব'ললো, 'এবারেই হাসালে দেখচি। কাব্যের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনকে জড়িয়ে তুমি দেখছি প্রমাদ সৃষ্টি করতে চাও। দু'টি তারায় নিতান্তই একটা কাল্পনিক রোমান্স ফুটে উঠেছে। তোমার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই।'

কিন্তু এতটুকু যুক্তিতেই নিরস্ত হবার লোক নয় অরুণ, ব'ললো, 'কল্পনা তো বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে কিছু নয়। আসলে তুমি নিজেকে চেপে যাচ্ছ।'

—'ক্রিমিনাল সায়ান্স সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি কিছু প'ড়ে থাকবে।' থেমে বিজন ব'ললো, 'তার আওতায় অন্ততঃ নিজেকে ফেলতে পারছি না, অতএব স্বভাবতঃই বুঝতে পারছো—নিজেকে চেপে যাবার কোনো কারণ নেই। ওটা তোমার একটা সাপোজিশন্ মাত্র। কল্পনা কখনও বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে নয়, ঠিকই; কিন্তু সে বাস্তব সর্বত্রই যে কবির ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ, এ কথাই বা পেলে কোত্থেকে?'

এবারে কথা কাটবার মতো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে প্রথমটা চুপ ক'রে যেতেই চেষ্টা ক'রলো অরুণ, পরে ব'ললো, 'কবিতাটি খুব এ্যাপিলিং হ'য়েছে। প'ড়তে গিয়ে স্বভাবতঃই মনে হয়—কবি তার নিজের জীবনকেই তুলে ধ'রেছে।'

হেসে বিজন ব'ললো, 'পাঠকের জীবনও তো হ'তে পারে!'

এ কথার জবাব না দিয়ে অরুণ ব'ললো, 'মহিন দা তোমাকে তাঁর সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন।'

—'হঠাৎ?'

—'হঠাৎ নয়, তোমার কাব্য-মালিকার প্রচ্ছদপটের জন্তে।'

—'মহিনদাকেও তবে পড়িয়েছ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখের পাতা দু'টো একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো বিজনের।

অরুণ ব'ললো, 'পড়াই নি, শুধু প্রচ্ছদপটটুকু পর্যন্তই তাঁর পরিচয় ঘ'টেছে। হঠাৎ এসে গেলেন কিনা তা ছাড়া মহিনদার কাছে লুকোচুরি ক'রবারই বা কি আছে?'

—'না কিছু নেই।' ব'লে হাত মুখ ধোয়ার অছিলায় একসময় কল-ঘরের দিকে চ'লে গেল বিজন।

অরুণও আর অপেক্ষা ক'রলো না। সকাল থেকে একটি মুহূর্তের জন্তও ঘর থেকে বেরোয়নি সে। এবারে হাফ সার্ট গায়ে দিয়ে কিছু সময়ের জন্ত সামনের পার্ক থেকে ঘুরে আসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লো অরুণ।

রেবা ব'লেছিল—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে নিয়ে তাকে শোনাতে, কিন্তু এ ক'দিনে বিজন অন্ততঃ আটটারও বেশী কবিতা লিখেছে, অধিকাংশই রোমান্টিক মনোধর্মী। যথাসময়ে খাতা নিয়ে সে রেবাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলো। কিন্তু রেবার দেখা পাওয়া গেল না, গঙ্গায় বেরিয়েছে সে হাওয়া খেতে। সহসা সমস্ত মন একবার বিষণ্ণতায় ভ'রে উঠলো বিজনের। নিশিকান্তের হাতের তৈরী চা খেয়ে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গে উপস্থিত-মতো দু'একটা কথা ব'লে আবার এসে বাস ধ'রলো সে।

একসময় ঠাট্টার সুরে মহেন্দ্র বললো, 'কবির মুখে শুধু যদি বিষাদের ছায়াই দেখবো, তবে দেশকে হাসাবে কে?'

অরুণ বললো, 'ডি, এল, রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ হাসতে ভুলে গেল। এটা জীবন-ধর্মের লক্ষণ নয়।'

বিজন ইচ্ছে ক'রেই কারুর কথায় কোনো জবাব দিল না। পাশ কাটিয়ে একসময় অন্য কোথায় একদিকে উঠে গেল।

একটা দিন বাদ দিয়ে আবার গিয়ে উঠলো সে রেবাদের বাড়ীতে। আজও রেবার দেখা পাওয়া গেল না। শুনলো—দিলীপ দত্তদের কি একটা চ্যারিটি ফাংশনে গানের প্রোগ্রাম র'য়েছে তার। কে যেন একবার ভিতর থেকে চাবুক মারলো বিজনকে। মনে হ'লো—রেবা যেন ইচ্ছে ক'রেই তাকে এড়িয়ে চ'লতে চাইছে। বিকেলের দিকে ভিন্ন ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট থেকে রাসবিহারী এভিন্যুর এতটা পথ আসা বিজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছে ক'রেই যেন ইদানিং এ সময়টাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে রেবা। হাতের মুঠোর মধ্যে কবিতার খাতাখানিকে সহসা একখণ্ড প্রস্তর ব'লে মনে হ'লো বিজনের। ফিরে এসে আবার সে পথে দাঁড়ালো। ঠিক ক'রলো, এর পর যেদিন আসবে, খালি হাতেই আসবে; রেবা বাড়ীতে না থাকলেও অন্ততঃ এমন ব্যর্থতা নিয়ে ফিরতে হবে না।

দিন দুয়েক পরে সময়টা পরিবর্ত্তন ক'রে নিয়ে রবিবারের সকালে বেরিয়ে পড়লো সে রাসবিহারী এভিন্যুর দিকে। এসময়টা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনায় আর ব্রহ্মসঙ্গীতে তৎগতমন হ'য়ে ওঠেন আচার্য্য পুরুষ। প্রতি রবিবারে নিয়মিত এ সময়টা উপাসনা সভায় গিয়ে যোগ দেন মিঃ মল্লিক। সঙ্গে যায় দিলীপ দত্ত। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হ'লে রেবাকে নিয়ে মিসেস্ মল্লিকও গিয়ে কোনো কোনো দিন ঘুরে আসেন সমাজ-মন্দির থেকে। আজ কিন্তু ব্যর্থ হ'তে হ'লো না বিজনকে। রেবা ঘরেই ছিল। দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললো, 'শুনেছি, দু'দিন এসে তুমি ঘুরে গেছ বিজুদা। দোষ তোমার নয়, আমার; দু'দণ্ড সময় ক'রে ব'সে তোমার কবিতা শোনা হ'য়ে ওঠেনি। খাতা সঙ্গে নিয়ে এসেছ তো?'

রেবার এ অনুগ্রহ না আগ্রহ? সংশয়ের দোলায় একবার দোল খেয়ে গেল বিজনের মনটা। বললো, 'খাতা সঙ্গে আনলে হয়ত আজও তোমার দেখা পেতাম না। দেখলাম—খাতাটা একেবারেই অলক্ষুণে।'

—'এমনি ক'রে বলছো কেন, বিজুদা?' কিছুটা চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রলো রেবা।

বিজন বললো, 'স্কুল কলেজের মতো তোমার ফাংশন্স্ থেকেও নিশ্চয়ই কখনও ছুটি আছে। ছুটির অবকাশে কবিতার মন নিয়েই কবিতা শুনো, এখন থাক্।'

কিন্তু রেবার গান? গানের মন নিয়েও গান শুনবার অবকাশ চাই কি তেমনি? কথাটা ব'লে হঠাৎ থেমে গেল বিজন।

রেবা বললো, 'এ তুমি অভিমানের কথা বলছো বিজুদা। আমার এই দু'দিনের আকস্মিক অনুপস্থিতিকে কি তুমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারো না?'

দেখতে দেখতে অভিমানের পাহাড় ভেঙে এবারে কুয়াসাবৃত রাত্রির বুক থেকে বরফ নেমে এলো। বিজন বললো, 'অভিমানটাই শুধু বোধ ক'রলে, আর কিছু নয়?'

উত্তরে কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল রেবা, ইতিমধ্যে মিসেস মল্লিক এসে সামনে দাঁড়ালেন। এতক্ষণের কথা তাদের সহসা একটা দমকা হাওয়ার মতই কোথায় যে উড়ে গেল—বুঝতে পারলো না তারা।

চৌদ্দ

অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে! রাজসাহীর দাম্পত্য-জীবনে অতর্কিতে একদিন সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল ছন্দার। শ্যামলকান্তির রোগটা গোড়ার দিকে ধরা পড়ে নি, পরে বোঝা গেল প্লুরিশি। শ্যামলকান্তি নিজে ডাক্তার হয়েও নিজের রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। স্থানীয় চিকিৎসকদের মধ্যে নিজেকে সার্থক নামে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে দিবারাত্রির অক্লান্ত শ্রমকে সে হাসিমুখেই বরণ ক'রে নিয়েছিল! চৈত্রের খর-রোদ কি শ্রাবণের মুষল-ধারা তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। তেমনি পারেনি ছন্দা। কতদিন ব'লেছে, 'এত পরিশ্রম তোমার সইবে না। এ সহরে ডাক্তার তো আরও কতই আছে, তোমার এত রোগী ঘাটবার দরকার কি?

যা তুমি রোজগার করো, তাতেই আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে সারা জীবন কেটে যাবে।' হেসে জবাব দিয়েছে শ্যামলকান্তি: 'আমাদের তো সরকারী চাকরী নয় যে, বুড়ো বয়সে ঘরে ব'সে পেন্সন ভোগ ক'রবো। এখন থেকে যদি কিছু সঞ্চয় না করতে পারি, তবে বুড়ো বয়সে কিসের উপর নির্ভর ক'রে বাঁচবো বলো তো?' উত্তরে ছন্দা ব'লেছে, 'সবাই যেভাবে যে অবলম্বন নিয়ে বাঁচে।'—'অর্থাৎ?' কৌতুকের দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছে শ্যামলকান্তি ছন্দার মুখের দিকে। ছন্দা আর দ্বিরুক্তি করেনি, শুধু মুখ টিপে হেসেছে। অর্থাৎ—সন্তান, তাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তাদের একমাত্র বংশধর। অলীক ছিল না এ আকাঙ্ক্ষা ছন্দার জীবনে। কিন্তু বিধাতা সে সম্ভাবনা আজও তার দেহের কোথাও ফুটিয়ে তোলেননি।

কথা রাখে নি শ্যামলকান্তি। যোগ্যতার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সে বড় ব'লে মনে ক'রেছিল জীবনে। শীতাতপ আর রৌদ্র-তাপকে তাই ভ্রূক্ষেপ করে নি সে। কিন্তু বিধাতা যাকে দুঃখ দেবেন, তাকে রক্ষা করবে কে? অকস্মাৎ একদিন সেই দুঃখই নেমে এলো ছন্দার জীবনে। তার এত সুখের আকাশে কখন্ কৃষ্ণমেঘ ডেকে এলো। শয্যা নিল শ্যামলকান্তি। বৃদ্ধ তারিণীমোহন ছুটোছুটি ক'রে ডাক্তারের পর ডাক্তার জড়ো ক'রলেন ঘরে। অষুধে, পথ্যে, ব্যাণ্ডেজে ঘর ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। অলক্ষ্যে হয়ত একবার বিধাতাপুরুষ হাসলেন। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চেপে একসময় শেষ নিঃশ্বাস ফেললো শ্যামলকান্তি। ছন্দার হাত দু'খানিকে বুকে চেপে ধ'রে একবার শেষ কথা ব'লতে চেষ্টা ক'রেছিল সে: 'নিয়তি। তার উপর মানুষের হাত নেই। তোমার কথা রাখিনি কোনোদিন, সেই অপরাধের হয়ত শাস্তি দিলেন ভগবান। তুমি দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি।' আরও হয়ত অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল শ্যামলকান্তির।

অশ্রুবন্যায় বুক ভেসে গেল ছন্দার। স্থির রাখতে পারলো না সে নিজেকে, শ্যামলকান্তির পরিত্যক্ত দেহের পাশেই কখন্ অলক্ষ্যে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলো—চার পাশে তার পাড়া-প্রতিবেশিনীদের ভিড়। শ্যামলকান্তির নশ্বর দেহকে ততক্ষণে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। শোকের আঘাতে নিজের ঘরে তারিণীমোহন ভেঙে প'ড়েছিলেন। পাড়ার লোকেরাই সৎকারের কাজ ক'রে ফিরলো। সংসারের দিক থেকে শুধু ছন্দাই সর্ব্বস্ব হারালো না, নিঃস্ব হ'য়ে গেলেন তারিণীমোহনও। তাঁর বার্দ্ধক্য-জীবনের শেষ অবলম্বন ছিল শ্যামলকান্তি। স্ত্রী সংসার থেকে চক্ষু বুজে গিয়েছেন আজ নয়। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরোটা বছরই এক-রকম হ'তে চললো। শরিকি হিস্যায় জ্ঞাতি-ভাইদের সংসার হ'য়েছে, এতদিন আপদে বিপদে তারাই দেখেছে। ছন্দাকে নিজে দেখে নিজের হাতে আশীর্ব্বাদ ক'রে ঘরের বউ ক'রে এনেছিলেন তিনি। সেই থেকে দুঃখেরও কিছু লাঘব হ'য়েছিল তাঁর। স্ত্রীর পরিত্যাক্ত সংসারকে আবার লক্ষ্মীশ্রীতে ভ'রে তুললো ছন্দা। সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, যত্ন দিয়ে ভ'রে তুললো সে আবার তারিণী-মোহনের বিষাদক্লান্ত ভাঙা মনখানিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস এসে সব কিছুকে অকস্মাৎ ওলট পালট ক'রে দিয়ে গেল। মেরুদণ্ড ভেঙে গেল তারিণীমোহনের, শেষ অবলম্বনের ভিৎ ভেঙে গেল স্ত্রীর জীবনে। এতদিনে তাঁর জীবনে সত্যিকারের সন্ন্যাস-মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

দিন কয়েক কেটে গেলে একদিন বিনা কারণেই শ্বশুর মহাশয়ের সামনে এসে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আবার অবগুণ্ঠনে দাঁড়ালো ছন্দা।

তারিণীমোহন জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কিছু ব'লবে মা?'

মনের কথা মুখ ফুটে বলতে গিয়ে একবার বাধা পেল ছন্দা। তারিণীমোহনের মুখের দিক তাকাতে গিয়ে নিজের কথাটাকে কিছুতেই সে প্রকাশ ক'রতে পারলো না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললো, 'ডিস্-পেন্সারীটা বিক্রী ক'রে দিলে হয় না বাবা?'

—'হ্যাঁ, দিতে হবে বৈ কি মা।' অভিভূত কণ্ঠে তারিণীমোহন বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় বীরেশ্বর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার এসেছিল তার চিঠি নিয়ে। ওষুধপত্র, ফার্নিচার কি কি আছে, কিরকম দাম, জানতে চান। কিছু সুবিধেয় ছেড়ে দিলে বীরেশ্বর ডাক্তার নিজেই নিয়ে নেয়। অদৃষ্টের কি পরিণাম, তাই ভাবি মা এতদিন

এখানে এই বীরেশ্বরই ছিল শ্যামলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি।' —কথার শেষে সারা বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন তারিণীমোহন।

আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না ছন্দা। সে জানতো, দুর্ব্বল মনকে নাড়া দিতে গেলে না পারবে সে শ্বশুর মশাইকে সান্ত্বনা দিতে, না পারবে নিজেকে। নীরবে তাই কিছুক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে ফিরে এলো ছন্দা। কিন্তু তাতেই কি সে শান্তি পেলো? যে অশান্তি নিয়ে তিলে তিলে নিজের মধ্যে নিজে দগ্ধ হ'চ্ছে সে, সে আগুন ক্রমে বাইরে এসেও যে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পুড়িয়ে মারছে। তা থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন ক'রে? ঘরের মধ্যে বিষিয়ে উঠছে সে প্রতিমুহূর্ত্তে। শ্যামলকান্তির স্মৃতি আগুনের শিখা হ'য়ে তাকে দগ্ধে' দগ্ধে' মারছে। খণ্ডকালের একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তও অসহ্য তার কাছে। 'কি নিয়ে থাকবে সে, কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবে সে নিজেকে? এ ক'দিন ধ'রে কত কান্নাই না কাঁদলো ছন্দা, কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বরফ হ'য়ে গেছে। কেঁদেই কি সান্ত্বনা আছে, কান্নাই কি পরম প্রশান্তি? কিন্তু পথ কোথায়, মুক্তি কোথায়, মনের আশ্রয় কোথায়? মনটা যে বল্‌গা ঘোড়া, সে যে কোথাও বাধা মানে না।

মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেলে আর-একবার এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো সে শ্বশ্রু মহাশয়ের সামনে।

আজও সেই একই প্রশ্ন ক'রলেন তারিণীমোহন: 'কিছু ব'ল্‌বে মা?'

আজ আর চেষ্টা ক'রেও নিজেকে চেপে যেতে পারলো না ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'আমি ক'দিন মাগুরায় গিয়ে থেকে আসি বাবা?'

আপত্তি করতে পারলেন না তারিণীমোহন। সংসারে নিজের রিক্ততাকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে পুত্রবধূর হৃদয় সম্পর্কে অন্ধ ছিলেন না তিনি। ব'ল্‌লেন, 'তাই এস মা। আমিও ক'দিন ধ'রে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো ভেবেছি। তোমার যে এখানে কত কষ্ট হ'চ্ছে, তা কি বুঝি না? কেউ কি পারে এভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে!'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু—আমি চ'লে গেলে আপনার যে কষ্ট হবে বাবা!'

—'আমার আবার কষ্ট!' অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'জ্ঞাতি-কুটুমেরা আছে, দরকার মতো তারাই দেখবে। তুমি কিছুদিন থেকে এস'গে কাকার কাছে। এখানে থেকে শুধু কর্ত্তব্য ক'রেই যাবে, মনেরও যে পরিবর্ত্তন দরকার মা!'

কেন যেন এবারে আর কিছু-একটাও ব'ল্‌তে পারলো না ছন্দা।

থেমে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'শ্যামলের মা একদিন তিল তিল ক'রে সাজিয়ে তুলেছিল এই সংসারকে। যেদিকে তাকাতাম, সুস্পষ্ট লক্ষ্মীর ছাপ ভেসে উঠতো চোখের উপর। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম—নারীর কি অসামান্য শিল্পীকুশলতা। কিন্তু থাকলো না, সেও চক্ষু বুজে গেল, তার সাজানো ঘরও ভেঙে গেল একে একে। তারপর এলে তুমি, তোমার স্নেহকোমল হাতে আবার সেজে উঠলো ঘর, দেখে বুক জুড়ালো। সে ঘর যে আবার এমনি ক'রেই ভাঙবে, এও কি ভাবতে পেরে-ছিলাম! অদৃষ্ট মা, সব আমার এই অদৃষ্ট।' ললাটে একবার করাঘাত ক'রলেন তারিণীমোহন। সাথে সাথে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের দু'পাশ ভিজে গেল তাঁর।

ছন্দাও নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারেনি, অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠেই সে ব'ল্‌লো, 'আমি যাবো না বাবা।'

হাতের তেলোয় অশ্রু মুছে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'তা হয় না মা। এখানে এই যক্ষপুরি আগ্‌লে এম্‌নি ক'রে তুমি থাকতে পারো না। মন জিনিষটা তো পাথর নয়, সেখানে উত্থান পতন আছে, তাকে আত্মস্থ হবার সুযোগ দিতে হয়। আমি হাজার হ'লেও পুরুষ মানুষ, দিন আমার একরকম চ'লে যাবেই। তুমি বরং এই বুড়ো বাপটার মাঝে মাঝে খোঁজ নিও, তা হ'লেই আমার শান্তি।'

নীরবে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা। বিকেল গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছিল। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে এক সময় সে তুলসীমঞ্চ থেকে প্রণাম সেরে এলো।...

এর পর একটা সপ্তাহও কাটলো না।

মাথুরায় কাকার আশ্রয়েই আবার ফিরে এলো ছন্দা। সেই চিরপরিচিত শ্যামল তরুশ্রেণী, ছোটবেলার খেলার সেই প্রাণময় পরিবেশ, নবগঙ্গার সেই ঢেউখেলানো স্নিগ্ধ জলরাশি, মাসীমা নির্ম্মলার সেই বুকভরা স্নেহ, তার সাথে মিশে আছে বিজুদার অনন্ত ভালবাসা। মনটাকে আবার যদি তবু ফিরিয়ে আনা যায় সেই শিশুজীবনের মাঝখানে।

নির্ম্মলা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদটা জেনেছিলেন, জেনে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছিলেন নিজের মনে: 'হায়রে হতভাগিনী! মানুষকে এত দুঃখও দেন ভগবান!' যে দুঃখের অনলে সারাজীবন পুড়ে ম'রলেন তিনি, সেই দুঃখ-সাগরে অবশেষে ছন্দাকেও ঝাঁপ দিতে হ'লো! এত বড় দুঃসংবাদটা চেষ্টা ক'রেও বিজনকে পৌঁছে দিতে পারেন নি তিনি। নির্ম্মলা জানতেন—ক'লকাতার মেসের ঘরে ব'সে ছন্দার এতবড় শোক বিজন সহ্য করতে পারবে না। ইচ্ছে ক'রেই তাই ছেলের কাছে গোপন ক'রে গেছেন তিনি সংবাদটা। ছন্দা এসে এবারে যখন তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো, তখন সান্ত্বনা দেবার ভাষাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি। সস্নেহে মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শুধু বললেন, 'এ তোর কপাল পোড়েনি মা, পুড়েছে আমাদের। কাঁদিসনে, কেঁদে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কাঁদলাম তো এতকাল আমিও, কিন্তু পেয়েছি কি? কপালের সিঁদুর মুছে এলি, এ তোর জীবনের যত বড় সত্য হ'লো, তার চাইতেও বড় সত্য হ'লো—আজ থেকে তুই এই পোড়া বাংলাদেশের হতভাগিনী বিধবা। জানিস তো—এ সংসারে বিধবার কি জ্বালা! কোথাও তার মাথা উঁচু ক'রে কথা বলবার অধিকার নেই।'

ব'লতে গিয়ে নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারলেন না নির্ম্মলা। টশ্‌ টশ্‌ ক'রে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে ছন্দার কপালের এক পাশ ভিজে গেল। থেমে নির্ম্মলা বললেন, 'সংসারের নানা বন্ধনে জড়িয়ে প'ড়ে এপথ যেন ভুলে যাসনে মা। রোজ অন্ততঃ একবারটি এসে মাসিমাকে দেখা দিয়ে যাস্।'

—'না এলে আমিই বা কি নিয়ে বাঁচবো মাসীমা!' বলতে গিয়ে অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল ছন্দার।

ঘরে এলে একসময় রসিকলাল কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন ছন্দাকে। শরীরে বাত এসে আজ প্রায় একেবারেই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে রসিকলালকে। আগের চাইতে বুড়িয়েও গেছেন অনেকখানি। সংসারবৈরাগ্য-মন নিয়ে এখনও তবু তাঁকে সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্ছে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে ব'সে। সেদিকে এতটুকুও সহানুভূতি নেই অঞ্জনার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার জিহ্বা তাঁর প্রশমিত না হ'য়ে অরও শাণিত হয়েছে। ছন্দার বিয়ে হ'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি; হতভাগিকে বিদেয় ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলেন তিনি চিরদিনের মতো। কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। এতদিনে সাশ্রুনেত্রে ছন্দা এসে আবার তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই কপালে চোখ তুললেন অঞ্জনা, মনে মনে অভিসম্পাত ক'রলেন: শ্যামলকান্তি না গিয়ে ছন্দা কেন গেল না চক্ষু বুজে! হ'ড় তবে জুড়োতো অঞ্জনার। সংসারে বৈধব্যের যে আরও বেশী জ্বালা, তার জন্তে চাল-চুলোর ব্যবস্থা চাই স্বতন্ত্র, ছোঁয়া-ছানার বালাই আছে পদে পদে। এমন জ্বালায় মানুষ পড়ে?

কিন্তু অঞ্জনার জ্বালা কোনোকালেই যেমন রসিকলালকে বেঁধেনি, আজও তেমনি বিঁধলো না। শুধু ছন্দার দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখে বুকখানি তাঁর ভেঙে গেল। নিজের হাতে একদিন বিয়ের আসরে তিনি সম্প্রদান করেছিলেন ছন্দাকে, তার পিছনে এমন অভিঘাত লুকোনো ছিল, এও কি জানতেন তিনি?

ছন্দাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কণ্ঠ তাই আর্দ্র হ'য়ে উঠলো রসিকলালের। বললেন, 'মনকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা কর মা। হিন্দু জাতি আমরা আত্মার বিশ্বাসী. আত্মা অমর, তার মৃত্যু নেই। গীতায় ভগবান বলেছেন—বাসাংসি জীর্ণানী, অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ ক'রে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র পড়ে, তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নতুন দেহ ধারণ করে আত্মা। দেহ পতনশীল, কিন্তু

আত্মা অমর। শ্যামলের সেই অমর আত্মা অমৃতলোকে শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা কর্ মা।'

দিনরাত যে সেই প্রার্থনাই ক'রছে ছন্দা। তার কি ভাষা আছে, তার কি অভিব্যক্তি আছে! তিলে তিলে সেই প্রার্থনা যে তার ধমনীর রক্তে রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হৃদয় তবু প্রশমিত হ'চ্চে কই? এখানে যাঁর সঙ্গে তার প্রতিমুহূর্তের সম্পর্ক, তাঁর মুখ কালো মেঘের মতো থম্‌থমে; গম্ভীর। তিনি অঞ্জনা। আর যে ছিল, সে সবিতা, কিছুদিন হ'লো তার বিয়ে হয়েছে। রাজসাহীর ঘরে ব'সে সংবাদ পেয়েছিল সে যথাসময়েই, কিন্তু এসে বিয়েতে যোগ দেওয়া হয়নি তার। কাকা নিজেই উৎসাহ দেখাননি। না দেখাবার পিছনে তাঁর যে কতখানি ব্যথা লুকিয়ে ছিল, সে কি জানতে বাকী আছে ছন্দার! দু'চোখের বিষ কি সবিতারই কম ছিল সে! খবর এসেছে—আট ন' মাসের পোয়াতি সে, শীগ্‌গিরই মার কাছে আসবে। এসে আবার কোন্ নজরে দেখবে সে তাকে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যাকে দেখলে, যার মুখের দু'টো কথা শুনলে এই থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যেও বুকখানি শান্তিতে ভ'রে যেতো, সে আজ গ্রামে নেই। বিজুদা: বিজন। প্রতি মুহূর্তে আজ তার অভাবটাই বড় ক'রে বাজছে বুকে। মনের শান্তির জন্য মানুষ এমন ক'রেও মাথা খুড়ে মরে!

এক কথা ভাবতে গিয়ে সহস্র কথার জাল এসে ঘিরে ধরে সারা মনটাকে। চিন্তাধারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। রসিকলালের কথার জবাবে একটি কথাও এসে অধরোষ্ঠকে কাঁপিয়ে তোলে না।—বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা।

ভাঁড়ার ঘরের সাজসরঞ্জাম নিয়ে তখন উদ্দীপ্ত কণ্ঠ জ'লে উঠেছে অঞ্জনার। কাকার পাশ থেকে উঠে ত্রস্তে একসময় কাকিমার পাশে গিয়েই দাঁড়ালো ছন্দা, বললো, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন কাকিমা, আমি গুছিয়ে রাখছি সব।'

পনের

ক'লকাতার জীবনে মহেন্দ্র শুভক্ষণে বিজনকে নিয়ে মুক্ত হাওয়ায় মুখর হ'য়ে উঠেছে বোটানিকাল গার্ডেনে। বিজনের 'কাব্য-মালিকা' যথাসময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল মহেন্দ্রের। অরুণই উৎসাহী হ'য়ে সংযোগটা ঘটিয়েছিল। সেই থেকে অরুণেরও বিজনের কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। মনে মনে সেও কবিতা রচনার প্রয়াস খুঁজ্‌ছিল, কিন্তু আকাশ-পাতাল ভেবে একটা পংক্তিও কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারছিল না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যসৃষ্টিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বস্তু ব'লে মনে মনেই কাব্যলক্ষ্মীকে নমস্কার ক'রে আত্মসম্বরণ ক'রেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রের দিকটা একেবারেই স্বতন্ত্র। এককালে কবিতা সে ভালোবাসতো, কবিতা রচনায় হাতও ছিল তার; কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে একদিন সেই কবিতা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল তার জীবনে। সেটা সে ভিন্ন সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কেউ জানে না। মাঝে মাঝে স্মৃতির পথ বেয়ে সেই জীবনটা এসে সামনে দাঁড়ায়, অলক্ষ্যেই আবার সে চঞ্চল কর্মব্যস্ততার মধ্যে কখন্ হারিয়ে যায়। বোটানিকাল গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে আবার সেই জীবনটা যেন মনের কোন্ নিভৃত কোণে হঠাৎ এসে উঁকি দিয়ে গেল। নিজেকে সম্বরণ ক'রে যেতে চেষ্টা ক'রলো মহেন্দ্র। বললো, 'তোমার কবিখ্যাতি একদিন দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ুক,এই কামনাই করি বিজন। কিন্তু সংসারের পথ বড় ক্ষুরধার, জীবনে কাব্যকে টিকিয়ে রাখা সেখানে মস্তবড় শক্তি-সাপেক্ষ।'

বিজন ব'ললো, 'সামান্য একটা খণ্ডকালেই যার সমাধি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, গোটা জীবনের প্রশ্নটা সেখানে একেবারেই অসার্থক। কবিতা লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছি মহিনদা, তা নিয়ে আমার জীবনে কোনো প্রশ্নই নেই। আপনি লিখ্‌লেই বরং তা শোভা পায়।'

—'কট্‌কা বাজারের মানুষ হ'য়ে আমি লিখ্‌ব কবিতা, এবারেই হাসালে তুমি।' থেমে মহেন্দ্র ব'ললো, 'এখন্ জীবন নেই, শুধু জীবিকা।'

—'কোনোদিন তবে জীবন ছিল বলুন?' চ'লতে চ'লতে হঠাৎ একবার থ'মকে তাকালো বিজন মহেন্দ্রর মুখের দিকে।

আত্মসম্বরণের বাঁধ বুঝি এবারে একেবারেই ভেঙে যেতে ব'স্লো। কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে মহেন্দ্র বললো, 'অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। তোমার কাব্যমালিকার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সেই জীবনটার দিকেই হঠাৎ একবার কখন্ দৃষ্টি প্রসারিত হ'য়ে গেল। ফেরাতে পারলুম না।'

—'কবিতা তবে আপনিও লিখ্‌তেন?'

গাছের ডালে ডালে দক্ষিণা বাতাস একবার দোলা দিয়ে গেল। সেদিকে লক্ষ্য গেল কিনা কারুর ব'ল্‌তে পারি না।

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'লিখ্‌তুম। উঠ্‌তি যৌবনের জোয়ারে তখন কেবল স্নান ক'রে উঠেছি। কবিতার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে একদিন ভালবাসলাম হঠাৎ, হাসি ছিল তার শরতের শিউলীর মতো। সেই প্রথম জীবনে আমার কবিতা এলো। রোজ একটি ক'রে কবিতা লিখতাম আর তাকে উপহার দিতাম। দু'বছরে প্রায় সাতশো ত্রিশটা কবিতা জমা হ'য়েছিল তার হাতে, সেই সাথে ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা দু'একটুকরো চিঠি। কিন্তু আমি কি জানতুম, শূন্যে সৌধ নির্মাণ ক'রতে চলেছি! আমার জীবনে মল্লিকার অবির্ভাব ঘট্‌লো না। কোথায় একদিন তার মালাবদলের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে চুকে গেল। মনে মনে ব'ল্‌লাম—সুখী হও তুমি মল্লিকা।'

পা দু'খানি হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল বিজনের, মুহূর্তের জন্ত একবার থ'মকে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লো, 'ব'ল্‌তে পারলেন একথা মহিনদা?'

—'পারলুম বৈ কি! তার অকল্যাণ কি কোনোদিন চেয়েছি?' ব'লে ম্লান একটুকরো হাসলো মহেন্দ্র।

বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আর কোনোদিনই কি তার দেখা পাননি?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'পেয়েছি, শুধু একবার এবং শেষবার। ব'ল্‌লাম, 'কবিতাগুলো এবারে ফিরিয়ে দাও, ওগুলো দিয়ে বই ছাপিয়ে তোমার নামে উৎসর্গ ক'রে প্রেমকে আমার অক্ষয় ক'রে রাখবার অন্ততঃ কিছুটাও সুযোগ পাই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যেন বজ্রপাত ঘট্‌লো। বললো—অতীতের ছেলেখেলাকে এতদিনও কি সযত্নে সাজিয়ে রাখতে বলো? সংসারদুর্গে প্রবেশ ক'রবার দিন সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেছি। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন মল্লিকার সামনে থেকে। ভালোবাসা হ'লো ছেলেখেলা, তাই নির্বিবাদে তার বুকে অগ্নি-সংযোগ ক'রে দিতে পারলো সে। ভাবলাম—কবিতা দিয়ে নিজের জীবনটাকে অন্ততঃ আর কোনোদিনই প্রতারণা ক'রবো না। বেছে নিলাম পথ, জীবনটা ফট্‌কা ভিন্ন আর কিছুই নয় বিজন, ঢুকলাম তাই এই ফটকার কারবারে শেয়ার মার্কেটে। এ ব্রিলিয়েণ্ট লাইফ, বেঁচে থাকবার পক্ষে অন্ততঃ চমৎকার জীবন।'

একটা দুরন্ত জিজ্ঞাসা হঠাৎ যেন কেমন রুদ্ধ হ'য়ে গেল বিজনের কণ্ঠে। মনে মনে শুধু একবার উচ্চারণ করলো সে—অদ্ভুত বিচিত্র মানুষ এই মহেন্দ্র। বাইরে কঠিন কর্মব্যস্ততার প্রলেপ দিয়ে প্রশমিত ক'রে রেখেছে অন্তরের ব্যথাদীর্ণ ভালোবাসাকে। স্বল্পক্ষণ থেমে পরে বললো, 'আপনি শক্তিমান পুরুষ, মহিনদা।'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ—এমন ক'রে যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, সংসারে সে যথার্থই শক্তিমান বৈ কি?'

মহেন্দ্র বললো, 'প্রেমের ব্যাপারে আত্মবলি দেওয়াকে চিরকালই আমি কাপুরুষতা ব'লে ঘৃণা করি। মল্লিকাকে না পেয়ে তাই মনে দাগ রাখতে দিই নি।'

এবারে না হেসে পারলো না বিজন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'হাসলে যে বড়?'

—'হাসির কথা ব'ল্‌লেন কি না, তাই।' বিজন ব'ল্‌লো, 'যেটাকে দাগ ব'ল্‌লেন, সেটা ঠিকই অন্তরে বিঁধে আছে, তাকে শুধু ছাই চাপা দিয়ে রেখেছেন, এই পর্যন্ত।'

—'ধ্যেৎ।' কৃত্রিম বকুনির সুরে হঠাৎই শব্দটা উচ্চারণ ক'রলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'চলো, এবারে ফিরি।'

বিজন বুঝলো, ইচ্ছে ক'রেই নিজেকে চেপে যেতে চাইল মহেন্দ্র। তাই আর কথাটা নিয়ে বড়বেশী ঘাটাঘাটি ক'রলো না সে; কথার তাল রেখে শুধু ব'ল্‌লো, 'চলুন।'

বোটানিকাল গার্ডেনের বুকে তখন চাঁদের আলো এসে ঠিক্‌রে প'ড়েছে। এমন অপূর্ব্ব পরিবেশে চাঁদটাকে আজ যেন নতুন চোখে দেখতে পেলো বিজন। ক'ল্‌কাতায় এসে অবধি এমন ক'রে এর আগে কখনও চন্দ্র-দর্শন ঘটে ওঠে নি। চাঁদের জ্যোৎস্নালোকিত আর্শিতে প্রথম যার মুখখানি তার মনে ভেসে উঠলো, সে ছন্দা। সহসা ছন্দার জন্য মনটা কেমন অস্থির হ'য়ে উঠলো তার। শ্যামলের অসুখের কথাটাই শুধু শুনেছিল সে, তার নিরাময়ের সংবাদ এসে তার কানে আর পৌঁছায় নি। আর একবার উর্দ্ধাকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রলো সে চন্দ্রাননের মধ্যে। এবারে যার মুখখানি অকস্মাৎ ভেসে উঠলো তার মনে, সে রেবা। চাঁদের মতই শুভ্রকান্তি। মনে প'ড়লো—কিছুদিনের মধ্যে আর বড়একটা যাওয়া হয়নি রেবাদের বাড়ীতে। এই মুহূর্ত্তে এই চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় মুখোমুখি ব'সে যদি অবকাশ পেতো সে রেবার স্বভাবসুন্দর কণ্ঠের গান শুন্‌বার, আরও শুভ্রসুন্দর হ'য়ে উঠতো না কি তবে এই জ্যোৎস্নাবিধৌত সন্ধ্যা ?

চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'খানিকটা যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লে তুমি, দেখতে পাচ্ছি।'

ছোট্ট ক'রে বিজন শুধু ব'ল্‌লো, 'উপভোগ করছি এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে।'

সহসা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লো মহেন্দ্র, 'আজ যদি অমাবস্যা হ'তো ?'

—'শ্মশানে গিয়ে তবে আত্মদর্শন করতাম।' জবাব দিতে এতটুকুও বিলম্ব হ'লো না বিজনের। ব'ল্‌লো, 'অন্ধকারের গর্ভ থেকে যখন চিতাগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌তো, তার স্ফুলিঙ্গকে তারার মতো উড়িয়ে দিতাম এম্‌নি একটা চাঁদের প্রচ্ছন্ন রূপের উদ্দেশে। অমাবস্যারও একটা আলাদাই রূপ আছে বৈকি মহিনদা ?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কবি মানুষ তুমি, তোমার কাছে রূপ আর অ-রূপ এক হ'য়ে গেছে। আমরা বাস্তব জগতের মানুষ, আমাদের কাছে অমাবস্যাটা বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

ইতিমধ্যে সাম্‌নে এসে বাস দাঁড়াতেই দু'জনে উঠে প'ড়লো। কণ্ডাক্টারের হাঁকাহাঁকিতে কণ্ঠ এবারে তাদের চাপা প'ড়ে গেল। ভ্যাঁপুর কর্ণবিদারি শব্দে দ্রুত বেগে ছুটে চ'ল্‌লো বাস: বোটানিকাল গার্ডেনকে পিছনে ফেলে একেবারে শিবপুর বাজার, তারপর হাওড়া ষ্টেশন, তারপর—

যখন এসে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পৌঁছালো তারা, সাম্‌নের একটা বড় টাওয়ার ক্লকে তখন জলতরঙ্গের মতো সাড়ে আটটার ঘণ্টা বেজে যেতে শোনা গেল।···

[ক্রমশঃ

কান্তকবি রজনীকান্ত

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের যৌবনকালে কান্তকবির গান ঘরে ঘরে শুনিতাম। কবি নিজে ভালো গাহিতে পারিতেন, তাঁহার সুর তাল মানের জ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাই তিনি আসল গান লিখিতে পারিতেন। আজকাল যেমন নভেলকে নাটকে পরিণত করার মত কবিতাকে গানে পরিণত করা হয়, সে যুগে তাহা ছিল না। সে যুগে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহারা গানের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গান রচনা করিতেন। রজনীকান্ত কবিতা খুব কম লিখিয়াছিলেন—তাঁহার কবিপ্রতিভা ছিল সঙ্গীতময়ী—তাহা অজস্র গানেই অভিব্যক্ত হইয়াছে।—তাঁহার গানগুলি তিনি নিজেই গাহিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বাগ্‌যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া গানগুলি দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। নিয়তি তাঁহার বাগ্‌যন্ত্রেই মৃত্যুবীজ রোপণ করিলেন; তাঁহার কণ্ঠ অকালে নীরব হইল। এখন তাঁহার গানের বিশেষ আদর নাই। এখন তাঁহার গানগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠাতেই বন্দী হইয়া আছে। আমরা 'বাণী' 'কল্যাণী' ইত্যাদি গ্রন্থে সেই চমৎকার গানগুলির সাক্ষাৎ লাভ করি।

তাহাও সম্ভব হইত না, যদি তিনি বাণী কল্যাণীর গ্রন্থস্বত্ব স্বল্পমূল্যে বিক্রয় না করিতেন। এদেশে গ্রন্থকার বিপন্ন হইয়া অর্থকষ্টের তাড়নায় গ্রন্থস্বত্ব স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করেন। প্রকাশকগণ গ্রন্থকারের দারিদ্র্যের সুযোগ পাইয়া স্বল্পমূল্যে গ্রন্থস্বত্ব কিনিয়া ল'ন—সে জন্য আমরা আক্ষেপ করি এবং প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা মস্ত অভিযোগ এই। কিন্তু আমরা নিজেরাও দেশমান্য গ্রন্থকারদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য কোন ব্যবস্থাও করি না—কোন বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থাও নাই। ফলে, প্রকাশকগণ যে সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব কিনিয়া ল'ন—সেই গুলিতেই গ্রন্থকার দেশে জীবিত থাকেন। ভাগ্যে কান্তকবি বাণী কল্যাণীর গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিয়াছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশককে, তাই তাঁহার গ্রন্থ দুইখানির বহু সংস্করণ হইয়াছে এবং দেশের লোক কান্ত কবিকে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই। গ্রন্থ দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদপটে মণ্ডিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে—সহজেই তাঁহার গানগুলির মুদ্রিত রূপ লোকের হাতে হাতে পৌঁছিয়াছে।

কবি কর্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন—মৃত্যু যখন অনিবার্য্য ও আসন্ন, তখনও কবির লেখনী অবিশ্রান্ত চলিতেছিল। সেই সময়ে দেশে কবির প্রতি একটা গভীর সহানুভূতির ভাব প্রবুদ্ধ হয়। তাহার ফলে তাঁহার অভয়া, আনন্দময়ী, বিশ্রাম, অমৃত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অমৃত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, সেজন্য ইহার কতগুলি সংস্করণ হইয়াছে—অমৃতের ছোট ছোট কবিতাগুলির সৌজন্যে রজনীকান্ত ছাত্রসমাজে সুপরিচিত। আমাদের দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশু রায়, নীলকণ্ঠ, বাউল ফকির ও দেহতত্ত্বমূলক গীতি-রচয়িতাদের গানগুলির মধ্য দিয়া দেশে যে সঙ্গীতের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, রজনীকান্ত সেই ধারার শেষ কবি।

রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য এই,—পূর্ব্বতন সঙ্গীত-রচয়িতাদের গানগুলির মুদ্রিতরূপ ছন্দোবন্ধের দিক হইতে অনবদ্য নয়, কান্তকবি রবীন্দ্র যুগের কবি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কান্তকবির গানগুলিতে ছন্দোবন্ধের পারিপাট্য অনবদ্য। কান্ত কবির রচনাভঙ্গী প্রধানতঃ প্রাক্তন সঙ্গীতরচয়িতাদের মতই—তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত সুরে তাঁহার গানগুলি রচিত। দুই চারিটি গানে কবি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরও সংযোজিত করিয়াছেন। কেবল হাসির গানগুলিতে তিনি তাঁহাদের অনুকারক নহেন। হাসির গানগুলিতে তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। অমৃতের ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কণিকার অনুসরণে Epigrammatic ভঙ্গীতে রচিত। প্রভেদ হইতেছে—রবীন্দ্রনাথের কণিকার কবিতাগুলি প্রধানতঃ শ্লেষব্যঙ্গাত্মক, রজনীকান্তের কবিতাগুলি নীতিমূলক।

কান্ত কবির গান গুলিকে বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।
১। ভগবদ্ভক্তিমূলক ২। দেহতত্ত্বমূলক ৩। বৈরাগ্যমূলক
৪। আগমনী বিজয়ার গান ৫। হাসির গান ৬। নীতিমূলক।

ভগবদ্ভক্তিমূলক গানে তিনি ব্রহ্মের পিতৃরূপ ও মাতৃরূপ দুইই কল্পনা করিয়াছেন। যে গানগুলিতে পিতৃরূপ কল্পিত হইয়াছে—সে গুলিতে ব্রাহ্মসঙ্গীতের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়।

এই শ্রেণীর সঙ্গীতে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিতে না পারার জন্ম কবিচিত্তের একটা আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—এই আক্ষেপের সুর নরোত্তম দাস, লোচন দাস ইত্যাদি সাধক কবিদের কথা মনে পড়ায়। দুই একটি অংশের উৎকলন করি—

(১) প্রেমিক হৃদয় গুলি প্রেমানল শিখা তুলি
জয় প্রেমময় বলি তব পানে ধায়।
সে বহ্নিপরশে মম সিক্ত ইন্ধনসম
হৃদি হতে উঠে শুধু ধূম।

(২) —কেন বঞ্চিত হব চরণে
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি পাব
জীবনে না হয় মরণে।

বহুগানে তিনি ব্রাহ্মসঙ্গীতের অনুসরণে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কবি তাঁহাকে কোন মঠমন্দিরে দেখেন নাই—কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে দেখেন নাই—কোন দেবদেবীর মধ্যে দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকে বিশ্বব্যাপ্তরূপে—বিশেষতঃ বিশ্বমানবেরই মধ্যে। যেমন—

সাধুর চিত্তে তুমি আনন্দরূপে রাজো
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে।
প্রেমরূপে জাগো সতীর হিয়া মাঝে
স্নেহরূপে জাগো জননী নয়ানে।

সমগ্র বিশ্বই নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। তাহাই আবার নিরুপাধিক ব্রহ্মকে উপাধি মালায় মণ্ডিত করিতেছে—

উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমার মূরতি করাল
মরীচিকা ঘোষে তুমি ইন্দ্রজাল
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
অনুতাপী কহে তুমি ক্ষমাবান্
ভক্ত কহে তুমি আনন্দ বিধান
সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্য পান
প্রকাশে তোমার করুণা অতল।

তাই তিনি বলিয়াছেন

অনন্ত দিগন্তব্যাপী অনন্ত মহিমা তব
আমি ক্ষুদ্র দীন কবি কিবা জানি কিবা ক'ব?

কবি হতাশ ন'ন—তিনি জানেন যিনি পতিতপাবন, তিনি একদিন পতিতকে তরিবেনই। তবে যত বিলম্ব হয়, ততই উৎকণ্ঠা বাড়ে। কবে সেদিন আসিবে তাহারই অপেক্ষায় কবি বলেন—

কবে—তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।

রামপ্রসাদের 'এমন দিন কি হবে মা তারা, যেদিন তারা তারা তারা ব'লে দুনয়নে বইবে ধারা,' অথবা নীলকণ্ঠের—'কত দিনে হবে আমার প্রেমের সঞ্চার'—এই গান দুইটির কথা মনে পড়ে।

কবি বলেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন নাই—তবু লোকে ভক্ত মনে করে—সেজন্য তিনি লজ্জিত—

তোমারি ত আমি খাই পরি তবু
তোমারই করি পরিহাস।
তোমার সেবা নাহি করি তবু কেন হরি
লোকে বলে মোরে হরিদাস।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কবি আত্মচৈতন্যসম্পাদনের জন্য ভগবানের রুদ্র আঘাত প্রার্থনা করিয়াছেন—

(১) ফেলে যাও আর করো না যতন ফিরাও বদন সরাও চরণ।
ছাড় মোর আশা মোর ভালবাসা (বুকে) লাথি মেরে চলে যাও।

(২) প্রভু নিদাঘ হৃদয়ে কর কঠিন আঘাত
কর চূর্ণ কলঙ্কিত এ শোণিত পাত।
মৃদু প্রতিকারে ব্যাধি হবেনা নিপাত গো
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ।

বাংলার বাউল ও সহজিয়া কবিরা তত্ত্বমূলক গানে হেঁয়ালির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—ঠারেঠোরে তাঁহারা বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এজন্য রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রজনীকান্তের তত্ত্বমূলক গানে অস্পষ্ট কিছুই নাই, বক্তব্য পরিচ্ছন্ন। তবে তিনিও অনেক স্থলে সঙ্গিরূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে একটি 'পর পার'

ভাসারে জীবন তরণী ভবের সাগরে।
যাবি যদি ওপারের সেই অভয় নগরে। ইত্যাদি

একটি গানে কবি বলিয়াছেন—

তুই ঘুরে বেড়াস পরিধিতে
সে যে বসে আছে কেন্দ্রটিতে
সাধনা—ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।

এইরূপ রূপক কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। এরূপ উপমা পূর্ব্বের কবিদের জানা ছিল না। কবি গ্রহরহস্যে জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা

ভগবৎতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'যোগ' শব্দটিকে শ্লেষে ব্যবহার করিয়া কবি গণিতশাস্ত্রের বিবিধ প্রকরণের রূপকে ভাগবত সংযোগের কথা বলিয়াছেন। এই গানটির মধ্যে যথেষ্ট কলা চাতুর্য্য আছে।

যোগ কর প্রাণ মনে,
আর কাজ কি ভবের ভাব পুরণে ?
হয়োনা কাতর বিয়োগে হাসবে লোকে দেখে শুনে।
আগে নে মনকষাকষি করিসনে মন কষাকষি
সরল কররে জটিল রাশি, থাকিস্ নে বসি'
ভবের, মিথ্যা মিশ্র সঙ্কলনে। ইত্যাদি—

দেশাত্মবোধজাগরণে কান্তকবির কিছু দান ছিল। তাঁহার —'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', অথবা 'আমরা নেহাৎ গরিব আমরা নেহাৎ ছোট, তবু সাত কোটি ভাই জেগে ওঠ'—তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।' এই তিনটি গান স্বদেশী যুগে সভায় সভায় পথে পথে গীত হইত। কান্তকবির আর একটি গান—তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা। এ গান মাধুর্য্যে দ্বিজেন্দ্র লালের বিখ্যাত গানগুলির সমকক্ষ,—গাম্ভীর্য্যে দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতকেও অতিক্রম করিয়াছে।

বৈরাগ্যমূলক গানগুলিতে মোহমুদ্গরী ভাব আছে। আবার কতকগুলি কেবল প্রমত্তচিত্তে প্রসাদসঞ্চারের জন্য। যেমন 'নশ্বরত্ব' গানে—

১। ভাই এখন দেখরে ভেবে বসা কি উচিত দেবে
কখন টান দিয়ে নেবে (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয়।
সে যে—কি ভেবে কখন কি করে কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে
কান্ত, তুই জীবন ভয়ে ভাব্ না সেটাই ভাবের বিষয়।

২। যা খেলে আর হয় না খেতে
যা পেলে আর হয় না পেতে
তাই ফেলে দিনে রেতে মরিস্ কিসের পিপাসায়।

মোহমুদ্গরী ভাবের গানগুলিতে জরামরণের ভয় দেখানো হইয়াছে। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে 'কত বাকি ?', 'আর কেন ?' 'এখনও' 'বৃথাদর্প' 'পরিণাম' এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে 'শেষ দিন'টি চমৎকার রচনা। ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য শতকের অনুসরণে কবি রক্তমাংসমেদোময় দেহের জঘন্যতা দেখাইয়া জুগুপ্সার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কোন কোন গানে।—

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই
এতে—ভাল জিনিস একটি নাই।
(এইত) অস্থি চর্ম্ম মাংস মজ্জা মেদ
মূত্র বিষ্ঠা পিত্তশ্লেষ্মা দুর্গন্ধময় ক্লেদ ?
এটা, পুঁতে রাখে পুড়িয়ে ফেলে
(না হয়) অমনি ফেলে দেয়রে ভাই।

কবির নীতিমূলক গানগুলিতে পরিণামে দণ্ডের ভয় দেখানো হইয়াছে—যেমন—

যত—খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা মদ গাঁজা ভাঙ্ বারাঙ্গনা
এর মজা বুঝবে সেদিন যেদিন যাবে শিঙে ফুঁকে।

বিলাসের অসারতা দেখাইয়া এবং জরায় যৌবনের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করাইয়া সময় থাকিতে তরুণদের সতর্ক হবিার জন্য কবি বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

এখন, মরছ মাথা খুঁড়ে,
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল পড়ল বালি গুড়ে
যখন গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে বলতে বিঘত মাটি প্রহর বলতে পল।
এখন যষ্টি ভিন্ন যষ্ঠীর বাছা সাতকুঁড়ের এক কুঁড়ে।

× × ×

ছিল দেহের বাহার কি!
সোনার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি।
এখন হাড়ে চামড়া আছে মাংস গেছে উড়ে।

× × ×

দীন কান্ত বলে ভাই,
আগেই আমি বলেছিলাম তখন শোনো নাই।
(আর) কি ফল হবে খুঁড়লে কুয়ো বাড়ীই গেছে পুড়ে।

শেষের সেদিনটিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বৈরাগ্য উদ্দীপনের এবং ধর্ম্মের পথে আকর্ষণের একটি চিরপ্রচলিত পদ্ধতি। কবি গাহিয়াছেন—

যেদিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট;
বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ হবে নিজ নিজ স্থানভ্রষ্ট।

× × ×

কেবল, বুকের কাছে একটু থাকবে রে ধুকধুকি
আর ঈষৎ নড়বে শুধু ওষ্ঠ
মলমূত্রে কফে জরে পড়ে রবে সোনার শরীর পরিপুষ্ট।

কান্ত বলে ভ্রান্ত মনরে বলি শোন, এখন, লাগছে না বটে মিষ্ট,
কিন্তু—সকল সত্যের চেয়ে এইটে সত্যি কথা দিনত গেল
ভাবরে ইষ্ট।

পরিণাম কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

যেদিন কফের নাড়ী উঠবে জেগে বায়ু পিত্ত ক্ষীণ
সেদিন কস্তুরী ভৈরবে হালে পাবে না আর পানিরে।
বসবে ঘিরে মাগ ছেলে
বলবে—ব'লে যাওগো কোন সিন্ধুকে কি রেখে গেলে।
গুণবে টাকা, কাণে কেউ দেবে না তারকব্রহ্ম বাণীরে।

কবির প্রার্থনাসঙ্গীতের মধ্যে 'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম্ম মুছায়ে'—গানটি খুব বিখ্যাত।

ইহাছাড়া—"এই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু দেখাও তব চির আলোক লোক", "তোমারি দেওয়া তোমারি লওয়া দুখ—তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব"; "পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি ঘোরে দিনপতি"; "তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।" ইত্যাদি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আমাদের দেশের সাধক কবিগণ—সকলেই আশাবাদী, তাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্ত করুণায় বিশ্বাসী। তাই তাঁহারা মনে করেন—ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়—ভগবানও তেমনি ভক্তকে চান। আমি চাই আর না চাই—তিনি আমাকে চান—কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার কাছেই যাইতে হইবে। দুর্ব্বল সসীম জীব আমরা, আমাদের ভুলভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক—করুণাময় কি সেজন্য তাঁহার সন্তানকে বর্জ্জন করিতে পারেন?—এই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়া রজনীকান্তের রচনায় সঞ্চারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কান্তকবির—"আমিতো তোমারে চাইনি জীবনে তুমি আমারে চেয়েছ"; "(আমি) অকৃতি অধম ব'লেও ত তুমি কম ক'রে মোরে দাও নি।" ইত্যাদি গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভগবান সম্বন্ধে এই আশ্বস্ত মনোভাব স্বতঃই ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনায় প্রণোদিত করে। রজনীকান্ত রামপ্রসাদের অনুসরণে বিশ্বজননীর কাছে আবদার অভিমান জানাইয়াছেন—

১। কোন ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন হেলায় খেলায়।

২। আহা, কত অপরাধ করেছি আমি তোমার চরণে মাগো।

৩। (মা আমায়) আমারে আদর করোনা নিওনা নিওনা কোলে—

৪। মাগো, সকলি আমার ভ্রান্তি।

৫। কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।

এই গানগুলিতে প্রসাদী বাৎসল্যরস চলচল করিতেছে। কান্তকবির ভগবন্মহিমাবিষয়ক গানগুলির মধ্যে এই গানটি সুন্দর—

তুমি—সুন্দর—তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি—উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য নন্দনপ্রভাময়।
তুমি, অমৃত বারিধি হরি হে
তাই—তোমার ভুবন ভরি হে
পূর্ণ চন্দ্রে পুষ্প গন্ধে সুধার লহরী বয়।
ঝরে সুধাজল ধরে সুধাফল পিপাসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি—সর্ব্ব শকতি মূল হে,
তাহে—শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে উপদেশ নাহি লয়।
নাহি ক্রম ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি—প্রেমের চিরনিবাস হে
তাই—প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে
তাই—মধু মমতায় বিটপিলতায় মিলি প্রেমকথা কয়।
জননীর স্নেহ গভীর প্রণয় গাহে তব প্রেমজয়।

এই গানটির ছন্দে কেবল নাহি ক্রম ভঙ্গ ইত্যাদি চরণে ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে—নতুবা ইহা ছন্দের পারিপাট্যে অনবদ্য। এই পর্য্যায়ের গানগুলির মধ্যে 'আকাশসঙ্গীত' সুন্দর রচনা—ইহা রীতিমত গীতিকবিতা।

'চিরশৃঙ্খলা' গানটিতে কবি বলিতে চাহিয়াছেন—এই বিশ্বের অপরিবর্ত্তনীয় শৃঙ্খলাই অনবরত ঘোষণা করিতেছে এই বিশ্বের মূলে একটা বিরাট চিৎশক্তি বর্ত্তমান—এই শৃঙ্খলা দেখিয়া শৃঙ্খলধারীকে কবির দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইহা একটি বাউল সঙ্গীত—বাউলিয়া ভাব ইহাতে চমৎকার ফুটিয়াছে।

তত্ত্বমূলক গানগুলিতে কবির মৌলিকতা কিছু নাই, তিনি কোন নূতন তত্ত্বকে বাণীরূপ দেন নাই—ভারতের চিরপুরাতন তত্ত্বগুলিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী অভিনব রূপ দিয়াছেন। এক হইতে বহুত্বের বিকাশ। বহুত্ব শেষে একে বিলীন হয়—এ তত্ত্ব পুরাতন,—কবি 'পর্য্যবসান' ও 'প্রলয়' কবিতায় তাহার নবরূপ দান করিয়াছেন। অপরা বিদ্যায় আমাদের জীবনের প্রশ্নের শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ছাড়া চরম প্রশ্নের চরম উত্তর পাওয়া যায় না—'নিরুত্তর' নামক গানে কবি সেই তত্ত্বের একটি বাণীরূপ দিয়াছেন—

কান্ত বলে আছে প্রেম কেনর কেন তত্ত্ব কেন
যাও নিখিল কেনর মূল কারণে (সে) রেখেছে
কালের খাতায় লিখে।

আত্মাভিমান নিঃশেষে বিসর্জ্জন না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—এই তত্ত্ব কবি প্রকাশ করিয়াছেন 'শুদ্ধ প্রেম' গানে। আত্মাভিমানবর্জ্জিত প্রেমকেই কবি শুদ্ধ প্রেম নাম দিয়াছেন।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে।
কঠিনে মেশে না সে মেশে যে তরল হ'লে।
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিণাম সিন্ধু জলে।

বহিরিন্দ্রিয় গ্রামকে অন্তর্মুখী করিতে না পারিলে অন্তর্যামীর সন্ধান পাওয়া যায় না। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করিলেই তাহা সম্ভব। এই তত্ত্বকে কবি অভয়ার মিলনানন্দ ও কল্যাণীর অন্তর্দৃষ্টি কবিতায় বাণীরূপ দিয়াছেন।

ভাঙ্গাগড়া, ফোটাঝরা, জীবনমৃত্যু, সর্গ-লয়ের মধ্য দিয়াই এই সৃষ্টিধারা চলিয়াছে—এধারা অনন্ত। কবি বলিয়াছেন—

কান্ত কয়, গড়েছে যেই ভাঙ্গবে নিজেই সৃষ্টি বীজেই মৃত্যু পুরে।
চিরদিন, এমনিভাবে হাটটি লাগে সেই তা ভাঙ্গে আবার গড়ে।

রজনীকান্তের রচনায় ভাবের কোন মৌলিকতা নাই, হয়ত সেই জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে রজনীকান্তের স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। যে সব কথা বাংলার গীতরচয়িতারা আগে বলিয়া গিয়াছেন—রজনীকান্ত সেই কথাগুলিই বলিয়াছেন। তবু রজনীকান্ত খুব বড় কবি। পুরানো কথাই এমন চমৎকার ভঙ্গীতে তিনি বলিয়াছেন, যে ভঙ্গীতে এ যুগে আর কেহ বলে নাই। পুরাতনকে অভিনব ভূষণে এমন করিয়া সজ্জিত করিতে পারে কে? মাইকেল দত্ত হইতে সত্যেন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত এ যুগের প্রত্যেকটি কবির কাব্য ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে আবিষ্ট—একমাত্র আমরা রজনী কান্তকেই পাই—বহিঃপ্রভাব-মুক্তরূপে। অবশ্য এ যুগের একজন বড় কবির পক্ষে ইহাই বড় কথা নয়। তবে যাঁহারা খাঁটি বাংলার অন্তরের বাণী এ যুগেও শুনিতে চাহেন—তাঁহাদের রজনীকান্তকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

বাংলার বিলীয়মান সংস্কৃতি বিদায়ের আগে তাহার পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে এই কান্তকবির রচনায়—তাই কান্ত কবির গানগুলিকে আমরা ভালবাসি।

রজনীকান্ত,—রামপ্রসাদ দাশরথি নীলকণ্ঠ ইত্যাদি কবিদের অনুবর্ত্তী—ইঁহাদেরই গোষ্ঠীর শেষ সন্তান। ইঁহাদের রচনার গুণগুলির মত দোষগুলিও সংক্রামিত হইয়াছে কান্ত কবির রচনায়। যেমন দীর্ঘ-তালিকা দেওয়ার অভ্যাস, ক্লিষ্ট সাঙ্গরূপকের (Strained metaphor) অবতারণায় ইহলোকবিদ্বেষ প্রচার ইত্যাদি।

প্রাক্তন কবিগণের গভীর আন্তরিকতাও কান্ত কবির রচনায় দৃষ্ট হয়।

ভগবৎ তত্ত্বমূলক কবিতা অভক্তেও লিখিতে পারে—শিল্পী বড় হইলে—ভক্তিভাবও ফুটাইতে পারে—কিন্তু সেগুলির অন্তরালে একটি অকৃত্রিম ভক্ত হৃদয় আছে—কি ভক্তহৃদয় আছে তাহা ধরিতে পারা যায় রচনার অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যেই। রজনীকান্তের গানগুলি তাঁহার হৃদয়ের আবেগোত্তাপেই উত্তপ্ত। সে উত্তাপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে—এমন কি হৃদয়কে গলাইতে পারে।

রজনীকান্তের গানের মূল মর্ম্মকথা এই—ব্রহ্ম তিনি মাতৃরূপে বিশ্বকে প্রসব করিয়াছেন, পিতৃরূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন—একদিন তিনি এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া আবার ইহাকে নবতর রূপ দান করিবেন। তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা। একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করা ছাড়া জীবের আর কোন ধর্ম্ম নাই, অন্য লক্ষ্য নাই। তিনি নির্বিকার নির্বিকল্প নিরুপাধিক নহেন, তিনি প্রেমময়, করুণাময়, ক্ষমাময়। আমরা তাঁহার কাছ হইতে যতই দূরে যাই না কেন, প্রেম ও করুণা বশে আমাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি আমাদের টানিয়া লইবেন।

এই বিশ্ব তাঁহার মহিমা নিরন্তর প্রচার করিতেছে—তাঁহার অনন্ত শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র এই বিশ্বভূমি—এই বিশ্বেই তিনি অনুস্যূত আছেন। মানবের মধ্যে দয়া, প্রেম, স্নেহ, ক্ষমা ইত্যাদির রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন।

সৃষ্টির মোহে স্রষ্টাকে ভুলিয়া থাকাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে আত্মরক্ষার নাম ধর্ম্মসাধনা। মনে রাখিতে হইবে আমরা ভাঙ্গনধরা নদীর কূলে অট্টালিকা গড়িয়া তাহাকে চিরস্থায়ী মনে করি—জন্মমৃত্যুর কথা ভাবি না। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া এই সৃষ্টিকে ভোগ করিতে হয় কর—ত্যাগ করিতে হয় কর। প্রেয়ের লোভে শ্রেয়কে বিসর্জ্জন দিও না। শেষ পর্য্যন্ত বৈরাগ্যই আদর্শ—যতদূর সম্ভব চিত্তকে বৈরাগ্যাভিমুখী করিতে হইবে।

রজনীকান্ত মিথ্যা-খুঁটামেকীর পরম বৈরী ছিলেন। এই সমাজের খুঁটা মেকি নকল ভেজাল যাহা কিছু হাসির গানগুলিতে তাহাকেই আঘাত করিয়াছেন। নানা রূপ পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলা

দেখাইয়া তিনি হাসাইতে চেষ্টা করেন নাই—চরিত্র ও আচরণের বিসদৃশতা দেখাইয়া তিনি কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, বাচনভঙ্গীর জন্য তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে সম্ভবতঃ ঋণী। সম্প্রদায়গত দোষত্রুটীকেই তিনি আঘাত করিয়াছেন—ব্যক্তি-বিশেষের অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে তাঁহার ভজনসঙ্গীত অপেক্ষা হাসির গানের মূল্যই বেশী। হাসির গানগুলিতে তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর আর্টের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এক দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্য কাহারো রচনায় নাই। হাস্যরস নিম্নশ্রেণীর রস—কিন্তু আর্ট তাহাকে আশ্রয় করিয়া ১ম শ্রেণীর রচনায় পরিণত করিতে পারে। রজনীকান্তের হাসির গানগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। কান্ত কবির গানের ভাষার তুলনা নাই। যে গানে যে ভাব, ঠিক সেই ভাবেরই অনুগামী ভাষা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া জুটিত। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে সুরে রচিত তাঁহার গানের ভাষা হইত সম্পূর্ণ মার্জ্জিত, বাউলের সুরে রচিত গানের ভাষা হইত নিরক্ষর বাউলের মুখেরই মত। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিই—

আঁকড়ে ধরিস যা কিছু তা ফস্‌কে যায়।
তবু তোর লজ্জা হয় না হায়রে হায়।
কত কি হ'ল পয়দা কিছুতে হয় না ফয়দা
টুস্‌কিটির সয়নাক ভর দেখতে দু'খান হয়ে যায়।
এই আছে এই হাতড়ে পাসনে,
তাই বলি মন আর হাতড়াসনে,
যা হারায় আর তা' চাস্‌নে
নেড়া যায়রে ক'বার বেলতলায়?
অকারণ টানা হেঁচড়া দু'শ বার খেলি হেঁচা
বেহায়া হেঁচড়া হলি কখন যেন প্রাণটা যায়।
যা খেলে আর হয় না খেতে
যা পেলে আর হয় না পেতে
তাই ফেলে দিনে-রেতে মরিস্ কিসের পিপাসায়?

নিরীক্ষা

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

লাঞ্ছিত নরদেবতা কাঁদে
মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদে।

আভিজাত্যের জীর্ণপ্রতন ইমারত ওঠে নড়ে
সর্ব্বহারার বেদনামথিত দীর্ঘশ্বসন ঝড়ে।
নিদাঘ সূর্য্য শুধু দুই হাতে বহ্নি ছড়ায়,
মাটির সবুজ নিমেষে পাতাল পুরীতে পালায়।
সারা দিনান্তে চলে সে সূর্য্য অস্তাচলে—
লাল সমুদ্র প্রবাহিয়া এই পৃথীতলে।
ঘুমায় সূর্য্য শিশু সূর্য্য যে ক্ষুব্ধ দামাল।
আর কী আসিবে নামিবে নতুন রূপালী সকাল?

ঋক্-প্রার্থনা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সোম-সুধাপায়ী স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবতা হে
প্রার্থনা মোর তোমার নিকটে আজি—
অভিষ্টময় কেশরযুক্ত দিব্য তুরগদ্বয়ে
কর হে যুক্ত তব স্যন্দনে আজি।
আমাদের যত স্তুতি ও মন্ত্র সকলি ইহার পর
তোমার যুগল শ্রুতি-সন্নিধ ভরি'
তুষ্টিতে তব ঝঙ্কৃত হ'য়ে যেন বিচরণ করে,
ইহাই কামনা—দাও হে পূর্ণ করি'।*

* ঋক্ অনুসরণে।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ায় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মামলা-মোকদ্দমার পরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যে অন্ধকার যুগ আসিয়া পড়ে, সেই দুঃসময়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রই অগ্রবর্ত্তী হইয়া উহার কর্ণধারত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অমৃতলাল সেই সময়ে পোর্টব্লেয়ারে। তাই অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, বেলবাবু ও মতিলাল সুর প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের শিষ্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় থাকিলেও মেঘনাদ বধ এবং পলাশীর যুদ্ধে তিনি কোন অংশ গ্রহন করেন নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটার ক্রয় করিয়া থিয়েটার চালাইতে উদ্যোগী হন। এইখানেই গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর লাভবান চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। রঙ্গালয়কে উপজীবিকাস্থল স্থির করিয়া তিনি সমস্ত শিষ্যশিষ্যাগণকে আহ্বান করিলেন এবং নিজেই নানাবিধ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। অমৃতলাল এখানে আসিয়া গুরুর সঙ্গে যোগদান করেন এবং হামিরে (১৮৮১) জালমন্ত্রী, আনন্দরহোতে মানসিংহ রাবণ বধে বিভীষণ, রামের বনবাসে কঞ্চুকী ও ভরত, সীতাহরণে সুগ্রীব এবং তিল তর্পণে বাপ্পারাও প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। শেষোক্ত নাট্যগ্রন্থ অমৃতলালের নিজের রচিত।

অতঃপরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বিডন ষ্ট্রীটে, গুর্মুখ রায়ের স্বত্বাধিকারিতে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটক লইয়া থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অমৃতলাল হন দধীচি। অভিনয় খুবই ভাল হয়, কিন্তু স্বজাতির তাড়নায় গুর্মুখ রায় বৎসরেকের মধ্যেই থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়। গিরিশচন্দ্র নিজে স্বত্বাধিকারী না হইয়া অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাশু নীয়োগীকে স্বত্বাধিকারী করিয়া নিজে ম্যানেজার হয়েন। অমৃত বসু নগদ কোন টাকা না দিলেও নাটক লিখিবার অভিনয় ও থিয়েটার পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে গিরিশচন্দ্র অপর তিনজনকে অনুরোধ করেন। তাহারাও সম্মত হন।

ষ্টারে অতঃপর ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তীতে (১৮৮৩) বিদূষক, কমলেকামিনীতে গুরু মহাশয় ও সদানন্দ, শ্রীবৎসচিন্তায় বাতুল, চৈতন্য লীলায় প্রতিবেশী, প্রভাস যজ্ঞে বসুদেব, বুদ্ধদেবে শিষ্য ও গণক ও রূপ-সনাতনে সুবুদ্ধির ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই কয়টি ভূমিকাই অমৃতলাল কর্তৃক খুব সু-অভিনীত হয়।

এই সময় গোপাল লাল শীল (ধনকুবের মতি শীলের পৌত্র) ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী খরিদ করিয়া "এমারেল্ড থিয়েটার" করে। ষ্টার থিয়েটার হাতীবাগানে জমি কিনিয়া বর্ত্তমান ষ্টার যেখানে আছে, সেইখানে ঐ বাটী নির্ম্মাণ করেন। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে যোগ না দিলে ষ্টার উঠাইয়া দিবে ভয় দেখাইলে গিরিশবাবু কুড়ি হাজার টাকা বোনাস লইয়া যোগদান করেন। তিনি উক্ত টাকা হইতে নিজ বাকী বেতন বাবদ ৪০০০৲ লইয়া বাকী ষোল হাজার টাকাই ষ্টারের বাড়ীর জন্য দান করেন এবং ছদ্মবেশে উদ্বোধন রাত্রিতে অভিনয়ের জন্য ষ্টারকে সেবক প্রণীত আখ্যায় নূতন একখানা নাটক "নসীরাম" লিখিয়া দেন। কয়েক মাস একটু ঘুরিয়া কিছু টাকা উঠাইবার জন্য ষ্টার থিয়েটার অমৃতলালের অধিনায়কত্বে ঢাকা সহরে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়া বড় লাঞ্ছিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকা আসিয়াছিল—প্রথম ১৮৭৩ এবং দ্বিতীয় ১৮৭৯ সালে। অভিনেত্রী না থাকায় প্রথমবারে বাহিরের লোকের সঙ্গে কোন গোলমাল হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বার ১৮৭৯— অভিনেত্রী থাকার জন্য Dr. Livingstone, Dr. P. K. Roy প্রভৃতি ঢাকা কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ

ছাত্রগণকে অভিনয় দেখিতে নিবৃত্ত করেন। তবে চেষ্টা করিয়াও তাহারা বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। সেবারে একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এবার বড়ই গোল হয়। কেবল অধ্যাপক নয়, সাধারণের দিক হইতেও লোকদিগকে থিয়েটারে যাইতে নিবৃত্ত করা হয়। তদুপরি কতিপয় ব্যক্তি রাত্রিতে জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গন হইতে ঢিল ছুড়িয়া অভিনয়ের বিঘ্ন ঘটায়। অল্পদিন মধ্যেই বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অমৃতবাবু জিলার জজ সাহেব Mr. Place এর সঙ্গে দেখা করেন, উক্ত জজ সাহেব পুলিসের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লার্ককে বলেন। কয়েকটি ছেলে ধৃত হয় এবং আরও গোলযোগ বৃদ্ধি পায়। অতঃপরে জুবিলি স্কুলের শিক্ষকদ্বয়, পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় এবং প্রসন্ন কুমার গুহকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা হয়। ফলে গোলযোগ কতকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

হাতীবাগানে যে নসীরাম লইয়া ষ্টার থিয়েটার আরম্ভ হয়, অমৃত বাবুই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং নসীরামের ধর্ম্মোন্মাদ এবং লোকশিক্ষার—উভয় ভাবই প্রকট করিতে সমর্থ হন। তিনিই ম্যানেজার হন এবং পরবর্ত্তী নাটক মঞ্চস্থ হয় সরলা। অমৃত বাবু স্বর্ণলতা উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়া দেন। সরলার ভাব খুব উচ্চাঙ্গের এবং নাটকখানি বিয়োগান্ত। হাসিরঙ্গের দৃশ্যগুলি তিনি আরও সরস করিয়া দেন। নাটকখানি বড়ই জনপ্রিয় হয়। অতঃপরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ আসেন ম্যানেজার হইয়া, কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়, অমৃতবাবু এখন হইতে বরাবর ম্যানেজার থাকেন। ষ্টারে অমৃতলাল যে সমস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা নিম্নে দিতেছি—প্রফুল্লে রমেশ—অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়। 'চণ্ড' নাটকে পূর্ণ ভাট্‌—তরুবালায় বেহারী খুড়ো, বাবুতে মিঃ ফিস্‌ ও হরিশ্চন্দ্রে বিশ্বামিত্র। (১৮৯৮) প্রভৃতি।

কুড়ি বৎসর ষ্টার অপ্রতিহতভাবে চলে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের মৃত্যুর পরে উহা প্রায় অচল হয়, তথাপি ২।৩ বৎসর অমর দত্তকে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার করিয়া চালানো হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল প্রভৃতি নিজেদের থিয়েটার উঠাইয়া দিয়া অমর দত্তকে লিজ (ভাড়া) দেন। তাঁহারই খাস দখল ১৯১২, ৩০ মার্চ্চ অভিনীত হয় এবং তিনি নাট্যাচার্য্য পদে বরিত হন এবং নিতাইর ভূমিকায় অজস্র প্রসংসা লাভ করেন। ১৯১৩ মিনার্ভায় তিনি অল্পদিনের জন্য নাট্যাচার্য্য হন এবং তাঁহার নবযৌবনে বসন্তের ভূমিকা লয়েন। ১৯১৪ পুনরায় ষ্টারে আসিয়া রুদ্রবীরে করেন ধৃতরাষ্ট্র।

১৯২৬ মিনার্ভায় যোগদান করিয়া খ্যাপিকাবিদায় মঞ্চস্থ করেন এবং ১৯২৮ সনে করেন যাজ্ঞসেনী।

ইহাই অমৃতলালের রঙ্গমঞ্চ সংশ্রব, নাটকাবলীর ইতিহাস ও অভিনয়ের পরিচয়। তবে অভিনয় সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিতেন, "দেহপট সঙ্গে নট সকলি ফুরায়", কিন্তু বাকি দুইটি বিষয়ে তাহার অবদান রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্থায়ী থাকিবে।

অমৃতলাল যে থিয়েটারে কিরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। সবই আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের আরও প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ষ্টারের অন্যতম সুদক্ষ অধ্যক্ষ নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অমরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিতে গিয়া অমৃতলালেরও শৃঙ্খলাশক্তির কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"প্রবীন নাট্যনায়ক শ্রীযুত অমৃতলাল বসুর পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার যেন একটী সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছিল। ষ্টারের সব দিকেই ধরাবাঁধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসিতে হইত ভয়ে ভয়ে। বস্তুতঃ—নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী এবং খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সর্ব্বোপরি আভিজাত্য—সবই অমৃত বাবুর সুপরিচালনায় নির্ব্বাহ হইত।"—"রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"।

অমৃতলাল অনেক নাটক ও প্রহসন লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটক লিখিবার ক্ষমতা বেশ ছিল, তবে প্রহসন এবং ব্যঙ্গমূলক রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কেবল রসসৃষ্টি ও বিতরণের জন্যই যে বইগুলির বৈশিষ্ট্য তাহা নহে। লোকশিক্ষার এই সব প্রধান উপকরণ। অমৃতবাবু

যে সময়ে থিয়েটারে আবির্ভূত হন (১৮৭২), তখন ইয়ং বেঙ্গলের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। লোকে ইংরাজী শিখিয়া বিদেশী আচারসম্পন্ন হইত, উচ্চ কার্য্যভাণে বাপমাকে খাইতে দিতনা, ভণ্ডামি, কদাচার দেশে বিস্তৃত হইতেছিল। বড় লোকেরা ইংরাজী চালে চলিত। সামান্য শিক্ষা পাইয়া স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করিত, গৃহকার্য্যে বীতস্পৃহ থাকিত; বড়লোক পূজা অর্চনার পরিবর্ত্তে সাহেবের স্তুতি করিত। সাহেবদিগের প্রতি চাটুকার বাক্য প্রয়োগ মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিক অমৃতলালের অসংখ্য রচনাবলীতে মনে হয় যেন স্কুল মাষ্টারের মত বেত্রহস্তে সমাজস্থ লোকদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেছেন। সুগঠিত রঙ্গমঞ্চকে আমি জাতীয় শিক্ষা মন্দির হিসাবেই জ্ঞান করি, আর সেই কার্য্য অমৃতলালের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাকেও জাতীয় বিদ্যামন্দিরের অন্যতম অধ্যাপক বলিয়াই আমি শ্রদ্ধা করি। ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে একবার অমৃতলালের প্রহসনাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে Aristophanes of India বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃই সেই কুশিক্ষা ও অশিক্ষার দিকে অমৃতলালের ব্যঙ্গমূলক প্রহসন সমাজ সংস্কারে শ্রেষ্ঠ ভেষজের কাজ করিয়াছিল। এইবার ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার নাটক ও প্রহসনের পরিচয় দিব।

"হীরক চূর্ণ" নাটকের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। ১৮৭৫ গ্রেট ন্যাশনালে "চোরের উপরে বাটপাড়ি" অভিনীত হয়। যে সব দুশ্চরিত্র লোক ভদ্রলোকের মেয়েদের উপর খারাপ নজর দিত, তাহাদেরই একজন অঘোরকে তার স্ত্রী কিরূপ উপযুক্ত শিক্ষা দেয়—প্রহসন খানিতে তাহা বর্ণিত আছে। প্রথমকার রচনা হইলেও ইহা বেশ কৌতুকপূর্ণ—। অমৃতবাবু নিজে হইতেন কর্ত্তা, নারায়ণ মহেন্দ্র বসু আর গিন্নী তদানীন্তন শক্তিশালিনী অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি দেবী।

১৮৮০ তিলতর্পণ প্রতাপজহরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাপ্পারাওএর ভূমিকা তিনি নিজেই করেন।

এ সময়ে অনেকে নাটক লিখিতে প্রয়াস পাইত, ইতিহাসে মিল নাই, কবিতায় মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর বুঝা যায় না, রচনা বোধগম্য নয়, এরূপ রচনাই ঐ সব নাটকে বেশী থাকিত; প্রহসনখানিতে তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। সমালোচক বলিতেছে—

"মশায়, আপনার নাটকখানির আমিই অনেক স্থান বুঝতে পারিনে, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছি যে, এই নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার—কেননা যেমন মাষ্টার পেন্টারের পেন্টিং হঠাৎ দেখলে কেবল কালী ছাপা বোধ হয়, কিন্তু তেমনের বোধ হয় কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই আছে, তেমনি যে লেখা সহজে, বুঝতে পারা যায় না, তার ভিতরে অবশ্য কোন গুরুতর ভাব আছে।"

প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিও কটাক্ষ আছে।

নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল, কিন্তু একটু পরেই দর্শকরা অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল। আর নাট্যকার রাগিয়া বলিতে লাগিল—

"হায় হায় আমার ভাল সলিলকিটা বলা হ'ল না—জানি এ বেটাদের বড় অহঙ্কার। এরা সব আপনারা বই লেখে। কালই গিয়ে বইখানি ওদের দেব। অহা! ওরা অতি গোবেচারা, যা পায় তাই প্লে করে, ফলও হয়। হবে না কেন? একে half price তাতে অমন অমন বই play করে যেমন বগলে অংগুরলী, বোনতা চাক আমার planchet নাটকখানি পর্য্যন্ত play করেছে। তা বিদ্যা আছে কিনা। ঐ যে শৈলেশ্বর ঘোষ ক'রি বই লেখেন, কৈ দুর্গেশনন্দিনীতে কি করেছেন? যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুর ভুল কেটে আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলে, বঙ্কিমবাবুও মলেন।...

ভূমে পদাঘাত করিয়া দৌড়।"

এই নকসাখানিতে গিরিশচন্দ্রকে করা হইয়াছে শৈলেশ্বর।

এই পঞ্চরংখানি অভিনীত হইবার পর গিরিশচন্দ্র একদিন হাসিতে হাসিতে অমৃতলালকে প্রশ্ন করেন—

ভুনি, তুই খুব বিষ ছড়াতে পারিস্, কেমন না?

অমৃতলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—

আমি বিষ পাব কোথায় মশায় সব বিষটুকো আপনার পেটে, একটু আধটু গুরুদেবের কাছ থেকে ধার ক'রে ছড়াই।

গিরিশ মহাদেবের অপর নাম শৈলেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সমগ্র বিষরাশি পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। নাট্যকার 'তিলতর্পণ' নাম সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—"লোকে মনে করবে নীলদর্পণের উত্তর, আর একটা উদ্দেশ্য আছে একটুখানি তিলে যেমন সাগরপ্রমাণ জল দেওয়া হয়, এতেও তাই সব রসই পাওয়া যাবে।"

তিলতর্পণের ন্যায় এসময়ে রচিত আর একখানি নক্সা ডিসমিস্‌ও বেশ উপভোগ্য হয়। প্রমদা চরিত্র অল্প কয়টি দৃশ্যে দেখানো হয়, "স্বামীরা স্ত্রীদের সন্দেহ করিলে বুদ্ধিমতী স্ত্রীদের কাছে খুব নাকাল হয়, আর ঘোমটা দিলেই সতী হয় না।"

উভয় নক্সাতেই দীনবন্ধুর প্রভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নবীন তপস্বিনীর জলধর আঁকা সহজ নয়। অমৃতলাল দক্ষ শিল্পী হইলেও তখনও তাঁহার হাত পাকে নাই।

চাটুয্যে বাড়ুয্যে—১৮৮৪, ২৬ এপ্রিল ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। চাটুয্যে—অমৃতবাবু, বাড়ুয্যে—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। একখানি ঘর দুই জনকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। অথচ ভাড়াটিয়ারা ইহা জানেনা, পরস্পরের সহিতও পরিচিত নয়।

বিবাহ বিভ্রাট—১৮৮৪ ডিসেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

এই প্রহসনখানি অতি উচ্চাঙ্গের এবং যে কোন প্রহসনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইহা সুকৌশলে লিখিত, আর সে সময়ে ইহা সমাজের বিশেষ হিতসাধন করিয়াছিল। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা অভিনীত হয়। তাহাতে একদিকে যেমন হিন্দু দর্শকের মধ্যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হয়, 'বিবাহ বিভ্রাটে' অন্যদিক হইতে আবার বিদেশী আচার ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইয়া দেওয়া হয়। সেই যুগে এই প্রহসনখানি জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়াছিল। গুরুশিষ্য তখন একসঙ্গেই ছিলেন। 'বিবাহ বিভ্রাটে' লোকগুলি তখন বিদেশী আচারে কিরূপ বিভ্রান্ত হইতেছিল, দুই একটি উদাহরণেই পরিচয় দিতেছি—

বিলাসিনী কারফর্ম্মাও উচ্চশিক্ষিতা মহিলা, বিজ্ঞানে এম, এ দিবেন, স্বামীর চাকুরী ছাড়াইয়া একটা প্রেস করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছেন, তিনিই (স্বামী) রান্না করেন, আর পত্নী পুস্তক পাঠে নিরত থাকেন, ক্লাব পিকনিকে যান, আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। তাহার স্বামীর নাম গৌরীশঙ্কর কারোফর্ম্মা। উমাচরণ গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হইবার কথা ছিল, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহার মাতার মৃত্যুতে হিন্দু আচার পালন করায় তাহাকে বিবাহ না করিয়া মিঃ কারফর্ম্মাকেই অনুগৃহীত করিয়াছে। তাহার বসিবার ঘরে সদ্য বিলাত প্রত্যাগত মিঃ সিং আসিয়াছে।

সিং—গতবৎসর দেশ ছাড়ার পূর্ব্বে অনুমান হয়েছিল আপনি উমাচরণ গুপ্টাকেই সুখী কর্ব্বেন।

বিলাসিনী—হাঁ, একরকম ঠিকই করেছিলুম, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি স্বামী ব'লে কি ক'রে নিই ?

সিং—"নেংটা গা ? নেংটা পা ? লেডীর সাম্‌নে ? Horrible" !

গৌরীশঙ্কর—আপনি ছিলেন কদ্দিন হলো ?

সিং—এ, এ—ইয়ে যাওয়া আসা নিয়ে—দশমাস।

অন্যত্র গৌরীশঙ্কর—আপনি কোন্ লাইনে ঢুকেছেন ?

সিং—Surjeon, Physicians, Accoucher M. M. L. R. C.P.L.R.C.S. (Edin—

গৌরী—খুব আশ্চর্য্য তো ! এই মাস আষ্টেকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল পেলেন ? মেলাই examine দিতে হয়েছিল দেখ্‌ছি—

সিং—Nothing of the kind, বিলাতে আমাদের মত জেণ্টেল্‌ম্যানকে একজামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে compell ক'রে insult করেনা। আমাদের ইংলিস manners দেখলেই বিদ্যা হয়েছে বুঝে নেয়, ফি দিলেই বুঝতে পারে respectable, আর ডিগ্রী দেয়। আমার প্রাকটিস জমলেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এম্-ডিটা আনিয়ে নেবার ইচ্ছা আছে।

গৌরী—বাড়ীতেই আছেন ?

সিং—না কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে, আমি ত গোরস্থান লেনে থাকি—

বিলাসিনী—ও বেলা রান্নার কি উদ্যুগ করেছ।

গৌরী—কি খাবে বল? করে দিচ্ছি।

বিলা—বেশী কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব, আজ আমাদের পুরুষ দমন সভার anniversary. মাছের ঝোল টোল যা হয় পরে কর। আমার এক প্লেট sago pudding আর খান চারেক কাটলেট ভেজে দিও। বিজ্ঞান মতে রাঁধবে। বুঝেছ—আমি আজ বাদে কাল সায়েন্সে এম্-এ দিব, আমার husband কিনা heat এর theory বোঝে না।

অতঃপর প্রস্তাবিত এক বিবাহের বর নন্দলালের প্রবেশ—

নন্দ—মিঃ সিং, আমি আপনার বাড়ী গিয়েছিলুম—বিলাতের সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো ব'লে। দশ মাসে সব সাহেবের মত হওয়া যায়?

সিং—তাহা intelligence থাকলে হ'তে পারে। আপনার বাবার ইচ্ছা আছে নাকি?

নন্দ—ইচ্ছা? যাবই। এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি, খুব আমার intelligence.

সিং—আপনার কাদারের মত হবে?

নন্দ—আবশ্যক? বুড়োদের মত আবার কোন সৎকাজে হয়?

সিং—টাকার যোগাড় কি রকম হবে?

নন্দ—সে যোগাড় বাবাই করেছেন, এক রকম বাবাই করেছেন।

বিলাসি—কিরূপ পাত্রী? অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে?

নন্দ—বাজলা কথাটা ভুলে যাই কি ক'রে বলুন তো?

সিং—That's secret amongst our fraternity; আগে প্যাসেজ engage করুন, তারপর privately ব'লে দিব।

বিলাসিনী—আপনি গেলে চাদর নিবারণী সভা চালাবে কে?

নন্দ—অনেক আছে, আর আমিও ফিরে আসি, একেবারে ভাত কাপড় নিবারিণী সভা করবো।

আরও চিত্র দেখুন—নন্দের মা নন্দের পিতা গোপীনাথকে আর একস্থানে বলিতেছে—

"এবার চার হাজার নিয়ে কচ্ছো কর—কিন্তু বছরের ভিতর বৌটার যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে। দেখো তখন কিন্তু ফের ছেলের বে দিয়ে এক খানা দোতালা বাড়ী আর আমার গা-ভরা গয়না কর্ত্তে পারি কিনা?

ঝির চরিত্রটি খুবই সরস। নন্দ যখন বিলাসিনীকে নিয়া গয়না ও টাকা সহ পালাইয়া যায়, ঝির উক্তি বড় সরস—

"ছেলে টাকা শুদ্ধ সরেছে। জোচ্চোর বাপ বেটার ছেলে কি সাধ হবে?"

শেষ গোপীনাথের অনুতাপে পরিসমাপ্তি—

"ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়েতে টাকা রোজ-গারের চেষ্টা না করে।"

সব দৃশ্যের অভিনয়ে মনে হয় অমৃতলাল যেন চাবুকের সহায়তায় সমাজের শিক্ষকতায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। অভিনয়ের সময়ে অমৃতবাবু নিজে হইতেন মিঃ সিং, মিসেস কারোকবুমা বিনোদিনী, ঝি ক্ষেত্রমণি দেবী, কর্ত্তা নীল-মাধব চক্রবর্ত্তী, নন্দ—অঘোর পাঠক।

ক্ষেত্রমণির সরস অভিনয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরীণ ও তৎপত্নী লেডি ডাফরিণকেও মুগ্ধ করিয়াছিল।

Indian Stage, Vol. II p. 68

"তাজ্জব ব্যাপার" হাতী বাগান ষ্টারে ১৮৮৯, নববর্ষে (১লা জানুয়ারী) অভিনীত হইয়াছিল, বিজ্ঞাসিনী কারফর্মার অন্যতম সংস্করণই মৃণালিনী মিত্র হাইকোর্টের উকীল, মুক্তকেশী বক্সী হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার অনঙ্গ মঞ্জরী গুহ ঢাকা গেজেটের সম্পাদিকা, নিস্তারিণী ভট্টাচার্য্য ভলাণ্টেয়ার সৈন্যের কর্ণেল।

স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তা কর্ত্তী, পুরুষরা আজ্ঞাবহ মাত্র। সভা স্ত্রী লোকগণ সভায় মিলিতা হইয়াছেন—

ননীবালা—স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই, হাইকোর্টে হাউসে আফিসে, গুদামে সর্ব্বত্র লোকের আবশ্যক

গিরিবালা—গোঁফ আঁটি সত্যতেই উঠিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মহৎ উপকারও হইতে পারে, আমাদের ছেলে হওয়া বন্ধ হইতে পারে। আমাদের উদরের মধ্যে ovarine.

বিরাজমোহিনী—এই নিয়ে আমেরিকায় মেমোরিয়াল পাঠালে হয়, তাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য যাহা করিয়াছেন জগতে কোন জাতিই করিতে পারেন নাই।

অনঙ্গ মঞ্জরী—(পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী শিক্ষিতা মহিলা) বোন্দ করেন, বোন্দ করেন, চুপ দেন, আমিও বক্তৃতা করবো বইলে সভায় আসছি আমারে কিছু বলতে দেন—এই দণ্ডায়মান অইলাম—

মৃণালিণী মিত্র—সভ্যাগণ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেখান হইতে একেবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মঞ্জরী মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন যে, পুরুষদের স্ত্রী বেশ পরানো নিতান্ত আবশ্যক, আমার বাড়ীতেই অদ্য এইক্ষণে সেই কার্য্য প্রাকটিকেলি আরম্ভ করি। বসন্ত, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও এখন, তাদের শাড়ী গহনা-টহনা পরাও গে।

কর্ণেল— অ্যাটেনশন—

"তরুবালা" ষ্টারে অভিনীত হয় ২০ ডিসেম্বর ১৮৯০। ঠাকুরদা হন নীলমাধব বাবু, ঠান্‌দিদি গঙ্গামণি, তরুবালা প্রমদা, অখিল অমৃত মিত্র, বেহারী খুড়ো অমৃত বসু, শান্তা নগেন্দ্রবালা, পারুল মানদা, হীরালাল-অক্ষয় কোঙার। ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। সাধ্বী স্ত্রী তরুবালাকে পরিত্যাগ করিয়া নায়ক অখিল শিক্ষিতা বারাঙ্গনা পারুলে আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর্দ্দার কিরূপ কৌশলে অখিল আবার ঘরে ফিরিয়া তরুবালার সহিত সুখে বাস করে তাহাই দেখান হইয়াছে। পরিশেষে অখিল নির্য্যাতিতা সাধ্বী তরুবালাকে বলিতেছে—

"যে অবজ্ঞা তোমায় করেছি এখন প্রাণ ঢালা ভালবাসায় যদি সে অবজ্ঞার শোধ হয়, ঈশ্বর সাক্ষী—সে ভালবাসা আমি তোমায় দেব।"

নাটকের অনেক চরিত্রই সজীব। বিধবা শান্তর চরিত্র খুব সরস হইয়াছে।

বিলাপ—১৮৯১, ২২ আগষ্ট ষ্টারে অভিনীত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া শোক করা হইয়াছে। শেষ গানটি চমৎকার—

বিদ্যার সাগর ব'লে খ্যাত ছিল মহীতলে
দয়ার সাগর ব'লে স্বর্গে আবাহন।

রাজা বাহাদুর—১৮৯১, ২৫ ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত হয়। টাইটেলের জন্য মূর্খ জমিদারগণ কিরূপ ব্যগ্র হইত এবং তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির কত দৌড় তাহা এই প্রহসনে দেখানো হইয়াছে। রাজা বাহাদুর হইতেন উপেন্দ্র মিত্র, আর মিঃ ফিস অমৃত বসু নিজে, কালাচাঁদ চরিত্রও সরস গানিক্যরন মণ্ডলে দীনবন্ধুর রামমাণিক্যের ছাপ আছে—

কোলে বসা যার পতি আজ্ঞার অধীন
স্বাধীন বর্ত্তকা তায় কয় সুপ্রবীণ

অয় চলেন। সব চাঁদাই দিমু। রাজা অইমু রাজা অইমু বাঁশী মোহনয়ে, এতদিনে গানিক্য দনের জন্ম সফল অইল, রাজা অইমু রাজা অইমু।

মাতাল ফিসের চরিত্রটিও খুব সরস।

কালা পাণি—হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা—১৮৯২ ডিসেম্বর মাসে বড়দিনে ষ্টারে অভিনীত। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে অনেক বাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য বিলাত যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত ছিল।

অমৃতলাল বলেন, "যেতে হয় যাও, কিন্তু ভণ্ডামি ক'রে যেয়ো না।"

১৮৯১, ২১ মার্চ্চ সম্মতিসঙ্কট ষ্টারে অভিনীত হয়। ছোট লাট স্যার চাল'স্ ইলিয়ট ১৮৯১—Age of Consent Bill উপস্থিত করিয়া পাশ করান। ইহাতে ১২ বৎসরের নিম্নে মেয়ের বয়স হইলে তাহার সম্মতি থাকিলেও স্ত্রী-সহবাস অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

গানটি হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যায়—

ওলো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি
দেখবো কেমন আশে পাশে এগারো'র পতি
তিনি নিজেই হন তিনকড়ি মামা।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (তখন কুমার) হিন্দু মতে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে মতানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করেন। অমৃত বসু তিনকড়ি নামারূপে ব্যঙ্গচ্ছলে যে উপদেশ দেন, এক সময়ে তাহাতে বেশ কাজ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অমৃতলাল সমুদ্রযাত্রার বিরোধী ছিলেন না, ভণ্ডামির বিরোধী ছিলেন। নিম্ন কথোপকথনে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে—

মাখন—তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চট কেন?

তিনকড়ি—চটবো কেন, তুমি যমালয়ে গেলেও চটবার নাই, যেতে হয় তার জন্য মিটিং ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোধ, সোজা পথ আছে, ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও।

দুলাল—হাঁ, তারপর ফিরে এলে তোমরা আমাদের একঘরে কর। যেমন সব বিলাত ফেরতদের ক'রে থাক।

তিন—আমরা তাদের একঘরে করি, না তারা আপনারা একঘরে হয়। বাপ মা শিষ্ট শান্ত ছেলেটিকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ খরচ ক'রে দুর্গানাম ব'লে ছেলেটিকে বিলাতে পাঠালেন, সখ—যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হয়ে আসবে। ও বাবা! ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন, খুচি মাথায় দে গ্যাড্‌ম্যাড্ ক'রে। ভাত হ'ল বাসকা চীচি মোচা হ'ল কেলাকা ফুল, চলন বলন ও চং চাং সব বিপরীত, কাজেই ভেতো বাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়, শৃঙ্গিণাং শত হস্তেন—আর সাহেবেন বিশেষতঃ দেশী সাহেবেন লক্ষ হস্তেন লক্ষ হস্তেন যত তফাৎ থাকে, ততই ভাল।

দুলাল—কেন? ইদানীং আমাদের অনেক বাঙ্গালী তো বিলাত থেকে এসে দেশী চালে চলছে।

তিনকড়ি—তারা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা।

∴ বাঙ্গালী নবীশরা সামান্য সামান্য ইংরাজী জানিয়া সে যুগে কিরূপ ইংরাজী বলিত, অমৃতলাল তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সি সি মাই বাবু—অল্ ব্রামিন মাউথ ওপেন ষ্ট্যাণ্ড হেড্ সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

একে একে গোলমাল করোনা one one রাউণ্ড গুলস্ ডু নট

সই না দিলে বিদায় পাবে না, বার্ষিক বন্ধ

Tell, sign no give farewell no get, annual stop.

ভাল হয়েছে Good been

আমি ওকে ঠিক করছি I make him addition.

ঠাণ্ডা হো cold be, কাজ রক্ষা হয়েছে Business compromise.

পাগল—Leg round. পরে বলবো afterwards tell.

এইরূপ ইংরাজী কথা অল্পদিন মধ্যে নাটকান্তরিত "চন্দ্রশেখরে"ও আছে। উহারও নাট্যরূপ অমৃতলালই দেন। উহা ১৮৯৪ সেপ্টেম্বরে ষ্টারে অভিনীত হয়। কথার একটু নমুনা দিতেছি।

He woman বৈত নয় slow slow walk করে পা I masculine man long long পা ফেলেন two leg এ গিয়ে catch করে পা।

You go sir নৌকায় গিয়ে নাকে oil give করে sleep করোগে, I your slave my fourteen masculine generation your slave.

তখন ছাত্রমহলে এইরূপ নকল (caricature) হইত। 'কালাপাণিতে' পণ্ডিত মহাশয় সমুদ্রযাত্রা কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাও আছে; পণ্ডিত মহাশয় সেবারে এসিয়েটিক সোসাইটির মিটিংএ বলেন যে—বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে, বাল্মিকীর তপোবন তো বিলাতেই ছিল, তমসা তো টেম্‌স্ নদী। আর সমুদ্রযাত্রায়ই বা দোষ কি; হিন্দুর দেবতা জগন্নাথ সমুদ্রের ধারেই। আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষ নাই।

'বাবু' অভিনীত হয় ১৮৯৩, ২৫শে ডিসেম্বর ও ১৮৯৪ ১লা জানুয়ারী আর 'একাকার' হয় ১৮৯৪, ২৫ ডিসেম্বর।

'বাবু'র বক্তৃষ্ট বটব্যাল দেশহিতৈষী বন্ধু, নাকে খাইতে দেন না, কারণ জন্মভূমির জন্যই মদ ছাড়েন,

সেকেণ্ড ক্লাসে না চলিলে পজিসন থাকে না, নিজের স্ত্রীকে সেলারের হাত হইতে রক্ষা না করিয়া, মিটিং করিয়া স্পীচ দিতে যান।

এ প্রহসনটিতে বেশ শিক্ষা আছে। তিনকড়ি মামারূপী অমৃতলাল বলিতেছেন—

"আপন স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বৃত্ত মাতালের হাতে ফেলে তোমরা যাচ্ছ কিনা সভা করতে, চাঁদা তুলে বিলেতে গিয়ে পার্লামেন্টে লেকচার দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রবে। ধিক্ ধিক্, আপনার স্ত্রীকে অপমান হ'তে রক্ষা ক'রবার ক্ষমতা নাই, আবার স্ত্রী স্বাধীনতার কথা মুখে আন— আগে আপনারা স্বাধীন হও, আত্মরক্ষা কর্‌তে শিক্ষা কর, তারপর স্ত্রীলোককে স্বাধীন করো।

মায়ের প্রতি এই সব তথাকথিত শিক্ষিত দেশহিতৈষীরা কিরূপ ব্যবহার করিত তাহাও আছে। মাকে বঙ্কিষ্ট বলিতেছেন—

"হঠাৎ আমায় পেটে ধরেছিলে, জায়গা না দেবার তোমার একতারই ছিল না, এই হিসাবে তোমাকে মা বলা যায়—তা ব'লে দিবারাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারতমাতার কাজ কখন্ করবো? আমার ভক্তি শ্রদ্ধা, মায়া, দয়া, এনার্জ্জি এজিটেসন, চাঁদা রোজগার এখন সবই তার জন্য, ভারতমাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত সন্তান।"

অন্যত্র গ্রাম্যমণ্ডল ভবহরি যখন গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য ইন্টারমিডিয়েট রিটার্ণ টিকেট কিনিয়া দিতে চায়, বষ্ঠী উত্তর করিতেছে—

"দেখছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক, দেশ হিতৈষিতার কি কি দরকার কিছুই জাননা—তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব—ইন্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিন্‌বে কে—ফার্ষ্ট ক্লাসে যাবার আসার টিকেটের দাম ঠিক কর আর আমি কেলনারের হোটেলে যাব—ফিরিঙ্গি রিপোর্টার দরকার, সাবব্রাঞ্চগুলিতে টেলিগ্রাম করতে হবে আর কলকেতা থেকে যদি একদল সখের কনসার্ট নিয়ে যেতে পার ত ভাল হয়।

একাকার প্রহসনে অভিনীত বড় বাবুদের চাপরাশী, কেরাণীদের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, আভব্যবসার কথাও আছে। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের চিত্র, হাকিমের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত হুকুম, সাহেবের প্রতি কদ্ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের অহেতুকী ভয় ও রাজানুরূপ ভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

তখনকার আধুনিকা স্ত্রী বা Modern Wife —বৌমা ১৮৯৬—২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়। সামান্য কিছু পড়াশুনা করিয়া বৌমা কিশোরী শাশুড়ীকে বলিতেছে, "আপনি আমাকে রান্নাঘরে যেতে ব'লছেন? আমি আলমারি খুলে সমস্ত বই আপনাকে খুলে দিচ্ছি, দেখুন তার মধ্যে যত নায়িকা আছে তারা কে হেঁসেলে গিয়েছেন? তিলোত্তমা কখনও ঘরের কাজ করেছিল না, মৃণালিনী প্রেমের ছবি আঁকা ছাড়া কিছু করেনি, মনোরমা পুকুরের হাঁস দেখা ভিন্ন আর কি করেছিল? সূর্য্যমুখী কখনও রেঁধেছিল? কুন্দ কখনও ভাত বেড়ে দিত?

গ্রাম্যবিভ্রাট ষ্টারে ১৮৯৭, ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি নেওয়া লইয়া ভোটের বাদবিসম্বাদ সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।

সাবাস আঠাস ১৮৯৯, ২৩শে সেপ্টেম্বর ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাঙ্গলার ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেনজি একটী মিউনিসিপাল বিলের সহায়তায় কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য ১২ জন সভ্য লইয়া একটী জেনারেল কমিটি গঠিত করিতে চাহেন এবং তন্মধ্যে ৪জন মাত্র নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ৮জন হইবেন সরকার পক্ষান্তর্গত। এই বিলের প্রতিবাদ কল্পে ২৮জন সভ্য পদত্যাগ করেন, কয়েকজন করেন নাই, যেমন রামময় ডাক্তার। তাই প্রহসনে আছে—

তবে অসময় রামময় পাশ দিয়ে তাস
রঙ্গের খেলায় ভ্যালা পেলে উপহাস।
আহা ভাল কটি সুখে থাক
সাবাস সাবাস বলি সাবাস আঠাস।

যাদুকরী অভিনীত হয় ১৮৯৯ ডিসেম্বর, আদর্শ বন্ধু ২০শে এপ্রিল, ১৯০০ পৃথ্বী সিং হন, দানিবাবু, দণ্ডার সিং চুণী দেব, ফুলওয়ালা নিখিল দেব।

১৯০১ অবতার, ২৫শে ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত হয়। ভণ্ড অবতার হইয়া যে লোক-সমাজে আসিয়া

অনেকে আধিপত্য বিস্তার ও পয়সা রোজগার করে, সেই বিষয়েই হলাহলানন্দ স্বামীকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। ইনি ইংরাজীও জানেন, সংস্কৃতেও কথা বলেন; পূর্ব্বে সে শাখারীদের বুলা ছিল, এখন থেকে মুরিয়া বেড়ায় অনেক টাকা রোজগার করে।

"নবজীবন"—১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই সম্পর্কে রচিত। 'ওই ভুবনমোহিনী' 'বন্দেমাতরম্' 'মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি' প্রভৃতি সঙ্গীতে একাঙ্ক নাটিকাটী বেশ রসদায়ক হয়। ভারত সন্তানগণ বলিতেছে—"আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই, মধুরগাঁথা বন্দেমাতরম গাইবো।" পূর্ব্বে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে যে ভারতমাতার গান হয়, সে সময় রচিত দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানটীও সংযোজিত হয়—

দেখগো ভারত মাতা তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে শবপ্রায় হীন প্রাণ,

কয়েকজন ভারতবাসীও বলিতেছেন—

"মহাশক্তির অংশে আমাদের রূপ, তবে তার নাম-গানে কেন আমরা যোগ দেব না?"

১৯০৪ ডিসেম্বর বাহবাবাতিকও উপভোগ্য প্রহসন।

১৯০৫ ডিসেম্বর সাবাস বাঙ্গালী অভিনীত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত। যাহাতে বিলাতী জিনিসের বয়কট চলে এবং স্বদেশী দ্রব্যাদির প্রসার হয়, সেই উদ্দেশ্যে রচিত এখানিও সরস প্রহসন। চরকা কাটিতে কাটিতে মহিলাগণের ইহাতে শেষ গানটি ইহার সম্বন্ধে খাঁটি পরিচয় দিবে।

"আমরা আবার কাটবো স্থতো চরকাতে
যাবনা আর সখী সেজে
সভার মাঝে ফরকাতে;
শুনেছি সেই ঠাকুর মা
দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা
পড়তো নাকো এলিয়ে গতর
কোনও কর্ম্ম করাতে॥
জ্যাকেট বডিস যাক উচ্ছন্ন
আমরা হবনা মতিচ্ছন্ন
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্ম
বিদেশীর পেট ভরাতে,
শুনছি এক আছে ছুতো
দেশে নাকি নাইকো স্থতো
আমরা ঘরে ঘরে কেটে স্থতো
দেবো তাঁতি ভরাতে
যদি বাবুরা হন গো নারাজ
বিলিতী জুতা পরাতে।

নাটক বলি প্রহসন বলি "খাসদখল"ই অমৃতলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা যেমন সরস, তেমন শিক্ষাপ্রদ। রসাবতারণায় খাসদখল ছিল অদ্বিতীয়। যে দিক দিয়া দেখা যাইত, দর্শক বিমল আনন্দ পাইত। ইহার বিষয়—আলিপুরের ফৌজদারী উকীল লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদা কবিতাপ্রিয় ছিল। তাদের বাড়ীতে কবি-উন্মাদ মোহিত, সুরজিনীর সহকারী সম্পাদক নিতাই, ঠাকুর্দ্দা, লোকেনের জুনিয়ার রমেশ প্রভৃতি বাহিরের লোক আসিত এবং গল্পগুজব হইত। দার্জ্জিলিং আসিবার পরে Landslip এ লোকেন পড়িয়া যায় এবং ঈশ্বর কৃপায় বাঁচিয়া উঠিয়া ধর্ম্মের দিকেই মন সমর্পণ করে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে প্রচারিত হয় যে তার মৃত্যু হইয়াছে। মোহিত এবং মোক্ষদার বিধবা-বিবাহ হইবে স্থির হয় এবং নিমন্ত্রিত সকলেই উপস্থিত হন, কিন্তু সেই দিনই লোকেন আসিয়া উপস্থিত হইল। মোক্ষদার কাছে গিরিবালা নাম্নী একটি সুশীলা সেবাপরায়ণা গ্রাম্য মেয়ে থাকিত। গিরিবালা মোহিতেরই স্ত্রী, কিন্তু স্বামী-পরিত্যক্তা, ওবাড়ীতে মোহিত তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু পরে চিনিয়া গ্রহণ করে। এইরূপ কবিপ্রেম সুলভতা এবং তজ্জনিত বিধবা-বিবাহ অমৃতলালের অনুমোদিত নয়। কিন্তু নাটকে কয়েকটি সরস স্থানের উল্লেখ করিতেছি। সাময়িক অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন—রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হওয়া তাহার মনঃপূত হয় নাই—পার্টিসন উঠিয়া যাওয়ায় মুচিরাম—খুব আনন্দোৎসাহে—England for ever, Bengal for ever.

তপস্বী বলিতেছে—খুব আমোদ যে মুচিরাম, খানিকটা নাচ না হয়।

মুচি—নাচবোই তো, আপনিও নাচুন—সেদিন মা বসুমতী পর্য্যন্ত নেচে উঠেছেন।

এই নাটকে অমৃতলাল নিজে নিতাই করিতেন। নিতাইর ইস দি এত সরস হইত, তখন ইস দি সাধারণের কথার একটা অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল।

রমেশ বলিতেছে—রামকমলবাবু বিধবা বিবাহ দিবেন না, পিছিয়ে গেলেন ও কত বক্তৃতা দিতেন—যা নিজে করবার সাহস নেই, তা অপরকে করতে বলেন কেন?

ঠাকুর্দ্দা—তুমি উকীল হয়ে আর শামলা চাপকান পরে কাছারী যাও কেন?

নিতাই—বিকজ সেটা ইজ দি কাছারীর পোষাক।

ঠাকুরদা—তা রামকমলবাবুরও সমাজ সংস্কারই ইজ দি, কাছারীর পোষাক। যেমন রমেশ কাছারীর পোষাক পরে ভাতও খায় না, তেমনি রামকমলবাবুও আপনার বাড়ীর ভেতর সমাজ সংস্কার করেন না।

লোকেন—ঠাকুরদার লজিক অকাট্য।

অন্যত্র মোহিত বলিতেছে—"আমি বই নিয়ে পড়ে থাক্‌লে কি এত কাব্য লিখতে পারতুম? বানান সন্ধি হুড়োহুড়ি করে এসে আমার ব্যস্ত মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে দিত"—তাই সে বলিতেছে, যে মহিলা এরূপ বিদুষিণী তার স্বামী কিরূপ বিদূষক।

কবিরা যে কিরূপ উদ্ভটভাবে পদ মিলাইত, এই বিষয়ে অমৃতলালের রহস্য আছে—

লুকায়ে চোরের প্রায় নিশীথে ঝরিয়ে হায়
নলিনী মলিনী কেন করিস্ শিশির
ভূমিগতা পদ্ম লতা তার প্রাণে দিলি ব্যথা
কি লাভ হইল ইথে তোমারি—।

নিতাই—ষ্টপ ইজ দি থামলেন যে?

মোহিত—মিলটা আস্‌ছে না।

রমেশ—কেন শিশিরের সঙ্গে নিশির তো বেশ মিল হয়।

মোহিত—মানে হয় না।

ঠাকুরদা—পিসীর, কেমন মিলেছে তো?

মোহিত—বড় শ্রুতিমধুর হয়েছে, কিন্তু শিশিরের পিসী কে হ'তে পারে?

ঠাকুরদা—শিশিরের বাপ কে?

নিতাই—আকাশ ইস্ দি শিশিরের পাপা।

ঠাকুরদা—আকাশের বোন কে? সমুদ্রা, ছুই নীল সীমাশূন্য কেমন?

ওরে পাপিষ্ঠ শিশির তুই যদি তোমার পিসীর গর্ভে পড়্‌তিস,তাহ'লে পিসীর ফোটা কতক জল লাভ হত, কিন্তু তা না করে ভূমিলতা পদ্মলতাকে ছোব্‌লালি কেন?

অন্যত্র মোহিত বলিতেছে—

পদ্ম সুন্দরীর তরে বৈদ্য আনিবারে
যেতে পারি বৈদ্যবাটী লঙ্ঘিয়ে সাগর
তুচ্ছ সে প্রেম ষ্ট্রীট গোষ্পদ সমান।

গিরিবালার কথা—

"আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, আমি ত জানি না কলকাতায় একটু অসুখ হলেও কি বলতে হয় খুব অসুখ হয়েছে?"

ও ভারী উপভোগ্য—

আবার যখন সকলেই মোক্ষদার জন্য কেউ বেলেডোনা কেউ এগোরিন প্রভৃতি ডাক্তার মিত্রকে প্রম্‌পট করিতেছিল—ঠাকুর্দ্দা বলেন, আপনাদের অন্ন উঠল।

ডাঃ—আজ্ঞে না, বরং সাধারণে ওসব শিখে আমাদের একটু উপকার হচ্ছে। আমরা যদি বলি কলিক, রোগীর আপনার লোক সেটা এ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ না বলিয়ে আপনাকে আর ছাড়ে না।

ডাক্তার কেবল ঘুমুতে বলিয়া যাওয়ার—১৬৲ টাকার ফির জায়গায় মোক্ষদা—না না, ষোল টাকা নয়, পায়ে ষ্টকিং নেই, তার জন্য ছ' টাকা কেটে নিয়ে দশটা টাকা দিও।

মোক্ষদার কথা—কি মিত্তির ডাক্তারের কথা—আমার temparature কিনা 99· তখন একটা সাধারণ কথাবার্ত্তারও রঙ্গরহস্যে দাঁড়াইয়াছিল।

ব্যাকুলা গিরিবালার মোক্ষদাকে আগ্রহে আলিঙ্গন দেখিয়া কবি মোহিত বলিতেছে—"কি দেখি, কি দেখি কমলে—কুমুদে আলিঙ্গন। এক দেহে আমি রবিচন্দ্র নই কেন?" কোমলে উজ্জ্বলে বিশালে সৌন্দর্য্যে উক্তিতে নাট্যকারের সরসতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

মোহিত—তোমার দিদির সঙ্গে আমার বিবাহ হ'লে তুমি আমায় দাদা ব'লে ডাকবে তো?

গিরি—আপনাদের কি দিদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়?

অন্যত্র—

মোহিত—আশ্চর্য্য, সেই বর্ব্বরকে আপনি পতি ব'লে মনে করেন?

গিরি—যার সঙ্গে বিবাহ হ'য়েছে তাকে পতি ব'লে মনে কর্ব্বো না তো কি বাড়ীর সরকার ব'লে মনে কর্ব্বো?

মোহিত—সরকার-ম'শাই কি! সে গর্দ্দভ আপনার ওই শতদল—কোমল পায়ে জুতো পরাবার পর্য্যন্ত উপযুক্ত নয়!

গিরি—আমার সোয়ামী কি মুচি?

মোহিত—সে মূর্খ, পাজী বা নরাধম, এখানে থাক্‌লে তার মুখে আগুন জেলে দিতুম।

গিরি—আর সেই রোসনায়ে সেই আলোর দাঁড়িয়ে আপনি সত্ত বিধবা মোক্ষদা সুন্দরীকে বিবাহ কর্ত্তেন?

মোহিত—গিরিবালা!

গিরি—ম'শাই!

মোহিত—বিধবা বিবাহ কি মন্দ?

গিরি—আকাশ পিদিম কি চাঁদ?

অন্যত্র আছে—

ঠাকুরদা—কেন হে নিতাই রামকমলবাবু বাইশ বছরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেন নি ব'লে অত চ'টে-ছিলে, তখন—আর তোমার ও বাড়ীর বউমার (মোক্ষদার) বয়স তো ২৫।২৬-এর বেশী হবে না।

নিতাই—রামকমলবাবু is the who is my—

আর এ আমার রেভারেণ্ড অন্নদাতা ফাদার ওয়াইফ—

ঠাকুরদা—তা হ'লে তোমারও কাছারীর পোষাক আছে!

অন্যত্র—

লোকেন্দ্র যে জীবিত,এই খবরটি দিতে আসিয়া ডাক্তার গুণধর ও আমি দু-ছুটো কল ভাড়িয়ে আপনার বাঁচার খবর পেয়ে ছুটে এসেছি—কিছুদূর গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।

সারদাবাবু—আজকের এ কল-এর বিলটাও তা হ'লে পাঠিয়ে দেব।

"এ পরাণ চিরি তোমারে দেখাব গিরি
কোমল চরণ তলে নত করি শির,
বধূ লাভ হ'ল আজ নন্দর পিসীর"ও ভারী উপভোগ্য।

"ভাতার কেমন মিষ্টি" অত্যন্ত সুগীত হইত।

এমন পাঁচ সাত দিন আমি এই অভিনয় দেখিয়াছি, আর অভিনয়ান্তে গানটির সময় "হ'ল না ইজ দি নতুন বন্দোবস্ত" দর্শকবৃন্দ অমৃতলালকে অজস্র সাধুবাদ দিয়াছেন আর অমৃতলালও হাত জোড় করিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়াছেন।

অমৃতলাল বিজয়বসন্ত, নবযৌবন নাটকও লিখিয়া-ছিলেন। আমাদের সাহিত্যিকগণ সবিনয়ে সকলেই তাহার আলোচনা করিবেন।

নবযৌবন ৫ই পৌষ, ১৩২০ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

বন্দে মাতরম ভারত সংস্কার (Government of India Act of 1919) বাহির হইবার পরে এবং ১৯২০ সাল হইতে চালু হইবার পরে বন্দে মাতরম প্রহসন রচিত হয়। ষ্টার থিয়েটারে ১০ই নভেম্বর ১৯২৬ অভিনীত হয়।

হিন্দুদিগকে অমুসলমান (Non-Mahomedan) বলিয়া ভোটের কাগজে অভিহিত করা হয় বলিয়া তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হন। বন্দে মাতরমে সেই মনোভাবই প্রতিভাত হইয়াছে।

বিবাহ বিভ্রাটে যে বিবাহের টাকা দিয়া পলাইয়া যায় সেই নন্দের উপসংহারও অমৃতলাল করিয়াছেন—এস্থলে রঙ্গযুক্ত গল্পের একটু পরিচয় দিতেছি। নন্দ এন সরকার এখন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস করিতেছে—কিন্তু এখন আর তেমন জজ নাই যে তার বক্তৃতা বুঝিবে, সুতরাং গত দুই বৎসরের মধ্যে কোন মামলা নাই—আসা যাওয়া পদব্রজে, ট্রামকার পর্য্যন্ত চড়েন না পাছে ব্যাড়ানের ব্যাঘাত হয়। মাই ডিয়ার যাবারের স্বামী গোপীনাথ ছেলে এলে টাকা দিব বলিয়া এতদিন যাহাদের তালবাহনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা হাইকোর্টে বন্ধকী বাড়ী ফোরক্লোজ করিবার জন্য

হাইকোর্টে নালিস করিয়াছে। নম্ব. বিনা পয়সার বাদীর কৌসিলি। প্রতিবাদী পিতাকে প্রশ্ন করিতেছে—

পুত্র—তোমার নাম ?

পিতা—তুমিতো জান বাপু

পুত্র—আমি জানি না জানি সেকথা হইতেছেনা, আদালতকে বল।

পিতা—আমার নাম শ্রীগোপীনাথ সরকার।

পুত্র—বয়স কত ?

পিতা (বিরক্ত ভাবে)—আন্দাজ বাট বাবট্টি।

পুত্র—কি জাত ?

পিতা—কায়স্থ-পুত্র—বিবাহ হয়েছে ?

পিতা (অসহ্য বশতঃ) ও গুওটা, হয়েছে বৈকি ? নইলে তোর মত অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মাল কোথা থেকে; গুওটা তুই কি ভুই কোঁড়।

সরকার সাহেব Contempt of Court বলিয়া কোর্টের দিকে তাকাইলেন। লর্ড জরিমানা করিবেন এমন সময় ইণ্টারপ্রিটার গোপনে আদালতকে বুঝাইয়া দিলেন ব্যারিষ্টার সাহেব বুড়োর পুত্র।

আদালতে একটা হাসির রোল উঠিল; ব্রিফ ফেলিয়া মিঃ সরকার হাইকোর্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন যাহার self-respect আছে সে এ কোর্টে প্রাক্টিস করেনা। সে এখন সাঁওতাল পরগণায় প্রাকটিস করে—আর আমরাও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম—তাহারই পিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছে।

এইভাবে রস বিতরণ করিতে করিতে অমৃতলাল দেশবাসীকে কাঁদাইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন।

গান

শ্রীমতী শান্তা ঘোষ

ফুরায় যা দাও ফুরাতে—
কেন যাও মিছে ছিন্ন মালার
ঝরা ফুলগুলি কুড়াতে ?
যা ছিল আজি তা নাহি রয় যদি
সেই স্মৃতি কেন কাঁদে নিরবধি—
এসো এ বিজন বন-পথছায়ে
শ্রান্ত হৃদয় জুড়াতে॥
প'ড়ে আছে পথ তুমি যে পান্থ
অস্ত অচলগামী,
সেই পথে চলো—ক্লান্ত চরণ
পরে না ক' যেন থামি।
কী যে হ'লো নাকো মিছে তারি ব্যথা
মিছে ফিরে চাওয়া—মিছে আকুলতা—
মিছে ভয় আজি সকল কামনা
বেদনা অনলে পুড়াতে॥

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

এগার

আমার ঠাকুর্দারা ছিলেন দু'ভাই। দু'জনের একজনও লেখাপড়ার সুবিধে করতে পারেন নি; কিন্তু কারবারে দু'জনই খুব উন্নতি করেন—তখনকার দিনে রাধাবাজারে তাঁদেরই ছিল সব চেয়ে বড় আমদানী কারবার। দু'জনের মধ্যে ছোট ছিলেন বুদ্ধিতে কাঁচা আর মেজাজেও কড়া। ধূর্ত্ত কর্ম্মচারীরা ছোটকে হাত করে এমন অনেক কাজ করিয়ে নিত যাতে তাদের নিজেদের মোটা হাতে লাভ হয়, কিন্তু তাতে কারবারের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। এতে বিরক্ত হয়ে বড় ভাই একদিন আদেশ দিলেন—তাঁর সই ছাড়া যেন কোন মালের অর্ডার আর বিদেশে পাঠান না হয়।

এই আদেশেই একদিন হিতে বিপরীত হল। যে-সব কর্ম্মচারীরা কারবারের স্বার্থের চাইতে নিজেদের স্বার্থকে বড় মনে করত, এই আদেশে তাদের আঁতে ঘা পড়ল। এই শ্রেণীর স্বার্থপর কর্ম্মচারীরা ছোটর দলে যোগ দিল, আর যারা ছিল কারবারের হিতৈষী তারা বলল বড়র পক্ষ টেনে। এই টানাটানায় পড়ে দোকানের অবস্থা দিন দিনই মন্দের দিকেই চলল। এ নিয়ে দু'ভায়ের মধ্যে এক দিন তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ছোট ঠাকুর্দা ছিলেন স্বভাবতই রগ-চটা। তিনি রাগের মাথায় ঠাকুর্দার পক্ষের একজন পুরনো কর্ম্মচারীকে জবাব দিয়ে বসলেন। ঠাকুর্দারও সেদিন কেমন জিদ চড়ে গেল, তিনিও ছোট ঠাকুর্দার পক্ষের একজন ধড়িবাজ কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করলেন। এই হটকারিতার ফলে ভাইদের মধ্যে কথা-বার্ত্তা বন্ধ হল আর কর্ম্মচারী বরখাস্তের অবাধ পাল্লা চলল। এই বিশ্রী কাণ্ড দেখে মুখুজ্জে দাদু ও আরো কয়েকজন হিতৈষী লোক মাঝে পড়ে একটা আপোষ করিয়ে দিলেন। কারবার ভাগাভাগি হয়ে গেল এবং ঠাকুর্দারাও পৃথকান্ন হলেন। পৈত্রিক বাড়ী ছোটর অংশে পড়ায় বড় শ্যামবাজারে বাড়ী কিনে উঠে গেলেন।

পৈত্রিক বাড়ীর তুলনায় নতুন বাড়ীটা ছোট হলেও রোদ-বাতাস ছিল খুব; আর ঘর ক'খানা ছিল বেশ বড় বড়। ঠাকুর্দারা ভিন্ন হলেও ঠাকমাদের মধ্যে বেশ প্রীত ছিল এবং আসা-যাওয়াও ছিল। পৃথক হওয়ার পর বছর না ঘুরতেই ঠাকুর্দা গঙ্গালাভ করলেন। এই অকাল মৃত্যু-শোকে ঠাকমা ও বাবা দু'জনই বেশী রকম বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কেউ না ডাকলেও আমাদের এই দুঃসময়ে ছোট-ঠাকমাই এসে সংসারের ভার নিয়েছিলেন। ছোট ঠাকুর্দাও রোজই এসে খোঁজ-খবর নিতেন। ঠাকুর্দার কাজের দিনও তিনি উপস্থিত থেকে পরম আত্মীয়ের মতই অন্তরের সহিত সব-কিছু দেখা-শোনা করছিলেন, আদর যত্ন করে লোকজন খাইয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মীয়োচিত ব্যবহারে অন্যের ত কথাই নাই, ঠাকুর্দার পক্ষের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল। ঠাকমার মুখে শুনেছি মুখুজ্জে দাদু নাকি আনন্দে আটখানা হয়ে ছোট ঠাকুর্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এই সময় বাবা হাই কোর্টে বেরুচ্ছিলেন; পসার সবে জমে উঠছিল। তিনি কারবারের কাজ তেমন বুঝতেন না এবং পছন্দও করতেন না। তাঁর অংশটা উচিত মূল্যে ছোট ঠাকুর্দা'কে বেঁচে দিলেন। এই ঘটনার বছর আড়াই পরে ছোট ঠাকুর্দা হঠাৎ 'হার্ট' ফেল করে মারা গেলেন। এই আকস্মিক বিপদে ছোট ঠাকমা যখন শোকে অধীরা হয়ে পড়লেন, সে সময় ঠাকমা, বাবা, সবাই দরদী আত্মীয়ের মতই সময়োচিত সমস্ত কাজকর্ম্ম করেছিলেন। ঠাকমা ত শ্রাদ্ধাদি চুকে যাওয়ার পরও রোজই দুপুর বেলায় ছোট ঠাকমার কাছে দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন। এদিকে ছোট ঠাকমার দাদা ও মা দু'জনই এসে জেঁকে বসলেন বাড়ীতে। ঠাকমার নিত্য যাওয়া-আসা এরা পছন্দ করত না এবং এমন হাব-ভাব দেখাত যাতে ঠাকমা অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি জা'য়ের বাড়ী রোজ রোজ যাবেন কিনা এই সমস্যা

সমাধানের জন্ত যখন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সে সময় একদিন ছোট ঠাকমার ভাজ এক দঙ্গল ছেলে পুলে, আর বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-পত্তর নিয়ে ছোট ঠাকমার বাড়ী হানা দিলেন। সারা বাড়ীতে কিছুক্ষণ হৈ-হল্লোর চলল; ছোট ঠাকমা তাদের দেখা শোনাতেই আটক পড়লেন। সেদিন আর তিনি ঠাকমার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইবার ফুরসুৎ পেলেন না। এই ঘটনার পরই ঠাকমা যাওয়া-আসাটা ক্রমে কমিয়ে আনলেন।

ছোট ঠাকমার দাদা বাসুদেব বাবু ছিলেন উকিলের ধড়িবাজ মহুরী; ইনি হলেন ছোট ঠাকমার লক্ষাধিক নগদ টাকা আর সমৃদ্ধ কারবারের রক্ষাকর্ত্তা। স্ত্রীর উত্তেজনায় মা'য়ের উসকানিতে আর নিজের অতৃপ্ত অর্থলালসায় অধীর হয়ে কোন কৌশলে বোনের টাকা-কড়ি, কারবার ও বাড়ীটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারে কিনা সে চেষ্টায় আদা-জল খেয়ে লাগলেন। দিন রাত নাকি ছোট ঠাকমাকে পাখী পড়াবার মত পড়াতেন —তুই বোন বিধবা মানুষ, তোর অভাবে তোর টাকা-কড়ি বিত্ত-পসার, সে-সবই মধু পাবে। আমরা যে কাঙাল সে কাঙালই থাকব চিরকাল।

দাদার কাঁদুনির সঙ্গে ভাজও নাকি চোখের জল মিশিয়ে বিলাপ করতেন—মধুর অভাব কি ঠাকুর-ঝি? কি মাসে কম হলেও হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার উঠতি সময়—হাজার দু'হাজারে ঠেলে উঠতে ক'দিনের মামলা?

বাসুদেব বাবু—না বোন তেলে মাথায় আর তেল ঢেলে কাজ নেই। তার চাইতে তোর এই ছা-পোষা দাদাকেই লিখে-পড়ে দে। দেখছিস ত কি কষ্টে ছেলে-পুলে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

ছোটঠাকমার ভাজ অনেক করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতেন—তাই করো ভাই ঠাকুর-ঝি; আমার আণ্ডা-বাচ্চাগুলোর একটা হিল্লে হোক।

ছোটঠাকমার মা-বুড়ীও এই কাঁদুনিতে যোগ দিতেন। তিনিও নাকি রোজই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলতেন—আহা কত কষ্টেই তোদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছি, অমু। তোকে বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে উনি কত কি সুখের স্বপ্ন দেখতেন। আহা সারা জীবন কী কষ্টই ভোগ করে গেছেন। আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুই সুখের মুখ দেখেছিস, লাখ টাকার মালিক হয়েছিস। এখন আর ভাবনা কি আমাদের? তোর যা 'শরীল' তার ওপর মধুর মা মাগীর আবার যা কুনজর, কখন কি হয় তোর তা কি বলা যায় অমু। তার চেয়ে সময় থাকতে বাসুমনির নামেই লিখে-পড়ে দে। তোর কল্যাণে কাচ্চা-বাচ্চাগুলো দুধ-ভাত, মিঠাই-মণ্ডা খাক। আর আমি তোর বুড়ী মা, আমি 'শত্তু'রের মুখে ছাই দিয়ে ফল-মিষ্টি মুখে দি, আর তসর-গরদ পরে রূপোর বাসনে পূজা-আর্চ্চা করি। তাই কর অমু, বাসুকেই লিখে-পড়ে দে। মধুর গুষ্টিকে খাইয়ে ভূতের বাপের 'ছেরাদ্দ' করিসনে।

এই ভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পাখী পড়াবার পর পাখী একদিন সত্যসত্যই বোল শিখল। বাসুদেববাবু একটা বয়নামা করিয়ে বাড়ীটা তার স্ত্রীর নামে লিখিয়ে নিলেন। আর ব্যাঙ্কের হিসাবটা ট্রান্সফার করিয়ে নিলেন নিজের নামে। শুধু এই নয়, স্ত্রীর অনুরোধে বাসুদেব বাবু তাঁর দুই শালাকে ছোটঠাকমার কারবারে চাকুরী দিলেন। বড় হলেন 'ক্যাশিয়ার' আর ছোট হলেন 'ম্যানেজার'। এই ভাবে ছোটঠাকমাকে তাঁর দাদা 'অক্টোপাসে'র মত বেষ্টন করে ফেললেন। ফলে নিজের বাড়ীতেই তিনি কার্য্যতঃ অতিথি হয়ে পড়লেন; আর ভাজের হাত তোলা খেয়ে-পরে দিন কাটাতে লাগলেন। এতে তাঁর কোন কষ্ট কি লজ্জা লাগেনি মনে। মেয়েরা চিরদিনই ভাই-গত প্রাণ; আর ভাইরা আ-বিবাহই পত্নী-গত প্রাণ। বোনেরা স্নেহে জড়বুদ্ধি, মোহগ্রস্থ; তারা ভাইদের প্রতারণা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না।

বাবা যে সেদিন ছোটঠাকমাকে কঠিন কথাগুলি শোনালেন তার একটাও মিথ্যে ছিল না। ছোটঠাকমা যে তাঁর সব কিছুই দাদাকে লিখে-পড়ে দিয়েছিলেন সে কথা ঠাকমাও জানতেন, আর আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও জানতেন। দাদাকে টাকাকড়ি লিখে দেওয়ায় বাবা বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি ছোটঠাকমার উপর। তবে

বাড়ীটা লিখে দেওয়ায় তিনি সত্যই দুঃখিত হয়েছিলেন। এতে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। যে বাড়ীতে জন্মেছেন, শৈশব, কৈশোর, যৌবনে খেলাধুলা করেছেন, বিবাহিত জীবনের মন্ত্রমুগ্ধ দিনগুলি যেখানে কাটিয়েছেন, সে বাড়ীটার জন্ত আইনতঃ দাবী না থাকলেও অন্তরের দরদের দাবী থাকাটা অন্যায় মনে করা যায় না। ছোট-ঠাকমা যদি ন্যায্য মূল্যেও বাড়ীটা বাবাকে দিতে চাইতেন তিনি হয়ত তাতেও খুশির সঙ্গে রাজি হতেন। ছোট-ঠাকমার উপর বিরক্ত থাকলেও বাবা তা কোনদিনই মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি। সে জন্তই বাবার সেদিনকার ব্যাপারে ঠাকমা ও আমি দু'জনই বিস্মিত হয়েছিলাম।

বার

বিয়ের পর আট দিনের মধ্যেই নতুন মাকে নিয়ে বাবা তিন রাত্রি কাটিয়ে এসেছেন শিবতলায়। বিয়ের পর থেকেই তিনি মাছ-মাংস খাচ্ছেন, পেড়ে ধুতি পরছেন, গায় সাবান-এসেন্স মাখছেন।

বাবার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে শুধু যে মুখুজ্জে দাদুর মত দু'চারজন বুড়োর দলই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন তা নয়। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ ঠাট্টা তামাসা করে বাবার নীচেকার বসবার ঘরের নীরস আবহাওয়াকে সরস করে তুলতেন। বাবার ছিল সাদা প্রাণ; তিনি বন্ধুদের ব্যঙ্গ-উপহাসকে বুদ্ধিমানের মতই হেসে উড়িয়ে দিতেন।

নতুন মা যেদিন দ্বিরাগমনের পর ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে এল তাঁর পোষা বেড়ালটি। হলোই বা বেড়াল কিন্তু কী সুন্দর! গায়ের বারো আনাই ছিল দুধের মত ধব্‌ধবে সাদা; মাথাটি আর কান দু'টি ছিল মিশ কালো। পাঁজরার দু' পাশে ছিল দু'টো দু'টো ক'রে কালো ছোপ, আর লেজের ডগাটি ছিল সাদা-কালোর সঙ্গে সোনালী। বেড়ালটির নাম ছিল 'গোলাপী', সে যে সার্থকনামা ছিল তাতে সন্দেহ নেই; কারণ ঠোঁট দু'খানি ছিল ফিকে গোলাপী—ঠিক যেন স্থলপদ্মের পাৎলা দু'টি পাপড়ি।

এই লোভনীয় নবাগত প্রাণীটিকে আমার বড্ড ভাল লাগল। ইংরেজরা যাকে বলে love at first sight বা প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়া, আমারও ঠিক সে অবস্থাই হয়েছিল। গোলাপীকে দেখা মাত্রই আমি কোলে তুলে নিলাম। মার্জ্জারী হলেও স্বভাবটি ছিল তার ভারি ভদ্র, ভারি শিষ্ট। চেনা-অচেনার ধার সে ধারত না; যে আদর করে কোলে নিতে চাইত, বিনা ওজরে তারই কোলে উঠে পড়ত—যেন কতকালের জানা-শোনা! আমি গোলাপীকে কোলে তুলে নিলাম দেখে নতুন মা খুব খুসী হলেন মনে হল।

কি কারণে জানিনে ঠাকমার প্রসন্নতার কোন আভাস পেলাম না। আমার কোলে বেড়ালটাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—এ আপদটাকে আবার কোথ্‌থেকে জোটালি?

—নতুন মা'র সঙ্গে এসেছে। দেখতে খুব সুন্দর, না ঠাকমা? আমি আদর করতে গিয়ে গোলাপীকে বুকে চেপে ধরলাম।

নতুন মাকে উপরে যেতে দেখেই হো'ক বা আমার অতিরিক্ত আদরে বিরক্ত হয়েই হো'ক, ছাড়ান পাবার জন্ত মিউ-মিউ করে মিনতি জানাচ্ছিল। প্রার্থনা উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে বেশ উসখুস করতে লাগল। যেই আমি একটু আলগা দিয়েছি, অমনি ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। মনের ভাবটা যেন—মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছে, সর্ব্বত্রই তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি!

ঠাকমা আপনা-আপনিই অনুচ্চস্বরে বললেন—এ আবার কি রকম সখ বাপু! বেঁচে থাকলে আরো কত কি দেখবো।

শিবুর মা নিকটেই ছিল। সে বললে—এ আবার নতুন কি গিন্নী মা? আমাদের গাঁয়ের কেষ্টো চৌধুরীর নাতনীর খুব সোন্দর একটা কুকুর ছেলো। তার মা না বাবা কে নাকি আড়াইশ' টাকায় কিনে দেয়।

ঠাকমা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—বলিস কি শিবুর মা, আ—ড়া—ই—শ' টাকা একটা কুকুরের দাম?

শিবুর মা বললে—এ আর বেশী কি গিন্নীমা, চৌধুরী

আসামের নারী শিল্প

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসাগর

প্রাচীনকালে সমস্ত সভ্যাসভ্য দেশে সকলেরই ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। রন্ধন এবং সন্তান পালন ভিন্ন চরকা এবং টাকুর সাহায্যে সূতা তৈয়ার করা এবং বস্ত্র বয়ন করা নারীদিগেরই কার্য্য ছিল। সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়ন আর্য্যসভ্যতার অতি প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটী মন্ত্রে (১০।৫৩।৬) সূত্র প্রস্তুতের এবং বস্ত্র বয়নের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ-মেয়েদের পৈতা কাটার প্রথাটি স্মরণাতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ-কন্যারই সূতা না কাটিলে চলিত না। উত্তম কাটুনীরা মিহি পৈতা কাটিতেন। বিগত ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ঢাকায় স্বদেশী মেলায় শিল্প প্রদর্শনী হয়। এই মেলায় কতিপয় মহিলা যে মিহি পৈতা উপস্থিত করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় অবিবাহিতা কন্যাকে এখনও SPINSTER (সূতা কাটুনী) বলা হইতেছে। ইংরাজের মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও বোধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সূতা কাটার কাজ (Spinning) করেন না, তথাপি তাঁহাদের ভাষায় অবিবাহিত মেয়েকে (বিশেষতঃ একটু বয়স হইলে) Spinster বলিতে ছাড়িতেছেন না। একেই বলে সংস্কার।

আসাম এণ্ডি ও মুগার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এণ্ডি বা এড়ি রেশম কীট। যে রেশম কীট এরণ্ড বা ভেরাণ্ডার পাতা খাইয়া গুটি বাঁধে উহা হইতে 'এণ্ডি' (এরণ্ডি) সূতা হয়। এণ্ডির কীট গুটির মুখ ঠেলিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া গেলে গুটিকে (cocoin) ধুইয়া পিজিয়া তুলার সূতার মত টাকুতে কাটিয়া সূতা বাহির করিতে হয়। এণ্ডিসূতা পাইবার জন্য কীটকে মারিবার প্রয়োজন হয় না। 'এণ্ডি' এবং 'পাটের' কীট গৃহের ভিতর পালন করিতে হয়। একই জাতীয় কীট হইতে মুগা এবং তসর—এই উভয় প্রকারের রেশম পাওয়া যায়। সেই কীট যখন বন্য কুল গাছের পাতা খায় এবং সেই গাছে

[৫৪৯ পৃষ্ঠার পর]

বাড়ীর ঝি বউদের কাছে শুনেছি এক একটা কুকুরের নাকি হাজার বারোশ' টাকাও দাম হয়।

ঠাকমা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন—দেখেছিস কখনও হাজার বারোশ' টাকার কুকুর?

—না গিন্নী মা। আমি শুধু আড়াইশ' টাকারই দেখেছি। বেশ ছেলো দেখতে। হাতীর কানের মত ঝুল-কাণ, ভেড়ার মত থোকা থোকা কোঁকড়ানো নরম রোঁয়া। আহা কুকুরটার কি মায়াই ছিল মেয়েটার জন্তে।

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে ঠাকমা বললেন—এক মায়ের এক বেটার মত, মেয়েটার নেও ছিল বুঝি?

—ঠিক বলেছ গিন্নীমা। মেয়েটার ত বিয়ে হয়ে গেল। পরের দিন বর-কনে যখন মোটরে উঠল কুকুরটাও ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানটায় বসে পড়ল। বাড়ীর লোকজন আর কর্তা-গিন্নী কত চেষ্টা করল কিন্তু কেউ তাকে নামাতে পারল না। যে-ই নামাতে যায় তাকেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। মজা দেখে বর ত হেসে কুটিকুটি। কনের মুখখানি কাঁদো-কাঁদো দেখে সে আর কুকুরটাকে নামাতে দিলে না। পরে শুনলাম মেয়ের শ্বশুর বাড়ী কুকুরের সে কি আদর! রোজ আধ সের মাংস আর সেরটেক দৈ নাকি বরাদ্দ হয়ে গেল তার জন্তে।

ঠাকমা শুধু বললেন—বাব্বা? কুকুর ত নয় বাপের ঠাকুর!

[ক্রমশঃ

গুটি বাঁধে তখন উহা হইতে "মুগা রেশমের সূতা" পাওয়া যায়। আর সেই কীট যখন শাল বা অসন গাছের পাতা খায় এবং সেই গাছে গুটি বাঁধে, তখন উহা হইতে তসরের সূতা পাওয়া যায়। পশ্চিম বাঙ্গলায় মুগার গুটিকে "কুলে গুটি" এবং তসরের গুটিকে "শেলো গুটি" বলে। পাট, মুগা এবং তসরের গুটীর সূতা টানিয়া বাহির করা যায়, কিন্তু এণ্ডির (এড়ির) সূতা টানিয়া বাহির করা যায় না। এণ্ডি, মুগা, পাট এবং কার্পাসের সূতা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। এড়ি সূতা মোটা হয় বলিয়া তাঁহারা উহার দ্বারা প্রধানতঃ শীতবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উক্ত পাটের সংস্কৃত নাম "পত্রোর্ণা" (পত্র+ঊর্ণা)। অসমীয়ারা 'ত' বর্ণের স্থানে 'ট' বর্ণের উচ্চারণ করায় আমাদের 'পাত' অসমীয়াতে 'পাট' হইয়াছে। রেশমের কীট তুঁতগাছের পাতা খাইয়া যে গুটি বাঁধে উহা হইতে এই 'গরদ' বা 'পাটসূতা' পাওয়া যায়। 'গরদ' শব্দ গৌরদ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ হলুদে রঙের। প্রকৃতপক্ষে পত্রোর্ণা শ্বেত এবং হরিদ্রা উভয় বর্ণের হয়। আমাদের গরদ এবং অসমীয়াদের 'পাটর কাপড়' মূলতঃ একই বস্তু।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বহুস্থানে তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। অসমীয়ারা বুননকে 'রাস' (নানা weaving) বলেন। আমরা বিগত ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে দরঙ জেলার মঙ্গলদৈ অঞ্চলের 'রাস' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উজনী আসামের নগাঁও জেলার বহুস্থানে সেখানকার 'রাসের' খ্যাতি আছে। গৌহাটী মহকুমার নাহরভাগ মৌজার মাথিবাঁহা গ্রামের (Ry. Stn. Tihn.) রাস ও তাঁতের নানাবিধ সরঞ্জাম চিত্তাকর্ষক। সেগুলিও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের জেলাগুলিতে প্রশংসিত। অন্যান্য প্রদেশে নারীগণ প্রধানতঃ পাককার্য্যকেই প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্ব্বত্র কি স্বচ্ছল, কি অস্বচ্ছল অসমীয়া মহিলারা সাধারণতঃ কোন রকমে পাককার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহারা তাঁতশালায় গিয়া কাজ করেন। কেবল নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সেখানকার ধুবড়ী মহকুমার গৌরীপুর, রূপসী, শানকোয়া, ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ দলগোমা আদি গ্রামে কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে তাঁতশালা আছে উহা হইতে প্রয়োজনমত কাপড়, চাদর, গামছা, মশারী প্রভৃতি বুনা হয়। গোয়ালপাড়া জেলার মহিলারা যেন বাঙ্গালারই মেয়ে। তাঁহাদের মধ্যে শাড়ী, সেমিজ, জ্যাকেট, ব্লাউজ ব্যতীত রীহা ও মেখেলার প্রচলন নাই। এ কারণ সে অঞ্চলে এই দুইটী প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় না।

সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিলের কাপড়ের চলন অধিক বলিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য সূতার কাপড় তেমন প্রস্তুত হয় না। এখানকার মহিলারা তাঁতের সাহায্যে শাড়ী কোটের কাপড়, চাদর, গামোছা প্রভৃতি বয়ন করেন। ইহা তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। এমন কি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের (অর্থাৎ গোয়াল পাড়া, কামরূপ, দরঙ, নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের) খুব বড় ঘরের মেয়েরাও নিজেদের হাতে সূতা কাটিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। বাঙ্গালা দেশে পাত্রী দেখার সময় যেরূপ কুমারীদের হস্তাক্ষর পরীক্ষা হয়, আসামে সেরূপই কুমারীর প্রস্তুত রীহা, মেখেলা, রুমাল পরীক্ষা করা হয়। আসামে পুরুষেরা বস্ত্রবয়ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বর্ত্তমান কামরূপ অঞ্চলের পলাশবাড়ী, সোয়ালকুচি এবং উহাদের নিকটবর্ত্তী যে কয়েকটি গ্রামে ব্যবসায়ের জন্য বস্ত্র বয়ন করা হয়, কেবল সেখানে পুরুষেরা স্ত্রীলোক-দিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁতের কাপড় বুনিয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, কৃষি কার্য্যের দিকে তাহারা তেমন লক্ষ্য রাখে না। শ্রীহট্ট অঞ্চলে একমাত্র যোগীজাতীয় ও মণিপুরী নারীগণ তাঁতে কাপড়, গামছা ও মশারী বয়ন করিয়া থাকেন। নিম্ন-আসামে মশারীকে 'মুহরী' এবং উজনী আসাম অঞ্চলে উহাকে 'আঠুয়া' বলে। পল্লীগ্রামের ও নগরের মহিলারা নিজ নিজ বাটীতে ব্যবহারের জন্য সূতা অথবা এড়ির দ্বারা 'মুহরি' কিংবা 'আঠুয়া' প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত পলাশবাড়ী ও সোয়ালকুচিতে অতি সুন্দর মুগার শাল, কাপড়, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি মূল্যবান

পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মঙ্গলদৈ অঞ্চলের মহিলারা বস্ত্রগুলিকে সুশোভন অথবা চিত্রিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছগাছড়া এবং ফুলের নির্য্যাস হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এরূপ উৎকৃষ্ট রঙ প্রস্তুত করিয়া থাকেন যে, সেগুলি দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মধ্য-আসামের তেজপুর ও উপর-আসামের লখিমপুর অঞ্চলের মহিলাদের বস্ত্রবয়ন-শিল্পের পারিপাট্য বিষয়ে কামরূপের উত্তর গৌহাটী, নলবাড়ী, বেলসর, গঙ্গিয়া, চামটা, মাহিবাঁহা, বড়পেটা প্রভৃতি স্থানের মহিলাদিগের কৃতিত্ব অধিক। উপর-আসামের শিবসাগর জেলার গোলাঘাটে অবস্থানকালে আসাম-জননীর অন্যতম কৃতিসন্তান বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চলিহা (Excise Inspector) আমাকে বামাহস্তের নানা প্রকার বয়ন শিল্প ও সীবন যন্ত্রের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহকুমার নহরাণী মৌজার মুগাজাত বস্ত্রশিল্প সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গোলাঘাট ও শিবসাগর অঞ্চলের বহুস্থানের মহিলারা তাঁতের সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট 'হাচতি' ও 'চিৎ' বয়ন করিয়া থাকেন। এই দুইটীর আকৃতি রুমালের মত। 'চিৎ'এ তেঁতুল পাতা প্রভৃতির নক্সা থাকে। শিবসাগর জেলার কতিপয় স্থানে অহম বংশীয় মহিলাগণের কৃত নানা প্রকারের নয়নাভিরাম চানেকী—ডিব্রুগড় মহকুমার বহুস্থান আমি পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু কোথায়ও উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প আমার চক্ষে পড়ে নাই। এখানকার ব্রহ্মপুত্র তটস্থ মটকডাইনি গ্রামের অনেক নদীয়াল (আধুনিক কৈবর্ত্ত) জাতীয় রমণী সীবনশিল্পে সিদ্ধহস্তা। আমি তাহাদের তৈয়ারী কতকগুলি কাঁথা (সুচিচিত্রিত) দেখিয়াছিলাম।

অসমীয়া মহিলারা মুগার সুতার দ্বারা মেজাঙ্করী, রীহা, মেখেলা এবং কার্পাস সূত্রে খনীয়া ও চেলেং নামক চাদর, গামোছা প্রভৃতি বয়ন করিয়া থাকেন। চেলেং ও খনীয়ার মধ্যে পার্থক্য এই যে, চেলেং এক পাট্টা এবং খনীয়া দুই পাট্টা বিশেষ। চেলেংয়ের একদিকে এবং খনীয়ারও একদিকে মুগা অথবা জরীর কাজ থাকে। মুগা হইতে বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার বস্ত্রকে 'মেজাঙ্করী' বলা হয়। ইহা অনেকটা ঢাকার মসলিন বস্ত্রেরই অনুরূপ। সাদা পাটের কাপড়ের উপর অসমীয়া মহিলারা অতি সুন্দর জরীর কাজ করিতে পারেন। ইহাকে "গুণার বনকরা কাপড়" বলে। বস্ত্র বয়নের সঙ্গে সঙ্গে জরীর কাজ করা হয়—ইহার সহিত সূচীকার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এই চিত্তাকর্ষক জরীর কাজগুলি এক প্রকার নিদর্শন বা নমুনা (pattern) দেখিয়া প্রস্তুত হয়। অসমীয়ারা এই নমুনাকে 'চানেকী' বলেন। খুব সরু সরু বাঁশের শলার উপর সুতার দ্বারা নানা রকমের লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির নিদর্শন দেখাইবার উদ্দেশ্যে চানেকীগুলি প্রস্তুত করা হয়। অসমীয়া মহিলারা পাটের কাপড়ে মেখেলা, রীহা ও খনীয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সেগুলিতে স্বহস্তে সুভুষিতভাবে অতি মনোরম শিল্পকার্য্য করেন।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পাদদেশে যে সকল নমঃশূদ্রের বিধবারা বসবাস করেন, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবহার্য এড়ি পোকা উঠান ও তাহার সাহায্যে রেশম তুলিয়া বস্ত্র বয়ন করেন। তাঁহাদের প্রস্তুত কোন বস্ত্র বাজারে বিক্রয় হয় না। খাসিয়া পাহাড়ের সীমান্তে 'ভৈ' নামে এক স্বতন্ত্র বন্যজাতি বিশেষের বাস আছে। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষেরা খাসিয়া এবং সিংটেনদিগের জন্য এবং নিজ নিজ ব্যবহার্য এণ্ডি ও মুগার কাপড় বয়ন করে। বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই লেখক ভুটীয়া, মিরি, ছুটীয়া, পাকিয়ান আদি বন্য ও পাহাড়ীয়া এবং অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া পরিচিত মহিলাদিগের বস্ত্রবয়ন-নৈপুণ্য দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। স্বর্গত মহাত্মা লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি মহোদয় ঐ বৎসর তেজপুরে আমাকে বলিয়াছিলেন—ভোট বা ভুটান অঞ্চলে প্রস্তুত 'কিংখাপ' নামক অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সমন্বিত কৌষের বস্ত্র (ইহা অত্যন্ত মূল্যবান) সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন অসমীয়া ভদ্রলোকদিগের বাটীতে স্থান না পাইলে তাঁহারা তৃপ্তিবোধ করিতেন না।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্য্য সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কামরূপ বা কামরূপ জনপদের মহিলারা তাঁহাদের প্রতিবেশিনী কিরাত রমণীদিগের নিকট হইতে

বস্ত্র বয়নের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে বৈচিত্র্য না থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যেহেতু স্মরণাতীত-কালে নেপাল, ত্রিপুরা, কোচক (বর্ত্তমান কোচবিহার অঞ্চল), উত্তর বঙ্গ আদি দেশের ন্যায় পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নামে অভিহিত অঞ্চলও কিরাত জাতির অধ্যুষিত ছিল এবং সেই ঐতিহ্যটী কামরূপে উদ্ভূত কালিকা পুরাণেও প্রদত্ত হইয়াছে। কিরাত জাতির মহিলারা (এবং উপর-আসামের খামতি রমণীরাও) স্তন-যুগলের উপরিভাগে যে ধরণে কাপড় আঁটিয়া পড়িত—আজিও নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া মহকুমার কোন কোন স্থানে এবং কামরূপ জেলার ও দরঙ্গ মহকুমার সর্ব্বত্র অসমীয়া 'গাভরু'রা (যুবতীরা) এবং উত্তর বঙ্গের কোচ ও রাজবংশী যুবতীরা সাধারণতঃ নিজ নিজ বাটীতে সেই ধরণে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। অসমীয়ারা উহাকে 'মেখনী মারা, এবং রাজবংশীরা অথোরণ (বা আগুরণ) পন্না বলেন। 'মেখনী' শব্দ সংস্কৃত 'মেখলা' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং উহার অর্থ বেষ্টনী। উক্ত আগুরণগুলি সাধারণতঃ ৪ হাত দীর্ঘ এবং ৮ হাত প্রস্থ। আসামের বস্ত, অর্দ্ধসভ্য ও পাহাড়ীয়া জাতির মহিলারাও যে বস্ত্রবয়নে সুনিপুণা তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হউক, অসমীয়া মহিলাদিগের রীহা, মেখেলা ও ও চেলেং পরিধানের পদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার এবং ইহাতে তাঁহাদের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, ভারতের আর কোন দেশে তাহার নিদর্শন মেলে না।

বর্ত্তমান কামরূপ অঞ্চলের মহিলারা পুরাতন কাপড়ের পাড় এবং পুরাতন (বা ছিন্ন) কাপড়ের দ্বারা নানা রকমের গালিচা ও সৌখিন কাঁথা প্রস্তুত কার্য্যে সিদ্ধহস্তা। নগাঁও জেলার হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা কার্পাস সূত্র দ্বারা বিছনী (ব্যজনী বা পাখা) ও গাড়ুর তলা'র (বালিসের চাকতির) উপর এরূপ চিত্তাকর্ষক সূচীকার্য্য করেন যে উহা দর্শন মাত্রেই মুগ্ধ হইতে হয়। অসমীয়া ভাষায় বালিসকে গাড়ু বলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সাধারণ লোকের ঘরে ট্রাঙ্ক নামক বাক্স ছিল না। কাপড়-চোপড় যে বোচকায় বাঁধা হইত, তত্রত্য মহিলারা সেটী সাদা, নীল, লাল আদি সুতায় নানাপ্রকার ছবির দ্বারা চিত্রিত করিতেন এবং তাহার বেষ্টনী প্রয়োজন মত দীর্ঘ-প্রস্থ কাপড় কাটিয়া সুঁচ শিল্পের সাহায্যে উহাতে পাখী, ঘোড়া, হাতী, মানুষ আদির মনোরম মূর্ত্তি আঁকিতেন। যাহা হউক, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে শ্রীহট্ট অঞ্চলে দেশব্যাপক বস্ত্র শিল্পের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আসামে পুরুষেরা ব্যতীত কোন অসমীয়া মহিলা কোনরূপ বংশ শিল্পের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। অসমীয়ারা চাটাইকে 'ধারি' এবং চাঁচকে 'বনে' বলেন। শ্রীহট্ট দেশ আসাম প্রদেশভুক্ত থাকাকালে তত্রত্য নমঃশূদ্র জাতীয়া নারীদের প্রস্তুত চাটাই, চাঁচ, চুপড়ী প্রভৃতি বংশশিল্প গৌরবজনক ছিল এবং সেগুলি কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে চালান হইয়া প্রতি বৎসর বেশ অর্থাগম হইত। আসামের দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলায় অতি উৎকৃষ্ট শীতল পাটী প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে সেখানকার কোন মহিলা হস্তক্ষেপ করেন না। শ্রীহট্ট অঞ্চলের দাস জাতীয় নারীদের প্রস্তুত বেত্রনির্ম্মিত মূর্ত্তা এবং শীতলপাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার পুরুষেরা এই শিল্পকার্য্যে নারীদের সহায়তা করেন। আসামে মূর্ত্তাকে 'মুদ্রা' বলে। শ্রীহট্ট সহরে বেতের পেটরা এবং সুটকেশ প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যে নমঃশূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের হাত রহিয়াছে। শ্রীহট্ট জনপদে দেবদাস, দে, সিংহ, ভাণ্ডারী উপাধিধারী লোকেরা নমঃ-শূদ্রজাতীয়। তাহারা বেতের পেটরাকে 'জাকরি' বলে। অসমীয়ারা এই জাকরিকে 'পেটরা' বা 'জপা' বলে। পেটরা অপেক্ষা জপা আকারে একটু বড়। আসামে উচ্চ-নীচ প্রায় সকল জাতির পুরুষেরা এই দুইটি এবং উক্ত ধারি বান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আসাম উপত্যকা বিভাগে মোজা বুনার কাজ কিংবা পাত কাটার কাজ (কাগজের কাজ) হয় না।

স্বর্গত মোহনচাঁদ গান্ধীজী বহু স্বাধীনতাকামী অসমীয়া ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে ও কাতর প্রার্থনায় বিগত ১৯২১ খৃঃ অব্দের আগষ্টমাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পর্য্যটিত স্থানগুলি

হইতে বহু টাকার তোরা উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোন কোন স্থানের মহিলাদিগের বস্ত্রশিল্পের পারিপাট্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই সংবাদটি ভূয়সী প্রশংসাসহ স্বকীয় "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নাম্নী সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকায় "Lovely Assam" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য—ঢাকার মসলিন ভারতের বহির্ভাগে যাবতীয় সভ্যদেশে বিলাস ও শোভার চরম দ্রব্য বলিয়া গণ্য ছিল। সেই মসলিন এখন নাই এবং সেরূপ শিল্পীর সন্ধান এখন আর মিলে না। বঙ্গ বিখ্যাত শান্তিপুরের ধুতি, ত্রিপুরার সরাইলের ধুতি এবং বালুচরের শাড়ীর গৌরবের ভাবিটুকু এখন নির্ব্বাণোন্মুখ। বৃটিশ জাতি যখন বণিক বেশে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে বহুবিধ শিল্পকর্ম্ম দেখিয়াছিলেন। তাহার পর কিরূপে সেইগুলি একে একে বিলুপ্ত হইল তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প প্রধানতঃ ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতির ফলে এখন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষরূপ প্রবল ছিল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এবং জাতির উপর সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের অভিযান চালাইয়াছেন, কিন্তু তখনও কোন শিল্পের কিছুমাত্র হানি হয় নাই—বরং সমৃদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়। বিবিধ কারুকার্য্যে সমৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহ ও আধুনিক পাকিস্থানভুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলের সে মহিমময়ী শ্রী আজ বিপর্য্যস্ত।

কেবল ইংরাজকে শোষক বলিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য-নীতির (Commercial policyর) দোষ দিলে চলিবে না। আমরা কখনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল ভাবিয়া দেখি নাই। প্রতিকারের কোন চেষ্টাও করি নাই। মনে পড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদির প্রচেষ্টার কথা। এবারকার বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিকাংশ নর-নারী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে হৃদয়বিদারক হাহাকার রব তুলিতেছে—ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। পশ্চিম বঙ্গে উহার কম প্রতিক্রিয়া নানা প্রকারে হইতেছে না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার শিল্পাদির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, উহার স্থানবিশেষে এখনও যাহা আছে অদূর ভবিষ্যতে তাহাও লোপ পাইবে। তখন পূর্ব্ববঙ্গের নানাবিধ শিল্পের ন্যায় এদেশের শিল্পের গৌরবকাহিনী একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হইবে সংশয় নাই।

প্রতিধ্বনি

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পূর্ব্ববঙ্গে দাঙ্গা চলেছে ;

বহু হিন্দু মারা পরেছে মুসলমানদের হাতে। বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে অজস্র। আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা ছুটেছে—উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে।

*

আমেদ এসে দাঁড়ালো, হাতে তার রামদা। সঙ্গে এসেছে একপাল উন্মত্ত মুসলমান।

হাত জোর করে কাঁপছে নমিতা, বলছে, রক্ষা কর, বাঁচাও। তোমার ত কোন ক্ষতি করিনি আমরা। তবে কাটবে কেন?

বিকট ভাবে হেসে ওঠে আমেদ, বলে, হ্যাঁ! বাঁচাবো এই দা দিয়ে। হিঃ হিঃ—বীভৎস হাসি হেসে ওঠে আমেদ।

তোমার কি ক্ষতি করেছি যে, কাটবে?

ক্ষতি করনি সত্য। কিন্তু পাকিস্থানে হিন্দু রাখব না। বড্ড বিশ্বাসঘাতক এই হিন্দুজাতি।

বিশ্বাসঘাতকের কি কাজ করেছি বল?

কৈফিয়ৎ দিতে আমেদ আসে নি।

আমাদের বাঁচাও তুমি। চিরদিন তোমায় প্রতিপালন করে এসেছি। আমাদের খেয়েই তুমি মানুষ।

উপায় নেই।

সব নিয়ে যাও, শুধু প্রাণ ভিক্ষে দাও।

সে হয় না। বিবি।

তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও। তুমি ধর্ম্মের বাপ।

বাপই বল, চাচাই বল, রক্ষা নেই।

রক্ষা কর। রক্ষা কর। খোদার দোহাই, বাঁচাও।

প্রস্তুত হন কর্ত্তারা।

আমরা প্রস্তুতই আছি—আমেদ।

আমেদের রামদা ওঠে। নমিতা আর্ত্তনাদ করে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। তারি সম্মুখে, আমেদ কেটে ফেলেছে তার পিতা মাতাকে। মূর্চ্ছিতা নমিতাকে কোলে করে নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে।

দুই

আল্লা! আল্লা! বাঁচাও, রক্ষা কর খোদা! মেয়েরা চীৎকার করছে।

বীরেন বললো, চুপ, চেঁচিও না, বল হোসেন মিয়া কোথায়?

মোরা জানি না—হুজুর।

জাননা! উল্লুক কোথাকার। বল কোথায় সে?

অণিমা বিবি বললো, খোদার কসম, মোরা জানি না হুজুর।

ফের মিছে কথা! না বললে এই ছোড়া দিয়ে জবাব বার করবো?

বিশ্বাস করুন সত্যি মোরা জানিনে, হুজুর।

তোদের বিশ্বাস নেই, তোরা বেইমান বিশ্বাসঘাতুক।

হুজুর বাপ মা,—রক্ষা করুন।

হুজুর! হুজুর! ওতে ভুলছি নে। এখন বল হোসেন কোথায়। ওকে মোরা চাই।

সত্যি কথাই বলেছি হুজুর।

তুই বলবি নে, দেখছি!

বীরেন ডাকলো, জোত সিং?

জী!

কোতল কর এই উল্লুকদের।

আপনি ধর্ম্মের বাপ। বাঁচান মোদের।

না, না, ধর্ম্ম-টর্ম্ম নাই।

রক্ষা করুন। পায়ে পড়ি!

আল্লার নাম কর তোমরা।

জোত সিং বললো, আমরা মেয়েদের নিয়ে যাই—বীরেন বাবু?

কোথায় নেবে?

মোদের বাড়ী! সাদী করবো এদের?

বেশ নিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান।

অণিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, খোদা আপনার মঙ্গল করুন হুজুর। একশ বছর পরমায়ু হোক!

মঙ্গল! হা হা—

চারিদিকে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ ভেসে উঠছে!

*

আমেদ আর হোসেন পাশাপাশি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। হোসেন স্ত্রী কন্যা ফেলে পালিয়ে এসেছে পাকিস্থানে। এরা পিতা পুত্র।

বৈদ্যনাথে সাতদিন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

গত দুর্গাপূজার ছুটিতে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চাঁদ মোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আমন্ত্রণে বৈদ্যনাথধামে গিয়াছিলাম; সাথে ছিলেন প্রবীন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার বৈদ্যনাথে গিয়া আমার মাসীমা ও মাসতুতো ভগিনীর সহিত তাহাদের 'ডক্টরস্-লজ' ভবনে প্রায় মাসাধিককাল ছিলাম। সেই সময় আমার মাস্তুতে ভগিনীপতি বাগবাজারের সোম্ বংশোদ্ভূত প্রবোধবিহারী সোম আমায় যে ভাবে আদর আপ্যায়ণ করিয়াছিলেন তাহা আজও আমার স্মরণে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—প্রবোধ বাবু, আমার ভগিনী এবং আমার মাসীমা সকলেই অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই জন্ত বৈদ্যনাথের পুরাণো স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া মনকে ভারী করিবার বাসনা আমার আর ছিল না। কিন্তু তাহা আর হইল না; চাঁদমোহন বাবুর আমন্ত্রণ ও পরমপূজ্য হেমেন্দ্রবাবুর সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ আমাকে আবার বৈদ্যনাথের চরণ দর্শন করাইয়া তবে ছাড়িল। মানুষের নিজের হাতে যে কিছুই নাই, প্রত্যেক মানুষ যে এক অজানিত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা নিজ জীবনে আর একবার উপলব্ধি করিলাম।

নন্দন পাহাড়ের উপর মহাদেবের মন্দির

তবে এবারে বৈদ্যনাথে গিয়া আমার লাভ ও অভিজ্ঞতা যে অনেক হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বলা প্রয়োজন; কারণ বাংলা দেশের দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে সাতদিন একত্র বসবাস আমার পক্ষে শ্লাঘার ও অন্যের নিকট যে ঈর্ষার বিষয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বৈদ্যনাথে সাধারণতঃ লোকে যায় দুইটি কারণে—প্রথমতঃ পুণ্য-সঞ্চয়ের কামনায়, আর দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য লাভের আশায়। কিন্তু আমি বা হেমেন্দ্র-বাবু সেইরূপ কোন আশা করিয়া বৈদ্যনাথে যাই নাই বলিয়া, সেখানে কলিকাতার অবিশ্রাম কলরোলের পরিবর্ত্তে যেরূপ নিভৃত বিশ্রাম-সুখ লাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছি, তাহা আমার স্মৃতিপথে বহুদিন জাগিয়া থাকিবে।

শুনিলাম হেমেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে পাঁচবার বৈদ্যনাথে গিয়াছেন, সেই জন্ত বৈদ্যনাথের যাবতীয় বাড়ি ও প্রতিটি রাস্তা তাহার মুখস্ত। তিনি প্রথম বৈদ্যনাথে যান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, তখন আমার জন্মই হয় নাই। তার পর যান ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, দেওঘর

বড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের পক্ষে উকিল হিসাবে তাহার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে; তখন তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ। এতদ্ব্যতীত আরো বার তিনেক তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছেন, সেইজন্য আজও বহু ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় রহিয়াছে। তাই এবারে হেমেন্দ্র বাবু সঙ্গে থাকায় আমারও তাঁহার মারফৎ বহু ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়; কেবল আলাপ বলিলে যথেষ্ট হইবে না, কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করিয়া এমন কতকগুলি জিনিষ আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে, যাহা বলিবার জন্যই আমি আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

ট্রেন ছাড়িবার কথা সকাল সাড়ে দশটায়; আমরা দশটার মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূজার ভীড় তখনও একেবারে কমে নাই; সেকেণ্ড ক্লাসের যে কয়খানি টিকিট ছিল, তাহা দূরের যাত্রীরা বহু পূর্ব্বেই কাটিয়া রাখিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময় রেলের এক কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসে 'স্লিপিং কোচের' টিকিট কিনিতে বলিলেন। কারণ পূজার সময় রেলওয়ে কোম্পানী যাত্রীদের সুবিধার জন্য ঝাঁঝা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঐরূপ কয়েকখানি গাড়ি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে এ খবরটা জানিতাম না; তাই রেলের সেই কর্ম্মচারীটিকে ধন্যবাদ জানাইয়া দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিলাম এবং ঝাঁঝার মধ্যেই আমরা নামিয়া যাইব, সুতরাং কোন অসুবিধা হইবে না ভাবিয়া স্লিপিং কোচে গিয়া বসিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দ্ধারিত সময়ে দিল্লী এক্সপ্রেস্ তাহার গন্তব্যপথে যাত্রা সুরু করিল।

কামরার মধ্যে হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন পরিচিত লোক দেখা গেল, তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও জামাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারাও শুনিলাম বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে বা মধুপুরে যাইতেছেন। ট্রেন ছাড়িবার

বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনের পার্শ্বে রাস্তার দৃশ্য

অব্যবহিত পরে তাঁহারা হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু প্রত্যেকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সকলেই যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, মনে হইল যেন—তাঁহারা 'হুগলী জেলার ইতিহাস'-লেখকের বয়স আর একটু বেশী হইবে বলিয়াই আশা করিয়াছিলেন। নরেনবাবু বলিলেন যে, আপনি এই বয়সে এত বড় বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় ধন্য হইলাম। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রাজা প্যারীমোহনের পৌত্রও যথেষ্ট আশ্চর্য্য হইলেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতে কত দিন সময় লাগিয়াছে, কেন হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিলাম, অন্যান্য জেলার ইতিহাস আবার লিখিব কি না—প্রভৃতি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিলাম। পরে তিনি আমাদের

দুইজনকে একদিন তাঁহার উত্তরপাড়ার বাড়িতে যাইবার জন্য আমন্ত্রন জানাইলেন।

এই সমস্ত প্রারম্ভিক কথাবার্ত্তার পর আরম্ভ হইল রাজনীতির আলোচনা। হেমেন্দ্রবাবু বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেসের প্রাচীনতম সেবক, দেশবন্ধুর সহচর এবং এক-সময় কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ওকালতি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজও তিনি মোটা খদ্দর ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরেন না; সুতরাং তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া কংগ্রেস সরকারের বর্ত্তমান নীতি লইয়া যদি কেহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যদিও তিনি সরকারের ভিতরের খবর কোন কিছুই জানেন না এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস পরিচালকবৃন্দের সহিতও যুক্ত নন, তথাপি তাঁহাকে যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে জানেন, তাঁহারা ছাড়িবেন কেন?

চলন্ত ট্রেণের কামরার মধ্যে আলোচনা খুব জোর চলিতে লাগিল, হেমেন্দ্র বাবু কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সুতরাং কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ণধারা জনসাধারণ যে কেন পছন্দ করিতেছে না, তাহা তিনি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন; গাড়ীখানি একটি ক্ষুদ্র সভাক্ষেত্রে পরিণত হল। গাড়ীতে যত নরনারী ছিল, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। গাড়ীতে তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারাও কংগ্রেসকে গালাগালি দিতে সুরু করিলেন। দেখিলাম যে, পাঞ্জাবীদের রাগও বাঙ্গালীদের চেয়ে বড় কম নয়।

আলোচনা কোথা হইতে যে কোথায় চলিল—তাহা আজ আর ঠিক স্মরণ নাই। কাশ্মীর, হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন, হায়দ্রাবাদ, বাস্তুহারাদের কথা, চোরা কারবার, বর্ত্তমান কংগ্রেসীদের অসাধুতা, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধান রায়, সুরেন ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি যে কত রকমের আলোচনা চলিতে লাগিল—তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না, তবে মোট কথা, কেহই যে বর্ত্তমান সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট নন, তাহাই বুঝিলাম।

আমিও মধ্যে মধ্যে আলোচনায় যোগ দিলাম, কিন্তু প্রত্যেকের প্রতিপাদ্য বিষয় যে সরকারের প্রতি বিরাগ, তাহা অনুরাগে পরিণত করাইতে কোন রকমেই সমর্থ হইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি জনসাধারণের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া চলিতেন তাহা হইলে দেশের অবস্থা বোধ হয় এইরূপ হইত না।

হেমেন্দ্র বাবু কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশমত সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যের ভার লইলে দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অর্থই যে হইয়াছে অনর্থের মূল—সেই গৌরী সেনের অর্থ আধা অর্দ্ধশিক্ষিত ও মূর্খ কংগ্রেসীদের হাতে যখন পড়িয়াছে, তখন তাহা ছাড়িয়া ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তীর মত মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ মত জন-সেবা করিতে অগ্রসর হইবে এইরূপ বোকা নির্লোভী কংগ্রেস-সেবক আজ আর কেহ আছেন কি? স্বার্থ দুষ্ট, আত্মীয় পোষণকারী, চোরা-কারবারী কংগ্রেসীগণকে দেশের লোক এখন কি ভাবে দেখেন তাহা চিন্তা করিলে দুঃখ হয়।

আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে চার ঘণ্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; গাড়ী মিহিজামে আসিয়া দাঁড়াইল। মিহিজামের নাম সম্প্রতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে "চিত্তরঞ্জন" হইয়াছে। এইস্থানে রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে কারখানার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ইহা এশিয়ার বৃহত্তম কারখানায় পরিণত হইবে। ভারতের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই স্থানের নাম চিত্তরঞ্জন ও কারখানার নাম "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্‌" বলিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই কারখানায় নির্ম্মিত প্রথম ইঞ্জিনখানির নাম হইয়াছে "দেশবন্ধু" এবং দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী উক্ত ইঞ্জিনের নামকরণ করেন। হেমেন্দ্রবাবু দেশবন্ধুর বিশেষ ভক্ত, সেইজন্য তিনি জাতীয় সরকারের এই কার্য্যটি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং দেশবন্ধুর রাজনীতি যে কি তাহা লইয়া আবার আলোচনা সুরু করিলেন। দেশবন্ধুর দান, তাঁহার দেশবাসীর প্রতি দরদ প্রভৃতি বিষয় লইয়া হেমেন্দ্র বাবু এরূপ সুন্দর গল্প আরম্ভ করিলেন যে, গাড়ীর

যাত্রীগণ তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গেল। বেলা সাড়ে তিনটার সময় ট্রেন যশিডি ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল; আমরা সকলে অবতরণ করিলাম—যাত্রার প্রথম পর্ব এইস্থানে শেষ হইল।

দুই

যশিডি ষ্টেশন হইতে একখানি মোটরে করিয়া আমরা চাঁদমোহনবাবুর বাড়ী রওনা হইলাম; ষ্টেশন হইতে তিন মাইলের মধ্যে রোহিণী রোডে 'এসিয়াটিক্ হাউসে' তিনি অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এসিয়াটিক হাউস বৈদ্যনাথের একখানি প্রসিদ্ধ বাড়ী; প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর এই সুরম্য ভবনটি অবস্থিত, পার্শ্বে আর একখানি ছোট বাংলো আছে—চারিদিকে ফুলের বাগান বাড়ীর পরিবেশকে আরো মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেখিয়া চাঁদমোহন বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। বাংলোর সম্মুখে চেয়ার পাতা ছিল—আমরা বসিলাম; তিনি চাকরকে ইঙ্গিত করিলেন—চাকর আমাদের মুখ ধুইবার জন্ত জল আনিয়া দিল। তারপর আসিল দুইখানি প্লেটে দুইজনের জলখাবার ও চা।

এসিয়াটিক হাউসের পাশেই 'বড়াল বাংলো'। এই বাড়ীতে এখন পাবনা সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবর্গ অবস্থান করেন। চাঁদমোহনবাবু তাঁহাদের কথা বিস্তারিত ভাবে আমাদের বলিতে লাগিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত শুনিতে লাগিলাম। পূর্ববর্তী বারে তিনি একবার আশ্রমে গিয়াছিলেন, এবারেও তাঁহার শিষ্যগণ চাঁদমোহনবাবুকে আশ্রমে যাইবার জন্ত বিশেষরূপে আহ্বান জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম যে, এবারে আর তিনি আশ্রমে যাইবেন না।

সেই সময় সৎসঙ্গের "ঋত্বিক সম্মেলন" হইতেছিল; তাই পাঁচটার সময় সৎসঙ্গের অগণিত ভক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। জনবিরল রোহিণী রোড নরনারীর কল্লোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে সৎসঙ্গের একজন ডাক্তার আসিয়া চাঁদমোহন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি চাঁদমোহনবাবুর একটি ছোট কন্যাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন শুনিলাম; তিনি আসিতেই আমাদের সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, কারণ 'মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম' এই নীতি-কথা আমাদের মানা উচিৎ বলিয়া মনে করিলাম।

ডাক্তারবাবুর সহিত চাঁদমোহন বাবু আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন; তিনিও অনুকূলবাবুর আশ্রমে যাইবার জন্ত আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। হেমেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব হইতেই অনুকূলবাবুকে জানিতেন, কারণ তিনি যখন দেশবন্ধুর সেক্রেটারী ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় আশ্রমের কর্ম্মিগণ দেশবন্ধুকে পাবনায় 'সৎসঙ্গ' দেখিতে লইয়া যান। সে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর দেশবন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দার্জ্জিলিং যাইবার পথে পাবনায় সৎসঙ্গের আশ্রমে গিয়াছিলেন শুনিলাম।

ডাক্তারবাবু ঔষধপত্র দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চাঁদমোহনবাবুকে বেড়াইতে যাইবার জন্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন, আজ আপনারা ক্লান্ত, আজ আর বিশেষ বেড়াইবেন না। সন্ধ্যার পর বাড়ীর সামনেই সকলে একটু বেড়াইব। তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু দেরী ছিল—আমি বলিলাম, তবে চলুন না একটু সাধু দর্শন করিয়া আসি। আপনার বাড়ীর পাশে এত বড় এক সাধু যখন রহিয়াছেন, তখন একবার দর্শন করা উচিৎ। হেমেন্দ্রবাবু রাজী হইলেন, কারণ সাধু তাঁহার পরিচিত; কিন্তু চাঁদমোহনবাবু যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, আপনারা দর্শন করিয়া আসুন—আমি আপনাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছি; আপনারা ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে একসঙ্গে বেড়াইতে যাইব।

চাঁদমোহনবাবুর কথামতই কাজ করা হইল; আমি ও হেমেন্দ্রবাবু "বড়াল বাংলো" অভিমুখে গেলাম। বাংলোর সম্মুখে নরনারীর ভীড় জমিয়াছে—আমরা ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সভাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি ও বহু নারী সমবেত হইয়াছেন। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র যে স্থানে বসিয়া আছেন তাহার তিন দিকে বেড়া দিয়া ঘেরা; বেড়ার চতুর্দ্দিকে অগণিত নরনারী দূর হইতে তাঁহাকে

দর্শন করিতেছেন। আমরা বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাবো, এমন সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া ভিতরে যাইতে আমাদের নিষেধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি ভিতরে গিয়ে দয়া ক'রে অনুকূলবাবুকে বলুন যে, কলকাতা থেকে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।'

ভদ্রলোক ভিতরে গিয়া বলিবা মাত্র তিনি আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে নিয়া গেলেন; হেমেন্দ্রবাবু আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য বলিলেন, কিন্তু বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে জুতা খুলিয়া যাইতে হয় দেখিয়া আমার ভিতরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না, কারণ, পূজার সময় আমার একজোড়া নুতন জুতা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে চুরি গিয়াছিল। তা ছাড়া পোষাকটাও সেই সময় দেশী ছিল না—তাই আমার আর সেদিন সাধুসঙ্গ করা হইল না। আমি কেবল ভীড় দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম ভীড়ের মধ্যে একটি সাহেব কি পুস্তক বিক্রয় করিতেছে। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল; তাহার কাছে যাইয়া 'গুড ইভনিং' বলিয়া আলাপ সুরু করিয়া দিলাম।

সাহেবটির নাম মিঃ স্পেন্সার (Mr. Spencer), আমেরিকান—তিনিও সৎসঙ্গের সভ্য এবং শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের শিষ্য হইয়াছেন। এই কথা তাহার নিকট হইতে শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। মিঃ স্পেন্সারের বয়স ত্রিশের মধ্যে হইবে; পূর্ব্বে তিনি সামরিক বিভাগে ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, পরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাহার আলাপ হয় এবং তিনিই সৎসঙ্গে তাহাকে লইয়া আসেন। যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি আর আমেরিকায় ফিরিয়া যান নাই—আশ্রমেই রহিয়া গিয়াছেন। কারণ আশ্রমের আদর্শ তাঁহার ভাল লাগে।

সাহেবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার তাঁহাকে খুব ভাল লাগিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিলাম, তিনিও হাসিমুখে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:

তিনি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন; পরে তিনি বিবাহ করেন। পিতার অর্থও যথেষ্ট আছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য দেওঘরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর তাহার স্ত্রীর সহিত যান নাই। বরং তিনি তাহার স্ত্রীকেও আশ্রমে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী আশ্রমে থাকিতে রাজী হন নাই।

মিসেস স্পেন্সার শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বামীকে সৎসঙ্গ আশ্রম হইতে ছাড়িয়া দিতে বলেন; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারেন—তিনি তাহার স্বামীকে আটক করিয়া রাখেন নাই। এইভাবে তাহাদের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি দেওঘর হইতে রাগ করিয়া চলিয়া যান।

ভারতীয় নারী ও আমেরিকান নারীদের মধ্যে কি পার্থক্য তিনি দেখিতেছেন—এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সাহেব বলিলেন যে,ভারতীয় নারী স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি সদগুণে ভূষিতা, কিন্তু তাহাদের দেশের নারীদের এই সমস্ত গুণগুলি আজকাল কুশিক্ষার জন্য একপ্রকার চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় মহিলারা এখনও ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই বলিয়া ভাল আছেন, ভারতীয়দের ঘর এখনও ঠিক আছে, কিন্তু তাহাদের ঘরগুলি তত্রস্থ নারীগণ ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। ইহার ফল ভবিষ্যতে খুবই খারাপ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন—তাই তিনি ভারতীয় শিক্ষা ও তাহার ধারা জানিবার জন্য এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সাহেবের কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইল। এমন সময় একটি কাঁচের গ্লাসে এক কাপ চা একজন তাঁহাকে দিয়া গেল; তিনি আমার জন্য আর এক গ্লাস চা আনিতে বলিলেন। চা খাইতেছি, এমন সময় হেমেন্দ্র বাবু আসিলেন, উভয়ে তখন সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহন করিলাম।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে চাঁদমোহন বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হেমেন্দ্র বাবু

অনুকূল বাবুর সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা বলিলেন। উক্ত কথাবার্ত্তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—অনুকূল বাবুর শরীর এখন খুব ভাল নয়—তিনি রক্তের চাপে মধ্যে মধ্যে ভীষন কষ্ট পান। দেওঘরের জল বায়ু তাঁহার খুব ভাল লাগিতেছেনা, সেইজন্ত তিনি অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পাবনা সৎসঙ্গের প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তি পাকিস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে—বহু পত্র দিয়া উহার কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিতেছেনা, প্রভৃতি। পরিশেষে যে কয়দিন হেমেন্দ্রবাবু দেওঘরে থাকিবেন, যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন—এইরূপ অনুরোধ তিনি করিয়াছেন।

আমার সাধু দর্শন হয় নাই শুনিয়া চাঁদমোহন বাবু বলিলেন যে, আপনার অদৃষ্ট মন্দ। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। চাঁদমোহন বাবুর কন্যা কমলা চা ও খাবার লইয়া আসিল। আবার জলযোগ হইল।

চাঁদমোহন বাবুর মা ও দিদি আসিলেন; আমি তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। মায়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে বলিয়া মনে হইল; প্রশান্ত মুখ, পুষ্পের ন্যায় হাস্যময়ী। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়া গেল, বুঝিলাম—চাঁদমোহন বাবুর মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি, তাহা তাঁহার দৃঢ়চেতা আদর্শ মাতার শিক্ষার গুণেই সম্ভব হইয়াছে। চাঁদমোহন বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র কেষ্ট আসিল, সে ক্লাস সিক্স-এ পড়ে; তাহার সহিত হেমেন্দ্র বাবু আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

রাত্রি হইয়া গেল বলিয়া সেদিন আর বেড়ান হইল না। যতগুলি সংবাদপত্রের পূজা সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সবগুলিই বাড়িতে রহিয়াছে। কেষ্ট বইগুলি আনিয়া দিল, আমি তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। এদিকে হেমেন্দ্র বাবু ও চাঁদমোহন বাবু দুই উকিলে বসিয়া পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময় খাওয়ার ডাক পড়িল; ভিতরে গেলাম ও সেখানে রান্নার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ভাত, ডাল, আট-দশ রকমের তরকারী, দু-তিন রকমের মাছ, মাংস, দই, সন্দেশ প্রভৃতি। পাশে না বসিয়া

কানাই লাল মিত্রের
সোমরাজ
কবিরাজী কেশতৈল
মাথার রোগের মহৌষধ
সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ফরমুলা :-
তিল তৈল · ক্যাষ্টর অয়েল
· ক্যান্থারাইডিন
সোমরাজ বীজ
· মহাভৃঙ্গরাজ
রক্ত ও শ্বেত চন্দন
· ব্রাহ্মী · আমলা
· মাস্ক (কস্তুরী) · চন্দন তৈল
· বেলা তৈল · চামেলী তৈল
· রোর গুমেট · ল্যাভেণ্ডার
· ইত্যাদি বিখ্যাত সেন্ট
উপকারীতা :-
* মাথার রোগে
* চুল ওঠা বন্ধ করিতে
* চুল বাড়াইতে
* অনিদ্রায়, নিত্যস্নানে
'সোমরাজ কেশতৈল'
* সর্ব্বোৎকৃষ্ট *

আছেন আমাদের খাওয়াইবার জন্ত। এত রাত্রি অবধি বৃদ্ধা মহিলা আমাদের জন্ত বসিয়া আছেন দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তিনি সেই সময় সামান্ত অসুস্থ ছিলেন, তাই আমরা একটু লজ্জিত হইলাম। হেমেন্দ্র বাবু মাকে শুইয়া পড়িতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি হাসিয়া আমাদের খাওয়া না হইলে শুইবেন না—ইহা জানাইলেন। আমরা তিনজনে খাইতে আরম্ভ করিলাম এবং যতদূর সম্ভব খুব তৃপ্তি সহকারে খাইলাম। কিছু কিছু ভোজ্য বস্তু পাতে পড়িয়া রহিল দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে রান্না বোধ হয় ভাল হয় নাই, তাই সব পড়িয়া রহিল? আমি ও হেমেন্দ্রবাবু অপ্রস্তুত হইলাম; হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাত্রে ইহার বেশী খাইলে অসুস্থ হইবেন। আর আমি সাধারনতঃ যাহা খাই ঐ দিন তাহার দেড়গুণ বোধহয় খাইয়াছিলাম, কারণ রান্না এত উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে ঐরূপ রান্না ও অত বিভিন্ন পদ আমি সচরাচর খাই নাই বলিলেও চলে। আমি মাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, রান্না খুবই ভাল হইয়াছে—কিন্তু যাহা খাইয়াছি তাহার চেয়ে বেশী এক দিনে খাওয়া কি করিয়া সম্ভব? তিনি তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, পাতে কিছু পড়িয়া থাকিলে তিনি মনে করেন যে রান্না নিশ্চয় খারাপ হইয়াছে। আমি ও হেমেন্দ্রবাবু উভয়েই তাঁহার কথার প্রতিবাদ জানাইলাম। আমি বলিলাম, কাল হইতে খাবার কিছু কম করিয়া দিবেন—তাহা হইলেই সমস্ত খাইব; দেখিবেন পাতে আর কিছু থাকিবে না।—তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ হইল। এইরূপ ভুরিভোজন কদাচিৎ হইয়াছে; এইবার গা এলাইয়া দিয়া শুইতে ইচ্ছা হইল। চাঁদমোহনবাবুর মেজমেয়ে বিমলা পান আনিয়া দিল। চাঁদমোহন বাবুর এই মেয়ে দুইটির (কমলা ও বিমলা) বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কমলার একটি ছেলে হইয়াছে—নাম অঞ্জন। হেমেন্দ্রবাবুর হাবভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি বোধ হয় আবার গল্প সুরু করিবেন। মনে হইল এইবার বিশ্রামের কথা একবার বলি, কিন্তু ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ আর তিনি গল্প করেন? খুব বেশী আর গল্প হইল না, কারণ চাঁদমোহন বাবু নিজেই বলিলেন যে, রাত অনেক হইয়াছে—আপনারা শুইয়া পড়ুন—বিশেষ করিয়া আজ আপনারা ক্লান্ত। হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, না না ক্লান্ত বিশেষ নয়। আমি হেমেন্দ্র বাবুর রকম দেখিয়া ভড়কাইয়া গেলাম। এ কি ব্যাপার! তাহার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর, এখনও তিনি ঠিক আছেন; বলেন আমি ক্লান্ত নই। মনে মনে প্রমাদ গুনিলাম এবং ভাবিলাম—এবারে আর নিস্তার নাই।

চাঁদমোহনবাবু একপ্রকার ঠেলিয়া হেমেন্দ্রবাবুকে তুলিয়া দিলেন; আমরা উভয়ে পাশের একখানি বাড়িতে শুইতে গেলাম। বিছানা পাতাই ছিল; হেমেন্দ্রবাবু আরো গল্প করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু আমি আর তাঁহাকে কথা বাড়াইতে দিলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলাম।

[ক্রমশঃ

পরিচয়

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

কলিকাতার কোনো এক খ্যাতনামা কলেজের লেডি প্রিন্সিপাল মিস্ ব্যানার্জ্জি সেদিন যখন কাজ হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন বেলা অনুমান সাড়ে চারিটা হইবে—ডিসেম্বর মাস—, দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছিলো। প্রতিদিনের ন্যায় তাহার সঙ্গে ছিলো সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের শিশুদের পরিচ্ছদে ভূষিত ছয় বছরের ছেলেটি। মাসিক ভাড়া চুক্তি করা রিক্সা, তাই মিস্ ব্যানার্জ্জি আর ভাড়া চুকাইতে রাস্তায় দেরী করিলেন না, নামিয়া ছেলেটির হাত ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।—ভৃত্য আসিয়া ছেলেটির কাঁধ হইতে বই খাতার হ্যাভারস্যাকটি সরাইয়া নিল।

সন্ধ্যার পর ছেলেটি দৌড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই মিস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিলো—"হ্যাঁ মা, স্কুলে সব ছেলেরা বলে যে তাদের বাবা তাদের কত কি দেয়, কত আদর করে,—আচ্ছা মা আমার বাবাকে ত' দেখিনি।—কই, তিনি ত' কোনও দিনই আমাকে আদর করেন নি। মা, আমার বাবা কোথায়?" মিস্ ব্যানার্জ্জি ছেলেটির গাল টিপিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"তোমার বাবা? তিনি যে তাঁর সবকিছু আমার কাছে দিয়ে চলে গে'ছেন। হ্যাঁ বাবা—, আমি তোমায় বড় স্নেহ করি, কত ভালো বাসি।— আচ্ছা, ওদের বাবারা ওদের কি কি দেয়, জেনে এসো, দেখবে আমি তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশী দিই।" বলিয়া শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার-বার চুম্বন করিলেন। শিশু সব ভুলিয়া বলিলো—"মা গো, মাষ্টার মশাইকে translation-এর খাতাটা দিয়েই আমি ছুটে এলাম তোমার কাছে।—" শিশু চলিয়া গেলো।—মিস্ ব্যানার্জ্জির বুক হইতে হুস্ করিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল, তিনি চাপিতে একটুও চেষ্টা করিলেন না।

দুই

১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট কলেজ হইতে ফেরার সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিস্ ব্যানার্জি দুই বৎসরের একটি শিশুকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন।—সেই শিশুই আজ ছয় বছরের বালক, এবং সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ-স্কুলের ছাত্র।—মিস্ ব্যানার্জির বুভুক্ষ হৃদয়ে এই শিশুই প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ আনিয়াছে।— প্রিয়হারা জনহীন গৃহে অজ্ঞাতকুলশীল এই শিশুই গৃহের আলো এবং তাহাকে ঘিরিয়াই মিস্ ব্যানার্জির বৈচিত্র্যহীন জীবনে এখন সব কিছু গড়িয়া উঠিতেছে—নিরুদ্দেশের সংবাদ অথবা শিশুদের হারাইয়া যাইবার সংবাদ যখন রেডিওতে ঘোষিত হয় তখন মিস্ ব্যানার্জি রেডিয়ো বন্ধ করিয়া দেন।—

আতঙ্ক এবং ভয়, যদিবা শিশুর পিতা মাতা একদিন পর সংবাদ পাইয়া আসিয়া শিশুটিকে দাবী করে।—তিনি শিশুটির নাম রাখিয়াছেন "আনন্দ", এবং স্কুলে সবাই ডাকে "এ ব্যানার্জ্জি।—" মহাভারতের কর্ণও জানিত যে সে রাধার নন্দন, কিন্তু আনন্দকে তাহার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—"সে কি? আমি মিস্ ব্যানার্জির ছেলে—, আমার মা কলেজের প্রিন্সিপাল, তা জানিস্!" ইহার বেশী পরিচয় সে জানিত না, আর কাহাকে দিতেও পারিত না।—

তিন

কয়েকদিন পর আবার একদিন রবিবার দুপুর বেলায় হাতের লেখা এবং অঙ্ক শেষ করিয়া আনন্দ আসিয়া তাহার মাকে বলিল—"মা, ছেলেরা বলে যে তাদের বাবা তাদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়ে আনেন, কিন্তু কৈ, আমার বাবা ত' আমাকে কোন দিনই কিছু দেখাতে নিয়ে যান না।—"

মিস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন—"আমিই ত' তোমায় সব দেখিয়ে নিয়ে আসি।—আচ্ছা, আমি আর একদিন তোমায় চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো।" বালক উত্তর করিল—"তুমি ত আমায় সবই দেখিয়ে আনো, এই সেদিন ত' কত দেখিয়ে নিয়ে এলে, কিন্তু আমার বাবা কেন এ সব করেন না?" মিস্ ব্যানার্জি ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তোমার বাবা যে স্বর্গে গেছেন।" শিশু আনন্দের সহিত এবার বলিলো—"স্বর্গে ত ভগবান আছেন, তুমি যে আমাকে বলেছো। আমি ভগবানকে চিঠি লিখে দেবো, তিনি যেন আমার বাবাকে পাঠিয়ে দেন।" মিস্ ব্যানার্জি এবার হাসিয়া উত্তর করিলেন—"বেশ, তাই দিয়ো।" কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি ডেড লেটার আপিস্ হইতে বিলি না হইয়া ফেরত আসিলো—, আনন্দ লিখিয়াছিলো স্বর্গে ভগবানকে, তাহার বাবাকে যেন শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়।—চিঠিখানা মিস্ ব্যানার্জির হাতে পড়িতেই তিনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কয়েক দিন পর আনন্দ বলিলো—"মা, ভগবান ত' বাবাকে পাঠালেন না, আমার চিঠির উত্তরও দিলেন না।" মিস্ ব্যানার্জি কহিলেন, "ভগবানের অনেক কাজ কিনা, তাই সময় করে উঠতে পারেন্‌নি।"

চার

যুগান্তর পত্রিকায় একখানা বিজ্ঞাপন পড়িয়া মিস্ ব্যানার্জি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উহাতে লেখা ছিলো—"১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের বেক্‌বাগান রোডের বাড়ী লুট হয়। আমার স্ত্রী এবং ভ্রাতা গুরুতররূপে আহত হন, এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। আমার একটি দুই বৎসরের শিশু ছেলেকে মুসলমান আয়া লইয়া যায়, এবং পরে সংবাদ নিয়া জানিয়াছি যে, সে তাহাকে গুণ্ডাদের ভয়ে ফুটপাথের উপর ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়া আসে। প্রতি বৎসর এই ১৭ই আগষ্ট আমি যুগান্তরে বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছি। জানি না সেই শিশু জীবিত আছে কিনা, এবং কে তাহাকে কুড়াইয়া নিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। যে কেহ এই বিষয়ে আমাকে সংবাদ দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকিব এবং আমার শক্তি অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিব। শিশুটির বয়স এখন ছয় বৎসর হইবে। দেখিতে তখন সুদর্শন ছিলো এবং বাঁ কানের নীচে একটি অপারেশনের এক ইঞ্চি চওড়া দাগ ছিলো। ইতি—শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, ১১ রাণীভবাণী ষ্ট্রীট, টালিগঞ্জ পোঃ।"

মিস্ ব্যানার্জি তখনই আনন্দকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন, তাহার বাঁ কানের নীচে সেই অপারেশনের দাগটি।—বুকটা তাঁহার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিলো, তিনি শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কেবলই মনে হইতে লাগিলো, হয়ত বা প্রাতেই দেখিবেন, কোনো রকমে সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞাপনদাতা বিমল রায় আসিয়া তাহার ছেলের দাবী জানাইতেছে—বিশেষ পাড়ার লোকে জানিত যে, আনন্দকে তিনি দাঙ্গার সময় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। আইন আদালতে প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, আনন্দের পিতা বিমল রায়, এবং তাহার দাবীর নিকট মিস্ ব্যানার্জির দাবী অগ্রাহ্য। সেই রাত্রে মিস্ ব্যানার্জির ঘুম হইলো না, কিন্তু আনন্দ রোজকার মতই ঘুমাইলো। পরদিন প্রাতে উঠিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিখানি প্রণাম করিয়া সে যথারীতি তাহার মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পড়িতে গেলো।

পাঁচ

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। মিস্ ব্যানার্জি যেন আনন্দকে লইয়া কোথায় যাইবেন, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিলেন। কোথায় গেলে যে আনন্দের খবর আর কলিকাতাবাসী কেহ পাইবে না, সেই ছিল তাঁর ভাবনা। স্থির করিলেন, এবার যাইবেন গোপালপুর—সে একেবারে বাংলার বাহিরে, তাই আর তেমন ভাবনার কিছু নাই।

গোপালপুর যাইয়া মিস্ ব্যানার্জি এক সাহেবী হোটেলে উঠিলেন। আনন্দকে লইয়া সমুদ্রতীরে বেড়ান এবং সমুদ্র-স্নান করেন—এই হইলো তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম। কচিৎ কখনও দুই একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালী দেখিলেই এড়াইতে চেষ্টা

করিতেন। তথাপি, কিছুদিনের ভিতর ঐ হোটেলেই আগত আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত বেশ হৃদ্যতা হইয়া গেলো, এমন কি সেই ভদ্রলোককে নিজের কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা ও পরিচয়াদিও বলিলেন। ভদ্রলোক অতি অমায়িক এবং সজ্জন, বয়স প্রায় পঞ্চাশের নিকট। মিস্ ব্যানার্জ্জি ইহার সহিত মেলামেশা করিতে তাই একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। হঠাৎ পরের দিন যখন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক কেবলই আনন্দের দিকে তাকাইতেছেন, এবং তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার বাঁ কানের নীচের সেই দাগটা বারংবার হাত দিয়া দেখিতেছেন, তখন মিস্ ব্যানার্জ্জি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পরের দিন হঠাৎ জিনিষপত্র গুছাইয়া মিস্ ব্যানার্জ্জি মাত্র ১০।১২ দিন গোপালপুর থাকার পরই কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কারণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

ছয়

মিস্ ব্যানার্জ্জি নিজে আনন্দকে সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ-স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া কলেজে যাইতেন, এবং ফিরিবার মুখে আবার তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিতেন। ভৃত্য অথবা বেয়ারা কাহারও উপর আনন্দের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। আনন্দর পোষাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা, বেড়ান, আহার, বিশ্রাম সবকিছুরই তত্ত্বাবধান মিস্ ব্যানার্জ্জি নিজেই করিতেন। লোকে বলে যে তিনি তখনকার দিনের এক ডেপুটি কালেক-টারকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ হয় নাই, এবং সেই ব্যর্থতাই তাঁহার জীবনে তিক্ততা আনিয়া দিয়াছিলো। আর তিনি বিবাহ করেন নাই। দেখিতে তিনি সুন্দরী ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশের নিকটবর্ত্তী। মাতৃত্বের ক্ষুধা প্রত্যেক নারীর হৃদয়েই জাগরূক থাকে। হয়ত বা উহা সুপ্ত থাকিতে পারে, যদিও কেহ কেহ উহা আবার গোপন করিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু, প্রকৃতির সহিত লড়াই করা গেলেও প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। তাই আনন্দকে পাইবার পর হইতে মিস্ ব্যানার্জ্জির জীবনে আসিলো পরিবর্ত্তন, তিনি পাইলেন মাতৃত্বের আস্বাদ। তাই আনন্দকে হারাইবার চিন্তা তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া দেয়। তিনি হইয়া পড়েন চঞ্চল, এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্তিও যেন আর অটুট থাকিতে চায় না।

সাত

হঠাৎ একদিন প্রাতে আসিয়া হাজির হইলেন গোপালপুরের পরিচিত সেই ভদ্রলোকটি।—আদর করিয়া মিস্ ব্যানার্জি তাঁহাকে বসাইলেন।—এ কথা সে-কথার পর ভদ্রলোক বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জি, আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।—আপনি আমার শিশু পুত্রকে কুড়াইয়া আপনার গৃহে স্থান দিয়াছিলেন—, আর আজ তাহার বয়স ছয় বৎসর।—"মিস্ ব্যানার্জি হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"আপনি উন্মাদের মত কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।—পাগলামী করা অন্যত্র চলতে পারে, আমার পাগলামী শুনবার সময় নেই।—"বলিয়া তিনি অভদ্রোচিত ভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।—ভদ্রলোক ২।৩ মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পরিলেন।—মিস্ ব্যানার্জি একেবারে সোজা যাইয়া ঢুকিলেন আনন্দ'র পড়ার ঘরে।—সেদিন যতক্ষণ পড়া শেষ না হইল, তাহার নিকটেই বসিয়া রহিলেন। নিজেও কাজে গেলেন না, এবং আনন্দকেও সেদিন স্কুলে পাঠাইলেন না।—ভয় হইতেছিলো যে, যদিবা রাস্তায় রিক্শা হইতে কেহ তাহাকে উঠাইয়া নিয়া যায়।—

সেইদিনই বিকালে আবার আসিলেন সেই ভদ্র লোক।—তিনি সেদিন একটু রূঢ় ভাবেই বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জি, আপনি যদি আপোষে আমার ছেলে দেন তবে ভালো, নচেৎ আমি আদালতের শরণ নিব।—"

মিস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন—"আদালতের ভয় আমাকে দেখাবেন না।—আপনার ছেলে আমার কাছে নেই, আপনি যা করতে হয় করুন গিয়ে।",—তিনি ইহা বলিয়াই উঠিয়া গেলেন।—ভদ্র লোক চলিয়া আসিলেন।

আট

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টে মামলা উঠিলো, এবং কোর্ট বিমল রায়ের পক্ষে রায় দিলেন। যেদিন কোর্টের সাহায্যে বিমল রায় মিস্ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে তাহার ছেলেকে লইয়া যাইতে আসিলেন, সেদিন কিন্তু মিস্ ব্যানার্জ্জি একটি কথাও বলিলেন না। সমস্ত রাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখ দেখিলে তাহা সহজেই বোঝা যাইতেছিলো।—আনন্দ কিছুতেই যাইবে না, কেবলই মিস্ ব্যানার্জ্জিকে বারে বারে জড়াইয়া ধরিতেছিলো। মিস্ ব্যানার্জ্জি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তাতে কি, তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে, সে ত' ভালোই। তুমিও ত' তোমার বাবার খোঁজ ক'রছিলে একদিন। আমি তোমায় গিয়ে দেখে আসবো, আর তোমার যখন ইচ্ছা হবে, আমার কাছে এসে থাকবে। তুমি ত' নিশ্চয়ই তোমার মা'কে ভুলবে না।" কথাগুলি বলিতে বলিতে মিস্ ব্যানার্জ্জির গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিলো, তবু তিনি গম্ভীর ভাবে সব কথাগুলিই বলিলেন। বিমল রায় বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জ্জি, আমার ক্ষমা করবেন, আমি অতি নিষ্ঠুর কাজ করছি, তা, আমি জানি, কিন্তু কি করবো, আমারও আর কিছুই নেই। আমিই বা কি নিয়ে থাকবো! যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আনন্দকে আপনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমার বাড়ী পৌঁছে দিন।" মিস্ ব্যানার্জ্জি একটু নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তারপর ক্রমে প্রস্তুত হইয়া লইলেন, এবং আনন্দ'র হাত ধরিয়া গিয়া উঠিলেন গাড়ীতে।

আনন্দকে রাখিয়া মিস্ ব্যানার্জ্জি বাড়ী ফিরিলেন। ধীরপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আনন্দের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সব জিনিষ—বই, ছবি, খেলনা সব ঠিক আছে, আনন্দের ট্রাই সাইকেলটি, চিরপরিচিত সুটকেসটি, সবই ঠিক ভাবেই সাজানো আছে, মনে হইলো যেন আনন্দ স্কুলে গিয়াছে। মিস্ ব্যানার্জ্জি আর সেদিন কাজে গেলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইলো। সেদিন আর আনন্দ কাছে নেই। এই প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন করার লোক নাই। মা, মা, করিয়া ডাকিয়া যে সে একটার পর একটা কথা বলিয়া যাইতো, মিস্ ব্যানার্জ্জি সব কথা শুনিতেন, আর হাসিতেন, আর কখনো বা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেন। আজ আর সে সব কিছুই নাই, সমস্ত বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল বটে, তথাপি সবই যেন অন্ধকার, এবং অভিশপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিলো। মিস্ ব্যানার্জ্জি রেডিওটা একবার খুলিয়াই বন্ধ করিয়া দিলেন। নিজের বেহালাটি অনেক দিন পরে পাড়িয়া আনিয়া সেটা বাজাইতে চেষ্টা করিলেন। একটা করুণ সুর উহাতে ফুটাইয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না, সব যেন গুলাইয়া গেলো। বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মিস্ ব্যানার্জ্জি বুঝিলেন, কেন তাঁহার জীবনে একটা ওলোট-পালোট হইয়া গেলো। নচেৎ পৃথিবীর সব কিছুই ঠিক একই ভাবে চলিতেছিল।

নয়

পরদিন প্রাতে আবার আসিলেন বিমল বাবু, সঙ্গে আনিয়াছিলেন আনন্দকে। আনন্দ দৌড়িয়া "মা মা" করিয়া উপরে উঠিয়া গেলো। ছুটিয়া আসিলেন মিস্ ব্যানার্জ্জি। সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ চারি বৎসর শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনে যেন স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াছে। তিনি আনন্দকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"পড়া ফেলে এলে কেন?" আনন্দ উত্তর করিলো—"আমার বই যে সব এখানে। মা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? তোমাকে ফেলে আমি কি ক'রে থাকবো। হয় তুমি যাবে, নয় ত বাবা এখানে আসবেন। আমি যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না—মা!"

মিস্ ব্যানার্জ্জির চোখে জল আসিলো। তিনি বলিলেন—"যাও, তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো।" শিশু ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলো। বিমলবাবু আসিতেই মিস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"আনন্দকে ছেড়ে থাকতে পারবো না, তাই আপনার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।"

সভ্যতার অভিসম্পাত

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন 'Man never dies ; he kills himself.' কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের মনঃপূত হবে না। চারিদিকে অসুখের হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করতেই আমাদের প্রাণান্ত ; আর আমরা কিনা নিজেকে হত্যা করি। একথা অবান্তর। আত্মহত্যা কেউ কেউ করে বটে, তা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে। এই আমাদের ধারণা। কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলে আমরা এই নির্ঘাৎ বাণীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবো।

ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অথবা সন্ত্রাসবাদিদের কার্য্যকলাপে যেখানে গুলি, বোমা, এসিড্-বাল্‌ব বেপরোয়াভাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে দর্শকের অংশ অভিনয় করায় প্রাণহানীর সম্ভবনা—এ বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত। কিন্তু ঠিক চরম মুহূর্ত্তে আমরা সব বিপদের সম্ভবনার কথা ভুলে গিয়ে মরণের সম্মুখীন হয়ে পড়ি। অখাদ্য কুখাদ্য খেলে পেটের অসুখ হবে—জানা সত্ত্বেও দৃষ্টিমধুর, জিহ্বাতৃপ্তকারী ঐ সব খাদ্য খাবার ফলে পরিপাক শক্তি বিকল করে জীবন্মৃত অবস্থায় এসে পড়ি। হোটেলের চায়ের পেয়ালা "টি. বি" সংক্রামিত করতে অদ্বিতীয় জানা সত্ত্বেও চায়ের দোকানে ভীড় করতে কুণ্ঠিত হইনা। বসন্ত, টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমরা বেপরোয়া ভাবে আমাদিগকে ঐ সব রোগের সম্মুখীন করে বসি। মোট কথা স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে আমরা নিজেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। আর এই উদাসীনতা অতি প্রকট ভাবে দেখা দেয় আমাদের ছেলে মেয়েদের মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

আমরা সুসভ্য। শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত। অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে আমরা দিন দিন জগৎকে চমৎকৃত করে দিচ্ছি। দু'শ বছর আগেকার জীবন আজকের তুলনায় অতীব নগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা Vital Statistics-এর ভীতিপ্রদ সংখ্যা দিয়েও আধুনিক জগৎকে বিস্মিত করতে সক্ষম হয়েছি। "মনে রাখবেন আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে একজন করে টি, বি, রোগে প্রাণত্যাগ করে" ইত্যাদি।

দেশ ত এখন এক বিরাট Mental Hospital-এ পরিণত হতে চলেছে। প্রতি ঘরে ঘরে মানসিক বিপর্য্যয়ের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। কত অসংখ্য রকম নূতন নূতন প্রাণ হত্যাকারী রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। নূতন নূতন চমকপ্রদ ঔষধের আবিষ্কার কেবল আমাদিগকে 'ধনে প্রাণে' শেষ করবার পথে এগিয়ে নিয়েই চলেছে। লোক নাকি আগেকার চেয়ে দীর্ঘায়ু হয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে এ দীর্ঘায়ুতায় লাভ কি ?

মনের সুস্থতার উপরেই নির্ভর করছে দেহের সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে। আর এই ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার বিকাশ আনছে আমাদের মনের উপর বিষম বিপর্য্যয়, আনছে অনাবশ্যক দ্রব্যের অভাব বোধের পীড়ন ; যার সংঘাতে মন নিত্য হচ্ছে কত বিক্ষত। তাই মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখতে আমরা অপারগ। আমাদের এই দেহ-যন্ত্রের যন্ত্রী হ'লো 'মন'। যেমন চালকের বা Pointsman-এর সাময়িক মানসিক অবনতি অসাবধানতার কারণ হওয়ায় Train disaster ক্রমবর্দ্ধমানরূপ ধারণ করছে, তেমনি দেহের চালক 'মন' সভ্যতার চাপে নিষ্পেশিত হয়ে দেহের অংশ বিশেষের কর্ম্মদক্ষতার অবনতি ঘটিয়ে High blood pressure, diabetis, dyspepsia, heart trouble, headache, defective vision প্রভৃতি রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে পড়ছে। রোগ নিরাময়ের চমকপ্রদ ঔষধ সমূহের আবিষ্কার আমাদের মনের উপর এমন এক

আধিপত্য বিস্তার করেছে—যে রোগের ভয়াবহ দিক সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছি। ফলে স্বভাবের সহযোগিতা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। দেহের উপর অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলেছে। রোগগ্রস্ত দেহ ও মনকে ব্যয় বহুল চিকিৎসার নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত করে মানসিক অশান্তির মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মন সতত: বিক্ষুব্ধ চঞ্চল। তাকে সংযত করে তার স্থিরতা বৃদ্ধির মধ্যেই হবে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত করেছে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনিষীগণকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে 'মন' এক বিরাট অংশ অধিকার করে। আফিসের কাজ করছেন—যা মাইনে পান তাতে ক্ষুদ্র সংসার বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়। কোন অভাব নাই—কোন গোলযোগ নাই। অতএব মনেও কোন অশান্তি নাই। হঠাৎ একদিন চিত্তাকাশে মেঘ দেখা দিল। আফিসে গিয়ে হয়ত শুনলেন আপনার দাবী উপেক্ষা করে নিম্নপদস্থ কোন কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হয়েছে। তখন আপনার মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় আসবেই। মন কিছুতেই এই পরাজয় মেনে নিতে চাইবে না। ফলে হবে—আপনার উপর যে অন্যায় করা হয়েছে, এই চিন্তাই এত প্রবল ভাবে মনকে আলোড়িত করতে থাকবে, যাতে আপনার মানসিক শান্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। তখন কোথায় চলে যাবে আপনার সদা-প্রফুল্ল ভাব, স্নেহ মায়া, পরোপকার-স্পৃহা। পরিবর্ত্তে সদা বিমর্ষ ভাব, নির্জ্জন স্পৃহা, অল্পেতেই রেগে উঠা, খাদ্যে অরুচি, নিদ্রাহীনতা, ভদ্রতা-সৌজন্যের অভাব প্রকট হয়ে উঠবে আপনার স্বভাবের উপর। এই চিন্তায় যতই বিভোর হতে থাকবেন, ততই কাজে অবহেলা, ভুল ভ্রান্তির মাত্রা ক্রমবর্দ্ধমান রূপ ধারণ করে মনের অশান্তি আরও বাড়াবার কারণ হয়ে পড়বে। ক্রমে জীবন যেন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠবে। তখনই বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ট্রামে, বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া বা বিপদসঙ্কুল স্থানে গমনাগমন, অন্যমনস্ক বা অসাবধানতার জন্য গাড়ীচাপা পড়া, আহারে বিহারে অনিয়ম ও শরীরের প্রতি অত্যাচার করে রোগ-প্রবণতা বাড়ান বিচিত্র নয়। নতুবা ঐ দুঃখ ভোলবার জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা কুসঙ্গ যাপন শ্রেয়ঃ মনে করে ধীরে ধীরে নিজেকে সংসার থেকে, বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এমন কি আত্মহত্যা করে এ গ্লানির হাত থেকে উদ্ধার পেতে সচেষ্ট হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় হবে না।

এই গেল পরাজয়ের একটা দিক। এখানে বিপর্য্যস্ত মন পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টায় সদামগ্ন। কিন্তু এমনও ত হতে পারে—মন পরাজয়ের গ্লানি মুখ বুজে সহ্য না করে তার সমস্ত আক্রোশ নিয়ে পরিস্থিতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাবো তাঁর আফিসকর্ত্তার উপর এক বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে দিয়ে। তিনি মন প্রাণ দিয়ে আর কাজ কর্ত্তে চাইবেন না; সকলের সঙ্গে তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলবেন; কাজে অমনোযোগী হবেন; ইচ্ছা করেই হয়ত অনেক ভুলভ্রান্তি করে বসবেন! অবাধ্য, উদ্ধত প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার খামখেয়াল প্রভৃতি দোষের অধিকারী হয়ে পড়বেন। এমন কি কর্ত্তার বিরুদ্ধে ষ্ট্রাইকের প্ররোচনা দিয়ে আফিসের শান্তি ব্যহত করে বসবেন। এমনি করে নিজের আর সঙ্গে সঙ্গে দশজনের মনে শান্তি নষ্ট করবার কারণ হয়ে পড়বেন। সংসারের সুখের নীড় অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার করবেন।

তাঁর জীবনে কেবল এই একটাই সমস্যা নয়। প্রতি-দিন কত নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁকে—যতই সভ্যতার স্বরূপ বাস্তব হয়ে ফুটে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। এখানে অশান্তির কবল থেকে বাঁচতে গেলে মনকে সমস্যার সঙ্গে compromise করতে হবে। বিজয়ের গৌরব যদিও এতে নাই, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানির হাত থেকেও রক্ষা করবে যথেষ্ট। তখনই আশার ক্ষীণ আলোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদিগকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে।

ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক স্তরেই এই সমস্যাসমূহ বর্ত্তমান। এবং তার পরিণতি ভাবপ্রবণতাযুক্ত মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে। ফলে স্কুল কলেজের ছাত্রসমাজের

মধ্যে দুর্নীতি সৌজন্যের অভাব ষ্ট্রাইক প্রভৃতি অসামাজিক কার্য্যাবলির প্রাবল্য বৃদ্ধির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। দেশ গঠন, আর্ত্তের সেবা, সমাজ সংস্কার, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি সৎকার্য্যাবলী কেবল সাময়িক খেয়াল চরিতার্থের উপকরণে পর্য্যবসিত হয় তাদের।

যে শিক্ষা জীবনের পাথেয় সে শিক্ষা এখন আমাদের নাই। ছিল তা একশ বছর আগেও। জ্ঞান বলতে তাঁরা বুঝতেন নিজেকে জানবার স্পৃহা এবং সেটি মানব-হিতার্থে নিয়োগ করা। আর আমরা এ যুগে বুঝি কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা। আর তাকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান। বিজ্ঞান বলতে তাঁরা বুঝতেন 'বিশেষ জ্ঞান'—যা বিশিষ্টরূপে মানবের উন্নতিবিধান করে। আর আমরা বুঝি 'বিকৃত জ্ঞান'—যা সৃষ্টিকে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তখনকার দিনে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি মহাগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে চরিত্রগঠন, মনের উৎকর্ষ বিধান, মানসিক স্থৈর্য্য প্রভৃতি উপাদানে নিজেকে মহিমান্বিত করে দেশের ও দশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবার শিক্ষা পেতেন। আর আজ আমরা যতই সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করছি, ততই ঐ সব নিছক আজগুবি গল্পের পর্য্যায়ে এসে পড়ছে। কাজেই ও সবের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত গুণাবলী আমাদের চোখে হেয় বলেই প্রতিপন্ন হতে চলেছে। সুতরাং আমরা প্রকৃত শিক্ষার বদলে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার মোহে মুগ্ধ হয়ে কায়-মন-বাক্যে সংযম হারিয়ে এক অভিনব পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যখন আমাদের মনের অবস্থা—তখন স্বভাবতঃ আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিশু মানসিক বিকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এই বর্ত্তমান আবেষ্টনির মধ্যে।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যেন চির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার রূপান্তর মাত্র। এই যেন এযুগের যুবক যুবতীর প্রথম শিক্ষা। কেউ স্বেচ্ছায় এ গুরু দায়িত্ব বহনে রাজি হতে চায় না। একদিকে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য অন্যদিকে পোষ্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দুই পক্ষের মনেই এমন এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করে, ফলে বিবাহিত জীবনের সুখস্বপ্ন দুঃস্বপ্নেই পর্য্যবসিত হয়। তাই ভাবী মায়েদের সন্তানের জননী হবার আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে যতদিন সম্ভব বিবাহিত জীবনের সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করাই কাম্য হয়ে পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে। যদি হঠাৎ সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ভাবী জননীর মনে এক নিদারুণ মানসিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়—যার ফলে Child becomes unwanted. দশমাস দশদিন এই অবাঞ্ছিতকে গর্ভে ধারণ করে নিত্য তার মুণ্ডপাত করাই হয় মায়ের কাজ তখন। শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে মন কিছুতেই মত থেকে তাঁর ভাবী সন্তানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করতে পারে না। গর্ভস্থ সন্তান মায়ের বিকৃত চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে যথা কালে 'বাঙ্গালী করেছো—মানুষ করনি' এই বাক্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি!

এই সব শিশু বিকৃত মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। মাতৃত্বের সহজাত উৎস যদিও তখন প্রবল হয়ে উঠে, জননী তখন ভুলে যান পূর্ব্বস্মৃতি। শিশু কিন্তু এত শীঘ্র ভুলে যাবার পাত্র নয়। প্রথম থেকেই মায়ের প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পেতে থাকে—প্রতি পদে পদে তার অন্যায় আব্দারের মাত্রা বাড়ার মধ্যে দিয়ে। মা শত চেষ্টা করেও শিশুর মন জয় করতে অপারগ হন। ফলে হয় একদিকে শিশু যেমন জেদী, অবাধ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা কিছুতেই থামতে চাইবে না। অন্যদিকে তেমনি মাও সন্তানের প্রতি ক্রমেই রূঢ় আচরণ করতে থাকবেন শিক্ষার নাম করে। শিশু ক্রমেই মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করতে থাকে। আর মার প্রতি আরও বেশী বিরুদ্ধ ভাব মনে মনে পোষণ করতে থাকে। এদিকে মাও সন্তানের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রমেই তার প্রতি উদাসীন হতে আরম্ভ করেন। এমনি করেই সন্তান আর জননীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিষময় হয়ে ওঠে। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকৃতি দিন দিন আরও প্রকট হতে থাকে। উত্তরকালে এই সব ছেলেরাই ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে নানা প্রকার অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

[আগামী বারে সমাপ্য]

শ্রীমদ্ভাগবত

(১০ম স্কন্ধ; ৩৫ অধ্যায়)

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪টি গীতার উল্লেখ আছে। বেণু-গীতা, গোপিকা-যুগল-গীতা, গোপী-গীতা ও ভ্রমর-গীতা। এই ৪টি গীতারই উদ্গাতা গোপীগণ। তাঁহাদের শ্রীমুখে তাঁহাদেরই আরাধ্য দেবতার কথা পরম রমণীয় ও অনন্ত মাধুর্য্যের খনি। গোপিকা-যুগল-গীতায় দিনভাগে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গত হইলে তাঁহারই বিরহে গোপীগণ অতি দুঃখে দিন-যাপন করিতেন, সেই কথা বর্ণিত হইয়াছে।]

১

শ্রীশুক :

যবে বনে যেত কৃষ্ণচন্দ্র তাঁরে মনে অনুসরণ করি
গোপীরা বাসর দুঃখে কাটাত শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ করি।

২, ৩

গোপীগণ :

যবে মুকুন্দ বেণু বাজায়—
বামবাহুমূলে বাম-কপোল,
অধরেতে বেণু, ভ্রু নাচায়,
অঙ্গুলে ঢাকি' রন্ধ্র-দল;

লখিরে,—তখন ব্যোমযানে—
সিদ্ধাঙ্গনা পতি সহ,
বিস্মিত, ক্ষত স্মর-বাণে,
বেণুরবে আনে সম্মোহ।

নীবীর বসন খুলে যায়,
তুলে দিতে তাহা ভুলে যায়।

৪, ৫

হায় সখি! শোনো নব আলেখ্য-লেখা,
অধরের হাসি স্ফুরিত বক্ষহারে।
উরসে লক্ষ্মী স্থির-বিদ্যুৎ সম,
আর্ত্তজনারে যে জন তরাতে পারে।

দূর হ'তে তাঁর কূজনধ্বনি শুনি'
উর্দ্ধকর্ণ বৃষ-মৃগ-গাভীগণ,
অর্দ্ধদষ্ট-তৃণগ্রাস মুখে তুলি'
নিদ্রিত কিবা পটেতে রেখাঙ্কন।

৬, ৭

যবে গৈরিকে ময়ূরপুচ্ছে পলাশে সে চঞ্চল,
বলরাম আর গোপগণ সহ মল্লভূষণ পরি'
ধেনু গোবৎস আহ্বান করে, নদী ভুলে যায় গতি—
পবন-বাহিত কানু-পদাম্বু রজ আকাঙ্খা করি',
হায় সখি! নদী মোদেরই মতন অল্প পুণ্যবতী,
প্রেমে তরঙ্গবাহু মেলে দেয়, ক্ষণ পরে নিশ্চল।

৮, ৯

অনুচরগণ বর্ণনা করে তাঁরি বীর্য্যের গান
অচলালক্ষ্মী আদি পুরুষের,—তুলিয়া মুরলী তান,
বনে পশি' যবে আহ্বান করে গিরিতট ধেনুপাল,
তখনই প্রকাশ তিনি শ্রীবিষ্ণু,—বনচারী এ রাখাল।
বনলতা-তরু পুষ্পে ও ফলে ভারে অবনত হ'য়ে,
মধুধারা করে বর্ষণ প্রেমে পুলকিত-তনু লয়ে।

[ক্রমশঃ

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজা রুদ্রনারায়ণের গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহ। রাজা রুদ্রনারায়ণ দুর্লভ হরু উপবিষ্ট।)

রুদ্রনারায়ণ—তুমি এ সব খবর তা' হলে ভাল করে জেনেছ? কিছুতেই শুনলে না।

দুর্লভ—আমি ত' রাজা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি—সব প্রস্তুত রাখ।

রুদ্র—তাই তো! (চিন্তা) গুরুদেব এখনও আসছেন না কেন?

চরণ—(ডাকিলেন)

(হরিদেবের প্রবেশ—উভয়ের প্রণাম—হরিদেব আসন গ্রহণ করিলেন)

হরিদেব—কেন রাজা? এমন সময়ে ডেকে পাঠিয়েছ?

রুদ্র—পাঠান দস্যুরা বাংলার স্থানে স্থানে লুট হত্যা করে প্রজাদের শান্তিভঙ্গ করছে। বাংলার প্রতাপশালী ভূইঁয়ারা ত কই কিছুই করতে পারছে না গুরুদেব! নিরীহ প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য; তা' না করে রাজাসুখ ভোগ করার অধিকার আমার কই? উপদেশ দিন গুরুদেব।

হরিদেব—তুমি চঞ্চল রুদ্রনারায়ণ। অসীম শক্তিশালী তুমি—এমন সমবেদনা তোমার অন্তরে—ধনসম্পদে পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার—বাংলার অসংখ্য বীর সন্তান তোমার সেনানী—সবার উপরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সোদর সম বন্ধু যার মন্ত্রী—আমিও নিশ্চিন্ত, তোমার রাজ্যে তস্কর তার অত্যাচারের নিশান নিয়ে আসবে না।

(রুদ্রনারায়ণ উৎসাহিত—দুর্লভ কিছু লজ্জিত হইয়া)

দুর্লভ—গুরুদেব রাজাকে আপনি যা' বললেন সবই ঠিক। এ রাজ্যে সবই আছে। কিন্তু দেব, প্রয়োগের অভাব—আর—আর আমার কথা আর বলবেন না। আমি না :জানি যুদ্ধবিদ্যা—আর রাজনীতি—তা' আর শেখালেন কই?

রুদ্র—দুর্লভ তোমরাই আমার সব। গুরুদেবের আদেশ—তোমার পরামর্শ আর চতুর্ভুজের শক্তি, এর সমন্বয়ে অসাধ্যসাধন হয়। গুরুদেব! বলে দিন আমায় কি করতে হবে? (আগ্রহ)

হরিদেব—প্রিয় তোমার ভাগ্য ভাল—তুমি পারবে। আজ মহাপুরুষ এসেছিলেন, বলে গেছেন—সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন।

(রুদ্রনারায়ণ ও দুর্লভ উদ্বেগে উঠিয়া বসিলেন)

হ্যাঁ রাজা—উতলা হয়ো না, সময়ে সব বলছি—এখন মন্ত্রী বল ত' ভুরশুট রাজ্যের কর্ত্তব্য কোথায়? পাঠান সর্দ্দার তোমাদের সাহায্য চায়। তার লক্ষ্য বাংলায় বা ভারতে রাজ্য স্থাপন নয়। মোগল বাদশা তাদের ছত্রভঙ্গ করেছে। তারা লুণ্ঠন করবে। বল এর প্রতিবিধান কি?

দুর্লভ—(চিন্তিত) ওসমান খাঁর দল গত একমাসের মধ্যে বাংলায় বাদশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অত্যাচার করেছে। অধিকাংশ স্থলেই বাধা পায় নি। সাহস তার বেড়ে গেছে। এই ভবানীপুরেও দেখা দেবে। সে চায় ভুরশুটরাজ্যের সাহায্য—মোগলশক্তিকে বিধ্বস্ত করতে। হ্যাঁ তা আপনারা যখন বলেছেন একটা ব্যবস্থা করুন। মোগল সম্রাট—হ্যাঁ তিনি একটা গঠনের পথ নিয়েছেন সত্য, কিন্তু বড় বাধা। গুরুদেব! সবই তো আপনার হাত—তৈরী করে নিন। আপনার আশীর্ব্বাদ—আমি কি জানি বলুন।

রুদ্র—ভারতের সাধনা অমর রাখতে এর বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রীভূত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ধ্বংসাবশেষ পাঠান রাজশক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা সে চায় না।

হরিদেব—রুদ্রনারায়ণ সব বুঝেছি। মহাপুরুষের আদেশ কৌপীনধারী শৈলচারী সাধক—আজ ভুরশুটের আলো ও বাতাসে জাগরণ দিয়ে গেছেন। তাঁর নির্দ্দেশ মন্ত্রীর বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সব প্রস্তুত কর। মহাপ্রাণ দিল্লীর বাদশার আদর্শ সিদ্ধ হোক। সোণার ভারতে সুগঠিত জাতি শাসন করুক। এর জ্ঞান, শিল্প, ধর্ম্ম প্রচারিত হোক বিশ্বে।

(দূরে চরণের প্রবেশ ও প্রণাম)

রুদ্র—(সঙ্কেতে ডাকিল) খবর?

চরণ—মহামান্য মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বার্ত্তা নিয়ে এক রাজপুত এসেছেন। বল্লেন কালবিলম্ব করবার উপায় নেই। (তিনজনেই চিন্তিত)

হরিদেব—রাজা?

রুদ্র—অপেক্ষা করতে বলে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

(চরণ ইতস্ততঃ করিল)

দুর্লভ—না রাজা। এই রাজপুতের আরও কর্ত্তব্য পালন করার থাকতে পারে। তুমি ত একমাত্র লক্ষ্যস্থল নও। আরও তো রাজারা আছেন। দিল্লীর সম্রাট আদর্শ মানব। গুরুদেব! মনে হয় ইনি পদস্থ রাজপুত।

হরিদেব—যোগ্য অভ্যর্থনা করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুক।

রুদ্র—বেশ চরণ! তুমি, আচ্ছা মন্ত্রী তুমি গিয়ে যোগ্য সমাদরে এখানেই তাঁকে নিয়ে এসো। আমরা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব।

(দূর্লভের প্রস্থান)

আমি আপনাদের কাছে সব শুনলাম। আমার সঙ্কল্প দৃঢ় করেছি। গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন আমার ভুরসুট যেন বাংলার মান বজায় রাখতে পারে।

(মন্ত্রীর রাজপুত যোদ্ধা রামসিংহের সহিত প্রবেশ)

রুদ্র—(সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন বীর। মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সকল কুশল ত? মহারাজা মানসিংহ ও অন্যান্য মান্যবর ওমরাহগণ সব কুশলে আছেন?

রামসিংহ—হ্যাঁ রাজা সমস্তই কুশল।

রুদ্র—আমার পূজনীয় গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্য্য—আমার মন্ত্রী দুর্লভচন্দ্র দত্ত।

রামসিংহ—(যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে) আপনাদের দর্শনে সুখী হলাম। আপনারা সকলেই বিচক্ষণ এবং ভুরসুট রাজ্যের পরম শুভানুধ্যায়ী একথা দিল্লীর সকলেই জানেন।

রুদ্র—এখন সর্দ্দারজী মহামান্য সম্রাটের আদেশ ব্যক্ত করুন। আমরা সকলেই উৎসুক তা' শুনতে।

রামসিংহ—হ্যাঁ (চারিদিকে চাহিয়া) দেখুন আজকের বার্ত্তার গোপনীয়তা বিশেষ আবশ্যক। আমি যা বলবো বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা।

রুদ্র—বলুন সর্দ্দারজী—ভুরসুটরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী যাঁরা তাঁদের কাছে আপনার বক্তব্য বলুন—আমরা প্রস্তুত।

রামসিংহ—মহামান্য দিল্লীর সম্রাট বিচক্ষণ অমাত্যগণসহ পরামর্শ করে স্থির করেছেন—সমগ্র ভারতে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ে এক মহাজাতি গঠন কর্বেন। ভারতে শাসন হবে সেই জাতির কল্যাণে। তার সভ্যতার আদর্শ সমস্ত পৃথিবীকে দান কর্ব্বে—ন্যায়ের শাসন। বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ একটি সুবা—এর বীরত্ব এর সম্পদ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ পরিগণিত হয়—এই সম্রাট বাহাদুরের ইচ্ছা। ভুরসুট রাজ! আপনি বাংলার একজন রাজা। আপনার আনুগত্য, সহযোগিতা—শাহন্‌শা মূল্যবান জ্ঞান করেন। বিক্ষিপ্ত পাঠান দস্যুরা সম্রাটের কাছে বাধা দানে বদ্ধপরিকর। তাদের শক্তি বিধ্বস্ত হলেও নিঃশেষিত হয় নাই। বাংলায় শান্তি বিধ্বস্ত করেছে তারা নিরীহ গৃহস্থের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। রাজা! আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন। মহানুভব সম্রাট বাংলাদেশের শান্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এখন আপনাদের মনোভাব জানতে পারলেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করবেন।

রুদ্র—মান্যবর সম্রাটকে আমার সম্মান জানিয়ে বলবেন আমরা দস্যুর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে, আমার প্রিয় প্রজাদের রক্ষা করতে, আমার রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি স্থিরসংকল্প। আমার গুরুদেব মহাজ্ঞানী হরিদেব ভট্টাচার্য্য আমার অশেষ বুদ্ধিশালী দূরদর্শী মন্ত্রী—আমরা সকলে একমত। বাংলা যাতে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সম্ভার নিয়ে তার বীর সন্তানের ত্যাগ ও শক্তির মহিমায় সমস্ত ভারতকে মহিমান্বিত কর্ত্তে পারে, তার জন্য আমরা এই মহাব্রত গ্রহণ করেছি। উদারচেতা বীর সম্রাটের সহানুভূতি আমরা পাবোই।

হরিদেব—বৎস! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তানদের তুমি ভারতের মধ্যে যোগ্যস্থানে অধিষ্ঠিত হবার ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য হও।

মন্ত্রী—রাজা! সর্দ্দারজী বহুদূর থেকে এসেছেন তাঁর সুযোগ্য বিশ্রামের এবং আদরের ব্যবস্থা করা আমাদের আবশ্যক। মহামান্য সম্রাটের আদেশ—আমাদের কর্ত্তব্য ত স্থির আছে; সবদিক বিবেচনা করে সকল সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য রেখে সম্রাটকে আমরা নিবেদন কর্ব্বো। এখন চলুন মান্যবর আপনার আহারের ব্যবস্থা করি গে।

রামসিংহ—আমার বিশ্রামের অবসর কই?

রুদ্র—তা হয় না সর্দ্দার। সমস্ত ব্যবস্থাই প্রস্তুত। অল্প বিশ্রাম করে যাবেন আমার অনুরোধ।

মন্ত্রী—চলুন সর্দ্দার আপনার কাজের ব্যাঘাত হবে না, সত্বরেই আপনি যেতে পারবেন। আপনার কার্য্য সুসিদ্ধই হবে। (মন্ত্রীর সর্দ্দারকে লইয়া প্রস্থান)

রুদ্র—গুরুদেব! (প্রণাম)

হরিদেব—(আশীর্ব্বাদ করিয়া) তোমার আশা ফলবতী হোক। (উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীর নবগৃহ উদ্বোধন

গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার (১২ই মে ১৯৫১) অপরাহ্নে কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে ৭নং চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত প্রাক্তন হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল এণ্ড কোং লিমিটেডের প্রাসাদোপম এবং বাণিজ্যোপযোগী অট্টালিকায় মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নূতন হেড আফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান বাঙ্গলার অন্যতম বাণিজ্যবিশারদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রী এস্‌, সি, রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রায় চারি সহস্র নাগরিকের স্বাগত উপস্থিতিতে উদ্বোধন ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চৌরঙ্গী রোডের উপর হইতে উক্ত প্রাসাদোপম বাটির নবনির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের অতীব সুন্দর ও মনোহর সোপানাবলীর মধ্যস্থলে সিংহাসনের ন্যায় একটী সু-উচ্চ খিলানের অভ্যন্তরে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মযোগী মহাপ্রাণ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদাহাস্যময় একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি ধূপধুনাদিতে গন্ধামোদিত ও বিচিত্র পত্র-পুষ্প ও মাল্যাদিতে পরিশোভিত হইয়া এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন যে ভবন বিদেশী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, আজ তাহাতে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য স্বাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাই দলে দলে ভারতীয়গণ সেই উদ্বোধন কার্য্যকালে উপস্থিত হইয়া চক্ষু সার্থক করিতে সোৎসাহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, আর স্বক্ষ-মাংসে উপস্থিতির ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিল। সমাগত নরনারীগণ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় সর্ব্বাগ্রে যখন তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা নাই। ক্রমে সকলেই শান্তভাবে বিরাট হলটিতে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করেন।

কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রী অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার ঘোষণা করিলে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার সচ্চিদানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র, সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত অতিথিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ইংরাজীতে কোম্পানীর ইতিহাস ও আদর্শ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুলিখিত ও মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। কোম্পানীর ইতিহাস এবং আদর্শ সম্বন্ধে যখন তিনি নিবেদন করেন, তখন তাঁহার পাঠের গুণে ও গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিল। সুযোগ্য পিতার সমুন্নত ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মপ্রতিভা যে পুত্রের মধ্যেও সম্যক্‌রূপে স্ফুরণ লাভে সমর্থ হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের ভাষণে প্রতি ছত্রের মধ্যে উপলব্ধি করা যাইতেছিল। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি উপযুক্ত পুত্র অথবা যে গুরু উপযুক্ত শিষ্য রাখিয়া তিরোহিত হন, তিনিই পূর্ণ মানব বা পূর্ণগুরু, সুতরাং অমরত্বের অধিকারী। কারণ তাঁহার কার্য্য ও শিক্ষার ধারা পুত্রে অথবা শিষ্যে অক্ষুন্ন থাকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

অতঃপরে প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন, আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র

মজুমদার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিয়া প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কোম্পানীর অগ্রগতি কামনা করেন। অতঃপরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে সচ্চিদানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সখ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অমূল্য-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গৌরমোহন পাল, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমিয় মুখার্জ্জি, ডাঃ ব্রজবল্লভ সাহা, ডাঃ সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য, পি, কে, ঘোষ ও কোম্পানীর সহরের এবং বিভিন্ন স্থানস্থ কর্ম্মী ও কর্ম্মসচিবগণ, সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন।

প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সভায় নানা প্রদেশ ও নানাজাতি ও সম্প্রদায়ের বহুলোক উপস্থিত হওয়ায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণটি ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত হয়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণ

* * *

On this auspicious day when we are shifting our Head Office from 11, Clive Row to this building, I hope, it will not be out of place to give a short sketch of the life of The Metropolitan Insurance Company Ltd.

Our Institution is only twenty years old. It started its life in a very humble tenanted place at 28, Pollock Street in the year 1930 and from there it shifted to 4B, Council House Street also as a tenant. From there it came to its own building at 11, Clive Row on the 9th of February, 1941, that is practically a decade after its inception. Since then the Company has rapidly grown from stength to strength so much so that the five-storied building at 11, Clive Row, soon became too small for it and we had to think seriously for a place where it could be properly accommodated. This, in short, is the history behind the purchase of this building. In this context I may also mention that during the twenty years of its existence the Company has acquired an annual premium income of over one crore, a life-fund of nearly two and a half crores and a business-in-force of nearly twenty crores. During this period the Company has paid claims amounting to nearly fifty-five lacs. This, ladies and gentlemen, is our modest achievement during the past twenty years, and it is our fervent hope that with the blessings of the Almighty God and with the good wishes of you all we shall be able to give a brighter account of ourselves in future.

While speaking of the progress of the Company my mind naturally goes to my field-workers. The progress of an insurance company depends no less on its field-workers and staff than on its management. As a matter of fact they are the real pillars on which the company stands and unless the field-workers, staff and the management can function as a compact team in complete co-operation and unision of purpose no satisfactory progress can be made. I extend to my field-workers, staff and officers my heartiest congratu-

বামে : ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। মধ্যে : চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী (সভাপতি)। দক্ষিণে : প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত এস্. সি. রায়।

lations for the splendid co-operation they have rendered in bringing up the Company to its present position when it has been able to win for itself this historic building(at practically the focal point of Calcutta) and which will henceforth be called "The Metropolitan Insurance House."

But at the same time I should ask them not to feel proud of their achievement. I should rather say that we have just stepped into a position when we can claim that amount of confidence in the minds of the policy-holders and the general public without which the prosperity of an insurance company is not at all possible. But this success is only partial success because in these critical days when the conditions of life are becoming harder and harder, I know, there are members on our staff who cannot even make their both ends meet with what they are earning now. In my opinion the real success will be on that day when I shall feel that at least those

members of our staff who are co-operating with us, have the minimum requirements of their life and for which they will not have to worry at the end of the month which they have to do now. I do not know whether it will ever be possible for us to attain that goal. But I think this is not impossible. Any way this will depend mostly on our own initiative and actions.

If instead of setting ourselves to the realisation of that goal we allow ourselves to be proud of our present achievements and grow complacent, I am sure that in no time the spirit of co-operation that is prevailing among ourselves at the present time, will no more be there and vanity mixed with all sorts of complexes will creep in, which will be suicidal and I do not think any one of us has the moral right to think of such a thing which will be directly against the principle of the Company as laid down by my late lamented father and the Founder Managing Director of this institution, Sri Satchidananda Bhattacherjee.

Speaking of him, I think, I need not go into the past history of this institution which is known to most of you and it also does not look nice for a son to recount the achievements of his father on such an occasion.But I cannot refrain from saying that whatever partial success we have been able to achieve has been possible only by following the path shown by him and but for his spiritual guidance and blessings along with the living inspiration of my Chairman, Rai S. C. Chaudhuri Bahadur nothing could have been possible. I beg leave to take the privilege of this occasion to say that the picture of the country which we are seeing and feeling to-day was mostly predicted by late Sri S. Bhattacherjee as far back as in 1936 when nobody could even imagine of such consequences of the war. It might be that all his predictions might not have been correct; but most of them became true, specially those in respect of the economic condition of the country. So as a mark of respect to the memory of the departed great it has been decided to rename the 'Victoria Chambers', which, as you all know, is the name of the residential portion of this house—as "Satchidananda Chambers".

I will now request the President formally to declare open the 'Metropolitan Insurance House' and the 'Satchidananda Chambers'.

ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

আজ এই শুভ উদ্বোধন দিবসে ১১ ক্লাইভ রো হইতে আমাদের হেড অফিস স্থানান্তরিত হইল। সুতরাং আশা করি, এমন দিনে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র ২০ বৎসর। ১৯৩০ সালে ২৮নং পোলক ষ্ট্রীটে এক ভাড়া বাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছিল। পরে ঐখান হইতে অফিস ৪-বি কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে এবং সেখান হইতে আবার ১৯৪১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ১১নং ক্লাইভ রোডে কোম্পানীর নিজ বাড়ীতে অফিস স্থানান্তরিত হয়। সে আজ ১০ বৎসরের কথা। ঐ সময় হইতে কোম্পানীর শক্তি উত্তরোত্তর এতটা বৃদ্ধি পায় যে, ক্লাইভ রো-এর প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ীটিও কোম্পানীর অফিসের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং কোম্পানীর অফিসের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে। বর্ত্তমান বাড়ীটি ক্রয়ের পূর্ব্বেকার ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২০ বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম খাতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি টাকারও অধিক, জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ আড়াই কোটি টাকা ও চালু ব্যবসায় পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী বীমাকারীদের দাবী পূরণ করিয়াছে প্রায় ৫৫

লক্ষ টাকা, গত ২০ বৎসরের এই প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এখন এই আশা হইতেছে যে, ভগবৎ কৃপায় ও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা লইয়া আমরা ভবিষ্যতে কোম্পানীর এক উজ্জ্বলতর চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইব।

কোম্পানীর এই ক্রমোন্নতির কথা বলিতে গেলেই আমাদের সংগঠন-কর্ম্মীদের কথা মনে পড়ে। কারণ কোন বীমা কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির অনেকখানিই নির্ভর করে কোম্পানীর সংগঠন-কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের উপর। বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রচেষ্টার উপরই কোম্পানীর ভিত্তি নির্ভরশীল। কাজেই এই সকল সংগঠন-কর্ম্মী, কর্ম্মচারী ও পরিচালকমণ্ডলী একত্রে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ না করিতে পারিলে কোন সন্তোষজনক উন্নতি হইতে পারে না। কাজেই যাহাদের প্রচেষ্টার ফলে আজ কোম্পানী ইহার বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় পৌঁছিয়া কলিকাতার সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এই ঐতিহাসিক ভবনটিতে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, আমাদের সেই সকল সংগঠন-কর্ম্মী, কর্ম্মচারীবৃন্দ ও অফিসারদিগকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এখন হইতে এই ভবনের নতুন নাম হইল 'দি মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স হাউস'।

তবে এ কথাও আমি স্মরণ করাইব যে, আপনারা অহংভাব পোষণ করিবেন না। এ কথা সত্য যে, আমরা আমাদের কোম্পানীর বীমাকারিগণ ও জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু এ সাফল্য আংশিক মাত্র। কারণ দেশ এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠোরতর হইতেছে। আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান আয় দ্বারা এমন কি দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারেন না। আমাদের এই যে সকল কর্ম্মচারী আমাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দান করিতেছেন, তাঁহারা যখন ...হাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সক্ষম হইবেন ...াঁহাদের দুশ্চিন্তার কারণ দূর হইবে, সেই দিনই ...চেষ্টা প্রকৃত সফল হইল বলিয়া আমি মনে ...াদের চেষ্টা ও উদ্দীপনা দ্বারা এই কাজ ...র—এমন ভরসা রাখি। কাজেই ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া আজ যদি আমরা শুধু গর্ব্ব বোধ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়ত আমরা সহযোগিতার মনোভাব হারাইয়া ফেলিব। এবং এই কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার স্বর্গত পিতা শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কোম্পানীর পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই আদর্শই ক্ষুণ্ণ হইবে। এই কোম্পানীর জন্য পিতা কি করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের অধিকাংশেরই সুবিদিত। সুতরাং পুত্র হইয়া আমার পক্ষে সে অতীত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা শোভন নহে। তবে একথা আমি না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা এই আংশিক সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাঁহার চিন্তাধারা ও আশীর্ব্বাদ এবং তৎসহ ডিরেক্টর বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় এস. সি. চৌধুরী বাহাদুরের সদাজাগ্রত অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমাদের প্রচেষ্টা এতখানি ফলবতী হইতে পারিত না। আজ আমরা দেশের যে অবস্থা ও চিত্র সম্মুখে দেখিতেছি, ১৯৩৬ সালেই স্বর্গত শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণীর সব কিছুই হয় ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় নাই। কিন্তু অধিকাংশই এবং বিশেষ করিয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার অনেক কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই সেই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই নূতন ভবনটির পুরাতন আবাসিক অংশ ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সের নূতন নাম রাখা হইল "সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স"।

এখন আমি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস ও সচ্চিদানন্দ চেম্বার্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করিবার জন্য এই সভার সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ জানাইতেছি।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য সভাপতি ও প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীএস, সি, রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ভারতীয় বীমা শিল্পের সভাপতি হিসাবে

আমি এই ব্যবসায়কে সেবা করিবার কার্য্যারম্ভ সুযোগ পাইয়াছি। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আপনারা আপনাদের নিজস্ব ব্যবসায়কেই জোরদার করিয়াছেন।

মেট্রোপলিটান কোম্পানী তাহার নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই দিনটিকে 'স্মরণীয়' আখ্যা দিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যেই মেট্রোপলিটান কোম্পানী বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

তিনি বলেন, ১৯৪৩ সালে কোম্পানী মাত্র দেড় কোটী টাকার ব্যবসা করিত; অথচ ১৯৫০ সালের মধ্যে উক্ত টাকার অঙ্ক ৭ কোটী ৭ লক্ষে পৌঁছে, ইতিমধ্যে কোম্পানীর বীমা ফণ্ড সাড়ে ৪১ লক্ষ হইতে ২ কোটীতে উন্নীত হইয়াছে। আমেরিকার সহিত ভারতের বীমা ব্যবসায়ের তুলনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় প্রত্যেককে বীমা ব্যবসায়কে উন্নত করিয়া তুলিবার কাজে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সহায়তা করিবার জন্য আবেদন জানান।

জাতীয় জীবনে জীবনবীমার স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, বীমা সমাজের প্রত্যেকের নিরাপত্তার প্রতিভূস্বরূপ। শ্রীযুক্ত রায় আশা প্রকাশ করেন যে, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত হইয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনে মেট্রোপলিটান কোম্পানী দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে সহায়তা করিবে।

সভাপতির ভাষণে কোম্পানীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর বলেন, '১৯৩০সালে যখন আমি আমার বন্ধু স্বর্গগত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করি, তখন ভাবিতেও পারি নাই যে, আমার সম্মুখ হইতে তিনি চিরকালের জন্য এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। আজ হইতে এই বাড়ীর নাম হইবে মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স হাউস এবং আবাসিক ঘরগুলির নাম হইবে 'সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স'।

সভায় ভারতের নানা প্রদেশবাসী অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীতও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিকবৃন্দও উপস্থিত থাকেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে, দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

অতঃপরে চপলাবাবু পরলোকগত কর্ম্মবীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মতৎপরতার সাধুবাদ প্রদান করিয়া পিতা যে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্বই প্রতিভাত হয়—"পুত্রে যশসী তোয়ে চ নরাণাং পূর্ণলক্ষণম্" বলিয়া উল্লেখ করেন।

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স হাউসের নূতন ভবন

[illegible] সম্মেলন

মেট্রোপলিটা[illegible] কোম্পানীর ৭ নং চৌরঙ্গী রোডস্থ নবতম ভবনে কোম্প[illegible]ীর কর্ম্মীবৃন্দের এক অপূর্ব্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমবেত কর্ম্মীবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাইয়া সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন করেন কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বৃহত্তর ভারতের বোম্বাই, দিল্লী, পাটনা, বিলাসপুর, নাগপুর, বেজওয়াদা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের শাখা-অফিসগুলি হইতে শ্রীশান্তনম তেভেরা, ওম্ প্রকাশ

শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়
উদ্বোধনী-ভাষণ দিতেছেন।

গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, সুধীর মুখোর্জ্জি, ডি, ভেঙ্কটাপ্পারলু, নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, হৃষিকেশ সেনগুপ্ত, ডি. এন. দত্ত, রাজেন্দ্র সেনগুপ্ত, নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মুণীন্দ্রনাথ বসু, টি. আর. নন্দলাল, এম. এস. পি. রাও, এ. এম্. সুন্দরম্, এস. এন. গাঙ্গুলী, কে. বি. মুখার্জ্জি, সর্দ্দার অভয় সিং প্রমুখ বিভিন্ন এজেন্সী ম্যানেজার, অফিসার, অর্গানাইজেসন অফিস-ম্যানেজার ও হেড্ অফিসের কন্ট্রোলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনকে সার্থক-মণ্ডিত করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও সেক্রেটারীর নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের পর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্য হইতে অনেকে বক্তৃতা করেন। গত কুড়ি বৎসরে মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং তাহাতে ৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ম্ম-প্রতিভাই যে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সকলের বক্তৃতায় তাহাই প্রকাশ পায়। অনুষ্ঠান-শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

পরের দিন সমবেতভাবে বরানগর লক্ষ্মীনারায়ণ নিবাসে উক্ত কর্ম্মীবৃন্দ সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী সরোজিনী দেবীর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক-সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। পরে তাঁহাদিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, বেলুর মঠ ও গান্ধী-ঘাট প্রদক্ষিণ করা হয়। সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান ক্লাবের উদ্যোগে 'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হয়। অভিনয়ে রামদাস স্বামী প্রমুখ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এবং পাঁচ হাজার লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত অভিনয়টি কলাসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অফিসারবর্গ, ষ্টাফ্ এবং কর্ম্মিগণের মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রীতিবন্ধনই মেট্রোপলিটান কম্পানীর এই বিরাট সাফল্যের প্রধান কারণ। ভরসা করি, চিরকাল ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং অচিরেই ইহার প্রভাব সারা ভারতের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতেই পরিব্যাপ্ত হইবে।

ইতিহাস

অনেকগুলি মানুষের এক মিছিল প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া চলিতেছিল। সাঁজোয়া মানুষের মিছিল নয়, সাধারণ মানুষের মিছিল। তাও সাধারণ মানে অতি সাধারণ। যেমন পোষাকে আষাকে, তেমন চেহারায়, তেমনি ভাবে ও ভঙ্গিতে। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে কেমন একটা হন্যে কুকুরের : মতো ক্ষুধার্ত্ত উদ্‌ভ্রান্তি, যেন লোকগুলি পারে তো পথের ধুলাবালি আর হাওয়া

খাইয়াই পেট ভরায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছিল যে মানুষগুলা প্রায় একটানা মাস তিনেক সময় ধরিয়া পেট ভরিয়া খাওয়া তো দূরের কথা, পেটের সিকিভাগ ভরাইয়াও কোনো খাদ্য খাইতে প[illegible] নাই। অথচ উহাদের দলের অর্দ্ধেকেরই বেশী মানুষ কৃষিজীবী শ্রেণীর—যাহারা শুধু নিজেদেরই জন্য নয়, অন্য মানুষেরও পেটের জোগান দিতে গিয়া নিজেদের হাতে খাদ্য ফলায়। এবং সেই পরিমাণের খাদ্যের ফসলও নাকি উহারা এই উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট সালেও ফলাইয়াছিল।—মিছিলটার লক্ষ্য মানুষগুলির তাবৎ ঐহিক ব্যাপারের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যিনি সেই তাহাদের শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের অভিমুখে।

বলা বাহুল্য সারা মিছিলটা ছিল অত্যন্ত নিরামিশ রকমের নিরস্ত্র। উপবাসে উপবাসে একটা ইটের ঢেলা ছুঁড়িয়া মারারই মতো ফুসফুসের জোর ছিল না কাহারো, তার আবার হাতিয়ার চালাইয়া বাহির হওয়া। তা ছাড়া যে আয়োজনে এই মিছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল পৃথক।—মানুষগুলি জানিত যে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইবার মতো ফসল এ সালেও তাহারা সমান ভরিয়া তুলিয়াছি, অথচ সেই ফসলই যে কোন্ এক গুপ্তিত অনাবিষ্কৃত সুরঙ্গ ধরিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল, সেই হদিশ উহারা আজও পাইল না। বণ্টনের ভার ছিল রেজ্ কি-রাজকর্ম্মচারীদের, এই রহস্য তাহাদের জানার কথা ছিল। কিন্তু তাহাদের কাছে এসব কথা জানিতে চাহিবে কেন! কাহার ঘাড়ে ক'টা এমন উদ্বৃত্ত মাথা! জানিতে চাওয়া চুলায় যাক, এই ধরণের কোনো অমার্জ্জনীয় কৌতুহল কাহারো মনে বাসা বাঁধিয়াছে, ইহা কোনোক্রমে জানাজানি হইয়া গেলেই প্রাণ নিয়া টানাটানি হইবার উপক্রম। এই কারণেই নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই মানুষগুলি এইভাবে সেদিন পথে বাহির হইয়াছিল—অর্থ হইল জলের আবর্ত্তে পড়িলে স্থলচর জীব ডাঙা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ঠিক যতখানি নিরুপায় হইয়া চলতি স্রোতের খড়াকুটাকেও ভাসিয়া থাকার অবলম্বন বলিয়া আঁকরাইয়া ধরে—ঠিক সেইরকম নিরুপায় হইয়া। ওরা আজ সরাসরিই গিয়া শাসনকর্ত্তার কাছে দরবার করিতে চায়। নালিশ নয়, বিক্ষোভ নয়, সব কথা জানাইয়া তারা কেবল তাদের সেই মহামহিম শাসনকর্ত্তার সমীপে গিয়া গলবস্ত্রাবস্থায় এই প্রার্থনাটুকু জানাইবে যে—হুজুর, না খাইতে পাইয়া [illegible] একত্র হইয়া থাকিতে চ[illegible] যাতে বজায় থাকে তেমন [illegible]কটা কিছু বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া দিন।—এই সামান্য প্রজা[illegible]টুকুর অনুষ্ঠান ব্যতীত যে আর কোনরূপ উত্তপ্ত উদ্দেশ্য [illegible] এই মিছিলবদ্ধ মানুষগুলার ছিল না, তার আর একটি বড় নজির এই মিছিলটার উদ্যোক্তা আর পরিচালক ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা। ইঁহারা সবাই ছিলেন সমাজের সেই বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ, যাঁহারা মানুষের মন হইতে তাহার বহুমুখী পাশবৃত্তিটাকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করার ব্রতই তাঁহাদের আমরণ নিষ্ঠাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

ঠিক যে কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মিছিলটা সে কথা সপ্রমাণে নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত। তবে যেখান হইতেই হোক্, প্রাসাদের বেশ কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতে সে মিছিলের জনসংখ্যা যত ছিল, সুরুতে তার এক দশমাংশ ছিল কি না সন্দেহ। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে খসিয়া পড়া বড় একটা পাথরের চাই যেমন নীচে নামিবার মুখে তার গতিবেগের প্রচণ্ডতার বলে তার চলতিপথের আর আর সমুদয় ছোট বড় শিলাখণ্ডকেও সঙ্গে নিয়া এক শিলাস্রোতের রূপধারণ করিয়া নামিতে থাকে, এ মিছিলটাও তেমনি তার চলার পথ হইতে লোক টানিয়া নিয়া আগাইতেছিল। ঠিক এই ভাবে আগাইতে আগাইতে মিছিলটা যখন প্রায় গন্তব্য স্থানের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন উহাতে মানুষের সংখ্যা হইবে প্রায় কয়েক হাজার।

প্রাসাদকূটের কোনো নিভৃত কোটরে বসিয়া এই মিছিলের উদ্দিষ্ট মানুষটি তখন কী করিতেছিলেন কে জানে। তবে এই মিছিলের কথা তিনি জানিতেন। জানিতেন মানে অবশ্য কয়েকটা ঘণ্টা আগেকার কথাই জানিতেন, যখন সর্ব্ব সাকুল্যে মাত্র শ'ছয়েক লোক ছিল সারা মিছিলটায়, সেই তখনকার খবর। মিছিলের আয়তনটা যে এত বড় হইতে পারে তা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। প্রাসাদকূটে বসিয়া তাই তিনি যখন দূর হইতে ভাসিয়া আসা প্লাবননির্ঘোষের মতো একটা কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তখন বোধহয় তিনি আঁতকাইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত আহ্বানে, সভাষদ, পারিষদ সেপাই-সামন্ত যে যেখানে তাহাদের সকলকে ডাকিয়া

।তনি। তারপর অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে কী যেন একটা পরামর্শ দিলেন।

।লটা ততক্ষণে প্রায় প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া হ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের সম্মুখ দিকের জানা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকগুলো মানুষ। আগে প্রাসাদের নিভৃত কোটরে বসিয়া হুজুর ।রে যাহাদের কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহারা ই। রাজকীয় বেশভূষার দস্তুর অনুযায়ী তাহাদের কয়ই হাতে একটি করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র। মিছিলের ভাবিল, সদাশয় হুজুর নিশ্চয়ই আগে ভাগেই তাঁর প্রজাদের আগমনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তাহাদের দরবারে নিবেন। রাজকীয় প্রথায় অঙ্গ ব আগ্নেয়াস্ত্রী মানুষগুলি বোধ হয় সেই শুভ- নেরই অগ্রদূত হইয়া আসিয়া প্রাসাদের সম্মুখে য়াছে।—জনতা সমস্বরে হুজুরের জয়ধ্বনি করিয়া ার করিয়া উঠিল।

ঠাৎ সেই তুমুল হর্ষধ্বনিটাকে ছাপাইয়া আর একটা

াশেপাশের গাছগুলিতে নিরাপদ আশ্রয়ে যত বসিয়াছিল, সেই আকস্মিক আওয়াজটার আচমকা ত যেন গিয়া তাহাদের ছোবল মারিল। পরক্ষণেই টাছ ফেলিয়া প্রাণপণে দিশ্বিদিকে কোথায় ছুটিয়া র হইয়া গেল পাখীগুলি। আর এদিকে মাটির য় দেখা গেল—মিছিলটার সামনের ভাগে কতক- দেহ রক্তে মাখামাখি হইয়া ধুলার উপরে ছটফট তছে।—বিস্মিত হইবারও সময় পাইল না ।গুলি—ঘটনাটি এত আচম্বিতে ঘটিয়া যায়।

র্ত্তকালমধ্যেই আবার সেই শব্দ, আর সঙ্গে আবার কয়টি রক্তাক্ত দেহ ধুলায় লুটাইয়া ় করিতে থাকে। মিছিলের হতভম্ব জনতা এই- বুঝিল এ ব্যাপারখানা কী! প্রাসাদের নানা া দাঁড়ানো মহামান্য হুজুরের সেই সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী গার উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জানাইতেছে—যে কোনো ।থি-রাজপুরুষের শুভাগমন ঘটিলে বন্দুকের পর বন্দুক গিয়া যথাযোগ্য আড়ম্বরে যেমন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত গ হয়, প্রায় ঠিক সেই রাজকীয় আদবেই ।সাদরক্ষীদল এই মিছিলকেও অভ্যর্থনা জানাইতেছে। শুধু সামান্য একটু পৃথক ভাবে। রাজপুরুষদের অভ্যর্থনার বেলায় রাজরক্ষীরা বন্দুকগুলা দাগে ব্যারেলগুলি আকাশের দিকে উঠাইয়া; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ রাজপুরুষদের চেয়েও অধিক সম্মান দিবার জন্য তারা বন্দুকগুলি একেবারে জনতার মাথা আর বুক ঠিক করিয়াই দাগিয়াছিল।—সহসা স্তম্ভিত আতঙ্কের এক দিশাহীন ব্যাপাটে রোল পড়িয়া যায় সেই মিছিলে। এবং ইহার পরমুহূর্ত্তেই কিছুক্ষণ আগেকার সেই শঙ্কাক্লিষ্ট ত্রস্ত পাখীগুলির মত মিছিলান্তর্গত লোকগুলিও দৌড় দিল যে যেদিকে পারে। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই ছত্রাকার হইয়া গেল সেই হাজার হাজার মানুষের মিছিলটা। অবশ্য রাজকীয় গুলির সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া যাহারা ধুলায় রক্তে গড়াগড়ি যাইতেছিল, তাহারা সেই অকুস্থলেই রহিয়া গেল।...

উপরে যে বিবরণটি দেওয়া গেল সেইটি পাঠ করিয়া পাঠকদের প্রায় সকলেই সম্ভবতঃ খুব বিস্মিত হইয়া যাইবেন, ক্রুদ্ধও হইবেন কেহ কেহ, এবং আমাদের উদ্দেশে কোনো কটূক্তি করিয়া তাহারা মন্তব্য করিবেন যে, এই যদি কুচবিহারের গুলিবর্ষণের যথার্থ বর্ণনা হয়, তাহা হইলে লেকসাকসেসের পুত্তলিকা পরিষদে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচীবটি মাসের পর মাস ধরিয়া কাশ্মীর সম্পর্কে যে ভাষ্য করিয়া যাইতেছেন সে ভাষ্যকে অকৃত্রিম ও অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। সেদিন—কুচবিহারে যে শোচনীয় কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল, সেই কাণ্ডের ষোলো আনার চার আনা ঘটনাও আমাদের এই বিবরণে স্থান পায় নাই।

কিন্তু ভুল বুঝিবার এমন কোনো সম্ভাবনা উদ্ভিত হইবার আগেই পাঠকদিগকে আমরা জানাইয়া রাখি যে, উপরে যে বিবরণটি আমরা দিয়াছি, সেইটি আদৌ কুচবিহার সম্পর্কিত কোনো ঘটনা নয়—এদেশেরই ব্যাপার নয় কোনো। এবং বর্ত্তমান কেন, কাছাকাছি কোনো অতীতেরও ঘটনা এইটি নয়। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আজ হইতে প্রায় দীর্ঘ ছেচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—১৯০৫ সালে, রুশীয় জারের শীত প্রাসাদের সামনে। সেই হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে 'রক্তময় রবিবার' এই বলিয়া দিনটি একটি বিশেষ খ্যাতি বহন করিয়া আসিতেছে।

এ-দফায় পাঠকেরা বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিস্মিত

হইয়াছেন। এবং মনে মনে বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছেন—আশ্চর্য্য, এ তো দেখিতেছি অবিকল কুচবিহারেরই ঘটনা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমন হুবহু ভাবে ঘটিতে পারে? এবং ইহার পরেই খতাইয়া চিন্তা করিয়া হয়তো মন্তব্য করিতেছেন,—কিন্তু, কিন্তু— এই রক্তময় রবিবারের সূত্রপাত হইতেই না, সারা রুশিয়া দেশটা অতি ভয়াবহ রকমের এক রাষ্ট্রীয় হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল? আর, ১৯১৭ সালেরও না আবির্ভাব হইয়াছিল এই ১৯০৫-এর রক্ত রবিবারের পথ অনুসরণ করিয়াই?—বলিয়া রাখা ভালো, একেবারে শেষের মন্তব্যটি যে পাঠক করিবেন, সেটি অবশ্যই তাঁহার নিজের উক্তি নয়। কারণ আজ হইতে বছর উনিশ আগে ঠিক ঐ উক্তিটিই উচ্চারণ করিয়াছিলেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু স্বয়ং।

কুচবিহারের গুলি সম্পর্কে আমাদের নিজেদের তরফ থেকে বলার কিছু নাই। শুধু একটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, সে বিষয়টি হয়তো উত্তেজনামুখর বহু সংবাদের হট্টগোলে অনেকেরই নজর এড়াইয়া গিয়াছে। যে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে কুচবিহারের অধিবাসীদিগের উপর গুলি চলিয়াছিল, সেইদিন, ঠিক সেই দিনই ভারত পার্লামেন্টের সমবেত সদস্যদের মধ্যে একটি বিলকে কেন্দ্র করিয়া খুব আন্তরিক আলোচনা চলিতেছিল।—বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ভারতীয় পুলিশবাহিনীর এক উন্মত্ত অফিসারের দানবীয় আনন্দের যূপকাষ্ঠে এমনই কয়টি নিরস্ত্র ভারতীয় প্রাণ বলি দিয়াছিল। উল্লিখিত বিলটি দিয়া ভারত সরকার সেই শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এক স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিতেছিলেন—জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতিমন্দির।

মাঝে মাঝে মাথা খারাপ ইতিহাসটা যে কী ঠাট্টাই করিতে পারে!

শান্তি সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন শেষ হইয়াছে। প্রথিতনামা লেখক, শিল্পী, নাট্যকার, নট, গায়ক, জননেতা, ট্রেড ইউনিয়ান, কৃষক কর্ম্মী ও বিভিন্ন বামপন্থীদল ইহাতে ... শান্তির জন্ত দলমতনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ... শীল এবং প্রয়োজন হইলে উহার জন্ত সংগ্রাম ইঁহারা দ্বিধা করিবেন না; এই সম্মেলনের সফল্য প্রমাণ। গত বৎসরের পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সম্মে... জনপ্রিয়তা বা সর্ব্বদলীয়তা পায় নাই। উহ... দলেরই কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু এবারে ডাঃ কিচল... বিভিন্ন নেতারা উহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝাইয়া দি... তাছাড়া বার্লিন শান্তিপত্রে যে দেড় লক্ষ সই উ... তাহার মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হইতে বিশিষ্ট কংগ্রে... শ্রমিক-কৃষক সকলেই আছেন। শান্তির জন্ত ... উৎকণ্ঠা সমভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহ... সম্মেলনের সফলতা।

ইংরাজ রাজত্বের ছায়ায় আমরা দ্বিতীয় ম... দেখিয়াছি। দেখিয়াছি যুদ্ধের প্রয়োজনে মানুষের ... কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, দেশ গঠনের উপাদ... সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেছে। লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরু... এক মুষ্টি অন্নের জন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরি... বোমার ভয়ে মানুষ বাস্তু ত্যাগ করিয়া নূতন... খুঁজিয়াছে; যুদ্ধের প্রয়োজনে খাস্ত সরাইয়া ... হইয়াছে! তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই স... মানুষের আজ যুদ্ধের প্রতি দুর্ব্বার ঘৃণা। তাই কো... যে সব বিদেশী সৈন্ত রহিয়াছে, তাহাদের অ... সরাইয়া আনিবার ডাক সে দিয়াছে। বাহির ... গিয়া যাহারা সে যুদ্ধ জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ... আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সাধারণ লোক যুদ্ধ... যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করে। যদিও তাহাদের ... এখনো খুব বেশী জোরদার হয় নাই, তবু এই শান্তি সম্মেলনগুলি হইতে সেই সম্ভাবনার সূচনা হইয়াছে।

শান্তি সম্মেলন যে প্রস্তাবগুলি লইয়াছেন, তাহা সুস্থ... মানুষেরই সমর্থন পাইবে নিশ্চয়। ইংরেজ, মার্কিন, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এই পঞ্চ শক্তির শান্তিচুক্তির জন্ত দাবী করা হইয়াছে এবং সেই চুক্তির জন্ত ভারত চেষ্টা করুক যাহাতে ভারতেই সেই সম্মেলন ডাকা হয়। চীনকে জাতিসংঘে তাহার ন্যায্য আসন দিতে হইবে, যুদ্ধের প্রচার বন্ধ করিতে হইবে, পাকিস্থান ও ভারত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হোক, নির্ব্বাচনে প্রতিটি কার্য্যক্রমকে স্থান দান ইহাও সম্মেলন দাবী করেন। জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জা

না। এই যে দাবী, এগুলি পশ্চিমবঙ্গ তথা
ই সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

ার কয়েকটি দুর্ব্বলতাও চোখে পড়ে।
কার্য্যক্রম উপস্থিত করার ব্যাপারে মতপার্থক্য,
লীয় অসহিষ্ণুতার প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য
প্রশ্নে বিরোধ না থাকায় আমরা আশা করি
পার্থক্যও ধীরে লোপ পাইবে।

াড়া যাহা গুরুতর, তাহা হইল এইবারকার
মিক ও কৃষক প্রতিনিধির অংশ অত্যন্ত কম।
মধ্যেই এবারকার উৎসাহ সীমাবদ্ধ। সাধারণ
ামান পল্লীতে সম্মেলনের স্থান হইলেও তাঁহারা
াগ দেন নাই।

নের শেষে তিনটি দিন যে সাংস্কৃতিক উৎসব
তাহা প্রচুর লোককে টানিয়াছে। সাধারণ
ন শান্তি সম্মেলন হইতে এইটাকেই চাহিয়াছে
প্রাণে। কিন্তু উহাও সফল হয় নাই। কেননা
যন্ত্রসঙ্গীত যাহাই হইয়াছে, তাহা সাধারণ
রূপ লইয়াছে। ঐগুলির মধ্য দিয়া শান্তির
প্রচেষ্টা ছিল না। কলিকাতার প্রখ্যাত শিল্পীরা
লেই আসিয়াছেন, কিন্তু সকলেই নিজ নিজ প্রিয়
অনুষ্ঠানে করিয়াছেন। হয়ত অর্থ সংগ্রহের জন্য
র পাণ্ডারা ইহা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হয় নাই।
সম্মেলন হইতেই শান্তি আন্দোলনের এক নূতন
গুরু হইবে। সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতা ও অনৈক্যের
পসারণ করিয়া সকল দলমতধর্মজাতি-নির্ব্বিশেষে
আন্দোলনকে অগ্রসর করার এক কার্য্যক্রম
নর আছে। এই কার্য্যক্রমের প্রধান হইল
তিন মাসের মধ্যে শান্তি আবেদনে ৫ লক্ষ সই
বিবিধ সংগঠনের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধি, প্রত্যেক
তই আনুষ্ঠানিক ভাবে শান্তি কমিটি স্থাপন এবং
ন্তির লক্ষ্য ও বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির
প্রচার।

শ্রীকৃপালনি ও কংগ্রেস

কটি মনগড়া রূপক উদ্ধৃত করিতেছি।
শ্বশুর আর পুরাতন ঘর জামাইয়ের মধ্যে বিবাদ
ত হইয়াছে।

যে কারণেই হোক, শ্বশুর মহাশয়ের আর আগের মতো তোয়াজ করিবার প্রবৃত্তি নাই পুরাতন ঘর জামাইকে। উপরন্তু বাধাজীবনের কোন বেয়াদবিতে তিনি তাহার উপর রীতিমত রুষ্ট হইয়াছেন। পারেন তো লোকটিকে তিনি অবিলম্বে সেই প্রবাদ কথিত ধনঞ্জয় জামাইয়ের ন্যায় বিদায় করিয়া দেন। কিন্তু উপায় নাই। অবশ্য এতকাল যে লোকটিকে দিয়া অনেক কাজ কর্ম্ম করাইয়া নেওয়া হইয়াছে সংসারের, কাজেই এখন দুটমুট তাড়াইয়া দিতে বসিলে, পাড়ার দশজনের কাছে একটা নিন্দনীয় অকৃতজ্ঞতার অপবাদে অপরাধী হইতে হইবে—নিরুপায় হওয়ার কারণটি কিন্তু আদতেই তা নয়। নিরুপায় হওয়ার আসল কারণ হইল এই যে, লোকটি তো সংসারের একেবারে অভ্যন্তরীন ব্যাপারের সঙ্গেই অনেক দিন ধরিয়া জড়িত হইয়া আছে, সংসারের বহু অপ্রকাশ্য গুপ্ত কথাই তার নখদর্পনে। এমতাবস্থায় মানুষটাকে তাড়াইয়া দিলেই সে বাহিরে গিয়া এই সব গুপ্ত তথ্য পাড়া-পড়শির কানে তুলিবেই। সেটা সমূহ আমাদের কথা। কেননা পাড়া-পড়সির মাতবরি করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের দিন চলে। পাড়ার লোকের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইলে একবারে অন্নেই টান পড়িয়া যাইবে।

ওদিকে জামাতার অবস্থাটিও বিশেষ কিছু কারাকের নয়। উনি জানেন যে, শ্বশুর মহাশয়ের কাছে তাহার আর দর নাই আগের মতো। বরঞ্চ তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিলেই যেন বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হন। এই তাচ্ছিল্যের আঘাতটাই জামাতা-ভদ্রলোকের কাছে সবচেয়ে বেশী দুঃসহ। অথচ তিনিও নিরুপায়। কারণ মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি জানেন যে পাড়া-পড়শীর কাছে তাঁহার নিজের যা কিছু আদর কদর সে ওই বুড়া শ্বশুরের জন্যই। ওই বুড়ার সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিলে পাড়ার লোক তাহাকে আর ডাকিয়াও পুছিবে না। দু'চার জন যাঁহারা ইতিমধ্যে নানা কারণে বৃদ্ধের উপর বিরূপ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিয়া হয়তো একটা বিরুদ্ধ মাতব্বরী দল টলও গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু ইহাতে বৃদ্ধকে তাঁহার মাতব্বরীর আসন হইতে নামাইয়া সেই আসন দখল করা যাইবে—তাহা মনে হয় না। কাজেই শ্বশুর

মহাশয়ের কাছ হইতে তাঁহার সেই পূর্ব্বতন খাতিরটি পুনরুদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পাড়ার লোকের সামনে দাঁড়াইয়া শ্বশুর মহাশয়কে খালি এই বলিয়া হুমকির পর হুমকি দিয়া চলিয়াছেন—এখনও বলিতেছি ভালোয় ভালোয় মিটমাট করিয়া নিন একটা। নহিলে…

বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধায় পুষ্ট কংগ্রেসকে বৃদ্ধ শ্বশুর, আর শ্রীকৃপালনিকে পুরাতন ঘর-জামাই বলিয়া মানিয়া নিতে পারিলে মনে হয় মনগড়া হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরই এই আজগুবি রূপকটিরও একটি বিশেষ অর্থ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মার্কিণ গম

সাম্যবাদের যে সর্ব্বগ্রাসী বিভীষিকা আজ সমগ্র মানববিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিভীষিকার কবল হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার শক্তি আছে শুধু এক পশ্চিমী গণতন্ত্রের। আমেরিকাই হইল এই শক্তির সর্ব্বোত্তম সংহত রূপ। পৃথিবীকে সাম্যবাদের ভয়াবহতা হইতে ত্রাণ করিবার সকল সুমান দায়িত্ব তাই আমেরিকারই। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রাচুর্য্যের প্রতীক আমেরিকাও সেই গৌরবান্বিত দায়িত্ব পালন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রস্তুত—অর্থ দিয়া, সামর্থ্য দিয়া, আহার দিয়া, আনবিক বোমা দিয়া এবং এমন কি এই দায়িত্ব পালনের জন্ত সর্ব্বস্বও যদি বিলাইয়া দিতে হয় আমেরিকা তাহাতেও পশ্চাদপদ নয়।

—অনেকটা এই ধরণের এক সঙ্কল্প মার্কিণ রাষ্ট্রনায়করা প্রায় প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চরণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের অজস্র প্রচারযন্ত্র দিয়া এই সঙ্কল্পের কথা তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই দুনিয়াময় প্রচার করিয়া থাকেন।

দুইশত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হইয়াছে ভারতবর্ষ। এই প্রচারকার্য্য তাই তাহার কানে যেন গোকুলের বাঁশীর মতো মধু বর্ষণ করিত। আয়ান ঘোষের অন্তঃপুরের মতো বৃটিশ প্রভুর ঘেরাটোপ ছাড়িয়া সবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের বহিরাঙ্গিণায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রীরাধা-ভারতবাসী—মার্কিণী গণতন্ত্রের ভুলায়শিঞ্জীত সুর তাহার বুকে … তুলিত, মনে মনে অনুক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিত … শিহরিত মনুষ্যদিগের।—এইরূপ মনে করা… কারণও যথেষ্ট ছিল। ফিলিপাইন, জা… তুরস্ক, স্পেন, পর্ত্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়া… গোটা দক্ষিণ আমেরিকার পুত্তলি রাষ্ট্র-… সব হইল মার্কিণ শ্যামের আলিঙ্গনবদ্ধা গো… শ্যামপ্রেমের গুণগান করিতে করিতে আ… রুদ্ধবাক হইয়া যায়, আবেশে ইহাদের গা… ওঠে।—এই গোপিনীদিগের মুখেই শ্যামের … শুনিতেই তো বৃটিশ বন্ধনমুক্ত ভারতের এই … ইহার উপরে আবার ছিল ভারতের আ… মার্কিণ সুবদনরূপী বিন্দে দূতীর দল। তা… মার্কিণ-শ্যামের আবদ্ধ করিতে তাদের… কি কম ছিল? ন্যায় ও আইনের সং… লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগের ৫৪ জন ভারতে… গোপনে শ্যামের কাছে এক প্রেমলিপি পা… পর্য্যন্ত।

তারপর, আজ হইতে তিন মাস আগে … তাহারও তিনমাস পূর্ব্ব হইতে তখন ভারতের বাতাসে মুক্তিজীর বন-মহোৎসবের মোচ্ছব-বা… সঙ্গে সমানে তাল দিয়া বাজিতে সুরু করিয়া… দানবের করাল মড়ক বাদ্য। সেই একদা … বে, প্রত্যক্ষ মিলন না ঘটিলেও Sam-প্রেমে… মিলিবে ভারতবাসীর; বিন্দে দূতীদের মুখে বুভুক্ষ… ভারতের বুকফাটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া শুনিয়া … uncle Sam-এর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে; তা… প্রেমের প্রথম নিদর্শন স্বরূপ কুড়ি লক্ষ টন গম … একটি কানাকড়িরও প্রত্যাশা না করিয়া ভারতবাসীর উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে।—… শ্যামের প্রধান প্রতিভূ টুম্যান নিজমুখে ঘোষণা করিলেন।

ভারতবাসীর মন বুঝি আরও একটু টলিল… কীর্ত্তনে বিন্দে দূতীরা অধিকতর তৎপর হইলে… ভারতবাসী ক্ষুধিত জঠর চাপিয়া ধরিয়া অধীর

তিশ্রুত ২০ লক্ষ টন গম-প্রসাদের পথ চহিয়া

পর দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়,—ক্রমে ক্রমে ানবটার তাণ্ডব নৃত্য তাণ্ডবতর লয়ে চড়িতে কিন্তু কোথায় সেই মার্কিণ প্রেমের প্রসাদ? পরিবর্ত্তে ক্ষুধাব্যাকুল ভারতবাসীর কানে খবর যে সেনেট ও কংগ্রেসের গোপবালারা নিজের টু আলাপ-আলোচনা করিতেছেন এই কুড়ি ম-প্রসাদ নিয়া—তাঁহারা খতাইয়া দেখিতেছেন পাইন, তুরস্ক প্রভৃতি গোপিনীদিগের মতো ভারতের Sam-প্রেমের কোনো সন্তোষজনক পাইয়াই এই গম-প্রসাদ তাহাকে সমর্পন করা।—সে খবর শুনিয়া বিদেদূতীরা বলিলেন, টেই—সন্দেহটা কি আর কিছু অসমীচীন? সত্যই এখনও কায়-মন-বাক্যে মার্কিণ সখার কে সমর্পিত করিতে পারিয়াছে?—অতএব ত সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কংগ্রেস করিয়া এই সব বিলাইয়া দেওয়া মার্কিণ প্রেমের খিল করিলেন।

ণ গম কিন্তু তবুও আসিল না—কুড়ি লক্ষ টন র কথা, একটি দানাও না, ইতিমধ্যে বিহার র্ভিক্ষ রীতিমত বাধিয়া গিয়াছে, খন্দের দাম চতুর্গুণ এবং অন্যান্য রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রীরাও তাষার জবাব দিয়া বসিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় হইতে খাদ্য আসিয়া না পৌঁছিলে জনগণকে খাদ্য ত তাঁহারা অক্ষম।—'ভারতীয় খাদ্য বিল' খন মার্কিণ সেনেট ও কংগ্রেসের সদস্যরা আলাপ নার নেবু চটকাইতেছেন আর চটকাইতেছেন।

শবে এইমাত্র দিন কয়েক আগে একদিন এক তে আমেরিকার বার্ত্তা সংভরন বিভাগের nformation Service) মধ্যস্থতায় আবার ল যে পাওয়া যাইবে, ভারতের প্রতি ভেচ্ছার অকাট্য প্রমাণরূপে মরণোন্মুখ াণ বাঁচানোর জন্য গম পাওয়া যাইবে। ং পাওয়া যাইবে এবং পরোক্ষভাবে দেখিলে তাহা পাওয়া যাইবে প্রায় একরকম বিনা মূল্যেই। কিন্তু কয়টি সর্ত্তে। কী কী সেই সর্ত্ত?

তেমন কিছু নয়। অতি সাধারণ, অতি ন্যায্য ও অতি সম্মানজনক এই পাঁচটি সর্ত্ত মাত্র। যথা—

প্রথমতঃ, আমেরিকার দেওয়া যে খাদ্য এদেশে আসিয়া পৌঁছিবে, সে সমস্ত খাদ্যই ভারতবাসীর মধ্যে জাতিধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত মূল্যে বণ্টন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু আমেরিকার দেওয়া খাদ্যই নহে, ভারত সরকার যেখান থেকে যত খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন, সে সমুদয় খাদ্যও ঠিক প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে ভারতবাসীর মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারত সরকারকে আমেরিকার এই বদান্যতার কথা প্রতিনিয়ত সমস্ত উপায়ের প্রচার কার্য্য দ্বারা তাবৎ ভারতবাসীর গোচরীভূত করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, আমেরিকার এই খয়রাতি (?) করা খাদ্য উপযুক্ত মূল্যে বণ্টন করিয়া বিনিময়ে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, সেই অর্থ দিয়া এমন একটি বিশেষ ফাণ্ড (Fund) খুলিতে হইবে যে ফাণ্ড শুধু নিয়োজিত হইবে ভারতের অনুন্নত খাদ্য, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি বিধানার্থে—এবং ভারত ও আমেরিকার যুগ্মস্বার্থে।

পঞ্চমতঃ, ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই চতুর্ব্বিধ সর্ত্ত যথাযথ পালনে যাহাতে না কোনো প্রত্যয় ঘটিতে পারে তাহার উপর কড়া নজর রাখার জন্য ভারত সরকারকে কয়েকজন মার্কিণ সরকার মনোনীত কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইবে। এইসব মার্কিণ সরকার মনোনীত কর্ম্মাধ্যক্ষরা ভারত সরকারের কোনো নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের এক্তিয়ার ভুক্ত থাকবেন না, কিন্তু তাহাদের বেতন আহার-বিহার যানবাহন প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ভারই ভারত সরকারকে নিজ ব্যয়ে বহন করিতে হইবে।

তার মানে এক কথায় ভারতের যদি মার্কিণ গম খাইতেই হয়, তাহা হইলে ভারত সরকারের পাঁচটি মন্ত্রী-দপ্তর—খাদ্য অর্থ কৃষি ও শিল্প আর প্রচার বিভাগটি মার্কিণ Sam-এর পায়ে বাঁধা রাখিতে হইবে।

শ্যামের শুধু বাঁশিই শুনিয়াছিল ভারতবর্ষ, এইবার সে সেই বিশ্বত্রাতার মোহনরূপ চাক্ষুস দেখিল।

ইতিমধ্যে আরেক ব্যাপার। বিশ্বকে যে দুইজন কুচক্রীর ভয়াল গ্রাস হইতে রক্ষা করার সুমহান স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ বিশ্বত্রাতারা, সেই কুচক্রী দুইজন কিন্তু কোনোরকম সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই ক্ষুধিত ভারতকে সর্ব্বসমেত ১৬ লক্ষ টন খাদ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের সব বিশুদ্ধ দোকানদারির সর্ত্ত—আমার যা আছে তুমি নাও, তোমার যা বাড়তি আছে আমাকে দাও—আর কিছু নয়।

কিন্তু এত কাণ্ডের পর, এবারে মার্কিণ-শ্যামের ভারতবর্ষীয় বিন্দে দূতীরা কী বলিবেন?

ম্যাক্ আর্থার জঙ্গ বাহাদুর

অনেকদিন ধরিয়াই ম্যাক্ আর্থার সাহেবের নামের ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলাইয়া বোম্বাইয়ের কয়টি সংবাদপত্রের সংবাদ লেখকেরা তাহার সম্বন্ধে একটি বড় মজার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 'ম্যাক্ আর্থার'কে তাহারা বলেন 'ম্যাড্ আর্থার'—অর্থাৎ কিনা 'পাগলা আর্থার'। কথাটা এতদিন বোধহয় শুধু রসিকতারই বিষয় ছিল। কোরিয়ায় ডলার-প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্ত আমেরিকান বাহিনী সেনানায়ক জঙ্গ বাহাদুর ম্যাক্-আর্থারের নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী কোরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতীর্ণ হইয়াছে আজ প্রায় এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে ম্যাক্ আর্থার জঙ্গ বাহাদুর বোধ হয় অন্ততঃ বারো বার ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বাধীন কোরিয়ার আয়ু আর মাত্র দুই সপ্তাহের—এই দুই সপ্তাহের মধ্যে দুই থাবড়ায় তিনি কোরিয়াবাসীদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িবেনই। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টাই ঘটিয়াছে বার বার। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, যতবারই তিনি এইভাবে দুই থাবড়ায় কোরীয় বেচারাদের ঠাণ্ডা করিয়া দিবার সাধু সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, কোরীয়রা আসিয়া স্বয়ং তাঁহারই গণ্ডদেশে পাঁচ থাবড়া বসাইয়া দিয়াছে।—'পাগলা আর্থার' নামকরণটিকে প্রধানতঃ এই কারণেই কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইত। আর বোধহয় উক্ত কাগজওয়ালাদের ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে, বিষয়টি কৌতু মোটেই। ম্যাক্ আর্থার যথার্থই উন্মাদ মানুষ। এক ভয়াবহ হত্যা-বিকার তাঁহার সম অনুভূতি ও আচরণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্ ও ভূপর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণ জানা যায় যে, মালয়ভূমির জলবায়ুতে অথবা সে অধিবাসীদিগের রক্তের মধ্যেই কী যেন এক রহস্য একটা আছে, যার ফলে মাঝে মাঝে এই স্থানের ক কাহারো ঘাড়ে সহসা একটা দুর্দ্দম ভয়ঙ্কর 'রোখ' বসে।...নিশিতে পাওয়া বিকট দুঃস্বপ্নের ম রোখ।...কতকগুলি লোক হয়তো একস্থানে দিব্যি জটলা করিয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে। দেখা গেল—বলা নাই, কওয়া নাই একটি চকিতে সেই জটলা হইতে উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে যেন কোথায় ছুটিয়া গেল। অপরিচিত গোছের কেহ যদি কাছাকাছি কোথাও তাহা হইলে তিনি ব্যাপারটির আকস্মিকতায় হইয়া যাইবেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিবেন ন মুহূর্ত্তেই তিনি দেখিবেন আরও এক হতভম্বকর দেখবেন যে, যে-লোকগুলি বসিয়া জটলা ক গুজব করিতেছিল, সেই লোকগুলিও কেন একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নয়, চোখ ফেলিতে না ফেলিতেই ভয়ার্ত্ত চিৎকারে স্থানী কী একটা বলিতে বলিতে তাদের সকলেই ছুটিয়ে করে দিক্‌বিদিকে—যেন কোন খাঁচা-বদ্ধ হিংস্র খাঁচা ভাঙিয়া ফেলার খবর পাইয়াছে লোক ইহার পর মুহূর্ত্ত কয়েক সময় অতিবাহিত হইবে ততক্ষণে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। দুইচারি জন বিহ্বল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত অসহায়ের মতো এ দরজা ছোটাছুটি করিতে থাকিবে, তার কারণ সমস্ত দরজাই তখন অর্গলবদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই অপরিচিত আগন্তুকটি একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন।

াদের অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিতেই যে দৃশ্যটা তিনি ন, তাহাতে তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত- যেন একলহমায় স্তব্ধ হইয়া যাইবে—হৃৎপিণ্ডটা াপি করিতে করিতে যেন কণ্ঠনালির কাছে উঠিয়া য়া তাহার দম বন্ধ করিয়া দিতে চাহিবে—অক্ষি- া যেন চোখের কোটর মধ্যে আর আবদ্ধ হইয়া তে চাহিবে না। তিনি দেখিবেন—একটি লোক স্থানীয় আকারের রামদা লইয়া আরেকটা লোককে পত কোপাইয়া চলিয়াছে—খানিকক্ষণ আগে হাসি াসার জটলা হইতে উঠিয়া সেই যে-লোকটি হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল—সে।

কন্তু এইখানেই শেষ নয় এ-ব্যাপারের।—সেকেণ্ড হ পরেই দেখা যাইবে, রামদা-হাতে লোকটি ম্ম লোকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আবার আরেকজনের ছুটিয়া আসে। আবার একটা তীব্র আর্ত্তনাদ— সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করা অবর্ণনীয় —ইহার পরেও যদি সেই অপরিচিত আগন্তুক ্বর মতো দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই তাঁহার শেষ দাঁড়ানো। আর যদি পূর্ব্বতর দের অর্জ্জিত বহুপুণ্যের ফলে প্রাণপণে দৌড়িয়া কোথাও তিনি আশ্রয় লইতে পারেন, এবং সেই স্থল হইতে যদি বাকি ঘটনাটুকও দেখিবার স সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বেন যে, সেই রামদা লোকটি রাস্তার উপর সমানবেগে কেবলই ছুটিয়া চলিয়াছে, আর যাহাকেই দেখিতেছে তাহারই উপর পড়িয়া রামদাখানি দিয়া শুধু কোপের পর কোপ বসাইয়া ছে। অতঃপর এই অপরিচিত আগন্তুক অনুসন্ধান জানিতে পারিবেন যে, এই সময়ে যদি না কোনো য় একেবারে সংজ্ঞা লোপ করাইয়া দেওয়া যায় এই া-হাতে লোকটির, তাহা হইলে উহার এই কৃত হত্যাবিকার আর কোনো প্রকারেই থামিবে একের পর একে, মানুষ দেখিলেই সে তাহার উপর াইয়া পড়িবেই। কারণ, হতভাগ্যের উপর ক' (Amok) বিকার ভর করিয়াছে।

ম্যাক আর্থার সাহেবও ঠিক এই 'আমক' বিকারের মতোই এক দুর্নিবার করাল হত্যাবিকারের দ্বারা আক্রান্ত। নহিলে যে দৃশ্য দেখিয়া সাধারণ মানুষ ভয়ে জুগুপ্সায় পাগল হইয়া যায়, বোমাবিধ্বস্ত ছিন্নভিন্ন হাজার হাজার মৃত মানুষের সেই দৃশ্য দেখিয়া কি তিনি বলিতে পারিতেন যে, উপভোগ করিবার মতো দৃশ্য দেখিলাম বটে। নহিলে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষতবেদনাই যেখানে এখনও অশুষ্ক, যেখানে মাটির বুকে এখনও রক্তের দাগ জ্বল জ্বল করিতেছে, গলিত শবস্তূপের পুতি-গন্ধে এখনও যেখানকার সমস্ত বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত—সেই মুমূর্ষু বিধ্বস্ত পৃথিবীর আঙিনায় দাঁড়াইয়া কি কোনো মানুষ এই বলিয়া তাহার মতো সদম্ভে ঘোষণা করিতে পারিতেন যে—যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ করিতেই হইবে, অ্যাটন-বোমার ঘায়ে নিঃশেষে মুছিয়া দিতে হইবে মার্কিন-প্রভুত্বের মিত্র নয় যারা সেই বেয়াদব এশিয়াবাসীকে যুদ্ধ না বাধিলে আমেরিকা বাঁচিবে না।

যুদ্ধের শুধু একটাই মানে হয়। যুদ্ধ মানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। সুতরাং ম্যাক্ আর্থারের রোগের উপসর্গ যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্ত্তৃক পদচ্যুত না হইলে তাঁহার এই হত্যাবিকার কোথায় গিয়া শেষ হইত ভগবানই জানেন। পৃথিবীর মানুষের এখনও ভাগ্যই বলিতে হইবে যে, আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রধানচক্রের সকলেই এখনও ম্যাক্ আর্থারের রোগে আক্রান্ত হন নাই।

বর্ষ শেষ

বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর অষ্টাদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রীর নব (ঊনবিংশ) বর্ষ আরম্ভ। এই সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ যাঁহাদের সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় বঙ্গশ্রীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, আগামী নববর্ষেও তাঁহারা আমাদের পাশে থাকিয়া বাংলার সংস্কৃতি প্রসারে বঙ্গশ্রীকে সমৃদ্ধ-শালিনী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন, এই কামনাই করি। বঙ্গশ্রী আজ বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের বস্তু। বঙ্গশ্রীর রচনাসম্ভার শুধু মানুষের অবকাশ-বিনোদনেরই

সামগ্রী নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বড় সম্পদ। সেই সম্পদকে যাহাতে দিনে দিনে প্রগতিধর্ম্মী পৃথিবীর পথে বাড়াইয়া তুলিতে পারি, তজ্জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা আমাদের একমাত্র ক... দেশবাসীকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন ক... সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি কামনা করি।

বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়,—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য।

* * *

চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্-দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—মস্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ। —*স্বামী বিবেকানন্দ*

বঙ্গশ্রীর স্থান পরিবর্ত্তন

এখন হইতে রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় চিঠি পত্রাদি সম্পাদকের নামে নিম্নের পরিবর্ত্তিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।